চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা

দেবব্রত নস্কর

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা
১৯৯৯

মাতৃঋণ, পিতৃঋণ ও গুরুঋণ অপরিশোধ্য
মাতৃদেবী পরলোকগতা গৌরীদেবী
পিতৃদেব স্বর্গত সেধকচন্দ্র নস্কর-এর স্মৃতি ও
শিক্ষাগুরু অধ্যাপক তুষার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
উদ্দেশে গ্রন্থখানি
বিনয়াবনত চিত্তে সমর্পণ করলাম।

বিষয়-সূচি

ভূমিকা

আঞ্চলিক পটভূমিকায় সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন আধুনিক কালের গবেষণার অন্যতম প্রধান বিশিষ্ট দিক। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং জনজাতির জীবনধারার প্রবাহের পটভূমিকায় গড়ে ওঠে এক একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে অঞ্চল বিশেষে গড়ে ওঠে Culture Complex তথা মিশ্র সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ, যার প্রতিফলন ঘটে বিশেষভাবে জনজীবনাশ্রিত লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারায়। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে নানা প্রকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে যার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ বিশেষত চব্বিশ পরগণা অঞ্চলটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। চব্বিশ পরগণা তথা সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোকে এই তথ্য ও সত্য উদঘাটিত হয় যে চব্বিশ পরগণার ইতিহাসের সীমারেখা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। প্রাকৃতিক ভৌগোলিক বিপর্যয়ে এই অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোল বার বার হয়েছে বিপর্যস্ত। নদীনালা ও অরণ্যের পট-ভূমিকায় এই অঞ্চলের জনজাতির ও জীবন ধারার যে বিশিষ্ট বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে ইতিহাসের ধারায় তার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক উপকরণের স্তরায়ণ প্রত্যক্ষ করা যায় ঐতিহ্য বাহিত লোকসংস্কৃতির প্রবাহে। চব্বিশ পরগণা তথা দক্ষিণবঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীর পূজাচার সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস-সংস্কার এবং আখ্যানমূলক লোকায়ত পালাগানের সুবিপুল ঐহিহ্যে।

চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগানের পর্যালোচনার প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যে আখ্যান কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আখ্যানমূলক কাব্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। আখ্যানমূলক গীতিসাহিত্য পাশ্চাত্য দেশে যা Ballad এবং Folk Narrative Song হিসাবে কথিত হয়, বাংলা ভাষায় তা যথাক্রমে গীতিকা বা পালাগান হিসাবে উক্ত হয়। বাংলা আখ্যানমূলক কাব্যগুলিকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়। যার মধ্যে গীতিকা, জীবনরস প্রধান গাথাকাব্য, ধর্মাশ্রিত গাথাকাব্য, ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাব্য, প্রণয়-গাথা, নীতিকথাশ্রিত গাথা, বারমাসী গাথা প্রভৃতি প্রধান। সাধারণভাবে বলা যায় বাংলা গাথাকাব্যের তিনটি সুস্পষ্ট রূপ—ব্যালাড বা গীতিকা, লিজেণ্ড বা ইতিকথা এবং রিলিজিয়াস ন্যারেটিভ বা ধর্মাশ্রিত গাথাকাব্য। লৌকিক ধর্মাশ্রিত আখ্যান কাব্যের একটি অভিজাত রূপ মঙ্গলকাব্য এবং আর একটি লৌকিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ রূপ "লোকায়ত পালাগান"। বাংলা আখ্যানমূলক গীতিসাহিত্যের ধারায় যেমন মৈমনসিংহগীতিকা এবং নাথগীতিকা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, তেমনি বাংলা পালাগানের বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লৌকিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ লোকায়ত পালাগানসমূহ।

মঙ্গলকাব্যসহ শিষ্ট ও শিল্প-সাহিত্যগত আখ্যানকাব্যের বহুল প্রভাব সত্ত্বেও বাংলার বৃহত্তর লোকসমাজে লোকসংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যনির্ভর লৌকিক বৈশিষ্ট্যজাত লোকায়ত

ঐতিহ্যের ধারা লুপ্ত হয়নি। লৌকিক দেবদেবী ও লোকধর্ম বিষয়ক লোকায়ত আখ্যান কাব্যের বহুল প্রচলন বাস্তব সত্য। লোকসমাজে অদ্যাপি লৌকিক দেবদেবী নির্ভর আখ্যানমূলক পালাগানের সজীব ঐতিহ্য বিবর্তিত হয়ে চলেছে। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা যায় 'লোকায়ত সাহিত্য' বা "Para Folkloric Literature" । পরিবর্তিত সামাজিক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার বাতাবরণে কালের গতিধারায় সংস্কৃতির বিভিন্নরূপ আত্মপ্রকাশ করে এবং উদ্ভব ও বিকাশের ধারায় তার মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়-জাত রূপান্তরের জটিল প্রক্রিয়া। এই ভাবে সংস্কৃতির সজীব প্রবাহে আবর্তিত হয় ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এবং গঠন-পুনর্গঠনের (Creation and re-creation) ক্রিয়াজাত 'ফোকলোর' তথা 'লোককৃতি' বা লোকসংস্কৃতির ত্রয়ীরূপ— লোককৃতি, লোকায়তকৃতি ও লোকবিকৃতি (Folklore-Parafolklore- Fakelore) । সমাজ বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে শিষ্ট ও লোকঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যময় মধ্যবর্তীধারা হিসাবে লোকায়ত সংস্কৃতির রূপাবয়ব গড়ে ওঠে। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যময়রূপ বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় চব্বিশপরগণার লৌকিক দেবদেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগানের ঐতিহ্যে।

লোকায়ত পালাগানের উদ্ভব ও বিকাশের একটি অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যময় ক্ষেত্র চব্বিশ পরগণা। আদিম ও লোকলোকায়ত ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী এবং বিবি ও পীরগাজী বিষয়ক পালগানগুলির একদিকে যেমন চব্বিশপরগণার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ের মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে, তেমনি আছে তার সাহিত্য-রসগত আবেদন—বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে যার মূল্য অপরিসীম। সুন্দরবন ও চব্বিশ পরগণার পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও লৌকিক দেবদেবী বিষয়ে পূর্বসূরীগণ অনেক মূল্যবান আলোচনা ও গবেষণা করলেও বিশেষভাবে এই অঞ্চলের লৌকিক দেব-দেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগান সম্পর্কে সামগ্রিক গবেষণা সম্ভবত হয়নি। এই দিক থেকে লোকায়ত পালাগান সম্পর্কিত বর্তমান গবেষণা-কর্মটি নূতন পথের বার্তাবহ বলে বিবেচিত হয়। গবেষণা-সূত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দেবদেবী ও পালাগানের প্রবাহে আঞ্চলিকতা, সর্বজনীনতা, শাস্ত্রানুশাসন, লৌকিক ও আদিম ঐতিহ্যাদির আশ্চর্য সংশ্লেষ ঘটতে দেখা যায়। চব্বিশপরগণার লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক লোকায়ত পালাগানগুলির প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—

১) পাঁচালিপালার ধারা
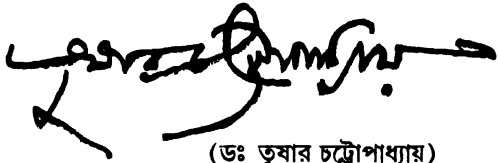
২) কেচ্ছাকাহিনীর ধারা

পাঁচালি পালার ধারাটি মূলত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক দেবদেবী অবলম্বনে রচিত ও পরিবেশিত হয় এবং কেচ্ছাকাহিনীর ধারা প্রধানত পীর-গাজী ও বিবি মাহাত্ম্যের ইসলামী ধারাকে অবলম্বন করে প্রচারিত হয়। সামগ্রিক ভাবে উভয় প্রকার পালাগানই পাঁচালগান নামে পরিচিত। জানা যায় বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু পাঁচালির ধারা এবং ইসলামী কেচ্ছার ধারা পরস্পর সম্মিলিত হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত জনসমাজ এই সব পালাগানে অংশগ্রহণ করেন এবং এই সব পালার রসাস্বাদন করেন। আসরের পরিস্থিতি

পালাগানে অংশগ্রহণ করেন এবং এই সব পালার রসাস্বাদন করেন। আসরের পরিস্থিতি অনুযায়ী পালা পরিবেশনার ক্ষেত্রে পালাগীত ও পালাভিনয়ে আখ্যানগত ও ভাব-রূপ-গত স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন সাধিত হয়, যা লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণজাত "প্রদর্শনানুসঙ্গ গত অনুশীলন তত্ত্ব"-এর (Performing-Contextual Theory) বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে।

সংশ্লিষ্ট গবেষক ডঃ দেবব্রত নস্করের ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্ম ও গবেষণা গ্রন্থের সূত্রে এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয় যে চব্বিশ পরগণার বহুল প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক আখ্যানমূলক গীতগুলি যেমন অভিজাত বা শিষ্ট সাহিত্যান্তর্গত গাথাকাব্য শ্রেণীর রচনা নয়, তেমন সেগুলি একান্ত পাশ্চাত্য অভিধা সমৃদ্ধ লৌকিক গীতিকা বা ব্যালাড নয়। আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের অভিধায় এগুলি অভিজাত ও লৌকিক ধারার মধ্যবর্তী লোকায়ত পালাগান হিসাবে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক — যার ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানগত মূল্য অনস্বীকার্য। লোকায়ত পালাগানসমূহ, মৌখিক-লিখিত রূপের বৈপরীত্য ও লিখিত-অলিখিত ধারার দ্বৈত-বিভাজন প্রথার ("Orality-Literacy Contrast" and "Verbal-Written Dichotomy") সমন্বিত লৌকিক প্রতিরূপ হিসাবেই বিবেচ্য। সামগ্রিক বিচারে মনে হয় চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগানগুলি বাংলা মঙ্গলকাব্য ও প্রচলিত আখ্যান কাব্যধারার পরিপূরক লোক-লোকায়ত ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক দেশজ সম্পদরূপে বিবেচিত হয়।

"চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা" গ্রন্থের লেখক ডঃ দেবব্রত নস্কর চব্বিশপরগণার আদি অধিবাসী পরিবারের সন্তান। বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের অধীনে জঙ্গল হাসিল করে মুষ্টিমেয় যে কটি পরিবার বর্তমান বেগমপুর মৌজায় বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের অন্তর্গত নস্কর পরিবারের সন্তান বর্তমান গবেষক। ডঃ নস্কর নিষ্ঠাবান ছাত্র ও পরিশ্রমী গবেষক। প্রধানত প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানকর্ম ও অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ-মূলক (Field work and Participant Observation) পদ্ধতির মাধ্যমে লেখক তথ্যাদি, পালাগান ও পালাভিনয়ের প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করেছেন এবং তত্ত্বমুখী অন্বেষায় বর্তমান গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ণ করেছেন। ডঃ দেবব্রত নস্করের শ্রমসাধ্য এবং তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা কর্মটি যথাযথ সমাদর লাভ করবে এই আমার একান্ত বিশ্বাস।

তারিখ ঃ মে ১৯৯৯

(ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়)
প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান - লোকসংস্কৃতি বিভাগ
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান - বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অংশকালীন অধ্যাপক-বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অতিথি অধ্যাপক - বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আম্বেদকর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৯৩)
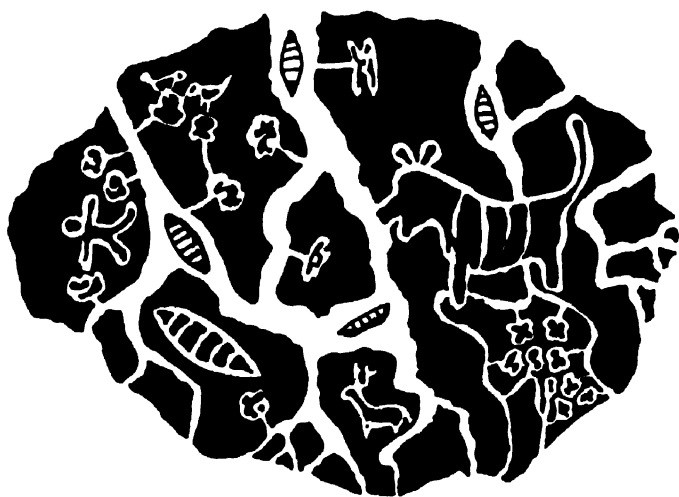
নিবেদন

সমগ্র বঙ্গভূমির সাংস্কৃতিক মানচিত্রে সুন্দরবন-চব্বিশপরগণা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। চব্বিশ পরগণা জেলার ইতিহাস ও ভূগোলের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে নানা প্রকার সংস্কৃতির ধারা। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লোকসংস্কৃতি গৌরবময় স্থান অধিকার করে এবং যার বিশিষ্ট সম্পদ লোকায়ত পালাগান। চব্বিশপরগণার ভূমিসন্তান হিসাবে এই অঞ্চলের তৃণমূলস্তরে বিস্তৃত জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পঠন পাঠনের সূত্রে এবং বিশেষ ভাবে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুশীলনের সূত্রে প্রধানত আমার গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক তুষার চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় আমি বর্তমান গবেষণা কর্মে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমার গবেষণার মূল বিষয় গড়ে উঠেছে চব্বিশ পরগণার "লোকায়ত পালাগান" কে অবলম্বন করে।

নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্ত সহ চব্বিশ পরগণার লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ। এখানকার বিস্তৃত অঞ্চলে লোক সমাজে ছড়িয়ে আছে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গাথা, গীতিকা, লোককথা, লৌকিক দেবদেবী প্রভৃতির বিচিত্র সম্ভার। এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি বিষয়ের কিছু কিছু সংকলন ও আলোচনা হলেও লোকপ্রচলিত পালাগানগুলির বিষয়ে বিশেষ সংগ্রহ বা আলোচনা ইতোপূর্বে হয় নি। এই পালাগানগুলি সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষ্যে লোকসমাজে পাঁচাল ও লোক নাট্যের ধারায় পরিবেশিত হয়। চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে যেমন কতিপয় একান্ত আঞ্চলিক দেবদেবীর অবস্থান দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় বৃহৎ বঙ্গে প্রচলিত কতিপয় দেব দেবীর অস্তিত্ব। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সব দেবদেবীর উৎস এবং বিবর্তন কাহিনী বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ এই সব লৌকিক দেব-দেবীকে অবলম্বন করে যেসব লোক-উৎসব ও পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় তার একটি প্রধান অঙ্গ প্রমোদমূলক পালাগান বা লোকায়ত পালাভিনয়ের অনুষ্ঠান।

বর্তমান গবেষণার মূল বিষয় আঞ্চলিক লোকঐতিহ্যজাত লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক দেবদেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগান যা বিশিষ্ট ভাবে লোক ঐতিহ্যনির্ভর লোক-সংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয়। বিশেষত চব্বিশ পরগণার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিকায় গড়ে ওঠা লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের ঐতিহ্যই বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য। আলোচনা সূত্রে অন্যান্য অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তুলনামূলক আলোচনাও করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য যেমন একদিকে ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্মের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে তেমন অন্য দিকে নির্ভর করতে হয়েছে বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শন, মুদ্রিত গ্রন্থ, পুঁথি, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি উপকরণের উপর।

অখণ্ড চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং চব্বিশপরগণার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র অনুসন্ধান কর্ম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলার প্রায় উপেক্ষিত লৌকিক দেবদেবী নির্ভর পালাগানের বিপুল নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে চব্বিশপরগণার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পরিচয় পাঠ, সংশ্লিষ্ট লোকায়ত পালাগানের অনুষ্ঠানাদির পর্যবেক্ষণ, পালা রচয়িতা ও পরিবেশক শিল্পীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ এবং বিভিন্ন ভাবে পালাগান সমূহ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে।

ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায়, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক বহু পালাগান আছে, অধুনা যার কিছু প্রচলিত, কিছু লুপ্ত। প্রচলিত পালাগানগুলির অধিকাংশই চব্বিশপরগণার গ্রামগঞ্জের লোক-শিল্পীদের দ্বারা গীত হয়ে থাকে। প্রতিভাবান লোক শিল্পীগণ লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে নতুন পালাগানও সৃষ্টি করেন। লোকবিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে তাঁদের এই সৃষ্টি। অপ্রচলিত পালাগানগুলি অনেকক্ষেত্রে গল্প কথায় পর্যবসিত হয়েছে। এর কিছু অংশ মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। হাতে লেখা পুঁথির মধ্যেও অনেক পালগান সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। চব্বিশ পরগণার এমন কিছু লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব আছে যা এই অঞ্চলের বিশেষত্বকে পরিস্ফুট করে এবং লৌকিক দেবদেবী নির্ভর পালাগানগুলি এই অঞ্চলের মানুষের আর্থ, সামাজিক ও ধর্মীয় দিকটি উদ্‌ঘাটন করে। শুধু তাই নয় চব্বিশ পরগণার ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক ধারা উক্ত পালাগানগুলিতে মূর্ত হয়ে ওঠে, যার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাহিত্যগত মূল্য অপরিসীম।

চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগানগুলি লোকপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে স্থানীয় কবিগণ রচনা করেন। কাহিনী, ছড়া, ছড়া জাতীয় সংলাপ, উক্তি-প্রত্যুক্তি, বক্তৃতা, বর্ণনা, নৃত্য, গীত, হাস্যকৌতুক প্রভৃতির মাধ্যমে পালাগানগুলি জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়। সাধারণত মৌখিক ভাবে পালাগানগুলি পরিবেশিত হয়। অবশ্য বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে পালাগানের লিখিত খাতা দেখা যায়। খাতা থাকলেও আসরে মূলত স্মৃতি নির্ভর মূল কাহিনীর কাঠামো অবলম্বনে ও উপস্থিতমত সংলাপ, গীত, নৃত্যাদি পরিবেশিত হয়। মূল গায়ক, বাদকগণ, দোহার প্রমুখ সকলের সক্রিয় প্রচেষ্টায় হারমোনিয়াম, করতাল, কাড়া-নাকাড়া, খোল, ঝাঁঝর প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে সমষ্টিগত ভাবে পালা আসরে গীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দর্শকের মধ্য থেকেও ব্যক্তি বিশেষকে আসরে তুলে বিশিষ্ট চরিত্রে স্থাপন করে তাকে ঘিরে মূল গায়ক ও তাঁর সহযোগিগণ পালা পরিবেশন করেন। পালগানগুলি বিষয়বস্তু ও আসর অনুসারে সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘায়িত করা হয়। জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই এইসব পালাগানের পরিবেশনে অথবা দর্শক শ্রোতা হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। মোটের উপর কাহিনী ও সংলাপ, সংগীত, বাদ্য, নৃত্য, উপস্থাপনরীতি সামাজিক-সম্প্রীতি প্রভৃতি সমুদয় দিক থেকে লোকায়ত পালাগানগুলি বিশেষ সমৃদ্ধ।

চব্বিশপরগণার লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করে যে সুসমৃদ্ধ লোকায়ত পালাগানের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার সামগ্রিক পরিচয় প্রদানই বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্যাপক ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থে এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগানগুলিকে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ —

১) দেবীপালা
২) দেবপালা
৩) বিবিপালা
৪) পীর ও গাজীপালা

এই প্রধান ভাগগুলিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন পালা আলোচনারক্ষেত্রে বস্তুগত প্রয়োজন অনুসারে বিবিধ প্রকার উপবিভাগ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পালাগানের লোকায়তরূপ নির্ধারণ এবং তার বিশিষ্ট ভাগ ও উপবিভাগ বিন্যাস- পরিকল্পনা পরিচালক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মৌলিক চিন্তানুসারে সম্পাদনা করা হয়েছে, যা বর্তমান গবেষণাকর্মের পূর্বে (১৯৯০) কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

উপরে বর্ণিত বিভাগ অনুসারে বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর এবং পীর, গাজী, বিবিমা প্রমুখের উৎসগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ, পূজাচার সংশ্লিষ্ট লৌকিক বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে এবং আলোচনা সূত্রে বিভিন্ন অধ্যায়ে পালাগানগুলির পূর্ণাঙ্গ, আংশিক বা গদ্যরূপ প্রদত্ত হয়েছে। ক্ষেত্রগবেষণা লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পালাকার, গায়েন, বায়েন প্রমুখের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রদান করা হয়েছে লোকায়ত পালাগানের প্রথা, প্রয়োজনীয় তথ্যচিত্র, মানচিত্র, তথ্যদাতা ও সহৃদয় সহায়কবৃন্দের তালিকা।

বর্তমান গবেষণা সূত্রে সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণকরি আমার গবেষণা পরিচালক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ও ছাত্রদরদী ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় আমাকে কেবল লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞাননিষ্ঠ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করেননি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রগবেষণা কর্মেও অনেক ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অকুণ্ঠ প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। আমার গবেষণা কর্মের পূর্বাপর সহায়ক শক্তি হিসাবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন আমার অগ্রজ শ্রী ফাল্গুনীকুমার নস্কর এবং আমার সহধর্মিণী প্রতিমা নস্কর। চব্বিশপরগণার লোকায়ত সমাজের পালাগায়ক, পালাকার, ও সহৃদয় সহায়ক বৃন্দের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি। সকলের প্রতি নিবেদন করি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, প্রীতি ও নমস্কার।

অবশেষে স্বীকার করি বর্তমান গবেষণা কর্মের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কথা। প্রথমত অত্যন্ত সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ সম্পূর্ণ এড়াতে পারিনি। দ্বিতীয়ত ক্ষেত্রগবেষণায় যে সমস্ত পালাগান সংগৃহীত হয়েছে তা গ্রন্থের অস্বাভাবিক কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করা গেল না। তৃতীয়ত চব্বিশ পরগণার গ্রামে-গঞ্জে ও লোকাচারে

অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁদের অনেককে নিয়ে পালাগান গীত হয়। যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে পালাগান গড়ে উঠেছে প্রধানত তাঁদের প্রসঙ্গ ও পালাগান এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছ, ক্ষেত্রগবেষণা কালে যে সকল দেবদেবীর পালাগান দৃষ্ট হয়নি তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচনা সূত্রে উল্লেখ থাকলেও কোন পালাগানের আলোচনা করা হয়নি। সবিনয়ে জানাই পাঠক এইসব বিষয়ে উপযুক্ত তথ্যাদি সহ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা সাদরে গৃহীত হবে ও কৃতজ্ঞতা সহ পরবর্তী সংস্করণে সংযোজন করা হবে। সুধী পাঠকের নিকট গ্রন্থটি আদৃত হলে নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মে ১৯৯৯

গ্রাম ও ডাক - বেগমপুর
ভায়া - পিয়ালী টাউন
জেলা - দঃ চব্বিশ পরগণা
পিন-৭৪৩৩৮৭
পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ।

ডঃ দেবব্রত নস্কর

এই গবেষণা সম্পর্কে দু-একটি কথা

আমার জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা (অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগণা), মাতুলালয়ও এই জেলায় অবস্থিত। সুতরাং এই জেলা সংক্রান্ত কিছু হাতে এলেই মন আপনা আপনি খুশি হয়ে ওঠে। তাই ডঃ দেবব্রত নস্করের গবেষণাগ্রন্থ ("চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা") আমার বিশেষ কৌতূহল আকর্ষণ করেছে। পাঁচ-ছ বছর কেটেছে বাগুড়-হাওড়ের দেশে, কোথায় বেলেঘাট, কোথায় হাবড়ে ঘাট—সে বয়সে ছিল নখদর্পণে। জল-জঙ্গল, গাছ-গাছালি, সাপখোপ, ক্বচিৎ চিতাবাঘের বাচ্চা, বা গোবাঘা—এই সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার শৈশবকে বিস্ময়রসে আবিষ্ট করেছিল। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, প্লীহায় স্ফীতোদর, শীর্ণদেহ এই ছিল আমার শৈশব-কান্তি। তারই মধ্যে যখন দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা আসত, চলে যেত, শীতের শেষে এবং গ্রীষ্মের মধ্যে যখন বসন্ত আসত, আমের গুটি বাঁধত, ঝড়ের পর আম কুড়োবার ধুম, তারপর চারদিক ঝমঝমিয়ে বর্ষা নামত, তার সঙ্গে আসত ম্যালেরিয়া জ্বর। কখন ধর্মপূজা, মনসার ভাসান, যুগলকিশোর উৎসব (রাসে রাধাকৃষ্ণলীলা), শিবের গাজন আসত এবং শেষ হত, বনবিবিতলায় ফলারের আয়োজন, দক্ষিণরায় তলায় বাঘমামার আদর-আপ্যায়ণ পঞ্চানন তলায় শিবের অনুচর পঞ্চানন্দের পূজার্চনা, বড়পীরখাঁ গাজীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রথমে অভিধান বহির্ভূত কুৎসিত গালাগালি, তারপর দুই বীরের মধ্যে লড়াই—দুই পক্ষেই হিন্দু ও মুসলমান ব্যাঘ্রবাহিনী নখদন্ত শানিয়ে প্রস্তুত, সৃষ্টি যায় যায়, তখন পীরখাঁ গাজীর ভগিনী বনবিবির মধ্যস্থতায় দুজনের মধ্যে সন্ধিস্থাপনা এ পাঁচালীগান কতবার শুনেছি। নানা ধরণের লৌকিক ব্যালাড, কোথাও বা পৌরাণিক গল্পকথা আখ্যানের আকারে গ্রামীন সমাজে পরিবেশিত হত। তারপর দিন বদলে গেল। গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগ ঘটল, কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ এল, মাল-মোটর ও যাত্রীবাহী বাস ধূলো উড়িয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে চলল। কোথায় গেল সে সমস্ত উপকথা, গালগল্প, কাহিনী কিস্‌সা? হারানো শৈশবের সঙ্গে সোনার খাঁচার বন্দী দিনগুলো কোথায় গেল কে জানে।

ডঃ দেবব্রত নস্করের সংগৃহীত পালাগান সম্পর্কে লেখা এই গবেষণাগ্রন্থ একটি দুরূহ পরিশ্রমসাধ্য ক্ষেত্রানুসন্ধান। তাঁকে অনেক চেষ্টা করে চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত গ্রামীন ব্যালাড সংগ্রহ করতে হয়েছে, বর্গীকরণ করতে হয়েছে, তার পশ্চাদপটে আর্থ সামাজিক তথ্যও খুঁজে বার করতে হয়েছে। এই ব্যালাড বা গাথা-গীতিকা লোকায়ত জীবনপ্রত্যয় থেকে উত্থিত হয়েছে, এ সব কাহিনীর প্রায় কোনটারই লেখক পরিচিতি পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন গোটা সমাজই এর রচনাকার। তাই প্রায়ই কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন ব্যালাড উচ্চ কোটির শিল্পেরও রূপ ধারণ করতে পারে, কোথাও বা কৃত্রিম নগরজীবনেও চলতি জীবনকে নিয়ে গল্প-আখ্যান নাগরিক ব্যালাডের গঠন সম্ভব হতে পারে। জেলেপাড়ার সঙ, হাওড়া শহরের সঙবাহার তারও পিছনে আখ্যানধর্মিতা থাকতে পারে। এ কালের সমাজের জানা ঘটনা (রাজনৈতিক বা সামাজিক) ব্যালাডের আকার লাভ করতে পারে যদিও তাকে যথার্থ ব্যালাড বলা যাবে না।

ব্যালাড (Ballad) শব্দটির মূল হচ্ছে ল্যাটিন ভাষার (Ballare) অর্থাৎ নৃত্য। প্রথম যুগে গানে ও ছন্দে কোনো কাহিনী বা গল্প বিবৃত হত। যেমন স্কটিশ ব্যালাড, গোলিফ ব্যালাড, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ব্যালাড। যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রেম ও রোমান্স, ইতিহাসের ছিটেফোঁটা বা একেবারেই বানানো গল্প দলবদ্ধভাবে গাওয়া হত, সঙ্গে নৃত্যও চলত। কাব্যসৃষ্টির পূর্বে এই ব্যালাড-ই ছিল

কাব্য-কবিতার পূর্বসূত্র। আমাদের দেশেও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য একদা সীমাবদ্ধক্ষেত্রে ব্যালাডের আকারেই প্রচলিত ছিল। য়ুরোপেও বীররসাত্মক মহাকাব্যের পিছনে নানা ব্যালাডের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে। এখনও স্কটল্যান্ড, ওয়েলস্, আয়ারল্যান্ড এবং উত্তরের স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় গ্রাম্য ব্যালাডের অস্তিত্ব আছে। গল্প আখ্যানের রস মানবসভ্যতার গোড়া থেকেই মানুষের মনকে আকর্ষণ ও আবিষ্ট করেছিল। পরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সাহিত্যের নানা রূপরীতির অদলবদল হলেও ব্যালাড কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যায়নি, পাশ্চাত্য এবং আমাদের দেশে ব্যালাড নানা আকারে এখনও প্রচলিত আছে। আমাদের মঙ্গলকাব্য প্রধানতঃ ব্যালাডের আধারেই পরিকল্পিত। এখনও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামান্তরে ব্যালাডের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যযুগের নাথগীতিকা (ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, গোর্খ-বিজয়) ব্যালাডের মধ্যেই পড়ে। এই সময়ে আরও নানা ধরণের ব্যালাড গ্রামে প্রচলিত ছিল, অক্ষয় কুমার মৈত্রের সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্রে' কিছু কিছু ব্যালাড উদ্ধৃত হয়েছে। পরে চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ভিক্ষেপজীবী ও কৃষকদের কাছ থেকে অনেক ব্যালাড সংগ্রহ করেন। চন্দ্রকুমারের কাছে তার সন্ধান পেয়ে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সেগুলিকে আধুনিক পাঠকের দরবারে পেশ করেন। তবে ভাষায় কিছু পরিমার্জনা ঘটেছে, আর তা ছাড়া ব্যালাড সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক রীতি তখনও এদেশে উদ্ভব হয়নি। ফলে এই গাথা ও গীতিকা কতটা বিশুদ্ধ, কতটা বা কলকাতার পাঠকদের দিকে দৃষ্টি রেখে এর রূপান্তর ঘটানো হয়েছে তাতে কিছু সন্দেহ আছে। সে যাই হোক, এখনও দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গ্রামে নানা ধরণের গাথা-গীতিকার প্রচার আছে। পৌরাণিক স্মৃতিবহ কিছু কিছু পালায় উত্তর ভারতীয় সংস্কারের কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালির প্রাগার্য কৌম সংস্কার, কোনটিতে হিন্দুর আচার আচরণ, কোনোটিতে বা মুসলমান সমাজের প্রভাব আছে। লৌকিক, অ-লৌকিক, পৌরাণিক, ছদ্ম-পৌরাণিক (Pseudo Puranic) , ইসলাম ধর্মানুমোদিত পীর-ফকির-গাজী, মুরিদ-মুর্শিদের গল্প-আখ্যান এই গবেষণার মূল ভিত্তি। আবার অনুমান, বাঙালি সংস্কৃতির যে মার্জিত রূপ আমাদের চেতনায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে, তারও গভীরে নিহিত আছে বাঙালির নিজস্ব কুসংস্কার কিরাত নিষাদ, কোল্ল, ভীল্ল জাতি উপজাতির বিলীয়মান পরিচয়। সমুদ্রে ভাসমান হিমশিলার (iceberg) তিন চতুর্থাংশ থাকে জলের অতলে অদৃশ্যরূপে, দৃষ্টিগোচর হয় শুধু সিকি ভাগ, যা জলের উপরে জেগে থাকে। আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারার সিকিভাগ মার্জিত সাহিত্য ও শিল্পে ধরা পড়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ রয়ে গেছে চেতনার গভীরে, যার কথা নাগরিক বাঙালি ভুলে গেছে। তার কিছু ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্যকরা যাবে ছড়া-পাঁচালী, গল্প কাহিনী, পুরাতন আখ্যান বা ব্যালাডে — ডঃ নস্কর অত্যন্ত পরিশ্রম করে নানা স্থান থেকে সেগুলি সংগ্রহ করেছেন। আমার ছাত্র ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের রত্নাকর, তিনি এই গবেষণা কর্মটির নির্দেশক, সুতরাং এটিযে বিজ্ঞান ভিত্তিক হবে তাতে আর সন্দেহ কী। আমি বিশ্বাস করি, এই গবেষণায় বাঙালির হারানো ইতিহাস ধরা পড়বে। মৃত্তিকার গভীরে থাকে গ্রানাইট শিলা, যার ওপর গড়ে ওঠে ভব্য সংস্কৃতির ইমারত। আমরা তাজমহল দেখে চমৎকৃত হই, কিন্তু তার পাথরের খবর কে রাখে? অস্তিত্বের শিকড় সন্ধান আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সেই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি এই গবেষক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অবধারণ করেছেন। এর পর তিনি যদি সন্ধানের সীমা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে অন্য জেলাতেও গবেষণা চালনা করেন, তা হলে বাঙালি ঐতিহ্যের লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভরতগড় অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি। আঃ মাঃ ১৩০০-১৪০০ শতক।

এটি একটি যৌগিক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া (মৈথুন প্রাগ)। দক্ষিণবঙ্গে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যখন অবক্ষয় শুরু হয়, ঠিক সেই সময় নাথ যোগীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা শৈব যোগী। মৈথুন মুদ্রার মধ্য দিয়ে উর্ধ্বরেত হয়ে মহানির্বান লাভ করতে চেয়েছিলেন। অষ্টসিদ্ধ আসনের উপর মৈথুনরত যুগ্ম অশ্ব, অথচ একটি মুখ। এটি নারী পুরুষের অভিন্নরূপের পরিচায়ক। অশ্বমুখ যেন কোন মৈথুন দণ্ডকে লেহন করছে। মৈথুন পাত্র থেকে ফোঁটা কেটে পড়ছে সাধনার ফসল। হটযোগীরা কাম-কলাকে সাধনার অঙ্গ হিসাবে নিয়েছিলেন।

(কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিওলজি বিভাগ, সাক্ষাতকার সূত্র)

শক্তি

(বেলেপাথরের

মহিষ মর্দিনী দুর্গা)

ধপধপি

(দঃ ২৪ পরগণা)

অনন্তদেব
(জৈন তীর্থঙ্করের
প্রস্তর মূর্তি)
করঞ্জলি, দঃ ২৪ পরগণা

আড়ি লক্ষ্মী

নারায়ণী (দারুমূর্তি)
খাড়ি, দঃ ২৪ পরগণা

নারায়ণী (দারুমূর্তি)
নারানপুর, দঃ ২৪ পরগণা

বনবিবি

বড়খাঁগাজী (দারুমূর্তি)

দক্ষিণরায়
ধপধপি, দঃ ২৪ পরগণা

মনসা

চণ্ডী

শীতলা

মহাদেব
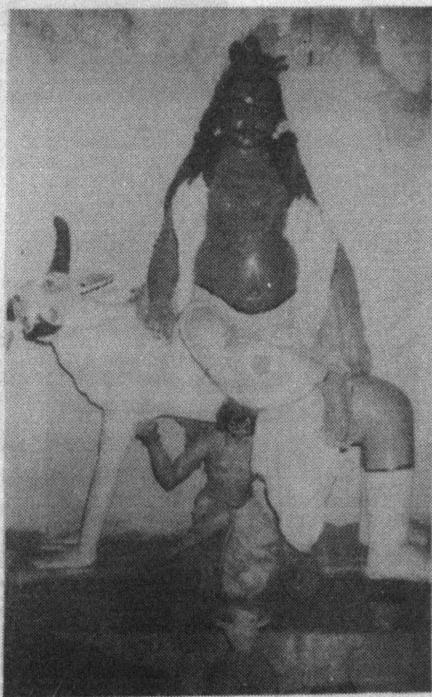
গোভূতে আসীন পঞ্চানন্দ
নিচে-পেঁচো-খেঁচো

ব্যাঘ্রবাহন (পঞ্চানন্দ)

ধর্মঠাকুর
দঃ বারাশত

বড়ঠাকুর (শনি)

নন্দিকেশ্বর (বাবাঠাকুর)
চিত্রশালী, দঃ ২৪ পরগণা
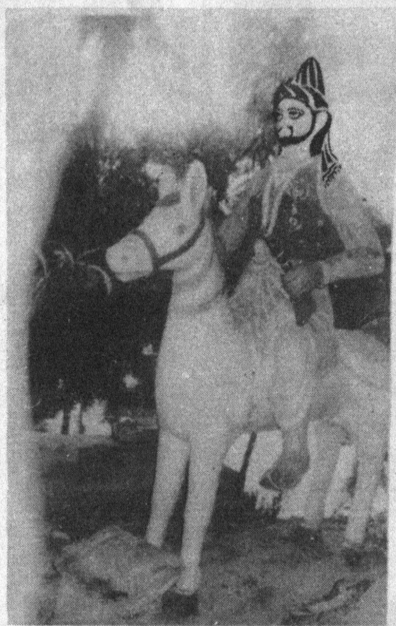
বড়পীর সাহেব
শান্তিপুর, দঃ ২৪ পরগণা
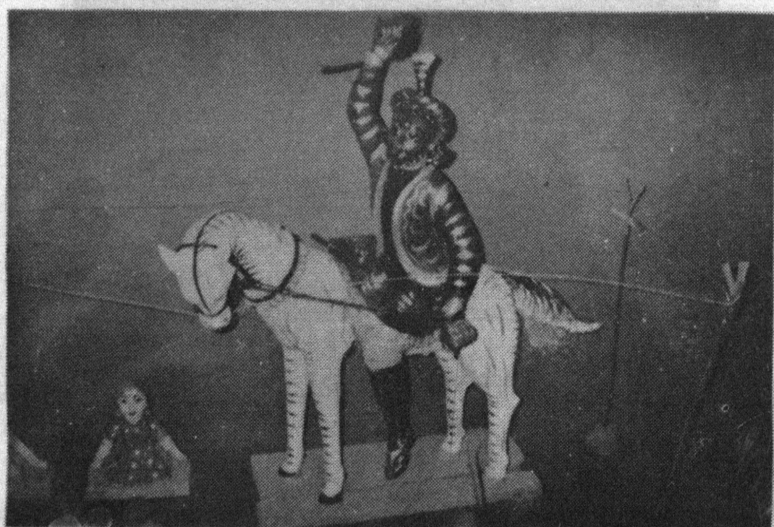
সত্যপীর
পাথর প্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা
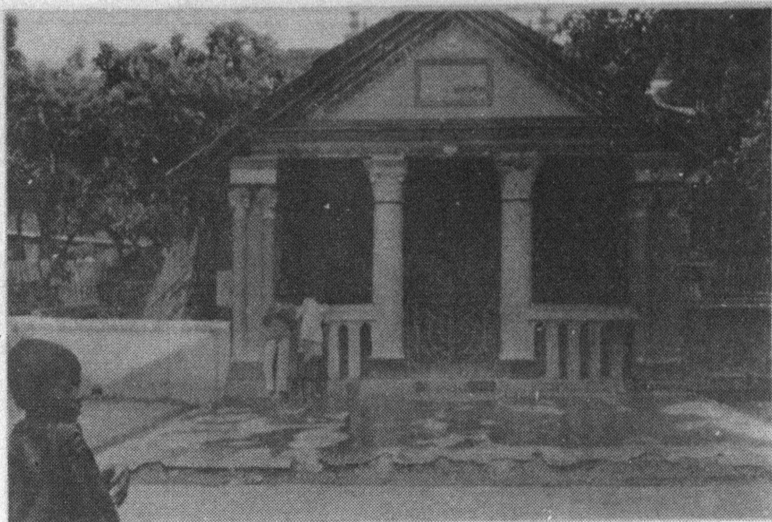
গোরাচাঁদপীরে দরগা
হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগণা
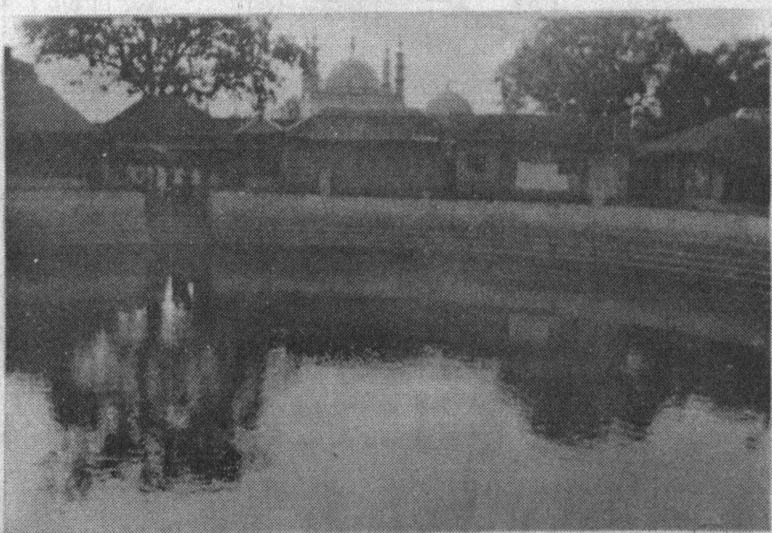
মোবারক গাজীর মক্কা-পুকুর ও দরগা
ঘুটিয়ারীশরীফ, দঃ ২৪ পরগণা
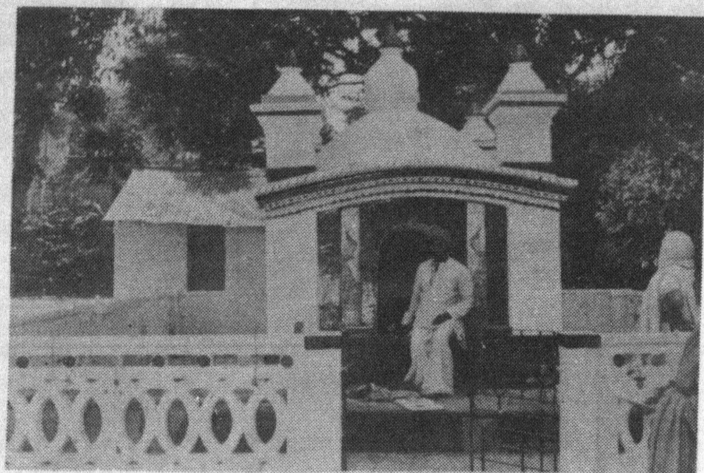
রক্তানগাজীর থান
এড়াচি, দঃ পরগণা
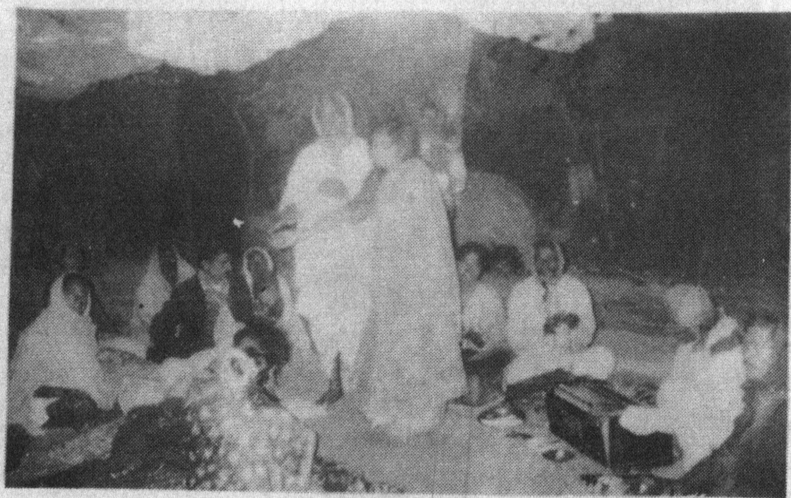
মনসাপালার একটি দৃশ্য
ছন্দানস্কর, বাসুদেব মণ্ডল ও সম্প্রদায়

উত্তর চব্বিশ পরগণা
নদীয়া
বাগদহ
বনগাঁ
গাইঘাটা
বীজপুর
নেহাটি
জগদ্দল
নোয়াপাড়া
ব্যারাকপুর
টিটাগড়
খড়দহ
বেলঘরিয়া
দমদম
বরাহনগর
রাজারহাট
আমডাঙ্গা
বারাসাত
হাবড়া
স্বরূপনগর
বাদুড়িয়া
রাজ্য সড়ক
জাতীয় সড়ক
বসিরহাট
হাড়োয়া
হাসনাবাদ
মিনাখাঁ
হিঙ্গলগঞ্জ
সন্দেশখালি
দক্ষিণ
চব্বিশ
পরগণা
হুগলী
বাংলাদেশ
২৫
০
২৫
কি·মি·

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
২৫ ০ ২৫
কি.মি
৮৮°পূঃ দ্রাঃ
৮৯°পূঃ দ্রাঃ
হু গ লি
উত্তর
চব্বিশ
পরগণা
হা ও ড়া
মেদিনীপুর
গার্ডেনরীচ
মেটিয়াবুরুজ
আলিপুর
যাদবপুর
বজবজ
সোনারপুর
চম্পাহাটি
ফলতা
বারুইপুর
মগরাহাট
ক্যানিং
হেড়োভাঙ্গা
ডায়মন্ডহারবার
মন্দিরবাজার
বাসন্তী
গোসাবা
মেদিনীপুর
মথুরাপুর
কুলতলী
কুলপী
করঞ্জলি
কাকদ্বীপ
সাগর
পাথরপ্রতিমা
নামখানা
মাতলা নদী
ঠাকুরাণ নদী
ডালহৌসী দ্বীপ
ভাঙাদুনী দ্বীপ
বুলচেরী দ্বীপ
ব ঙ্গো প সা গ র

প্রথম অধ্যায়

চব্বিশ পরগণার ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

চব্বিশ পরগণা জেলাটি নিম্নবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত। ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে এই জেলাটি ৮৮° পূর্ব থেকে ৮৯° পূর্বদ্রাঘিমা এবং ২১° ৩০' থেকে ২৩° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। প্রশাসনিক কারণে জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় ১৯৮০ সালের ৩০শে জুন এই জেলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু কার্যকরী করা হয় ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ। বর্তমানে জেলাটি উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এই দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর চব্বিশ পরগণা অপেক্ষা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা আয়তনে বড়। অখণ্ড জেলাটির দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলী নদী, উত্তরে নদীয়া জেলা ও পূর্বে বাংলাদেশের খুলনা জেলা। চব্বিশ পরগণাকে একসময় ভাটির দেশ বলা হত। কারণ নদীর ভাটা বয়ে যেত দক্ষিণে। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে গঙ্গার পূর্বপাড় থেকে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড সমতট নামে পরিচিত ছিল। সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘের কথা মনে রেখে এই ভূখণ্ডের এক বিশেষ অঞ্চল ব্যাঘ্রতটী বলেও পরিচিত ছিল।[১]

জেলা চব্বিশ পরগণার জন্ম ১৭৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর। মীরজাফর ইংরেজ অনুগ্রহে বাংলার মসনদে বসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণা 'চব্বিশ পরগণার জমিদার' নামে যৌতুক হিসাবে দিয়েছিলেন। এই চব্বিশটি পরগণার নাম হল —

(১) আমিরপুর, (২) আকবরপুর, (৩) আজিমাবাদ, (৪) বালিয়া, (৫) বারিদহাটি, (৬) বাসনধাওর, (৭) কলকাতা, (৮) দক্ষিণ সাগর, (৯) গড়, (১০) হাতিয়াগড়, (১১) ইখতিয়ারপুর, (১২) খাড়িজুড়ি, (১৩) খাসপুর, (১৪) ময়দানমল, (১৫) মাগুরা, (১৬) মানজুড়ি, (১৭) ময়দা, (১৮) মুড়াগাছা, (১৯) পাইকান, (২০) পেচাকুলি, (২১) সাতাল, (২২) সাহানগর, (২৩) সাহাপুর, (২৪) উত্তর পরগণা। চব্বিশটি পরগণার ভূখণ্ডের আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল। এই বিশাল ভূখণ্ডের জমিদারী প্রাপ্তির জন্য

কোম্পানিকে ১২০০ (বারশত) টাকা খাজনা দিতে হতো। পরবর্তীকালে কোম্পানির এই জমিদারী 'চব্বিশ পরগণা' নামে পরিচিত হয়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে কলিকাতাকে বাদ দেওয়া হয়।[২]

বর্তমানে বাংলার যে অংশকে চব্বিশ পরগণা বলা হয় মীরজাফর প্রদত্ত চব্বিশ পরগণার সীমারেখা থেকে তা ভিন্ন। ১৭৮৩-তে যখন জরিপ হয় দেখা যায় জেলার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি বর্ধমান, নদীয়া ও যশোহর রাজাদের মালিকানায় ছিল। ১৮১৪ সালে জেলাকে কলকাতা ও শহরতলী এলাকা এবং জেলার অবশিষ্টাংশ নিয়ে দুইটি পৃথক জেলায় ভাগ করা হয়। ১৮৩২-এ এই ঘোষণা আবার বাতিল করে এক জেলা করা হয়। এরপর বেশ কিছুকাল আলিপুর বিভাগ ও বারাসাত বিভাগ এই দুই ভাগে চব্বিশ পরগণা বিভক্ত ছিল। ১৮৬১ সালে এই যৌথ বিভাগ বাতিল করে সমগ্র জেলাটিকে ৮টি মহকুমায় ভাগ করা হয়। যথা—ডায়মন্ডহারবার, বারুইপুর, আলিপুর, দমদম, ব্যারাকপুর, বারাসাত, বসিরহাট ও সাতক্ষীবা মহকুমা। ১৮৮২-তে খুলনা জেলা গঠনকালে সাতক্ষীরা মহকুমাকে বিচ্ছিন্ন করে নবগঠিত খুলনা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৮৩ সালে বারুইপুর মহকুমাবে বাতিল করা হয়। ১৯০৪ সালে দমদম ও ব্যারাকপুরকে পুনর্গঠিত করে ব্যারাকপুর মহকুমা নতুন করে তৈরি হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৮৪ সালে বনগাঁ ও গাইঘাটা এই দুটি থানা নিয়ে বনগাঁ মহকুমা সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সালে আলিপুর মহকুমাকে বিভক্ত করে বারুইপুর মহকুমার উদ্বোধন করা হয়। অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার মোট ৭টি মহকুমা। বর্তমানে বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ ও বসিরহাট নিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং আলিপুর, ডায়মন্ডহারবার ও বারুইপুর নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা গঠিত হয়েছে।

চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১৬৩০ বর্গমাইল। স্থলভাগের বেশির ভাগ দ্বীপের মত। দ্বীপগুলির মাঝখান নিচু ও জলাভূমি। সমগ্র এলাকার ৩০০ বর্গমাইল অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ নদীনালা সমাকীর্ণ। সমুদ্রোপকূলের প্রধান নদীগুলি মুড়িগঙ্গা, রায়মঙ্গল, ঠাকুরান বা জামিরা, বারাতলা, হরিণভাঙা, হাড়িয়াভাঙা, সপ্তমুখী, গোসাবা, মাতলা, বিদ্যা, হাড়োয়াগাং, কুলটি গাং, কলাগাছিয়া প্রবাহিত। সুন্দরবনের বেশির ভাগ নদীর সঙ্গে গঙ্গার কোন যোগ নেই।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে এ অঞ্চলের ভূখণ্ড খুবই প্রাচীন। ভূতত্ত্ববিদ ওল্ডহাম সাহেব তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছেন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল সুদূর অতীতে ছোট ছোট প্রস্তরের পাহাড় ছিল। যা পূর্বোক্তরূপ ভূমি নিমজ্জনে বসে গেছে এবং তার উপর পলি পড়ে বর্তমান ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশসহ বিস্তীর্ণ এলাকা নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ভূপৃষ্ঠের নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছে। বিগত ৫-৬শ বৎসরের মধ্যেই এই অঞ্চলে নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন ১৫৮৬ সালে আকবরের রাজত্বকালে ব্যাপক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এই অঞ্চল নিমজ্জিত হয়েছিল। ক্রমাগত ৫-৬ ঘণ্টা বজ্রপাতসহ ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছিল। ১৬৮৮ সালে এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে যায়। ১৭০৭ সালে প্রবল সাইক্লোন হয়েছিল।

১৭৩৭ সালে মারাত্মক ভূমিকম্পে ও ঝড়ে নিম্ন গাঙ্গেয় সুন্দরবনের মাটি বসে যায়। বড় বড় অট্টালিকা ও বৃক্ষ মাটির নিচে বসে যায়। ১৮৬২ সালে ভয়ঙ্কর ঝড় এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ১৮৬৪ সালে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তাতে কলকাতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৮৬৭ সালে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ও জলস্ফীতিতে নদীতীরের জমি প্রায় নয় ফুট জলের নিচে চলে যায়। এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার উপর বারে বারে প্রাকৃতিক আঘাত জনজীবনকে পর্যুদস্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই সত্য ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তা হল—

"Floods occurred in 1823, 1838, 1856, 1864, 1868 and 1871 on such a scale as to seriously effect the crops of the district, but not such as to cause a general destruction of them ...... (page-132) ......

The severest earthquake within the memory of the present generation occurred on 24th June 1897, when many building were damaged and other brought down. In Calcutta the steeple of the cathedral was destroyed and 1300 houses were injured. Another earthquake was experienced on 24th July 1885, and there were several earth tremors less seniority in previous years of the eighteenth century."৩

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে এই অঞ্চলের ভূখণ্ড প্রাকৃতিক কারণে নানা সময়ে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং আরও অনুমান করা যায় যে সুদূর অতীতে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার বারবার উত্থান-পতন ঘটেছে। সুতরাং ব-দ্বীপ অঞ্চল আপাতদৃষ্টিতে নতুন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এই তথ্যের সত্যতা মেলে ভূতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, নৃতাত্ত্বিক, লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে।

চব্বিশ পরগণার সুপ্রাচীন অস্তিত্বের পরিচয় পাঠের সঙ্গে বর্তমান কালের পরিচয় পাঠও বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাসের প্রবাহে চব্বিশ পরগণার আয়তন ও জনবসতির ক্ষেত্রে ঘটেছে নানাবিধ রূপান্তর। দেশবিভাগ-পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে পূর্ববঙ্গের বহু মানুষ বসবাস করছেন। ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী জেলা চব্বিশ পরগণার আয়তন ১৪০৫৩.৭৩ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১,২৯,৯৬,৯১১। এই জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়গত যে বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ—

হিন্দু	৯৪৪৫৭১০	তপশিলী জাতি	৩৫৩৩৫০৩
মুসলমান	৩৪৭১১৩৬	তপশিলী উপজাতি	২৪০৩৩০
বৌদ্ধ	৪৭২৩	অন্যান্য	৫০৪

খ্রীস্টান	৬৩৫৮৬	অনির্দিষ্ট	২০৫১
শিখ	৮১৭০	কৃষক	৭৬৫০১৯
জৈন	১০৩১	কৃষক মজুর	৭৯৭৬৭৩

শিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ৬৬৭৯৪৩০।[৪]

ভূতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান গবেষণাদির মাধ্যমে এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানারূপ ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে। ভগ্নমন্দির, প্রস্তর, ধাতব ও মৃণ্ময় মূর্তি, তাম্রপট্ট লিপি, লোকধর্ম ও উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, এই অঞ্চলটি সুপ্রাচীন কাল থেকে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। লোকসংস্কৃতির গবেষক বিনয় ঘোষ মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের এই ভৌগোলিক বিভাগের ইতিহাস অতীতের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। হিন্দু যুগ তো বটেই, তারও আগে অন্তত মৌর্যযুগ পর্যন্ত। উত্তরে বেড়াচাঁপা, চন্দ্রকেতু গড়, দক্ষিণে জটার দেউল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে-সমস্ত প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে হিন্দু যুগের সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশকে সূচিত করে। তার উপর দিয়ে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির ধারা প্রবাহের চিহ্ন স্বরূপ বহু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি এবং এই সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে। মুসলমান যুগের ঐতিহাসিক সম্পদ চব্বিশ পরগণায় যথেষ্ট পরিমাণে আছে।[৫] From the bottom up-পদ্ধতির মাধ্যমে চব্বিশ পরগণার লোকসংস্কৃতির চর্চা করলে এই অঞ্চলের মানুষের ভৌগোলিক অবস্থানগত সাংস্কৃতিক ইতিহাসটিও আবিষ্কৃত হবে, প্রমাণিত হবে আর্যেতর জাতির ঐতিহ্যময় সভ্যতার সাথে বেড়াচাঁপা, আটঘরা, ভরতগড়, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানের মূক ঐতিহ্যের ইতিহাস এবং দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গারিডি জাতির প্রকৃত পরিচয়, যাদের ভয়ে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার বিপাশা নদী অতিক্রম করতে সাহস পাননি। ইতিহাসে বর্ণিত গঙ্গারিডি জাতি ও গঙ্গারিডি রাজ্য বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ছিল বলে উল্লিখিত হয়। চব্বিশ পরগণার ভূখণ্ড ও এই অঞ্চলের জনজাতি প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীতের ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠী বলে ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও লোকবিজ্ঞানের গবেষকগণ মনে করেন।[৬]

"চব্বিশ পরগণা জেলাটি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই অঞ্চলে হিন্দু-বৌদ্ধ, শৈবতান্ত্রিক, ইসলাম-বৈষ্ণব, খ্রীস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থান ঘটেছে। এই জেলার জনজাতি ও সংস্কৃতির প্রবাহে খুঁজে পাওয়া যায় মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত সুবিপুল তথ্য, যার মূল্যবান পরিচয় বহন করে চলেছে এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী এবং তাঁদের নিয়ে রচিত পালাগানসমূহ। বৈদিক-অবৈদিক, আর্য-অনার্য, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রভৃতি ভিন্নমুখী সাংস্কৃতিকধারার মিশ্রণে চব্বিশ পরগণা জেলাটি এক বৈচিত্র্যময় রূপ নিয়েছে। এই বৈচিত্র্যময় রূপের বিশেষ ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক দেবদেবীর প্রথাগত ধারা। আদিম কাল থেকে হিন্দু-

বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান সংস্কৃতির নানাবিধ পরিচয় চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে প্রচলিত লৌকিক ধর্ম উৎসব ও তৎসংশ্লিষ্ট পালাগানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায়।"[৭] উপরে বর্ণিত চব্বিশ পরগণার ইতিহাস ও ভূগোলের পটভূমিকায় বিভিন্ন সময় নানা প্রকার লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা প্রকার লোকায়ত পালাগানের সুবিপুল ঐতিহ্য যা বাংলা লোকসংস্কৃতির ও লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদরূপে বিবেচিত হয়।

[illegible]

১। কমল চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত।

কমল চৌধুরী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত।

২। ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য, ২৪পরগণা জন্ম ও রূপরেখা, ২৪পরগণা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলন, বারুইপুর, ১৯৮৩।

৩। By L. S. S. O'MALLEY, Bengal District Gazetteers, 24 Parganas 1914, Page - 138.

৪। Dr. M. Vijayanunni, Census of India 1991, Series-1 Part-IV-B II Religion table C-9.

৫। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

৬। L. S. S. O'Malley, দীনেশ চন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র মিত্র, কালিদাস দত্ত, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বিনয় ঘোষ, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, প্রসিত রায়চৌধুরী, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র দত্ত, নরোত্তম হালদার, দিলীপকুমার মৈতে।

৭। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণরায়, পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, পৃঃ- ৫৩৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য ও পালাগান

জাতির ইতিহাস গড়ে ওঠে দেশ-কাল-পাত্রকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের ইতিহাসও এরই অঙ্গীভূত। ইতিহাসের গতি নদীর ন্যায় পরিবর্তনশীল। সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাও এরই অনুগামী। সহস্র বর্ষব্যাপী বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে নানারূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর বিষয় বৈচিত্র্য ক্রম-সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষা-ভাষী জনজাতির জীবনধারা ও মানস বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য বয়ে চলেছে। বাংলা সাহিত্যের ভাষার বয়স অন্যূন হাজার বছর। ভাষাগত পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে বাংলা ভাষাকে যদি আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়, তাহলে নিঃসংশয়ে বাংলা লেখ্য ভাষার আদি রূপ চর্যাপদ। এই ভাষার সময় সীমা ধরা হয় আনুমানিক খ্রীস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদিরূপের পরিচয় মেলে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। এর সময়সীমা ধরা হয়েছে আনুমানিক চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের ভাষার তেমন কোন নিদর্শন মেলে না। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ১৭৬০ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার অন্তপর্যায় বিস্তৃত ছিল বলে ধরা হয়। এই স্তরের বাংলা ভাষার রূপান্তর প্রায় আধুনিক কালের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। বাংলা মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য এর প্রধান নিদর্শন। এরপর শুরু বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব। ইংরেজদের আগমনে বিদেশী শিক্ষা সংস্কৃতির স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে নবজোয়ার আসে। বাংলা গদ্য বাঙালী চিত্তপ্রবাহকে নাড়িয়ে দেয়। সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যে শুরু হয় সাহিত্য সাধনা। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি লেখা শুরু হয়।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় সাহিত্যের শিষ্টরূপ নানাভাবে বিকশিত হতে দেখা যায়। শিষ্ট বা লিখিত উচ্চ সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে চির প্রবহমান থেকেছে মৌখিক ধারার লৌকিক সাহিত্য। মৌখিক ধারার অলিখিত সাহিত্যকে বলা হয় 'লোকসাহিত্য'। লোকসাহিত্যের এক বিশিষ্ট রূপ 'পালাগান'। মৌখিক ধারার পালাগান সমূহের সঠিক জন্মলগ্ন নির্ধারণ করা না গেলেও বলা যায় বাংলা ভাষা সৃষ্টির শুরু থেকেই এই ধারার জন্ম। বর্তমানে পালাগানের লিখিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও রূপ বৈচিত্র্যের আলোচনা সূত্রে বিশেষভাবে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয় বৈচিত্র্যগত সমৃদ্ধি বিস্ময়কর। গল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, অনুবাদ, জীবনীকাব্য প্রভৃতি সাহিত্যের সব শাখাতেই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির এক প্রান্তে আছে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিচিত্র সম্ভার, অন্য প্রান্তে আছে উচ্চ সাহিত্যের ঐশ্বর্য। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক হারানো ঐতিহ্য ও অনেক সৃষ্টিশীল নিদর্শন অদ্যাপি বিবর্তিত হয়ে চলেছে লৌকিক ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারায়। বাংলা সাহিত্যের গতিধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের অনেক ঐতিহ্যময় নিদর্শন লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে গেছে নানাবিধ প্রাকৃতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ায়। বাংলার লৌকিক ঐতিহ্য সঞ্জাত সাহিত্যের মধ্যে পালাগান অন্যতম নিদর্শন—"যার ধারক প্রধানত শ্রুতি ও স্মৃতি বা প্রচলিত প্রথা" এবং "আস্বাদক সহৃদয় সমাজ বা সমষ্টিগত মানুষ।"[১] সামগ্রিক বিচারে বলা যায় বাংলার লৌকিক পালাগানকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা পূর্ণ হতে পারে না।

বাংলা লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাসাহিত্য বা লোকায়ত পালাগানের মধ্যে যুগভেদে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশেষজ্ঞগণ পালাগানের আদিরূপ হিসাবে 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মধ্যযুগের পালাগানের বিশিষ্টরূপ হিসাবে বাংলা আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যসমূহ এবং আধুনিক যুগের পালাগান বলতে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানকে বুঝিয়েছেন। উক্ত তিন প্রকার পালা সাহিত্য-ধারায় গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পালাগানের আঙ্গিকসমূহ আংশিক প্রত্যক্ষ করা যায়। "জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ শ্রীকৃষ্ণলীলার আদি নাট্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলির গান ও সংলাপ হইতে পরবর্তীকালে যাত্রাগানের যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"[২] সুতরাং লোকায়ত পালাগানসমূহের মধ্যে লোকনাট্যগত বৈশিষ্ট্য যে আধুনিক একথা বলা যায় না। আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্য ধারার পূর্বে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তার বিশিষ্ট রূপের আভাস পাওয়া যায়। মূলত "লোকনাট্যের ক্রমবিকাশের আলোচনাটি অনেকখানি অনুমান নির্ভর। কেননা, খুব বেশি পুরানো লোকনাট্যের কোন নিদর্শন আমাদের হাতে নেই। চর্যাকার কথিত 'বুদ্ধনাটক' কেমন ছিল আমাদের জানা নেই, অন্য দিকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যদি লোকনাট্য

প্রভাবিত হয়েও থাকে তবুও এগুলিকে যথার্থ বিচারে লোকনাট্য বলা চলে না।"[৩]

লোকনাট্যের বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় প্রচলিত লোকায়ত পালাগানসমূহের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতি বা লৌকিক ধারা সুনির্দিষ্ট সময়সীমায় বন্দী থাকে না। এই ধারা সতত পরিবর্তনশীল। অবশ্য পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও তার আদিরূপটি একেবারে হারিয়ে যায় না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গীতগোবিন্দ, মধ্যযুগের আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্য ও সাম্প্রতিক কালের লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানসমূহের মধ্যে একপ্রকার যোগসূত্র আছে। উক্ত তিনটি ধারা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই প্রত্যক্ষ করা গেলেও লোকনাট্যের আদিরূপটি পালাগানের মধ্যে প্রবহমান। লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানগুলি লোকনাট্যের ঐতিহ্য চব্বিশ পরগণা তথা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকসমাজের নিকট অতিশয় আদরণীয় ও বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। মানুষের দৈব বিশ্বাস, ভক্তি, সামাজিক সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি প্রভৃতির কথা লোকায়ত পালাগানের মধ্যে নিহিত থাকায় পালাগানগুলি এই অঞ্চলের লোকসমাজের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় পাঠের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

আখ্যানমূলক বাংলা পালা সাহিত্যের সুপরিচিত রূপ বাংলা মঙ্গলকাব্য। মধ্যযুগের বাংলার বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের ন্যায় লিখিত সুপরিচিত পালাগানের বাইরেও মৌখিক ধারায় রচিত ও প্রচারিত থেকেছে অনেক লৌকিক পালাগান। যা বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়। এই সব মৌখিক পালাগানগুলি বিশেষভাবে আঞ্চলিক পরিমণ্ডল ও লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। আঞ্চলিক ও লৌকিক পটভূমিকায় উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত পালাগানের ইতিহাসে চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর আঞ্চলিক পালাগানগুলি বিশেষ পর্যালোচনার দাবী রাখে।

মঙ্গলকাব্য বাংলা আখ্যানকাব্যের সুপরিচিত রূপ হলেও এগুলির উৎস সম্ভবত লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কিত পালাগানে। বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, বাংলার মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাচার সম্পর্কিত একশ্রেণীর আখ্যানকাব্য যা আর্যেতর সংস্কার বহন করে চলেছে। পঞ্চদশ শতক থেকেই এর লিখিত পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া গেছে। তারও পূর্বে ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব ছিল। পঞ্চদশ শতক থেকে এর উদ্ভবকাল ধরা হলেও ঠিক পরিণত কাব্যরূপে পরিণতিরও পূর্বে ব্রতকথা, ছড়া, পাঁচালির মধ্য দিয়ে এ কাব্যের বিবর্তন ধারাটিকে বিশেষত পণ্ডিতগণ চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। একেবারে প্রাথমিক পর্বে তাই ব্রতকথা ও ছড়ার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের আদিরূপটি চিহ্নিত এবং পরবর্তী পর্বে তা বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি সঙ্গতিপূর্ণ ও কাহিনীভিত্তিক পাঁচালির রূপ নিতে শুরু করে। "সব দেবতার ছড়া পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত হইয়া কাল সহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে অনবদ্য কাব্যরূপ বিকাশ পাইয়াছে। ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি

যশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এই সব ছড়া পাঁচালি, শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণ রাশির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবমন কিরূপে যুগ ব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠক ও মানসিক গতিবিধির একটি আশ্চর্য ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নবশিক্ষা লাভ করিবেন।"[৪]

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ গ্রামবাংলার লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত হলেও পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও পৌরাণিক প্রভাবে এই কাব্যের অনেক দেবদেবীর আর্যিকরণ ঘটেছে। ব্রাহ্মণ কবিগণ দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উপর আর্যসংস্কার ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও পৌরাণিক প্রভাব পড়েছে, তেমন মঙ্গলকাব্যগুলি হয়েছে শিল্প সাহিত্যের (Art Literature) অঙ্গীভূত। চব্বিশ পরগণা তথা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এমন কিছু লৌকিক দেবদেবী আছেন যাঁদের মাহাত্ম্য উচ্চ বা শিল্প সাহিত্যের মর্যাদা পায়নি, কিন্তু লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর লোকায়ত পালাগানের ঐতিহ্যে তাদের মাহাত্ম্যগত অস্তিত্ব রক্ষিত ও বিবর্তিত হয়ে চলেছে। ক্ষেত্র গবেষণায় দেখা যায় চব্বিশ পরগণার লোকশিল্পীগণ পূর্বোক্ত দুই ধারার লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান ঐতিহ্যময় লোকনাট্যের ধারায় অদ্যাপি আসরে পরিবেশন করেন এবং তা জীবন জীবিকার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন।

বাংলা পালাগানের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ নাথসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বাংলা ভাষার উন্মেষ কাল থেকেই বাংলাদেশের গ্রাম্য কবিগণ ছড়ার আকারে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সমাজ সমস্যামূলক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গান রচনা করে ও গেয়ে গ্রাম্য জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতেন। খ্রীস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত গান ও ছড়াই বাংলা গাথাকাব্যের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত হয়। বিভিন্ন ধর্মান্তর্গত দেবদেবী অথবা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে নিয়ে এই সব কাহিনী যখন নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হত তখন কাহিনীর মূল বক্তব্য তাদের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করত। গানের কাব্যগুণ অপেক্ষা কাহিনী মুখ্য বিষয় হয়ে উঠত। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরস্পর বিরোধী মতবাদ যখন প্রবল ছিল তখন এই শ্রেণীর গান খুবই জনপ্রিয় ছিল, পরে উভয় ধর্মের বিরোধ থেমে যাবার পর ধর্মমূলক কাহিনীগুলি দেবপূজার সঙ্গে নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য-বিবর্জিত হয়ে নিতান্ত লৌকিক কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করে গীত হত। ফলে এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য অনুযায়ী গাথাকাব্যগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা — (১) প্রণয় গাথা, (২) ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত গাথা, (৩) ধর্মাশ্রিত গাথা, (৪) নীতিকথাশ্রিত গাথা ও (৫) বারমাসী গাথা।[৫] ধর্মাশ্রিত গাথাকাব্যগুলির সাথে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানের আঙ্গিকগত কিছু

সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অঞ্চল বিশেষে গল্পগুলি বিভিন্ন ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। যেমন উত্তরবঙ্গে শিব, পার্বতী ও যোগসিদ্ধাগণকে আশ্রয় করে গাথা সৃষ্টি হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে শিব, পার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে গাথা সৃষ্টি হয়েছিল, উত্তর পূর্ববঙ্গে গাজী পীর ইত্যাদির মাহাত্ম্য প্রচারার্থে গাথা সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রচিত গাথা বা পালাগানগুলি সর্বত্র একপ্রকার নয়। পালাগানগুলির মধ্যে যেমন ধর্মমূলক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগান আছে তেমন আছে পীর মাহাত্ম্যমূলক লোকগাথা। বাংলার আখ্যানমূলক পালাগানের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি অন্যতম প্রধান, যা মুখ্যত মানবিক হৃদয়াবেগের প্রতিভূ। বাংলার পালাগানসমূহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের উক্তি উদ্ধার করা যায়।

"ধর্মাশ্রিত গাথাগুলি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গাথাগুলি দেবদেবীকে লইয়া রচিত হইলেও ইহাদের ভিতর দিয়া কোনও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা স্থান পায় নাই। নাথ গীতিকাগুলির মধ্য হইতে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সংযম ও বৈরাগ্য সাধনার বাণী প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাম্য কবিগণের গৃহস্থালী চিত্র বর্ণনায় শিবদুর্গা লৌকিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মানুষ গ্রাম্য সমাজের গৃহদম্পতী। .... কেবলমাত্র পীর মাহাত্ম্যগুলিতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল গাথার মাধ্যমে মুসলমান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়। ইহা তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের প্রভাব প্রসূত বলিয়া মনে হয়। চব্বিশ পরগণার প্রচলিত পীর পালার মধ্যে বিশেষ কোন ধর্মবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না।"[৬]

"ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে কোনরূপ সাধন প্রণালী নেই, আছে সর্বমানবিক হৃদয়স্ফূর্তি, অসাধারণ রূপচেতনা ও প্রকৃতি সৌন্দর্যের ভাব প্রকাশিকা শক্তির সহযোগিতায় এক সজীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব স্বর্গ রচনা করেছে। এই স্বর্গের চাবি জনসাধারণের অতি সন্নিহিত পল্লীকবির হাতে আছে।"[৭]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, "বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গোপীচন্দ্রের গান হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মের কোন আদর্শ অনুসরণ করেনি। এর সঙ্গে এই বিষয়ে কেবলমাত্র বাংলার অন্যতম মৌখিক সাহিত্য মৈমনসিংহ গীতিকার তুলনা হতে পারে, লিখিত কিংবা মৌখিক সাহিত্যের আর কোন বিষয়ের তুলনা হতে পারে না। বহিরাগত পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবমুক্ত বাঙালীর সহজ মনের রস পরিচয়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মত গোপীচন্দ্রের গানও সার্থক রচনা।"[৮]

আখ্যানমূলক পালাগান হলেও নাথ গীতিকা এবং মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা এক শ্রেণীর রচনা নয়। মৈমনসিংহ গীতিকা মৌখিক ধারায় প্রচারিত লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট রূপ। যা সাধারণভাবে গাথা বা গীতিকা হিসাবে সুপরিচিত। অপরপক্ষে "নাথ সাহিত্য পুঁথির আশ্রয় পেলেও এর উৎস ভূমি লোকসাহিত্যেরই প্রাঙ্গণ।"[৯] মূলত লৌকিক উৎসজাত হলেও মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং নাথ গীতিকা সমগোত্রীয় রচনা

নয়। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা যায় নাথ সাহিত্য ইতিকথা বা Legend শ্রেণীর রচনা এবং মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা ballad বা গাথাকাব্য তথা গীতিকা শ্রেণীর রচনা। অপরপক্ষে লোকসমাজে একপ্রকার পালা সাহিত্যের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যা বিশেষভাবে লোকায়ত পালাগান হিসাবেই বিবেচ্য। রচনাগত বৈশিষ্ট্যে যে মিল ও পার্থক্য থাক না কেন নাথ সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা আখ্যানমূলক গাথাগীতিকা শ্রেণীর পালাগান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেকটাই আখ্যানমূলক পালাগানের মধ্যে পড়ে। বাংলা পালাগানের ঐতিহ্যের অনেক সম্পদ অদ্যাপি লোকসমাজে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। বাংলা আখ্যানমূলক পালাগানের ধারা লোকসমাজে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কিত আখ্যানমূলক কাব্যের মধ্যে এখনও সজীবভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বাংলার সুপ্রাচীন আর্যেতর সংস্কার এবং সৃষ্ট সাহিত্যের দূরবর্তী দেশজ সাহিত্যের প্রথাগত লৌকিক রূপের নিদর্শন অদ্যাপি বিশেষভাবে ও নানারূপে লোকসমাজে প্রচলিত আছে। লোকসমাজে প্রচলিত লোকায়ত পালাগানের বিশিষ্ট নিদর্শন চব্বিশ পরগণায় লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর পালাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সুতরাং নাথগীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি ধর্মাশ্রিত ও ধর্মনিরপেক্ষ গাথা কাব্যগুলির সাথে চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানগুলির মূলগত যে সাদৃশ্য তা হল এগুলির লেখক হলেন গ্রামের লোকশিল্পী বা লোককবিগণ। এ গানের শ্রোতাও মুখ্যত এই অঞ্চলের লোকসমাজ এবং এ গানের শিল্পীও অধিকাংশই লোকসমাজ সম্ভূত। পালাগানগুলির মধ্যে কোন তত্ত্ব বা সংকীর্ণ ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের প্রবণতা নেই। এ দিক থেকে পালাগান ও গীতিকার মধ্যে ভাব ও আঙ্গিকগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রচলিত লোকায়ত পালাগানের পরিবেশনের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক পূজাচার জড়িত থাকে যা গীতিকার মধ্যে নেই। চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত পালাগানগুলি এ অঞ্চলের মানুষের আদিম ঐতিহ্য সঞ্জাত জাদুবিশ্বাস প্রসূত ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি কামনাময়, রোগশোক হতে পরিত্রাণময় দৈববিশ্বাস কেন্দ্রিক, লৌকিক আচার-আচরণ সর্বস্ব এক বিশিষ্টরূপ যা এই অঞ্চলের লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাষা সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

পাদটীকা

১। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, বিষয়ঃ প্রবন্ধ, '৯০, পৃঃ ১৩৮।
২। অজিত ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, অবতরণিকা, পৃঃ ৭।
৩। মানস মজুমদার, লোক ঐতিহ্যের দর্পণে, ১৯৯৩, পৃঃ ১৪৬।
৪। দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৬২।
৫। বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, বাংলা গাথা কাব্য, ১৯৬২, পৃঃ ৮।
৬। বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, বাংলা গাথা কাব্য, ১৯৬২, পৃঃ ১৮।
৭। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ২য় সং, পৃঃ ১৪৭-৪৮।
৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য, গোপীচন্দ্রের গান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃঃ ভূমিকা - দশ।
৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৯০, পৃঃ ২৫৮।

তৃতীয় অধ্যায়

চব্বিশ পরগণার পালাগানের বিষয় বিভাগ

বাংলা সাহিত্যে পালাগানের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন প্রকারে বাংলা সাহিত্যে আবহমানকাল কাহিনীমূলক পালাগান রচিত হয়েছে এবং ঐ রচনা পুষ্ট হয়েছে বহু সংখ্যক উচ্চ শিষ্ট সাহিত্যিক অথবা লোকায়ত সাহিত্যসেবীর রচনায়। বলা যায় বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব হল—এক-একটি নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করে যুগের পর যুগ বহু সংখ্যক সাহিত্যসেবী লেখনী ধারণ করে বর্ণিতব্য বিষয়টি সমধিক পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এই নিমিত্ত শিবায়ণ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে বহু সংখ্যক কবি বিভিন্ন সময়ে লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতিভা ও মনীষার উৎকৃষ্টতা প্রদান করেছেন। চব্বিশ পরগণা তথা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এমনই অগণন লোকশিল্পী আছেন যাঁরা উক্ত বিষয় সমূহ অবলম্বন করে আপন প্রতিভাবলে ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে পালাগান রচনা করেন এবং গ্রামে-গঞ্জে পরিবেশন করেন। তাঁদের কল্পনা, আদর্শ-জীবনবোধ, ভবিষ্যতের বিকাশ-পন্থা, তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাঁদের সৃষ্ট পালাগানসমূহে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

সমাজ বাস্তবতার ধারা ও মানবজীবনের সাধনার ফলে জাতীয় জীবনে বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে। এই বিশিষ্টতা সেই জাতির কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, আচার-আচরণ, গার্হস্থ্য জীবন, ধর্মানুষ্ঠান বেশভূষা কিংবদন্তী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। লোকশিল্পীগণ স্বতস্ফূর্তরূপে জাতির উক্ত বিশিষ্টতার মধ্য থেকে জীবনের শাশ্বত সত্যগুলিকে নিষ্ঠার সাথে চয়ন করেন এবং সেগুলির প্রকাশ ঘটে তাঁদের সৃষ্ট কথায়, গানে, নানা ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদিতে। তাঁদেরই সৃষ্ট সঙ্গীত, কাব্য, শিল্প, পালাগান প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে লোককৃতি যা লোকসমাজের অমূল্য সম্পদ। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে বিভিন্নভাবে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানগুলি এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চব্বিশ পরগণার লোকধর্ম ও লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে রচিত, প্রচলিত

ও পরিবেশিত হয়ে চলেছে যে সকল লোকায়ত পালাগান সেগুলি বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যায়।

শুধু চব্বিশ পরগণা নয়, বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির ধারার মধ্যে থাকে সেই অঞ্চলের ইতিহাস। ইতিহাস বলতে শুধু রাজরাজড়াদের আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, বিলাস-বৈভব নয়, আপামর জনসাধারণের জীবন প্রবাহের অতীত কথাই প্রকৃত ইতিহাস। সুতরাং প্রকৃত ইতিহাস ও আপামর জনসাধারণের কথা বা জমিদার-বিত্তবানদের কথা জানতে গেলে গ্রামগঞ্জে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির ধারার মধ্যেই তা খুঁজতে হবে। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের অনেক ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এই অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগান-সমূহের ঐতিহ্যে। লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে রয়েছে মানুষের বিশ্বাস সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিচয়, আর লৌকিক দেবদেবী অবলম্বনে রচিত পালাগানে রয়েছে লোকজীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির ইতিহাস। চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত পালাগানসমূহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের লৌকিক ঐতিহ্য বহন করে। পালাগান বা লোকাভিনয়ের ইতিহাস বাংলায় সুপ্রাচীন। লোকসমাজে পাঁচালী মঙ্গলকাব্যের ধারায় সুপ্রচলিত পালাগানের ঐতিহ্য অবলম্বন করেও চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে গ্রাম্যকথা কাহিনী-নির্ভর লোকায়ত পালাগান।

চব্বিশ পরগণার লোকধর্ম, উৎসব ও দেবদেবীগণকে অবলম্বন করে এই অঞ্চলে লৌকিক স্তরে যে সব পালাগান রচিত ও পরিবেশিত হয়ে চলেছে সেগুলিকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) পাঁচালি পালার ধারা ও (২) কেচ্ছাকাহিনীর ধারা। পাঁচালি পালার ধারাটি মুখ্যত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক দেবদেবী অবলম্বনে রচিত ও পরিবেশিত হয় এবং কেচ্ছাকাহিনীর ধারাটি প্রধানত পীর, গাজী, বিবি মাহাত্ম্যের ধারাকে অবলম্বন করে প্রচারিত হয়। ইসলামি কেচ্ছা কাহিনীর ধারাকে অনেকে 'পিরুলী গান' বলেন। অবশ্য সামগ্রিকভাবে উভয় প্রকার পালাগানই লোকসমাজে 'পাঁচাল গান' বা 'পিরুলী গান' এবং উভয় প্রকার গানের দল 'পাঁচাল গানের দল' বা 'পিরুলী গানের দল' বলে কথিত হয়। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে হিন্দু পাঁচালির ধারা ও ইসলামী কেচ্ছার ধারা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর মিলে গেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত লোকসমাজ এই সব পালাগান পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন এবং এই সব পালাগানের রসাস্বাদন করেন।

চব্বিশ পরগণায় লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর বহু প্রকার পালাগানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এগুলি পালাকারগণ ও পালাগায়কগণ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সংরক্ষণ করে আসছেন। ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত পালা-সমূহকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

১। দেবীপালা ৩। বিবিপালা
২। দেবপালা ৪। পীর ও গাজীপালা।

দেবীপালা গড়ে উঠেছে মুখ্যত লৌকিক হিন্দু দেবীকে কেন্দ্র করে। লোকসমাজে প্রচলিত

নারীদেবতা বা দেবীকে অবলম্বন করে রচিত পালাগানগুলিকে সাধারণভাবে 'দেবীপালা' বলা হয়। চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত ও সংগৃহীত লৌকিক দেবীপালাগুলি নিম্নরূপ —

দেবীপালার অন্তর্গত উল্লিখিত অধিকাংশ পালার একাধিক শাখাকাহিনী প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন শীতলাপালার শাখাপালা— চন্দ্রকেতুর পালা, বিরাট রাজার পালা, রাবণ রাজার পালা। লক্ষ্মীপালার শাখা পালা— বীরবাহুর পালা, ভাঁটুই ঠাকুর, বিনন্দ রাখাল, বল্লভ দত্ত ও সনাতন, বলাই সদাগর, লক্ষ্মীনারায়ণ (দ্বারকাপালা)। বিশালাক্ষীর শাখা পালা— সিদ্ধেশ্বর ও অনন্তদেবপালা। দেবীপালার মধ্যে যত শাখাকাহিনীমূলক পালা লক্ষ্য করা যায় এমনটি অন্য বিভাগে দেখা যায় না।

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত দেবপালাগুলি গড়ে উঠেছে লৌকিক দেবতাকে কেন্দ্র করে। এই অঞ্চলে বহু লৌকিক দেবতার পূজাচার প্রচলিত থাকলেও সব দেবতাকে নিয়ে পালাগান সৃষ্টি হয়নি। কতিপয় লৌকিক দেবতা পালাগায়কের গানে স্থান পেয়েছেন। ক্ষেত্রগবেষণামাধ্যমে যে-সমস্ত লৌকিক দেবতা-নির্ভর পালাগান সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ —

দেবপালার অন্তর্গত উপর্যুক্ত পালাসমূহের প্রতিটি পালা একাধিক পালাগায়কের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। প্রতিটি পালারই কাহিনীগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে। পঞ্চানন্দের গানের একটি প্রাচীন খাতা বর্তমান গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে, যেটির কাহিনী, ভাষা, অক্ষর ইত্যাদি প্রাচীনত্বের ও মৌলিকত্বের দাবী রাখে। এছাড়া এই অঞ্চলের লোকসমাজে পূজিত আরও কিছু লৌকিক দেবতা আছেন যাঁদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগানের প্রচলন নেই, তাঁদের পূজানুষ্ঠান কালে তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক পাঁচালী পাঠ করা হয়। যেমন— ত্রিনাথের পূজার সময় কেবল ত্রিনাথের পুঁথির পাঁচালি পাঠ করা হয়। বলা বাহুল্য এই ত্রিনাথ নাথযোগীদের উপাস্য দেবতা নন, এঁরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। "ত্রিনাথের পাঁচালী" নামক মুদ্রিত পুস্তিকায় গুরুকর্তৃক ত্রিনাথের ঘটে পদাঘাত ও দণ্ডপ্রাপ্তি উল্লেখ আছে—

> তুমি হরি কৃপা সিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
> ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর
> তিনদেব একস্তরে পূজা প্রকাশের তরে
> ত্রিনাথ হইলে তদন্তর।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার নাম উল্লিখিত হলেও লোকসমাজে পৌরাণিকভাবে নয়, একান্ত লৌকিকভাবেই ত্রিনাথের পূজা ও পালা অনুষ্ঠিত হয়।

চব্বিশ পরগণায় লোকায়ত পালাগুলির মধ্যে মুসলমানী পালা একটি বিশিষ্ট বিভাগ। মুসলমানী পালাগুলি প্রধানত পীর-গাজী ও বিবি অবলম্বনে রচিত ও পরিবেশিত হয়। বিবিপালাগুলির নিম্নলিখিত বিভাগ লক্ষ্য করা যায়—

উপরে বর্ণিত বিবিদিগের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক লোকায়ত পালাগান জেলা চব্বিশ পরগণার প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকাগুলিতে উল্লিখিত পালাসমূহের প্রচলন সর্বাপেক্ষা বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে সাধারণভাবে এই সব বিবিপালা হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগানের একটি বিভাগ 'পীর ও গাজীপালা'। এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন নামে নানা প্রকার পীর-ফকির ও গাজীর মাহাত্ম্য প্রচলিত আছে। তাঁদের দরগায় নিত্য ধূপ-বাতি দেওয়া হয়, বাৎসরিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদি হয়, কিন্তু সমস্ত পীর গাজীকে নিয়ে লোকায়ত পালাগানের প্রচলন দেখা যায় না। ক্ষেত্রগবেষণায় যে-সমস্ত পীর ও গাজীকেন্দ্রিক পালাগান সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ—

উল্লিখিত পীর ও গাজীদিগের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান ছাড়া আরও অনেক গাজী বা পীর আছেন যাঁদের মাহাত্ম্য অন্য পালা 'ভাঙটা' করে গাওয়া হয়, যার মধ্যে রক্তানগাজী, দেওয়ানগাজী, কামালগাজী, পীর মছলন্দ ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া আরও অনেক পীরপীরানী আছেন, যাঁদের মাহাত্ম্য মুসলমান কাওয়ালগণ বিভিন্ন পীরপীরাণীর দরগায় বিশেষ অনুষ্ঠানে জমায়েত হয়ে কাওয়ালী ঢঙে গান করেন, যার মধ্যে—পীর ভাঙড় সুলতান, বাবনগাজী, ফতেমাবিবি ইত্যাদির গান উল্লেখযোগ্য। এই গানগুলি সঠিক অর্থে লোকায়ত পালাগান নয়। অবশ্য বাংলার লোকসমাজে যেমন একদিকে পীর-গাজীর পূজার প্রচলন ঘটেছে তেমন অন্যদিকে গড়ে উঠেছে তাঁদের মাহাত্ম্যমূলক গাজী-পালা গীত ও পীরপাঁচালি বা পিরুলী পালাগান, যা লোকায়ত পালাগান হিসাবে বিবেচিত হয়।

উপরে বর্ণিত ও ক্ষেত্রগবেষণায় সংগৃহীত লোকায়ত পালাগানগুলি পর্যালোচনা করলে লোকসাহিত্য তথা আখ্যানমূলক পালাগীতি সাহিত্যের বিশিষ্ট পরিচয় পাঠ করা

যায়। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত পালাগানগুলির মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিক হিন্দু এবং লৌকিক ইসলামী ধর্ম সংস্কৃতির নানাবিধ পরিচয় এবং হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্ররূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। আখ্যান বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টি, গীতি মাধুর্য ও কাব্যগুণে এই সব লৌকিক পালাগুলির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম (লোকায়ত পালাগান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অধ্যায়ে এই বিষয়টি বিস্তৃতরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগানসমূহ চব্বিশ পরগণা তথা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকসমাজের পরিচয়জ্ঞাপক ও সাহিত্য সংস্কৃতির মূল্যবান দলিল। মুসলিম পীরপালাগানের মধ্যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বিশেষভাবে মঙ্গলকাব্যের ভাবাদর্শ লক্ষ্য করেছেন— "মুসলিম কবিদিগের রচিত পীরমাহাত্ম্য-সূচক এক শ্রেণীর কাব্য আছে, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহাদের বিষয়গত ঐক্য আছে। ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি, পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের রূপ ইহাদের নাই, ইহারা পাঁচালী নামে পরিচিত। এই বিষয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনার নাম সত্যপীরের পাঁচালী। সত্যপীর কোনও মুসলমান পীর ছিলেন, পরে হিন্দু ও সমাজের স্বীকৃতির পর তিনি নারায়ণের সঙ্গে একাকার হইয়া সত্যনারায়ণ রূপে পরিচিত হন। তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক কাহিনী মঙ্গলকাব্যের ভাবাদর্শ-অনুসারী রচনা।"[২] মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলায় বিশেষ করে ইসলাম ধর্মপ্রচারক গাজী ও পীরপীরাণীগণের অলৌকিক কীর্তিকলাপপূর্ণ প্রভাব প্রসার লাভ করে এবং বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ রূপান্তর। রূপান্তরিত সেই সাহিত্যশাখার বিশিষ্টরূপ পীর-গাজী সাহিত্য। সামগ্রিকভাবে পীর-গাজী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য ও তার ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য মূল্যবান অঙ্গ, যার বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে পীর ও গাজী সম্পর্কিত লোকায়ত পালাগানে।

সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে, চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোকসমাজে বিভিন্নভাবে ও রূপে নানাপ্রকার লৌকিক দেবদেবী বা পীর-গাজী ও বিবিমাদের মাহাত্ম্যমূলক লোকায়ত পালাগানের প্রচলন আছে। এই সব পালাগান সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রকার জনসমাজেই সমাদৃত হয়। এই পালাগানগুলি সহজাত লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারের পটভূমিকার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগানসমূহ শুধু লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির নয়, সমগ্র বঙ্গসংস্কৃতির ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যায় হিসাবে পরিগণিত হয়।

১। শ্রী মহেশচন্দ্র দাস বিরচিত ত্রিনাথের পাঁচালী, পৃঃ ৯।
২। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ১০৬।
□ ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬, ভূমিকা।
□ ডঃ সুকুমার সেন, আহম্মদ শরীফ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ দেবীপালা

দেবীপালা ঃ শীতলা

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের বিশিষ্ট দেবী হলেন দেবীশীতলা। পালাগান আলোচনায় এটি দেবীপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজের বিশ্বাস, দেবীশীতলা বসন্ত ও কলেরারোগের দেবী। এছাড়া কামলা, গলগণ্ড, কোরণ্ড, সান্নিপাত, পীলে, ফোড়া, বাত, উদরী প্রভৃতি চৌষট্টি ব্যাধি তাঁর আজ্ঞাবহ। এই সমস্ত মারাত্মক রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে এই অঞ্চলের মানুষ দেবীশীতলাকে রোগপ্রতিকারিণী শক্তিরূপে কল্পনা করে পূজা করেন। কেবল চব্বিশ পরগণা নয়, দেবীর পূজা বাংলা তথা ভারতবর্ষের বহু স্থানে বিভিন্ন নামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'শীতলা' নামটি অখণ্ড বাংলায় প্রচলিত আছে। সুদূর দাক্ষিণাত্যে শীতলাম্মা নামে এক দেবীর পাথরের নুড়িপূজার প্রচলন আছে বলে জানা যায়, যার সাথে চব্বিশ পরগণার শীতলা নামের মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সর্বোপরি চব্বিশ পরগণায় শীতলার পাথরের নুড়ি ও মৃৎ-মূর্তি দুই প্রকার পূজার প্রচলন থেকে অনুমান করা যায় আর্যেতর সমাজ থেকে দেবীর আর্যীকরণ হয়েছে। [১]

প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থের মধ্যে দেবীশীতলার পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পিচ্ছিলাতন্ত্র ও স্তবকবচমালায় দেবীর ধ্যানমন্ত্র আছে, যার সাথে ময়ূরভঞ্জে ধর্মের মন্দিরে খোদিত শীতলা মূর্তির সাদৃশ্য আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে উল্লিখিত জ্যেষ্ঠা-দেবীর মাহাত্ম্যে দেবীকে বিঘ্নসৃষ্টিকারী অলক্ষ্মী বলা হয়েছে এবং তাঁর অস্ত্র ঝাঁটা ও বাহন গাধা। নেপালের বহু ধর্মচৈত্যে শীতলার মূর্তি আছে বলে জানা যায়। এছাড়া বিক্রমপুরে প্রাপ্ত পর্ণশবরীর মূর্তির সাথে বসন্তরোগ ও গাধার অস্তিত্ব থাকায় অনেকে পর্ণশবরী ও শীতলা একই বলে মন্তব্য করেছেন। পর্ণশবরী হলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী। বৌদ্ধ হারিতীর সাথে শীতলাদেবীর সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[২] তাঁদের যুক্তি, অখণ্ড বাংলাদেশের বহুস্থানে শীতলাওধর্মরাজতলা একই সংলগ্ন। এই যুক্তি বড় দুর্বল বলে মনে

হয়। কারণ চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে অনেক স্থানে দেখা গেছে—একই স্থানে ষষ্ঠী, শীতলা, পঞ্চানন্দ, মনসা প্রভৃতি এবং মন্দিরের ঠিক বাইরেই বনবিবির মূর্তি আছে। সুতরাং উল্লিখিত দেবদেবী সকল একই স্থানে স্থাপিত বলে একই—একথা বলা চলে না। তবে এই অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি দেবদেবীই সমগুণসম্পন্ন হিসাবে বিবেচিত হন। অন্য স্থানের ন্যায় চব্বিশ পরগণায় সাধারণভাবে মনসা সর্পদেবী, ষষ্ঠী সন্তানদাত্রীদেবী এবং শীতলা রোগ-অপহরণকারিণীদেবী হিসাবে পূজিতা হলেও এই অঞ্চলে আলোচ্য তিন দেবী লোকসমাজে সাধারণভাবে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাকারীদেবী হিসাবেই পূজিতা হন। চব্বিশ পরগণায় এই তিন দেবী সন্তানহীনার সন্তান দান করেন ও শিশুকে রক্ষা করেন বলে এই অঞ্চলের লোকসমাজের প্রচলিত বিশ্বাস।

মধ্যপ্রদেশে শীতলাদেবীর পূজার প্রচলন আছে বলে জানা যায়। সেখানে শীতলাদেবী মহিলাদের যাবতীয় রোগ নিরাময়কারিণীদেবী হিসাবে পরিচিতা। মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত শীতলার দোহাই দেওয়া একটি মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। এই মন্ত্রের সাহায্যে মেয়েদের যাবতীয় রোগ সেরে যায় বলে ঐ অঞ্চলের লোকবিশ্বাস। মন্ত্রটি নিম্নরূপ —

শীতলা হ্যায় ব্রাহ্মণী কি পুত্রী
লে বল চল ফুল,
জাহা ভেজু তাঁহা চল
তু ছুটাইছে বাঁয়ে, ম্যায় ছুটাইছে ডাঁয়ে
সদগুণ সামারকে বাণ্
গাই গুহার, বালক-গুহার, তিহির গুহার
তিন গুহারকে মা শেতলা,
দোহাই মা শেতলা, দোহাই মা শেতলা, দোহাই মা শেতলা।[৩]

এই মন্ত্রটি প্রমাণ করে যে দেবীশীতলা মধ্যপ্রদেশে যাবতীয় রোগনিরাময়কারিণী দেবী হিসাবে স্বীকৃত হন। চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রগবেষণায় অনুরূপ মন্ত্র সংগৃহীত না হলেও এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যে, বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের মানত পূরণের জন্য শীতলার পালাগান অনুষ্ঠিত হয়।

দেবীশীতলাকে কেন্দ্র করে লোকসমাজে বিবিধ প্রকার বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রচলন আছে। চব্বিশ পরগণায় দেবীশীতলা ব্যাপকভাবে পূজিতা হন। কালান্তক হাম-দাম-বসন্তের দেবী বলে তিনি লোকসমাজে সুপরিচিতা। এই রোগের আক্রমণে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তখন আর্ত মানুষের একমাত্র সহায় হন শীতলাদেবী। শীতলাপূজা, দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান ও হরিনাম সংকীর্তনই আর্ত মানুষের তখন একমাত্র সান্ত্বনা। যেহেতু এই রোগের কার্যকরী ওষুধ গ্রামাঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য, তাই এসব রোগ হলে চব্বিশ পরগণার অধিকাংশ মানুষ দেবীশীতলার কাছে 'মুদো বেঁধে'[৪] মানত করেন ও শীতলাতলার

মাটি বা 'চন্নেমিত্তিকে' (চরণমৃত্তিকা বা চন্দনমৃত্তিকা) রোগীর সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দেন। লোকসমাজের বিশ্বাস, শীতলাদেবীর কৃপা ছাড়া এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। দেবীশীতলার কৃপালাভের জন্য সাধারণ মানুষ যেমন শীতলার পূজা করেন তেমন আয়োজন করেন শীতলাপালা গানের অনুষ্ঠান।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে বসন্তরোগের সাথে শীতলা নামটি বিশেষভাবে জড়িত। ফলে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলাকে নিয়ে নানা আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধ মেনে চলার প্রবণতা অদ্যাপি বিদ্যমান। মানুষের শরীরে বসন্ত বা হাম দেখা দিলে এখানকার মানুষজন সহজে হাম বা বসন্ত কথাটি উচ্চারণ না করে বলেন 'মার দয়া' হয়েছে বা 'মা দেখা দিয়েছে'। বয়স্কা মায়েরা বলেন 'মা জাল পেতেছে'। এইজন্য যে অঞ্চলে এই রোগ হয় সেখানে সাধারণ মানুষ পুকুরে জাল ফেলেন না। লোকবিশ্বাস, যেহেতু মা জাল পেতেছেন সেই জালের উপর জাল ফেলা অপরাধ। তাতে মা আরো কুপিতা হন। যে বাড়িতে এই রোগ দেখা দেয়, সে বাড়িতে কোন অতিথি এলে বসতে দেওয়া হয় না, ভিক্ষা দেওয়া হয় না, এমনকি পিপাসায় একগ্লাস জলও পান করতে দেওয়া হয় না। বসন্তরোগে আক্রান্ত পরিবারে মাছ, মাংস, মুসুর ডাল, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উত্তেজক সমস্ত খাবার নিষেধ থাকে। এই সমস্ত আচার-আচরণ পালনে বাড়ির মহিলাগণ বেশি তৎপর।

কোন পরিবারে বসন্তরোগ দেখা দিলে তা সেই পরিবারের সমস্যা নয়। গোটা পাড়া ও গ্রাম সেই সমস্যাকে গ্রামীণ সমস্যারূপে দেখে। ফলে পুরুষগণ সারাদিন পরিশ্রম করার পর সন্ধ্যাবেলা হরিনামের দল নিয়ে বাড়ি বাড়ি "নাম দিয়ে" বেড়ান। একমাস ধরে চলে এই নাম-দেওয়া ও মাস শেষে শুরু হয় গ্রামভিত্তিক অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ। নাম হল বৈষ্ণবদের 'মহামন্ত্র' নাম।[৫] লোকবিশ্বাস, মা শীতলা হরিনাম সংকীর্তনে শীতল হন। যে গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন হয় বা 'হরিবাসর' হয় সে গ্রাম ছেড়ে মা চলে যান। নাম কীর্তনের পর লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে কাঁদতে কাঁদতে মাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে অনেকে দেখেছেন, এমন কথিত হয়। হরিনাম-দেওয়া ছাড়া মা শীতলার সন্তুষ্টি বিধানের আর একটি উপায় হল দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান। গ্রামে বসন্তরোগ দেখা দিলে একক প্রচেষ্টায় বা গ্রামের মানুষ যৌথ প্রচেষ্টায় শীতলার পালাগান দেন। দিনের বেলায় মহা ধুমধামে দেবীর মূর্তি গড়ে পূজা হয় ও রাতে শীতলার পালাগান হয়। অদ্যাপি চব্বিশ পরগণার গ্রামগঞ্জের লোকসমাজে এই রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। দেবীর গানপূজা মানত করলে বা 'গানপূজা' দিলে বসন্তরোগী কষ্ট কম পায় ও বেঁচে যায়, এই বিশ্বাসে জলা-জঙ্গল অধ্যুষিত চব্বিশ পরগণার মানুষ ব্যাপকভাবে শীতলাদেবীর পূজা করেন ও শীতলা পালাগান দেন। তাঁদের বিশ্বাস, গান দিলে বসন্তের মত কালান্তকরোগ আর হয় না বা হলে রোগী অল্পে মুক্তি পায়।

জেলা চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে শীতলাদেবীর তিন ধরনের পূজা প্রচলিত

আছে। প্রথমত নিত্যপূজা, দ্বিতীয়ত বাৎসরিক পূজা, তৃতীয়ত সাপ্তাহিকপূজা। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা-করা শীতলামন্দিরে দেবীর নিত্যপূজা হয়। নিত্যপূজা হলেও এইসব স্থানে বাৎসরিক বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয়। বাৎসরিকপূজার দিনে অতিশয় জাঁকজমক সহকারে দেবীর পূজা হয় এবং বিশাল জমায়েত হয়। দ্বিতীয় পূজা ব্যবস্থায়ও জনসাধারণের আগ্রহ কম থাকে না। 'দেশপালা'-পূজা হিসাবে অনেকক্ষেত্রে শীতলাপূজা পালিত হয়। সাপ্তাহিকপূজা যে-মন্দিরে হয় সেখানে সাধারণত সপ্তাহে শনি ও মঙ্গলবার এই দুইদিন পূজা হয়ে থাকে। নিত্য ডালাপূজা হলেও শনি, মঙ্গলবারের পূজায় বেশ আড়ম্বর থাকে। ভক্তগণ এই দুই দিনে মানত চুকোতে আসে। এ ছাড়া ঐ মন্দিরে বাৎসরিকপূজার ব্যবস্থাও থাকে। বাৎসরিকপূজায় অন্যান্য দিনের পূজা অপেক্ষা অনেক বেশি আড়ম্বর হয়। যে মন্দির বা থানে শীতলার কেবল বাৎসরিকপূজা হয় সেখানে নিত্য ডালাপূজার ব্যবস্থা তো থাকেই না, এমনকি সন্ধ্যাকালে অনেকক্ষেত্রে প্রদীপ জ্বালানো, ধূপ দেওয়াও পর্যন্ত হয় না। এইরূপ অবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বারোয়ারী থানে দেখা যায়।

শীতলাদেবীর বাৎসরিকপূজার দিন সর্বত্র এক থাকে না। দিনটি স্থানীয়ভাবে ধার্য হয়। আবার বাৎসরিকপূজা মন্দির বা থান বিশেষে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনেই অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি শীতলা পূজার দিনের পরিচয় প্রদান করা যায়—

দেবীশীতলার পূজার দিন, পরিচয়

গ্রাম	থানা	সময়	স্থায়িত্ব
বেগমপুর	বারুইপুর	জ্যৈষ্ঠ	১ দিন
কোমরপুর	হাসনাবাদ	মাঘ	৭ দিন
বাখরাহাট	বিষ্ণুপুর	মাঘ-ফাল্গুন	৫ দিন
কীর্তনখোলা	বিষ্ণুপুর	চৈত্র	১ দিন
তালদি	ক্যানিং	জ্যৈষ্ঠ	২ দিন
ভরতগড়	বাসন্তী	ফাল্গুন	৭ দিন
শিখরবালী	বারুইপুর	ফাল্গুন	৭ দিন
কালিকাপুর	ভাঙ্গড়	৩রা বৈশাখ	৭ দিন
শিরাকোল	বিষ্ণুপুর	জ্যৈষ্ঠ	১ দিন
আলিপুর	বিষ্ণুপুর	(?)	১ দিন
পূর্বচণ্ডী	বিষ্ণুপুর	(?)	১ দিন

উপরে বর্ণিত তালিকা ও ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় যে, চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে বা গ্রামেবিভিন্ন সময় দেবীশীতলার বাৎসরিকপূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানভেদে দেবীশীতলার মূর্তি একক বা অন্যান্য দেবদেবীর সাথে অধিষ্ঠিতা থাকেন। কোন থানে দেবীশীতলার

পূজা মুখ্য ও অন্যান্য পূজা গৌণ এবং কোন স্থানে অন্য দেবদেবীর পূজা মুখ্য ও শীতলার পূজা গৌণ রূপে অনুষ্ঠিত হয়।

শীতলাদেবীর বাৎসরিকপূজার দিন উপলক্ষে চব্বিশ পরগণার গ্রামবাসীগণ বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতি পালন করেন। পূজার একসপ্তাহ আগে 'সাধারণী পূজা'র উদ্যোক্তা গ্রামবাসীর বাড়ি বাড়ি খবর দেন ও পূজার জন্য চালপয়সাদি সংগ্রহ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে খবর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, দেবীর বাৎসরিক নির্দিষ্ট পূজার দিনটি সবার জানা থাকে। পূজার দিন বেশিরভাগ বাড়িতে কোনরকম গরম জিনিস খাওয়া হয় না। পান্তাভাত খাওয়া হয়। দেবীর ভক্তগণ মানত অনুযায়ী গলায় 'কুটো' (খড়ের কালি) বেঁধে সাতগ্রাম, পাঁচগ্রাম বা তিনগ্রাম মাঙন করে চাল পয়সা সংগ্রহ করে দেবীর পূজা দেন। কেউ মায়ের কাছে গণ্ডি কাটেন, বুক চিরে রক্ত দেন, হাঁস, ছাগল ইত্যাদি বলি দেন, হাতে মাথায় ধূনা পোড়ান ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করেন। বর্ণব্রাহ্মণ দেবীর পূজানুষ্ঠান করেন। পূজার দিন পূজার স্থলে প্রায় প্রতি বাড়ি থেকে চাল, ফলমূল, পয়সা ইত্যাদি একটি পিতলের রেকাবে সাজিয়ে পূজার স্থলে মায়ের ভক্তগণ এনে দেন। একে 'ডালা-দেওয়া' বলে। পূজার শেষে পূজারী প্রতি 'ডালার' চাল ও পয়সা এবং সামান্য কিছু ফলমূল নিয়ে ডালা ফেরত দেন। ভক্তগণ সেই ডালা বাড়িতে এনে বাড়ির প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে খুব ভক্তি সহকারে বিতরণ করেন। এই পদ্ধতিকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে 'পূজার জিনিস দেওয়া'। যারা পূজার জিনিস নেয় তারা দুহাত পেতে নেয় ও কপালে ঠেকিয়ে মায়ের স্মরণ করে ভক্তি সহকারে মুখে দেয়। লোকবিশ্বাস, প্রসাদ সামান্যতম হলেও মায়ের করুণা পাওয়া যায়। শীতলাপূজার একটি বড় অঙ্গ হল 'হরিরলুট' বা 'হরিনুট'। পূজার অন্তিমপর্বে পূজারী ভক্তদের বা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাতাসা ছড়িয়ে দেন। বাতাসা ছড়ানোর সময় পূজারী উচ্চৈস্বরে বলেন, 'মা শীতলার নামে একবার হরি হরি বল'। যাত্রীগণও হরি হরি বল বলে সেই বাতাসা আঁচল পেতে বা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেন। লুটের বাতাসার আলাদা গুরুত্ব। যাত্রীগণ বিশেষত বয়স্কা মহিলারা বা মায়েরা এই বাতাসা কুড়িয়ে আলাদাভাবে নেন, বা আঁচলে বেঁধে রাখেন। বাড়িতে গিয়ে শিশুদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। শীতলা মায়ের প্রসাদ ছাড়া এটি আলাদাভাবে বিরতণ হয় মায়ের 'নুটের বাতাসা' বলে। 'দেশপালা' শীতলা পূজায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশি। তাঁরা পূজার দিন অনেকে উপবাসে থাকেন এবং পূজার শেষে পান্তাভাত খান।

চব্বিশ পরগণার গ্রামগঞ্জে বহু শীতলাদেবীর থান দেখা যায়। দেবীর থানে কোথাও মূর্তি আছে কোথাও নেই। শীতলাদেবীর মূর্তি সর্বত্র একই রকমের নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেবী গাধার পিঠে কারুকার্য-করা আসনে উপবিষ্টা। গাধার মস্তক দেবীর ডান দিকে থাকে। ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। দেবী গাধার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এমন মূর্তিও ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রত্যক্ষ করা গেছে। বাহনহীন শীতলা দেবীর 'ছলন' দিয়ে ভক্তগণ অনেকসময় 'মানত' চুকতে আসেন। চব্বিশ পরগণার অনেক শীতলা মন্দিরে

সপার্ষদ শীতলাদেবীর মূর্তি আছে। সেক্ষেত্রে দেবী গাধার পিঠে আরূঢ়া। তাঁর কোলে এক শিশু। লোকবিশ্বাস, শিশুটি হলেন বসন্তরায়। দেবীর দুইপাশে দুই সখী, একজন হলেন রক্তাবতী, অন্যজনের নাম লীলাবতী। লীলাবতীর বিশেষ কোন পরিচয় লাভ করা যায় না। রক্তাবতীর রক্তবর্ণের শাড়ি ও লীলাবতীর কমলারঙের শাড়ি। উভয়েই সালঙ্কারা ও স্নিগ্ধ হাস্যময়ী। দেবীর বামদিকে থাকেন পিঙ্গলবর্ণের চতুর্ভুজ জ্বরাসুর। দেবীর বাম-কাঁখে কলসী ও ডানহাতে ঝাঁটা দেখা যায়। বিশেষ করে যে-সমস্ত 'ছলন' ভক্তগণ মানত চুকতে আনেন বেশির ভাগ সেই ছলনের কাঁখে কলসী ও হাতে ঝাঁটা থাকে। শীতলাদেবীর ধ্যানমন্ত্রের সাথে দেবীর রূপের কিছু বৈসাদৃশ্য আছে।

ওঁ শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং, সুরগণৈঃ সংস্তুয়মানাং মুদা
বামে কুম্ভধরাং সরোজ (পয়োদ) বদনাম্বন্দে খরস্থাং সদা।
দিগ্‌বাসামুরুহাস-সুন্দরমুখীং সম্মার্জ্জনীং দক্ষিণে,
পাণৌ তাং দধতীং ভয়ার্ত্তি শমনীং সাংসারবিদ্রাবিণীম্।।[৬]

দেবীর প্রণামমন্ত্রে উল্লেখ আছে —

ওঁনমামি শীতলাং দেবী রাসভস্থাং দিগম্বরীম্
মার্জনীকলসোপেতাং শূর্পালংকৃতমস্তকাম্।।[৭]

মন্ত্রানুসারে শীতলামূর্তি কোথাও দিগম্বরীরূপে দেখা যায় না। মস্তকে শূর্প অর্থাৎ কুলো এমনটিও খুব বিরল। বারুইপুর সদাব্রত গঙ্গার স্নান ঘাটে বহু দেবতার একটি মন্দির আছে। এখানে শীতলাদেবীর এক অভিনব মূর্তি দেখা গেছে। গাধার পিঠে ঘণ্টাকর্ণের বামদিকে একাসনে শীতলাদেবী বসে আছেন। তাঁর দুইদিকে আছেন জ্বরাসুর ও রক্তাবতী। ঘণ্টাকর্ণ হলেন দেবীর স্বামী। ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি—হাতে ঘণ্টা, কানে ঘণ্টা, সৌম্য রূপ, দুইহাত, ধুতি, উড়ানী পরিহিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ঘটকপুকুরের নিকট হাজরাতলা নামক স্থানে পঞ্চানন্দের মন্দিরে দেবীশীতলার বিশাল মূর্তি আছে। এখানে দেবী বিশাল এক গাধার উপর উপবিষ্টা। তাঁর পরনে লালপাড় যুক্ত সাদাশাড়ি, ললাটে বড় সিন্দূর ফোঁটা ও সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুরের রেখা।

বারুইপুর থানার অন্তর্গত শিখরবালী গ্রামের শীতলাতলার শীতলাদেবী বিখ্যাত। এখানে দেবীর যে মূর্তিপূজা হয় তা হলো দেবীর দুই হাত, কোলে শিশু বসন্ত, সামনে দণ্ডায়মান বিজয়(?)।[৮] দেবীর দক্ষিণ দিকে ত্রিশূল-হস্তে মহাদেব, বামে চতুর্ভুজ জ্বরা, দেবীর সামনে দুই সখী, বামে রক্তবস্ত্র পরিহিতা রক্তাবতী, ডাইনে কমলারঙের শাড়ি পরিহিতা আর এক সখী। মূল বেদীর সামান্য নিচে একেবারেই সামনে সন্ন্যাসী নিতাই গৌর, একটি পাথরবাটিতে শিবলিঙ্গ। দেবীর সামনে আছে ভক্তদের দেওয়া শাঁখা, সিঁদুর ও পূজার সামগ্রী। শীতলাদেবীর পাথরের নুড়িপূজার ব্যাপক প্রচলন ক্ষেত্রগবেষণায় প্রত্যক্ষ করা যায়। আমতলা-শিরাকোল অঞ্চলে কোন কোন মন্দিরে শীতলা, ষষ্ঠী, বাবাঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর নুড়িপূজার প্রচলন বহুকাল আগে থেকে প্রচলিত আছে বলে জানা যায়।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে শীতলাদেবীর পূজা ও পালাগানের নানারূপ বিধিনিষেধ প্রতিপালিত হয়। শীতলার পালাগান ও পূজা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুর গৃহে শীতলার মূর্তিপূজা ও পালাগান সংশ্লিষ্ট সমস্ত নিয়মনীতি পালিত হয় কিন্তু মুসলমানের গৃহে কেবল পালাগান সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি পালন করা হয়, কোনরকম মূর্তিপূজা হয় না। দেবীর পূজাচার বিষয়ে মহিলাগণ খুবই শুদ্ধাচার অবলম্বন করেন। পূজায় কোন অনাচার হলে মায়ের কোপে পড়তে হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। পূজার আগের দিন মহিলাগণ ভাতরান্না করে তাতে জল ঢেলে রাখেন। পরদিন সেই জল-দেওয়া ঠাণ্ডাভাত (পান্তাভাত) নিজে ও পরিবারের প্রত্যেকেই খান। তাতে কোনরকম গরমের সংস্রব থাকে না। ব্রতিনী উপবাসে থেকে মায়ের পূজার স্থলে উপস্থিত থাকেন। পূজানুষ্ঠান করেন বর্ণব্রাহ্মণ। পূজার শেষে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করে ব্রতিনীগণ উপবাস ভঙ্গ করেন। পূজার দিন ডালকলাই বা ঐ জাতীয় কোন দ্রব্য খাওয়া নিষেধ, কারণ চৌষট্টি ব্যাধি জীবন্ত কলাই রূপে দেবীর কাঁকস্থ কলসী বা কুঁজোতে থাকে বলে প্রচলিত বিশ্বাস। ডালকলাই খাওয়া মানে লোকবিশ্বাসে দেবীর অসন্তোষ বৃদ্ধি ও ব্যাধিকে আমন্ত্রণ জানান।

শীতলাদেবীর পালাগানের আসর বসে গৃহে বা সাধারণী থানে। প্রায় সর্বত্রই শীতলাদেবীর পূজার পরে রাত্রে পালাগানের আসর বসে। ব্যতিক্রমও আছে। কোন কোন স্থলে দেবীর মূর্তিপূজা হয় না, কিন্তু পালাগানের আসর বসে। সেক্ষেত্রে পালাগায়ক প্রথমে পিতলের একটি ঘটি জলে ভরে তাতে সিন্দুর লাগিয়ে 'আমেশ্বর' ঘটি বা ঘটের মুখে দিয়ে নির্দিষ্ট কোন স্থানে স্থাপন করেন। একে 'শীতলার ঘট বসানো' বলে। ঘটের উপর একটি নূতন বস্ত্র, নতুন গামছা দেওয়া হয়। এ দুটি মায়ের উদ্দেশ্যে দেওয়া হলেও গানশেষে গায়কেরই তা পাওনা হয়। ঘট বসানোর পর গায়ক একটি পাথরবাটি বা থালায় কাঁচা দুধ, ডাবের জল, আমসত্ত্ব ও তালমিছরি বেশ ভাল করে মাখিয়ে নেন। এই বস্তুটিকে 'আক' বলে। এই আক মাকে ঠাণ্ডা বা শীতল করার জন্য। গান শেষ হয়ে গেলে 'আক' জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আক বিতরণের আগে গায়ক চামর দিয়ে শীতলার ঘট ও আককে ব্যাজন করে আরাধনা করেন। আসর আরম্ভের পূর্বে এই আচরণীয় অনুষ্ঠান শেষ করে মূল গায়ক আসরে প্রবেশ করেন ও দেবীর বন্দনাদি শুরু করে মূল কাহিনীতে প্রবেশ করেন। মূল কাহিনীকে পালাগায়ক 'জাগরণ' বলেন। যে-বাড়িতে গানপূজা হয় সেই বাড়ির একজন মহিলা উপবাসে থাকেন। তাঁর নামে পূজায় সংকল্প হয়। মানত অনুযায়ী তিনি অনেক ক্ষেত্রে গণ্ডি কাটেন বা বুকচিরে রক্ত মায়ের চরণে দেন, হাতে মাথায় ধুনা পোড়ান।

শীতলার পালাগানের সময়ের কোন নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতামূলক নিয়ম নেই। দেবীর পূজা সাধারণত দুপুর বা বিকেলে হয়। তারপরেই পালাগান শুরু হয়। আবার দিনে পূজা হয়ে গেলে রাত্রে পালাগান হয়। যেক্ষেত্রে দেবীর মূর্তিপূজা হয় পালাগায়ক সেখানে আলাদাভাবে ঘট স্থাপন না করে কেবল আক তৈরি করেন। মূর্তিপূজা না হলে দেবীর 'ঘট স্থাপন' ও 'আক' দুই-ই আচরণ বিধি পালন করেন। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের বাড়িতেই

এই আচরণ পালিত হয়। মুসলমান-সম্প্রদায়েব বাড়িতে অবশ্যই মূর্তিপূজা হয় না, কিন্তু ঘটস্থাপন ও আকগড়া হয়।

শীতলার পালাগানের আসরে মূল গায়ক অনেক সময় শীতলা সাজে সুসজ্জিত হয়ে হাতে ঝাঁটা, কুলো ও কাঁখে কলসী নিয়ে গান করেন। যাঁরা শীতলার সাজ সাজেন না, তাঁরা পুরুষ হলে ধুতি পাঞ্জাবী পরেন, গায়ে ওড়না ফেলে হাতে চামর নিয়ে গান করেন। পালাগায়ক নিজের দলের লোকজন ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে আসর থেকে শ্রোতাদের মধ্য হতে দু-একজনকে ডেকে নিয়ে বিশেষ কোন চরিত্রে সাজিয়ে কথোপকথন ও নাচগান করেন। বিশেষ করে শীতলার পালায় পাটনী চরিত্র প্রায় ক্ষেত্রে শ্রোতা বা দর্শকদের মধ্য থেকে ডেকে নেওয়া হয়। লোকনাট্যের এই রীতি পালাগানের আসরে আনন্দবর্ধনের নূতন মাত্রা যোগ করে। চার-পাঁচ ঘণ্টার এই পালাগান দর্শক বা শ্রোতা হাসি, ঠাট্টা, অশ্রুবিসর্জন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপভোগ করেন।

বসন্ত বোগের কবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের অসহায় মানুষ বসন্তরোগেব দেবী হিসাবে দেবীশীতলার কল্পনা ও পূজা করেছেন এবং বিশেষভাবে মৌখিক বা লিখিতরূপে রচনা করেছেন শীতলার পালাগান। শীতলাকে নিয়ে যে-সব পালাগান রচিত হয়েছে তাদের অধিকাংশের রচয়িতা বা কবি সুন্দরবনঘেঁষা অঞ্চলের অধিবাসী এবং তাঁরা লোকবিশ্বাসকেই অবলম্বন করে শীতলার পালাগানগুলি লোকায়ত ধারায় রচনা করেছেন। এই সব পালাগানে শাস্ত্র পুরাণের প্রভাব কম। লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারই এর মূল ভিত্তি। বলা যায়, শীতলা দেবীর পূজা ও গান বহুলাংশে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। চব্বিশ পরগণার জলাজঙ্গল অধ্যুষিত আর্ত মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারই বিশিষ্ট বাণীরূপ লাভ করেছে আঞ্চলিক লৌকিক দেবীশীতলার পালাগানগুলির মধ্যে। মধ্যযুগের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর রায়মঙ্গলকাব্যের (রায়মঙ্গলের রচনাকাল ১৬৮৬) পরে 'শীতলামঙ্গল' রচনা করেছিলেন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন, কিন্তু শীতলাদেবীর অন্যান্য পালা বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সৃষ্ট বলে মনে হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় চব্বিশ পরগণায় শীতলার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অনেক পালাগান প্রচলিত আছে। যেগুলি স্থানীয় লোককবিগণ কর্তৃক রচিত ও পরিবেশিত হয়। ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে শীতলাদেবীর নিম্নলিখিত পালাগানসমূহ সংগৃহীত হয়েছে—

১। রাজা নহুষের কাহিনী বা ইন্দ্রপালা
২। রাবণরাজার কাহিনী
৩। বিরাটরাজার কাহিনী
৪। চন্দ্রকেতুর কাহিনী।

দেবীশীতলার একএকটি পালাগান একাধিক পালাগায়কের নিকট হতে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য প্রায় এক থাকলেও পরিবেশন পদ্ধতির পরিবর্তন হেতু ও মূল গায়কের সক্রিয়তায় সামগ্রিকভাবে কাহিনীর কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চব্বিশ পরগণার লোকশিল্পীগণ কর্তৃক শীতলার পালাগানগুলি প্রধানত চারটি ধারায়

পরিবেশিত হয়। যথা —

১। পাঁচালিগান ও পাঠের ধারা ২। পালাগানের ধারা

৩। গীতিনাট্যের ধারা ৪। বাদ্যকে দোহার করে একক গানের ধারা।

'পাঁচালিগান ও পাঠ' এই রীতিতে লোকশিল্পীগণ কৃষ্ণরাম দাসের লেখা মূল 'শীতলা-মঙ্গল'কাব্যের বিষয়টি রামায়ণ গানের ঢঙে গান করেন। মূল গায়ক পয়ারের একটি করে অংশ সুর করে বলেন এবং দোহারগণ প্রায় সেই সুরেই তা আবৃত্তি করেন। বারুইপুর থানার নাজিরপুর গ্রামের শ্রী নকুলচন্দ্র গায়েন শীতলাপালাটি উল্লিখিত রীতিতেই গান করেন। একরাতেই পালাটি শেষ হয়ে যায়। এই গানের আসরে শ্রোতাদের নিকট হতে 'প্যালা'[৯] তোলা হয় না।

শীতলা পালাগানের দ্বিতীয় ধারাটি অতিশয় জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত। শীতলা 'পালাগানের ধারা' হল পালাগানের সনাতন রীতি। একে অনেকে 'পাঁচাল' ধারাও বলেন। মূল গায়ক শীতলার গান দোহারদের সহযোগিতায় গেয়ে থাকেন। তিনি শীতলা সেজে গান করেন, অনেক ক্ষেত্রে কোনরকম সাজসজ্জা না করেই গান করেন। দোহারগণ বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে আসরের মাঝখানে চারিদিকে গোল হয়ে বসেন। মূল গায়ক বৃত্তাকার আসরের মাঝখানে অল্প পরিসর জায়গার মধ্যে নাচগান ইত্যাদি করেন। পালাটি একরাত বা দু'রাতেই শেষ হয়ে যায়। বেশির ভাগ গায়ক একরাতেই শেষ করেন। এই ধারার গায়ক ও আসর বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় অধিক দেখা যায়। মূলত মূল গায়ক এই আসরে 'প্যালা' তোলেন।

বর্তমানে শীতলাপালার 'গীতিনাট্যের' রীতি চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেক পালাগানের শিল্পী তাঁদের পালাটিকে গীতিনাট্যের ধারায় সাজিয়ে গান করছেন। এই ধারাটি অনেকখানি 'যাত্রা' ঢঙের। লোকশিল্পীগণ বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী সাজসজ্জা করেন এবং ঘটনা পরম্পরায় আসরে প্রবেশ করে উক্তিপ্রত্যুক্তি বা সংলাপের মাধ্যমে কাহিনীটি উপভোগ্য করে তোলেন। শীতলার পালাটি এই ধারায় গান করলে কমপক্ষে তিন-চাররাত সময় লাগে। শুধু তাই নয়, অনেক চরিত্র থাকায় সাজ-সজ্জায় ইত্যাদিতে আসর পিছু খরচ অনেক বেশি পড়ে। গীতিনাট্যের ধারায় শীতলাগান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অপেক্ষা উত্তর চব্বিশ পরগণায় অনেক বেশি। উত্তর চব্বিশ পরগণার নলকোঁড়া গ্রামের বাসুদেব মণ্ডল, দুলালচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ এই ধারার খ্যাতিমান লোকশিল্পী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আটঘরা গ্রামের গোষ্ঠ মণ্ডল ও ধোপাগাছি গ্রামের দীপক মণ্ডল গীতিনাট্যের ধারায় শীতলাপালা লিখেছেন।

শীতলা পালাগানের চতুর্থ ধারাটিকে 'একক গানের ধারা' বলা হয়। এই ধারায় গায়ক থাকেন একজন। তাঁর কোন দোহার থাকেন না। তবে ৩-৪ জন বাদক যাঁরা হারমোনিয়াম, বাঁশী, খোল, করতাল ইত্যাদি সহ মূল গায়ককে সহযোগিতা করেন। মূল

গায়কের গানের পর বাদকগণ যন্ত্রের সুরে তাঁর দোহারের কাজ করেন। অবশ্য দেখা যায় এই একক গানে ধারার প্রচলন কম। শীতলামঙ্গল ছাড়া অন্য পালাগানও এই নিয়মে অনেক স্থানে গাওয়া হয়। বারুইপুর থানার অন্তর্গত ধোপাগাছি গ্রামের দীপক মণ্ডল এই ধারায় বহু আসর গান করেছেন বলে সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন।

দেবীশীতলাকে নিয়ে যে সমস্ত পালাগান চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত আছে এগুলি স্থানীয় লোককথা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সৃষ্টি হয়েছে। কিছু পালা অবশ্য অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে এই জেলার বিস্তৃত অঞ্চল থেকে নানা প্রকার শীতলার পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। এগুলি স্থানীয় বিভিন্ন লোককবি ও লোকশিল্পীদের দ্বারা রচিত। সংগৃহীত পালাগুলির নাম ও রচয়িতা বা পালাকারগণের নাম এবং পালাগায়কের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল—

শীতলাপালার নাম	পালাগায়ক	রচয়িতা বা পালাকার
১। শ্রীশ্রী শীতলা মাহাত্ম্য (বিরাট রাজার পালা বা চন্দ্রকেতুর পালা)	নিতাই ছাটুই, প্রবোধ ছাটুই (সীতাকুণ্ডু), বারুইপুর	দ্বিজপদ মণ্ডল (সীতাকুণ্ডু)
২। শীতলার গান (পালা)	বসন্তকুমার গায়েন (৭০), মোকিমপুর, দঃ ২৪ পরগণা	দ্বিজমাধব ও নিত্যানন্দ
৩। রাজা নহুষের কাহিনী বা ইন্দ্রপালা	সুদিন মণ্ডল ও অনিল হাজরা	সুদিন মণ্ডল
৪। রাবণরাজার কাহিনী	বলরাম জানা (দিঘিরপাড়)	অনির্দিষ্ট
৫। বিরাটরাজার কাহিনী	শশধর মহিষ, সুদিন মণ্ডল, অনিল হাজরা প্রমুখ।	ঐ
৬। চন্দ্রকেতুর কাহিনী	সুদিন মণ্ডল	দ্বিজপদ মণ্ডল
৭। শীতলামঙ্গল (লোকনাট্যের ধারা)	গোষ্ঠ মণ্ডল (আটঘরা)	গোষ্ঠ মণ্ডল
৮। শীতলামঙ্গল (লোকনাট্যের ধারা)	দীপক মণ্ডল (ধোপাগাছি)	দীপক মণ্ডল

উপর্যুক্ত পালাগানগুলি চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন লোকশিল্পী পরিবেশন করেন। সাধারণত পালাগান হিসাবে অথবা লোকনাট্যের ধারায় শীতলার কাহিনী পরিবেশিত হয়। তবে যে বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয় তা হল শীতলার পূজা বা মাহাত্ম্য প্রচারমূলক ঐ সমস্ত পালার মূল কাহিনী বিভিন্ন শিল্পীর নিকট এক হলেও পরিবেশন পদ্ধতি বা মূল কাহিনীর আনুষঙ্গিক ঘটনা ও কথোপকথন এক নয়। প্রত্যেকেই নিজের মত করে কাহিনী

সাজিয়ে পালা পরিবেশন করেন। হাস্যরস পরিবেশনের রীতিনীতিতে দল বিশেষে বিশেষত্ব থাকে। মোটের উপর স্থানীয় প্রভাব অতিশয় প্রকট। যে পালাগুলির রচয়িতা পাওয়া যায়নি সেগুলি মুখ্যত লোকসাহিত্যের মৌখিক ধারার সাহিত্য তথা Oral Literature-এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন এবং এই পালাগানগুলি লোকসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও অনির্দিষ্ট রচয়িতার Unanimity-এর সাক্ষ্য বহন করে। কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীতে (সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত) যে 'শীতলামঙ্গল' নামক রচনাটি আছে তা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণরাম দাসের কিনা সে বিষয়ে সম্পাদক সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দ্বিজপদ মণ্ডলের 'শ্রী শ্রী শীতলা মাহাত্ম্য' নামক রচনাটি লোককথার আশ্রয়ে রচিত বলে মনে হয়। সুদিন মণ্ডল প্রমুখ পালাগায়কগণ এটি 'চন্দ্রকেতুর পালা' বলে গান করেন। দ্বিজপদ মণ্ডল পালাটি বিরাটরাজার নাম দিয়ে লিখেছেন কিন্তু মূল বিরাটরাজার কাহিনীর সঙ্গে এর কোন মিল নেই। বিরাট রাজার নামের পরিবর্তে চন্দ্রকেতু নামটি বসিয়ে দিলে প্রকৃতপক্ষে এটি চন্দ্রকেতুর পালা হয়ে যায়। প্রকৃত বিরাটরাজার কাহিনীটি শীতলামঙ্গল নাটকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে মৎস্যাধিপতি বিরাটরাজা, রাণী সুদেষ্ণা, শ্যালক কিচক ইত্যাদি চরিত্র আছে। পালাগায়ক বসন্তকুমার গায়েনের 'শীতলার গান' পালায় কৃষ্ণরাম দাসের কাহিনীর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। দেবীশীতলার সংগৃহীত পালাগান ছাড়া বিভিন্ন গায়কের আসরে উপস্থিত থাকার সুবাদে যা প্রত্যক্ষ করা গেছে তা হল তাঁরা প্রত্যেকেই বিরাটরাজার কাহিনী পরিবেশন করেছেন। প্রতিটি আসরে লক্ষ্য করা গেছে তাঁদের কাহিনীর মূল বক্তব্য বিরাটরাজা কর্তৃক শীতলাদেবীর পূজা প্রচার অর্থাৎ মূল কাঠামোর মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু সংলাপসমূহ পৃথক। লোকশিল্পীগণ নিজের মত করে পালাগুলি সাজিয়েছেন। ফলে প্রতিটি দলের পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। ক্ষেত্রগবেষণায় যে-সমস্ত পালা সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত চারটি পালার নমুনা দেওয়া হল। প্রথম পালাটি ইন্দ্রপালা নামে পরিচিত। এই পালায় দেবীশীতলার জন্ম, সহচর, সহচরী লাভ ও দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক শীতলাদেবীর পূজা প্রচারের কথা আছে। এই পালাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অনিলকুমার হাজরা, সুদিন মণ্ডল, প্রবোধ ছাটুই, সনাতন মণ্ডল, জ্যোতিষ কয়াল প্রমুখ পালাগায়কগণ গান করেন। পালাটির প্রকৃত লেখক কে তা জানা যায় না। এটিই চব্বিশ পরগণার প্রচলিত লোককথা অবলম্বনে সৃষ্টি বলে কথিত হয়। দ্বিতীয় পালাটি হল 'রাবণরাজার পালা'। এই পালাটিতে রাবণরাজা কর্তৃক শীতলার পূজা প্রচারের কাহিনী আছে। এটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রায়দীঘি থানার দীঘিরপাড় গ্রামের বলরাম জানার নিকট হতে সংগৃহীত। কাহিনীটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে লিখিত হল। তিনি পালাটি ৩-৪ ঘণ্টা ধরে পরিবেশন করেন বলে সাক্ষাতকারে জানান। তৃতীয় পালাটি হল 'চন্দ্রকেতুর পালা'। এটির লেখক বারুইপুর থানার সীতাকুণ্ডু গ্রামের দ্বিজপদ মণ্ডল। তিনি এটি বিরাটরাজার নাম দিয়ে লিখেছেন। সুদিন মণ্ডল পালাটি 'চন্দ্রকেতুর পালা' এই নামে গান করেন। দ্বিজপদ মণ্ডল সুদিন মণ্ডল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। দ্বিজপদ মণ্ডলের হাতের লেখা খাতা সংগৃহীত হয়েছে। পালাটি

এই অঞ্চলের অনেক পালাগায়ক গান করেন। চতুর্থ পালাটি 'শীতলার গান বা বিরাটরাজার পালা'। এটি বিষ্ণুপুর থানার মোকিমপুর গ্রামের বসন্তকুমার গায়েন (৭০)-এর নিকট হতে সংগৃহীত। এটি শীতলার একটি পূর্ণাঙ্গ পালাগান বলে বিবেচিত হয়। পালাটি খুবই জনপ্রিয়। সংগ্রহীত অন্যান্য বিরাটরাজার কাহিনীর সাথে এ পালার যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। উল্লেখ্য শীতলাপালার পালাগানের ধারা উত্তর চব্বিশ পরগণা অপেক্ষা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতে অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়। সম্ভবত এই ধারার রচয়িতা ও শিল্পী এই অঞ্চলে বেশি থাকার সুবাদে পালাগানের ধারাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

রাজা নহুষের কাহিনী বা ইন্দ্রপালা

(কাহিনী সংক্ষেপ)

সন্তানহীন নহুষরাজন সন্তান কামনায় মুনিঋষিগণকে ডেকে যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজার ইচ্ছানুয়ায়ী তাঁরা রাজাকে যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। রাজা বিধিমত যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করলেন। যথাযোগ্যভাবে যজ্ঞ আরম্ভ হল। যজ্ঞ শেষে যজ্ঞকুণ্ডে শত কলসী শান্তিবারি ঢালা হল। তখন—

সবিস্ময়ে দেখে সবাই কুণ্ডের ভিতর।
দিব্যজ্যোতি কন্যা হল তাহার ভিতর।।
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহিরে আসিল।
ধন্য রাজা নহুষ বলে সকলে স্তবিল।।

দিব্যজ্যোতি কন্যা দেখে রাজা অতিশয় আনন্দচিত্ত হয়ে তাঁকে আপন কন্যারূপে বরণ করে নিলেন। সবিস্ময়ে সবাই তাঁদের ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। যজ্ঞকন্যা যজ্ঞকুণ্ড হতে বেরিয়ে এসে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন কারণ তখনও তাঁর কোন পরিচয় নেই, মাহাত্ম্য নেই।

শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা মধুর বচনে কয়।
যজ্ঞের শীতল কালে জন্ম তোমার হয়।।
সেইহেতু তোমার নাম শীতলা রহিবে।
স্বর্গ মর্ত্যে দেব নর তোমায় পুজিবে।।

ব্রহ্মা আরও বললেন শীতলা যেখানে যাবেন সেখানে মটর, মুসুরী ডাল সহ বিবিধ উপচারে তিনি পূজা পাবেন। এতে দেবী শীতলা খুশি হলেন না। তাঁর দোসর চাই। কারণ নিজে সব কাজ করা সম্ভব নয়। তখন ব্রহ্মা দেবীর মনোভাব জানতে পেরে কৈলাসে মহেশ্বরের নিকট পাঠালেন।

গান॥ নাচতে নাচতে চলে মাতা কৈলাস শিখরে গো
ব্রহ্মার কথা শুনে মাতা আনন্দিত হয় গো

কৈলাসেতে গিয়ে মাতা দোসর চেয়ে নেবে গো
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরেই হবে গো।

কৈলাসেতে গিয়ে শীতলা ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরের স্তব করতে মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ হল। তাঁর পরিচয় সবিশেষ জেনে পুনরায় ধ্যানে বসলেন। তখন তাঁর ললাটের ঘাম ভূমে পড়ে এক বিশাল দৈত্যের জন্ম হল।

ধোয়া॥ তাহার ভারেতে ধরা করে টলমল। দেখিয়া দেবগণ ভয়েতে বিকল ও তার......

কথা॥ অসুর তখন জোড় হাত করে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন ও বললেন, কেন তাঁর জন্ম দিলেন? অসুরের আকার প্রকার ও তার সর্ব-বিধ্বংসী ক্ষুধা দেখে মহাদেব ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন অসুরকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর বলে বৈকুণ্ঠে মহাবিষ্ণুর নিকট গিয়ে সমস্ত বিবরণ জানালেন। বিপদ বুঝে হরি তখন সুদর্শনচক্র ছেড়ে তিনখণ্ড করে ফেলেন অসুরের দেহ। এই সংবাদ শুনে ব্রহ্মা ছুটে এলেন এবং তাঁর কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে তিনখণ্ড জোড়া দিয়ে অসুরকে বাঁচিয়ে দিলেন। তখন তিনটি দেহ জুড়ে এক হওয়ায় আরো এক অদ্ভুত চেহারা হলো অসুরের।

ছয় চক্ষু ছয় হাত ছয় পদে যায়।
তিনখণ্ড তিনশির কে শুনেছে কোথায়।।
এই দেখে বিধাতার আনন্দিত মন।
জ্বরাসুর নাম দিলেন তাহারই কারণ।।

জোড়হাত করে জ্বরাসুর আবার মহাদেবের নিকট তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে চান। তখন ভোলানাথ তাঁকে শীতলার দোসররূপে থাকতে বলেন।

শীতলা বলিবে যাহা তাহাই করিবে
নরলোকে তোমা দোঁহে ভক্তিতে পূজিবে।।

দোসর পেয়ে মাতা শীতলা মহাদেবের নিকট জানালেন যে, তিনি আগে স্বর্গের দেবতাদের নিকট তাঁর পূজাপ্রচার করে মর্ত্যে নরের পূজা নেবেন। মহাদেব সেই বরদান করে প্রথমে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের নিকট পাঠালেন। শীতলা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে ইন্দ্রপুরে জ্বরাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি জ্বরাকে পাঁচ বছরের শিশু করে কাছে নিলেন। তার মাথায় দিলেন কলাইয়ের বোঝা। স্বর্গের পথ ধরে উভয়ে যখন যাচ্ছেন তখন দেবরাজ ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত সেই পথ দিয়ে আসছেন। তাকে দেখে একটু দূরে জ্বরা কলাইয়ের বোঝা ফেলে দিলেন। জয়ন্ত নিকটে এলে বোঝাটি তুলে দিতে বললেন। জয়ন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের ছেলে বলে কথা —তিনি বোঝা তুলে দিতে ঘৃণা বোধ করলেন, কিন্তু বুড়ি খুব পীড়াপীড়ি করতে জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে কটুকথা বলেন এবং

ধোয়া॥ ঘাড় ধাক্কা মেরে মাকে ফেলে দিয়েছিল, আর ঘাড় ধাক্কা
খেয়ে মাতা হাসিতে লাগিল গো— দিন গেল পারে চল।

তখন মা শীতলা জীর্ণ বসন শীর্ণ গাত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গেলে ইন্দ্র বুড়িকে এই

অবস্থায় দেখে দুর দুর করে তাড়িয়ে দিলেন। ইন্দ্রের ব্যবহারে মা আরো কুপিতা হয়ে জ্বরাকে ডেকে জয়ন্তর গায়ে ডুবুরে বসন্ত ছেড়ে দিতে বললেন।

জ্বরেতে জয়ন্ত তখন শয্যাশায়ী হল।
একে একে যত দেব দেখিতে আসিল।।
চন্দ্র সূর্য বরুণ পবন আর হুতাশন।
কার্ত্তিক গণেশ আইল করিতে দরশন।।

জয়ন্তর এই অবস্থা দেখে সমস্ত দেবগণ বুঝতে পারলেন এটি সেই বুড়ির কারসাজি। তখন সবাই বুড়িকে গালাগালি করতে লাগলেন। মাতা শীতলা এতে আরো বিরক্ত হয়ে কার্তিক, গণেশ ও অন্যান্য দেবতার গায়ে ব্যাধি ছেড়ে দিলেন। কার্তিক, গণেশ তখন জ্বরে বিঘোর হয় ও বসন্তরোগের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে পার্বতী মহাদেবের নিকট এর রহস্য জানতে পারলেন। গৌরীদেবী ও মহেশ্বর ইন্দ্রের সভায় এসে ইন্দ্রকে শীতলাপূজা করতে বললেন। মহাদেবের কথা শুনে যত দেবগণ ভক্তিভাবে মা শীতলার পূজা করলেন এবং সমস্ত দেবতা ব্যাধিমুক্ত হলেন।

(কাহিনী সমাপ্ত)

রাবণরাজার পালা

(কাহিনী সংক্ষেপ)

রাবণরাজা স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে স্বর্গরাজ্যের দেবকন্যাদের ধরে এনে বিয়ে করতে লাগলেন। এমনি এক দেবকন্যা হলেন আগমনী। তাঁকে তিনি টানতে টানতে আনছেন, এমনসময় স্বর্গরাজ্যে মা শীতলা দাসী রক্তাবতীকে নিয়ে বসে আছেন আর ভাবছেন যদি রাবণরাজা আমার দাসী রক্তাকে ধরে নিয়ে বিয়ে করে তাহলে তো আমি বড়ই মুশকিলে পড়ব। তাছাড়া দেবকন্যাদের ধরে অসুর রাক্ষসরাজ রাবণ বিয়ে করবে এটা সমীচীন নয়; রাবণরাজাকে এই কর্ম থেকে বিরত করতে হবে। সে কারণে তিনি নিজেই সুন্দরী কন্যার রূপ ধারণ করে রাবণরাজার রাজদরবারের সামনে নূপুর পরে রুনুঝুনু শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনসময় রাবণরাজার লোকজন এই দৃশ্য দেখে রাজাকে সংবাদ দেন। রাবণরাজা এই সংবাদ শুনে ঐ সুন্দরী নারীকে দেখবার জন্য বাইরে এলেন এবং তাঁর রূপে মোহিত হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ছদ্মবেশী দেবীশীতলা রাবণরাজার প্রস্তাব শর্ত সাপেক্ষে স্বীকার করলেন যে-রাবণের সাথে তাঁর যুদ্ধ হবে, যুদ্ধে রাবণ জয়লাভ করলে তবেই তাঁকে শীতলা বিয়ে করবেন। নতুবা তিনি এই স্থান ত্যাগ করবেন। রাবণরাজা এই প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শীতলাদেবী তিনদিন সময় নিলেন। তিনদিনের দিন শীতলাদেবী পুত্র জ্বরাসুরকে ডেকে রাবণরাজা ও তাঁর লোক লস্করকে জ্বরে বিঘোর করে দিলেন। তাঁরা কেউ প্রাসাদ ছেড়ে বের হতে পারলেন না। এমনসময় ছদ্মবেশিনী শীতলা রাবণরাজার বাড়ির সামনে এসে রাবণরাজার নাম ধরে

চিৎকার করে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন, কিন্তু কেউ বের হলেন না। তখন রাবণরাজা খবর পাঠালেন আরো তিনদিন পরে তিনি যুদ্ধ করবেন। আজ ঐ রমণী যেন ফিরে যান। এইকথা শুনে শীতলা যেমনই ফিরে এলেন অমনি রাজার লোক লস্করের জ্বর ভালো হয়ে গেল। আবার তিনদিনের দিন একই পদ্ধতিতে রাজার ও তাঁর লোক লস্করের দেহে জ্বর দিলেন। শীতলা রাজাকে ডেকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। আবার রাবণ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই দুর্গার মন্দিরে গিয়ে শক্তিমাতার পূজা করে মনের কথা জানালেন যে, কেন তিনি ঐ রমণীর সাথে যুদ্ধ করতে পারছেন না ও তাঁকে কাছে পাচ্ছেন না। এমন বলার পর রাবণ দেবীর দিকে তাকাতে দেখেন দেবীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখন রাবণ তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে দেবী বলেন, দেখ পুত্র, আমার একশ আটটি রূপের মধ্যে শীতলা অন্যতম রূপ। সাতশত উনপঞ্চাশজন রমণীকে বিয়ে করেছিস, এই পর্যন্ত তুই থাম। তখন রাবণরাজা দেবীর পদ জড়িয়ে ধরে নিজের অপরাধ মার্জনা করতে বলেন, দেবী তাঁকে ক্ষমা করেন ও তাঁকে সাতশত পঞ্চাশতম বিবাহ করতে নিষেধ করেন। আর বলেন রাক্ষসকুলে দেবীশীতলার পূজা করতে। সেই থেকে রাবণরাজা ত্রেতাযুগে প্রথম মর্ত্যে দেবীশীতলার পূজা করেন। শীতলা, তাঁর স্বামী ঘণ্টাকর্ণ, পুত্র জ্বরাসুর ও দাসী রক্তাবতী এসে রাবণরাজার সামনে দাঁড়ালে রাবণরাজা ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে নানান উপচারে দেবীর পূজা করেন।

গীত॥ দয়াময়ী মাগো তুমি তোমার দয়ার নেই তুলনা
দয়াময়ী নামটি তোমার কেন মিছে এ ছলনা। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

এই পালাটি বলরাম জানা আসরে দুই-তিন ঘণ্টা ধরে গান করেন। এই পালার মাঝে তিনি ঘটনা উপযোগী বিভিন্ন গান গেয়ে পালাটি হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন।

চন্দ্রকেতুর পালা

সর্ব দেবদেবীর বন্দনা

করিয়া ভকতি স্তুতি বন্দি প্রভু গণপতি
পরম পুরুষ পরাৎপর।
স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরম সুন্দর।।
হোম যোগ যাগে তোমার অর্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ।
স্বর্গ রসাতল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্ন রাজ।।
শিব বোবোম বোম গিরি সুতা প্রিয়তম
বৃষভ বাহন জটাধারী।

সূর্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ধারণ ত্রিপুরারি।।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হেম কর শেখর শঙ্কর।
দিও মোরে পদাশ্রয়, শম্ভু শিব দয়াময়
দানব দলন মহেশ্বর।।
বন্দি লক্ষ্মী মহামায়া দেহ মোরে পদচ্ছায়া
দয়াময়ী লক্ষ্মী নারায়ণী।
তুমি শান্তি তুমি প্রাণ তুমি শক্তি তুমি মান
তুমি মাগো ত্রিলোক নাশিনী।।
বন্দি দেবী সরস্বতী. আমি অতি ক্ষুদ্র মতি
তব গুণ কে করে প্রকাশ।
তুমি বেদ তুমি তন্ত্র তুমি বিনা যন্ত্র মন্ত্র
শ্বেত সরস্বতী শ্বেত বাস।।
বন্দি দুর্গা মহামায়া কে বুঝিবে তব মায়া
দশ মহাবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
অকালে পাইয়া পূজা উদ্ধারিলে রাবণ রাজা
যার দম্ভে কাঁপে সুরপুরী।।

গীত ।। কোথা মা শীতলা জুড়াও ভব জ্বালা
লীলাময়ীর লীলা কে জানে।
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি
প্রণতি করি তব চরণে।।
তুমি এস শীঘ্র গতি হৃদে জাগো দয়াবতী
আসরেতে রেখে মোর মান।
তোমার লীলার নাই মা অন্ত, তুমি অসীম হও অনন্ত
অন্তিম সময় কৃপাময়ী কর কৃপাদান।

পয়ার ।। হামদাম বসন্ত আদি তোমার ইঙ্গিতে।
তুমি যারে হও বাম (তারে) কে পারে রক্ষিতে।।
একদিন মা শীতলাদেবী সখি সন্নিধানে।
ধীরে ধীরে কহে কথা মধুর বচনে।।
শুন শুন ওগো সখি আমার বচন।
সবিশেষ বলি কথা শুন দিয়ে মন।।
হামদাম বসন্ত আদি যত ব্যাধি আছে।
পুত্রসম স্নেহ করি রাখি সদা কাছে।।

যখন ব্যাধি ক্ষিপ্ত হয়ে করয়ে ভ্রমণ।
আমি তার পিছু গিয়ে করি নিবারণ।।
ব্যাধির জ্বালায় জীব ছটফট করে।
শীতলা নাম ধরি আমি দিই শীতল করে।।
কিন্তু আমারে শীতল করে নাহি হেন জন।
যাও সখি ত্বরায় ধরায় করহ গমন।।
ভক্তিভাবে সবে পূজা করে যেন মোরে।
মঙ্গল হইবে সদা তাহার সংসারে।।
ষোড়শ উপচারে পূজা যেবা করিবে।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ তাহার হইবে।।
গঙ্গাজল বিল্বদল পুষ্প মনোনীত।
ফলমূল উপকরণ যা হয় বিহিত।।
এই ধরাতে দাস দ্বিজপদ কয়।

ধোয়া ॥ কোথা মা শীতলা জুড়াও ভব জ্বালা
যাও যাও সখি আর বিলম্ব কোরো না
ধরা মাঝে আমার পূজার করে দাও যোজনা।

গীত ॥ যাও যাও যাও সখি যাও তুমি ত্বরা করে
আমার পূজার কথা বলে দেওগে সর্ব নরে
যে জন আমায় পূজিবে তাহার মঙ্গল হবে
দ্বারা পুত্র সুখে রবে আপদ বালাই যাবে দূরে
আমি যে বসন্তমাতা জানেন সকল দেবতা
যে করে আমায় অন্যথা তার রক্ষা নাই সংসারে।

কথা।। যাও সখি, তুমি আর বিলম্ব কোরো না। আমাদের পূজার কথা সকলকে জানিয়ে দাও। তারা যেন সত্বরে আমার এবং হামদাম বসন্ত আদি ব্যাধিগণের পূজা দিয়ে শান্ত করে। নতুবা ধরা মাঝে খুব অমঙ্গল হবে।

প্রণাম করিয়া সখি মায়ের চরণে; ধরামাঝে যায় সখি আনন্দিত মনে।
বৃদ্ধা এক ব্রাহ্মণী হয়ে নড়ি লয়ে করে; শুভ্র বস্ত্র শুভ্রকেশ চলে ধীরে ধীরে।
মৎস রাজ্যে ছিল রাজা বিরাট রাজন, তাহার দুয়ারে গিয়ে দিল দরশন।
দ্বারেতে প্রহরী ছিল কহিল তাহারে, রাজার কাছে যাব দ্বারী দেও দ্বার ছেড়ে।

সখি ঃ দেখ দ্বারী, তুমি দ্বার ছেড়ে দেও, আমি তোমাদের রাজার কাছে যাব।

দ্বারী ঃ কোথাকার বুড়ি তুমি হে বাপু, রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? আমরা কি এখানে বসে ঘাস কাটব?

সখি : তোমরা ঘাস কাটবে কেন?

দ্বারী : ঘাস কাটব না তো আর কি করব। যেও-সেও যখন তখন যদি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে তাহলে আমাদের আর দরজায় থাকবার দরকার কি?

অন্যদ্বারী : তেমার কি নাম? কোথায় ঘর? কি কারণে দেখা করবে? এই সমস্ত লিখে রাজদরবারে একটি দরখাস্ত কর। তারপর রাজামশাই দেখে শুনে একটা সময় করে ডাকবেন। তবে তুমি দেখা করতে পারবে। তা না হয় তুমি বাপু দুটো ভিক্ষে টিক্ষে নিয়ে চলে যাও।

সখি : আমি বাপু ভিক্ষে করতে আসিনি। আমি তোমাদের ভালো করতে এসেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলে যাবো, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।

দ্বারী : মঙ্গল হোক আর যাই হোক, তাঁর বিনা হুকুমেতে দ্বার ছাড়তে পারি নে। তবে যদি তুমি একান্ত দেখা করতে চাও, কিছু খরচা টরচা কর একবার চেষ্টা চরিত্র করে দেখি।

সখি : ও বুঝেছি, তোমরা কিছু ঘুষ চাও। ঘুষ দিলে তবে তুমি দ্বার ছাড়বে এই তো?

দ্বারী : চুপ, চুপ, চুপ অমন কথা আর মুখে এনো না। ঘুষের কথা শুনলে আমার মাথাটা যাবে, নয়তো জন্মের মতন আমার চাকরির জবাব হয়ে যাবে। এ বড় শক্ত রাজা। স্বাধীন দেশ, একটি পয়সা ঘুষ চলবে না।

সখি : তবে তুমি আমার খরচ করবার কথা বলছ?

দ্বারী : এই আর বুঝতে পারছ না, চা-টা, পান-বিড়ি খাবার জন্যে দু'একটি টাকা আমাকে দিলে আমি খেটে খুটে যেকোন রকমে রাজার সঙ্গে তোমাকে দেখা করিয়ে দিতে পারি। নইলে সুদি সুদি হবে না।

সখি : এই বলছ ঘুষ নেবার উপায় নেই। আমাদের স্বাধীন রাজ্য ...

দ্বারী : আরে বাপু, এরে কি আর ঘুষ বলে? যাওনা, তুমি চুরি কর ডাকাতি কর, খুন কর আর দু'পাঁচশ টাকা ছাড়, একবারে বেকসুর খালাস।

সখি : আমার কাছে এক কড়া পর্যন্ত নেই, তুমি রাজার কাছে যেতে দেবে কি না বল?

দ্বারী : তা কেমন করে হয়, কিছু না দিলে —

সখি : তবে আমি ফিরে যাই। দেখি রাস্তায় লোকদের জিজ্ঞেস করে, এ দেশের রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে নাকি ঘুষ দিতে হয়। (যেতে উদ্যত)

দ্বারী : এই আমার মাথাটা খেয়েছে। থাম, থাম, ফিরে যেতে হবে না। এইখানে বসো। আমি রাজামশাইকে জিজ্ঞেস করে আসি। মেয়েছেলে তুমি তো বাছা। কিছু বোঝ না।

সখি : না বাছা, আমি আর কি করে বুঝব, বুড়ো হয়ে পড়েছি।

কথা।। ব্রাহ্মণীকে রেখে দ্বারী হইল বিদায়, রাজার নিকটে গিয়ে উপনীত হয়। জোড় হাত করে দ্বারী এই কথা কয়—

দ্বারী : মহারাজ, ব্রাহ্মণী দরজায় এসে বসে আছেন।

রাজা : তুমি বাপু দুটি ভিক্ষেটিক্ষে দিয়ে একবার বিদায় করে দিতে পারলে না?

দ্বারী ঃ তিনি কিছু ভিক্ষা নিতে চান না। কেবল আপনার সাথে দেখা করতে চান।

রাজা ঃ যাও, তাকে তুমি এখানে নিয়ে এস।

কথা।। এই কথা শুনে দ্বারী হইল বিদায়, ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে নিয়ে উপনীত হয়। ব্রাহ্মণীকে দেখে রাজা এই কথা কয়—

কোথা ধাম, কিবা নাম কিসেরই কারণ, কি নিমিত্ত আসিয়াছ কহ বিবরণ।
শুনিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী কহিছেন তখন, কি কারণে আসিয়াছি শুন হে রাজন।
সুদূর প্রদেশে ঘর আমি শীতলা কিঙ্করী, অদ্য রজনীতে আমি স্বপনে যা হেরি।
তোমার রাজ্যতে বড় হবে অরাজক, বসন্তরোগেতে মৃত্যু হবে বহু লোক।
গরু,বাছুর, হাতি, ঘোড়া জীবজন্তু যত, প্রজাপুঞ্জ পাত্রমিত্র আর দারা সুত।
শ্মশানের সম রাজ্য হইবে নিশ্চয়, সময় থাকিতে সাবধান হও মহাশয়।
শীতলামায়ের শীতল করহে রাজন, হামদাম বসন্তরোগ হবে নিবারণ।

ধোয়া।। এখন শীতলামায়ের পূজা কর মহাশয়, সকল আপদ যাবে দূরে, কহিলাম নিশ্চয়।
এই কথা বলে সখি হইল বিদায়, মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা ধীরে ধীরে কয়।

দেখ মন্ত্রী, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কথা শুনে আমার মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠছে। এখন কি করা কর্তব্য একটা স্থির কর।

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, সামান্য এক বুড়ির কথা শুনে অত ব্যস্ত হবেন না। এই দুর্বৎসর, অন্নের অভাবে কে কতরকম ছল করে আসছে, যাঁর বাড়িতে নিত্য শিবপূজা, নারায়ণপূজা অতিথিসেবা হয়, তাঁর বাড়ি নাকি অমঙ্গল হবে। ওসব মিথ্যা কথা মহারাজ।

কথা।। মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা দিল সায়। সভা করে সবে হইল বিদায়।
সেই দিন রাজা নিশিযোগে দেখিল স্বপন, বিভীষিকাময় কিছু দেখে অচেতন।
চেতন হইয়া রাজা রাণীকে ডাকিল, সবিশেষ স্বপ্নের কথা কহিতে লাগিল।

ধোয়া।। স্বপনের কথা শুনে রাণী শিহরিয়া উঠে, বলে হায়রে দারুণ বিধি কপালে কি ঘটে।

হায় হায় বলে রাণী পড়িল ধরায়, হেন অমঙ্গল স্বপন দেখে কে কোথায়।
বলিতে কহিতে নিশি প্রভাত হইল, পাত্র মন্ত্রী ডেকে রাজা কহিতে লাগিল।
কি আর কহিব মন্ত্রী বিভীষিকাময়, স্বপন হেরিয়া আমার বিদরে হৃদয়।
অকস্মাৎ উঠে ঝড় গগনমণ্ডলে, মেঘেতে আবৃত বজ্র পড়িছে ভূতলে।
ভাঙ্গে ঘর অট্টালিকা কুলীশ পাতনে, মরে কত পশুপক্ষী তাহার কারণে।
গভীর গর্জনে মেঘ কাঁপাইছে ধরা, প্রসূতির কোলে শিশু কত যায়গো মারা।
হায় হায় করে কাঁদে যতেক রমণী, বজ্রের আঘাতে মরে অসংখ্য প্রাণী।
হেনকালে ভূমিকম্পে মেদিনী ফাটিল, জলমগ্ন হয়ে ভগ্ন বৃক্ষাদি ডুবিল।

ভাঙে কত ঘরবাড়ী মরে হাতি ঘোড়া, অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে মন্দিরের চূড়া।
দেখে প্রাণ হয় অধৈর্য শ্মশান হয় রাজ্য, দারা পুত্র সবই মল কি করিলাম কার্য।
আমার বলে আর কিছু রহে নাই, পুড়ে ভস্ম হল চতুর্দিকে ছাই।

রাজা : বল বল মন্ত্রী, কি উপায় করি। সেই স্বপ্নের কথা মনে হলে আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। শীঘ্র শীঘ্র এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করে ফেল।

গীত ॥ কি হবে উপায় মন্ত্রী ভেবে বাঁচিনে
স্বপন হেরিয়া আমার আতঙ্ক হতেছে প্রাণে
বিভীষিকাময় স্বপন হেরি বিদরে জীবন
প্রসূতির কোলে পুত্রধন মরে বজ্র হুতাশন
ভূমিকম্পে কাঁপে ধরা, ভাঙ্গিল মন্দিরের চূড়া
প্রজ্বলিত হুতাশনে মরে কত হাতি ঘোড়া।।

মন্ত্রী : মহারাজ, অত চিন্তা করবেন না। আপনি এই যে সমস্ত স্বপ্ন দেখেছেন এর কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। সেই যে একদিন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এসে কতগুলি আবোল তাবোল বলে আপনাকে ভয় দেখিয়ে গেছে সেইদিন হতে আপনি ঐ নিয়ে চিন্তা করে-করে মনটাকে দুর্বল করে ফেলেছেন এবং তার দ্বারায় বায়ু বৃদ্ধি হয়ে ঐ স্বপ্নের উদ্ভব হয়েছে। ওর জন্যে অত চিন্তা করবেন না। আর যদিও আপনার সন্দেহ থাকে তবে এক কাজ করুন — কথায় বলে দানে দুর্গতি খণ্ডে, একটু হোম সস্তেন দিয়ে দু-চারজন বামনবোষ্টম খাইয়ে দিন, সবদিকে মঙ্গল হবে।

রাজা : ঠিক বলেছ মন্ত্রী, এ যুক্তি মন্দ নয়। আজই এর ব্যবস্থা করে ফেল। আজ দিন ভাল আছে।

মন্ত্রী : যে আজ্ঞে মহারাজ। এক্ষুণি আমি এর ব্যবস্থা করছি।

পয়ার ॥ এই রূপে সেইদিন মন্ত্রণা করিল।
বামন পুরুত কত ডাকিয়া আনিল।।
কেহবা হইল হোতা কেহ বা পূজারী।
কেহ করে চণ্ডীপাঠ বাদ্য ঘণ্টা নাড়ি।।
কেহ বা জ্বালিয়া বাতি আরতি করিল।
কেহ কেহ হোমকুণ্ডে ঘৃত ঢালি দিল।।
কেহ বাঁধে লুচির বোঝা কেহ বসে খায়।
কেহ বলে খানিক দই দেওত আমায়।।
এই রূপে সস্তেন আদি সমাপ্ত হইল।
সখিরে ডাকিয়া দেবী কহিতে লাগিল।।

শীতলা ঃ কই সখি, তুমি যে আমার পূজার ঘোষণা করতে গেলে, সে তো বহুদিন হয়ে গেল, কেউ তো কোন সাড়া দিল না।

সখি ঃ সাড়া আর কেউ দেবে না মনে হয়। ধরার ধারা সব বদলে গেছে। পৌরাণিক প্রথা আর কিছুই নেই। অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রায় সব বন্ধ। কেবল দেখা যায় সর্বজনীন দুর্গা ও সরস্বতী হাটে ঘাটে মাঠে, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় সর্বত্র আড়ম্বরের সীমা নেই। তার উপর আবার রেডিওতে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়েছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি গেল আর কি। শুধু ব্রাহ্মণের কেন ঐ সঙ্গে মোল্লা মৌলবীদেরও বৃত্তি যায়। কলমা পড়া এবং আজানদেওয়া রেডিওতে বেশ চলছে, এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা— ধরা মাঝে অনাচার ব্যাভিচার অত্যেচার অবিচার খুব জমেছে। তৃতীয় কথা— অন্যায়ের বিচার নেই, দুষ্টের দমন নেই, পয়সা হলে সাত খুন মাপ। আর কি বলব মা। কে হিন্দু, কে মুসলমান কিছুই চেনা যায় না। এক স্থানে গিয়ে যা দেখলাম তা আর বলার নয়। খুব বড় দুতলা বাড়ি, সদরে একটি বৈঠকখানা। সেখানে চেয়ারে বসে একজন খবরের কাগজ পড়ছে। মাথায় এক গোছা শিখে, গলায় চকচকে মোটা পৈতে। এমন সময় দেখি বাড়ির মধ্য হতে একদল যুবক বেরিয়ে এল, তাদের পরনে লুঙ্গি। পরে একঝাঁক মুরগীর চিৎকার শুনে আমি অবাক। এমনসময় একজন বৃদ্ধলোক আমার সামনে এসে পড়লে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম— এটা কিলোকের বাড়ি? লোকটি তো আমার উপর রেগে চক্ষু লাল করে বলে—জান না এটা রামব্রহ্ম ভট্টাচার্যের বাড়ি। টোলের বড় পণ্ডিত। ঐ তো কর্তা বসে আছেন—গলায় পৈতে ঝুলছে দেখছ না? আমিবললুম তবে বাড়ির ভেতর থেকে লুঙ্গি পরে কারা একদল বেরিয়ে এল—ওরা কি কর্তার ছেলে? বুদ্ধ বললে তা আবার কারা? আমি তো শুনে অবাক। আবার জিজ্ঞেস কল্লুম, "ব্রাহ্মণ কি মুরগি পোষে? তখন সুর পালটে নরম মেজাজে বললে,"মুরগি পোষে একটা আদটা—এক একজনার পাঁচ-ছয়টা করে মুরগি। মুরগির ডিম না হলে এদের খাওয়া হয় না। কিনে আর কত খাবে? বলে, ঘরের জিনিস ইচ্ছেমত খাওয়া যায়। আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেলুম।

শীতলা ঃ এই সামান্য দেখে তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ সখি। কলির শেষ; প্রলয়ের সময় উপস্থিত। অনাচার অবিচার হবেই। তা ছাড়া জাতের আর কোন ভেদাভেদ থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান, বামন-বোষ্টম এক বিছানায় বসে খানা খাবে। স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছামত বিয়ে করবে। হাট-বাজার, বেচা-কেনা সবই তাদের হাতে থাকবে। পুরুষগুলো হবে তাদের ধামাধরা। বামনের বেঁসোর মত সঙ্গে ছুটবে। এসব কথা যাক, এখন আমাদের পূজার সম্বন্ধে কি হল তাই বল।

সখি ঃ পূজার কথা আর কি বলব বল। তোমাকে পূজা সহজে আর কেউ দেবে না। তোমার পূজার কথা বললে সকলে উপহাস করে। বলে কোথাকার শীতলা? শেষে মৎস্যরাজ্যে বিরাট রাজার নিকট বলতে সে অনেক কথা আমার তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিল। শেষে স্বপ্নে রাজাকে কত অমঙ্গল দেখালাম। তার ফলে হল কিনা শান্তি স্বস্ত্যয়ন। ভুলে তোমার নাম কেউ বললে না।

ধোয়া।। মায়ের সঙ্গে সখির যখন কথা হতেছিল, কোথা ছিল হাম-দাম-বসন্ত ব্যাধি আসি উপনীত হল গো—কি বলব কারে—কপালে সকল করে। মায়ের নিকট ব্যাধিগণ কহিতে লাগিল।

বসন্ত : কই মা, তুমি যে বলেছিলে, আমাদের আর ধরা মাঝে যেতে হবে না। আমাদের শান্তির জন্য মানবগণ মাসে মাসে পূজা দেবে। কই, মাস ছেড়ে বৎসর চলে গেল, পূজা দেওয়া দূরে থাক, তোমার নামটি পর্যন্ত কারও মুখে শুনলাম না। আমরা পিপাসায় ও ক্ষুধায় যারপর-নয় কাতর হয়ে পড়েছি। আর সহ্য হয় না। এখন বলো মা, আমরা কোন দেশে যাব?

শীতলা : দেখ বাপ ব্যাধিগণ, তোমরা আর দু'এক সপ্তাহ বিলম্ব কর দেখি, যদি ....

সখি : যাক মা, তোমার আর পূজা পেতে হবে না। তুমি অমনি দানব দত্তির মত পড়ে থাক। না হয় পড়ে পড়ে মাটি কামড়াও। তোমার কথায় নরলোকে গিয়ে যে অপমানিত হয়েছি তা মনে হলে জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা হয়।

শীতলা : দেখ সখি, কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো হয় না, সন্তান সহস্র অপরাধ করলে ও ক্ষমার পাত্র।

সখি : দেখ মা, কুমাতা না হলে কুপুত্র হয় না। কারণ মায়ের শিক্ষাদীক্ষার গুণে পুত্র গুণবান হয়। দেখ, তোমার আদেশ মত সব কথা রাজাকে জানালাম, সেখানে হল কিনা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আর লুচি-মণ্ডার ছড়াছড়ি। ভুলেও কেউ তোমার নাম কল্লে না। একটু ফুল গঙ্গাজল দিলে না? যে-পুত্র মাতৃ আদেশ মানে না এবং মায়ের সেবা করে না অমন পুত্র না থাকাই ভাল।

বসন্ত : বল বল শীঘ্র বল, কোথায় সে রাজা? কে সে? কোথায় বাড়ি? মাকে অপমান করেছে, আমরা এখনি যাব।

সখি : মৎস্যরাজ্যে বিরাট ভূপতি।

ধোয়া।। মায়ের চরণে ব্যাধিগণ করিয়া প্রণাম নাচিতে নাচিতে সবে হয় আগুয়ান।
শ্বেতবসন্ত বলে ভাই আমার কথা শুন হাওয়া ভরে আমি করিব গমন।
অলক্ষ্যেতে গিয়ে আমি অস্থিতে মিশিব, অস্থি চূর্ণ করে আমি তাহারে মারিব।
চামবসন্ত বলে আমি চর্মে প্রবেশিব, পচাইয়া দেহ তারে প্রাণেতে বধিব।
পান বসন্ত বলে আমি পানি মত হই, রাজার পুকুরেতে গিয়ে জলমধ্যে রই।
গরু বাছুর লোক লস্কর যে করিবে পান, ফুলাইয়া দেহ তারে বিনাশিব প্রাণ।
পোড়াব্যাধি বলে আমি যাবো ধোঁয়া ভরে, পোড়া ঘা পচাইয়া মারিব তাহারে।
রক্তবসন্ত বলে আমি রক্তিম বরণ, রক্তেতে মিশিয়া তারে বধিব জীবন।
শিরায় শিরায় আমি প্রবেশ করিব, দিবানিশি বসি বসি রক্ত চুষে খাব।
জ্বালাব্যাধি বলে আমি আগুন সমান, আমার জ্বালায় জীব হারাইবে প্রাণ।

ফাটাব্যাধি বলে আমি কহিব আর কত, একবারে করে দিব ফুটিফাটার মত।
সর্বাঙ্গে ফুলায়ে তার ফাটাইব গা, পুঁজ রক্তে বইবে নালা পচা গন্ধ বায়।
চল চল সবে মিলে ....

ধোয়া ॥ কি বলিব বিধাতারে, কপালে সকল করে।

কথা॥ এইরূপে যুক্তি করে চলে সবে পরস্পরে, উপনীত হইল তথায়।
নবলক্ষ ধেনু ছিল মারিয়া নির্ম্মূল কৈল, হাতি ঘোড়া কত মরে যায়।
লোক মরে একাকার, হয়ে ছারখার, রাজ্য মধ্যে পড়ে গেল হাহাকার।
পড়িল রাজার নন্দন, ব্যাধিগ্রস্ত যায় জীবন, পড়ে রাণী অকূল পাথার,
পড়িল রাজার নন্দিনী, অন্তপুরে কান্নাকান্নি, পাগলী হলো রাণী প্রায়।
রাজার চরণে ধরি, কহিল মিনতি করি বল বল নাথ কি হবে উপায়?

গীত॥ কি হবে উপায় নাথ, বল বল মম সনে
সাধের পুত্রকন্যা আমার পড়ে আছে ধরাতলে
এমন ব্যাধি কে দেখেছে, ফুলে দেহ ফেটে গেছে
জ্বালায় দেহ জ্বলিতেছে, বাঁচে কিনা বাঁচে প্রাণে।
রাজ্য তো শ্মশান হল, এ জীবনে কিবা ফল
আমি মরিব খেয়ে গরল, কি হবে আর রাজ্যধনে।

ত্রিপদী॥ দেখে রাজার ফাটে বুক, শুকাইয়া যায় মুখ,
হায় বিধি কেমন কপালে
পুত্র মিত্র সব যায়, হইল শ্মশান প্রায়,
হায় মোর কি হইল কপালে।
অনলে প্রবেশ করি, কিম্বা জলে ডুবে মরি,
শোকের হাত হতে রক্ষা হবে
শূন্য হল সিংহাসন, রাজ্যপাট হল বন,
এছার জীবনে কিবা হবে।
রাজা হয়ে শোকাকুল, ভাবিয়া না পায় কূল,
অকূল সাগরে ডুবে রয়
প্রলাপ বকে ক্ষণেক্ষণে, কখনো চিন্তিত মনে,
সেই ব্রাহ্মণীর কথা মনে হইল উদয়।

ধোয়া॥ যেমন হঠাৎ বিদ্যুৎ ঘোর অন্ধকার হরে, তেমনি হইল উদাস রাজার অন্তরে।
কি বলিব বিধাতারে, কপালে সকল করে।

পাঁচাল ও ধোয়া ॥ কোথা মা শীতলা, জুড়াও ভব জ্বালা, লীলাময়ীর লীলা কে জানে। যেমন হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে অন্ধকার হরে। কোথা মা শীতলা......

ধোয়া ॥ মা মা বলে রাজা লুটায় ধরণী, কোথা আছো দয়াময়ী দেখা দেও জননী।
মদে মত্ত হয়েছি মোর অহংকারে, অপরাধ ক্ষমা কর জননী গো মোরে।
ব্রাহ্মণীর কথা আমি না করে বিশ্বাস, আপনি করেছি মাগো আপন সর্বনাশ।
এস মা শীতলাদেবী রক্ষা কর মোরে, তোমায় পূজিব মাগো ষোড়শ উপচারে।
দন্তে তৃণ লয়ে আমি দ্বারে দ্বারে যাব, তব নামে গ্রামে গ্রামে মাগুন করিব।
সোনার প্রতিমা ঘর প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিত্য নিত্য দিব পূজা বামন ডাকিয়া।
বুক চিরে রক্ত দিব কহিলাম নিশ্চয়, ধুনা পুড়াইবে রাণী হাতে ও মাথায়।
তোমার মহিমা গান গাবে চারণগণ, পুত্র কন্যা রাখব পাশে করিয়া বন্ধন।
চন্দ্র সূর্য ধর্ম সাক্ষী মিথ্যা না হইবে, যেই দিন হতে রাজ্যে মঙ্গল করিবে। কোথা মা শীতলা।

কথা ॥ রাজা তখন উর্ধ্ব দিকে চেয়ে হাত জোড় করে কেঁদে কেঁদে বলছেন, কোথা মা শীতলাদেবী অজ্ঞান অন্ধ অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি একবার দয়া কর মা। আমার হাতি, ঘোড়া, গরু, বাছুর, প্রজা-পাঠক, লোক-লস্কর যে যেখানে পড়েছে সেই সেখানে মরে আছে। যারা বেঁচে আছে তাদের মুখে শুধু হায় হায় বুলি। আমার সোনার রাজ্য আজ শ্মশানভূমি। রাণী উন্মাদ। আমার পুত্রকন্যা এতক্ষণ জীবিত আছে কিনা। আমার নিজের দোষে নিজের সর্বনাশ করেছি। তোমার কোন দোষ নাই মা। সেই ব্রাহ্মণীর কথা তাচ্ছিল্য না করে যদি একটু ফুলজল দিয়ে তোমার পূজা দিতাম তাহলে আমার এ বিপদ হত না। এখন আমায় ক্ষমা কর মা। কুপুত্র যদি হয়, কুমাতা নহে কখন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমার রাজকাছারির সম্মুখে তোমার প্রতিমা ও মন্দির করে ষোড়শ উপচারে পূজা দেব এবং রাণী হাতে মাথায় ধুনো পোড়াবে, আমি বুক চিরে রক্ত দেব। আর আমাদের পুত্রকন্যার হস্তবন্ধন করে তোমার ডাইনে বাঁয়ে ফেলে রাখব। এই কথা বলতে বলতে রাজা সেইখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

গীত ॥ কোথায় আছ মা, কর মা করুণা, রক্ষা কর আমার এ ঘোর তুফানে।
মাগো আমি কুলাঙ্গার, না-চিনে তোমার, করি হাহাকার ব্যথা পাই প্রাণে।
রাজার মঙ্গল করগো জননী, অকালেতে মৃত্যু কত শত প্রাণী।
এ ঘোর সংকটে না বাঁচালে তুমি, কে আছে আর আমার এই দুর্দিনে।
করিলাম প্রতিজ্ঞা পূজিব তোমারে, রক্ত দিব আমি নিজ বুক চিরে।
সোনার প্রতিমা ষোড়শ উপচারে, সুবাসিত পুষ্প সুগন্ধ চন্দনে।।
রাজার অবস্থা মাতা অন্তরে জানিয়া, কহিছে সকল কথা সখিরে ডাকিয়া—

শীতলা ঃ দেখ সখি, এখনই তোমার সেই মৎস্যরাজ্যে যেতে হবে।

সখি ঃ তা যেতে হবে বৈকি মা, ঝিচাকর তো হুকুমের দাস। বিনা ওজরে আজ্ঞামাত্রই ছুটতে হবে। এদের প্রাণে ঘৃণা লজ্জাও ভয়ের লেশমাত্র থাকা উচিত নয়। যেহেতু এরা পরাধীন। আপনার পূজার জন্যে রাজসভায় গিয়ে প্রথমত যে তাচ্ছিল্য উপহাসের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছি, পুনঃ আবার রাজার স্বপনে রাজাকে কত ভয় দেখিয়েছি, তার ফল হল কিনা লুচি মোণ্ডার ছড়াছড়ি। ভুলেও তোমার নামটি পর্যন্ত কেউ করল না। তার পর তো ব্যাধিগণ সব লম্ফঝম্প মেরে গেল। তাদের দ্বারাও কিছু হল না। আবার গিয়ে তোমার পূজার জন্য গলায় কুটো বেঁধে রাজার কাছে ভিক্ষে করতে হবে।

শীতলা ঃ না না সখি, আমার পূজার জন্যে রাজার নিকট তোমার ভিক্ষে করতে হবে না। রাজার সে রাজ্য শ্মশান সম-প্রায়। লোকলস্কর, হাতি ঘোড়া, গরু, বাছুর সব মরে একাকার এবং রাজার পুত্রকন্যারাও যায় যায় অবস্থা। রাণীও উন্মাদ, এক-একবার ছুট মেরে পালাচ্ছে। রাজাও এখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। তুমি গিয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলে সে কথা রাজার স্মরণ হয়েছে। পূজা দেবার জন্যে এখন রাজা খুবই আগ্রহী। এমনকি প্রস্তরনির্মিত মন্দির ও স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তুমি এখন গিয়ে স্বপ্নে জানাও যেখানে আমার মন্দির নির্মাণ করবে বলেছে সেখানকার মাটি নিয়ে গঙ্গাজলের সাথে মিশিয়ে যেখানে যত মরে আছে তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিলে সবাই প্রাণ ফিরে পাবে এবং তার পুত্রকন্যার গায়ে মাখিয়ে দিলে তারাও ভাল হয়ে যাবে।

সখি ঃ হাসির কথা বললে মা, যারা বেঁচে আছে তারা না হয় ভাল হবে কিন্তু যারা আগে মরে গিয়ে পোকা ধরেছে দেহে, মাংস খুলে গেছে, তারা বাঁচবে কি করে?

শীতলা ঃ কেউ পচেনি, গলেনি, পোকায় ধরেনি কিংবা শিয়ালকুকুরেও খায়নি। এমনকি কারোর গায়েতে একটি মশা ও মাছি বসতে দিইনি। আমি আমার আঁচল দিয়ে সবাইকে ঢেকে রেখেছি।

সখি ঃ আর আপনার ব্যাধি সব কোথায় কি করছে?

শীতলা ঃ তাদের নিবৃত্ত করেছি, তারা ফিরে এসেছে। তুমি সত্বর গমন কর।

সখি ঃ আচ্ছা মা, যদি কোন শবদেহ পুড়িয়ে দিয়ে থাকে, কি মাটির মধ্যে পুঁতে দিয়ে থাকে তাহলে কি হবে?

শীতলা ঃ না না। এ ব্যায়রামে মরলে দাহ করতে নেই বা কেউ করেও নি। আর যদি কোন দেহ পুড়িয়ে বা পুঁতে থাকে তাহলে তাকে তুলে নিয়ে ঐ গঙ্গাজল মৃত্তিকা মাখিয়ে দিলে বেঁচে যাবে।

সখি ঃ এতদিন বলদের মত বোঝা বয়েছি কিন্তু আস্বাদ পাইনি। এর মধ্যে অমৃত ছিল আজই তা জানলাম। এত করুণা কৃপাদৃষ্টি না থাকলে তারে দয়াময়ী মা বলবে কেন। আজ আর আমার আনন্দ রাখবার স্থান নেই। ইচ্ছা হচ্ছে নেচে নেচে গিয়ে এই শুভ সংবাদটা রাজার কাছে এখুনি দিয়ে আসি।

শীতলা : তাই যাও সখি।

গীত ॥ তবে যাই যাই রাজবাড়ি যাই দেখব মা তোর কেমন লীলা
রাজার শিয়রে বসি, স্বপনে দেখাব খেলা
এবার যদি হার তুমি, মা বলে ডাকব না আমি
যা কর করিবে তুমি, আমি সার করেছি ঐ চরণ ভেলা।

পয়ার ॥ নাচিয়া নাচিয়া সখি হইল বিদায়।
রাজার শিয়রে বসি এই কথা কয়।।
শুন শুন মহারাজা মন করি স্থির।
যথায় করিবে তুমি মায়ের মন্দির।।
সেইখানের মাটি লয়ে গঙ্গাজল সহ।
যেথায় যত মড়ার গায়ে ছড়াইয়া দেহ।।
মায়ের কৃপায় তারা পাইবেক প্রাণ।
পূজিবে শীতলা মায়ের হয়ে সাবধান।।
মাগুন করিবে আনি প্রতি দ্বারে দ্বারে।
পূজিবে মায়ের পদ ষোড়শ উপচারে।।

ধোয়া ।। প্রত্যাদেশ দিয়ে সখি হইল বিদায়, মা মা বলিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়ায়।
অপরাধী মহাপাপী ক্ষম মা আমায়, অবোধ সন্তান বলে ঠেল নাকো পায়।
তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজা রাণীকে ডাকিল, সবিশেষ স্বপ্ন কথা সকলি কহিল।
মরা দেহে প্রাণ যেন পাইলেন রাণী, মা মা বলিয়া কাঁদে জুড়ি দুইপাণি।
রাজা বলে শুন রাণী মন কর স্থির, কাছারীর সম্মুখে হবে মায়ের মন্দির।
স্নান করিয়া উভয়ে মোরা গণ্ডি দিয়ে যাব, সেইখান হইতে কিছু মৃত্তিকা লইব।
গঙ্গাজল, ফুল চন্দন যোগায় দাসীগণে, মনের মানসে পূজা করি মায়ের চরণে।
সর্বাঙ্গ লুটিয়ে রাজা করিল প্রণাম, চরণমৃত্তিকা তুলি নিলেন হইয়া সাবধান।
মায়ের স্মরণ সদা করিয়া অন্তরে, মাখাইয়া দিল রাজা পুত্র আর কন্যারে।
মায়ের কৃপায় সব জ্বালা গেল দূরে, জয় মা শীতলা বলি ডাকিল উচ্চৈস্বরে।
মৃত্তিকা লইয়া রাজা বাহির হইল, সবার দেহেতে তাহা মাখাইয়া দিল।
পচা গন্ধ কাটা ফুলা কিছুই নাহি আর, মুহূর্তের মধ্যে হইল সাবেক আকার।
যথা ছিল মৃতদেহ রাজা চলিল তথায়, স্বহস্তে মাখায়ে দেয় মৃত ব্যক্তির গায়।
মরা দেহে পেয়ে প্রাণ মায়ের কৃপায়, জয় মা শীতলা বলি উচ্চৈস্বরে গায়।

হাতি ঘোড়া মরে ছিল যেখানে যে মত, ঘুম ভেঙে উঠে যেন হয়ে আনন্দিত।
তিনদিনের মরা গরু উঠে খায় ঘাস, হাম্মা রবে নাচে বৎস হইয়া উল্লাস।
কোথা মা শীতলা গাহি তব লীলা, লীলাময়ীর লীলা যায়নাত ভোলা।
ওমা আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি কৃপা করো মাগো মোর নিদানে।
রাজার রাজ্যতে হয় আনন্দের মেলা, উচ্চকণ্ঠে গায় সব জয় মা শীতলা।
প্রজা প্রস্থ ডেকে রাজা করিল ঘোষণা, শীতলা মায়ের পূজা কর সর্বজনা।
আমি জানিব কেমনে, আমি না বুঝে মরি প্রাণে।
ধন্য ধন্য শীতলাদেবী ধন্য গো জননী, তোমার মহিমা মা কি বুঝিব আমি।
আজ হতে তব নামে মাগুন করিব, তিনদিন মাগিয়া মাগো তোমায় পূজিব।
বিশ্বকর্মা বলি রাজা ডাকে উভরায়, অন্তরে জানিয়া শিল্পী উপনীত হয়।

পয়ার ॥ রাজা বলে শুন দেব মন করি স্থির।
সোনার শীতলামূর্তি পাথরের মন্দির।।
তিনদিনের মধ্যে তুমি নির্মাণ করিবে।
যাহা চাহ দিব আমি অন্যথা না হইবে।।
এই কথা বলে রাজা রাণীকে লইয়া।
দ্বারে দ্বারে মাগে রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।।
শুন শুন প্রতিবেশী আমার পানে চাও।
শীতলামায়ের নামে মাগুন কিছু দাও।।
শুন শুন মা সকল গো করোনাকো লজ্জা।
মাগুন মাগিয়া আমি দিব মায়ের পূজা।।
যে মায়ের দয়াতে মরাপুত্র কোলে পাই।
সেই মায়ের নামেতে মাগুন দেহগো সবাই।
এইরূপে তিনদিন মাগুন করিল।
মাগিয়া পাতিয়া রাজা পূজা আরম্ভিল।।
সখির লইয়া দেবী করিতে কল্যাণ।
সুবর্ণ মূর্তিতে মাতা হলেন অধিষ্ঠান।।
কাঁসর ঢোল কাড়া নাকাড়া বাজে কত বাঁশী।
চারণেতে গাহে গান করজোড়ে বসি।।

ধোয়া॥ বুক চিরে রক্ত রাজা দিলেন আপনি, হাতে আর মাথায় ধুনা পোড়াইল রাণী।

পুত্রকন্যা রাখে তথায় করিয়া বন্ধন, গলে বস্ত্র দিয়ে স্তব করিছে রাজন।
জয় জয় দেবী জয় মা শীতলা, আমি অতি মূঢ়মতি কি বুঝিব লীলা।
অজ্ঞান অন্ধ মোহ মদে তোমারে না চিনি, শত অপরাধ পদে করেছি জননী।
সদয় হইয়া মাগো নির্দয় হয়োনা, কাতরের করুণা দানে বঞ্চিত কোরো না।
আমি জানিব কেমনে, আমি না বুঝে মরি প্রাণে।।

গীত।। ওমা এমন মা কে বা জানে
কে বুঝিতে পারে মাগো তোমার এত মহিমে
তোমায় যে না চিনতে পারে, কে বল তার রক্ষা করে
অকূল সাগরে পড়ে, মরে ঘোর তুফানে।
তুমি যারে হও মা সদয়, থাকে না তার সমনের ভয়
ত্রিতাপ জ্বালা সব দূরে যায়, তোমার কৃপা দানে।

অষ্টমঙ্গলা ধোয়া

কহে দ্বিজপদ, পাই যেন ও পদ, দিয়ে মা সম্পদ ভুলায়ো না মোরে।
তুচ্ছ রাজ্যপদ, ঘোর পরমাদ, মদে মত্ত সদা তম অহংকারে।

অষ্টমঙ্গলা পাঁচালি

এই রূপে কত স্তব করিল রাজন - কহে দ্বিজপদ
কাতরে করুণ কণ্ঠে মুদিয়া নয়ন - কহে দ্বিজপদ
সন্তুষ্ট হইয়া মাতা দিলেন অভয় - কহে দ্বিজপদ
শূন্যেতে মিশিয়া দেবী কহে সমুদয় - কহে দ্বিজপদ
আর কেন যাদুমণি দিয়েছি অভয় - কহে দ্বিজপদ
তোমার রাজ্যের মঙ্গল হইবে নিশ্চয় - কহে দ্বিজপদ

অষ্টমঙ্গলা ধোয়া

ধন ধান্য দারা পুত্র সকলি তোমার
নিরাপদে রবে সবে, কহিলাম সার গো - কহে দ্বিজপদ

ধোয়া।। অশান্তি অনল রোগ শোক তাপ যত,
সকলি হইবে দূর কহিলাম সত্য।
শত্রুক্ষয় রাজ্যের প্রজার পালন
অভাব অভিযোগ রাজ্যে হবেনা কখন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া মাতা হইল বিদায়
উদ্দেশে প্রণাম সবে করে মার পায়।

কৃপা কর কৃপাময়ী আমি মূঢ়মতি
তব লীলা বর্ণিবারে নাহি মা শকতি। কহে দ্বিজপদ ...

ধোয়া।। সংক্ষেপেতে পালা সায় অধম দ্বিজপদ কয়
অজ্ঞান অন্ধ মূঢ়জনে ও মা রেখো রাঙা পায়। কহে দ্বিজপদ ।।

(শীতলাপালা সমাপ্ত)

প্রণীত - অধম দ্বিজপদ মণ্ডল, সাং - সীতাকুণ্ড, থানা - বারুইপুর, ডাক - সীতাকুণ্ডু, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (পালাটি অবিকৃতরূপে উদ্ধৃত)।

বিরাটরাজার পালা (শীতলার গান)

গণেশ বন্দনা

প্রণতি যে করপুটে প্রথমে গণেশ ঘটে
অতএব নায়ক বাসরে।
গায়ক বন্দিয়া গায় উর প্রভু গণরায়
গহন গম্ভীর গুণবরে।।
বাম স্কন্ধে যোগ পাটা কপালে ভস্মের ফোঁটা
মুষিক বাহনে যোগধারী।
তুমি সর্বধর্মাধর্ম, পরিধান দ্বিপচর্ম,
তত্ত্ব কিছু বলিতে না পারি।।
স্বর্গ রসাতল ভূমি নিস্তার কারণ তুমি
গণপতি দেবের প্রধান।
একদন্ত গজানন ব্রহ্মরূপ সনাতন
অকিঞ্চনে তুমি দয়াবান।।
রচিয়া পরম নিধি ধ্যায়ানে না পায় বিধি
অধিতত্ত্ব আদি দেবরাজে।
মহিমাতে মত্ত হয়ে রাতুল চরণ পেয়ে
সকল দেবতা আগে পূজে।।
আমি অতি মূঢ়মতি (?) না জানি তোমার স্তুতি
আমি তোমার কি বুঝিব মহিমা।
গণেশ চরণ পূজে দ্বিজ মাধবেতে বলে
দিতে হবে ও রাঙা চরণ .... ।।

শীতলার বন্দনা

কি বন্দিব শিশু আমি কৈলাস ত্যজিয়া তুমি
অবনীতে এলে মা শীতলা।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ তুমি সত্ত্ব
ব্যাধি দেবী ভকত বৎসলা।।
রজত মার্জ্জনী সারা, হেমরূপ কুম্ভধারা,
জিনি দাড়িম্ব দশন উজ্জ্বলা।
বিশাল বদন ছবি যেন প্রভাতের রবি
শ্রুতিমূলে সুবর্ণ কুণ্ডলা।।
স্মৃতি (প্রীতি?) রূপা দক্ষসরা (?) দেহে শোভে পীতাম্বরা
মার পায়ে বাজে সোনার নূপুর।
আসরে কবির কাজে উর মা সন্ততি মাঝে
মাগো নায়কের বিঘ্ন কর দূর।।
সঙ্গে দাসী রক্তাবতী গর্দভ বাহন গতি
জ্বরা (?) সরা পাত্র বসন্ত সকল।
বৈছার মুসরি তিলা সূর্যমুখী চালতা কুল্যা
কালচিমিটি আর চামদল।।
পূর্ণ কর আমার আশ ছাড় মা কৈলাস মাঝ
দাস-দাসী ব্যাধির সহিত।
বিশ্রাম অষ্টম নিশি আমার আসরে আসি
গুণগান শুন মা সহিত।।
আমি মূঢ়মতি অতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
তুমি গুরুমন্ত্র দিলে কানে।
সেই মহামন্ত্র বলে পূর্ব আরাধন ফলে
দ্বিজ নিত্যানন্দ শ্রীপাদপদ্ম তলে।।

সরস্বতী বন্দনা

উর উর গো মাতা জয় দেবী সারদা
কৃপা করি হও কুতূহলে।
অবিরত ক্ষিতি মতি দণ্ডবত কোটি কোটি
করজোড় চরণ কমলে।।
শ্বেতপদ্মে সম্ভাবিত শ্বেতপদ্মে সুশোভিত

শ্বেত ও সুচারু বস্ত্র পরি।
শ্বেত ও চন্দনে লিপ্ত গলে গজমতি দীপ্ত
শ্বেতপদ্মে বেষ্টিত কবরী।।
মুখ যেন পূর্ণ শশী কুমুদ প্রকাশ হাসি
জগৎ যেন অভয় বরদা।
কর জোড়ে মন্ত্রধরি হংস বাহন করি
সরস্বতী সর্ব শাস্ত্রের মাতা।।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
তুমি গুরুমন্ত্র দিলে কানে।
সেই মহামন্ত্র বলে পূর্ব সাধন ফলে
দ্বিজ নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম তলে।।

পঞ্চানন্দের বন্দনা

মনে হইয়া আনন্দ বন্দিলাম পঞ্চানন্দ
তোমার চরণ করি আশ।
তোমার চরণ প্রতি, থাকে যেন মোর মতি
পুরাও মম মন অভিলাষ।।
স্থাবর জঙ্গম ময় তোমা ভিন্ন কিছু নয়
ভাবিয়া বুঝিনু তুমি এক।
এক ভিন্ন নহে অন্য ঘটে ঘটে দেখে ভিন্ন
দুষ্টমতি ভাবে গো অনেক।।
একদিন ত্রিলোচন বল্লুকায় চাষের কারণ
দেখি তথা স্বর্গের বিদ্যাধরী।
সেইদিন ত্রিলোচন কামে হয়ে অচেতন
আলিঙ্গন মাগে ত্রিপুরারি।।
ধুধুরার মাঠ হতে জনম লভিয়া তাতে
সে কারণে নাম পঞ্চানন।
লোহার গণ্ডুষ (?) হাতে ফণী মণি শোভে মাথে
অনুষঙ্গী যত ব্যাধিগণ।।
জ্বরবান জ্বরাশুল (?) সেঁজো জ্বরা নিষ্ঠুর
অস্থি দলন অতি ভয়ঙ্কর।
পাত্র এই পঞ্চজন সঙ্গে থাকে অনুক্ষণ
ব্যাধিগণ দারুণ নিষ্ঠুর।।
রায়ের চরণ সার বিনা গতি নাহি আর

যেমত কপালে ছিল লেখা।
রায়ের চরণ তলে দ্বিজ মাধবেতে বলে
অবশ্য নায়কের হবে ক্ষমা।।

মনসার বন্দনা

উর মা মনসা মাতা ত্রিজগৎ ধাত্রী ধাতা
যোগী শ্রেষ্ঠ হরের নন্দিনী।
উৎপত্তি পাতাল পুরী বিশ্বমাতা বিষহরি,
চারুকান্তি নির্মল ধারিণী।।
সর্ব ঘটে আছ তুমি মোম ক্ষেত্র দ্বারা ভূমি(?)
অচল অস্থির (?) তরুলতা।
মনসা মনের মাঝে সকল দেবতা পূজে
মনসা মনের জানেন কথা।।
বিধি অগোচর তিন অতিশয় প্রকাশন
সদয় হৃদয় সবাকার।
জগাতি যোগেন্দ্র সুতা তুমি গো জগৎ মাতা
এ তিন ভুবনের হরিহর।
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে আগম পুরাণে বলে
জগাতি মদনে কৃপাময়ী।।
তুমি সংসারের সার তোমা ভিন্ন কিবা আর
অবধি অশেষ মায়াময়ী।।
সৃজন পালন হরি ছলিবারে ত্রিপুরারি
জনমিলে পাতাল ভুবন।
শরীরের সকল ভার তোমা ভিন্ন কেবা আর
ধারণ করিবে বল এখন।।
বিশেষ না জানি তত্ত্ব আমি মূঢ় হীন তত্ত্ব
তুমি মম মন্ত্র দিলে কানে।
সেই মহামন্ত্র বলে পূর্ব আরাধনা ফলে
নিরক্ষরেতে গাই সে কারণে।।
ত্যাজিয়া আপন স্থান কর মোর পরিত্রাণ
গায়ক করিলে মোরে তুমি।
দিওস্থান ভবপারে বন্দি মাতা এই আসরে
তোমার গান গাই-গো জননী।।

সর্ব দেবদেবীর বন্দনা

প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম নিরঞ্জন।
জলাসনে বন্দিলাম লক্ষ্মীনারায়ণ।।
হংসে ব্রহ্মা বিষ্ণু বন্দ গরুড় বাহন।
বৃষ বাহনে বন্দ দেব ত্রিলোচন।।
প্রথমেতে বৃষভেতে বন্দ শূলপাণি।
শিরে গঙ্গা অর্দ্ধ তনু নরের নন্দিনী।।
যে হাতে ভব ভার নগের ঈশ্বর।
সর্প হাতে বিনা হাতে বন্দ বিশ্বেশ্বর।।
স্বর্গে দানব ভূতাসনে প্রথমে বেষ্টিত।
কৃপাময় মৃত্যুঞ্জয় বদন মোহিত।।
সরোবরে বিধাতারে বন্দ জোড় কায়।
সর্বক্ষণ বেদমুখে উচ্চারণ হয়।।
কতগুণ স্বয়ম্ভুর শোভে তার করে।
অনুক্ষণ আবাহন মরাল বাহনে।।
মহানন্দা হয় বন্দ চতুর্ভুজ ধারি।
নরসিংহ রূপে আসি নরের উদ্ধারি।।
বন্দ দেব নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
জ্ঞানস্বরূপ রূপে বুঝাইলেন ধ্যান।।
দ্বাপরে কৃষ্ণ রূপে করিলেন অবতার।
বৃন্দাবনে লীলাখেলা করিলেন অপার।।
ত্রেতা যুগে জন্মিলেন দশরথ ঘর।
রামচন্দ্র রূপে কৈলে রাবণ সংহার।।
কলিযুগে নারায়ণ চৈতন্য হয়ে।
নবদ্বীপে বসতি কৈল প্রেমমূর্তি লয়ে।।
পাতকি নিস্তার কৈলে শুনায়ে কীর্তন।
সেই দেব প্রণমিয়ে গরুড় বাহন।।
গরুড় আসনে হরি পূর্ণ অবতার।
শীতলা বসন্ত বন্দ সংহতি যাহার।।
বাসুদেব কৃষ্ণ বন্দ দেব বিশ্বনাথ।
কিঞ্চিৎ ধ্যায়ানে যার ইষ্ট হয় লাভ।।
বন্দিলাম পার্বতী দেবী পর্বতবাসিনী।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী নাম দাক্ষায়ণী।।
গঙ্গাঠাকুরাণী বন্দ হর শিরোবাসী।

যাহার স্মরণে হয় পাপ ক্ষয় রাশি।।
স্মরণেতে পাপক্ষয় পরশে মুক্তি।
গঙ্গাস্নান কৈলে হয় তার বৈকুণ্ঠে বসতি।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দ অযোধ্যার মাঝে।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ দশরথ রাজে।।
কৌশল্যা সুমিত্রা বন্দ সীতার চরণ।
কনক লঙ্কাপুরে বন্দ রাজা দশানন।।
ইন্দ্র আদি বন্দিলাম যত দেবগণ।
মুষিক বাহনে বন্দ হরের নন্দন।।
সুমেরুয়া আদি বন্দ যতেক শিখর।
লবণ আদি বন্দিলাম যতেক সাগর।।
দ্বিজ গুরু চরণে প্রণাম শত শত।
শ্রোতাগণে বন্দিলাম করি জোড় হাত।।
মম জন্মদাতা বন্দ মা কুলের জাঁই।
অভাগা কপাল তার জননী যার নাই।।
ডাকিনী যোগিনী বন্দ আর সুখ দুখি (?)
আমার আসরে আসি গান শুন বসি।।
বিনা অপরাধে যে শর হানিবে গায়।
তার শিক্ষাগুরুর মস্তকে লাগাইলাম বাঁয়।।
যতেক রমণী দেহ জয় জয় ধ্বনি।
ঘটে ভর করিলা শীতলা মাতা ঠাকুরাণী।।
ঘটে ভর কর মাগো শিরের উপরে।
গীত বলাহ মাগো অক্ষরে অক্ষরে।।
এতেক বলিয়া তখন নিত্যানন্দ গায়।
নায়েকের কর রক্ষা বলি মা তোমায়।।

শীতলার আবাহন গীত

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে,
ওঁ নমামি শীতলাদেবী শ্বেত বর্ণ সুলোচনা
দক্ষিণে মার্জ্জনি এতা বামে কলসী ধারিণী।
শীতলাং জগৎ পিতাং শীতলা জগৎ মাতাং
শীতলাং জগদ্ধাত্রীং শীতলা তং নমঃ নমঃ।
ওঁ ঘণ্টাকর্ণ মহাদেবী সর্বব্যাধি বিনাশন
বিষফোটকে ভয়ং নাস্তি রক্ষ রক্ষ মহাবীরং।

ওঁ রক্তাবতী পরমমতি রক্তবস্ত্র পরিধান
জ্বরাসুর মহাভাগে লঙ্কায় বসতিস্তথা।
প্রণমহ দিনমণি দেবদিন রায়
তব সঙ্গে মন যার অন্য নাহি ভয়।
চতুর্দশ ভুবনে মাতা তুমি দীপ্তমতি
ক্ষমিবে দাসের দোষ হয়ে দয়াবতী।
রক্ত চন্দন জবা পুষ্প তাম্রপাত্র লয়ে
সর্বদেব পূজে তোমায় হরষিত হয়ে।
দ্বিজ রামা ডুবে বলে সূর্যের চরণে
শুনগো ভকত লোক প্রসন্ন মনে।।

জাগরণ

শুন শুন ভক্তগণ হয়ে একমন
কহি শুন মা শীতলার জন্মের বিবরণ

একদিন ধরা কৈলাসে হরপার্বতীর কাছে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হলেন। মহেশ্বর বলেন, একি ধরা তুমি কাঁদছ কেন? আমি কেন কাঁদি? পৃথিবীর মানুষ মহাপাপে পরিপূর্ণ হয়েছে। সেই পাপের ভার সহ্য করতে পারছি না। আচ্ছা ধরা, তুমি স্বস্থানে গমন কর, আমি এর বিহিত করব। শুন পার্বতী, ধরা এসে আমার কাছে কাঁদছে। আমি এখন কি উপায় করি? পার্বতী বলেন, প্রভু তুমি নৈমিষ অরণ্যে গিয়ে দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। সেই যজ্ঞ হতে যে ফল উৎপাদন হবে তা হতে ধরা ভার নিবারণ হবে। শুন নন্দী আমার বচন সাবধানে দ্বার করিবে রক্ষণ। আর তুমি কোথায় যাবে প্রভু? আমি নৈমিষ অরণ্যে দেব যজ্ঞানুষ্ঠান করব।

কথা।। ধীরে ধীরে মহেশ্বর তখন করিল গমন
নৈমিষ অরণ্যে গিয়ে দিল দরশন।

দেবাদিদেব মহাদেব নৈমিষ অরণ্যে দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। দেবগণ যজ্ঞে এসে উপস্থিত হলেন। পরে ধূর্জটি মহাদেব সকল দেবগণকে যজ্ঞব্রতী হবার জন্য বললেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মকলসী নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। অস্থিরা (?) হতৃকা (?) সঙ্গে নিযুক্ত হলেন। আর মহাদেব নিজে আচার্য কাজে নিযুক্ত হলেন। বেদমন্ত্রে যজ্ঞকুণ্ড জ্বাললেন। তার ধূম কৈলাসে পার্বতীর ললাটে লাগল। তাতে দেবীর ললাট স্বেদসিক্ত হল। সেই স্বেদ থেকে শীতলার জন্ম হল। স্বেদ শীতল বলে এই দেবীর নাম হল শীতলা। ধূমেতে জন্ম বলে নাম রাখলেন ধূমাবতী তারা। ললাটে জন্ম তাই নাম রাখলেন অর্ধাঙ্গভাগিনী কপালিনীতারা। কন্যারত্নসহ দেবী আনন্দিত হলেন। এদিকে দেবগণের আহুতিতে বসন্তরায় উঠলেন। মহাদেব বললেন দেবগণ আমি যে মানসে যজ্ঞ করেছিলাম আমার সে মানস পূর্ণ হয়েছে। সকলে পূর্ণ আহুতি দাও। আহুতি দিলেন। যজ্ঞ নির্বাপণ হল। দেবগণ যজ্ঞ ভাগ নিয়ে স্বস্থানে গমন করলেন। মহাদেব সেই যজ্ঞের অঙ্গিরা কুশ দিয়ে নাড়ছেন। তাহাতে কতকগুলি অকাল ফল পেলেন। কুল, বেল, নারিকেল, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল পেয়ে ঝুলিতে নিয়ে রাখলেন এবং বসন্তরায়কে

বক্ষে নিয়ে কৈলাসে গেলেন। দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, দেবযজ্ঞে কি ফল পেলেন? মহাদেব বললেন বহু রত্ন লাভ করেছি। চৌষট্টি রকম অকাল ফল পেয়েছি। এগুলি ব্যাধি স্বরূপ। পুত্রের নাম বসন্তকুমার। ব্যাধিসহ জ্বরা বসন্ত ধরায় গেলে ধরা ভার নিবারণ হবে। তারপর দেবী বললেন যজ্ঞধূম আমার ললাটে লেগে আমি এক কন্যা রত্ন লাভ করেছি। শীতল ঘর্মে জন্ম বলে নাম রেখেছি শীতলা। ধূমাতে জন্ম তাই আর এক নাম রেখেছি ধূমাবতী তারা, ললাট ভাগে জন্ম তাই নাম অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী কপালিনী। ইহা শুনে মহাদেব বড় আনন্দিত হলেন। মহাদেব বললেন, এরা তিন মায়-পোয়ে ধরাধামে গেলে ধরাভার নিবারণ হবে। চৌষট্টি অকাল ফল ব্যাধি হয়ে অকাল মৃত্যুর কারণ হবে। যে কায়মনোবাক্যে পূজা করবে তাকে অভয় বর প্রদান করবে। আর যে মায়ের পূজা না করবে তার বসন্ত ব্যাধি দিয়ে সংহার করবে। লঙ্কাতে যে শিবজ্বর আছে তাকে পাত্র করে লও, অনুচর হবে। মহাদেবের আদেশে জ্বরাসুর সাতভারা ব্যাধি নিয়ে মার কাছে এলেন। সাত ভরা ব্যাধি হল জ্বরাসুর ত্রিপাদ, ত্রিশিরা, ষড়ভুজ, ষড়লোচন ও কালান্তক। তাঁরা শীতলার পাদপদ্মে এসে প্রণাম করছে।

জয়ন্তী মঙ্গলাময়ী, ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবে ক্ষমাধন্যা (?) স্বাহা সাধা নমোহস্তুতে
ওঁসর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।
আনন্দময়ী মা নিরানন্দ কোরো না................

প্রণামান্তে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করছেন, আমায় ডেকেছেন কেন?

মা : মহাদেবের অনুমতিতে আমরা মর্ত্যে যাব। প্রথমে নিষাদের ঘাট পার হয়ে বিরাট নগরে যাব। সেখানে মহারাজ বিরাট রত্নময় পালঙ্কে শয়ন করে যখন নিদ্রা যাবে তখন শিয়রে বসে স্বপ্নযোগে বলব, মহারাজ বিরাট, আমার পূজা কর। আমি দেবী শীতলা। কায়মনোবাক্যে পূজা করলে এক ছত্রের রাজা করে দেব আর পূজা না করলে আমার এই বসন্ত ব্যাধি দিয়ে তোমার রাজ্য সমেত সংহার করব।

জ্বরাসুর : আপনি স্বপ্নে বলবেন কিন্তু সেই বিরাট অযোনিসম্ভব, তিনি শিব ছাড়া কাউকে উপাসনা করেন না। সুতরাং দেবীপূজা করবেন বলে তো মনে হয় না।

মা : উঃ। জ্বরা তুমি আমার ভয়ঙ্কর রোগের পরিচয় জানো না। তারা চৌষট্টি জন আমার আদেশে গোটা দুনিয়া ছারখার করে দিতে পারে। এই বলে মা শীতলা তাঁর সমস্ত রোগগুলোকে ডাকলেন, আর তাদের কার্যক্ষমতা যাচাই করে নিতে চাইলেন।

মশাদল : মশাদল বসন্ত বলে আমার নাম মশাদল
সকল অঙ্গ ফাটাই যেন শিরিষের ফল।

কালচিমিটি : কালচিমিটি বসন্ত বলে যার গায়ে হই
থাকুক অন্যের কার্য আগে চক্ষু পরে যাই।

ধুকুড়ে বসন্ত ঃ	ধুকুড়ে বসন্ত বলে আমি যারে ধরি
	আশেপাশের মড়া আমি গ্রামের বাহির করি।
কাঁঠালে বসন্ত ঃ	কাঁঠালে বসন্ত বলে আমি হব যার গায়
	কাঁঠাল পাকিলে যেমন ফেটে ফেটে যায়।
কলাছড়া ঃ	কলাছড়া বসন্ত বলে আমার নামটি কলাছড়া
	আমি যার বাড়ী যাই তার পাঠাই জোড়া জোড়া।
তেঁতুলে বসন্ত ঃ	তেঁতুলে বসন্ত বলে আমি যাব যেথা
	সত্তরে নামাই আমি তাদের বউয়ের হাতের শাঁখা।
পুখুরিয়া ঃ	পুখুরিয়া বসন্ত বলে আমি হব পুখুরের মত
	চারিদিকে উঁচু হব আর মধ্যিখানে ডব খাব।
তিলেমুখ বসন্ত ঃ	তিলেমুখ বসন্ত বলে আমি বটে ভাল
	আমি যার অঙ্গে ধরি তার দেহ করি কালো।
মুশারি বসন্ত ঃ	মুশারি বসন্ত বলে আমি নই হীন
	আমি যার অঙ্গে হই তার গায়ে রাখি চিন।
পাথুরে বসন্ত ঃ	পাথুরে বসন্ত বলে আমি তোমাদের শুধাই
	থাকুক অন্যের কার্য আমি পাথর গলাই।
পানিয়া বসন্ত ঃ	পানিয়া বসন্ত বলে আমি নিবেদন করি
	আমি যার অঙ্গে হই তার প্রাণে নাহি মারি।

এইরূপে ব্যাধিগণ করিল নিবেদন। শুনে আনন্দিত তবে দেবীর নন্দন। তখন জ্বরাসুর বলছে মা, চৌষট্টি বসন্ত আর যত অকাল ফল কে কে বহন করবে? মা বললেন, এস আমরা সকলে সেই যুক্তি করি।

জ্বরা ঃ মা আমার যুক্তি শোন। তুমি এই চৌষট্টি কলাই পুঁটলি বেঁধে নাও। তারপর তোমার গাধাকে মায়াবৃষ করে তার পিঠে চাপিয়ে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে চালিয়ে নিয়ে যাও। আর আমরা সব শূন্য মার্গে অদৃশ্য হয়ে যাই। কারণ আমাদের এই রূপ যদি মর্ত্যলোকে কেউ দেখে তাহলে তাদের অকালে মৃত্যু হয়ে যাবে।

একথা শুনে মা বললেন, বাঃ উত্তম যুক্তি হয়েছে। তুমি যুক্তির শিরোমণি। মা চৌষট্টি অকাল ফল কলাই পুঁটলি করে আপনার গর্দভকে মায়াবৃষ করে তার পৃষ্ঠে চাপিয়ে ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেবীর শিরে কুলা ও ঝাঁটা, ক্রোড়ে কুম্ভ ও করে নিলেন রাহন (?) চুপড়ি। নিষাদ ঘাটে প্রহ্লাদ খেয়ারী পারাপার করে। পারের সময়ও আর নেই। খেয়ারী মনে মনে করছে। উপরে উঠে দেখি, যদি কেউ আসে তাকে পারে নিয়ে যাব। উপরে উঠে ব্রাহ্মণীকে দেখে বলছে—ও মা, একটু তাড়াতাড়ি আসুন, বেলা অনেক হয়ে গেছে, আমি আপনাকে পার করে দিয়ে বাড়ি যাব। মা ঘাটে এলেন। বলছেন বাবা খেয়ারী, আমাকে পার করে দাও। হ্যাঁ মা, পার করবার জন্যেই তো ডাকছি। পারের

কড়িটা আগে দাও মা। এই ঘাট মহারাজ বিরাটের কাছ থেকে ডেকে নেওয়া। অনেক টাকা দিতে হয়। বাবা খেয়ারী, আমার কাছে তো পয়সাকড়ি নেই, তোমাকে বরং আশীর্ব্বাদ করি।

খেয়ারী : দেখ মা, আমার আশীর্বাদ অনেকে করে গেছে। কিছু ফল হয়নি। তাই প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কাউকে আশীর্বাদ নিয়ে পার করব না।

মাঃ খেয়ারী, আজ তুমি আমাকে পার করে দাও, একসময় আমি তোমাকে পার করে দেব।

খেয়ারী : দেখ মা, আমি প্রতিদিন কত পারাপার করছি আর তুমি আমাকে কি পার করবে? আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর, তোমার বৃষের পৃষ্ঠে কি আছে?

মাঃ শিষ্য মহল থেকে কিছু কলাই পেয়েছি।

খেয়ারী : ঐ কলাই আমার পালি পাঁচ-ছয় দিয়ে যাও।

কথা॥ তখন মা মনে মনে করছেন খেয়ারীর কলাইয়ের উপর লক্ষ্য পড়েছে। আমি মনে করেছিলাম বিরাটে গিয়ে প্রথম পূজা নেব। বাবা খেয়ারী, তুমি এখন একপালি নাও। যদি খেতে পার তবে বেশি করে দিয়ে যাব। মা একপালি কলাই দিয়ে খেয়া পার হয়ে বিরাটে গেলেন।

সবে হল শেষ নিশি, রাজার শিয়রে বসি
স্বপ্নে দেখা দিলেন শীতলা।
অতি ভয়ঙ্কর বেশী, দিগম্বরী দর্পনাশী
ঘোর দৃষ্টি প্রবীণা বিশালা।।
সম্মুখে নাচার জট, ছয় চক্ষু ছয় কর
কালরূপী ত্রিশিরা ত্রিপাদ।

মা : মহারাজ বিরাট, আমার পূজা কর। আমি জগতের দেবী, মহাদেবী।

রাজা : আমার রাজ্যে দেবীপূজা নাই। আমার রাজ্যে কেবল শিবের পূজা হয়।

মা : মহারাজ, পূজা করবে না তাহলে? এখন সাবধান। শুকনো ডাঙ্গায় তরী মজাব, পচাব, ধসাব, হাড় হতে মাংস টুকরো টুকরো করে খসাব।

দেবীর আদেশ লইয়া ব্যাধিগণ আইল ধাইয়া
আহ্বানিয়া কহেন শীতলা।
আয় জ্বর হাণ্ডা কাণ্ডা কফ, কাশি, মাথা ব্যথা
কড়া পিত্তি ধাইয়ে আইলা।।
গৃধিনী সূতিকা সার স্বচ্ছন্দে ছাড় বাস
কালিন্দি পাদুকা পালা জ্বর।
গায়ে আম অষ্ট মুক্তি, নয় কফ চল্লিশ পিত্তি
আসি বায়ু হইল একত্তর।।
চলে ভেদ ভেদান্তর পাফাটা বাতজ্বর

এইরূপে চলিলেন যত সব জ্বরে।
এতেক বলিয়া তখন নিত্যানন্দ গান
নায়েকের কর রক্ষা বলি মা তোমারে।।

শতানিক্য মুদিরাক্ষ চারি সহোদর,
তাঁর ছোট ভ্রাত শঙ্খকুমার উত্তর।
চারি ভাই কেঁদে বলে ওমা হাটে যাই,
গোলাহাটে এসেছে নাকি অমর কলাই।
রাণী বলে প্রাণ গেলে নিয়ো না বালাই,
না খাই দেখে আসি কেমন কলাই।

রানী কোটালের আজ্ঞা করেন। কোটাল সেই গোলাহাটে গিয়ে উপস্থিত হল।

কোটাল ঃ বুড়ি, তোমার কলাইয়ের দাম কত? - - - মুষ্টিকে কাহন কড়ি? দেব না।

বুড়ি ঃ আমার কলাইয়ের দাম না দিলে আমি কলাই বিক্রী করব না।

কোটাল ঃ দাম না দিলে কলাই যদি বিক্রি না কর তাহলে আমার এ হাট থেকে উঠে যাও, আমাদের এই হাটে কলাই বিক্রি করতে দেব না।

কথা।। কোটাল না যেতে যেতে বুড়ি অন্য হাটে গিয়ে কলাই বিক্রি করতে বসেছে। একি হল, আমি না আসতে আসতে বুড় যে আগে এল? কোটাল বাড়িতে ফিরে এসে রাজাকে সমস্ত কথা বলল। রাণী রাজাকে দেবীপূজা করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু রাজা বলেন, আমি দেবীপূজা করব না, আমি শিবের উপাসক।

গান ।। ডুব দেরে মন কালি বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে.....

বাছারে, গণকে শুনেছে, সেই ভয় হচ্ছে বাড়া
এ সনের ফাল্গুন মাসে বাছাদের আছে ফাঁড়া।
ফাল্গুন মাস কেটে যাক যা বলবার বলব
তবু বিরাট বলে, শিব ছেড়ে দেবীপূজা না করব।
প্রথম পুত্রকে রাখলেন পান সরোবরে লুকায়ে
দ্বিতীয় পুত্রকে রাখলেন মানস সরোবরে।
তৃতীয় পুত্রকে রাখলেন পর্বত গহ্বরে
চতুর্থ পুত্রকে রাখলেন কীচকের ঘরে।

কথা।। মা তখন বলছেন— ও আমার ভয়ে লুকায়ে রেখেছে। দেখি বেটা তুই আমার হাত হতে কেমনে রক্ষা পাস। তখন মা কি করলেন— মা মহাশ্বেত বর্ণ পাতলার রূপ ধরে পদ্মসরোবরে গিয়ে প্রথম পুত্রকে নিধন করে মানস সরোবরে গেলেন। সেখানে গিয়ে দ্বিতীয় পুত্রকে নিধন করলেন। তারপর দেবী পর্বত গহ্বরে গিয়ে দরশন দিলেন। সেখানে

বলছেন এস ভাই, পাশা খেলি, বহুদিন পাশা খেলা হয় না। পাশা খেলতে খেলতে গায়ে জ্বর হল, সেখানে তাকে বসন্ত ব্যাধি দিয়ে অন্যত্র গেলেন। পরের দিন কীচকের গুরুপত্নীরূপে দর্শন দিলেন।

কীচক : এই যে, বহুদিন পরে মা আমার ঘরে আসছেন। মা তোমার হাতে ও কি?

মা : এ একটি ফুলের মালা। এই মালা যে পরবে সে অমর হবে।

কীচক : তবে মা এই মালা উত্তরকে পরিয়ে দাও।

কথা ॥ এই বলে কীচক করিল গমন। উত্তরের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে এসে দেখে মা নেই। মাকে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছে। এদিকে উত্তর বলছে মা, আমার গায়ে এসব কি বার হয়েছে? এদিকে রাজার কাছে খবর গেল কিন্তু রাজা তবুও বলে, আমি দেবীপূজা করব না। রাণী রাজার পায়ে ধরে কান্নাকাটি সত্ত্বেও তিনি অনড়।

গান ॥

বাছা আয় রে আয় আর আমার কেহ নাই রে
কোটালের আজ্ঞা কর ডেকে আনুক হাড়ি
শ্মশানে লইয়া ফেলুক পায়ে বেঁধে দড়ি।
রাণী বলে বাছাকে আগুন দিওনা মুখে
হাড়িতে যেন টানে না আমার সোনার চাঁদ বাছাকে।

কথা ॥ রাজা বলে, হাড়িকে ডাকতে হবে না, আমি কবিরাজ ডেকে চিকিৎসা করাব তথাপি আমি দেবীপূজা করব না। মা শুনলেন বিরাটের কথা। তিনি বসন্তরায়কে কবিরাজরূপে পাঠালেন। বসন্তরায় কবিরাজ সেজে রাজার কোটালের সাথে ছলচাতুরী করে রাজার বাড়ি গেলেন। রোগীকে দেখে বলছেন, এ যে ভারী শক্ত রোগ। তবে এ রোগের ওষুধ আমার ঘরে আছে, কিন্তু অনুপান আমার নেই। অনুপান যোগাড় করে দিতে হবে।

রাজা বলছেন—বলুন অনুপানের কথা।

রহিত মৎস্যের মূত্র ছাগলের নিঃশ্বাস
চন্দ্রের কিরণ আর শূন্যের বাতাস
ঢেঁকির রুধির আর চন্দনগাছের পুষ্প
ইক্ষুগাছের ফল আর ডুমুরের পুষ্প
ঘটনাতে ফেলে তুমি ঘটাও সকল
সবাইকে মাখায়ে দেহ ব্যাধি হবে ধ্বংস
জোড়া লাগবে পচে গেছে দেহের যত মাংস।

আমি দিতে পারলাম না, আর আমার ছেলে তোমার বাঁচাতে হবে না।

বসন্তরায় : তবে আর একটি কথা বলব মহারাজ? বৃক্ষ হতে এক বিল্বদল দেহ আমায়, শীতলার নামে সর্বব্যাধি ধ্বংস হবে বলছি তোমায়।

কথা ॥ তারপর মায়ের কৃপায় রাজার ছেলে বেঁচে উঠল। মাতা শীতলার উপর তাঁর

গান ।। মা আমার ঘোরাবি কত কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত। ....

রাজা ঃ মা, নিজগুণে দয়া করে আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা কর। তোমার এই ব্যাধির নাম কি মা?

মাতা ঃ আমার এই ব্যাধির নাম বসন্তব্যাধি। তেরোদিন পরে স্নান করে জ্ঞাতিবন্ধু-বান্ধব আর ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করে আমার পূজা কর।

রাজা ঃ তোমার পূজার নিয়ম আমি কিছু জানি না। আমাকে পূজার নিয়ম বলে দাও।

গান ।। অসংখ্য বোয়াল রুই, ছাগ, মেষ কাহন দুই,
মহিষ যে কাহন পঞ্চাশ।
অগনন কৃষ্ণ সার, যত দিতে পার আর,
কবুতর আর বালিহাঁস।।

রাজা ঃ ও মা, তুমি রাক্ষসী না পিশাচী? এতগুলো খাবে?

মাতা ঃ না আমি খাব না, আমার অনুচরেরা খাবে।

রাজা ঃ আমি তো এ তামসিক পূজা করি না মা।

মাতা ঃ তবে তুই বিল্বপত্র আর গঙ্গাজল দিয়ে আমার পূজা কর।

রাজা ঃ তাই করলেম মা।

পয়ার।।
দুর্গা দুর্গা তুমি মাগো দুর্গতিনাশিনী।
শঙ্কটেতে কর রক্ষা কালেরও ঘরনী।।
দুর্গা নাম নিয়ে যেবা পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি তার কি শুধায়।।
না হইয়া বাম মাগো না হইয়া বাম।
পদযুগে লিখে রেখ দাসের এই নাম।।
পদযুগে লিখতে যদি আঁচড় লাগে গায়।
ধূলায় লিখিয়া চরণ দিবে তায়।।
ধূলায় না লিখে দুর্গে লিখিবে বসনে।
বসন দেখিয়া দাসের পড়ে যাবে মনে।।
কালিকান্তি কপালিনী কপালকুণ্ডলা।
ক্ষম দোষ বালকে দিও পদচ্ছায়া।।
তুমি মোরে ছাড় যদি আমি না ছাড়িব।
ব্যাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।।

অষ্টমঙ্গলা।।
নমঃ নমঃ নমঃ মাগো শীতলা জননী
তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি।
একচিত্ত হয়ে শুন অষ্টমঙ্গল।
শীতলার পাদপদ্মে দেহ সুপারি পুষ্প জল।
জয় জয় হুলাহুলি এ তিন ভুবন

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষন।
সেইরূপে পূজা করিল বিরাট রাজন
সেইমত পূজা করে যেন জগৎজন।
পূজা শেষে বিরাট রাজা করিল স্তবন
স্তব শুনে শীতলার আনন্দিত মন।
বর মাগো বর মাগো ওহে বাছাধন
যে বর মাগিবে বাছা দিবরে এখন।
তোমার চরণে মাগো এই বর চাই
স্মরণ করিলে যেন দরশন পাই।
তোমার চরণে আমার এই নিবেদন
অনুক্ষণ রহে যেন ও চরণে মন।
তোমার চরণে মাগো এই বর চাই
ব্যাধির যন্ত্রণা যেন কভু নাহি পাই।
বর দিয়ে শীতলার আনন্দিত মন
মায়ের চরণে মজ ওহে মোর মন।
তোমার চরণে মাগো কি বলিতে জানি
সব দোষ ক্ষমা করে রাখিবে আপনি।
কোটি কোটি অপরাধ বালকে যদি করে
জননী হইয়া কভু দোষ নাহি ধরে।
যে গায় যে গাওয়ায় গীত করিয়া কামনা
অবশ্য পুরাবে তাদের মনের বাসনা।
আমার নায়েকের মাগো আছে যত গুণ
সবাকার আনন্দ হবে তার তিনগুণ।
যেই রূপে করিলেন দয়া বিরাট ভবনে
সেইমত কর দয়া আমার নায়েকগণে।
যে দেবে ষোল আনা তোমারে জানাই
ধনধান্য আর বাড়াও পরমাই (পরমায়ু)।
অবশেষে গায়েনগণ মেগে লই বর
তোমার চরণে মন থাকে নিরন্তর।
শীতলার চরণ ভাগে দ্বিজমাধবেতে গায়
হরি হরি বল সবে অষ্টমঙ্গলা হয়ে যায়।

(কাহিনী সমাপ্ত)

শীতলার মূল পালাগুলি প্রচলিত কাহিনী বিন্যাস অনুসারে পরিবেশিত হয়। পালাকারগণও অনেক ক্ষেত্রে মূল শীতলার মাহাত্ম্যমূলক কাহিনীর পাশাপাশি কতকগুলি খণ্ডিত পালা পরিবেশন করেন, যেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পালাগুলি প্রধান —

১) শীতলার বাহন গাধার জন্ম
২) ধূমাবতী ও শীতলার জন্ম
৩) জ্বরাসুরের জন্ম
৪) রক্তাবতীর জন্ম

সাধারণত মূল শীতলাপালার অঙ্গ হিসাবে 'পার্শ্বপালা' রূপে এগুলি গীত হয়। পার্শ্বপালাগুলির আয়তন হয় স্বল্প। নিম্নে কয়েকটি পালার সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রদান করা হল।

শীতলার বাহন গাধার জন্মকথা

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পঞ্চমুখে ঈশ্বরের নামগান করছেন। এমন সময় কন্যা সন্ধ্যা তাঁর সামনে আসেন। সন্ধ্যার ছায়া ভূমে দেখে তিনি গান ভুলে কামে জর্জর হয়ে যান। তখন সন্ধ্যা তাঁকে অভিশাপ দিলেন নারী ছায়ামূর্তি যে মুণ্ডু মারফৎ দেখে ব্রহ্মার দেহ কামে জর্জর হয়েছে সেই মুণ্ডুটি খসে যাবে (সেই থেকে ব্রহ্মার চার মুখ)। তৎক্ষণাৎ সেই মুণ্ডুটি দেহচ্যুত হয়ে উড়ে গিয়ে কৈলাস শিখরে মহাদেবের হাতে পড়ে। মহাদেব সেই মুণ্ডটি ত্রিশূল-এ গেঁথে কাশি বারাণসীতে রাখলেন। বারাণসীতে মহাযোগী মহাদেব ও দেবী অন্নপূর্ণা সতত বিরাজমান। বারাণসী নদীর অপর দিকে হরিশচন্দ্র ঘাট। সেখানে ব্যাসদেব একটি বারাণসী তৈরি করছেন। তখন দেবী অন্নপূর্ণা মহাদেবকে বলেন, এই দুটি বারাণসীতে কে বা কারা যাবে। তখন মহাদেব জানালেন, যারা ব্যাস কাশীবাসী হতে চায় তারা সেখানে যাবে আর যারা বারাণসী কাশীবাসী হতে চায় তারা এখানে আসবে। তখন দেবী অন্নপূর্ণা জানালেন তিনি দুটি কাশী হতে দেবেন না, তাই ব্যাস কাশী বন্ধ করার পরিকল্পনা করে কালাবুড়ির ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বলেন বাবা ব্যাস, এখানে কারা আসবেন আর ওপারের বারাণসীতে কারা যাবেন, ব্যাসদেব মহাদেবের মতই উত্তর দেন। দুর্গা সেকথা শুনেও শুনতে পান না। বার বার প্রশ্ন করার ফলে ব্যাসদেব রেগে গিয়ে বলেন, এখানে যারা আসবে তারা মরে গাধা হবে। দেবী আপন রূপ ধারণ করে তথাস্তু বলেন। তখন দেবীর ছদ্মবেশ বুঝতে পেরে ব্যাসদেব বর ফিরিয়ে নিতে দেবীকে অনুরোধ করেন। দেবী তখন বলেন, এখানে এসে যে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করবে সেই হবে গাধা, নতুবা সেই হবে ব্যাস কাশীবাসী। তখন ব্যাসদেব বলেন, তাহলে যে গাধা হবে তার কি কোনদিন মুক্তি নেই? তখন দেবী জানালেন, মুক্তি তার হবে যদি আমার পাদস্পর্শ পায়। এই কথা বলে দেবী চলে গেলেন। তখন ব্যাস কাশীর রাজা বিক্রমজিৎ ব্যাস কাশীর মাহাত্ম্যের সাথে নিজের নাম অক্ষুণ্ণ রাখতে মৌনব্রত নিয়ে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন ও দেবীর অভিশাপ মত গাধা হন। এই গাধা হল মা শীতলার বাহন।

ধূমাবতী ও শীতলার জন্ম

নহুষ রাজা চৈত্র মাসে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন ব্রহ্মার আজ্ঞায়। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে

মঙ্গলবার যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা সেই যজ্ঞের হোতা। যজ্ঞে বিল্বপত্রে ঘৃত নিয়ে যখন অর্পণ করেন তখন যজ্ঞকুণ্ড থেকে ধোঁয়া নির্গত হয়। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে কুরূপা দিগম্বরী এক নারী মূর্তি। এই নারী বেরিয়ে এসে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার এই কুরূপ কেন? ব্রহ্মা অবাক হয়ে গেলেন, কারণ তিনি নহুষের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছেন কিন্তু তা থেকে নারীর সৃষ্টি হল কিভাবে? তাই তিনি নারীকে মিষ্ট বাক্যে আশ্বস্ত করে নিজেই কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং কমণ্ডলুর শীতল বারি ছিটিয়ে তার রূপ পরিবর্তন করে সুশ্রী এক নারীমূর্তিতে পরিণত করেন ও তাঁর নাম দেন শীতলা। ধোঁয়া থেকে জন্ম বলে তিনি প্রথমে হলেন ধূমাবতী, শীতল বারি ছিটিয়ে সুশ্রী হওয়ার জন্য তিনি হলেন শীতলা।

জ্বরাসুরের জন্ম

শীতলা ব্রহ্মার নিকট মাতৃ-পরিচয় জানতে চাইলে ব্রহ্মা বলেন 'ওঁ সুহয়া সুহয়া' মন্ত্র বলে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করায় তাঁর জন্ম হয়েছে, অতএব সাহাদেবী তোমার মাতা এবং আমি তোমার পিতা। তোমার কাকা হলেন মহাযোগী মহেশ্বর। তিনি কৈলাসে মহাদেবের কাছে গিয়ে দেখেন তাঁর দুই দাস (নন্দী ও ভৃঙ্গী) সিদ্ধি বাটছেন। তিনি তখন বলেন, মহাদেবের দেবতা হিসাবে যদি দাস থাকে তাহলে আমি দেবী, আমারও দাসদাসী থাকা দরকার। তখন মহাদেব সেই কথা শুনে জটা ছিঁড়ে মাটিতে প্রদান করায় এক কুৎসিত ভয়ংকর দেহ বিশিষ্ট অসুর জন্ম নেয় এবং মহাদেবকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়। এই দৃশ্য দেখে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে তাকে খণ্ড খণ্ড করেন। বিষ্ণু শীতলার কাছে এসে শীতলাকে আশ্বস্ত করে বলেন আমরা তিনজনে মিলে তোমাকে একটি দাস দেব, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সেই কাটা অসুরের দেহের উপর একটি করে পা রাখায় তার কাটা দেহ জোড়া লেগে যায়। তিন পা তার দেহে পড়েছিল বলে তার হল তিন পা, তিন মাথা এবং ছয় হাত। তিন খণ্ড জোড়া লেগে একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি হয়েছিল বলে তাঁরা এর নাম রাখলেন জোড়াসুর বা জ্বরাসুর। তাঁরা জ্বরাসুরকে শীতলার দাস বা পুত্ররূপে নিযুক্ত করলেন এবং তাকে চৌষট্টি জ্বরের অধিপতি করে দিলেন।

রক্তাবতীর জন্ম

জ্বরাসুরের দেহ ছেদনকালে তার রক্তে যে নদী বয়ে গিয়েছিল, এক ঋতুমতী ব্যাঘ্র সেই রক্ত পান করে গর্ভবতী হয়েছিল এবং তার উদরে একটি রক্তমাখা কন্যার জন্ম হয়েছিল। সেই কন্যার নাম রাখা হয়েছিল রক্তাবতী। এই রক্তাবতীকেই শীতলা দাসীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর শীতলার সাথে বিয়ে হয়েছিল ঘন্টাকর্ণ মুনির। শিবের একশ আটটি রূপের মধ্যে ঘন্টাকর্ণ একজন। এরপর শীতলা বাহন চাইলে মহাদেব ব্যাসকাশীর সেই গাধাকে শীতলার বাহন হিসাবে আনয়ন করেন। দেবীর পাদস্পর্শে ব্যাসকাশীর রাজা বিক্রমজিৎ

মুক্তি পেলেও তিনি মুক্তি নিলেন না, তিনি গর্দভ হয়ে মায়ের চরণতলে থাকতে চান। এইবার শীতলা, বাহন গাধা, স্বামী ঘন্টাকর্ণ, দাস জ্বরাসুর, কন্যা রক্তাবতী এবং পুত্র বসন্ত রায়কে নিয়ে মর্ত্যে এলেন। মহাদেব তাঁকে চৌষট্টি ব্যাধির অধিশ্বরীরূপে পাঠালেন। দেবী প্রথমে ব্রহ্মাসহ সমস্ত দেবতার পূজা করার পর মর্ত্যে এলেন এবং প্রথমে রাবণরাজাকে দিয়ে পূজা প্রচারের কথা ভাবলেন।

পাদটীকা
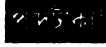
১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী (১৯৫৮) ভূমিকা, বাংলা শীতলাপূজার উৎপত্তি।
৩. প্রভঞ্জন মণ্ডল (৪৫) (দীর্ঘদিন মধ্যপ্রদেশে প্রবাসী ছিলেন), গ্রাম - বেগমপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
৪. চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ দেবতার নিকট মানত করার সময় একটি পরিস্কার নেকড়ায় (কাপড়-ছেঁড়া) 'শ-পাঁচ আনা' (৩৩ পয়সা) বা 'পাঁচ সিকি' (এক টাকা পঁচিশ পয়সা) বেঁধে গোলার ধারে, ঘরের চালে, বা দাওয়ার খুঁটিতে বেঁধে রাখে। একেই 'মুদো বাঁধা' বলে। মনস্কামনা পূর্ণ হলে ঐ পয়সা নিয়ে বা তার সাথে আরও কিছু যুক্ত করে যে দেবতা বা দেবীর নিকট মানত করা হয় তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়।
৫. হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
৬. ভূপতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (৭০) (শীতলা মন্দিরের পূজারী), গ্রাম- শিরাকোল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, সাক্ষাতকার।
৭. স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৮) (পুরোহিত), গ্রাম-বেগমপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
৮. পালাগান বা ক্ষেত্রগবেষণা সূত্রে বিজয়ের কোন বিশেষ পরিচয় লাভ করা যায়নি।
৯. পালাগান চলাকালীন পালাগায়ক বিশেষ কোন কোন দৃশ্যে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দর্শক বা শ্রোতাদের নিকট হতে চাল পয়সাদি ভিক্ষা করেন। একেই 'প্যালাতো' বলে।

দেবীপালা ঃ মনসা

চব্বিশ পরগণার প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী-বিষয়ক পালাগানগুলির মধ্যে লোকায়ত মনসার পালা দেবীপালার অন্তর্গত। লৌকিক দেবী মনসার কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত ও পরিবেশিত হয় এই পালাগান। লোকবিশ্বাসে মনসা হলেন সর্পের দেবী। সর্পভীতি থেকে রেহাই পাবার জন্য সর্পের দেবী মনসাপূজার সৃষ্টি, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে লোকসমাজের সকল স্তরের মানুষ মনসাপূজা করেন না। তাঁদের অনেকের ধারণা নাগ বংশরক্ষা করে। এছাড়া যেকোন রোগপীড়ার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, বিষয়, সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার জন্য ও সংসারের যাবতীয় মঙ্গল কামনা করে মনসাপূজা বা নাগপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তানদাত্রী রূপেও নাগ পূজিত হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় নাগপূজা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী বা বসুন্ধরা পূজা। লোকসমাজের অনেকেই এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মনসা বা নাগপূজা করেন। ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের উক্তিতে এই সত্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

"বর্ত্তমানে মনসা শুধু সর্পদেবী নামে পূজিত হইলেও পূর্বে ইহার মহিমা ব্যাপক ছিল। আর্যপূর্ব সমাজজীবনে মনসা ছিল প্রজননশক্তির দেবতা— শিশু ও সর্পের সহিত তাহার সম্বন্ধই ইহার প্রমাণ। সভ্যতার আদিযুগে মানব ও পশু যখন পাশাপাশি বাস করিত তখন পরস্পরের প্রতি ভয়ের পরিমাণ ছিল কম। পরবর্তীকালে সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত সর্পভীতি বাড়ায় সর্পের জন্য পৃথক দেবতার সৃষ্টি হয়। প্রজননশক্তির জন্য তখন অন্য দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে, খুব সম্ভব তাহারই পরবর্তী রূপ ষষ্ঠী। মনসার অনেক গুণের মধ্যে আরোগ্য ও পুষ্টিও আছে। এই গুণ দুইটি ষষ্ঠীর সহিত মিলিত হইয়া মনসাকে শুধু সর্পদেবতায় পরিণত করিয়াছে। বাংলাদেশে অনেক স্থানে মনসার মূর্তিতেই ষষ্ঠীপূজা করা হয়। ষষ্ঠী ও মনসার নিকট সম্বন্ধই ইহাতে সূচিত হইতেছে।"[১]

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সুহীবৃক্ষে বা সিজমনসা গাছে অথবা জীবন্ত সর্প বা সর্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মনসার মূর্তিতে সর্পপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে মনে করেন সর্পপূজা

মধ্যযুগের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে Snake Cult মধ্যযুগীয় নয়। এই পূজার উৎস সুদূর অতীতে। বিভিন্ন স্থানের প্রত্নিদর্শনে সর্পদেবতা ও সর্পদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুমূর্তি ও সর্পভূষণ মহাদেবের পূজাকে প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দুসংস্কৃতির Snake Cult-কেই স্মরণ করায়।[২] সম্ভবত সর্পপূজা মধ্যযুগ থেকেই মনসাপূজা বা নাগপূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে।

মনসার মূর্তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। কোথাও মনসা কেবল পদ্মের আসনে উপবিষ্টা। তাঁর মাথার উপরে বহু ফণাবিশিষ্ট সর্প ফণা বিস্তার করে আছে। কোথাও মনসাকে সিংহাসনে উপবিষ্টারূপে দেখা যায়। মূর্তির পাশে থাকে হাঁস। হাঁস সাধারণত দেবী সরস্বতীর বাহনরূপে পরিচিত, কিন্তু মনসার বাহনরূপেও দেখা যায়। চব্বিশ পরগণায় হংসবাহন মনসামূর্তি কম দেখা যায়। মনসার চার হাত। উপরের দুই হাতে থাকে শঙ্খ ও সর্প এবং নিচের এক হাতে পদ্ম ও এক হাতে বরাভয় মুদ্রা। এই হস্তভূষণের ব্যতিক্রমও লক্ষ্যকরা যায়। মনসাকে সাধারণত সালঙ্কারা দেবীমূর্তিরূপেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

চব্বিশ পরগণায় সর্বত্রই মনসার পূর্ণাঙ্গ মূর্তিপূজা হয় না। বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থান থেকে যে-সমস্ত অধিবাসী এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আছেন, তাঁরা মৃণ্ময় সর্পফণামূর্তি পূজা করেন। এই সর্পফণা কোথাও আটটি, নয়টি বা বিয়াল্লিশটি হয়। বিয়াল্লিশ নাগের পাশে 'কোকা' অর্থাৎ ছোট ছোট সর্পফণা থাকে। সর্পমূর্তির উপরে পদ্ম থাকে। এই নাগকেই পদ্মা হিসাবে ভাবা হয়। সর্পফণাসমূহ বিভিন্ন রঙের হয়।

সুতরাং দেখা যায় চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে মনসাপূজার দুরকম রীতি প্রচলিত আছে। একটি মনসাদেবীর মূর্তিপূজা, অপরটি সর্পফণা বা নাগপূজা। সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, নাগপূজা দেবীমনসার পূজা নয়, এটি বসুন্ধরা পূজা। অবশ্য স্থানীয়ভাবে এই পূজা মনসাপূজা বলে পরিচিত। যাঁরা মানত করে মনসাপূজা দেন, তাঁরা মনসার মূর্তিপূজা করেন। তাঁরা ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে হাঁস-পাঁঠা বলি দিয়ে সাড়ম্বরেই পূজা করেন। প্রায়ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ এই পূজানুষ্ঠান করেন। নাগপূজা ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত পূজানুষ্ঠান করলেও পূজায় খুব বেশি আড়ম্বর থাকে না। উভয় পূজার ক্ষেত্রে যতক্ষণ না পূজা হয় ততক্ষণ বাড়ির মহিলাগণ উপবাসী থাকেন। পূজা হয়ে গেলে প্রসাদ গ্রহণ করে তবেই আহারাদি গ্রহণ করেন। পূজা সাধারণত দুপুর বারোটার পর থেকে পাঁচটার মধ্যেই সমাপ্ত হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, 'দেবী রাগী' বলে দিনের এই সময়ের মধ্যে পূজা করা হয়। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে সর্প (নাগ) বা মনসাপূজা ব্যাপকভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।

নাগপূজার বিশেষ কতকগুলি নিয়ম আছে। সর্পফণার সামনে একটি ঘট বসান হয়। জল ভর্তি ঘটের মুখে থাকে আম্রপল্লব ও পদ্মফুল। নাগের সামনে মনসার'হালা পাতা' হয়। কচুপাতা, মাটির সরা বা লোহা-ছাড়া পিঁড়িতে হালা পাতা হয়। রবিবার বা

বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে যেকোন দিনে হালা পাতার নিময়। 'হালা পাতা' হল মুগডাল ভিজিয়ে চার-পাঁচদিন আগে কচুপাতা, সরা বা পিঁড়িতে পূর্বস্থিত মাটির উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মুগডাল ছাড়া আরও অন্যান্য শস্যবীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাটির রসে ঐ সমস্ত কলাই বা শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয় ও কয়েক ইঞ্চি বেড়ে যায়। একেই বলে 'হালা পাতা'। নাগপূজার পরদিন এই হালা বিসর্জন দেওয়া হয়। ফণাযুক্ত নাগের দুইদিকে দুটি পাত্রে দুধ ও কলা থাকে। একটি পাথরবাটিতে একপোয়া খাঁটি দুধ ও গোটা সবরী কলা থাকে। এটি পূজার শেষে সবাইকে পরিবেশন করা হয়। বড় একটি বা পাথর বাটিতে সোয়া সের দুধ-জল থাকে। সেটি গঙ্গায় বা পুকুরের জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। নয়টি নাগফণা ও বিয়াল্লিশটি নাগফণা দুইদিকে রেখে অনেকসময় পূজা হয়। নয়টি নাগের পাশে নয়টি সবরী কলা, বিয়াল্লিশটি নাগের পাশে বিয়াল্লিশটি সবরী কলা দেবার নিয়ম আছে। এছাড়া পেয়ারা শশা, ন্যাসপাতিও দেওয়া হয়। এই নিয়ম সর্বত্র এক নয় বলে জানা যায়। নাগের সামনে একটি বাটিতে আতপচাল, তার উপর পান ও হরিতকী থাকে। ধূপ, ধুনা ও প্রদীপ নাগপূজায় জ্বালান হয়। চব্বিশ পরগণার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে মনসাপূজায় ধুনা পোড়ান হয় না। তাদের বিশ্বাস (মনসার কাহিনীতে আছে) মায়ের একটি চোখ দেবীগৌরীর খুন্তির গোঁজায় ক্ষতযুক্ত বা খারাপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাই তিনি ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। এই নিয়ে এই অঞ্চলে একটি লোকপ্রবাদও প্রচলিত আছে।—

"একে মা মনসা কানী, তায় পেয়েছে ধুনোর গন্ধ।"

অর্থাৎ দেবী একে রাগী, তার উপর পূজার সময় ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে তাঁকে আরও বিরক্ত করতে এ অঞ্চলের লোকসমাজ রাজী নন। মানত থাকলে নাগপূজাতে অনেকে হাঁস, পাঁঠা বলি দেন। প্রাণীবলি নিষিদ্ধ থাকলে কুমড়া বা ঐ জাতীয় ফল বলি দেবার ব্যবস্থা থাকে। ঢাক, ঢোল বাজিয়ে যজ্ঞাদি করে এই বলি দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির এই পূজায় তাল ও চিঁড়ে খাওয়ার বিশেষ নিয়ম আছে। নাগপূজায় রক্তপদ্ম (কোকনদ) লাগে।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে দেবীমনসার একটি বিশেষ পূজার প্রচলন আছে। একে 'অরন্ধনপূজা' বা স্থানীয় ভাষায় 'রান্না পুজো' বলে। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারে এই পূজা হয়। এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। পূজার দিন কোন অঘটন ঘটে অতীতের কোন এক সময়ে যে পরিবারে রান্নাপুজো বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের উত্তরপুরুষগণ রান্নাপুজো করেন না, তবে পান্তাভাত খান।

'অরন্ধন' শব্দের অর্থ হল রান্না না করা। অরন্ধন পূজা প্রকৃতপক্ষে রন্ধনবস্তু বাসি করে (শীতল করে) পূজা করা। এই পূজার দিন কোনরকমভাবে বাড়িতে উনুন জ্বালান বা গরম খাবার খাওয়া হয় না। এটি এই পূজার একটি সংস্কার। এটিকে রান্নাপূজা বলার কারণ হল, পূজার আগের রাত্রিতে খুব ঘটা করে বিভিন্ন রকম রান্না করা হয়। সেই রান্না

পরদিন পূজা করা হয়। পূর্বদিন রন্ধন, পরদিন অরন্ধন। রন্ধনের দিন পূজাচার করে রান্না শুরু। পরদিন পূজাচার করে রন্ধন বস্তু খাওয়া হয়। নতুন করে রান্না হয় না। সুতরাং অরন্ধন পূজা' ও 'রন্ধনপূজা' এই দুই নামই তাৎপর্যপূর্ণ। 'রন্ধনপূজা'কে অনেকে ব্রহ্মপূজা ও পূর্বপুরুষের পূজা বলেন।

রান্নাপূজার অধিকার এ অঞ্চলে একমাত্র মহিলাদিগের আছে। ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে অরন্ধনপূজার জন্য ডাকা হয় না। মহিলাগণ অতিশয় শুদ্ধাচারে মায়ের পূজা করেন। পুরো ভাদ্রমাস চলে পূজার প্রস্তুতি। ঘরে যাবতীয় কাপড়চোপড়, কাঁথাকানি, বাসন-কোসন, হাঁড়ি-কুঁড়ি ইত্যাদি সবই এই মাসের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। মাটির ঘর হলে অবশ্যই ঘরের ভেতর-বার ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, ন্যাতা দিয়ে 'গোবরদেওয়া' হয়। অন্তত ঘরের ভিতর গোবর দেওয়া হয়ই। অরন্ধন পূজার আগের দিন পূজায় ব্যবহৃত সমস্ত হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসনপত্র, শিল-নোড়া ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু আর একবার পরিষ্কার করা হয়। তারপর রান্নার জন্য শাকসব্জী ইত্যাদি সবই পুকুর থেকে বা কলের জলে ভাল করে ধুয়ে নেওযা হয়। সন্ধে থেকেই চলে মহিলাদের রান্না-বান্নার তোড়জোড়। যাঁরা অর্থবান তাঁরা ছত্রিশ রকম ব্যঞ্জনাদি, পিঠে, পায়সাদি সারারাত ধরে প্রস্তুত করেন। রান্না শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে যায়। তারপর রান্নাভাতে জল ঢেলে পান্তা করে রাখা হয়। পরদিন ব্যঞ্জনাদিসহ পান্তাখাওয়াকে 'পান্না করা' বলে। আত্মীয়স্বজনকে পান্না করার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। বলা বাহুল্য পান্নার দিন সকালে জ্ঞাতি আত্মীয় বন্ধুদের পান্না করার নিমন্ত্রণরীতি প্রচলিত আছে। এইদিন বিশ্বকর্মা পূজা হয়।

অরন্ধনপূজা বা মনসাপূজায় বিভিন্ন সংস্কার পালিত হয়। ৩০শে ভাদ্র বিকালে মহিলাগণ নাপিত ডেকে নখ ছেনে অশৌচাদি মুক্ত হন। তারপর স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে 'ব্রহ্মাপূজার' আয়োজন করেন। ব্রহ্মাপূজা হয় উনুনে। রান্নাপূজার জন্য আয়োজিত সমস্ত উপকরণাদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ জ্বলন্ত উনুনে দিয়ে ব্রহ্মাপূজা করা হয়। এই পূজার নিয়ম হল, পূর্বে প্রস্তুত সমস্ত সব্জি সামান্য পরিমাণে কেটে তেল, লবণ, লঙ্কাদি সমস্ত মশলা, সামান্য পরিমাণ গুড়, চালের গুঁড়ো অল্প পরিমাণ; ফুল, দূর্বা, তুলসীপাতা, গঙ্গাজলইত্যাদি একটি 'আগুচ' কলাপাতায় (কচি কলাপাতা) রাখা হয়। এরপর গোবর নিকোনো উনুনে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। উনুনের ধারে একটি ডালায় বা খুরিতে অল্প সিদ্ধচাল, একটি পান, একটি সুপারি, একটি সিকি দেওয়া হয়। একে 'পুণ্যিপত্র' বলে। এরপর তিনটি বা পাঁচটি শঙ্খধ্বনি দিয়ে উনুনে আগুন দেওয়া হয়। সেই আগুনে আগুচ-কলাপাতায় প্রস্তুত নৈবেদ্য ব্রহ্মার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। একেই বলে ব্রহ্মপূজা। তারপর সিন্দুর চর্চিত হাঁড়ি বা কড়া উনুনে বসান হয় ও রান্না শুরু হয়। আয়োজন অনুযায়ী কোন কোন গৃহে রান্না চলে প্রায় সারারাত। রান্না সমস্তটাই ঝোলবিহীন। এইদিন কোন গৃহে মাংস রান্না হয় না। তবে মাছ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকে। 'আমিষ রান্নাপূজা' যাঁদের সিদ্ধ তাঁদের ব্রহ্মাপূজায় অবশ্যই একটি কাঁচামাছ থাকে। রান্নাপূজায় পিঠে পায়সাদি বিভিন্ন রান্নার মধ্যে 'ডালচচ্চড়ি' অবশ্যই থাকে।

সমস্ত রান্না শেষ হলে উনুন গোবর দিয়ে একটি মালসায় মা-মনসার নামে আতপচালের ভাত হয়। ভাত হয়ে গেলে আবার উনুন গোবর দিয়ে গঙ্গাজল, ফুল, দূর্বা দিয়ে "উনুনপূজা" বা "ব্রহ্মাপূজা" সমাপ্ত হয় এবং উনুনে জল ঢেলে দিয়ে উনুন "শীতল করা" হয়। এরপর ভাতে জল ঢেলে দেওয়া হয় এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কলার পাতা চাপা দেওয়া হয়। কোন কোন গৃহে শেষ উনুনপূজার সময় সমস্ত তৈরি খাদ্য অল্প পরিমাণ নিয়ে উনুনে দিয়ে শঙ্খধ্বনিসহ পূজার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তারপর অনেকক্ষেত্রে সমস্ত পূজা শেষে রন্ধন খাবারের 'আগ' কাটিয়ে পূজার জন্য রেখে পরিবারের লোকজনকে গরমভাত তরকারী খাওয়ানো হয়।

রান্নার পরদিন অর্থাৎ ভাদ্র সংক্রান্তিতে সকালে একজন মহিলা স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে মনসাপূজার আয়োজন করেন। তিনি প্রথমে উনুনের ছাই তুলে উনুন গোবর নিকিয়ে পরিষ্কার করেন। তারপর চালের গুঁড়ো জলে গুলে উনুনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর মনসাগাছের ডাল, কেঁশে বা কাশফুল উনুনের মধ্যে দেওয়া হয়। শাপলা ফুল সমেত তুলে, বিশেষ পদ্ধতিতে ডাঁটার মালা তৈরি করে প্রতিটি খাদ্যপূর্ণ হাঁড়ির গলায় দেওয়া হয়। আঙচ কলাপাতায় ফলমূল, চিনি, বাতাসা দিয়ে মনসার নামে নৈবেদ্য দিয়ে প্রদীপ, ধূপ (ধূনা বাদ) জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বড় দুটি শাপলার পাতায় প্রতিটি রান্না বস্তুর সামান্য অংশ কেটে নিয়ে নাগ-নাগিনীর নামে উৎসর্গ করা হয়। দুটি পাথরের থালা বা পিতলের থালায় সমস্ত প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ (সবটাই গোটা) 'বুড়োবুড়ির ভাত' নামে বুড়োবুড়ির উদ্দেশে অর্পণ করা হয়। এই 'বুড়োবুড়ি'-কে কেউ বলেন 'মা মনসা বুড়ি ও তাঁর স্বামী জরৎকারু-বুড়ো।' আবার কেউ বলেন, এই বুড়ো-বুড়ি হলেন এই বংশের শেষ বুড়োবুড়ি। তাঁদের উদ্দেশেই ঐ থালার নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শাপলাপাতায় খাবার দেওয়া হয়। কেউ সাতপুরুষের উদ্দেশে কেউ দশপুরুষের উদ্দেশে পাতায় সবরকম রান্না দেন। সেক্ষেত্রে আলাদা থালায় 'বুড়োবুড়ির ভাত' দেওয়া হয় না। এই নৈবেদ্য অবশ্য বাড়ির বালক ও বালিকাদের মধ্যে বিতরণের রীতি আছে। এরপর সমস্ত রান্নার উপর ফুল, দূর্বা, তুলসীপাতা দিয়ে (আমিষ হলে তুলসীপাতা দেওয়া হয় না) শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়ে নমস্কারাদি করে রান্নাপূজা বা 'অরন্ধনপূজা' সমাপ্ত করা হয়। পূজা শেষে নমস্কারকালে মহিলাগণ মা মনসার নিকট সন্তানাদির বিঘ্নহীন সুখসমৃদ্ধিময় জীবন কামনা করেন।

পূজা অন্তে কিছু সময় পর (৫-১০মি.) পূজার ফলমূল সবার মধ্যে বিতরণ করা হয় ও রান্নাখাবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব মিলে খাওয়া হয়। একেই বলে 'পান্না' বা 'পান্না করা'। পান্তাভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে 'পান্নার নিমন্ত্রণ'। এই দিন অনেক গৃহস্থ বাড়িতে পুরোহিত ডেকে গোলার ধারে বা বাস্তুঠাকুরের থানে মনসার পূজা দেন। মানত থাকলে মনসার পালাগান দেন।

পান্নার পরদিনকে (১লা আশ্বিন) বলা হয় 'টক পান্না'। এইদিন প্রভাতে হাঁড়ির সমস্ত পান্তা, ফুল ইত্যাদি কুলোয় করে মাথায় নিয়ে, শঙ্খ-কাঁসর বাজিয়ে পুকুরের জলে

বা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। এরপর পূর্বদিনের সমস্ত ভাত-তরকারী, যা অবশিষ্ট থাকে তাই খাওয়া হয়। পান্তাভাত ভালো করে নতুন জলে ধুয়ে নেওয়া হয়। 'এলিয়ে যাওয়া' (নষ্ট হয়ে যাওয়া) তরকারী সব এক সঙ্গে ভাল করে গরম করে ঐ পান্তাভাতের সাথে খাওয়া হয় অথবা ফেলে দেওয়া হয়। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজের বিশ্বাস সব দেবদেবী অপেক্ষা মনসা দেবী বেশি রাগী। তাই রান্নাপূজার দিন অতিশয় শুদ্ধাচারে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করা হয়। মনসা পূজার কালে বা বছরের যেকোন সময় বিশেষ উপলক্ষে মনসার পালাগান অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় চব্বিশ পরগণায় মনসার পালাগানের আসরসংক্রান্ত বিশেষ কিছু রীতিপদ্ধতি প্রতিপালিত হয়। নায়েকের বাড়ির উঠানে বা আসরের স্থলে এক কোণে মনসার উদ্দেশে একটি ঘট স্থাপন করা হয়। ঘটটি মাটির, পিতলের বা তামার তৈবি হয়। জলপূর্ণ ঘটের মাথায় থাকে আম্রপল্লব, সশিষ ডাব, নতুন বস্ত্র, লাল সূতা, আলতা পাতা, সিঁদুর, শাঁখা ও নোয়া। ঘটের সামনে রাখা হয় একটি গোটা আলু, একটি পান, একটি সুপারি ও একটি এক টাকার মুদ্রাসহ এক পূর্ণপাত্র আতপ অথবা সিদ্ধচাল, এই পাত্রকে আঞ্চলিকভাবে বলা হয় 'পুণ্যিপত্তর' বা 'পূর্ণপাত্র'। ঐ স্থলে একটি তামার বা পিতলের বেকাবি অথবা কলার পাতায় থাকে ফলমূলাদি ও বাতাসা-সন্দেশ দ্বারা সজ্জিত নৈবেদ্য। মনসার উদ্দেশে স্থাপিত ঘটটি যে-কদিন পালাগান চলে সেই কদিনই স্থাপিত থাকে। পালাগানের প্রতিদিন এই ঘটের সামনে বন্দনাদি করে গায়ক মূল পালায় প্রবেশ করেন। পালাগান চলাকালীন পালার কাহিনীর সূত্রে ঘটনা বা চরিত্র অনুযায়ী কিছু উপকরণ ব্যবহৃত হয়। যেমন তালপাতার পাখা, 'ধানের বেজনী' ('বেজনী' হল ধানগাছের শিষ টেনে তুললে প্রায় হাতখানেক লম্বা ডাঁটাসমেত শিষ উঠে আসে, এইরকম কিছু শিষ একত্র করে মেয়েদের বেণী করার মত তৈরি করা হয়। একেই বেজনী বলে), 'মেলানীর ভার' (মেলানীর ভার হল — চিঁড়ে, মুড়কি, বাতাসাপূর্ণ বেতের অথবা বাঁশের বেঁতীর পাত্র, বেহুলার ভাই বেহুলার জন্য এটি এনেছিল), জোড়াঘট(চাঁদবেনের পূজার জন্য দুটি মাটির ঘট, যার একটি শিবপূজার জন্য ও অপরটি মনসাপূজার জন্য ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি। এছাড়া পালাগান চলাকালীন পালাগায়ক আরও কিছু উপকরণাদি ব্যবহার করেন, যেমন— লখিন্দরের ষষ্ঠীপূজার সময় একজোড়া ডিম, বিবাহের সময় বরণডালা, সনকার সাধভক্ষণের সময় মিষ্টান্ন ইত্যাদি। যে ঘটটি বসিয়ে পালাগায়ক মনসার পালাগান শুরু করেন, গানের শেষদিনে গানের শেষে ঘটবন্দনা করে, হরিলুট দিয়ে ঘটটি তুলে নায়েকের বা নায়েকের স্ত্রীর মাথায় তুলে দিয়ে গোলার ধারে স্থাপন করা হয়। এই ঘটটি নায়েকের বাড়িতে 'মনসার ঘট' নামে সারা বৎসর পূজিত হয়।

'ঘটবসান' সংস্কারের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। পালাগায়ক পালাগান শুরুর আগে ঘটটি গোলার ধারে বা বাড়ির মধ্যে কোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে বসান। গায়ক এই ঘটকে বন্দনা করে তাঁদের গান শুরু করেন। যে কয়দিন নায়েকের বাড়ি গান চলে

সেই কয়দিনই ঘটটি ঐ একই স্থানে থাকে। যেদিন গান শেষ হয়ে যায় সেইদিন পালাগায়ক দেবীর 'অষ্টমঙ্গলা' গান গেয়ে হরিলুট দিয়ে ঘটটি যেখানে বসান থাকে সেখান থেকে কিঞ্চিৎ সরিয়ে দেন। এই সংস্কারটিকে বলে 'ঘটনাড়া'। ঘটনাড়া হলে পর পালাগান আর চলে না অর্থাৎ ঘটনাড়া মানে পালাগানের সমাপ্তি ঘোষণা করা। পালাগায়ক ঘট নেড়ে দিলে বাড়ির গিন্নিমা সেই ঘটটি নিয়ে বাড়ির বাইরে কোন ঠাকুরথান অথবা বাস্তুসীমানার মধ্যে কোন বিশেষ থানে বা যেখানে সাধারণত বাস্তুঠাকুর পূজা হয় সেইখানে রেখে আসেন। এখানে ঘটটিকে আর সন্ধ্যা বা পূজা দেওয়া হয় না।

বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গলকাব্য বহু আলোচিত। মনসা লৌকিক দেবীরূপে স্বীকৃত। তথাপি 'পালাগান' আলোচনাকালে মনসার আলোচনা অতিশয় প্রাসঙ্গিক। পালাগানের আসরে মনসার যে পালা গাওয়া হয় তাতে পালাগানের সমস্ত আঙ্গিক বা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পালাগানের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পালাগানে থাকে তা হল— (ক) কাহিনী (খ) চরিত্র (গ) সঙ্গীত (ঘ) সংলাপ (ঙ) দোহার (চ) বাদ্য (ছ) মূল গায়কের ব্যাখ্যামূলক বিবৃিত ও কাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির জন্য কথা (জ) মূল গায়কের অভিনেতার ভূমিকা, গায়কের ভূমিকা ও কথকের ভূমিকা ইত্যাদি। এছাড়া মনসার পালা গাওয়া হয় দেবীর পূজানুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে। এটি লোকসমাজে লোকনাট্যের ধারায় পরিবেশিত হয়। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেও এই পালা গীত হয়।

মনসাপূজার গান বাংলার প্রায় সর্বত্রই হয়ে থাকে। বিশেষত জলাজঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলেই দেবীর পূজা ও পূজা উপলক্ষে গানের আসর অধিক অনুষ্ঠিত হয়। চব্বিশ পরগণার অধিকাংশ পালাগায়ক এই পালাটি গান করেন। পালার বিষয়বস্তু বা কাহিনী সর্বত্র প্রায় একই, কিন্তু পরিবেশন পদ্ধতি ও হাস্যরসাদি পরিবেশনে অঞ্চল বিশেষে পার্থক্য বা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে পালাগায়ক তাঁদের নিজস্বতা প্রকাশ করেন। গানের সুরও সর্বত্র এক নয়। বিভিন্ন তালে ও রাগরাগিণীতে গানগুলি গীত হয়। প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশ অনুযায়ী অন্য গান গেয়ে গায়ক পালাগানের পরিবেশগত রসকে ঘনীভূত করেন। অন্য গান বলতে প্রচলিত লোকসঙ্গীত বা ঐ ধরনের কোন সঙ্গীতকে বোঝানো হয়। যেমন মনসামঙ্গলের একটি দৃশ্যে বেহুলা কলার মান্দাসে মৃতস্বামীকে নিয়ে জলে ভেসে যাচ্ছেন। তখন পালাগায়ক অথবা দোহারদের মধ্যে থেকে একজন গান ধরেন। গানটি নিম্নরূপ —

সোনার বন্ধুরে নয়ন মিলা দেখ
বাসর সাজালাম নদীর জলে
পূর্বজন্মের অভিশাপে দংশাইল কালসাপে
আমারে যোগিনী কৈলারে।
ঘুমায়ো না আর বন্ধু কথা কহ শুনি
চরণে বেহুলা কাঁন্দে জনমদুখিনী।

চন্দ্র তারা আছেন জাইগা আকাশেরই তলে
বাসর সাজালাম নদীর জলে।
নিভায়োনা বাসর-দীপ মিনতি আমার
লখিন্দরের লইয়া আমি ফিরিব আবার।
পতিবিনা সতী কেবা আছে ধারা তলে
বাসর সাজালাম নদীর জলে।

(গানটি লোকমুখ হতে সংগৃহীত)

এই গানটি সব মনসার আসরে গীত হয় না। বেগমপুর গ্রামের গায়েন অনিল হাজরার দলে হারমোনিয়াম মাস্টার উদয়কুমার নস্কর গানটি গাইতেন। গানটি সখেদে গাওয়া হয়। ফলে, এই সঙ্গীতের প্রভাব বেহুলার গাঙ্গুড়ের পথের যাত্রাকে খুবই করুণ করে তোলে। এইরকম বহু গান পালাগায়কগণ আসরে পরিবেশন করেন যা মূল পালাগানের কাহিনীতে নেই।

মনসার পালাগান বাঙালী সমাজজীবনের দর্পণ। এই পালাগানে পালাগায়কগণ হিন্দুসমাজের আচার আচরণাদি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত ধরনের আচার আচরণাদি আছে, যা সংস্কার বা স্ত্রী-আচার নামেও প্রচলিত তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালাগানের আসরে তুলে ধরা হয়। যেমন সন্তান সাতমাস গর্ভে এলে মেয়েদের সাধভক্ষণ করান হয়। সাধেব যত নিয়মকানুন তা পালাগানের আসরে সাধের উপকরণাদি সহযোগে বাস্তবসম্মত করে প্রকাশ করা হয়। সাধভক্ষণকালে ননদ-জা-বৌদি প্রমুখ যারা রসিকতা করার যোগ্যা, রসিকতার মাধ্যমে পালাগায়কগণ তাদের চরিত্র জীবন্তরূপে চিত্রিত করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে দাইমার ভূমিকা ও তার চরিত্র, হিজড়ের ভূমিকা ও তার চরিত্র ইত্যাদি অতিশয় সরসভাবে প্রকাশ ও পবিবেশন করা হয় । মনসার পালাগানের সঠিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায়, এ পালায় রয়েছে বাঙালীর ঘরের চিত্র এবং পালাগান বাঙালীর জীবনের গান। বাঙালীর সমাজজীবনের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র মনসার পালাগানে প্রত্যক্ষ করা যায়।

চব্বিশ পরগণায় মনসার যে পালাগান গীত হয় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান' কাহিনী অবলম্বনেই রচিত। গায়েনগণ একই কাহিনী নিয়ে মনসার পালা গাইলেও উপস্থিত মত আসরে নানারূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করেন। মনসা-মঙ্গলের মূল কাহিনীটি যেহেতু এক, সেকারণে এখানে মূল পালাগান বা কাহিনী সংক্ষেপ পরিবেশনার পরিবর্তে কিছু প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যময় অংশের সামান্যই উদ্ধৃত করা হল।

দেবীমনসার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনাকালে পালাগায়কগণ যেভাবে গান পরিবেশন করেন তা নিম্নরূপ —

কথা॥ মহাদেব বল্লুকানগরে কৃষিকর্ম করে কৈলাসধামে ফিরে এলে দেবীগৌরী তাঁর চরণবন্দনা করলেন না। কারণ দেবাদিদেব মহাদেব কুচুনী বাগদিনীকে প্রেম নিবেদন করে অপবিত্র হয়েছেন। সে কারণে তাঁকে মুক্তিহ্রদ থেকে স্নান করে আসতে বললেন। মহাদেব

মুক্তিহ্রদে স্নান করতে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে হংস-হংসী পরমানন্দে জলকেলি করছে। এই দেখে ভোলানাথের সেই হ্রদে পদ্মপাতায় বীর্যপতন ঘটে। সেই বীর্য নাগিনী কদ্রু ভক্ষণ করেছিল। উদরে সেই বীর্য সইতে না পেরে বাসুকীকে জানাল। বাসুকী তখন কশ্যপমুনির কাছে জানতে গেল। কশ্যপমুনি ধ্যানে জেনে বললেন মহাদেবের বীর্য খেয়ে ওর ঐ দশা হয়েছে। ঐ বীর্য বার করে দিলে যন্ত্রণা কমে যাবে।

এই কথা শুনে কদ্রু বীর্য উগরে ফেলেছিল
সেই বীর্য থেকে দেবীমনসার জন্ম হয়েছিল।।

গীত॥ দিনে দিনে বাড়ে আমার মনসা জননী গো
একও দিনে দুইও দিনে বাড়ে মনসা জননী গো
এইভাবে মা মনসা পাঁচ বৎসর হয় গো।

কশ্যপমুনি বাসুকীকে বলছেন পাঁচটি সর্প দিয়ে মনসাকে পদ্মবনে রেখে এস। পদ্মবনে গিয়ে মাতা তখন এফুল থেকে ওফুলে বসছেন। এমন সময় সেখানে মহাদেব এলেন। অপরিচিত মেয়েকে দেখে মহাদেব জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি কন্যা, একা পদ্মবনে? বাবা, আমি তোমার মেয়ে মনসা। মনসার কথায় মহাদেবের মনে কেমন সন্দেহ হল। তখন মহাদেব ধ্যানে বসে দেখলেন, হ্যাঁ তাই তো, তাঁরই বীর্য পদ্মপাতায় পড়ে তার থেকেই এর জন্ম হয়েছে। তখন মনসাকে কন্যা হিসাবে মেনে নিয়ে বলছেন— আচ্ছা মা, তুমি এক কাজ কর, আমার এই ফুলের সাজিতে লুকিয়ে থাক। আমি তোমাকে পুষ্প চয়নে নিয়ে যাব।

গীত॥ ওদেব যায় ওদেব যায় গো,
পুষ্প অন্বেষণে ওদেব যায়।
ফুলের সাজিতে মাতা রয়
ওদেব যায় গো।

মহাদেব : মা, তুমি সব মন্দিরে যাবে কিন্তু উত্তর দিকের মন্দিরে যেও না।

মনসা : কেন পিতা, আমি উত্তর দিকের মন্দিরে যাব না?

মহাদেব : গৌরী তোমাকে দেখলে অপমান করতে পারে, তাই তোমাকে সাবধান করে দিলাম।

মনসা : তবে আমি এখানেই লুকিয়ে থাকি।

কথা॥ এদিকে নারদ গিয়ে গৌরীকেএক নয় আর করে নানারকম কথা বলে।

নারদ : মামীমা, তোমার একটা সতীন এসেছে, ঐ কালীমন্দিরে আছে।

কথা ॥ তখন গৌরী সতীন দেখতে কালীমন্দিরে যায়, এমনসময় পথে গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয়।

গঙ্গা ঃ দিদি, তুমি এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছ?

গৌরী ঃ আমি একটা মেয়েকে দেখতে যাচ্ছি, সে নাকি আমার সতীন?

গঙ্গা ঃ না না, সে তোমার সতীন নয়, তোমার মেয়ে।

কথা ॥ গৌরী গঙ্গার কোন কথা না শুনে মন্দিরে গিয়ে দেখেন, মনসা ফুলের সাজিতে আছেন। গৌরী তাকে ধরে মারতে লাগলেন। মারের চোটে মনসাও কাঁদতে লাগলেন।

গীত ॥ ও কন্যা হই, কন্যা হই গো, ও আমার জননী, কন্যা হই—
ভোলানাথ আমার পিতা, তুমি আমার জননী, কন্যা হই
কার্তিক, গণেশ আমার ভাই গো, তুমি আমার জননী, কন্যা হই
লক্ষ্মী, সরস্বতী আমার ভগিনী, তুমি আমার জননী, কন্যা হই
আর মেরো না, ও আমার মা, চক্ষু অন্ধ হয় গো, কন্যা হই।

মনসার পালাগানের কাহিনীর প্রতিটি অংশ জীবনরস রসিক পালাগায়কগণ অতিশয় বাস্তব সম্মত ভাবে চিত্রিত করেন। সনকার সাধভক্ষণ, লখিন্দরের জন্ম, নাড়ীচ্ছেদ, দাইমাবিদায়, হিজড়ের আগমন ইত্যাদি পালাগায়কগণ খুব সরস ভাবে পরিবেশন করেন। কাহিনীর উক্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

সনকার সাধভক্ষণ অংশ

কথা ॥ সনকা বলে, দাসী তুই তড়কা বেনেনীকে ডাক, সাধ রাঁধবে। তখন দাসী তড়কা বেনেনীকে ডাকল।

গীত ॥ সাধ রাঁধে ও সাধ রাঁধে গো, তড়কা বেনেনী ওসাধ রাঁধে
সাত শাগী ভাতে দিল আমার তড়কা বেনেনী গো
পঞ্চ ভাত পঞ্চ ব্যঞ্জন রাঁধে থরে থরে গো।

কথা ॥ দাসী তখন বলল, মা রান্না হয়ে গেছে তুমি স্নান করে এস। সনকা তখন স্নান করতে যায়।—

গীত ॥ স্নান করতে যায় সনকা সরোবরের ঘাটে গো
ডুব দেয় ডুব দেয় আমার সনকা বেনেনী গো
স্নান করে উঠে সনকা মাথার কেশ ঝাড়ে গো
কুম্ভভরে জল নিয়ে সনকা আপন বাড়ি এল গো।

কথা ॥ তখন বউরা বলল, মাগো, তুমি এই জিনিসগুলির মধ্যে একটা তোল দেখি—

আমরা একটা পরখ করব। সনকা বলল, তোরা বাপু এক জোঁরো করলি। তখন বউরা বলে— তুমি তো মা বুড়ো বয়সে একটা জোঁরো করেছ। এই কথা বলে সনকা নুড়ির করতাল তুলল, তখন বউরা বলল—মার ছেলে হবে মা নুড়ি তুলেছে। তখন সনকা সাধ খেতে বসল—

গীত ॥ ও সাধ খায় সনকা বেনেনী গো

প্রথম সাধ খাওয়ার সময় তায় পড়েছে মাছি গো

দ্বিতীয় সাধ খাওয়ার সময় তায় পড়েছে মাকড়সা গো

শেষ সাধ খাওয়ার সময় সাপের খোলস পড়ে গো

সাধ খাওয়ার সময় দাসী কেন অমঙ্গল ঘটল গো।

দাইমার নাড়ীচ্ছেদ অংশ

লখিন্দরের নাড়ীচ্ছেদ করার জন্য দ্বারী গিয়ে দাইমাকে ডেকে আনে। দ্বারীর সাথে দাইমার যে কথোপকথন তা অত্যন্ত রঙ্গরসে ভরা।

দ্বারী : দাইমা বাড়িতে আছে?

দাইমা : কে?

দ্বারী : আমি সনকার বাড়ির দ্বারী।

দাই : কি বল্লি? তুই ধাড়ি? তোর এত বড় বড় দাড়ি? তা তোর কি হয়েছে?

দ্বারী : আমার আর কি হবে? আমাদের রাণীমার একটা পুত্রসন্তান হয়েছে। তুই তার নাড়ীচ্ছেদ করবি? যাবি?

দাই : যাব। তা তুই একটু ফুরগুা ফারাগুা করে নে।

কথা॥ এই বলে দাইকে নিয়ে দ্বারী সনকার নিকট এল। সনকা পূর্ণপাত্র দাইকে দিয়ে নাড়ীচ্ছেদ করতে বলল।

গীত ॥ নাড়ীচ্ছেদ করে আমার সে যে দায়ের মেয়ে গো

নাভির রক্ত নিয়ে খোকার ললাটেতে দিল গো।

কথা॥ দাইমা নাড়ীচ্ছেদ করে পাওনাগণ্ডা নিয়ে বিদায় হয়ে যায়।

গীত ॥ নামটি আমার ফুলকুমারী দাইকে বিদায় করগো

টাকা নিব, কড়ি নিব, নিব দোয়াল গাই গো

অতি গরীব দাইয়ের মেয়ে আমি দাইকে বিদায় করগো

টাকা নিব, কড়ি নিব, নিব কানের পাশা গো।.....

হিজড়ের আগমন ও সন্তান নিয়ে গান অংশ

কথা ॥ দাইমা বিদায় হয়ে গেলে হিজড়ে হাতে তালি দিয়ে বাড়ি ঢোকে। সনকার কোলে থেকে সন্তান কোলে নিয়ে বলে—

গীত ।। ওলো দিদি খোকার মা ও রাজরাণী
এমন ছেলে পেলি কোথায় ও নন্দরাণী
দেখ কোলজোড়া সনকার সোনার যাদুমণি
চাঁদের মত মুখখানি তার একটুখানি।
এ শালা ডাগর হবে গাড়িঘোড়া চড়ে বেড়াবে
রাঙাবৌ আনবে ঘরে দেখ চাঁদবদনী
ওলো দিদি খোকার মা টাকাকড়ি ফেল না।

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি আবার অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, পরিবেশন-গুণে এবং দর্শক ও শ্রোতাদের সক্রিয়তায়। গায়েনগণ উপস্থিতমত এমন কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন যার উত্তরে শ্রোতৃমণ্ডলী সক্রিয় হয়ে ওঠে। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে মনসার পালা বহু পরিচিত কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠলেও স্থানীয়ভাবে আসর অনুসারে নবরূপ ধারণ করে।

চব্বিশ পরগণায় মনসার পালাগান পরিবেশনার মূলত তিনটি ধারা প্রচলিত আছে। যথা (ক) পালাগানের ধারা (খ) রয়ানী ধারা (গ) লোকনাট্যের ধারা। মনসার গানের প্রথম দুটি ধারা চব্বিশ পরগণার স্থানীয় পালাগান পরিবেশনার পদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত। মনসার পালাগানের রয়ানী ধারাটি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনসমাজে প্রচলিত মনসাপালার ধারা। রয়ানী রীতির অন্তর্গত আরও কয়েকটি ধারাকে গণ্য করা যায়। যথা —- পাঁচালধারা, এককগানেরধারা, ঘোষাগীতপালা, পাঠপালা ও পুতুলগান।

পালাগানের ধারা ও লোকনাট্যের ধারাকে যদি স্থানীয়ভাবে লোকসংস্কৃতি বা Folklore of the Soil হিসাবে গণ্য করা যায় তবে রয়ানীর ধারাটিকে স্থানান্তরিত লোকসংস্কৃতি বা Immigrant Folklore বলা যায়।

মনসার 'পালাগানের ধারা'টি হল— মূল গায়ক থাকেন একজন। তাঁর চারদিকে গোল হয়ে বসে থাকেন দোহার ও যন্ত্রীগণ। মূল গায়ক কখনো সাধারণ পোশাকে গান করেন, কখনো মনসা সেজে গান করেন। তিনি ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক চরিত্রে কথা বলেন।

দোহারগণ বিভিন্ন চরিত্রে কথা বলেন। সাধারণত উক্তিপ্রত্যুক্তি যা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল গায়কের সাথেই হয়। পালাগানের ধারায় অনেকক্ষেত্রে আসর থেকে হনুমান চরিত্র, বেহুলা-লখিন্দরের চরিত্র তুলে নেওয়া হয়। হনুমান সাজেন সাধারণত রঙ্গরসিকপ্রিয় কোন ব্যক্তি। বিশাল এক লেজ করে মুখে চুনকালি মেখে আসরের মধ্যে নাচানাচি করেন। বাচ্চা ছেলেমেয়ে তুলে নিয়ে বেহুলা লখিন্দর সাজিয়ে মূল গায়ক নাচগান করেন। মনসার পালাগানের আসরে গায়কবৃন্দ প্রয়োজনে আসরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চা-পান আদি খেয়ে থাকেন। চব্বিশ পরগণায় লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক যত পালাগান আছে তার প্রত্যেকটি পালাগানের ধারায় গাওয়ার সময় এই রীতি অনুসৃত হয়।

মনসার পালাগানের দ্বিতীয় ধারাটি হল 'রয়ানী ধারা'। এই রীতিতে মনসার গান বহু ক্ষেত্রে গীত হতে দেখা যায়। বিশেষত চব্বিশ পরগণার বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে এই রীতিতে মনসার গান হয়। রয়ানী রীতির পাঁচটি শাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারমধ্যে 'পাঁচালপালার ধারা'টি হল— চার-পাঁচজন বা তারও অধিক কিছু গায়ক বিশেষত মহিলাগণ পাশাপাশি বসে হাতে তালি দিয়ে এই গান করেন অথবা বিভিন্ন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে মনসার পালাগান করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে মনসার এই পালা 'রয়ানী' নামে পরিচিত। মনসার রয়ানীপালা চব্বিশ পরগণার প্রচলিত মনসাপালার পাশাপাশি একটি জনপ্রিয় ধারা হিসাবে প্রচলিত আছে। এই ধারার মূল গায়িকা বা গায়কের হাতে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল থাকে। তিনি একটি করে লাইন সুর করে বলেন আর সবাই হাতে তালি দিয়ে তা দোহার হিসাবে গান করেন। ক্যানিং থানার মনসাপুকুর, বারাসাত; বারুইপুর থানার কুলবেড়ে প্রভৃতি গ্রামে এই রীতিতে মহিলাগণকে গান করতে দেখা যায়।

রয়ানী রীতির দ্বিতীয় ধারাটি হল 'একক গানের ধারা'। এক্ষেত্রে গায়ক মাত্র একজন থাকেন। দোহার হিসাবে থাকেন বিভিন্ন যন্ত্রী। তাঁদের কাছে বাঁশী, কাঁশী, হারমোনিয়াম, ঢোল ইত্যাদি থাকে। মূল গায়ক মনসার পালার একটি করে লাইন সুর করে গেয়ে গেলে পর যন্ত্রীগণ বিভিন্ন যন্ত্রে সেই সুরে বাজিয়ে যান। এক্ষেত্রে দোহারগণ গলা মেলান না। বারুইপুর থানার ধোপাগাছি গ্রামের গায়েন দীপক মণ্ডল এই রীতিতে গান করেন। এই রীতির চলন ব্যাপক নয়।

রয়ানী রীতির তৃতীয় ধারাটি হল 'ঘোষাগীতি'। মনসার ঘোষাগানের দলে পাঁচজন গায়ক ও পাঁচজন দোহার থাকেন। পাঁচজন গায়কের মধ্যে একজন মহড়া গায়ক, অপর চারজন ঘোষা। 'ঘোষা' শব্দের অর্থ দোহার। মূল গায়ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান' বইটি ধরে একটিকের করে লাইন সুর করে বলেন, বাকী দোহারগণ সেই সুর ধরে গান করেন। এই ভাবে পালাটি সম্পূর্ণ শেষ হতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মত সময় লাগে। নাওয়া-খাওয়ার সময়টি বাদ দিয়ে পালাটি শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। উত্তর চব্বিশ পরগণায় এই রীতিতে গানের প্রচলন খুব বেশি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাঁকুড়িয়া, খলিসাধী গ্রামে এই গানের বহু শিল্পী দেখা যায়। এই গ্রামের বনমালী মণ্ডলের ঘোষাগানের খুব জনপ্রিয় একটি দল আছে। ভাদ্রমাসের রান্নাপূজাতে ব্যাপকভাবে এই অঞ্চলে

ঘোষাগানের দল মনসার গান করেন। "মানসিকে গান" হিসাবেও উক্ত অঞ্চলে প্রায় মনসার ঘোষাগান অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

রয়ানী রীতির চতুর্থ ধারাটি হল 'পাঠপালার ধারা'। মনসাপূজার দিন এই অঞ্চলের বহুক্ষেত্রে মনসার ভাসান কেবল পাঠ করা হয়। কেউ পাঁচালিপাঠের মত সুর করে পাঠ করেন, কেউ সাধারণভাবে পাঠ করেন।

মনসার পালার দ্বিতীয় ধারাটি হল 'লোকনাট্যের ধারা'। এই ধারায় গান গাওয়ার সময় মনসার পালায় যত চরিত্র আছে ততজন ব্যক্তি সাধারণত সেই চরিত্র উপযোগী সাজে সজ্জিত হন। অনেকখানি যাত্রাগানের রীতিতে এই গান হয়। তিনচার-রাত এই রীতিতে গান চলে। লোকনাট্যের ধারায় গাওয়ার সময় আসরে বসে বিশ্রামের সুযোগ থাকে না। লোকনাট্যের ধারায় মনসার পালাগান অর্বাচীনকালের সৃষ্টি। বর্তমানে এই অঞ্চলের লোকসমাজ লোকনাট্যের ধারায় লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগান শুনতে পছন্দ করেন বলে পালাগায়কদের ধারণা। সে কারণে অনেক পালাগায়ক তাঁদের পালাগানের ধারার গানকে লোকনাট্যের ধারায় রূপান্তরিত করে নিচ্ছেন বলে জানা যায়। এতে পালাগানের ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

মনসার গানের আসরের আর একটি ধারা 'পুতুলগানের ধারা'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই 'পুতুলগানের ধারা' লক্ষ্য করা যায়। মূল গায়ক ও তিন-চারজন দোহার মিলে বসে বা দাঁড়িয়ে এই গান করেন। গায়কগণ আসরে বেহুলা ও লখিন্দরের দুটি পুতুল রেখে গান করেন। বর্তমানে এই রীতি তেমন দেখা যায় না। বারুইপুর থানার খাঁদা গায়েন, নাজিরপুরের করুণা গায়েন, কার্তিক গায়েন প্রমুখ লোকশিল্পীগণ এই রীতিতে গান করতেন। বর্তমানে এই ধারায় গানের গায়কও তেমন নেই।

সুতরাং অখণ্ড চব্বিশ পরগণায় বহুল প্রচলিত মনসার ভাসান বিভিন্ন রীতিতে গাওয়ার প্রচলন আছে। তবে প্রতিটি গানের ধারা পূজা কেন্দ্রিক। মনসাপূজাকে উপলক্ষ করে সর্বত্রই এই গান হয়ে থাকে। বর্তমানে ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায় মনসার গানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে পালাগানের ধারার প্রচলন অধিক।

পাদটীকা

১। শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা।

২। Fergusson, Trees and serpan worship.

৩। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১৯৯০)।

- Ashutosh Bhattacharya, Sun and Serpent worship.
- M. N. Srinivas, Religion and Society among the coorgs of South India, Oxford, 1952, P. 77.

দেবীপালা ঃ ষষ্ঠী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের বিশিষ্ট দেবী হলেন দেবীষষ্ঠী। পালাগান আলোচনায় দেবীষষ্ঠীর পালা দেবীপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণায় লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানে ষষ্ঠীপূজা সংক্রান্ত কথা ও আচার আচরণগত সংস্কার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে প্রতিপালিত হয়। বিশেষত দেব বা দেবীপালায় যেখানে সন্তানাদি জন্মের কথা আছে সেক্ষেত্রে ষষ্ঠীর কথা থাকে এবং দেবীষষ্ঠীর পূজা ও সমাজজীবনে ষষ্ঠী কেন্দ্রিক সংস্কার নিয়ে পালাগায়কগণ বিশেষ রঙ্গ-রসিকতার সাথে গান করেন। হিন্দু বাঙালীর পারিবারিক জীবনে দেবীলক্ষ্মীর পূজার ন্যায় ষষ্ঠীপূজার প্রচলন অতিশয় ব্যাপক। দেবীলক্ষ্মী ধন, সম্পদ, শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রতীকরূপে হিন্দু বাঙালীর জনমানসে প্রতিভাত হন। অপরদিকে সুখের সংসারে সন্তানাদির জন্ম ও তাদের ভালো-থাকা একটি প্রধান ব্যাপার। যথাসময়ে সংসারে সন্তানাদি আসার জন্য ও শিশুর জন্মান্তে তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধির জন্য পরিবারের মায়েরা অতুল উৎসাহে ষষ্ঠীপূজা ও বারব্রতাদি পালন করেন। সেদিক থেকে পুরুষদের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। সন্তানাদি জন্মের পর সাতদিন বা একুশদিনের মাথায় ষষ্ঠীপূজা মহিলাগণ করেন। শুধু তাই নয়, সারাবৎসর তাঁরা ষষ্ঠীর অনেক বারব্রতাদি পালন করেন। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ষষ্ঠীপূজার কথা স্কন্দপুরাণে আছে। যেমন— বৈশাখ মাসে চান্দনী ষষ্ঠী (চন্দন ষষ্ঠী), জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষষ্ঠী (স্কন্দ ষষ্ঠী), আষাঢ়ে কার্দমী ষষ্ঠী (বিপত্তারিণী) বা (কর্দ্দম ষষ্ঠী), শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী (লোটন ষষ্ঠী), ভাদ্রে চপেটী ষষ্ঠী (চাপড়া ষষ্ঠী, মন্থন ষষ্ঠী, অক্ষয় ষষ্ঠী), আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে নাড়ী ষষ্ঠী (ছটপূজা), অগ্রহায়ণে মূলক ষষ্ঠী (মূলা ষষ্ঠী), পৌষ মাসে অন্ন ষষ্ঠী (অন্নরূপা ষষ্ঠী), মাঘ মাসে শীতল, ফাল্গুন মাসে গোরূপিণী ও চৈত্রমাসে অশোক ষষ্ঠী চব্বিশ পরগণার বারব্রত প্রিয় মহিলাগণ পালন করেন। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায় এই অঞ্চলের মায়েরা সন্তান ও সন্তানতুল্যদের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন সময়ে সংস্কারগতভাবে

ফুল, ফল ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণের দ্বারা দেবী ষষ্ঠীর পূজা করেন। পুরাণাদিতে দেবীষষ্ঠীর বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ রূপা, কার্তিকেয় ভার্যা মাতৃকা বিশেষ দেবসেনা। ইনি শিশুদিগের প্রতিপালনকারিণী পুত্রপৌত্র দাত্রী ও ত্রিভুবন ধাত্রী। দ্বাদশ মাসে এঁর পূজা হয়। শিশুর মঙ্গলার্থে জন্মের ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে এঁর অর্চনার বিধান আছে।[১]

শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লেখ আছে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্বদা তপস্যায় নিরত থাকতেন। একদিন ব্রহ্মা এঁকে সন্তানলাভের জন্য বিবাহ করতে বলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইনি বিবাহ করলেও বহুকাল পর্যন্ত এঁর কোন সন্তান হয়নি। তখন ইনি কশ্যপঋষির সাহায্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। ফলে রাজার স্ত্রী গর্ভবতী হন ও মৃতপুত্র প্রসব করে। এই মৃতপুত্রকে নিয়ে রাজা শ্মশানে গেলে এক উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে সেখানে এক দেবী এলেন। তিনি রাজার সমস্ত কথা শুনে বলেন, আমি ব্রহ্মার মানস কন্যা, আমার নাম দেবসেনা, মাতৃকার মধ্যে আমি প্রধানা। কার্তিকেয় আমার স্বামী। আমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা, সেই জন্য আমার নাম ষষ্ঠী। তপস্যা দ্বারা এই মৃতপুত্রকে পুনর্জীবন দান করে দেবী সঙ্গে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা তখন এই দৃশ্য দেখে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী বলেন, তুমি আমার পূজার অনুষ্ঠান করেন এই পুত্রকে আমি প্রত্যর্পণ করব। রাজা স্বীকৃত হয়ে ষষ্ঠীর পূজা করলেন। শিশুর জন্ম হতে ষষ্ঠ দিনে ও একুশ দিনে সন্তানের কল্যাণের জন্য এই পূজা প্রচলিত হল।[২]

মহাভারতে মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধের বিবরণে জানা যায় "ষষ্ঠী জরারাক্ষসীর নামান্তর। ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। ইনি গৃহস্থের গৃহে ভ্রমণ করতেন বলে ব্রহ্মা এঁর নাম রাখেন 'গৃহদেবী'। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত আছে, যে ব্যক্তি যৌবনসম্পন্না স-পুত্রা এঁর মূর্তি গৃহে রাখে, তার গৃহ সর্বদা ধনধান্য পুত্রকন্যাদিতে পূর্ণ থাকে। এঁর নাম ষষ্ঠীদেবী। মতান্তরে, কার্তিকেয় কৃত্তিকাদি যে ছয় মাতৃকার স্তন্যপানে পালিত হয়েছিলেন তাঁদের সমবেত মূর্তি হলেন ষষ্ঠী।"[৩]

দেবীষষ্ঠী চব্বিশ পরগণায় লৌকিক দেবী হিসাবে পূজা পান। বিভিন্ন পুরাণে তাঁর উল্লেখ থাকলেও তিনি বৈদিক দেবী নন। বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণাদির দ্বারা প্রতীতি হয় যে, তিনি আর্যেতর দেবী। আদিম মাতৃকাপূজার একটি অংশ ষষ্ঠীপূজা বলা যায়। এই দেবী প্রজনন-শক্তির দেবী। বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হারিতীর সাথে দেবীষষ্ঠীর অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনের আদিযুগে হারিতীর শিশু অনিষ্টকারী গুণটি ষষ্ঠীতে আরোপিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেবীর যে পরিচয় আছে, সেই পরিচয় চব্বিশ পরগণার জনসমাজে পরিচিত। এই পুরাণের ষষ্ঠীস্তব অংশটি এখানে উদ্ধৃত হল।

শুনহ নারদ, এবে ষষ্ঠী বিবরণ।
মূল প্রকৃতির অংশে তাঁহার জনম।।

মাতৃকাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা তিনি।
বালক বালিকা তিনি নিজে তপস্বিনী।।
প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশরূপা সে বলিয়ে।
ষষ্ঠী নামে অভিহিতা জানিবে হৃদয়ে।।
ষষ্ঠীর অর্চ্চনা করে যেই সাধুজন।
তার গৃহে পুত্র পৌত্র বাড়ে বহু ধন।।
সুস্থির যৌবন বটে ষষ্ঠী রূপবতী।
বর্ষীয়সী বেশে কিন্তু ভ্রমে সেই সতী।।
প্রতিমাসে পূজা তার করিবে সুজন।
এইরূপ আছে বিধি ওহে তপোধন।।
ভূমিষ্ঠ হইলে শিশু সূতিকা আগারে।
ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজা করিবে সাদরে।।
একবিংশ দিন পরে করিবে পূজন।
তাহলে করেন ষষ্ঠী মঙ্গলসাধন।।[৪]

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', মুকুন্দরাম দাসের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবীষষ্ঠীর বর্ণনা আছে। বিভিন্ন প্রাচীন ভাস্কর্যে ষষ্ঠীদেবীর মূর্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। রাজশাহী জেলার ক্ষীরহর গ্রামে একটি চতুর্ভুজা ষষ্ঠীমূর্তি ও তাঁর ক্রোড়ে শিশু সন্তান এবং দেবীর দক্ষিণপদ ঊর্ধ্বমুখী একটি বিড়ালের উপর স্থাপিত আছে। এই মূর্তির দক্ষিণহস্তে আছে সপত্র বৃক্ষশাখা। আবার বগুড়া জেলায় অনুরূপ একটি ষষ্ঠীমূর্তির দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে বলে জানা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে, বালাসোর জেলার টুগুরা গ্রামে এবং শশখণ্ড গ্রামে দৃষ্ট যে স্কন্দষষ্ঠীর মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন তার সাথে মনসার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত স্কন্দ ষষ্ঠীর "মূর্তি দ্বিভুজা, পদ্মাসীনা, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, মস্তকে সাতটি সাপ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, বাম উরুর উপর একটি শিশুকে বসাইয়া বাম হস্তের দ্বারা তাহাকে ধরিয়া আছেন। মূর্তির দক্ষিণ হস্তে একটি সর্প রহিয়াছে।"[৫]

ভাদ্রে স্কন্দষষ্ঠীর পূজার মন্ত্রে দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেবীর সর্পের কথা উল্লেখ নেই। যেমন —

ওঁ দ্বিভুজাং, যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কার ভূষিতাম্।।
দিব্য বস্ত্র পরিধানাং বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্।

প্রসন্নবদনাং নিত্যং জগদ্ধাত্রিং সুখপ্রদাম্।।
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দ ষষ্ঠীং সর্ব্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম্।।[৬]

চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ষষ্ঠীদেবীর যে মূর্তি দেখা যায় সেখানে সর্পের কোন চিহ্ন নেই। দেবীর বাম কোলে শিশু, পায়ের নিচে বিড়াল। অথবা দেবী বিড়ালে আরূঢ়া, বিড়ালটি কোথাও কালো, কোথাও সাদা। এ অঞ্চলে বড়ো আকৃতির ষষ্ঠীমূর্তি দেখা যায় না। প্রায় মূর্তি এক ফুটের মধ্যেই। সন্তান একুশ বা তিরিশ দিন হলেই গৃহে এরূপ ষষ্ঠীমূর্তি এনে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজানুষ্ঠান করা হয়। দেবীকে রক্তবস্ত্র পরিয়ে (জড়িয়ে) পূজা করা হয়। মূর্তিটি সুন্দর ও সুশ্রী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তির মতই।

এছাড়া বারো মাসে যে ষষ্ঠীপূজার অনুষ্ঠান চব্বিশ পরগণার মহিলাগণ করেন তাতে সবক্ষেত্রে পুরোহিতকে আহ্বান করা হয় না। পুরোহিতকে আহ্বান করা সত্ত্বেও যদি কোন কারণে না আসেন তাহলে মহিলাগণ নিজেরাই ফুল, জল, নৈবেদ্য সহযোগে পূজার কাজ সেরে নেন। তাঁদের মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। 'ভক্তিতে মা তুষ্ট' এই কথা মনে রেখে পূজা করেন। দেবীষষ্ঠী সংক্রান্ত যাবতীয় ব্রতাদি মহিলাগণই পালন করেন।

ক্ষেত্রানুসন্ধানে আরও জানা গেছে, সর্বত্র ষষ্ঠীর মূর্তি পূজা করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে শিলাখণ্ডকে ষষ্ঠীরূপে পূজা করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শিরাকোল ও আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে ষষ্ঠীর ব্যাপকভাবে শিলাখণ্ড পূজার প্রচলন আছে। মন্দিরে শীতলা, পঞ্চানন্দ ও মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তির সাথে ষষ্ঠীদেবীর শিলাখণ্ড ভক্তগণ তেল সিঁদুর মাখিয়ে পূজা করেন। বিষ্ণুপুর থানার দক্ষিণ চণ্ডী গ্রামের একটি থানে ষষ্ঠী, মহাদেব, শীতলা তিনটি মূর্তি বা শিলা আছে। এখানে মহাদেব ও শীতলার সঙ্গে দেবী ষষ্ঠীর নিত্য পূজা হয়। এছাড়া এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে বাৎসরিক পূজা ও বিশেষ পূজা হয়। একক ষষ্ঠী মন্দির চব্বিশ পরগণায় দেখা যায় না। সাধারণত গৃহস্থের ঠাকুরঘর অথবা ধানের গোলার নিচে ষষ্ঠীমূর্তি বা ষষ্ঠীনুড়ি সারা বৎসর স্থাপিত থাকে। লোকালয়ের মধ্যে নিমগাছ বা বটগাছের তলায় ষষ্ঠীমূর্তি স্থাপন করে অনেকে ষষ্ঠীপূজা করেন। স্থানীয়ভাবে ঐ গাছতলাকে বলা হয় ষষ্ঠীতলা।

চব্বিশ পরগণায় দেবীষষ্ঠী কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান ও ব্রতকথা ব্যাপক, কিন্তু ষষ্ঠীর পালাগান সে তুলনায় ব্যাপক নয়। তুলনায় পার্শ্ববর্তী জেলা মেদিনীপুরে ষষ্ঠীর পালাগানের আসর বেশি হয়ে থাকে বলে জানা যায়। এছাড়া বর্তমান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে কোন কোন লোকশিল্পী ষষ্ঠীর পালাগান করেন। চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার শ্রী সুদিন মণ্ডল বেশ কয়েক আসর এই পালা গেয়েছেন। তিনি প্রচলিত লৌকিক ব্রতকথাকে অবলম্বন করে এই পালাটি তৈরি করেছেন বলে জানান। পালাটির এই অঞ্চলে তেমন চাহিদা নেই। মেদিনীপুর থেকে যে সমস্ত

মানুষ এসে চব্বিশ পরগণায় বসবাস করেন তাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই গানের বায়না করেন বলে সুদিন গায়েন জানান। সুতরাং ষষ্ঠীর মাহাত্ম্যপ্রচার পূজা ও ব্রতকথার মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। সুদিন মণ্ডল ষষ্ঠীর যে পালাটি গান করেন তা কৃষ্ণরাম দাসের ষষ্ঠীমঙ্গলের কাহিনীর সাথে অনেক মিল আছে। পালাটি প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা গান করেন। মূল কাহিনীর সাথে আরও কিছু কথা, গান ও কৌতুকাদি জুড়ে দিয়ে গানটি বড় করা হয়। সুদিন মণ্ডল ষষ্ঠীর যে পালাটি গান করেন তার কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

গুণবতীর পালা

সনকপুরের এক রাজা, নাম শত্রুজিৎ। তিনি রূপেগুণে ইন্দ্রতুল্য। তাঁর রাজ্যে দুঃখ-দারিদ্র চুরি-ডাকাতি, অরাজকতা কোনকিছুই নেই। প্রজাগণ পরম সুখে আছে, কিন্তু রাজার মনে একটি দুঃখ। তাঁর কোন সন্তানাদি নেই। তাঁর স্ত্রী সত্যভামা সাত ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়েও কোন ফল না পেয়ে পূজা অর্চনা ছেড়ে দিয়েছেন।

এদিকে মা ষষ্ঠী মনে মনে ভাবলেন সত্যভামাকে দিয়ে তিনি তাঁর পূজা প্রচার করাবেন। তাই তিনি তাঁর সখি নীলাকে ছদ্মবেশে তাঁর কাছে পাঠালেন। নীলা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে কাঁখে চুপড়ী, হাতে তুলসীপাতা ও নানা ফুল নিয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে রাজবাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন ও রাণীমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন, কিন্তু দারোয়ানরা তাঁকে ছেড়ে দিতে নারাজ। বুড়িমাকে নিয়ে তারা নানা রঙ্গ রসিকতা করে। অবশেষে রাণীমার আদেশ পেয়ে তাঁকে ভিতরে যেতে অনুমতি দেয়।

ছদ্মবেশী নীলা রাণীমার কাছে আসতে রাণী সত্যভামা তাঁকে আসন দিয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন ও কেন এসেছেন তা জানতে চান। দেবীনীলা দেখেন রাণীমা কনক আসনে বসে মাছপোড়া দিয়ে পান্তাভাত খাচ্ছেন। তখন বুড়িমা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন তিনি দেবীষষ্ঠীর পূজারী। বর্ধমান শহরে তাঁর বাসা। গঙ্গায় স্নান করতে এসেছেন। তাঁর চারপুত্র, তিনকন্যা। দেবীষষ্ঠীর কৃপায় তাঁর পরম সুখের সংসার। আজ অবশ্য ষষ্ঠীতিথি। তাই ভাবলাম রাণীমার সাথে নিয়ে দেবীষষ্ঠীর পূজা করব। কারণ এখানে আমার পূজার কোন উপকরণাদি নেই, কিন্তু এখানে দেখি বিপরীত অবস্থা। আজকের দিনে সন্তানের জননীগণ উপবাসে থেকে দেবীষষ্ঠীর পূজা করেন। আর রাণীমা মাছপোড়া দিয়ে পান্তাভাত খাচ্ছেন? রাণীমা জানালেন তাঁর কোন সন্তানাদি নেই। তাছাড়া দেবীষষ্ঠীর নাম তিনি তো কখনো শোনেন নি। তখন দেবীনীলার পরামর্শে সত্যভামা জননী হবার আশায় নিষ্ঠার সাথে জীবনযাপন করেন। মনে মনে দেবীষষ্ঠীর কথা স্মরণ করতে থাকেন। দেবীষষ্ঠীর কৃপায় তাঁর সাতজন পুত্রসন্তান হয়। সন্তানাদি বড় হলে পরে সাতপুত্রবধূও ঘরে আনেন। সত্যভামা পরম নিষ্ঠাভরে দেবীষষ্ঠীর পূজা করেন।

সত্যভামার সাতপুত্রবধূর মধ্যে ছোটবউ অতিশয় লোভী ও মিথ্যাবাদী। খাবার মাছ, দুধ ইত্যাদি জিনিস বাড়িতে যা থাকে নিজে চুরি করে খায় ও মিথ্যাকথা বলে যে,

কোথা থেকে একটা কালো বিড়াল এসে সব খেয়ে গেছে। একদিন সত্যভামা ষষ্ঠীর পূজার জন্য উপকরণাদি প্রস্তুত করে ছোটবউয়ের তত্ত্বাবধানে দিয়ে বাইরে গেছেন, সেই সুযোগে ছোটবউ পূজার উপকরণের অনেক অংশ খেয়ে ফেলেছে। পরে শাশুড়িমাতা এসে পূজার উপকরণ নেই দেখে ছোটবউকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন ছোটবউ সেই কালো বিড়ালের দোষ দিয়ে নিজে দোষমুক্ত হয়।

কালো বিড়াল ছোটবউ-এর এই মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে না পেরে প্রতিশোধ নেবার জন্য তক্কে তক্কে থাকে। সুযোগ একদিন এসে গেল। ছোটবউ-এর একদিন পুত্র সন্তান হল। বিড়াল সেই সন্তান চুরি করে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বটবৃক্ষতলে দেবীষষ্ঠীর ঘরে রেখে এল। এইভাবে ছোটবউ-এর ছয়সন্তান চুরি করে রেখে আসে।

ছোটবউ এইভাবে সন্তান হারিয়ে বাড়ির লোকজনের কাছে তিরস্কৃত হয়। অবশেষে পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে সপ্তমসন্তান যখন কোলে আসে তখন তাকে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। কালো বিড়াল সেখানেও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ছোটবউ সন্তান কোলে নিয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন কালো বিড়াল তার কোলের ভিতর থেকে সন্তানটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় বউ-এর ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কঙ্কণ ছুড়ে মারতে বিড়ালের পিঠ কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। বিড়াল সন্তানটি মুখে নিয়ে বটতলায় ষষ্ঠীর ঘরে রেখে আসে। ছোটবউ বিড়ালের গায়ের রক্ত ঝরে যে পথে পড়েছিল সেই পথ ধরে গিয়ে ষষ্ঠীর মন্দিরে ওঠে। দেবীষষ্ঠীর নিকট তার কোলের সন্তান দেখতে পেয়ে ছোটবউ কান্নাকাটি শুরু করে ও সন্তান ফিরিয়ে দিতে বলে। তখন দেবীষষ্ঠী তার কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কালো বিড়ালের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বলেন। ছোটবউ সেইমত কালো বিড়ালের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

এরপর দেবীষষ্ঠী তার আর ছয় পুত্রকে ফিরিয়ে দিতে চান। ছোটবউ গুণবতীকে বলেন তার ছয়পুত্রের নাম ধরে এক এক করে ডাকতে। গুণবতী সেইমত ডাকলে পরে পুত্রগণ তার কাছে আসতে গুণবতী তাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে, কিন্তু তারা কেউই মাকে চিনতে না পেরে গালিগালাজ করে। তখন দেবীষষ্ঠীর কৃপায় তাদের সুমতি আসে ও গুণবতীকে তারা মা বলে জড়িয়ে ধরে। সাতসন্তান ফিরে পেয়ে গুণবতী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। দেবীষষ্ঠীকে নমস্কার করে বাড়ি ফিরে এসে মহাধুমধামে দেবীষষ্ঠীর পূজা করে। দেবীষষ্ঠী তাঁকে পূজার যে বিধি বলে দিয়েছেন সেই নিয়মে গুণবতী পূজা করে ও পূজার কথা প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচার করে। সন্তান ফেরত দিয়ে গুণবতীকে দেবী ষষ্ঠীপূজার যে বিধান বলেছিলেন তা হল—সোম ও শুক্রবার দেবীষষ্ঠীর পূজা নিষিদ্ধ। পূজার দিন যথানিয়মে ষষ্ঠীপূজা করতে হবে। কালো বিড়াল দেবীর বাহন, তাকে অপমান করা চলবে না। ষষ্ঠীর দিন ছেলেদের মাথায় তেলজল দিতে হবে। শত অপরাধেও তাদের দোষ ধরা চলবে না। বড় কালো রঙের তালের নোদ, আউশের গুঁড়ি (চালের গুঁড়ো) মিশিয়ে ষষ্ঠীর ভোগ প্রস্তুত করতে হবে। প্রথমে কাদার তালের উপর একটি বটের ডাল পুঁতে তার পাশে

ঘট বসাতে হবে। তাতে আম্রপল্লবের ও ঘটের গায়ে তেল, সিঁদুর দিয়ে পূজা সমাপন করে কিছু আহার করতে হবে। যে এই নিয়মে ষষ্ঠীপূজা করে, সে সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে কালাতিপাত করে। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

বারো মাসে ষষ্ঠী পূজা

বৈশাখ মাসে দেবীষষ্ঠীর যে পূজা হয় তাকে বলে 'চন্দনী ষষ্ঠী'। এইদিন মায়েরা উপবাসে থেকে ফুল, চন্দন ইত্যাদি উপকরণে দেবীর পূজা করেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে 'অরণ্যষষ্ঠী' প্রতিপালিত হয়। এই ষষ্ঠীকে 'বাঁটাষষ্ঠী', স্কন্দষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী বলে। এইদিন মায়েরা জামাই-মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে আনেন ও বিভিন্ন উপচারে জামাইকে তুষ্ট করেন। এইদিন জামাইকে বিশেষভাবে বরণ করার প্রথা আছে। নতুন ডালা বা বাঁটায় (পিতলের বা তামার ছোটথালাকে স্থানীয়ভাবে বাঁটা বলে) দশরকম ফল, নতুন বস্ত্র, বাঁশপাতার নিউলি (পাতার মাঝের অংশকে নিউলি বলে) দিয়ে প্রস্তুত আংটি, তালপাতার ছোট ছোট পাখা এবং তালপাতার কাঠিতে তৈরি ধনুকবাণ ইত্যাদি থাকে। জামাইবরণের এই বাঁটাটি জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীপূজার প্রধান অঙ্গ। সে কারণে এই ষষ্ঠীকে বাঁটাষষ্ঠী বলে। বাঁটাষষ্ঠী নামকরণের আরও একটি কারণ আছে। জামাইষষ্ঠীর দিন জামাই, পাড়ার শাশুড়িদিগের টাকা দিয়ে নমস্কার করেণ। যত টাকা দিয়ে জামাই শাশুড়িকে নমস্কার করে, জামাই বাড়ি ফেরার আগে শাশুড়িগণ তার থেকে আরও কিছু বেশি টাকা জামাইকে ফেরত দেন। এই বাড়তি টাকাকে স্থানীয়ভাবে বলে বাঁটা বা সুদ। লোকবিশ্বাস, শাশুড়িমাতাদিগের আশীর্বাদে জামাইমেয়ের ঘরে ধনসম্পদ সন্তানাদি এইভাবে বেড়ে যায়, 'আসলে' কোনদিন হাত পড়ে না অর্থাৎ অভাব অনটন থাকে না। সুতরাং এইরূপ বাঁটা বা সুদ দেবার ব্যবস্থা আছে বলে জামাইষষ্ঠীকে বাঁটাষষ্ঠী বা বাটাষষ্ঠী বলা হয়।

জামাইষষ্ঠীর দিন জামাইকে নিয়ে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে অনেক প্রকার কৌতুককর ঘটনার প্রচলন আছে। তার মধ্যে একটি হল 'ডোমকল'। শালাজ (শালার বউ) এবং শালীরা জামাইকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে বা পাড়ায় যত জামাই আসে তাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান। শালাজ-শালীরা মিলে একভাঁড় দই আনে। সেই দই জামাইদের মধ্যে নিলামে তোলা হয়। যে জামাই বেশি দাম দিতে পারে, তাঁকে নিয়ে সবাই আদর করে, হুড় চলে। যারা নিলামে হেরে যায় তাদের গায়ে কাদা মাখানোর জন্য হুড়োহুড়ি চলে। অবশেষে সেই দই সবাই মিলে খায়। 'ডোমকল' অনুষ্ঠান এখন আর তেমন দেখা যায় না। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ষষ্ঠীর দিন জামাইকে মধ্যাহ্নে ভাল করে খাইয়ে শেষে শালাজ বা শলীরা এঁটো (উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারী) জোর করে মাখিয়ে দেয়। জামাইও শালাজ এবং শালীদের গায়ে এঁটো মাখিয়ে আনন্দ করে।

আষাঢ় মাসে হয় 'কার্দমীষষ্ঠী'। একে অনেকে কর্দ্দমষষ্ঠী বা বিপত্তারিণীর ব্রত বলে। এইদিন মায়েরা দেবীষষ্ঠীকে তেরটি ফুল, তেরটি ফল, তেরটি পান, তেরটি সুপারী,

তেরটি দূর্বা ও তেরটি পাতা দিয়ে পূজা করেন। এর সাথে থাকে তেরটি লুচি। পূজা শেষে ব্রতিনী একাসনে বসে ঐ তেরটি লুচি তেলছাড়া তরকারী দিয়ে আহার করেন।

শ্রাবণ মাসে 'লুণ্ঠনষষ্ঠী' বা লোটনষষ্ঠী পূজা হয়। এইদিন মায়েরা তালের নোদ, চালের গুঁড়ো বা আটা দিয়ে ভাল করে মেখে তেলে ভেজে দেবীষষ্ঠীকে নৈবেদ্য দেন। পূজা শেষে সেই নৈবেদ্য নিজে খান ও বাচ্চাদের বিতরণ করেন। মায়েরা এইদিন আরও একটি বিশেষ নিয়ম পালন করে থাকেন। সাদা সুতো হলুদ মাখিয়ে বাচ্চা দের হাতে পরিয়ে দিয়ে তবে জলগ্রহণ করেন। এইদিন মায়েরা অন্নগ্রহণ করেন না।

ভাদ্র মাসে 'চপেটীষষ্ঠী'। এই পূজার স্থানীয় নাম চাপড়াষষ্ঠী বা অক্ষয়ষষ্ঠী। মায়েরা চাপড়াপিঠে করে দেবীষষ্ঠীকে পূজা দেন। চালের গুঁড়োর সঙ্গে পাকা তালের নোদ মিশিয়ে এই পিঠে প্রস্তুত হয়। এই পিঠে ব্রতিনী নিজে খান ও বাচ্চাদের দেন।

আশ্বিন মাসে হয় 'দুর্গাষষ্ঠী'। চব্বিশ পরগণার মহিলাগণ মনে করেন দেবীদুর্গা এইদিন ষষ্ঠীর ব্রত করে বাপের বাড়ি আসেন। সেই কারণে বাঙালী মায়েরা ব্যাপকহারে এই ষষ্ঠী ব্রত করেন। এইদিন শাপলা ও শালুক দিয়ে মাকে পূজা দেওয়া হয় এবং সেই শাপলা ও শালুক মায়েরা খান ও বাচ্চাদের দেন।

কার্তিক মাসে হয় 'নাড়ীষষ্ঠী'। এই অঞ্চলের অল্প সংখ্যক মায়েরা এই ষষ্ঠী ব্রত করেন। তবে অ-বাঙালী বিশেষত হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এইদিন পূজার আড়ম্বর ব্যাপক দেখা যায়। এই পূজাকে অনেকে ছট্‌পূজা বলেন। গোটা কলার কাঁদি, আম, আখ ইত্যাদি গোটা জিনিস এই পূজার উপকরণ।

অগ্রহায়ণ মাসে হয় 'মূলকরূপিণীষষ্ঠী'। স্থানীয় ভাষায় একে মূলাষষ্ঠী বলে, বাড়িতে যতজন লোক থাকে ততগুলো ঘট বসিয়ে আঙচ কলাপাতায় একুশটি পিঠে, একুশটুকরো পাটালী, সর্ষের ফুল, মূলোর ফুল, কলমীর ডোগ, হিমচে, ওড়া ধান, আউশ ধান দিয়ে দেবীকে পূজা দেওয়া হয়। এইদিন মায়েরা মূলো-ভাতে ও মুগের ডাল দিয়ে ভাত খান। অবশ্যই নিরামিষ খেতে হয়। অনেকে শুধুমাত্র পিঠে খান।

পৌষ মাসে হয় 'অন্নরূপাষষ্ঠী' বা অন্নষষ্ঠী। প্রাচীন কৃষিলক্ষ্মীর সাথে অন্নষষ্ঠীর সম্বন্ধ আছে। এইদিন মায়েরা পায়স-পিঠে করে দেবীকে পূজা দেন। পূজার শেষে সেই প্রসাদ নিজে খান ও সন্তানাদির মধ্যে বিতরণ করেন।

মাঘমাসে ষষ্ঠীপূজাকে 'শীতলষষ্ঠী' বলে। এইদিন মায়েরা তথা চব্বিশ পরগণার প্রায় প্রতিটি পরিবার সারাদিন পান্তাভাত খেয়ে থাকেন। বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আগের দিন রেঁধে-রাখা নয়প্রকার গোটা সবজির তরকারী দিয়ে পান্তা খাওয়া হয়। এইজন্য এই ষষ্ঠীকে গোটাষষ্ঠী বলে। এছাড়া এই ষষ্ঠীর পূর্বদিন অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন মুড়ি, আলুর দম খাওয়ার প্রচলন আছে।

ফাল্গুন মাসে হয় 'গোরূপিণীষষ্ঠী'। গোমুণ্ডে ষষ্ঠীপূজার পরিচয় ষোড়শ শতাব্দী

থেকে পাওয়া যায়। একসময় ষষ্ঠী ছিলেন ভাগাড়ের দেবী। সন্তান প্রসবের পর আঁতুড়ঘরের চালে গোমুণ্ড গোঁজার বিধি এখনও বহু স্থানে প্রচলিত আছে। গোমাতা ভগবতী সম্ভবত দেবীষষ্ঠী।

চৈত্র মাসে হয় 'অশোকষষ্ঠী'; একে স্কন্দষষ্ঠীও বলা হয়। এইদিন অশোকফুলের কুঁড়ি ছটি মুগকড়াই ও দই দিয়ে আলতোভাবে গালে ফেলে গিলে খাওয়ার রীতি আছে। কেউ কেউ পাকা কলার মধ্যে দিয়ে গিলে খান। এইদিন মায়েরা সুজি, লুচি ইত্যাদি খেয়ে থাকেন। কেউ শুধুমাত্র ফলাদি ভক্ষণ করেন। ষষ্ঠীমায়ের ব্রত ও পূজা করেন। সকালে ষষ্ঠীমায়ের পূজা দিয়ে তবে মায়েরা জলগ্রহণ করেন। মায়ের ডালায় অশোকফুলের ছটি কুঁড়ি, ছটি মুগডাল ও অন্যান্য ফুলফলাদি থাকে।

দেবীষষ্ঠীর মুখ্যপূজা সাধারণত সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করলে হয়ে থাকে। সন্তান জন্মানর ষষ্ঠ দিনে দেবীষষ্ঠীর যে পূজাচার পালিত হয় তা এইরূপ— কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি চারকোণে চারটি কলা, চারটি পান, চারটি সুপারি, চারটি সিকি, দোয়াত, কলম, বই, নতুন বস্ত্র, বাতাসা, সন্দেশের ডালা দেওয়া হয়। সারারাত আঁতুড়ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সন্তানের মাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাড়ি পরে ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে অতিশয় শুদ্ধভাবে বা পবিত্র ভাবে থাকেন। লোকবিশ্বাস, এইদিন বিধাতা এসে সন্তানের ভাগ্য লেখেন। একে যেটেরা অনুষ্ঠানও বলা হয়। এরপর সন্তান একুশদিন বা একমাস হলে খুব জাঁকজমক সহকারে ষষ্ঠীপূজা হয়। পুরোহিত এই পূজানুষ্ঠান করেন। এইদিন বাচ্চাদের মধ্যে খই, মুড়ি, বাতাসা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

সুতরাং ষষ্ঠীপূজা ও ষষ্ঠীপূজা-সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান বাঙালী হিন্দু পরিবারে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিভিন্ন আচার আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায় এ দেবী অনার্য সম্ভূতা। সন্তানসন্ততির সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর জন্য এই দেবীর পূজানুষ্ঠান মায়েরা করেন। চব্বিশ পরগণা তথা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে দেবীষষ্ঠীর পূজাচার অতিশয় নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়। দেবীষষ্ঠী এই অঞ্চলের জনমানসে বংশরক্ষক বা সন্তান রক্ষাকর্ত্রী দেবীরূপে পূজিতা হন। সন্তান ও সন্তানতুল্যদের মঙ্গল কামনা করে সব বয়সের মায়েরা দেবীর বারব্রতাদি পালন করেন। পুরাণে দেবীর উল্লেখ থাকলেও লৌকিক ধারায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবীর পূজাচার পালিত হয়। দেবীষষ্ঠীর মূর্তি, পূজাচার, লোক-বিশ্বাস ও বিভিন্ন সংস্কারাদি থেকে প্রতীতি জন্মে যে, তিনি আর্যেতর জাতির আরাধ্যা দেবী। বিভিন্ন লোককথায় দেবীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত আছে। চব্বিশ পরগণায় দেবীর পূজানুষ্ঠানকালে দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুঁথিপাঠ করা হয়, কিন্তু তুলনামূলকভাবে পালাগানের আসর কম বসে। এই অঞ্চলে দেবীর পালাগানের শিল্পী সংখ্যাও কম দেখা যায়। সাধারণত 'দেবীপালা'র আসরে দর্শকের অনুরোধে দেবীষষ্ঠীর পালা গাওয়া হয়। পালাগায়কগণ 'ভাঙটা'[৭] পদ্ধতিতে যেমন ষষ্ঠীর পালাগান করেন তেমন কৃষ্ণরাম দাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল'ও পালাগানরূপে আসরে উপস্থাপন করেন।

পাদটীকা

১ স্কন্দপুরাণ।

২ শ্রী কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ অনূদিত, শ্রীশ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (৫ম খণ্ড)।

৩ সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত পৌরাণিক অভিধান, ৫ম সংস্করণ।

৪ শ্রীশ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১৩৫৯, পৃঃ ৮৭।

৫ শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী।

৬ ভূপতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (পুরোহিত), গ্রাম-শিবাকোল, দঃ ২৪ পরগণা।

৭ ষষ্ঠীর গানের ভাঙটা পদ্ধতি হল —অন্যপালার কেবল কাহিনী অংশ নিয়ে ষষ্ঠীর দোহাই দিয়ে আসরে উপস্থাপন করা।

দেবীপালা ঃ লক্ষ্মী

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে দেবীলক্ষ্মীর পালা অন্যতম। পালাগান আলোচনায় এটি দেবীপালার অন্তর্গত। শাস্ত্র পুরাণের প্রভাবে লক্ষ্মী বিশিষ্টরূপে পূজিতা হন, কিন্তু তিনি শ্রী, সম্পদ ও শস্যদায়িনী কৃষিলক্ষ্মীরূপে এ অঞ্চলের লোকসমাজে পূজিতা। তিনি ধান্যলক্ষ্মীরূপে মান্যা হন। এ অঞ্চলের মানুষ ধানকে 'লক্ষ্মীর দানা' বলেন। বাঙালী-জীবনে ধানের গুরুত্ব বোঝাতে কেউ কেউ এই শস্যকে 'ভীমরিদানা' বলেন। অন্নগতপ্রাণ বাঙালীর নিকট এটি মহাদানা বা ভীষণ দানারূপে বিবেচিত হয়। কারণ অন্নের অভাবে মানুষ ভীমরি খান (মূর্ছা যান), এমনকি মারা যান। সে কারণে চব্বিশ পরগণা তথা সমগ্র বাঙালীর নিকট কৃষিজাত শস্য ধান ও দেবীলক্ষ্মীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা আচার-আচরণগত সংস্কার ও পূজাচার। কৃষির সাথে জড়িত আছে শিল্প ও বাণিজ্য। এক্ষেত্রেও লক্ষ্মীর পূজা-সংক্রান্ত নানা পূজাচার পালিত হয়। মোটের উপর জীবনের যেক্ষেত্রে সৌভাগ্য লাভের প্রসঙ্গ থাকে সেক্ষেত্রেই লক্ষ্মীকে কল্পনা করা হয়। সেইহেতু এই অঞ্চলের লক্ষ্মীদেবীকে যশোলক্ষ্মী, ভূমিলক্ষ্মী, বাণিজ্যলক্ষ্মী, কৃষিলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী ইত্যাদি নামে বিশেষিত করা হয়।

চব্বিশ পরগণা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে শস্যদেবী লক্ষ্মী অন্য নামে পূজিতা হন। যেমন বাঁকুড়া জেলায় 'মহাদানা' নামে এক শস্যদেবীর পূজা হয়, যাঁর সাথে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের লক্ষ্মীর দানা বা 'ভীমরিদানা' শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মকর সংক্রান্তিতে দেবীর জলপূর্ণ মাটির ঘট আম্রপল্লবসহ ওই অঞ্চলের বাউড়ি সম্প্রদায় পূজা করেন। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে বিশেষত মেদিনীপুর থেকে স্থানান্তরিত মানুষ, শিব অনুচর ভীমই মর্ত্যে কৃষির পত্তন করেন বলে বিশ্বাস করেন এবং সেই সূত্রে ধানকে ভীমের দানা বা ভিমরিদানা বলা হতে পারে। চব্বিশ পরগণার 'হালাকাটা' ও 'হালাতোলা' লক্ষ্মীর পূজা-সংক্রান্ত কিছু সংস্কার, বাঁকুড়ার 'মুটআনা' ও 'দেনীআনা' নামক লক্ষ্মীর

পূজা-সংক্রান্ত সংস্কারের সাথে বিশেষভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় জেলার উক্ত সংস্কার পালনের ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করা হয় না। কেবল দেবী লক্ষ্মীর নিকট অধিক শস্য ও সুখ সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। সুতরাং চব্বিশ পরগণা তথা অন্যান্য জেলার কৃষিদেবীর সাথে আদিম মানুষের বাসনা কামনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, যার সাথে লক্ষ্মী, মহাদানা প্রভৃতি দেবীর অভিন্নতা প্রকাশ পায়। এই সমস্ত দেবীকে নিয়ে কালে কালে সৃষ্টি হয়েছে নানা আচার-আচরণ, পূজা, সংস্কার, পাঁচালি, পালাগান ইত্যাদি।

'লক্ষ্মী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঠাণ্ডা প্রকৃতির ধৈর্যশীল, ধীরস্থির রমণীদিগের ক্ষেত্রে। 'শ্রী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সাধারণত ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে। সুতরাং বর্তমানে দেবীলক্ষ্মী সুদূর অতীতে আর্য ও আর্যেতর জাতির মধ্যে ধনসম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যায়, যার আঞ্চলিক রূপ চব্বিশ পরগণার লক্ষ্মীপূজা ও দেবীলক্ষ্মীর পালাগানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

'লক্ষ্মী' শব্দটি সংস্কৃত, সুতরাং প্রাচীন কৃষিদেবীকে নিশ্চয়ই অন্য কোন নামে অভিহিত করা হত। বৈদিক ও পৌরাণিক লক্ষ্মী কল্পনার মধ্যে আর্যেতর সমাজের লক্ষ্মীব্রতগুলি এমনভাবে মিশে গেছে যে, এর মধ্যে থেকে আর্য-অনার্য জট ছাড়ানো কষ্টকর। বর্তমান লক্ষ্মীপূজায় শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য থাকলেও লৌকিক লক্ষণ ভালমতই আছে। বিশেষত জেলা চব্বিশ পরগণায় মহিলাগণ পূজিত দেবীলক্ষ্মীর পূজা-সংক্রান্ত যে সমস্ত আচার আচরণাদি পালিত হয় তা অনার্য সম্পর্কিত ধাবণাকে স্পষ্ট করে। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার নানা উপকরণাদির মধ্যে আর্য-অনার্য উভয় কৃষ্টির পরিচয় বাহিত হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়। তাছাড়া আমাদের দেশে পৃথক লক্ষ্মী-মূর্তি-পূজা খুব প্রাচীন নয় বলে অনেকে মনে করেন। "শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগর-লক্ষ্মীর যে পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহা আদিতে এই কৌম সমাজের পূজা বলিলে অন্যায় হয় না। বস্তুত, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শারদীয়া কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কোনও সম্পর্কই ছিল না।"[১]

প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি দেবীলক্ষ্মীকে বিভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের গৃহে লক্ষ্মী ছিলেন গজলক্ষ্মীরূপে। দেবীর এই মূর্তিতে দুটি গজ দুদিক থেকে শুঁড়ে জলকুম্ভ নিয়ে দেবীকে স্নান করাচ্ছে। এইরূপ মূর্তি ইলোরার চিত্রশালা, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত ভীমপুরের নিকট মণিনাগেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে, গুপ্তরাজাদের মুদ্রায়, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাংলাদেশে জয়নাগ নামে এক রাজার তাম্রমুদ্রা, হর্ষবর্ধনের পর খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে পূর্ববঙ্গে খড়্গবংশীয় যে রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়, তাঁদের ভূমিদানের একটি তাম্রপট্টে এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে সাঁচীতে। বিষ্ণুর সাথে দেবীলক্ষ্মীর কল্পনা অদ্যাবধি আছে। এক্ষেত্রে দেবী লক্ষ্মী দ্বিভুজা, তাঁর দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও বাম হস্তে বিল্ব। ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়—অনন্তশয্যায় নারায়ণ এবং লক্ষ্মী তাঁর পদসেবায় রত। এক্ষেত্রেও তিনি দ্বিভুজা। বাংলাদেশে পাল সেনবংশের আমলে নির্মিত লক্ষ্মীমূর্তির সাথে বিষ্ণু ও সরস্বতীর ত্রয়ী মূর্তি কয়েকটি পাওয়া গেছে। বিষ্ণুর

অপর স্ত্রীর নাম ভূমিদেবী। ভূমিদেবী, লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর ত্রয়ী মূর্তিও মিলেছে। লক্ষ্মী সেখানে বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে, বাম পার্শ্বে ভূমিদেবী। লক্ষ্মীর কয়েকটি একক মূর্তিও আছে। এ মূর্তি চর্তুভূজা। বগুড়ার চতুর্ভুজা লক্ষ্মীর এক হস্তে লক্ষ্মীর সুপরিচিত ঝাঁপি আছে যা বাংলার স্বকীয় লক্ষ্মীকল্পনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এছাড়া চতুর্ভুজা লক্ষ্মী মূর্তির দক্ষিণ হস্তে সমৃণাল পদ্ম ও বিল্ব এবং বাম হস্তে অমৃতঘট ও শঙ্খ আছে।[২]

চব্বিশ পরগণায় লক্ষ্মীদেবীর যে মূর্তি পূজিত হয় সেই মূর্তির মধ্যেও তাঁকে শ্রী ও সম্পদের দেবীরূপে কল্পনা করা হয়। তাঁর দুই হাত, সদাপ্রসন্ন মুখ, পেচক বাহন, ধানের শিষ হাতে। কোথাও হাতে পদ্ম, দণ্ডায়মানা বা পদ্মের উপর উপবিষ্টা ঐশ্বর্যময়ী। দেবীর বাহন সাদা পেঁচা এই অঞ্চলের মানুষের কাছে পবিত্রতা ও শুভ লক্ষণের প্রতীক। স্থানীয় মানুষ এই প্রজাতির পেচককে 'লক্ষ্মীপেঁচা' বলেন। গোলা অর্থাৎ শস্যভাণ্ডারের উপর বা ঘরের চালে সাদা পেঁচা উড়ে এসে বসলে গৃহস্থ মনে করেন দেবীলক্ষ্মী পরিবারের প্রতি প্রসন্ন হতে চলেছেন। শস্যক্ষেতের ভারায় (চাষী ইঁদুরের হাত থেকে শস্য বাঁচাতে শস্যক্ষেতের মাঝে দুই দিকে দুটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে আর একটি বাঁশ বা চেড়া দিয়ে সেটি যোগ করে দেন, এটিকে ভারা বলে) লক্ষ্মীপেঁচা গিয়ে বসলে কৃষক ভাবেন ক্ষেতে এবার প্রচুর ফসল হবে। এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাসে শস্যবৃদ্ধির আরও একটি ইঙ্গিত হল যদি চাষের সময় হনুমান আসে। দেবীর হাতে পদ্ম ও তাঁর পদ্মাসন থাকায়—এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস পদ্ম শ্রী, সম্পদ ও পবিত্রতার প্রতীক। প্রস্ফুটিত পদ্ম যেখানে, লক্ষ্মীও সেখানে অবস্থান করেন বলে সাধারণ মানুষ মনে করেন।

লক্ষ্মীপূজার উপকরণাদির মধ্যেও দেবীর শ্রীসম্পদদায়িনী রূপ পরিস্ফুট। দেবীর সম্মুখে জলভরা ঘট, আম্রপল্লব, পান, সশিষ ডাব, গেঁটেকড়ি, কুবেরের মাথার খুলির প্রতীক, শূকরের দাঁত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। 'জলভরা ঘট' সম্পর্কে পণ্ডিতগণ মনে করেন এটি সন্তানসম্ভবা মাতৃত্বের প্রতীক। ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়ে অঙ্কিত বিশেষ চিহ্নটি 'মাতৃচিহ্ন' বলে পরিচিত। এই অঞ্চলে ক্ষেত্রগবেষণায় এই তত্ত্বের সমর্থন লাভ করা গেছে। তাছাড়া ঐ বিশেষ চিহ্নটি 'স্বস্তিক চিহ্ন'(?), 'নারায়ণ', 'সপ্তঝারা' ও 'সপ্তদেবতা' নামেও কথিত হয়। কুবেবেব মাথাব খুলি ও শূকরের দাঁত এই অঞ্চলের লক্ষ্মীপূজায় ব্যবহৃত হয়। এগুলি আদিমতর কোন এক ঐতিহ্য বহন করে, যা বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও নেই বলে জানা যায়। গেঁটেকড়ি— সমুদ্রকন্যা ধনদেবী লক্ষ্মী বা বিত্তের প্রতীক। সমুদ্র পথে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদলাভের প্রতীক হিসাবে পূজায় গেঁটেকড়ির অস্তিত্ব বলে এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস আছে। তাছাড়া গেঁটেকড়ির এই দুই পিঠ মাতৃ-চিহ্নের অনুরূপ বলে পূজার উপকরণাদিতে স্থান পাওয়া বিচিত্র নয়। পূজায় 'বুতকাঠ' অর্থাৎ ছোট নৌকার ব্যবহার চব্বিশ পরগণার মানুষ তথা বাঙালীর বাণিজ্য-প্রীতিকেই সমর্থন করে। এছাড়া লক্ষ্মীপূজায় ব্যবহৃত হয় পঞ্চশস্য (ধান, সরিষা, তিল, যব, মাষকলাই), পঞ্চপল্লব (আম, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর), পঞ্চগুঁড়ি (চাল, হলুদ, বেলপাতা, তুষ

পুড়িয়ে গুঁড়ো, চাল ও রং মিশ্রিত গুঁড়ো), পঞ্চরত্ন (সোনা, রূপো, তামা, দস্তা, সীসা বা লোহা), পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোচোনা), পঞ্চফল ইত্যাদি। এগুলির প্রতিটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। উক্ত উপকরণাদি বিশ্লেষণে প্রাচীন মাতৃকা-পূজার বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্মীপূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং বিভিন্ন তথ্যসূত্র ও ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লক্ষ্মীপূজা আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ দেবী-পূজা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি শ্রী ও সম্পদের প্রতীক-পূজা। প্রচলিত পালাগানে এর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

চব্বিশ পরগণায় কেবল লক্ষ্মীব মূর্তিপূজা নয়, দেবীর ঘটপূজাও হয়। মূর্তি ও ঘট ছাড়া 'আচার সর্বস্ব' লক্ষ্মীপূজা আছে। যেমন "ধানের গাদার পূজা", গোলাপূজা, ক্ষেত্র-পূজা ইত্যাদি। বর্তমান গবেষক-সংগৃহীত ঘটের গায়ে সিঁদুর দ্বারা অঙ্কিত চিহ্নকে মাতৃচিহ্নরূপে এই অঞ্চলের নির্দেশ করার তথ্য লক্ষ্মীদেবীর মাতৃকারূপ বিশেষভাবে নির্দেশ করে। এই অঞ্চলের লোকসমাজে দেবী শুচিতা, পবিত্রতা, ধনসম্পদদায়িনীরূপে কল্পিতা ও পূজিতা হন। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে চব্বিশ পরগণার অভিজাত সমাজ ও লোকসমাজ এই দেবীকে যত নিবিড়ভাবে মনে ও কোণে স্থান দিয়েছেন এমনটি কোন দেবদেবীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। লক্ষ্মীকেন্দ্রিক বিভিন্ন লোকাচার, পালপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান, লোককথা ও পালাগান ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন তারই ইঙ্গিতবাহী। দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুর্দশাগ্রস্ত এই অঞ্চলের মানুষের একান্ত কামনা দেবীলক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করা। সে কারণে চব্বিশ পরগণার মানুষের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পূজাচার, পাড়াভিত্তিক, গ্রামভিত্তিক বা পরিবারভিত্তিক পালাগানের ব্যবস্থা অতিশয় ব্যাপক।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ পূজিতা লক্ষ্মী, পালাগানে নানাভাবে প্রতিভাত হন। পালাগান সাহিত্যে দেবীলক্ষ্মী নারায়ণ-ঘরণী। তাঁর সখী নীলাবতী, কোন কোন পালাগানে বিমলা। গরুড় তাঁর আজ্ঞাবাহী। অজগর সর্পদেবীর শুভশক্তির পক্ষে অনিষ্টকারী। দেবী তাকে বিনাশ করেন। কমলা নামেও তিনি পরিচিতা। মায়ারূপ ধারণ করে তিনি ভক্তকে ছলনা করেন। কৃষ্ণরাম দাসের 'কমলামঙ্গল'এ দেবী ধান্যভূষণা। প্রচলিত পালাগানে দেবী মায়া ধান্যক্ষেত্রের মাঝে অধিষ্ঠিতা। কোথাও তিনি গজলক্ষ্মী রূপে ভক্তকে দর্শন দেন। সেক্ষেত্রে দেবীর কমলেকামিনীর রূপ, সমুদ্রের মাঝে দুইদিকে দুটি গজ কুম্ভভর্তি জল দুইদিক থেকে দেবীর শিরে সেচন করে। কোথাও কমলে-কামিনী লক্ষ্মী এক হাতে হাতি গ্রাস করছেন, অপর হাতে উদ্গীরণ করছেন।

পালাগানের লোক-প্রচলিত কাহিনীতে দেবীলক্ষ্মী ভক্তকে একমুঠো ধান দিয়ে অনুর্বর জমিতে বুনতে আজ্ঞা দেন এবং তাতে রাশি রাশি ধান ফলে এবং ভক্ত লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠেন। যে ব্যক্তি দেবীকে অগ্রাহ্য করেন বা চিনতে না পারেন দেবী তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করেন। রাজা ভিখারী হয়ে যান এবং ভক্তির গুণে ভিখারী রাজা হয়ে যান অথবা প্রভু ভৃত্য বনেন, আর ভৃত্য হন প্রভু।

লক্ষ্মীর পালাগান সাহিত্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। দেবী কমলা বা লক্ষ্মীর ভক্ত দেবীর কৃপায় কেবল শস্য সমৃদ্ধি লাভ করেন না, সেইসাথে রাজকন্যাও লাভ করে থাকেন। এক্ষেত্রে রাজকন্যা সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। প্রচলিত প্রবাদেও এর সমর্থন আছে 'গরু, জরু, ধন, রক্ষা কর ভক্তজন'। সুতরাং গরু, স্ত্রী ও ধন এ সবই সম্পদের প্রতীক। সে কারণে রাজত্বের সাথে রাজকন্যা পালাগানে স্থান পেয়েছেন। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মত পালাগানে বর্ণিত লক্ষ্মী ভক্তের সৌভাগ্যদানের জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে তিন ধরনের লক্ষ্মীপূজা প্রত্যক্ষ করা যায়।
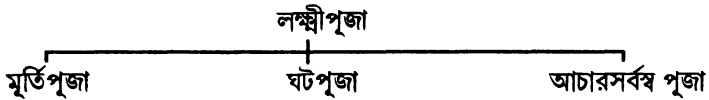
দেবীলক্ষ্মীর মূর্তিপূজা বৎসরে একদিন হয়। শারদ পূর্ণিমায় যে পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বলে। মহাধুমধামে দেবীর পূজানুষ্ঠান পালিত হয়। দেবী দুর্গার সাথে (দুর্গাপূজায়) লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিপূজা হলেও সামগ্রিকভাবে একে দুর্গাপূজাই বলা হয়।

দেবী লক্ষ্মীর ঘটপূজা বারোমাসই বিভিন্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। মহিলাগণ ঘরে অথবা ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীর ঘট বসিয়েই রাখেন। বারব্রতপ্রিয় মহিলাগণ প্রতি বৃহস্পতিবার দেবীর ঘটে পূজা করেন। এছাড়া ভাদ্র মাস, পৌষমাস ও চৈত্রমাসের প্রতি বৃহস্পতিবার দেবীর পূজা হয়। প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজানুষ্ঠানে অপারগ হলে মহিলাগণ অন্তত মাসের যেকোন দুটি বৃহস্পতিবারে নানা উপচারে দেবীর পূজা করেন। স্থানীয় ভাবে এই লক্ষ্মীপূজাকে আড়িলক্ষী বা 'খন্দপালা লক্ষ্মী' পূজা বলে। 'খন্দপালা' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। 'খন্দ' শব্দটির আঞ্চলিক অর্থ শাক-সব্জী শস্যাদির বাগান। 'পালা' শব্দটি খন্দের অনুচর শব্দ বা সমার্থক। সুতরাং খন্দপালা উল্লিখিত লক্ষ্মী বলতে শস্যের দেবীকেই বোঝায়। খন্দপালালক্ষ্মীর পূজা তিন মাসেই হয়ে থাকে। লোকবিশ্বাসে এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। এই পূজার ব্রতিনীগণ বলেন, চাষবাসের উন্নতির জন্য ও অভাব অনটন দূরীকরণের জন্যই এই পূজা করা হয়। 'খন্দপালালক্ষ্মীপূজার' আচার অনুষ্ঠান লৌকিক। অঞ্চল ভেদে এর ভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়। যে বৃহস্পতিবার দেবীর পূজানুষ্ঠান হয় সেই দিন গৃহস্থ বাড়ির একজন মহিলা উপবাসে থাকেন। 'উপবাস' বলতে এক্ষেত্রে ভাত ও আমিষ খাবার বাদ দিয়ে অন্য কিছু আহার্য হিসাবে গ্রহণ করাকেই বোঝায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পূজানুষ্ঠান উপবাসী ব্রতিনী করেন, পুরোহিতের দ্বারা পূজানুষ্ঠান করাতেও দেখা যায়। পূজার উপকরণ অতি সাধারণ। সন্দেশ, বাতাসা, কলা ইত্যাদি নানা ফলমূল উপকরণ হিসাবে থাকে। একে 'ডালাপূজা' বলে। পুরোহিত পূজানুষ্ঠান করলে পূজার ডালায় পরিমাণ মত আতপচাল থাকে। পূজাশেষে দানদক্ষিণা নিয়ে পুরোহিত বিদায় হলে ব্রতিনী পূজার প্রসাদগ্রহণ করে পরে অন্য খাদ্যগ্রহণ করেন। পূজার শেষে

পুরোহিত অবশ্যই লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করেন। তিনি পূজা কাজে অধিক ব্যস্ত থাকলে ব্রতিনী অথবা লেখাপড়া-জানা মহিলা পাঁচালি পাঠ করেন।

দেবীলক্ষ্মীর তৃতীয় ধারার পূজাকে লক্ষ্মীর আচারসর্বস্ব পূজা বলা হয়। এই পূজার জন্য ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে আহ্বান করা হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষগণ বিশেষ কয়েকটি আচার বা সংস্কার আচরণ করে লক্ষ্মীর পূজা করেন। যেমন ধানের গাদায় পূজা, গোলায় ধান তোলা বা নামানোর কালে পূজা, ক্ষেত্রে পূজা ইত্যাদি। ধানের গাদায় পূজাকে 'গাদার সাধ দেওয়া' বলে, ধানের গোলায় ধান তোলা বা নামানোর কালে যে সংস্কার তাকে "আগতোলা" বলে। ক্ষেত্রে ধান্যরোপণ বা ধান্যছেদন কালে সংস্কারগত যে পূজা তাকে "গোছপুণ্য' ও 'পোঁচপুণ্য' বলে। এ সবই লক্ষ্মীর আচারসর্বস্ব পূজা। মহিলাগণ ভাণ্ডার থেকে রান্নার জন্য চাল নেওয়ার সময়ও 'আগরাখা' সংস্কার পালন করেন। 'আগরাখা' সংস্কারটি হল ভাণ্ডার হতে প্রয়োজনীয় চাল বার করে নেবার পর বাম হাতে করে তিনটিপ বা তিনমুঠো চাল আবার রান্নার চাল থেকে তুলে ভাণ্ডারে রাখা হয়। গোলা থেকে ধান নামানোর সময়ও ঐ একই রীতি পালন করা হয়। ধান নামানো শেষ হলে বামহাতের তিনমুঠি ধান আবার গোলায় তুলে রাখা হয়। এইরূপ সংস্কার পালনের পেছনে যে লোকবিশ্বাস তা হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হতে কোন কিছুই নির্মূল করে নিতে নেই। অল্প কিছু রেখে দিলে মা লক্ষ্মীর কৃপায় আবার তা পূর্ণ হয়ে থাকবে। লক্ষ্মীর পূজা-সংক্রান্ত জাদুবিশ্বাসই এইরূপ সংস্কার পালনের মূল ভিত্তি। চব্বিশ পরগণার জনসমাজে লক্ষ্মীর পূজা ও সেই সম্পর্কিত নানা আচার-অনুষ্ঠান এই অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পালন করেন। ব্যবসাবাণিজ্য, চাষবাস প্রভৃতি জীবিকা-কর্মের সকল ক্ষেত্রে দেবী লক্ষ্মীকে নানাভাবে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর পূজা করা হয়।

চব্বিশ পরগণায় লক্ষ্মীপূজার এক বিশেষ অঙ্গ হল 'লক্ষ্মীর সাধ দেওয়া'। লক্ষ্মীর সাধ দেওয়া হয় লক্ষ্মীর ঘটে ও ধানের গাদায়। লক্ষ্মীর ঘটে সাধ দেওয়ার অনুষ্ঠান করেন মহিলাগণ এবং ধানের গাদায় সাধ দেওয়ার অনুষ্ঠান করেন পুরুষগণ। পুরুষদের আচরণীয় অনুষ্ঠানে কোনরকম আড়ম্বর থাকে না, থাকে কেবল নির্দিষ্ট সংস্কার। লক্ষ্মীর ঘটে সাধ দেওয়ার মধ্যে থাকে নির্দিষ্ট সংস্কার ও আয়োজনগত আড়ম্বর। চব্বিশ পরগণার জনসমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ বাড়ির মহিলাগণ একক ও সম্মিলিতভাবে কার্তিক সংক্রান্তিতে গৃহে বা ধানের গোলার ধারে অথবা ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীর ঘট প্রতিষ্ঠা করেন। পুরো অগ্রহায়ণ মাস এই ঘটপূজা চলে। কার্তিক সংক্রান্তিতে বা ১লা অগ্রহায়ণে ঘট বসান হয় একটি মাটির সরায়। সরাতে প্রথমে কিছু কাদা মাটি দেওয়া হয়। তারপর সরার উপর একটি মাটির, পিতলের অথবা তামার ঘট বা ঘটি জলপূর্ণ করে বসান হয়। সরার মাটির উপর সরিষা, কলাই, গম, যব ইত্যাদি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাটির রসে কয়েকদিন পর সেগুলি থেকে গাছ বার হয়ে জলপূর্ণ পাত্রটিকে প্রায় ঢেকে ফেলে। উক্ত ঘট ও সরিষা কলাইয়ের গাছ লোকবিশ্বাসে সুখসমৃদ্ধির প্রতীক। এগুলি যতই বাড়তে থাকে সংসারের সুখসমৃদ্ধি যেন ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘ একমাস যাবৎ মহিলাগণ স্নান করে এসে ঘটে

জল ভরে দেন, পূজা করেন ও সংসারের সুখসমৃদ্ধি কামনা করেন। নিত্যদিনের পূজা শেষ হলে মহিলাগণ অন্নাদি গ্রহণ করেন। মাসের শেষদিন যেদিন ঘট তোলা হয় সেইদিন ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত দ্বারা ঘটের সামনে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। পুরোহিত যথানিয়মে দেবীলক্ষ্মীর মন্ত্রে পূজা করেন। এইদিন উক্ত ঘটের সাধ দেওয়া হয়। ঘটের সাধের বিশেষ উপকরণ হল পাটালি, পাকাকলা ও চালের গুঁড়ো। এগুলি একটি পাত্রে ভালো করে চটকে দেবীলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। সুজি রান্না করেও অনেকে দেবীলক্ষ্মীর উদ্দেশে অর্পণ করেন। একেই বলে 'লক্ষ্মীর ঘটের সাধ' দেওয়া।

অনুরূপভাবে ধানের গাদায় সাধ দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসে চাষীর বাড়িতে বা খামারে ক্ষেত থেকে ধানের বিচালি তুলে এনে গাদা দেওয়া হয়। একজন বা একাধিক ব্যক্তি বিচালি সাজিয়ে গাদা দেন, অপর ব্যক্তি বিচালি সাজিয়ে নিচ থেকে গাদার উপর তুলে দেন। গাদা দেওয়া সমাপ্ত হলে নিচে একজন গাদা হাতের ঠেস দিয়ে ধরে থাকেন এবং গাদার উপর যে বা যাঁরা থাকেন তাঁরা ধীরে ধীরে নেমে আসেন। তারপর তিনি ঝরে-পড়া ধান একমুঠো নিয়ে গাদাটিকে ঘুরে এসে উপরে ছুঁড়ে দেন। একেই বলে 'গাদার সাধ' দেওয়া। লোকবিশ্বাস, সাধ দেওয়ার গুণেই গাদাঝাড়ার সময় অধিক ধান পাওয়া যাবে। এটি আদিম মানুষের জাদুবিশ্বাসের জের বলে অনুমান করা যায়। উক্ত পদ্ধতিতে সাধ দেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে শস্যসম্ভার প্রসবিনী লক্ষ্মীর পূজা করা হয় এবং ধনের প্রাচুর্য কামনা করা হয়। এইসব আচার-অনুষ্ঠান ও বাসনা-কামনার প্রকাশ ঘটে লক্ষ্মীর লোকায়ত পালায়।

অলক্ষ্মী পূজা

লক্ষ্মীপূজার সাথে এক বিশেষ লৌকিক পূজা জড়িত আছে। তা হল অলক্ষ্মী পূজা। অলক্ষ্মী হল লোকবিশ্বাসে শ্রী ও সম্পদের বিঘ্নসৃষ্টিকারী দেবী। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের বুড়ো অমাবস্যায় কালীপূজার পর প্রতিপদের দিন অথবা দ্বিতীয়ার দিন মহিলাগণ এই দেবীর পূজা করেন। দেবীর মূর্তি অতি সাধারণ। কলার পেটকো বা বাঁশের ঠুঙিতে গোবরের লাড়ু ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা পুতুল জগন্নাথের মত করে, চোখের কাছটিতে দুই আঙুল দিয়ে টিপে চোখ ও নাক করে দেওয়া হয়।[৩] আদিম প্রথায় নির্মিত এটাই অলক্ষ্মী মূর্তি। এবার এর মাথায় ছেঁড়া চুল, দু-চারটি নিমপাতা, ঝাঁটার কাঠি, জমা জঞ্জাল, কপালে সিঁদুর, গোবরের প্রদীপে তেল-সলতে দিয়ে জ্বেলে সূর্য ওঠার আগে কুলো (শূর্প) বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা করে পথের তে-মাথায় বা বাড়ির বাইরে বসিয়ে দিয়ে আসা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। তারা সবাই একযোগে বলে —

ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আয়
অলক্ষ্মী বেরিয়ে যায়।

আবার কোথাও বলতে শোনা যায় —

ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক
অলক্ষ্মী বাইবে যাক।

অলক্ষ্মী বার করার আগে গৃহের ঠাকুরথানে প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়। অলক্ষ্মী বাইরে ফেলে এসে ঠাকুর থানে তিনটি বা পাঁচটি শঙ্খের ধ্বনি দেওয়া হয়। তারপর পুরোহিত লক্ষ্মীপূজার নিয়মে লক্ষ্মীপূজা করেন। এই পূজার বিশেষ উপকরণ হল আটকড়াই ও চিঁড়ে ভাজা, এছাড়া থাকে পূজার সাধারণ উপকরণ। এদিন যে-লক্ষ্মী পূজিতা হন তা চালের গুঁড়োর পিটুলী দিয়ে তৈরি। একাসনে থাকে কুবেব, পাশে শস্য গোলা, নাবায়ণ, পাশে লক্ষ্মী ও সিঁদুর কৌটো।

অলক্ষ্মী বার করার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। স্থান বিশেষে মেয়েরা নিজেরা পূজা করে সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যাকালে বা সূর্য ওঠার আগে ভোরবেলা অলক্ষ্মী বার করেন। আবার এই অঞ্চলের ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় ব্রাহ্মণ এসে বামহাতে যেকোন সময় অলক্ষ্মী পূজা করলে পর 'অলক্ষ্মী বিদায়' করা হয়। উভয়ক্ষেত্রে বাচ্চারা শোভাযাত্রায় অলক্ষ্মী বিদায়কালে উপস্থিত থাকেই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় অলক্ষ্মী বিদায়ের এক অভিনব ছড়া ক্ষেত্রগবেষণায় সংগৃহীত হয়েছে। বাচ্চারা কুলো বাজিয়ে সমস্বরে চিৎকার করে ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করে —

কুলোর এই ঢপ্‌ঢপানি
বেরোরে চুদ-মারানী।

অলক্ষ্মী বিদায়কালে এই অশ্লীল ছড়ার আবৃত্তি ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অনেকে মনে করেন যে, অলক্ষ্মী বিদায় তথা আকাশের নিচে পূজিতা অলক্ষ্মীই অনার্য-সমাজে পূজিতা আদিম প্রকৃত শুভলক্ষ্মী এবং তার অলক্ষ্মী নামটি আর্য প্রভাবে পরবর্তীকালে আরোপিত হয়েছে। গভীরভাবে গবেষণা করে ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে এবং আধুনিক নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের আলোকে অনেকে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, অলক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী আদিম জনজাতির পূজিতা দুই শক্তি। অলক্ষ্মী অশুভ শক্তির প্রতীক, লক্ষ্মী শুভ শক্তির প্রতীক। খুব স্বাভাবিকভাবেই লোকসমাজ অশুভ শক্তির প্রতীক অলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে শুভ শক্তির প্রতীক লক্ষ্মীকে গৃহে স্থাপন করেন। Evil spirit বা অশুভ শক্তির বিতাড়ন এবং শুভ শক্তির বন্দনা পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম সমাজে পরিলক্ষিত হয়। বাংলার লোকসমাজে অশুভ শক্তির প্রতীক অলক্ষ্মীকে বিতাড়ন এবং শুভ শক্তির প্রতীক লক্ষ্মীকে বরণ করার মধ্যে উর্বরাসংক্রান্ত আদিম জাদুবিশ্বাসের অবশেষ লক্ষ্য করা যায়।[৪] গালমন্দ করে ছড়া কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করে বিভিন্ন সূত্রে এই তথ্য লাভ করা গেছে যে, অশুভ শক্তি অলক্ষ্মীকে তাড়ানোর জন্য গালমন্দ করা হয়। গালমন্দ করে অলক্ষ্মীকে না তাড়ালে আসল লক্ষ্মীকে ঘরে আনা যায় না। প্রাচীন মহিলাগণ বিশেষভাবে বলেন যে এই জন্যই আগে 'গালমন্দ' করে অলক্ষ্মীকে তাড়ানোর ব্যবস্থা এবং তারপরে 'আসল লক্ষ্মীকে' ঘরে তোলা 'কুলো-কৌলিক-প্রথা'

হিসাব পালিত হয়। অলক্ষ্মী বিদায়ের ছড়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে লোকসমাজে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর চরিত্র খুবই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রাহ্মণ অলক্ষ্মীকে যে- পূজা করেন সেখানে মন্ত্রতন্ত্র কিছুই থাকে না— আছে বিনয়পূর্ণ কিছু কথা। যেমন— "হে অলক্ষ্মী, তুমি মাতা, আমরা সন্তান, তুমি দুঃখ পেয়ো না বা কিছু মনে কোরো না, তুমি আমাদের মঙ্গল কামনা করে বেরিয়ে যাও।'[৪]

অশুভ শক্তিকে দূর করার জন্য অশ্লীল উক্তি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও নিষিদ্ধ বস্তু দিয়ে আঘাত ইত্যাদি করার এই রীতি আজও এই অঞ্চলে ও অন্যত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হতে দেখা যায়। ওঝা বৈদ্যগণ তাঁরা ভূতে পাওয়া নারী বা পুরুষকে ঝাঁটা, জুতা ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে 'অশ্লীল মন্ত্র' উচ্চারণ করে ভূত ছাড়ানর ব্যবস্থা করেন। আরও বাস্তব উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই অঞ্চলের লোকসমাজ তাঁদের অবাধ্য অশিষ্ট সন্তানাদিকে শান্ত-সৌম্য করার জন্য অশ্লীল বাক্য ও নিষিদ্ধ বস্তু দিয়ে আঘাতাদি করে থাকেন। সুতরাং অলক্ষ্মী বিদায়ের প্রথা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশ্বাস সংস্কারের মধ্যে অশুভ শক্তি বিতাড়নের আদিম জাদু-প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় স্থানীয় মহিলাদের বিশ্বাস, অলক্ষ্মী বার করার সাথে সাথেই যেন বাড়ির সমস্ত অশুভ শক্তির নাশ হয়, সমস্ত দৈন্যদুর্দশা দূর হয়ে লক্ষ্মীর আগমনের পথ প্রশস্ত হয়। গৃহে লক্ষ্মীর আসন যেন নতুন করে পাতা হয়।

অলক্ষ্মীকে নিয়ে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ— রাজা নতুন বাজার বসিয়েছেন, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দিনের শেষে সমস্ত অবিক্রীত মাল ক্রয় করে নেবেন। সত্যরক্ষার্থে দিনের শেষে অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে তিনি অলক্ষ্মীকেও কিনে আনেন। ফলে রাজলক্ষ্মী বা সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করে যান। স্বয়ং ধর্মও তাঁকে ত্যাগ করতে চাইলে তিনি বাধা দিয়ে বলেন, ধর্মরক্ষার্থে তিনি একাজ করেছেন। সুতরাং ধর্ম থেকে যান এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে রাজলক্ষ্মী ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী ফিরে আসেন। স্থির হয় যে, লক্ষ্মীপূজার সাথে অলক্ষ্মী পূজাও হবে, তা পুরীর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে। সে কারণে এই অঞ্চলের লোকসমাজের এক অংশ একই আসনে অর্থাৎ কলাগাছের খোলে গোবরের লাড়ু করে অলক্ষ্মী ও চালের গুঁড়োর পিটুলি করে লক্ষ্মীঠাকুর গড়ে পূজা করে বাড়ির বাইরে রেখে আসেন।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এ অলক্ষ্মী সম্পর্কিত পরিচিতি আছে। সেখানে অলক্ষ্মী সম্পর্কে বলা হয়েছে— "অলক্ষ্মী দুর্ভাগ্যের দেবী, লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী রূপে পরিচিত। জ্যেষ্ঠাদেবী, কালকর্নিকা-কালকর্ণী, নিঋতি, পাপীলক্ষ্মী, দুষ্ট লক্ষ্মী, আলক্ষ্মী ইত্যাদি নামেও অভিহিত। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে অলক্ষ্মীর উৎপত্তির কাহিনী অনুসারে- দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনকালে যে-দেবী ওঠেন এবং দেবতাদের যিনি অনাচার বহুল, অপরিচ্ছন্ন ও দুর্মতিপরায়ণ নরাধমদের গৃহে অধিষ্ঠিতা হন, তিনিই অলক্ষ্মী। ইনি দ্বিভুজা কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবসনা, লৌহ অলংকারে ভূষিতা, হাতে সম্মার্জনী, শর্করা চন্দনচর্চিতা,

গর্দভারূঢ়া, কুরূপা ও কুৎসিতস্থান বিলাসিনী। দীপান্বিতা অমাবস্যায় গৃহের বাইরে অলক্ষ্মীর পূজা ও বিতাড়ন অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণত দ্বীপান্বিতা অমাবস্যায় অলক্ষ্মীর পূজা হলেও দেশাচার বা কুলাচার অনুসারে ক্ষেত্রবিশেষে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি, নল সংক্রান্তি, সারু সংক্রান্তি বা ডাক সংক্রান্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গেও অলক্ষ্মী পূজা বা বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লোকসমাজে বিভিন্নভাবে অলক্ষ্মী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত গোবর, ছেঁড়া চুল আর নখ দিয়ে অলক্ষ্মীর মূর্তি গড়া হয় এবং গৃহাঙ্গনের বাইরে বাঁ-হাতে তাঁকে পূজা করা হয়। পূজান্তে অলক্ষ্মীকে ভাঙাকুলোয় করে দূরে চৌরাস্তায় বা আদাড়ে ফেলে দেওয়া হয় বা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। এইসময় কুলো পিটিয়ে বলা হয় —

অলক্ষ্মী দূর হ।
মা লক্ষ্মী ঘরে এসো।।

বিবর্তনের ধারায় লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর পরিবর্তিত বা অনার্য, অলক্ষ্মী আর্যকৃত রূপ নয়। লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী শুভ ও অশুভের প্রতীক দুই স্বতন্ত্র দেবী, অথর্ব বেদে যা পাপী লক্ষ্মী ও পুণ্যলক্ষ্মী বলে উক্ত। প্রকৃত পক্ষে অলক্ষ্মী পূজানুষ্ঠানে অশুভ শক্তির প্রতীক, অলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে শুভ শক্তির প্রতীক লক্ষ্মীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করার বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।"[৬] লোকায়ত পালাগানেও অলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ শোনা যায়।

লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী সম্পর্কে আরও একটি অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কালী-পূজার দুইদিন আগে থেকে কালীপূজার দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। দিনের বেলায় বালক বালিকারা বাড়ির বাইরে শুকনো লতাপাতা, শুকনো কলা-বাসনা (কলাপাতা) ইত্যাদি দিয়ে ঘর করে। ঠিক সন্ধে হতেই সন্ধে-দেওয়া প্রদীপের আলো থেকে পূর্বে প্রস্তুত করে রাখা একগুচ্ছ পাটকাঠি বা খড়ের মাথায় আগুন ধরিয়ে বাইরে গিয়ে প্রবল উৎসাহে আগুন ঘোরাতে থাকে ও প্রস্তুত করা লতাপাতার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এইসময় তারা সমস্বরে আবৃত্তি করে —

আলক্ষ্মীর বে, আলক্ষ্মীর ঘরে আগুন দে
আশ ধান পোষ ধান গোলায় ওঠ সে।

এই সাথে আরও একটি শ্লোক শোনা যায়, সেটি লক্ষ্মী সম্পর্কিত।

লক্ষ্মীরপোর বে, পাকাটির আলো দে
আজ লক্ষ্মীর অধিবাস, কাল লক্ষ্মীর বে
লক্ষ্মীর আনতে যাবে কে, ফুল বাতাসা দে
আশ ধান, পোষ ধান গোলায় ওঠ সে

প্রথম শ্লোকে পাটকাঠির আলো দেওয়া সংস্কারের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অলক্ষ্মীর ঘরে আগুন দিয়ে তার বংশবৃদ্ধি হতে না দেওয়া ও বাস্তুচ্যুত করার ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়। অপর দিকে দ্বিতীয় শ্লোকে লক্ষ্মীর সন্তানের বিবাহ তথা লক্ষ্মীর ঘর সংসার বৃদ্ধির কামনা

করা হয়। বালক-বালিকারা ফুল, বাতাসা নিয়ে লক্ষ্মীর আগমনের জন্য তৎপর। এই লোকোৎসবের মূল কামনা আউশ ধান ও পৌষ ধানের সম্ভারে যেন তাদের গোলা ভরে ওঠে অর্থাৎ যেন অন্নাভাব না হয়। লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান বা ছড়া-সমূহের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্মীর পালাগানে দেখা যায় না। অবশ্য লোকায়ত পালাগানে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়।

লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক বিভিন্ন পালাগানের প্রচলন চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবীলক্ষ্মীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক যত অধিক পালাগান এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে অন্য দেবদেবীর ক্ষেত্রে তা নেই। বিশেষত চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন-ঘেঁষা অঞ্চলগুলিতে এই পালার প্রচলন অধিক। পালাগায়ক ও পালাকার অধিকাংশই এই অঞ্চলের বাসিন্দা। লক্ষ্মীর ব্রতকথা, কাহিনীনির্ভর গান, পালাগান এ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশেই লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে আধ্যাত্মিক ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে চব্বিশ পরগণার জনজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই অঞ্চলের আচার-আচরণ, জীবন-সমস্যা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সবই লক্ষ্মীর পালাগানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সেদিক থেকে লক্ষ্মীর পালাগানের সাহিত্য-মূল্য অনস্বীকার্য।

চব্বিশ পরগণায় লক্ষ্মীর কাহিনীনির্ভর মাহাত্ম্য কথা তিন ধারায় প্রচলিত আছে। যথা — ১) মেয়েদের ব্রতকথায়, যা লক্ষ্মীর ব্রত উপলক্ষে পাঠ করা হয়। ২) পালাগানে, যা লোকশিল্পী কর্তৃক গীত হয়। ৩) ফকিরি গানে, যা মুসলমান ফকিরগণ দুয়ারে দুয়ারে গান করে ফেরেন।

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কথা

মেয়েদের ব্রতকথা পালাগান ফকিরি গান

মেয়েদের ব্রতকথা এখন মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে লক্ষ্মীর পূজা সংক্রান্ত নানা গল্প আচার-অনুষ্ঠানের কথা আছে। পণ্ডিতপ্রবর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ও নির্মল বুক এজেন্সী থেকে প্রকাশিত এই বইটি বারব্রতপ্রিয় প্রায় প্রতিটি মহিলা ঘরে রাখেন। লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আরও একটি জনপ্রিয় পাঁচালি হল 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র'। শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ মাজি প্রণীত ও এস. কে. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটিতে প্রায় আঠারটি গল্পে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। লক্ষ্মীপূজাকালে মহিলাগণ এই সমস্ত গল্প পাঠ করেন বলে জানা যায়।

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কথা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে প্রচলিত পালাগানে। এগুলির লিখিত রূপ নেই। লোকশিল্পীগণ কর্তৃক এগুলি আসরে গীত হয়। পালাগানের অনেক কাহিনী 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে, আবার স্থানীয় কোন কোন পালাগায়ক নিজেই রচনা করেছেন। লক্ষ্মীচরিত্র থেকে যে কাহিনী অবলম্বন করে পালাগান রচিত হয়েছে সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—কেবল মূল কাহিনীর ছায়া অবলম্বন করে

পালাগায়ক সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে, পালাগানের আদলে প্রস্তুত করে আসরে পালাগান পরিবেশন করেন। ফলে গ্রন্থে উল্লিখিত কাহিনীর সাথে পালাগানের সম্পর্ক তখন নিতান্ত ক্ষীণ বলে মনে হয়। পালা পরিবেশনকালে পালাগায়ক নাটকীয় ভঙ্গিতে এই গানকে জীবন্ত করে তোলেন। ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে বিভিন্ন লোকশিল্পীর নিকট হতে নিম্নলিখিত পালাগান সংগৃহীত হয়েছে।

শ্রী সত্যনারায়ণ সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীতে 'কমলামঙ্গল' নামে একটি পাঁচালি কাব্য আছে। এতে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। পাঁচালি ধারায় লেখা উক্ত পাঁচালি কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে পালাগায়কগণ পালাগান রচনা করে আসরে গান করেন। সংগৃহীত পালার দু-একটিতে কমলামঙ্গলের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পালাগানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণরামের ভণিতাযুক্ত শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে। কাহিনীর ধারাবাহিকতায় কোন কোন পালাগানে কমলামঙ্গলের প্রভাব থাকলেও পালাগায়কের স্বকীয়তা পালাগান থেকে হারিয়ে যায় নি। সুতরাং চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানগুলি প্রচলিত লোককথা বা পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে থাকলেও এগুলি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র।

ফকিরি গানে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কথা চব্বিশ পরগণার গ্রামেগঞ্জে প্রচলিত আছে। একশ্রেণীর মুসলমান, ফকিরবেশে হাতে চামর নিয়ে দুয়ারে-দুয়াবে গান করে চাল-পয়সা ভিক্ষা করেন। এঁরা মানিকপীরের গান করেন গোয়ালে গিয়ে, আবার লক্ষ্মীর গান করেন আঙিনায় দাঁড়িয়ে। এঁরা বিশেষ সুরে লক্ষ্মীর কৃপা পাবার পদ্ধতি গান করেন। তাঁদের গানের কথায় লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীর চরিত্র, সংসারের শুদ্ধাচার, সমৃদ্ধিলাভের উপায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। ফকিরদের মুখে এই গান শুনলে মনে হয় এঁরা যেন ঈশ্বর প্রেরিত দূত, সংসারের অন্যায়-অবিচার দূর করার জন্য, মানুষকে ভুলপথ থেকে সঠিক পথে পরিচালনার নিমিত্ত তাঁকে পাঠান হয়েছে।

চব্বিশ পরগণায় বহু লোকশিল্পী লক্ষ্মীর পালাগান করেন। যে-সমস্ত পালাগায়কের নিকট হতে উল্লিখিত পালাগুলি সংগৃহীত হয়েছে কেবল তাঁদের নাম ও তাঁদের নিকট হতে সংগৃহীত পালার উল্লেখ করা হল—

নাম	পালার নাম
১। সুদিন মণ্ডল	(১) বিনন্দ রাখালের পালা (২) ভাঁটুই ঠাকুরের পালা (৩) বীরবাহুর পালা
২। বসন্তকুমার গায়েন	বলাই দত্তের পালা

৩। নকুলচন্দ্র মণ্ডল বল্লভ দত্ত ও সনাতনের পালা

৪। শশধর মহিষ অমলার কথা

৫। বলরাম জানা লক্ষ্মীনারায়ণের পালা।

অস্বাভাবিক কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় উক্ত পালার কাহিনী সংক্ষেপ ও পালাকারদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে করায় কেবল বলরাম জানার নিকট হতে সংগৃহীত লক্ষ্মীনারায়ণের পালার সমস্ত অংশটিই সংযুক্ত করা হল।

বিনন্দ রাখালের পালা

বিনন্দ রাখালের কাহিনীটি 'সচিত্র বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র' গ্রন্থে আছে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রাপ্ত বিনন্দ রাখালের পালার সাথে উক্ত কাহিনীর কাহিনীগত মিল থাকলেও দুটির মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। প্রথমত প্রকাশিত পুস্তকের কাহিনীটি পাঁচালি আকারে লেখা। পয়ার ও ত্রিপদীছন্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পালাগানের কাহিনীটি দর্শক ও শ্রোতার উপযোগী করে সৃষ্ট। সেখানে হাস্য, করুণ, বীভৎস্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয়ত কাহিনীর অনেক ঘটনা ও চরিত্রগত পার্থক্য আছে। বিনন্দ রাখালের পালাটি সংগৃহীত হয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামের সুদিন মণ্ডলের নিকট থেকে। গায়ক সুদিন মণ্ডলের বক্তব্য অনুযায়ী বিনন্দ রাখালের কাহিনীটি তিনি শুনেছিলেন সীতাকুণ্ডু গ্রামের দ্বিজপদ মণ্ডলের নিকট থেকে, কিন্তু পালাটি সুর, তাল সহযোগে পরিবেশন উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই। তাই পালাটি সুদিনবাবু নিজের সৃষ্টি বলে দাবী করেন। পালাটি তিনি বহুদিন ধরে গ্রাম বাংলার বহু আসরে গেয়েছেন। কাহিনীটি অতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

বিনন্দ রাখাল এক গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মা পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে, দুজনের কোনরকমে পেট চলে। বিনন্দ একটু বড় হতে মা তাকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ির রাখাল হিসাবে নিয়োগ করে। সেখানে ব্রাহ্মণের অত্যাচার ও অবহেলায় তার খুব দুঃখ কষ্টে দিন যায়। বিনন্দ মাঠে গরু নিয়ে যায় আর সেখানে মাটির পুতুল গড়ে নিত্যপূজা করে আর কান্নাকাটি করে। মা-কমলা একদিন বালকের ক্রন্দন শুনে সেখানে আসেন ও বিনন্দকে কৃপা করেন। বিনন্দের হাতে একমুঠো ধান দিয়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে দিতে বলেন। বিনন্দ মায়ের কথামত সেই ধান পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাটে ছড়িয়ে ছিল। তাতে কয়েকদিনের মধ্যে গাছ হয়ে সুন্দর ধান ফলেছিল। মায়ের আদেশমত বিনন্দ সেই ধান গ্রামের লোকজন ডেকে সংগ্রহ করে কয়েকদিনে বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি হয়ে গেল। এই কথা শুনে রাজা কর ফাঁকি দেবার অভিযোগে বিনন্দকে রাজসভায় তলব করেন ও পরে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তখন মালক্ষ্মীর কৃপায় রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বিনন্দকে সসম্মানে মুক্তি দেন। এই অবস্থায় বিনন্দ যে ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখালি করত সেই ব্রাহ্মণ অবস্থার ফেরে বিনন্দের চাকর হয়ে থাকতে চাইলে বিনন্দ ব্রাহ্মণকে দেবীকমলার পূজারী

হিসাবে নিযুক্ত করে ও মহাধুমধামে দেশে লক্ষ্মীর পূজা হয়। সেই থেকে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পূজা হতে থাকে। এরপর গায়ক অষ্টমঙ্গলা ও মাঙনের গান গেয়ে আসর সমাপ্ত করেন।

ভাঁটুই ঠাকুরের পালা

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক অপর একটি পালাগান হল "ভাঁটুই ঠাকুরের পালা"। পালাটি সুদিন মণ্ডল গান করেন। সুদিন গায়েনের বক্তব্য অনুযায়ী সীতাকুণ্ডু গ্রামের দ্বিজপদ মণ্ডল এই পালার পালাকার। পালাগায়কগণ লক্ষ্মীর পালাগানের আসরে অন্যান্য পালাগানের সাথে এ পালাটি গেয়ে থাকেন। পালাটি খুবই ছোট, তবুও পালাগায়ক রঙ্গ-তামাশা দিয়ে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পালাটি পরিবেশন করেন। ভাঁটুই ঠাকুরের পালাটি রূপকথার মতই। গল্পরসের সাথে ভক্তিরস মিশে কাহিনীটি পরিবেশনকালে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে কাহিনীটি নিম্নরূপ —

ভাঁটুই ঠাকুর নামে এক দুর্ধর্ষ রাখাল ছিল। ঠাকুর-দেবতা সে কিছুই মানত না। নারায়ণ কিন্তু তার প্রতি সদয়। রাখাল বালকদের সাথে তার ওঠাবসা। সবাই তাকে রসিকতা করে বলে রাজকন্যার সাথে তার বিয়ে হবে। কারণ ভাঁটুই দুর্ধর্ষ হলে কি হবে দেখতে রাজপুত্রের মত। দেশের রাজার নাম পুষ্পরঞ্জন। তাঁর একটিমাত্র কন্যা। নাম তার পুষ্পবতী। পুষ্পবতী মালক্ষ্মীর নিত্যপূজা করে। পুষ্পবতীর মা মারা যাবার সময় কন্যাকে বলেছিলেন, প্রথম যৌবনকালে প্রভাতে রাজপ্রাসাদের বাইরে যে-অপরিচিত পুরুষের মুখ প্রথম দেখবে তাকেই স্বামী বলে বরণ করতে। একদিন রাখালবালকেরা ভাঁটুই ঠাকুরকে নিয়ে অতি প্রত্যুষে রাজার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রাজপুরীর বাইরে রাজার দর্শনপ্রার্থী হিসাবে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় প্রথম যৌবনদর্শী পুষ্পবতী পুরীর বাইরে এসে ভাঁটুই ঠাকুরকে দেখে ও তাকে স্বামী বলে বরণ করতে মনস্থ করে, কিন্তু তার সখীরা এ কাজে তাকে বাধা দিলে রাজা নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে মেয়েকে ভাঁটুই ঠাকুরের সাথে বিয়ে দিতে মনস্থ করেন। বিবাহ আসরে ঘটে এক চরম বিপত্তি। বিয়ের আসরেই অজগর সাপের দংশনে বর-কনে উভয়ের মৃত্যু হয়। লোকজন মৃতদেহ দুটি কলার মান্দাসে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। তখন দুটি কলার মান্দাস নদীর দুই কূল ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। শেষে মান্দাস মুক্তিদ্বীপের দুই দিকে গিয়ে আটকে যায়। মুক্তিদ্বীপের এমনই মাহাত্ম্য, সেখানকার মাটি স্পর্শমাত্র দুজনেই বেঁচে ওঠে। সেখানে নির্জন দ্বীপে একাকী পুষ্পবতী লক্ষ্মীর মূর্তি গড়ে পূজা করে, আর কান্নাকাটি করে। ভাঁটুই ঠাকুরও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে একাকী কান্নাকাটি করে। তাদের দেখে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের মনে দয়া হয়। তখন নারায়ণ লক্ষ্মীর সাথে পরামর্শ করেন দুজনের বিয়ে দেবার জন্য। লক্ষ্মী তাতে অমত হন ও সখী বিমলাকে নিয়ে মুক্তিদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে গরুড়কে স্মরণ করেন। গরুড় সেখানে উপস্থিত হলে পুষ্পবতীকে পুষ্পরঞ্জন রাজার কাছে পৌছে দিতে বলেন। গরুড় পুষ্পবতীকে নিয়ে রাজপুরীতে পৌছে দিলে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে। রাজা তখন দেশ বিদেশের রাজপুত্রদের খবর দিয়ে পুনরায় মেয়ের বিয়ের

আয়োজন করেন। লুচি, মণ্ডামিঠাই তৈরি হয়, তা থরে থরে সাজান হয়। এমন সময় রাজকন্যা পুষ্পবতী ঘুরতে ঘুরতে একটা লুচির ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে যায়।

এদিকে নারায়ণ ভাঁটুই ঠাকুরকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর দেখে গরুড়কে বলেন পুষ্প দত্তের রাজপ্রাসাদ থেকে একঝুড়ি লুচি মুক্তিদ্বীপে ভাঁটুই ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দিতে। আজ্ঞামাত্র গরুড় একঝুড়ি লুচি নিয়ে ভাঁটুই ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দেয়। লুচিতে হাত দেওয়া-মাত্র লুচির ঝুড়ির ভিতর থেকে পুষ্পবতী বেরিয়ে আসে। পুষ্পবতী ভাঁটুই ঠাকুরকে দেখে চিনতে পারে ও সেখানে তাদের গন্ধর্ব মতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। তারপর নারদ নারায়ণের নিকট গিয়ে অভিযোগ করেন যে, তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। কারণ তিনি ভাঁটুই ঠাকুরের সাথে পুষ্পবতীর বিয়ে দিতে পারলেন না। তখন নারায়ণ মুচকি হেসে লক্ষ্মী ও নারদকে নিয়ে মুক্তিদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। সবাই দেখে অবাক। সেখানে ভাঁটুই ঠাকুর ও পুষ্পবতী একাসনে উপবিষ্ট আছে। তা দেখে লক্ষ্মী, নারায়ণের উপর একটু চটলেন বটে, কিন্তু কিছু বললেন না। গরুড় নবদম্পতিকে নিয়ে আবার পুষ্পরঞ্জন রাজার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। রাজা মহা সমারোহে দুজনকে পুনরায় বিয়ে দিলেন ও বহু আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। পুষ্পবতী ও ভাঁটুই ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণকে পূজা করল ও দেশে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা প্রচার হল।

বীরবাহুর পালা

লক্ষ্মীর পালাগানের সব থেকে জনপ্রিয় পালা হল 'বীরবাহুর পালা'। পালাটি গেয়েছেন সুদিন মণ্ডল। তিনি পালাটি সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হারান পণ্ডিতের নিকট থেকে। হারান পণ্ডিতের বাড়ি জয়নগর থানার বাপুলীর চক্ গ্রামে। হারান পণ্ডিত অনেক পালাগান লিখেছিলেন, কিন্তু যথাযথ সংগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়ে যায়। সুদিন মণ্ডল তার কিছুটা সংগ্রহ করলেও তা রক্ষা করতে পারেন নি। উই পোকায় সেই সমস্ত খাতা শেষ করে ফেলে। তাঁর স্মৃতিতে পালাটি যতখানি ছিল ততখানিই সংগ্রহ করা গেছে। পালাটিতে কৃষ্ণরাম দাসের কমলামঙ্গলের কিছু ছাপ থাকলেও স্বাতন্ত্র্য অনেক ক্ষেত্রে আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

মলয়নগরে বীরবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে তিনি ইন্দ্রতুল্য। মহালক্ষ্মী রাজা বীরবাহুকে দিয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচার করার ইচ্ছা করলেন। স্বপ্নে বীরবাহুকে দেবীলক্ষ্মীর পূজা করার জন্য পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিষ্ণুভক্ত বীরবাহু দেবীপূজা করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। দেবীকমলা তখন তাকে শাস্তি দেবার জন্য ইন্দ্রের সাথে শঠতা করলেন। বারো বৎসরকাল বীরবাহুর রাজ্যে কোন বৃষ্টি হল না। তখন বীরবাহু ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে বীরবাহুর নিকট ইন্দ্র পরাজিত হলেন। রাজা তাঁকে স্বদেশে এনে কারাগারে বুকে পাথর চাপিয়ে রেখে দিলেন। মা কমলা ইন্দ্রের এই দশা দেখে বীরবাহুর নিকট পূজা ভিক্ষা করলেন এবং ইন্দ্রের মুক্তি চাইলেন। বিষ্ণুর ঘরনী

হিসাবে লক্ষ্মী পরিচয় দেওয়ায় বীরবাহু তাঁকে পূজা দিতে স্বীকার করেন। বিনিময়ে রাজ্যের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি তাঁকে পূরণ করতে হবে। দেবীকমলা তাতেই স্বীকার হয়ে তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করলে পর বীরবাহু দেবীর পূজা করতে প্রস্তুত হলেন। দেবীকমলা তাঁকে জানালেন তাঁর পূজা প্রচারের বিশেষ বিধি আছে। পঞ্চমবর্ষীয় কোন দেবীর ভক্ত সন্তান যদি মায়াদহ থেকে দেবীর ঘট এনে একশত একটা বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, সপ্ত-দূর্বা, সপ্তপ্রকার ধান্য একত্র করে পুষ্পাঞ্জলি দেয় তবেই দেবীর পূজা হবে। এই কথা বলে দেবী অন্তর্ধান করলেন।

রাজা এই কথা পাত্রমিত্রদের জানাতে তাঁরা চারদিকে বহু খোঁজাখুঁজির পর চরিত্র বেনেনীর সন্তান বিরোচনকে পায়। বিরোচনও রাজকার্যে নিযুক্ত হতে স্বীকৃত হন। রাজা বিরোচনকে যথোচিত ব্যবস্থা করে মায়াদহে পাঠালেন। বহু পথ অতিক্রম করে সাধুর ডিঙা মায়াদহে এসে পৌঁছায়। অদূরে সিংহল রাজ্য। সাধু বিরোচন সিংহলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। কিছুদূর অগ্রসর হতে সাধু আরো দেখলেন এক অবিশ্বাস্য সত্য। সমুদ্রের মাঝখানে এক দেবদেউল। সেখানে এক রমণী একটি জলহস্তী দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে গিলছেন আর বাম হস্তে উদগীরণ করছেন। তাঁকে ঘিরে ডাকিনী যোগিনী উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করছে। এই দৃশ্য সাধু দেখে মাঝিমাল্লাকে জিজ্ঞাসা করে এ ব্যাপারটা কি? কিন্তু তারা তা দেখতে না পাওয়ায় বিরোচনকে উপহাস করে। সাধু বিরোচন সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। সিংহল রাজের কাছে গিয়ে বৃত্তান্তটি বলে। রাজা সাধুকে জানান যদি সে দেখাতে পারে তাহলে তাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করবেন এবং একমাত্র কন্যা সুশীলাকে বিয়ে দেবেন। উৎফুল্ল হয়ে সাধু রাজাকে মায়াদহে নিয়ে গিয়ে চারদিকে দেখছে, কিন্তু সে দৃশ্য আর দেখতে পেল না বা রাজাকে দেখাতে পারল না। তখন পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত তাকে রাজার দক্ষিণ মশানে বলি দিতে নিয়ে গেল। এখানে বিরোচন কোতোয়ালকে অনুরোধ করে একটু সময় ভিক্ষা পায়। সেই সময়ে সে চৌত্রিশ অক্ষরে মা কমলাকে স্তব করে।

সাধু বিরোচন যখন দেবীকমলার স্তব করে তখন মা কমলা সখী বিমলাকে নিয়ে ছদ্মবেশে শ্মশানে উপস্থিত হন। তিনি ঘাতককে বলেন সাধু বিরোচনকে তিনি কোলে নিয়ে আদর করবেন, কারণ তাঁর নাকি এইরকম এক সন্তান ছিল, সে মারা গেছে, কিন্তু রাজার সৈন্যসামন্ত ও ঘাতক, বুড়ির কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। তখন দেবী যত দেবীসৈন্যকে আহ্বান করেন। তাদের সাথে রাজার সৈন্যের যুদ্ধ হয় ও সবাই নিহত হয়। অবশেষে কোতোয়াল রাজাকে গিয়ে এই সংবাদ দিলে রাজা এসে দেখেন তাঁর সমস্ত সৈন্য মৃত, কেবল সাধু বিরোচন ও এক বৃদ্ধা সেখানে আছে। রাজা বৃদ্ধার পরিচয় জানতে চাইলে দেবী নিজের পরিচয় দেন। তখন রাজা দেবীর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দেবীকমলা রাজাকে ক্ষমা করেন ও তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত বাঁচিয়ে দেন। রাজাকে দেবী তাঁর মায়ারূপ কমলেকামিনী দর্শন করান। রাজা দেবীর মায়ারূপ দর্শন করে সার্থক হন এবং কন্যা সুশীলার সাথে সাধু বিরোচনের বিয়ের ব্যবস্থা করেন ও মায়ের পূজার ব্যবস্থা করেন।

সিংহলরাজকন্যাকে বিয়ে করে বিরোচন মহাসুখে সেখানে কালাতিপাত করে, কিন্তু দেশের কথা, কর্তব্যের কথা একেবারেই ভুলে যায়। তখন দেবীকমলা তাকে স্বপ্নে তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন সাধু বিরোচন পরদিবসে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সুশীলাকে সাথে করে মলয়রাজ্যে ফেরে। সঙ্গে আনে মায়াদহ থেকে দেবীর ঘট। মলয়রাজ বীরবাহু সেই ঘট পেতে দেবীকমলার পূজা মহাধুমধামের সাথে করেন। রাজ্যে সুবর্ষণ হল, প্রকৃতি শস্যশ্যামল হয়ে উঠল। তখন খুশি হয়ে বীরবাহু সাধুকে অর্ধেক রাজ্য দান করেন। রাজ্যে দেবীর পূজা প্রচলন হওয়ার পর একদিন স্বর্গ থেকে রথ নেমে এল, তাতে বিরোচন ও সুশীলা স্বর্গে গেল।

এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি, তারপর গায়ক দেবীর অষ্টমঙ্গলা গান করেন ও নায়ক বন্দনা করে প্যালা তোলেন।

বলাই দত্তের পালা

চব্বিশ পরগণায় লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে-সমস্ত পালাগান জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছে তার মধ্যে বলাই দত্তের কাহিনীটি অন্যতম । বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে এই পালাটি পালাগায়ক বসন্তকুমার গায়েনের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। পালাটির প্রায় অধিকাংশই রামানন্দের ভণিতাযুক্ত। কয়েকটিমাত্র রামকৃষ্ণ দাসের ভণিতা আছে। রামানন্দ ভণিতায় লিখেছেন "কেশব দত্তের সুত গায় রামানন্দ"। কোথাও তিনি দ্বিজ রামানন্দ নামে ভণিতা করেছেন। কেশব দত্তের সুত রামানন্দ ও দ্বিজ রামানন্দ সম্ভবত এক। কারণ লেখার স্টাইল প্রায় একই। আর রামকৃষ্ণ দাসের ভণিতা যুক্ত রচনা মাত্র দুটি। এই রচনা দুটি রামানন্দের তুলনায় নিকৃষ্ট। রামকৃষ্ণ দাস কোন পালাগায়কের নাম হওয়া বিচিত্র নয়। এই পালায় দেবীলক্ষ্মীকে ধান্য ও সম্পদের দেবীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভক্তকে রক্ষা করার জন্য এ দেবী নানা ছলনার আশ্রয়ও গ্রহণ করেন। পালাগায়ক পালাটি গাওয়ার আগে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, গুরুবন্দনা ইত্যাদি গেয়ে মূল পালা শুরু করেন। বলাই দত্তের পালাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

একদিন মা দামোদরী সখী নীলাকে (লীলাবতী) সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখেন মর্ত্যে ধান্যে আগুন লেগেছে। তিনি বীরভদ্রকে (শিবের অনুচর) ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বীরভদ্র জানান তিনি শিবের আদেশে একাজ করেছেন। এতে লক্ষ্মীদেবী মনে খুব দুঃখ পেলেন। তারপর তিনি সুরপুরীতে গিয়ে সমস্ত দেবতাদের ডেকে যার যেমন ক্ষমতা তা প্রয়োগ করে ধান্যের আগুন নেভাতে অনুরোধ করেন। দেবী নিজেও স্তন্যের দুগ্ধ দিয়ে সেই অগ্নি নির্বাপিত করার চেষ্টা করেন। ইন্দ্রের বর্ষণে ও গরুড়ের পাখার ঝাপটায় অগ্নি নির্বাপিত হলে দেবী বলভদ্র বীরকে সমস্ত ধান্য একত্রিত করতে বলেন। অগ্নি লাগার ফলে দেখা গেল ধান্যের বরণ হরিদ্রা হয়ে গেছে এবং দেবীর দুগ্ধের স্পর্শে ভিতরের অংশ সাদা থেকে গেছে। দেবগণ এসে সেই ধান্যের বিভিন্ন নামকরণ করেন।

ধান্যের নামকরণ করে লক্ষ্মীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। সেখানে পদ্মাবতী নারায়ণের নিকট মর্ত্যে পূজা প্রচারের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। বলেন সনকপুর নগরে গুণসিন্ধু রাজার এক সদাগর আছে। তার নাম ভগীরথ ও স্ত্রী রত্নাবতী। নিঃসন্তান এই দম্পতি পুত্র কামনায় ব্যাকুল। ওদের কোলে জন্ম নিক প্রভাকর। কাঞ্চননগরের জয়ার গর্ভে জন্ম নিক প্রভাকরের স্ত্রী। দুইজন মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করার পর ওদের দ্বারাই মর্ত্যে আমার পূজা প্রচার হবে। লক্ষ্মীর এই কথায় নারায়ণ সন্তুষ্ট হয়ে প্রভাকর ও তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠান এবং মর্ত্যে পাঠান। প্রভাকর এসে জন্মগ্রহণ করলেন রত্নাবতীর গর্ভে ও তাঁর স্ত্রী জন্মগ্রহণ করলেন জয়ার গর্ভে। উভয়ের নাম হল বলাই ও বেদবতী।

বলাই দত্ত ছোটবেলায় পড়াশোনায় খুব ভাল, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী বুঝলেন বলাই পড়াশুনো করলে তাঁর পূজা প্রচার হবে না, তাই তাকে তিনি পড়াশুনোয় অমনোযোগী করে তোলেন। নিত্যনতুন উৎপাত সে শুরু করে। একদিন বিরক্ত হয়ে ভগীরথ তার বুকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। অপর দিকে ব্রাহ্মণ হরিহর তার পুত্র চন্দ্রশিখরকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বলাই ও চন্দ্রশিখর বন্ধু। উভয়ের যখন একই দশা অর্থাৎ বাড়ি থেকে বিতাড়িত তখন দুজনে দেশ ছেড়ে চলে যাবার মতলব আঁটে। দেবী কমলাও তাদের স্বপ্নে জানালেন বলাই দত্তের পাইঘরে মেঘপবন নামে যে-ঘোড়াটি আছে তাতে চড়ে তারা যেন কাঞ্চননগরে যায় এবং কাঞ্চননগরের রাজকন্যা বেদবতীকে বিয়ে করে দেশে ফিরে দেবীকমলার পূজা করে।

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দুই বন্ধু পাইঘর থেকে ঘোড়া নিয়ে বার হয়ে পড়ে। অনেক পথ অতিক্রম করে তারা খুব ক্লান্ত হয়ে এক জঙ্গলের মাঝে বিরাট পুষ্করিণীর কাছে বিশ্রাম নেয়। সরোবরে জল খেতে গেলে তাদের সেই ঘোড়াকে এক বিশাল অজগর গ্রাস করে এবং দুই বন্ধু তাই দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরলে তারা দেবী কমলার স্তব-স্তুতি করে। তাতে দেবী প্রসন্ন হয়ে তাদের অভয় দান করেন ও গরুড়কে স্মরণ করে সেই অজগর মেরে তার পেট চিরে মেঘ পবনকে বার করে আনেন। তারপর আবার তারা সেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাত্রা শুরু করে। পথে পড়ে প্রশস্ত এক নদী। দেবী মায়াপথ সৃষ্টি করে হরিণ হয়ে সেই পথ দেখিয়ে তাদের পার করে দেন। নদী পার হয়ে এসে তাদের সামনে দেখা দিল আর এক বিপত্তি। বিশাল এক শ্মশানপুরী। চারিদিকে হাড়, মাথার খুলি ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে। তারা সাহসে ভর করে সেই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখে এক রত্নসিংহাসন 'পরে এক ভীষণদর্শন রাক্ষসী। দুই বন্ধু তাকে নমস্কার করে মা বলে সম্বোধন করে। দেবীকমলার কৃপায় রাক্ষসী হিংসা ভুলে গিয়ে পুত্রস্নেহে আশ্রয় দেয় এবং জানায় এটা রাজা বীরসিংহের রাজপুরী। রাজার একটিমাত্র কন্যা—নাম তার শীলা, সে কেবল রাক্ষসীর সেবাদাসীরূপে বেঁচে আছে। রাক্ষসী ব্রাহ্মণপুত্র চন্দ্রশেখরের সাথে শীলার বিয়ে দেয়।

সেখানে কিছুদিন থাকার পর রাক্ষসীর অনুমতি নিয়ে শীলাকে রেখে তারা কাঞ্চির

নগরে যাত্রা করে। পথে যেতে এক সমুদ্র পড়ে। দেবীর কৃপায় সমুদ্রের উপর দিয়ে পথ সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা সেই পথ বেয়ে কাঞ্চির নগরে পৌছায়। তাদের দেখে নগর কোটাল তাদের ধরে রাজার কাছে নিয়ে যায় এবং রাজা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রাজা তাদের আগমনের বৃত্তান্ত ও পরিচয় শুনে খুশি হতে পারলেন না। তখন তিনি তাদের পরীক্ষা করার জন্য বলেন, তোমাদের প্রতি দেবীকমলার কেমন কৃপা তার পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেখানে এক বিশাল সরোবরে এক অজগর সাপ থাকে। রাজা বলেন, ঐ সরোবর থেকে পদ্ম তুলে আনতে পারলে তিনি তাদের পুরস্কৃত করবেন ও কন্যা বেদবতীর সাথে বিয়ে দেবেন। নতুবা দক্ষিণ মশানে বলি দেবেন। এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে বলাই দত্ত পুষ্করিণী থেকে পদ্ম তুলতে গেলে অজগরের ভয়ে ভীত হয়ে ফিরে আসে। তখন তাকে দক্ষিণ মশানে নিয়ে যাওয়া হয় বলি দেবার জন্য, কিন্তু দেবীকমলার কৃপায় রাজার লোকজন তাকে বলি দিতে পারল না। তাদের অস্ত্রশস্ত্র সবই ব্যর্থ হল। এমনকি সমস্ত সৈন্য মূর্ছিত হয়ে মশানে পড়ে রইল। এই সংবাদ শুনে রাজা মশানে দৌড়ে এসে দেখে অবাক। তিনি মা-কমলার স্মরণ নিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং দেবী তাকে স্বপ্নে বলাই দত্তের মুক্তির কথা রাজাকে বলেন ও তাঁর ভক্তের সাথে যে প্রতিশ্রুতি তা পালন করতে বলেন। রাজা জ্ঞান ফিরে পেলে পর বলাই দত্ত পুনরায় তাঁকে সেই অজগরের সরোবর থেকে পদ্ম তুলে রাজার হাতে দেয়। রাজা খুশি হয়ে কন্যা বেদবতীর সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। দেবীর কৃপায় রাজার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত বেঁচে ওঠে। কাঞ্চন নগরের রাজা মহাসমারোহে কমলার পূজা করেন।

বিবাহের পর বলাই দত্ত ও চন্দ্রশিখর কাঞ্চননগরে বেশিদিন অপেক্ষা করতে চাইল না। তারা দেশে ফিরে আসতে চায়। রাজানুমতি নিয়ে বহু ধনরত্ন সাথে নিয়ে রাজকন্যা বেদবতীকে সঙ্গে করে তারা রাক্ষসীর দেশে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে চন্দ্রশিখর পত্নী শীলাকে নিয়ে দেশে ফেরে। দেশের রাজা ও তাদের বাবা মা খুব খুশি হন ও মহাসমারোহে দেবীলক্ষ্মীর পূজা করেন। এরপর গায়ক লক্ষ্মীর অষ্টমঙ্গলা ও নায়েক বন্দনা করে দেবীর পালাগান সাঙ্গ করেন।

বল্লভ দত্ত ও সনাতনের পালা

বাংলায় লক্ষ্মীর পালাগান সাহিত্যে বল্লভ দত্ত ও সনাতনের কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয়। লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক অন্যান্য পালাগান অপেক্ষা এই কাহিনীটিরও পরিবেশন পদ্ধতির পার্থক্য লক্ষণীয়। কবি কৃষ্ণরাম দাসের কমলামঙ্গলের প্রভাব এ পালায় থাকলেও পালাটির মধ্যে নতুনত্ব ও বিশেষত্ব আছে। অপর পালাগানের সাথে তুলনামূলক বিচার করলে এটিকে আঙ্গিকগত লক্ষণে আলাদাই বলতে হয়। পালাটি আদ্যন্ত 'কথা', 'গান' ও 'ধোয়া' এই তিনের সুন্দর সমন্বয়ে সৃষ্টি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গায়ক নকুলচন্দ্র মণ্ডলের নিকট থেকে পালাটি সংগৃহীত। পালাটির মধ্যে তিনজন ব্যক্তির ভণিতা আছে। যেমন কৃষ্ণরামের নাম একটি পর্বে—

নিশাচরী গেল চরিতে বনে।

কবি কৃষ্ণরাম আনন্দে ভনে।।

অষ্টমঙ্গলায় দ্বিজ হরিপদ দাসের নাম পাওয়া যায়। যথা—

দ্বিজ হরিপদ দাসে ভনে মা কমলার পায়।

তাহার পরশে সবাই হরিলোকে যায়।।

আবার অষ্টমঙ্গলার শেষে গায়কের নামযুক্ত ভণিতা আছে। যথা—

করুণাময়ীর পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।

তোমার নামপ্রচার করে করুণা মণ্ডল গায়।।

দ্বিজ হরিপদ দাসের পরিচয় পাওয়া না গেলেও করুণা মণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। বারুইপুর থানার অন্তর্গত নাজিরপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। পাঁচালি গায়ক হিসাবে এতদঞ্চলে তাঁর খুব সুখ্যাতি। গল্প শুনে পালা বেঁধে নেবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল। নকুল মণ্ডল করুণাবাবুর শিষ্য। তিনি জানান প্রচলিত কাহিনী শুনে এই পালাটি করুণা মণ্ডলই লিখেছিলেন। এটি এই অঞ্চলে তিনি ছাড়া আর কেউ গাইতেন না বলে জানা যায়। অন্যান্য পালাগায়কের গানের সাথে এই পালার মূল কাহিনীর মিল লক্ষ্য করা গেলেও নামধামের পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বে উল্লিখিত বসন্তরঞ্জন গায়েনের নিকট থেকে প্রাপ্ত গানে এই ধরনের পালায় যে নাম পাই তা হল বলাই দত্ত ও চন্দ্রশিখর, বলাই দত্তের স্ত্রী বেদবতী ও চন্দ্রশিখরের স্ত্রী শীলা। কৃষ্ণরাম দাসের কমলামঙ্গলে পাই দ্বিজপুত্র জনার্দন ও সদাগরপুত্র বল্লভের কথা। জনার্দনের স্ত্রী বীরসিংহ-রাজকন্যা রত্নমালা, কাঞ্চির রাজা কলানিধির কুমারী হলেন বল্লভ দত্তের স্ত্রী, তাঁর নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং নামের কিছু হেরফের থাকলেও বিভিন্ন স্থানে থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক পালাগানের মূল সুর একই। বল্লভ দত্ত ও সনাতনের পালার কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

বল্লভ দত্ত ও সনাতন দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। নানা অসঙ্গতিমূলক কাজ বা আচরণ করার জন্য তারা উভয়েই বাড়ি থেকে তিরস্কৃত ও বহিষ্কৃত। দুইজনে তাই যুক্তি করেছে দেশত্যাগ করে বিদেশে যাবে। রাত্রে উভয়ে দেবীকমলার স্বপ্ন দেখে। দেবীকমলা তাদের স্বপ্নে জানান পথে পক্ষিরাজ ঘোড়া ও ধনুক আছে। তাই নিয়ে তারা যদি কাঞ্চিপুর সুরসিংহ রাজার কাছে যায় এবং সুবর্ণের বারি ও সুবর্ণের ঝারি নিয়ে এসে দেবীকমলার পূজা করে তাহলে তাদের সব দুঃখ কষ্ট দূর হবে।

স্বপ্ন পেয়ে দুই বন্ধু পথে সত্যসত্যই একটি ঘোড়া ও ধনুক পায়। সেই নিয়ে তারা কাঞ্চিপুর সুরসিংহ রাজার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যেতে যেতে তাদের অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হল, কিন্তু সবই মা কমলার কৃপায় দূর হয়ে গেল। মা নিজে তাদের অনেক পরীক্ষা করলেন। প্রথমে তাদের বাঘিনীর রূপ ধারণ করে ভয় দেখালে দ্বিজবন্ধু ভয় পেলেও সাধুপুত্র কোনরকম ভয় না পেয়ে বাঘিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিল। পরে মা

কমলার স্মরণ করতে বাঘ অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তারা যখন ঘোড়াকে জল খাওয়াতে সরোবরের নিকট যায় বিশালাকার এক অজগর অশ্বকে গ্রাস করে ফেলে। তখন বল্লভ দত্ত মা কমলাকে স্মরণ করতে দেবীকমলা গরুড় পাখিকে স্মরণ করেন। গরুড় তৎক্ষণাৎ এসে পাখার ঝাপটায় সরোবরের জল উপরে তুলে ঠোঁট দিয়ে অজগরকে পাঁকের মধ্য থেকে টেনে আনে ও তার পেট নখ দিয়ে চিরে অশ্বকে বার করে ঠোঁটের আঘাতে অজগরকে মেরে ফেলে। এরপর দেবী বল্লভ দত্তের হাতে একটা ফুল দিয়ে বলেন এটি হাতে নিয়ে দেবীর স্মরণ করলে সমস্ত রকম বিপদ তাদের কেটে যাবে।

তারপর দুই বন্ধু অশ্বে সওয়ার হয়ে যাত্রা শুরু করে। এবার তারা এক ভয়ংকর রাজ্যে এসে পড়ে। এটি বীরসিংহরাজার রাজ্য। মানুষজন কোথাও নেই। আছে চারিদিকে ছড়ান ফুলফল ও পূজার স্থান। দুই বন্ধু সেই দেবস্থানে নমস্কার করে অট্টালিকার দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে অট্টালিকার মধ্যে তারা এক সুন্দরী রমণীর সাক্ষাৎ পায়। তার নাম রত্নমালা। রত্নমালা এক দুর্ধর্ষ রাক্ষসীর কথা জানিয়ে তাদের সাবধান করে দেয়, কিন্তু দেবীকমলার কৃপায় রাক্ষসী সাধারণ মানবীর আচরণ করে তাদের সাথে সুব্যবহার করে এবং পালিতাকন্যা রত্নমালার সাথে ব্রাহ্মণপুত্র সনাতনের বিয়ে দেয়।

সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর দুই বন্ধু রাক্ষসীর অনুমতি নিয়ে কাঞ্চির নগরে সুরসিংহরাজার উদ্দেশে রওনা হয়। যাওয়ার পথে বল্লভ দত্ত মায়াদহে এসে কমলেকামিনী দর্শন করে। দেখে এক সুন্দরী রমণী এক হাতে ধরে হস্তি গ্রাস করছে আর অপর হাতে তা উদগীরণ করছে। চারদিকে পাখি গান করছে। ময়ূরময়ূরী নৃত্য করছে। সেখানে কত লোক ধান কাটছে, কেউ ধান জড়ো করছে। বিচিত্র ধরনের সে সব ধান। চারিদিকে এক মনোরম শোভা। এ দৃশ্য বল্লভ দত্ত ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না।

এই ঘটনা বল্লভ দত্ত সুরসিংহরাজার কাছে গিয়ে বললে রাজা তা দেখাতে বলেন। দেখাতে পারলে অনেক পুরস্কার দেবেন নতুবা দক্ষিণ মশানে বলি দেবেন। এই শর্তে বল্লভ দত্ত রাজী হয়, কিন্তু দেবীকমলার মায়ায় তা বল্লভ দত্ত রাজাকে দেখাতে পারে না। তখন তাকে দক্ষিণ মশানে নিয়ে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়। দেবীকমলার কৃপায় রাজার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বল্লভ দত্ত দেবীকমলার স্মরণ করায় দেবী সেখানে এক বৃদ্ধার রূপ ধরে এসে তাকে রক্ষা করেন। দেবীর কৃপায় সাধুপুত্র পুনরায় রাজাকে কমলেকামিনী দর্শন করাতে সমর্থ হয় এবং সুরসিংহরাজা সাধুপুত্রের নিকট সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ও নিজকন্যা সুশীলার সাথে বিয়ে দেন। এরপর রাজা মহাসমারোহে দেবীকমলার পূজা করেন।

পরদিন প্রভাতে বল্লভ দত্ত রাজার অনুমতি নিয়ে সুশীলার সাথে স্বদেশের উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করে। মায়াদহ থেকে সুবর্ণের বারি ও সুবর্ণের ঝারি নিয়ে তারা বীরসিংহ রাজার মৃত্যুপুরীতে এসে উপনীত হয়। সেখান থেকে রত্নমালাকে নিয়ে ও রাক্ষসীর অনুমতিক্রমে বহু ধনরত্নাদি নিয়ে স্বদেশে সনৎরাজ্যে উপনীত হয়। দেশের রাজাও তাদের

মাতাপিতা বল্লভ দত্ত ও সনাতনের আগমনে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বরণ করে গৃহে আনেন। রাজা তাদের আনিত সুবর্ণের ঝারি ও সুবর্ণের বারি নিয়ে মহা সমারোহে দেবীলক্ষ্মীর পূজার আয়োজন করেন এবং ঘরে ঘরে দেবীর পূজা শুরু হয়। এরপর গায়ক দেবীর অষ্টমঙ্গলা গেয়ে পালা সমাপ্ত করেন।

অমলার কথা

'অমলার কথা' লক্ষ্মীপালার একটি অংশবিশেষ। এখানে লক্ষ্মীপূজা মর্ত্যে কেন প্রচার হল এবং কিভাবে হল সেই কাহিনীই আছে। এখানে প্রকৃতপক্ষে অমলার বারোমাস্যা বর্ণিত হয়েছে। পালাটি শশধর মহিষের নিকট হতে সংগৃহীত। পালাটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ—

সত্যযুগে এক সময়ে অন্নের অভাব হয়েছে। মর্ত্যবাসী হা-অন্ন হা-অন্ন বলে ক্রন্দন করছে। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ও আদ্যাশক্তি মহামায়া লক্ষ্মীকে ডেকে বললেন — 'লক্ষ্মী, মর্ত্যবাসী হা-অন্ন, হা-অন্ন বলে কাঁদছে, তুমি মর্ত্যে গিয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর কর।' এই কথায় লক্ষ্মী সম্মত হলেন। দুটি শর্তে। কেউ যদি তাঁকে ভক্তি ডোরে বাঁধতে পারে তিনি তার কাছে অচলা লক্ষ্মী হয়ে থাকবেন। নতুবা তিনি চঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে তাকে অশেষ দঃখদুর্দশা ভোগ করাবেন।

এই কথামত লক্ষ্মী, অস্থিচর্ম সার বৃদ্ধা, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা, দীনহীন বেশে মর্ত্যে এলেন। মর্ত্যধামে এসে তিনি দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন আর মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখছেন। দেখতে দেখতে তিনি ধনপতি সদাগরের স্ত্রী অমলার নিকট গেলেন। গিয়ে শোনেন তার স্বামী বাণিজ্য করতে গিয়ে আর ফেরেনি। এখানে খুব দুর্দিন, সংসার চলে না। ভিক্ষা করে যা পায় তাতে সতীর ব্রত পালন করে তবে ভক্ষণ করে। যা ভিক্ষা করে তা দুটি পাত্রে রেখে একটা পাত্র স্বামীর উদ্দেশে অর্পণ করে জলে ভাসিয়ে দেয়। এই দেখে লক্ষ্মী খুব তুষ্ট হলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁর ঘরে অচলা হয়ে থাকতে চান। তখন অমলা বলেন আমি অতি কষ্টে দিন যাপন করে থাকি, তোমাকে কিভাবে রাখি বল মা। লক্ষ্মী বলছেন তবে কবে আসব মা বল। তখন অমলা বলে সারা বছরের মধ্যে আমার কোনসময় সুখে যায় না। আমার দুঃখের কথা তবে শোন বলি —

হায় হায় আমি কি কব তোমায়
কি দুঃখেতে আমি কাটাই বারোমাস।
যেমন সাগরমাঝারে বান আসে বারে বারে
তেমনি বান আসে আমার কুটীরমাঝারে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সাগরে যেমন বান আসে তেমনি বানে আমার কুটীরও ভেসে যায়। দেবী বলেন তবে কি আমি ভাদ্র মাসে আসব?

ভাদ্রে ভরা বাদর চারিদিকে জল
অভাগিনী আমি কিছু নাই সম্বল।
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ফিরি দ্বারে দ্বারে
মাসের তিনভাগ আমার যায় অনাহারে।
হায় হায় আমি।

তবে কি আমি আশ্বিন মাসে আসব। না মা, তবে আমার আশ্বিন মাসের দুঃখ শোন —

আশ্বিনে দুর্গাদেবী আসেন বাপের ঘরে
দেশে দেশে লোকে নানা পার্বণ করে
ঘরে ঘরে সবাই নতুন বস্ত্র পরে
অভাগিনীর ছেঁড়া টেনা নাহি জোটে।

তবে কি কার্তিক অগ্রাহায়ণ মাসে আসব? না মা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের দুঃখ কথা শোন —

কার্তিক-অগ্রহায়ণ কাননে শাক তুলিতে নাই
কি খেয়ে বল জীবন কাটাই?

নারী জাতির কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে শাকের পাতা ছিঁড়তে নেই। কারণ দেবতা-অসুরে যখন যুদ্ধ হয় তখন অসুরদের তাড়া খেয়ে দেবতারা জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। তখন আদ্যাশক্তি মহামায়া শাকাম্বরা মূর্তি ধারণ কবেছিলেন। যাঁকে লতাইচণ্ডীও বলা হয়। বরজে এই পূজা হয়। দেবীর দেহে যে শাক হয়েছিল তাই ছিঁড়ে খেয়ে দেবতারা জীবন ধারণ করেছিলো। এই কারণে নারী হয়ে নারীর অঙ্গে আঘাত করতে নেই বলে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মহিলাদের শাকের পাতা ছিঁড়তে নেই। এতে নিজের গর্ভের সন্তান নষ্টের পাপ স্পর্শে। তবে বাজারে যা পাওয়া যায় তা মরা। ওতে কোন দোষ নেই। লক্ষ্মী বলছেন, পৌষ-মাঘ মাসে তবে কি আসব? অমলা বলে না—

পৌষ-মাঘ মাসে শীতের কারণ
নানা বস্ত্রে সব করে শীত নিবারণ।
অভাগিনী আমি শীতের ভাজন
গাছের শুষ্ক পত্র বিধি আমায় দিলে।

তবে কি ফাল্গুন-চৈত্রমাসে আসব? এ মাসে আরো দুঃখ। কারণ —

ফাল্গুন-চৈত্র মাস যখনই আসিল
বসন্তের পোড়া কোকিল অমনি ডাকিল।

কোকিল ডাকলে কি হয়? কোকিল ডাকলে কীট পতঙ্গাদি যত প্রাণী আছে সবার মনে প্রেমের বিরহ জাগে।

কোকিলের ডাকে সবার প্রেমের বিরহ জাগিল।
অভাগিনী আমি উদরের চিন্তা করি মনে।।
তবে কি বৈশাখে আসব? না...
বৈশাখ মাসে দারুণ রৌদ্রের প্রখরে
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ফিরি দ্বারে দ্বারে।
সকল দুঃখের কথা আমি বলি মা তোমারে
অভাগিনী আমি ...

এই সমস্ত কথা শুনে ছদ্মবেশী লক্ষ্মী বললেন, আমার ডাকার তিথি বার কিছুই নেই। যেকোন দিন আমার পূজা করা যায়। তুই একটা ঘট বসা। এতেই তোর মঙ্গল হবে, স্বামী তোর ফিরে আসবে। একে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বলে। একই ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। ঐ ঘটই হল সর্ব দেবদেবী। ওকে পূজা করলে আমাকেই পাবি। সৎ মন, সত্যভাষিণী, সদাচারিণী, পতিব্রতা তাকেই বলে সতী। তোর মধ্যে সব গুণই আছে। তুই ঘট বসিয়ে আমায় পূজা কর। লক্ষ্মীপূজার কোন বার তিথি থাকে না। অমলা লক্ষ্মীর আদেশ যথাযথ পালন করে সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছিল।

লক্ষ্মী-নারায়ণের পালা

দেবীলক্ষ্মীর নিম্নলিখিত পালাটি বলরাম জানার বাড়িতে বসে রেকর্ড করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, আসরে এ পালাটি আরো আকর্ষণীয়ভাবে গাওয়া হয়। আরো গান, কথা ও সংলাপ যোগ করে দীর্ঘসময় নেওয়া হয়। লোকসমাজে পালাটি খুব জনপ্রিয়। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

লক্ষ্মী ও নারায়ণ মলয় পর্বতে বসে আছেন। সেখানে বসে পরস্পর কথোপকথন করছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন।

নারদ ঃ প্রভু! মর্ত্যবাসীগণ রোগশোক জরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে দুহাত তুলে চিৎকার করছে। তাদের কথা না ভাবলে আপনাদের ভক্ত বৎসল নাম লোপ পেয়ে যাবে। আমি লক্ষ্মীমাতাকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওঁর কৃপায় যদি মর্ত্যবাসী সুখশান্তির মুখ দেখতে পায়।

লক্ষ্মী ঃ আমি সেখানে যাব না নারদ। কারণ মর্ত্যবাসী কদাচারী-অনাচারী।

নারায়ণ ঃ কেন লক্ষ্মী যাবে না?

গীত।। অনাচারে ঘৃণা মোর শুন নারায়ণ
সদাই তুষ্ট থাকি আমি যথা আচরণ।

নারায়ণ ঃ দেখ লক্ষ্মী, তুমি মর্ত্যে যাও। যেখানে দেখবে অনাচার অত্যাচার সেখান থেকে ফিরে অন্যত্র যাবে। যেখানে সদাচরণ দেখবে সেখানেই থাকবে এবং সেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে আমার কাছে তুমি চলে আসবে।

কথা ॥ নারায়ণের আদেশ পেয়ে লক্ষ্মী নারদের সাথে মর্ত্যে আসতে রাজী হলেন। নারদ তাঁর ঢেঁকিতে করে লক্ষ্মীকে নিয়ে মর্ত্যে রওনা হলেন। প্রথমে তাঁরা ভৈরবনগরে এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে যাবেন বলে স্থির করলেন। তিনি প্রথমে যে-ব্রাহ্মণের বাড়িতে গেলেন সে-ব্রাহ্মণ এক মাতাল, চরিত্রহীন। ব্রাহ্মণ কর্ম কিছুই করে না। তাঁর স্ত্রী খুব লক্ষ্মীস্বরূপা; কিন্তু তার কথা না শুনে ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র স্ত্রীকে মারধোর করে কেড়ে কুড়ে বিক্রি করে ফেলেছে।

ব্রাহ্মণ ঃ তুমি কেন আমার বাড়ি এসেছ? আমার তো আর কিছুই নেই কিছু খেতে পাবে না। সব মদ-তাড়ি খেয়ে উড়িয়ে ফেলেছি।

লক্ষ্মী ঃ আমি তোর বাড়ি এসেছি, তোকে সব ফিরিয়ে দেবার জন্য। কিভাবে তা ফিরে পাবি শোন—

গীত ॥

ওরে আচরণ কর তোরা আচরণ কর
অনাচার ছেড়ে দিয়ে আচরণ কর।
নারায়ণে মতি রেখে লক্ষ্মীপূজা কর
লক্ষ্মীর আশিসে তোদের বাড়িবে বিস্তর।
লক্ষ্মী পূজা তোরা করনা এখন
লক্ষ্মী দিয়ে যাবে কুবেরের ধন।

ব্রাহ্মণ ঃ লক্ষ্মীপূজা আমি আর কি করব। আমি এখন এক সুন্দরী নারী যদি পাই তাহলে তাকে জড়িয়ে ধরে তার সব কথা শুনব। তুমি বরং আমার কাছে সরে এস তোমাকে মনের আনন্দে জড়িয়ে ধরি, তারপর তোমার কথামত লক্ষ্মীপূজা, নারায়ণপূজা, কালীপূজা সব করব।

লক্ষ্মী ঃ কি বেটা লম্পট ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মে তোর এই কদাচারিতা। আমি তোকে অভিশাপ করছি, তুই যক্ষ্মাকাশিতে ছটফট করে মরবি।

কথা ॥ এই কথা বলে মা লক্ষ্মী সেখান থেকে ফিরে নারদের কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। ব্রাহ্মণের আচরণের সমস্ত বৃত্তান্ত বলে জানান, আমি আর ব্রাহ্মণ বাড়ি যাব না। তখন নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি এবার কার বাড়িতে যাবে জননী?

আমি যাবনা রে কারো ঘরে
নিয়ে চল নারদ দ্বারকা পুরে
মর্ত্যে আসা আমার বিফল হ'ল রে
আমি কেন এসেছিলাম মর্ত্যধামে রে। (মাতন)

মা লক্ষ্মী আর কারও বাড়ি যাবেন না বলে স্থির করলেন, কিন্তু নারদ তাঁকে বৈষ্ণব বাড়িতে যাবার কথা বললেন। কারণ বৈষ্ণব মানবসমাজে খুব মান্যগণ্য সদাচারী বলে পরিচিত। তারা সবসময় মুখে ঈশ্বরের নামগান করে। এই কথা শুনে মালক্ষ্মী এক বৈষ্ণবের বাড়ি এলেন। বৈষ্ণবটি খুব ভাল কিন্তু বৈষ্ণবের স্ত্রীটি দজ্জাল। সে তার স্বামীকে মানে না, ভাসুর মানে না, শ্বশুর মানে না। দিন রাত গুনগুন করে গান গায়। সকাল সন্ধে বাড়িতে ছড়া ঝাঁট দেয় না। সন্ধে দেয় না। সবসময় আমোদ স্ফূর্তিতে থাকে। মা লক্ষ্মী এবার তাঁর বাড়িতে এসে দেখেন, বৈষ্ণবী সন্ধেবেলায় মাথায় চিরুণী দিচ্ছে, তার স্বামী কাজ থেকে এসে বলছে —

স্বামী ঃ কি গো, তুমি সাঁঝের ছড়াঝাঁট না দিয়ে মাথায় চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছ আর ছেঁড়া চুল এদিক ওদিক ফেলছ?

স্ত্রী ঃ আমি আমার কাজ করছি, এতে তোমার বাবার কি?

এমন সময় মা লক্ষ্মী বাড়িতে ঢুকে বলছেন, স্বামীকে বাবা-মা তুলছিস কেন মা? এই দেখ না আমি এয়োস্ত্রী, আমার কপালে সিঁদুর, হাতে শঙ্খ, আমার দিকে ফিরে দেখ। তোর স্বামী কত ভাল। তার কথা শুনতে হয় মা। স্বামীকে যে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তেত্রিশকোটি দেবতা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় । যে নারী তার স্বামীর সাথে ঝগড়াঝাটি করে সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্রী হয় মা।

পারুলবালা বৈষ্ণবী ঃ শোন শোন। কোত্থেকে এসে তুমি তো আমাকে বড়ো বড়ো কথা বলছ। আমি সে-জাতের মেয়ে নই। ওসব আমার ধাতে সইবে না। তুমি ভালোয় ভালোয় বের হয়ে যাও, নইলে তোমাকে এই ঝাঁটা মেরে বের করে দেব।

লক্ষ্মী ঃ কি বলছিস মা বৈষ্ণবী, আমি তোর বাড়ি এলাম, আমার সাথে ভালো করে কথা বলছিস না। স্বামীর সাথে ঝগড়া করছিস, উল্টোপালটা আচরণ করছিস এসব করতে নেই মা। একটু ভালো হয়ে চল, কোন অভাব অভিযোগ থাকবে না।

পারুল ঃ আমি ওসব ভালো ভালো কথা শুনতে চাই না। আমি রূপসী যুবতী পারুলবালা। রূপ থাকলে আমার কোন অভাব হবে না। এ স্বামী আমার ভালো লাগে না। দিনরাত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করে বেড়ায়, চৈতন রাখে, গলায় মালা পরে, কতরকম ফোঁটা চন্দন পরে, ওসব আমার ভালো লাগে না। আমার হাত ধরে সিনেমায় নিয়ে যাবে, থিয়েটার দেখাবে, সেন্ট, স্নো, কিনে দেবে, ভালো ভালো শাড়ি গয়না দেবে তবেই তো স্বামী।

কথা ।। বৈষ্ণবীর কথা শুনে মা লক্ষ্মী অবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবছেন ব্রাহ্মণের বাড়ী গেলাম, তারা আমাকে অপমান করল, বৈষ্ণববাড়ি এলাম, তারাও এই আচরণ করল, ঠিক আছে, পারুলবালার রূপের অহংকার আমি ঘুচিয়ে দেব। ওর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি দিয়ে যাবো। এই বলে তার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি দিয়ে মালক্ষ্মী সেখান থেকে বিদায় হলেন। বৈষ্ণববাড়ি থেকে বিদায় হয়ে মালক্ষ্মী আর এক কাঠুরিয়ার বাড়িতে গেলেন। সেখানে

গিয়ে দেখেন কাঠুরিয়ার বউ পূজা অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত। তার ছেলে অসময়ে খেতে চাইলে তাকে নিষেধ করে। বৃহস্পতিবার মাকে পূজা না দিয়ে খাওয়া উচিত নয় বলে জানায় এবং ফুল তুলতে পাঠায়। বনে ফুল তুলতে গিয়ে সেই ছেলে গান করে —

গীত॥ নব দূর্বাদল ঘনশ্যাম
ওগো প্রাণকান্ত শ্যামল প্রশান্ত
যে ডাকে তোমায় ডাকে অবিরাম
নব দূর্বাদল ঘনশ্যাম।

মা লক্ষ্মী নব দূর্বাদল ঘনশ্যাম কথা শুনে থমকে গেলেন। মর্ত্যধাম জঙ্গলের মধ্যে এমন নামগান শুনে অবাক হলেন। তিনি ছেলেটির কাছে এসে বললেন —

লক্ষ্মী : ও বাপু ছেলে, তুমি এখানে কি করছ?

ছেলে : তুমি মেয়েছেলে, জান না, আজ না বৃহস্পতিবার। আমার মা লক্ষ্মীপূজা করবে তাই এই ফুল তুলছি। তুমি মালক্ষ্মীর পূজা কর না?

কথা॥ এই রূপ কথোপকথনের পর মালক্ষ্মী তাঁর গলার মুক্তার মালা কাঠুরিয়ার ছেলের গলায় পরিয়ে দিয়ে ছেলেটির সঙ্গে তার বাড়িতে এল এবং তার মা কেমন করে লক্ষ্মীপূজা করে তা দেখতে চাইল। মালক্ষ্মীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে মাকে বলতে গেল এবং সব বৃত্তান্ত বলল। কাঠুরিয়ার বউ এই কথা শুনে নিজেই বাইরে এসে মালক্ষ্মীকে বলে ওমা, তুমি তো দেখছি এয়োস্ত্রী। ভালো ঘরের বউ বলে মনে হয়। তুমি আমার বাড়িতে এসো না মা। আমরা জাতিতে চণ্ডাল। চণ্ডালের বাড়ি এলে বা জল খেলে তোমার স্বামী জানতে পারলে আর ঘরে তুলবে না। সমাজেও নেবে না।

লক্ষ্মী : আমি জাত মানি না। আমি তোর লক্ষ্মীপূজা দেখব কেমন করে করিস।

বউ : তা ভালো হয়েছে মা, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার কাছ থেকে কিছু মন্ত্রতন্ত্র শিখে নেব।

লক্ষ্মী : মন তোর, আমি তোকে কি মন্ত্র শেখাব। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয় চালে, আর ঠাকুর সন্তুষ্ট হয় ফুলে। তোর ছেলে বন থেকে ফোটা ফুল তুলে এনেছে এ দিয়ে পূজা করলে মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হবে মা।

কথা॥ হীরা চণ্ডালিনী পূজা করছে আর মালক্ষ্মী তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মা লক্ষ্মী বলছেন —

গীত॥ আমার পদতলে নতশিরে কোন চণ্ডালিনী
তোমার পূজায় তুষ্ট হল লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
আশীর্বাদ আজ করে যাব মনের মত বরটি দেব
তুই যে বড় অভাগিনী জনমদুখিনী।

হীরা চণ্ডালিনীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ধনরত্ন দিতে চাইলেন চণ্ডালিনী তা নিতে অস্বীকার করে বলে, মরবার সময় আমার জিহ্বা সবসময় যেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। আর অন্ন ও বস্ত্রের অভাব যেন আমার চিরতরে দূর হয়ে যায়। মা লক্ষ্মী তাকে সেই আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

কাঠ কেটে রতন চণ্ডাল বাড়ি ফিরে দেখে এক অপূর্ব শোভা ও তৃপ্তি। ছেলের গলায় মুক্তার মালা দেখে জিজ্ঞাসা করে, এ হার কোথায় পেলে? তার ছেলে বলে—

বাবা, তুমি নারায়ণপূজা কর, কোনদিন নারায়ণ তোমাকে দেখা দিয়েছে?

সন্তানের মুখে এই কথা শুনে অবাক হয়ে রতন কাঠুরিয়া ভাবল, তাই তো আমি নারায়ণের পূজা করি, কোনদিন তাকে তো দেখিনি। মনে ভাবল, সংসারে থেকে তাকে পাওয়া যাবে না, বনে গিয়ে একান্তে তাকে ডাকতে হবে। এই কথা বলে রতন বনে চলে গেল। এদিকে লক্ষ্মী নারদের কাছে গিয়ে উপনীত হলে নারদ বলেন— মা, তুমি বৈষ্ণববাড়িতে খুব সেবা-যত্ন পেলে তো মা।

লক্ষ্মী ঃ না বাবা, ওরা আমাকে খুব অপমান করেছে। তবে আমাকে যত্ন সহকারে সেবা করেছে হীরা চণ্ডালিনী।

নারদ ঃ সে কি মা, তুমি চণ্ডালের বাড়িতে পূজা নিলে।

লক্ষ্মী ঃ কেন নারদ আমার প্রভু শুদ্ধাচারী ভক্তের বাড়ি পূজা নিতে বলেছে, কিন্তু চণ্ডাল জাতের বাড়ি পূজা নিতে নিষেধ তো করেনি। সে শুদ্ধাচারী তাই তাকে কৃপা করেছি।

নারদ ঃ বেশ ভাল হয়েছে মা, এবার চল দ্বারকাপুরে।

কথা ।। এই বলে নারদের ঢেঁকিতে চড়ে দুজনে দ্বারকাপুরীর পথে রওনা হলেন। যেতে যেতে রতন চণ্ডালকে দেখতে পান। রতন ঠাকুরকে না পেয়ে মা মা বলে আকুল হয়ে ডাকছে। জয়মা জয়মা গো মা আমার...............

লক্ষ্মী ঃ বাবা নারদ, তুমি আমাকে এই জঙ্গলে নামিয়ে দাও। এখানে আমার কোন এক ভক্ত মা মা বলে ডাকছে। আমি তার কাছে যাব।

কথা ॥ নারদ ঋষি মা লক্ষ্মীকে সেই জঙ্গলে নামিয়ে দিয়ে দ্বারকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ, বলরাম বসে আছেন। সেখানে নারদ উপস্থিত হতে কৃষ্ণ লক্ষ্মীর খোঁজ নেন। নারদ বলেন, লক্ষ্মী এক চণ্ডালের বাড়ি আছেন। এই কথা শুনে বলরাম আঁতকে উঠে বলে, সেকি কথা, জগতে এত উচ্চবর্ণ থাকতে লক্ষ্মী শেষে কিনা এক চণ্ডালের বাড়ি গেল? কৃষ্ণ তা বিশ্বাস করতে না পেরে বলরামকে লক্ষ্মীর খোঁজে পাঠালেন। বলরাম যাবার আগে কৃষ্ণকে বলে গেলেন, যদি লক্ষ্মী সত্যিই চণ্ডালের বাড়ি থাকে তাহলে আমি যে আদেশ করব তা তোমাকে নতমস্তকে পালন করতে হবে। এই বলে বলরাম লাঙল ঘাড়ে নিয়ে মর্ত্যের বুকে চললেন। গিয়ে দেখেন সত্যিই লক্ষ্মী রতন চণ্ডালের সাথে কথা বলছেন।

লক্ষ্মী ঃ এ ব্যাটা, তুই কি করছিস এই বনে?

কাঠু ঃ আমি নারায়ণকে দেখা পাইনি, আমার দুধের ছেলে অপমান করেছে। মা লক্ষ্মী আমার স্ত্রীকে দেখা দিয়েছে আর আমার ছেলেকে মুক্তার এই মালাটি দিয়েছে। আমি এই মালা এনেছি। যদি লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয় তো তাকে ফেরত দিয়ে বলব, তোমার মালা তুমি নিয়ে যাও। আমি লক্ষ্মী ও নারায়ণকে একসাথেই দেখতে চাই।

লক্ষ্মী ঃ ওরে বাবা কাঠুরিয়া, স্বর্গের সেই লক্ষ্মী আমার সই। আমি মর্ত্যের লক্ষ্মী। তুমি ঐ মালা আমাকে দিতে পার। আমি তাকে দিয়ে বলব, রতনকাঠুরিয়া এটা ফেরত দিয়েছে। সে লক্ষ্মী ও নারায়ণকে একসাথে দেখতে চায় এবং তার ছেলে বৌকে তা দেখাতে চায়।

রতন ঃ তবে তাই নাও মা।

কথা ।। রতনকাঠুরিয়া সেই রত্নহারটি মায়ের হাতে দিতে যাচ্ছে এমনসময় কৃষ্ণ, বলরাম সেখানে এসে হাজির। বলরাম সেই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করে বলেন ওরে কৃষ্ণ, তোর লক্ষ্মীর কাণ্ড দেখ। লক্ষ্মী কলঙ্কিনী, ওকে আর দ্বারকায় রাখা যায় না, ওর এখন প্রকৃত স্থান বনবাস' লক্ষ্মী রতনকাঠুরিয়ার কাছ থেকে ফিরে আসছেন এমনসময় কৃষ্ণ বলরামের সাথে দেখা হওয়ায় লক্ষ্মী কৃষ্ণকে প্রণাম করতে চান।

লক্ষ্মী ঃ প্রভু অনেক দিন পর তোমার দর্শন পেলাম, তোমাকে আমি নমস্কার করব।

কৃষ্ণ ঃ না, তোমাকে আর নমস্কার করতে হবে না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, তুমি কলঙ্কিনী, মর্ত্যে এত উচ্চবংশের মানুষ থাকতে তুমি কিনা এক চণ্ডালের বাড়ি গেলে, তাদের পূজা নিলে, তোমাকে আজ থেকে আমি ত্যাগ করলাম।

লক্ষ্মী ঃ তোমার ঐ উচ্চ বংশের মানুষের কথা শুনবে প্রভু —

ঐ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত হয় অনাচারী
তাই আমি যাই প্রভু চণ্ডালের বাড়ি।
চণ্ডাল বিনা ভক্ত দেখি না মর্ত্যে
গিয়েছিলাম তাই চণ্ডালভবনে।
চণ্ডাল বিনা আমার ভক্ত নাই গো
চণ্ডাল ভবনে আমি তাই যাই গো।

বলরাম ঃ দেখ কৃষ্ণ, তোমার লক্ষ্মী দুর্বিনীতা হয়ে গেছে, ওকে এখনই বনবাসে দাও। দ্বারকায় লক্ষ্মীর কোন স্থান হবে না। ওকে চুলের মুঠি ধরে বিদায় দাও।

কৃষ্ণ ঃ দেখ লক্ষ্মী, তুমি দাদার কথা শুনেছ, এবার তুমি বিদায় হও। তোমাকে আমি বনবাসেই দিলাম।

লক্ষ্মী ঃ না প্রভু, আমার উপর এই আদেশ করবেন না। আমি দুর্বিনীতা নই। আমি বনবাসে যাব না।

কৃষ্ণ ঃ দেখ লক্ষ্মী, তুমি যদি না যাও তাহলে তোমাকে আমি চুলের মুঠি ধরে বেত মারতে মারতে বনবাসে পাঠাব।

কথা ।। এই কথা বলে কৃষ্ণ লক্ষ্মীর চুলের মুঠি ধরে বেত মারতে মারতে সেখান থেকে দূর

করে দিলেন। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে দ্বারকাপুর ছেড়ে চলে গেলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন, এখনই চলে যাচ্ছি প্রভু। তবে আমার যাবার সাথে সাথে তোমাদের গৃহলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী চলে যাবে। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে তোমরা পথে পথে ঘুরবে। ভিক্ষা করেও তোমাদের অন্ন জুটবে না। যতদিন না তুমি ও তোমার দাদা বলরাম চণ্ডালের বাড়ি গিয়ে গোগ্রাসে চণ্ডালের ভাত খাবে ততদিন তোমাদের এই দশা হতে কোন মুক্তি নেই। এই বলে মা লক্ষ্মী চলে গেলেন। তিনি রতনচণ্ডালের বাড়ি গেলেন। লক্ষ্মী বলেন, দেখ রতন, আমি এখন থেকে তোমার বাড়িতে থাকব।

চণ্ডাল ঃ মা, তুমি এসেছ, বল মা, আমার নারায়ণ কি বলেছে।

লক্ষ্মী ঃ তুই সে-কথা শুনলে রাগ করবি বাবা, তোর সে-কথা শুনে কাজ নেই।

চণ্ডাল ঃ আমি কোন বাগ করব না মা, তুমি বল।

লক্ষ্মী ঃ তুই চণ্ডাল বলে তোর প্রভু তোর কাছে আসবে না।

চণ্ডাল ঃ তাহলে আমি কি কখনো আমার প্রভুকে দেখতে পাব না মা?

লক্ষ্মী ঃ তুই এবার বড় প্রশ্ন করলি বাবা রতন। তুই যেমন তোর নারায়ণকে দেখতে পাসনি, আমিও তেমনি স্বর্গের লক্ষ্মী সইয়ের স্বামীর (সয়া) দর্শন পাইনি। তোর দুঃখ আর আমার দুঃখ এক রে বতন। আমি বলি শোন, তুই এই জঙ্গল পবিষ্কার কর। লক্ষ্মীর দেওয়া টাকাকড়ি আমার কাছে আছে। আমি তাই দিয়ে এখানে বানাব বিশাল পাকাবাড়ি। নাম দেব 'আনন্দভবন'। যে এই বাড়িতে আসবে সে আনন্দ মনে বাড়ি ফিরে যাবে। তৃষ্ণার্তকে বারি দেব, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেব, বস্ত্রহীনের বস্ত্র দেব, রোগশোক জরা-ব্যাধি নিয়ে যারা আসবে, লক্ষ্মী-নারায়ণের নাম করে তাদের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেব, তাতে তারা মুক্তি পাবে।

চণ্ডাল ঃ আমি তখন কি করব মা!

লক্ষ্মী ঃ তুই তখন দ্বারে লাঠি হাতে দ্বারী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমার অনুমতি ছাড়া কাউকে হুটহাট করে ঢুকতে দিবি না। তারপর কাজ হয়ে গেলে তুই তোর নারায়ণকে ডাকবি আর আমি আমার সয়াকে ডাকব।

কথা॥ এই কথা শুনে রতন জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলল। মা লক্ষ্মী বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে সেখানে বিশাল তিনখানা ঘর নির্মাণ করালেন। একটা রন্ধনশালা, একটা মায়ের থাকার ঘর আর একটা অতিথিশালা। এবার তিনি সেখানে বসে হনুমানকে ডেকে বললেন, দেখ হনুমান, তুমি দ্বারকায় গিয়ে দেখবে কৃষ্ণ-বলরাম সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। তাদের তুমি মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে সোনার পালঙ্ক, ধনরত্ন যত দ্বারকায় আছে সব এইখানে নিয়ে আসবে আর এই ভিক্ষার ঝুলি তাদের দিয়ে আসবে। হনুমান তখন জয়রাম জয়রাম বলে দ্বারকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। এদিকে লক্ষ্মী গ্রহরাজ শনিকে ডেকে বললেন, তোমরা কৃষ্ণ-বলরামের পেছনে সবসময় লেগে থাকবে। যেন তারা খেতে না পায় , যতদিন না

এই আনন্দভবনে আসে। এদিকে কৃষ্ণ-বলরাম ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁরা মাটিতে শুয়ে আছেন। ঘরে কোন আসবাবপত্র কিছুই নেই। তখন তাঁদের মনে পড়ল লক্ষ্মীর কথা। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাঁদের বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

কথা।। বলরাম কৃষ্ণকে বলে, কৃষ্ণ, তুই আমাকে কিছু খেতে দে। ক্ষুধায় আমি যে আর বাঁচি নে। দ্বারকাপুরে খাবার সামগ্রী বলতে কিছুই নেই। শুকনো হাঁড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে। পাশে দেখতে পেলেন দুটো ভিক্ষার ঝুলি পড়ে আছে। তখন তাঁরা সেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা নগরে নগরে ভিক্ষার জন্য বের হলেন। কিছু চাল জুটল। সেগুলো এক পুকুরের পাড়ে রেখে স্নান করতে নেমেছেন, আর শনি দেবতা কুকুরের বেশ ধরে সেগুলো খেয়ে পালিয়ে গেলেন। তারপর আর এক ঘটনা ঘটল, ভৈরবনগরের মেয়ের সাথে তাঁদের দেখা হল। সে কিছু খেতে দেবে বলেছে। সে রান্না করে জল নিতে এসেছিল। কৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখে হাঁড়িতে ভাত নেই। কলসীতে জল নেই, কৌটয় মুড়ি নেই। দেখল এক পাত্রে কিছু খুদ পড়ে আছে। সেই খুদ কৃষ্ণ-বলরামকে দিতে তাঁরা সেগুলো নিয়ে জলে ভিজিয়ে খাবার জন্য পুকুরে গেলেন। যাবার পথে ঝোলা ছিঁড়ে সেগুলো বালির মধ্যে পড়ে গেল। কৃষ্ণ-বলরামের খাওয়া আর হল না। বাধ্য হয়ে তাঁরা কৈলাসে মহেশ্বরের কাছে গেলেন।

কৃষ্ণ : মহাদেব, তুমি আমাদের কিছু খেতে দাও। আজ তিনদিন আমাদের খাওয়া হয়নি।

মহাদেব : তোমরা তিনদিন খাওনি আর আমি আজ সাতদিন খাইনি।

কথা।। বলরাম তখন মহাদেবের নিকট কান্নাকাটি করে বলছে, তুমি কিভাবে বেঁচে আছ বল, কোথায় গেলে তুমি খেতে পাও, সে সংবাদ সন্ধান আমাদের দাও।

মহাদেব : ভৈরবনগরে এক জঙ্গল আছে, সেখানে আনন্দভবন নামে বিশাল বাড়ি আছে, সেখানে গেলে আমি খেতে পাই। আমার খিদে পেলে সেখানে গিয়ে খেয়ে আসি।

কথা।। এই কথা শুনে কৃষ্ণ-বলরাম ভৈরবনগরের দিকে রওনা হলেন। পথে যেতে যেতে সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। সে আসছে আনন্দভবনের দিকে যক্ষ্মারোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। রূপসী বৈষ্ণবী পারুলবালা আসছে কুষ্ঠব্যাধি থেকে নিস্তার পাবার জন্য। সবাই এক এক করে এসে আনন্দভবনের দরজায় দাঁড়িয়েছে।

লক্ষ্মী : দেখ বাবা রতন, প্রত্যেকদিন তুই একসঙ্গে অনেক লোক আমার কাছে পাঠাস, আজ এক এক করে আমার কাছে পাঠাবি। আমি প্রত্যেকের মনোবাসনা পূরণ করে বিদায় দেব।

কথা।। এই কথা শুনে রতন দ্বারে বসে আছে। এমনসময় মাতাল চরিত্রহীন ব্রাহ্মণ এলে তাকে দেবীর কাছে পাঠাল। ব্রাহ্মণ দেবীর কাছে তার কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্তি চাইল। লক্ষ্মীদেবী তাকে বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করতে বললেন। আরও তাকে মনে করিয়ে দিলেন, লক্ষ্মীদেবী যখন তার বাড়ি গিয়ে লক্ষ্মীপূজার কথা বলেছিলেন, তখন দেবীর সাথে সে কিরূপ আচরণ করেছে।

তারপর আসে রূপসী পারুলবালা কুষ্ঠব্যাধি নিয়ে। সে মায়ের কাছে কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। দেবীলক্ষ্মী তাকে স্বামীর কথা শুনতে বলেন, সদাচরণ করতে বলেন ও শ্বশুরশাশুড়িব কথা মানতে বলেন। আরও বলেন নিত্য লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করতে। লক্ষ্মীনারায়ণ সন্তুষ্ট হলে তার কুষ্ঠব্যাধি সেরে যাবে।

তারপর আসেন কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাই। রতন দেবীর কাছে এসে বলে, এবার দুইজন এসেছে। তারা কোন ব্যাধির জ্বালা নিয়ে আসেনি। তারা এসেছে ক্ষুধার জ্বালা নিযে। তখন দেবী তাদের জন্য রুপোর গ্লাসে জল ও সোনার থালায় ভাত বেড়ে তাদের নিকট এনে দিলে বলরাম তো গোগ্রাসে মুঠো মুঠো করে সেই অন্ন খাচ্ছে। এদিকে কৃষ্ণ বলছে, দাদা, তুমি তো শুধু খেয়েই চলেছ, কিন্তু ঐ যে মেয়েটি ভাত দিচ্ছে, কেমন যেন চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে।

বলরাম ঃ চেনা কি রে, তোর তো অনেক মেয়েই চেনা। যাকে দেখিস তাকেই চিনিস। বল তুই সত্যভামাকে চিনিস না, রুক্মিনীকে চিনিস না, জাম্বুবতীকে চিনিস না, এখন ওসব কথা বলিস না, কোথায় ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। তুই এখন চুপ কর ভাই, আগে পেটের জ্বালাটা মেটাই। ওমা, আর দুটো ভাত দিয়ে যাও।

কৃষ্ণ ঃ ও দাদা, তুমি কেবল খেয়েই চলেছ, এরা যদি চণ্ডাল হয়।

বলরাম ঃ চণ্ডাল হয়তো কি হয়েছে?

কৃষ্ণ ঃ সেকি দাদা, চণ্ডালের বাড়ি খেয়েছিল বলে আমার লক্ষ্মীকে তো তুমি বেত মারতে বলেছিলে ও বনবাসে পাঠিয়েছিলে। আর এখন এ কি কথা বলছ?

বলরাম ঃ খিদে পেলে জাত বাছলে চলবে ভাই? তাছাড়া আমরা চণ্ডালের বাড়ি খাচ্ছি, কি না, তোর লক্ষ্মী কি দেখতে আসছে? ওসব ভাবলে হয় না ভাই। ওমা, আর দুটো ভাত দিয়ে যাও।

কথা।। মা লক্ষ্মী আরও ভাল করে চেনাবার জন্য রান্নাঘর থেকে ধীরে ধীরে আসছেন। এক পা করে ফেলছেন আর একটা করে পদ্ম ফুল ফুটছে। পদ্মের উপর পা ফেলে আসছেন আর পরিবেশন করছেন। নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

লক্ষ্মী ঃ আপনি কিছু না খেয়ে বসে আছেন কেন?

কৃষ্ণ ঃ আপনার পরিচয় না দিলে আমি খাব না।

লক্ষ্মী ঃ আমার পরিচয় কাউকে দিইনি, আর আপনাকেও দেব না। আপনি দয়া করে খেয়ে নিন এবং আমাকে ধন্য করুন।

কৃষ্ণ ঃ আপনার পরিচয় না দিলে খাব না, বরং চলে যাব।

লক্ষ্মী ঃ বিষ্ণুর বনিতা আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া
মাতা হয় মোর অন্নপূর্ণা আমি সমুদ্রদুহিতা।

তুমি তো তোমার ভায়ের কথা শুনে আমাকে চুলের মুঠি ধরে বেত মারতে মারতে দ্বারকা থেকে বিদায় দিয়েছিলে। আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে আর চণ্ডালের বাড়িতে গোগ্রাসে খেতে হবে। তোমরা চণ্ডালের বাড়ি এসে খেলে তো! তোমার দাদা চণ্ডালের এতগুলো ভাত খেল তো!

বলরাম ঃ তুমি আর আমাকে লজ্জা দিওনা মা। যে অপরাধ আমি তোমার কাছে করেছি, তার জন্যে আমি আর মুখ দেখাতে পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি দ্বারকার দিকে ফিরে তাকাও। দ্বারকা আবার লক্ষ্মীশ্রী হয়ে উঠুক। আমি দ্বারকায় গিয়ে রেবতীকে নিয়ে সংসার করি। তোমরা জাত বিচার না করে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে ফিরে যেও বৈকুণ্ঠধামে।

কথা ॥ এবার মা লক্ষ্মী রতন চণ্ডালকে ডেকে বলছেন, রতন চণ্ডাল, রতন চণ্ডাল, দেখবি আয় বাবা, এতদিন ধরে তুই ঘর বাড়ি ত্যাগ করে ঠাকুরকে দেখবি বলে এখানে পড়ে আছিস, সেই ঠাকুর আজ এখানে এসেছেন, সেই ঠাকুর ঘরে এসে ঘর আলো করে দিয়েছেন।

রতন চণ্ডাল মনের আনন্দে আজ ঠাকুর দেখছে। ঠাকুর দেখে বলছে মাগো, তুমি ছদ্মবেশে আমার কাছে ছিলে মা, আমি বুঝতে পারিনি মা। তুমি এখানে থাক আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রী হীরা ও পুত্র মানিককে ডেকে এনে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি দেখাব। এই বলে রতন স্ত্রী ও পুত্রের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল।

রতনের গলার শব্দ চিনতে পেরে হীরা মানিককে ডেকে বলে, শোন মানিক, তোর বাবার কণ্ঠস্বর বলে মনে হচ্ছে?

রতন ঃ এস হীরা, এস মানিক, আমি তোমাদের দেখাতে চাই লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি।

হীরা ঃ তুমি কোথায় দেখেছ স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি? তুমি আমাদের দেখাতে পারবে তো?

কথা ॥ তারপর তারা সবাই এসে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি দেখে তাদের পায়ের কাছে বসল।

লক্ষ্মী ঃ বাবা রতন, আর তোমাদের কুঁড়ে-ঘরে ফিরে যেতে হবে না। এই যে বিরাট বড় বাড়িটি, তোমাকেই দিলাম। যাবার সময় তোমাকে একটা কথা বলে যাই। তুমি দানে কখনো কার্পণ্য কোরো না বাবা, তাহলে এই পাকাবাড়ি খসে খসে কুঁড়েঘর হয়ে যাবে। তুমি মনের আনন্দে দান করে যাও, তাহলে এক থেকে অধিক হবে। আর হীরা, তুমি আমার পূজা প্রতি বৃহস্পতিবার করবে। যদি প্রতি বৃহস্পতিবার না পার তাহলে চৈত্র, ভাদ্র, ও পৌষ এই তিনমাসে প্রতিটি বৃহস্পতিবার পূজা করবে। ঘট পেতে আম্রপল্লব দিয়ে সশিষ ডাব দিয়ে, সিঁদুর দিয়ে, ধূপ দীপ জ্বালিয়ে পূজা দেবে, কিন্তু আমার পূজার সময় ঘণ্টা বাজিও না মা। কারণ ঘন্টার শব্দ শুনলে আমি সেখান থেকে চলে যাই। ঘন্টাকর্ণ নামে এক দৈত্য আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাকে ধরতে এসেছিল। সেখান থেকে

ঘণ্টার শব্দ শুনলে আমি আর সেখানে থাকতে পারি না মা। ফল আর ডাবের জল খেয়ে আমার পূজা করলে বারোমাসের ফল তিনমাসেই হবে। তারপর রতন, স্ত্রী ও পুত্র তিনজন মিলে লক্ষ্মীর পূজা করে মায়ের পায়ে ভক্তির অঞ্জলি দিল। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

লক্ষ্মীপূজা কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলার জীবনসম্পৃক্ত আচার- সর্বস্ব এক লৌকিক পূজা। কৃষি ছাড়া বাণিজ্যক্ষেত্রেও দেবীর বিশেষ পূজাচার পালন করা হয়। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই প্রবাদ উক্ত বিশ্বাসের জের। চব্বিশ পরগণার সব শ্রেণীর মানুষ লক্ষ্মীদেবীকে বিশেষভাবে মান্য করেন। লক্ষ্মীদেবীর নিকট মানুষ রোগ-শোক নিবারণের জন্য প্রার্থনা করেন না, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। যাঁদের ঐশ্বর্য আছে তাঁরা আরও বেশি লাভের আশায় দেবীর পূজা করেন, যাঁদের নেই তাঁরা একটু সুখসমৃদ্ধির আশায় দেবীর পূজা করেন, দেবীলক্ষ্মী মূলত শস্য-উৎপাদিকাশক্তি। তিনি শস্যরক্ষাকর্ত্রী বলেও মানুষের বিশ্বাস। তিনি শস্যশ্যামল বসুন্ধরার প্রতীক। তাঁর বিহনে পৃথিবী অনুর্বর মরুভূমি হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট তিনি লাভের প্রতীক। সমুদ্রপথে যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করেন, তিনি তাঁদের নিকট বিঘ্ননাশকারী ও সৌভাগ্যের প্রতীক কমলা। সাধারণ লোকসমাজে তিনি কৃষিলক্ষ্মী। তাঁর পূজায় মহিলাদের একাধিপত্য। এই পূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু ব্রতকথা, ছড়া, পালাগান ইত্যাদি। ব্রতকথা ও ছড়া মহিলাদের সম্পদ হলেও পালাগান পরিবেশন করেন মহিলা ও পুরুষগণ। লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক সমস্ত পালাগানের কাহিনী রূপকথা ও লোককথা-নির্ভর হলেও সেগুলি সবই সাধারণের বোধগম্য করেই সৃষ্টি। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, চব্বিশ পরগণায় লক্ষ্মীসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার পূজানুষ্ঠানের প্রচলন আছে এবং সেইসঙ্গে আছে নানাপ্রকার পালাগানের লৌকিক ঐতিহ্য। লক্ষ্মীপূজার সময় বা অন্য যেকোন পারিবারিক বা পাড়াভিত্তিক লক্ষ্মীর পালাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। সাধারণত লক্ষ্মীর বেশে মূল গায়ক দোহারদের সহায়তায় লক্ষ্মীর পালা পরিবেশন করেন। অনেকক্ষেত্রে বেশভূষা পরিবর্তন না করেও পালাগীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত গৃহস্থ বাড়িতে মানত করে লক্ষ্মীর পূজা ও পালাগান অনুষ্ঠিত হয়, বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসাবে অনেকক্ষেত্রে পাড়াভিত্তিক লক্ষ্মীর লোকায়ত পালাভিনয় হয়। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে লক্ষ্মীর লোকায়ত পালাগানের বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

পাদটীকা

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৪০০, পৃঃ ৪৯১।

২। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী', ভূমিকা ৫/২০।

৩। Dr. Tushar Chattapadhyay, All India Oriental Conference Benaras.

৪। শ্রী রবিন হালদার, গ্রাম-সুবুদ্ধিপুর, দক্ষিণ, ২৪ পরগণা (সাক্ষাতকার)।

৫। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৭, পৃঃ ১৪৭-৪৮।

দেবীপালা ঃ চণ্ডী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে বিশিষ্ট পালাগান হল দেবীচণ্ডীর পালা বা শ্রীমন্তের মশান। পালাগান আলোচনায় দেবীচণ্ডীর লোকায়ত পালা দেবীপালার অন্তর্গত। দেবীচণ্ডী বিশ্বমাতৃকার প্রতীক। সমগ্র বিশ্বে মাতৃকাপূজার প্রচলন বহু প্রাচীন। মানবসমাজে কৃষি-সভ্যতা শুরু হওয়া থেকেই মানুষের মনে যে জাদু-বিশ্বাসের জন্ম নেয় তারই ফলস্বরূপ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার উদ্ভব হয়। স্ত্রী-দেবতা ও মূর্তিপূজা ভারতবর্ষে আর্যেতর জাতির মধ্যে ছিল বলে জানা যায়। গবেষকগণ মনে করেন, এই মাতৃকাপূজাই আদ্যাশক্তি মহামায়া বা চণ্ডীতে রূপান্তরিত হন। পরবর্তীকালে যত দেবীর অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে সবই সেই আদিমাতৃকার অংশ বিশেষ বলা হয়। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজের বিশ্বাসও এই মতকে সমর্থন করে।

মূলত বৈদিক যুগ থেকে আদ্যাশক্তির আভাস পাওয়া যায়। উপনিষদের যুগে কাত্যায়ণী ও কন্যাকুমারীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। উমা হৈমবতীরও উল্লেখ আছে। মহাভারতের কালে বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুরমর্দিনীর পরিচয় আছে। কেবল মার্কণ্ডেয় পুরাণেই প্রথম চণ্ডিকার বিস্তারিত বিবরণ মেলে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ সম্ভবত খ্রীঃ তৃতীয় শতকে রচিত বলে মনে করা হয়। এর পূর্বে 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধমহাযান গ্রন্থে যে-সমস্ত বৌদ্ধদেবীর উল্লেখ আছে তারা মাতৃকামূর্তির অনুরূপ। খ্রীঃ দশম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় পৌরাণিক-সাহিত্যে ঐতিহ্যগতভাবে দেবীচণ্ডিকার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এর আগে থেকে অবশ্য বিভিন্ন শিল্পকর্মে ও ভাস্কর্যে চণ্ডীর বিভিন্ন মূর্তি উৎকীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম দিকে চণ্ডী ও দুর্গা পৃথক ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অসুর-বিনাশিনী ও হর-গৃহিণী দুর্গা-পার্বতী এক হয়ে গেলেন। চণ্ডীর আরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। চণ্ডী-মূর্তির পাদদেশে স্বর্ণগোধিকার মূর্তি কল্পিত হয়। স্বর্ণগোধিকাবাহন চণ্ডীকে নিয়ে লেখা হয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজমাধব প্রমুখ কবিগণ এই পালার রচয়িতা।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে চণ্ডীদেবীর ব্যাপক পূজাচার হয়ে থাকে। ইনি লৌকিক দেবী। এই অঞ্চলে বিভিন্ন নামে দেবীর পরিচিতি। ওলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, হাড়িঝিচণ্ডী বা হাড়িরঝিচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, তুলোচণ্ডী প্রভৃতি নামে দেবীর পূজা হয়। চণ্ডীর থান সাধারণত উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এই দেবীর থান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে চব্বিশ পরগণায় যত চণ্ডীদেবীর থান আছে তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে না থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, অতীতে এই থানের পাশ দিয়ে নদীর স্রোত বহমান ছিল।

চণ্ডীদেবীর থান বহু স্থানে থাকলেও দেবীর মূর্তি সর্বত্র নেই। বাৎসরিক পূজার কালে যে চণ্ডীদেবীর মূর্তিপূজা হয় তা অতি সুন্দর; দুই হাত, কোথাও চারহাত বিশিষ্ট প্রহরণহীন সুশ্রী দেবীমূর্তি। দেবীর গাত্রবর্ণ হলুদ, দুটি চোখ টানা, কোথাও ত্রিনয়নী চণ্ডীমূর্তি দেখা যায়। দেবীর মাথায় মুকুট, পায়ে নূপুর, গলায় হার, কানে দুল, বাজুবন্ধ, হাতে চুড়ি ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা। দেবীর পরিধানে শাড়ি ও ব্লাউজ। দেবীর কোন বাহন নেই। ক্ষেত্রানুসন্ধানে আরও জানা গেছে দেবীচণ্ডীর নামে কোথাও নুড়ি, ঘট, কোথাও উঁচু বেদী, মুণ্ড প্রতীক, খেঁজুরগাছ পূজা হয়। চব্বিশ পরগণার নৈহাটি গ্রামে খেঁজুরগাছকে ঢেলাইচণ্ডী নামে পূজা হয়। চাংড়ীপোতা গ্রামে হাড়িঝিচণ্ডীর মুণ্ড প্রতীক পূজা হয়। শিরাকোল গ্রামে অনেক থানে দেবীর বেদী, নুড়ি ও ঘট পূজা হয়। বেগমপুর গ্রামে চণ্ডীতলা নামক এক মাঠের পাশে বৎসরান্তে দেবীর মূর্তিপূজা হয়। বারুইপুর থানার অন্তর্গত উলুঝাড়া গ্রামে এক উঁচু ঢিপি চণ্ডীর থান বলে পরিচিত, এখানে কোন মূর্তি বা নুড়ি কিছুই নেই। মাঝেমধ্যে এখানে চণ্ডীর মূর্তি গড়ে পূজা হয় বা হরিনাম সংকীর্তন হয়। সুতরাং লৌকিক দেবীচণ্ডীর মূর্তিকে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পৃথক করা যায় না।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবীচণ্ডীর বিকাশের মূলে মেয়েলী ব্রতকথা। আর্যেতর প্রভাব যার ভিত্তি। চণ্ডী নাম্নী এক শিকারের দেবী উপজাতীয়দের মধ্যে পূজিতা হন। ছোটনাগপুরের নানা উপজাতিদের মধ্যে এই পূজার অদ্যাপি প্রচলন আছে বলে জানা যায়....। সে কারণে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী অস্ট্রিক (আদিবাসী) বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আর্যেতর দেবী বলা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে গোধিকাযুক্ত চণ্ডীদেবীর বর্ণনা থাকায় প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়। কেউ কেউ মনে করেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকেই এই দেবীর উৎপত্তি। পরে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি সংস্কারে মিশে গ্রাম্য ব্রতকথায় পরিণত হয়। এর থেকেই পরবর্তীকালে 'কালকেতু' ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী গড়ে ওঠে। কালকেতু ব্যাধ সমাজের প্রতিভূ, ধনপতি সওদাগর এক সম্ভ্রান্তবংশীয় বণিক শ্রেণীর প্রতিভূ। প্রতিটি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে এই দুটি কাহিনী পরপর থাকায় দেবীচণ্ডীর অনার্য থেকে আর্যীকরণের ইঙ্গিতই প্রমাণিত হয়। তিনি আদিতে যাই থাকুন না কেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চসমাজে সগৌরবে আসীন হয়েছিলেন।

এক সময় চণ্ডীর পূজা এতদঞ্চলে যে যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল তার বহুল

প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন মন্ত্রতন্ত্রে। জলপড়া, তেলপড়া, নুনপড়া, রাতকানা ঝাড়ান, ভূত ঝাড়ান প্রভৃতি মন্ত্রে মা হাড়িরঝিচণ্ডীর দোহাই দেখা যায়। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা তো প্রায় হিন্দু বাঙালী পরিবারের ঘরে ঘরেই অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গার সাথে সব চণ্ডী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন।

দেবীচণ্ডী চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে বিভিন্ন নামে পূজিতা বলে উল্লেখ করেছি। বিশেষত 'হাড়িরঝিচণ্ডী' চব্বিশ পরগণায় এই নাম ওঝা-বৈদ্যদের নিকট সবিশেষ পরিচিত। বহু তন্ত্রমন্ত্র এই দেবীর দোহাই দিয়ে সৃষ্ট। হাড়িরঝিচণ্ডীর দোহাই দেওয়া বেশ কিছু মন্ত্র মুদ্রিত আকারেও দেখা যায়। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ গুহ্য বিদ্যা হিসাবে এগুলি সংরক্ষণ করেন। হাড়িরঝিচণ্ডীর দোহাই দেওয়া কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হল।

হলুদবাণ :

হাতে করি হনুমান আনে হলুদগিরি।
তাহা হতে রামচন্দ্র এক হলুদ নিল শিকড় ছিঁড়ি।।
রাক্ষস রাক্ষসী আর ডাকিনী যোগিনী।
তাহা হেরি পালাইয়া গেল যে তখনি।।
হনু বলে এই হলুদবাণ ছুঁড়ে মার।
বাহন বাণে সবার মুণ্ড কেটে ভূতলেতে পাড়।।
কার আজ্ঞে? হাড়িরঝিচণ্ডীর আজ্ঞে।
কাঁউর কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে।।

ধূলাবাণ :

ধূল ধূল ধূল ধূলা
নিলাম তোমার কুর‍্যা
অমুকের অঙ্গের ভূত এখনি ছাড়াও
রামচন্দ্রের নামে ধূলাবাণ হয়ে যাও
কার আজ্ঞে? কাঁউর কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে
হাড়িরঝিচণ্ডীর আজ্ঞে।

তেলপড়া :

প্রদীপে থাকিয়া তেল ধিক্ ধিক্ করে
সলিতা তাহার তেজে জ্বল জ্বল জ্বলে
অগ্নিসম আগুন জ্বলে অতি চমৎকার
অমুকের স্ত্রীর মন পড়ুক ঐ অগ্নি মাঝার
চাঞ্চল্য তেজিয়ে স্থির হউক তার মন
আমারে পূজিয়ে নিত্য কাটাক জীবন
কাঁউর কামুখ্যে মা আর হাড়িরঝিচণ্ডীর আজ্ঞায়
সিদ্ধ তার মনস্কাম যে ইহা পড়য়। *

চব্বিশ পরগণায় তথা সমগ্র নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গভূমিতে দেবীচণ্ডীর পালাগানের প্রচলন বহু প্রাচীন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পূর্বে মানিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবি বলে পরিচিত। তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী। মানিক দত্তের পরে মাধবাচার্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগণ চণ্ডীমঙ্গলকাব্য লিখেছেন, কিন্তু অধিক সাহিত্য গুণসম্পন্ন কাব্য বলতে গেলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র কথাই মনে হয়। একসময় চণ্ডীমঙ্গলের গান বাংলার হাটে মাঠে খুবই শোনা যেত বলে জানা যায়। তখন মনসার ভক্তের ন্যায় চণ্ডীরও ভক্তসমাজ গড়ে উঠেছিল, কিন্তু বর্তমানে চব্বিশ পরগণায় চণ্ডীর সেইরূপ ভক্তসমাজ আর নেই। চণ্ডী এখন মেয়েদের ব্রতকথার মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়েছেন। মঙ্গলচণ্ডীর যে গানপূজা হয় তা সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে। কারণ এই মাসের মঙ্গ লবারগুলি মেয়েরা উপবাসে থেকে খুব নিষ্ঠার সাথে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারগুলি জয়মঙ্গলবার বলেও পরিচিত। পূজার দিন বা মাসের শেষ মঙ্গলবার মায়েরা বা বোনেরা খুব জাঁকজমক করে গানপূজা ইত্যাদির আয়োজন করে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দেন। এই সময় পালাগানে বিশেষ আসর হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগর ও কালকেতু এই দুটি কাহিনীরধারা মঙ্গল কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মঙ্গল কাব্যের এই দুটি ধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় মানিকদত্ত, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগনের রচনায়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখাযায় যে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর প্রচলন কম। লোকসমাজে চব্বিশ পরগণায় চণ্ডীমঙ্গলের যে লোকায়ত পালা গীত বা অভিনীত হয় সেখানে ধনপতি সদাগরের কাহিনীর প্রাধান্য দেখা যায়। চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রগবেষণাকালে কালকেতু উপাখ্যান মূলক কোন প্রকার লোকায়ত পালাগানের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায় নি। সম্ভবত সুন্দরবন অরণ্য অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও কালকেতুর উপাখ্যান গৌণ স্থান গ্রহণ করেছে সুন্দরবন অঞ্চলের নিজস্ব বনদেবী হিসাবে বনবিবির অধিষ্ঠান ও আধিপত্যের জন্য (সৌজন্য ঃ ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়)। অরণ্য দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কিত কাহিনী সুন্দরবনে বনবিবিকে অবলম্বন করেই ব্যাপ্তি লাভ করেছে এবং কার্যত অরণ্যচণ্ডীর কথা বা ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীর কোন প্রভাব বিস্তারলাভ করতে পারে নি। মনে হয় চব্বিশ পরগণায় দেবীচণ্ডীর লোকায়ত পালায় তাই ধনপতি সদাগরের অভিজাত কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগরের যে-কাহিনী বর্তমানে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে প্রচলিত, তার দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত পাঁচাল ধারা, দ্বিতীয়ত গীতিনাট্যের বা লোকনাট্যের ধারা। গীতিনাট্য বা লোকনাট্যের যে ধারাটি প্রচলিত আছে তা অনেকখানি প্রচলিত যাত্রাগানের মত। বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় এক-একজন অভিনয় করেন। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যে-সমস্ত দোহার আসরের মাঝখানে গোল হয়ে বসে থাকেন, তাঁরা ক্ষেত্র বিশেষে দু'একটি চরিত্রের সংলাপ বলেন। তাঁদের সাজগোছ করা বা জনসমক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলতে হয় না, দর্শক বা শ্রোতাদের সে বিষয়ে কোন আক্ষেপাদিও থাকে না।

ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায় চব্বিশ পরগণায় চণ্ডীমঙ্গল গানের জনপ্রিয়তা কম। বর্তমানে খুব কম সংখ্যক গায়ক এই গান করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুনপুয়া গ্রামের শ্যামলকুমার সরদারের নিকট হতে চণ্ডীমঙ্গলের একটি পালা সংগৃহীত হয়েছে। গানটি খুব সুসংহত নয়। তিনি চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগরের কাহিনীটি গান করেন। এই পালার অনেক ঘটনা পূর্বসুরীদের থেকে পৃথক, ধারাবাহিকতাও সব ক্ষেত্রে বজায় নেই। রাজার নির্দেশে ধনপতি সওদাগরের সিংহলযাত্রা এবং সেখানে গিয়ে সিংহলরাজের কারাগারে বন্দী হওয়া ও পরে সসম্মানে গৃহে প্রত্যাবর্তন, এই মূল ধারাটি আছে। বাকী ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

শ্রীমন্তের মশান (কাহিনী সংক্ষেপ)

রাজা বিক্রমকেশর মা চণ্ডীর পূজায় বসেছেন। বহুদিন মাকে পূজা করছেন, কিন্তু মাকে দেখতে পান না। যার ফলে মায়ের কাছে খুব কান্নাকাটি করে বলছেন, মা এতদিন তোর পূজা করছি কিন্তু দেখা তো দিলি না। তাহলে কি দিয়ে পূজা করলে তৃপ্ত হবি বল, আমি সেইভাবে, সেই দিয়ে পূজা করব। এমনসময় মা দৈববাণীতে জানালেন, "ওহে রাজা, আমি তোর পুজোতে তৃপ্ত নই। তুই যদি শঙ্খ-চন্দন-চামর দিয়ে আমাকে পূজা করতে পারিস তাহলে আমি তৃপ্ত হব।

রাজা বিক্রমকেশর সেই শঙ্খ-চন্দন-চামরের জন্য মন্ত্রির পরামর্শে ধনপতি সওদাগরের স্মরণাপন্ন হলেন। ধনপতি জানালেন শঙ্খ-চন্দন-চামর পেতে হলে সুদূর সিংহলে যেতে হবে। এই কথা শুনে রাজা সেখানে যেতে যত ধন লাগে তা নিয়ে যাওয়ার জন্য ধনপতিকে অদেশ করলেন। এই কথা শুনে ধনপতি চিন্তায় পড়লেন এবং বাড়ি ফিরে এলেন।

ধনপতির দুটি স্ত্রী ছিল। একজন লহনা, অপর জন খুল্লনা। লহনা খুল্লনাকে ভালো চোখে দেখত না। কারণ তার ধারণা ছিল ধনপতি খুল্লনাকে খুব বেশি ভালবাসেন। সওদাগর তাই খুল্লনার জন্য চিন্তায় পড়লেন। তবুও তাকে যেতে হবে। তাই সবার কাছ থেকে বিদায় শেষে খুল্লনার কাছে বিদায় নিতে গেলে খুল্লনা স্বামীকে বিদায় দিতে রাজী হলেন না। কারণ তাঁর ভয় লহনার জন্য।

গীত ॥ স্বামী যেতে যে দেবনা সুদূর সিংহলে
পায়ে ধরি ওগো স্বামী তুমি যেয়ো না যেয়ো না।

ধনপতি ঃ দেখ খুল্লনা, তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি চলে গেলে লহনা তোমাকে দেখবে।

খুল্লনা ঃ না গো স্বামী, অমন কথা বল না। লহনা আমাকে কি বলে জান?

গীত ॥ বড় দিদি লহনা গো কিল লাথি মারে
ভাদ্র মাসের পাকা তাল যেমন ভূমে পড়ে।

ধনপতি ঃ সেকি খুল্লনা! লহনা তোমাকে এমন অত্যাচার করে? বেশ, যাবার সময় আমি লহনাকে বুঝিয়ে বলে যাব। তুমি আমাকে আর বাধা দিও না।

খুল্লনা ঃ তোমাকে আমি আর বাধা দেব না। তবে আমি তোমার মঙ্গলের জন্য গৃহে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসিয়ে পূজা করব। এতে তুমি যেন কোন বাধা দিও না।

ধনপতি ঃ না না তা হতে পারে না। আমার গৃহে মঙ্গলচণ্ডীর ঘটপূজা চলবে না। আমি ওসব মানি না।

কথা ॥ তবুও খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলের জন্য গৃহে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসিয়ে পূজা আরম্ভ করলেন। সওদাগর তখন বিরক্ত হয়ে সেই ঘট লাথি মেরে ভেঙে দিলেন। তারপর খুল্লনার কাছে বিদায় নিয়ে লহনার কাছে বিদায় নিতে গেলেন এবং খুল্লনা সম্পর্কে ভাল করে বুঝিয়ে বললেন। আবার ফিরে খুল্লনার কাছে এলে খুল্লনা বলেন স্বামী আমার গর্ভে তোমার ছয়মাসের সন্তান আছে। পুত্র বা কন্যা হলে তাদের কি নাম রাখব বলে যাও।

ধনপতি ঃ যদি পুত্র হয় তাহলে তার নাম রেখ শ্রীমন্ত আর কন্যা হলে নাম রেখ সুশীলা। আর যদি আমি বহুদিন ফিরতে না পারি তাহলে আমার উদ্দেশ্যে তাকে পাঠিয়ে দিও। আমি এই জাতপত্র লিখে দিয়ে গেলাম।

এই বলে ধনপতি সওদাগর শঙ্খ-চন্দন-চামর আনতে সুদূর সিংহলদ্বীপের উদ্দেশ্যে চললেন। সিংহলে তিনি শালিবাহন রাজার রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যাওয়ার পথে দেখে গেলেন কমলেকামিনী। শালিবাহনের রাজ্যে গিয়ে তিনি শালিবাহন রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে আপনার পরিচয় দিয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্য জানালেন। শালিবাহন রাজা ধনপতিকে সন্দেহবশত এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে বললেন। তিনি তাঁকে তাঁর এক বাগান বাড়িতে আশ্রয় করে দিলেন।

এদিকে মা চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার এক সন্তান হল। সন্তানের নাম রাখলেন শ্রীমন্ত। খুল্লনা নিয়ত পতির মঙ্গলের জন্য চণ্ডীর কাছে প্রার্থনা করেন কিন্তু ধনপতি একবারও চন্ডীর নাম করেননা। সেকারণে দেবীচণ্ডী মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে সুদূর সিংহলে গিয়ে ধনপতির হাতে একটি সুপক্ক ফল তুলে দিয়ে রাজদৃষ্টিতে তাঁকে চোর সাজালেন। যার ফলে শালিবাহন রাজা ধনপতিকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

এদিকে শ্রীমন্ত বড় হয়ে স্কুলে যেতে থাকেন। গুরুমশাই তাঁর পিতার নামধাম জিজ্ঞাসা করলে শ্রীমন্ত কিছু না বলতে পারায় গুরুমশাই তাঁকে তিরস্কার করেন। শ্রীমন্ত তখন মায়ের কাছে এসে পিতার সন্ধান জানতে চান। মা খুল্লনা তাঁকে তাঁর পিতার দেওয়া জাতপত্র দিয়ে পিতৃপরিচয় দিলে শ্রীমন্ত নৌকা সাজিয়ে সুদূর সিংহলে পিতার স্থানে চললেন। মাচণ্ডী শ্রীমন্তকে পরীক্ষা করার জন্য কালিদহে কমলেকামিনী রূপ দেখিয়ে ছলনা করলেন। শ্রীমন্ত এই দৃশ্য দেখে শালিবাহন রাজ্যে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি আসার পথে অদ্ভুত কিছু দেখলে কিনা বল। শ্রীমন্ত কমলেকামিনী দর্শনের কথা জানালে রাজা তাঁকে দেখাতে বলেন। দেখাতে পারলে অর্ধেক রাজ্য ও কন্যাকে বিবাহ দেবেন না দেখাতে পারলে দক্ষিণ মশানে বলি দেবেন।

শ্রীমন্ত শালিবাহনকে নিয়ে কালিদহে কমলেকামিনী দর্শন করাতে এনে মায়ের ছলনায় তা দেখাতে পারলেন না। তখন রাজা তাঁকে দক্ষিণ মশানে বলি দেবার জন্য নিয়ে গেলেন। মাচণ্ডী তখন তাঁর বরপুত্রকে ঘাতকের কাছ থেকে রক্ষা করলেন। তিনি বৃদ্ধা রূপে ঘাতককে বাধা দিলেন। এই কথা শুনে রাজা নিজে এসে শ্রীমন্তকে হত্যা করতে খড়্গ ধারণ করলে মাচণ্ডী নিজেই তাঁর হাত ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে শালিবাহনের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। শ্রীমন্তকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। তখন বুড়িমায়ের পরিচয় জানতে চাইলে বুড়িমা প্রথমে পরিচয় দিলেন না। বরং শ্রীমন্তের সাথে পুনরায় গিয়ে কমলেকামিনী দর্শনের পরামর্শ দিলেন। শ্রীমন্ত প্রাণে বেঁচে বুড়িমায়ের আদেশে শালিবাহনকে নিয়ে কমলেকামিনী দর্শন করাতে গেলেন। শ্রীমন্ত কালিদহে শালিবাহনকে কমলেকামিনী দেখালেন। মাচণ্ডী তখন সখিকে নিয়ে কালিদহের জলে কমলেকামিনী হয়ে খেলা করছিলেন। শালিবাহন এইরূপ দেখে অতিশয় আনন্দিত হয়ে শ্রীমন্তকে নিয়ে সসম্মানে আপন গৃহে ফিরে গেলেন। তখন মাচণ্ডীরূপী বুড়িমা শ্রীমন্তের হাতে রাজার কারাগারের চাবি তুলে দিতে বলেন। মহারাজ মায়ের আদেশে কারাগারের চাবি শ্রীমন্তের হাতে তুলে দিলে কারাগারের দ্বার খুলে সবাইকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু কারাগারের মধ্যে থেকে একজন বের হলেন না।

শ্রীমন্ত এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এমনসময় সেই লোকটি কারাগারের মধ্য থেকে একটু জল প্রার্থনা করলে শ্রীমন্ত একপাত্র জল নিয়ে কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করে ধনপতিকে দিলে ধনপতি প্রথমে তা খেতে চাইলেন না। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল রাজার কোন গুপ্তচর হয়ত তাকে মেরে ফেলার জন্য জলে বিষ মিশিয়ে এনেছে। তখন শ্রীমন্ত মনে মনে অনেক কথা চিন্তা করে ধনপতিক কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, কারাগারের দরজা উন্মুক্ত পেয়ে সবাই চলে গেলেন, কিন্তু আপনি গেলেন না কেন? ধনপতি তার উত্তরে বলেন— "রাজা আমাকে বন্দী করেছেন, রাজা আমাকে না ডাকলে বা আমার হাত ধরে না বার করলে কারাগারের দরজা দিবানিশি খোলা থাকলেও আমি বের হব না। কারণ আমি সত্যবাদী ও সৎ। মিথ্যা অজুহাতে আমাকে রাজা বন্দী করেছেন। অতএব রাজা না ডাকলে আমি যাব না।" শ্রীমন্ত তখন ধনপতির পরিচয় জানতে চাইলে ধনপতি একে একে সমস্ত পরিচয় দেন। শ্রীমন্ত বুঝতে পারেন এই তাঁর পিতা। কারণ মায়ের কাছ থেকে যা শুনেছেন সবই মিলে যাচ্ছে। তখন শ্রীমন্ত নিজের পরিচয় দিলে ধনপতি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীমন্ত ও ধনপতি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলে শালিবাহন নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীমন্তের সাথে আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। শঙ্খ-চন্দন-চামর ধনপতির হাতে দিয়ে তরণী সুসজ্জিত করে মহাসমারোহে উভয়কে বিদায় দিলেন।

শঙ্খ-চন্দন-চামর নিয়ে ধনপতি আপন দেশে ফিরে এলেন এবং বিক্রমকেশরকে সেই চামর দিয়ে পুরস্কৃত হলেন। বিক্রমকেশর সেই চামর দিয়ে মাচণ্ডীর পূজা করলে মা

তৃপ্ত হলেন। পূজা শেষে ধনপতি নিজের বাড়িতে ফিরে খুল্লনা বলে ডাকলে খুল্লনা স্বামীর পদতলে এসে নমস্কার জানান। তখন ধনপতি খুল্লনাকে জানান যাবার সময় মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘটে লাথি মারায় ও মঙ্গলচণ্ডীর নামে কটাক্ষ করায় মা তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। শুধু তোমার জন্যে মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপা আবার পেয়েছি। এস, আমরা সবাই মিলে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করি। এই বলে খুল্লনা, ধনপতি ও শ্রীমন্ত মিলে মায়ের নামে সাতগাঁ মেঙেপেতে মায়ের পূজা দিলেন। ***(কাহিনী সমাপ্ত)***

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়মঙ্গলবার মা চণ্ডীর পূজা হয়। সেই পূজা উপলক্ষে সাধারণত এই গান হয়ে থাকে। পালাগায়ক গানটি গাওয়ার আগে মায়ের নামে ডালাপূজা দিয়ে গান শুরু করেন। এই গানের শুরুতে নানা দেবদেবীর বন্দনা গেয়ে পালা শুরু হয়, কিন্তু শেষে অষ্টমঙ্গলা গাওয়া হয় না। গায়েন শ্যামল কুমার সরদার জানালেন এই পালার অষ্টমঙ্গলা তিনি গুরুর কাছ থেকে পান নি। তাই তিনিও গান করেন না। তবে পালাটি গাইতে তাঁর সাড়ে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে। গানের মাঝে বিভিন্ন 'গান' দিয়ে 'কথা' দিয়ে পালাটিকে বড় করেন। গানের মধ্যে বিভিন্ন দেহতত্ত্বের গান থাকে। মোটের উপর ভক্তিভাব বজায় রেখে তিনি গানগুলি সংযোজন করেন।

চব্বিশ পরগণায় দেবী চণ্ডীর পূজাচার ব্যাপক হলেও পালাগানের অনুষ্ঠান ব্যাপক হয় না। বর্তমানে চণ্ডীমঙ্গল গানের প্রচলন যথেষ্ট কমে গেছে। এ গানের শিল্পীও বর্তমানে কম। পালা গায়কদিগের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে জানা যায় বর্তমানে এ গানের চাহিদা না থাকায় চণ্ডীর গানের আসর পৃথকরূপে কদাচিৎ বসে। শ্রোতাগণ অন্য পালাগানের আসরে এই গান শোনার জন্য অনুরোধ করলে তবেই চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ক্ষেত্রবিশেষে গাওয়া হয়।

পাদটীকা

১। অশোক মিত্র সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা।

২। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা।

৩। পল্লব সেনগুপ্ত, পূজা পার্বণের উৎস কথা।

৪। বিনয় ঘোষ- পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

* কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, কামাখ্যাতন্ত্র, ১৩৪৯।

দেবীপালা ঃ বিশালাক্ষী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে বিশালাক্ষীপালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালাগান আলোচনায় বিশালাক্ষীর পালা দেবীপালার অন্তর্গত। বিশালাক্ষী সুন্দরবন অঞ্চলের এক বিশিষ্ট লৌকিক দেবী। চব্বিশ পরগণায় বিশালাক্ষীর পূজা ঐতিহ্যময় লৌকিক পূজা হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে দেবীর ব্যাপক পূজাচারের প্রচলন আছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বিশালাক্ষীর পূজা হয়। রঙ্কিনী, বাসলী, দেবী-নিত্যা, বাচ্ছলী, চণ্ডী, যোগিনী, ডাকিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, বিশালাক্ষী প্রভৃতি নামে তিনি পরিচিতা। চব্বিশ পরগণায় তিনি বিশালাক্ষী নামেই পরিচিতি লাভ করেছেন। বর্ণব্রাহ্মণ, পতিত ব্রাহ্মণ, কাঠুরিয়া, মৌলে, বাউলে, ধীবর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ দেবীর পূজারী বা সেবক। বৈদিক সাহিত্যে দেবী বিশালাক্ষীর কোন পরিচয় মেলে না। পুরাণাদিতে দেবী বিশালাক্ষীর পরিচিতি না থাকলেও বহু প্রাচীন গ্রন্থে দেবীর উল্লেখ আছে। দশম-দ্বাদশ শতকের লেখা বৌদ্ধ সহজিয়াদের পদাবলীর মধ্যে (চর্যাপদ) দেবী বিশালাক্ষীর উল্লেখ আছে। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি সময়ের মহাতান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে' বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্র আছে। মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যে (বাসলী সেবক চণ্ডীদাস) দেবীর নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন লেখকের লেখা দেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক পালাগানের সাথে এই অঞ্চলের মানুষ বিশেষ পরিচিত। বিশালাক্ষী পূজা বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকলেও চব্বিশ পরগণা তথা সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁর বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়।

দেবীর মূর্তিও পূজাচারের মধ্যে রয়েছে আদিমতার ছাপ। দেবীর প্রধান পূজারী তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। দেবীর পূজার উপকরণাদি রূপে অদ্যাপি মদ্য, পোড়ামাছ, বলিপ্রদত্ত পাঁঠার মাংস, মহিষের মাংস ইত্যাদি উৎসর্গ করা হয়। লাউ, কুমড়ো বলির

ব্যবস্থাও প্রত্যক্ষ করা যায়। নটেশাক, ওল, ঝাঁটা দিয়েও দেবীর পূজা হয়। দেবী বিশালাক্ষী জেলে-ধীবর, মাঝি-মাল্লাদের পূজিত দেবী হলেও পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে উচ্চবর্ণের নিকট সমাদৃতা হয়েছেন।

লোকবিশ্বাসে দেবী বিশালাক্ষী নানা রোগশোক প্রতিকারের দেবী। মাঝি-মাল্লাদের সমুদ্র বা নদীতে ঝড়বৃষ্টির ন্যায় আধিদৈবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষাকারী দেবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও কালে কালে তিনি তান্ত্রিকদেবী, বৌদ্ধদেবী, শাস্ত্রীয়দেবী, যোগিনী, ডাকিনীও, যোড়শ শতকে চৈতন্যপ্রভাবে বৈষ্ণবী হয়ে উঠেছেন। দেবী ঘোড়ামুখী, মুণ্ডমূর্তি, শিলাখণ্ড রূপে পূজিতা হন আবার পূর্ণ নারীমূর্তিতেও পূজিতা হন। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় সুন্দরবনের কোন কোন অংশে বিশালাক্ষী বনবিবি রূপে পূজিতা হন। উদাহরণ স্বরূপ পাথরপ্রতিমা থানার হেরম্ব গোপালপুর গ্রামের বিখ্যাত বিশালাক্ষীর কথা উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার এখানকার বিশালাক্ষী বনবিবি হিসাবে পূজিতা হন।[১] বিবর্তনের ধারায় দেবী বিশালাক্ষী শাস্ত্রপুরাণতন্ত্র এবং বৌদ্ধ বৈষ্ণব ধারার সঙ্গে যুক্ত হলেও মৌলিক বৈশিষ্ট্যে অরণ্যচারী লৌকিকদেবী হিসাবেই ব্যাপক জনসমাজে স্বীকৃতা বা পূজিতা হন; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ ধীবর-মাঝি-মাল্লারাই দেবীর সেবক। ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে নদী জঙ্গলের মানুষকে রক্ষা করাই দেবীর প্রধান মাহাত্ম্য। এইদিক থেকে বিচার করলে বিশালাক্ষীর আদিম ও লৌকিক চরিত্র বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চব্বিশ পরগণায় বিশালাক্ষীর প্রাচীন পোড়া ইঁটের মন্দিরের অস্তিত্ব যেমন মেলে তেমনি মুক্ত স্থানেও দেবীর থান আছে। সাধারণত গৃহস্থের ঠাকুরঘরে দেবী বিশালাক্ষীর পূজা হতে দেখা যায় না। দেবীর পূজা হয় মন্দিরে বা বারোয়ারী থানে। অধিকাংশ বিশালাক্ষীর থান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতেই দেখা যায়। বর্তমানে সমস্ত মন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে নদী না থাকলেও ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে অতীতে নিকটবর্তী স্থান দিয়ে নদী প্রবাহিত ছিল। যেমন পাথরপ্রতিমার সুরেন্দ্রনগর গ্রামে যে বিশালাক্ষী মন্দির তার নিকটেই ঠাকুরাণ নদী, উত্তর চব্বিশ পরগণার চিংড়ি মারার ট্যাকে বিদ্যাধরী নদীর পাশেই বিশালাক্ষীর মন্দির, বারুইপুরে দুইটি বিশালাক্ষী মন্দিরের নিকটে (বর্তমান মজে যাওয়া) আদিগঙ্গা, কাকদ্বীপের বিশালাক্ষী মন্দিরের নিকট গঙ্গার একটি স্রোত, কাঁটাবেনিয়া, মলঙ্গা (বারুইপুর থানা), প্রভৃতি বিশালাক্ষী মন্দিরের নিকট বর্তমানে কোন নদীর অস্তিত্ব না থাকলেও স্থানীয় মানুষের সাক্ষাৎকারে জানা গেছে পূর্বে নিকটেই নদীর একটি স্রোত ছিল। এমনই বহু প্রমাণ আছে যে, বিশালাক্ষীর মন্দির নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। বিশালাক্ষীর ন্যায় নারায়ণী বনবিবির থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদীর তীরেই দেখা যায়। ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও বিভিন্ন সূত্রে চব্বিশ পরগণার নানাস্থানে বিশালাক্ষীদেবীর থান বা পূজানুষ্ঠানের তথ্য জানা যায়। ঐ সব থানের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশালাক্ষী থানের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল।

কাকদ্বীপের বিশালাক্ষী

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপে বিশালাক্ষীর এক বিশাল মন্দির আছে। মন্দিরটি

হুগলি নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত। হেরম্বগোপাল দাস নস্কর, কৃষ্ণগোপাল দাস নস্কর, ও গণেশগোপাল দাস নস্কর মহাশয়ের জমিদারীর আমলে দেবীর মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়। মন্দির সংলগ্ন সাতবিঘা দুটি পুকুর ও দেড়বিঘা জমি আছে। পুকুরে মাছ ও জায়গার উপর যে সমস্ত দোকান আছে তার আয়ে মন্দিরের সমস্ত খরচ চলে। এছাড়া যাত্রীদের নিকট হতে কিছু আয় হয়।

এই মন্দিরে দেবীর যে মূর্তি আছে তার বিশেষত্ব লক্ষণীয়। দেবী শিব বা ভৈরবের উপর দণ্ডায়মান। তাঁর দুই হাত। দুইহাতে খড়্গ, গলায় মুণ্ডমালা, পরিধানে রক্ত বস্ত্র, দেবীর দুইদিকে দুই সখি নৃত্যের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। ডানদিকের সখির সবুজবস্ত্র, বামদিকের সখির হলুদ বস্ত্র, উভয়েই সালঙ্কারা হলেও মাথায় চূড়া নেই। দেবী বিশালাক্ষীর প্রতিমার নিচে সুন্দরবনের বাঘের একটি মুণ্ড আছে। এটি বহু প্রাচীন ও কাঠের নির্মিত মুণ্ড। দেবীর মৃণ্ময়মূর্তি। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ১লা বৈশাখ হালখাতা করার সময় প্রথমে বিশালাক্ষীকে পূজা দিয়ে তবে হালখাতা করেন। এটিই এখানকার রীতি হিসাবে প্রতিপালিত হয়। সন্দেশ, বাতাসা দিয়ে অনেকে মাকে পূজা দেন। দেবীর কাছে মানত করে, মনস্কামনা পূর্ণ হলে ওল, ঝাঁটার কাঠি দিয়ে পূজা দেবার ঘটনা আছে (কাঁটাবেনিয়ার বিশালাক্ষী পূজায় এই নিয়ম প্রত্যক্ষ করা যায়)। এছাড়া দেবীর ভক্তগণ দেবীকে শাড়ি, শঙ্খ, রূপার চোখ, নথ, সোনার হার ইত্যাদি দিয়ে পূজা দেন। দেবী বিশালাক্ষীর যে মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাতে (২৬.১.১৯৯৬) দেবীর চোখ ও নথ সোনার। এগুলো দেবীর ভক্তদের দেওয়া। দেবীর মূর্তিটির নিকট স্থাপিত দেবীঘট কমপক্ষে আড়াইশ বৎসরের পুরানো বলে সেবাইত প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান।

জম্বুদ্বীপের বিশালাক্ষী

বকখালির নিকট জম্বুদ্বীপে একটি বিশালাক্ষীর থান আছে। এটির প্রাচীনত্ব কেউ জানেন না। পূর্বে এখানে জঙ্গল ছিল। জঙ্গল হাসিল করার সময় এখানকার থানটি আবিষ্কৃত হয়। এটি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার মন্দিরে যে বিশালাক্ষীদেবীর মূর্তি আছে তা প্রায় ২৫০-৩০০ বৎসরের মধ্যে বলে অনেকে মন্তব্য করেন।[২]

কাঁটাবেনিয়ার বিশালাক্ষী

লোক প্রচলিত বিশালাক্ষী পালার কাহিনী করঞ্জলি গ্রামের নিকটবর্তী কাঁটাবেনিয়া গ্রামের বিশলাক্ষীর পূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এখানকার বিশালাক্ষীপূজা প্রাচীনত্বের বিচারে কমপক্ষে আড়াইশ বৎসরের পুরানো বলে কথিত হয়। বাঁশতলার লক্ষ্মীপুরের ধীবরেরা প্রথম নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মূর্তিটি জালে পায়। দেবীর প্রত্যাদেশের পরে তা জেলেরা কাঁটাবেনিয়ার চক্রবর্তীদের হাতে তুলে দেয়। বর্তমান ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষ মূর্তিটি নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। জেলে-মৌলে-জাত-অনজাত দেবীর দর্শনের জন্য চক্রবর্তীবাবুদের বাড়িতে যেতে থাকলে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকজনের কাছে তা খারাপ লাগে। কারণ তাঁরা ছিলেন বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণ। জাত-অনজাতের অবাধ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ তাদের জাত্যাভিমানে আঘাত দেয়। এমনকি গ্রামের মোড়ল

তাকে ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে একঘরে করার হুমকি দেন। তখন তাঁরা ঘরে দরজা দিয়ে দীর্ঘদিন দেবীকে রাখেন। বাইরের দর্শনার্থীদের দর্শন করতে দিতেন না। এই পরিস্থিতিতে পুনরায় দেবীর আদেশ হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের চক্রবর্তীদের বাড়িতে (বর্তমান শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষ) তাঁকে রেখে আসার জন্য। একই সাথে শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষেরও তাঁকে আনার জন্য প্রত্যাদেশ হয়। সেইসূত্রে এবং সেই থেকেই বিশালাক্ষীদেবী বর্তমান শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীদের বাড়িতে আছেন। বাঁশবেড়ের জমিদার বিশলাক্ষীর নামে দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর করে ৪-৫ শত বিঘা জমি দিয়েছিলেন। সেই আয়ে দেবীর সেবা ভালো ভাবেই চলত। ১৩৬২ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে সেই জমি সমস্ত বেদখল হয়। বর্তমানে দেবীর নামে বিশেষ কোন জমি নেই। আছে কেবল একটি ৩-৪ বিঘার পুকুর ও মন্দির সংলগ্ন ১০-১২ কাঠা জমি।

প্রায় একই সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে কথিত হয়। চক্রবর্তীদের একটি গাই হঠাৎ বাড়িতে দুধ দেওয়া বন্ধ করে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গাভীটি সিদ্ধেশ্বরের মস্তকে ছরছর করে দুধ দিচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর হলেন একটি শিবলিঙ্গ। রাত্রে সিদ্ধেশ্বর স্বপ্নযোগে চক্রবর্তীদের কাউকে জানান—দেবী বিশালাক্ষীকে তোমরা এনেছ বলে আমি এখানে এসেছি। আমার পাশে দেবীর মন্দির করে দাও আর সেই সাথে আমাকেও পূজা দাও। স্বপ্নাদেশ অনুসারে বিশালাক্ষীর থান সিদ্ধেশ্বরের পাশে স্থাপিত হয়। সেই থেকে বিশালাক্ষী ও সিদ্ধেশ্বরের পূজা অদ্যাবধি চলে আসছে। কেউ কেউ বলেন শিবলিঙ্গটি বহু আগে থেকেই এখানে ছিল। বিশালাক্ষীর মূর্তিটি পরে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩]

বিশালাক্ষী মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে অনন্তদেবের ৪-৫ ফুট দীর্ঘ একটি শিলা মূর্তি আছে। অনন্তদেব লোক প্রচলিত নাম। প্রকৃতপক্ষে অনন্তদেব বলে প্রচারিত মূর্তি টি হল একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। কেউ বলেন নদীর ধারে জেলেরা এটি পেয়েছেন, কেউ বলেন করঞ্জলির 'ষণ্ড পুষ্করিণী' (স্থানীয়ভাবে যাকে 'ষাঁড়পুকুর' বলে) সেচন করে এটি পাওয়া গেছে। এই সাথে একটি শিলালিপিও পাওয়া গেছে। এটির পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কাঁটাবেনিয়ায় এই লিপিযুক্ত বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর অনন্তদেবের মূর্তিটি আছে। অনন্তদেবের মূর্তিটি কষ্টিপাথরের বলে সেবাইত জানান। বিশালাক্ষীর সাথে অনন্তদেবের পূজা হয়ে থাকে।

বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার দেবীকে চক্রবর্তীদের বাড়িতে আনা হয়েছিল। সেই থেকেই ঐ দিনটি দেবীর প্রতিষ্ঠাদিবস বা জন্মদিবস হিসাবে পালন করা হয়। পূর্বে এই উপলক্ষে মাসাবধি মেলা বসত। বর্তমানে একসপ্তাহ চলে। বিভিন্ন শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। চণ্ডীপাঠ অবশ্যই হয়। পূর্বে এই পূজা উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী জমিদারগণ জোড়াপাঁঠা বলি দিতেন। দেবীর আবির্ভাবদিবস উপলক্ষে দুইশত থেকে আড়াইশত পাঁঠা, মহিষ বলি হত। কেউ কেউ শাড়িও পাঠাত। বর্তমানে দশ-বারোটা পাঁঠা বলি হয়। যে সমস্ত জমিদার পূজা

পাঠাতেন তাঁরা হলেন লক্ষ্মীপুরের প্রভাতকুমার বসু, বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী, পাটদা মুড়োগাছার বরদা চৌধুরী (১৮নং লাট), লর্ড ক্যানিং সাহেব প্রমুখ। পাটদা মুড়োগাছাতে পাটেশ্বরী আছেন। সেখানে নরবলি হত। মন্দিরবাজারের কেশব রায়চৌধুরী এখানে নরবলি দিতেন কিন্তু কাঁটাবেনিয়ায় বিশালাক্ষীর নিকট কোনদিন নরবলি দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। বর্তমানে দৈনিক আড়াই সের চাল রান্না করে দুপুরে দেবীর পূজা দেওয়া হয়, রাতে ফল, মিষ্টি দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। কাঁটাবেনিয়ার বিশালাক্ষীর মূর্তিটির বয়স কমপক্ষে আড়াইশ বৎসর হলেও সেবাইতগণ মনে করেন, এ মূর্তির কোন পরিবর্তন হয়নি। দশ-পনেরো বৎসর অন্তর একবার করে অঙ্গ-রাগ হয় মাত্র। এখানকার পূজার আর একটি বিশেষ রীতি হল মন্দিরে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা হয় কিন্তু কোন মূর্তি নিয়ে পূজা হয় না। ঘটস্থাপন করে দেবীর সামনে পূজা হয়। দেবী বিশালাক্ষীর আদেশে অন্য কোন মূর্তিপূজা এই মন্দিরে নিষিদ্ধ বলে কথিত হয়।

বিশালাক্ষীকে নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি লোকবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। মায়ের নামে মানত করে বিভিন্ন রোগমুক্তি, সন্তানকামনা করে সন্তানলাভ ইত্যাদি হয়ে থাকে। মানতকারীরা মানত অনুযায়ী দেবীর আগমনীর পূর্বদিন অর্থাৎ সোমবার প্রদীপ জ্বালান ও ধুনা পোড়ান। একে 'ধূনা জ্বালানো খেলা' বলে। কেউ পার্শ্ববর্তী মায়ের পুকুরে স্নান করে মন্দিরের চর্তুদিকে গণ্ডি দেন। অনেকে ছলন দেন। এখানে একটি প্রবাদ আছে— "ওলে বোল, ঝাঁটায় হাঁটা।" অর্থাৎ যে-সমস্ত শিশু কথা বলতে পারে না বা কথা বলতে দেরী হয় তাদের মা ঠাকুরমা 'ওল' মানত করেন। যে-সমস্ত শিশু হাঁটতে পারেনা বা হাঁটতে দেরী করে তাদের অভিভাবক 'ঝাঁটার' মানত করেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানত অনুযায়ী ওল ও ঝাঁটা দিয়ে পূজা দিয়ে যান। হিন্দু-মুসলিম সব শ্রেণীর মানুষ এই মন্দিরে বা থানে মানত করে ও মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানত চুকিয়ে যান। এখানকার বাৎসরিক মেলা হিন্দু-মুসলিমের মিলনক্ষেত্রও বলা যায়। এখানে বর্তমানে ছাগবলির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে, মহিষবলি হয় না। পূজায় যে-সমস্ত পাঁঠা পড়ে তার একটা মাথা ও পূজার প্রসাদ পূর্বে যাঁদের বাড়ি থেকে দেবীকে আনা হয়েছিল অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বংশধরকে দেওয়ার রীতি এখনও প্রচলিত আছে।

বিশালাক্ষীর মূর্তির পাশে যে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিটি আছে এ নিয়ে একটি লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যাঁরা মৃতবৎসা তাঁরা এখান থেকে তীর্থঙ্করের মূর্তির শরীর ধোয়া জল নিয়ে যান এবং তা ভক্তিভাবে পান করেন। এতেই তাঁদের মৃতবৎসার দোষ কেটে যায়। মানত অনুযায়ী পরে তাঁরা জৈনমূর্তির ছলন ও পূজা দিয়ে যান।

পূর্বে এখানকার রাস্তাঘাট ভাল ছিল না। ফলে বহু দূর দূর থেকে মানতকারীরা পূজার জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে সময়মত পৌঁছাতে পারত না। সে কারণে এখানে মানত করে দেবীর ছলন বাড়ির ধারে কোন সাধারণী স্থানে প্রতিষ্ঠা করে পূজা দিত। সেইসূত্রে কাঁটাবেনিয়ার বিশালাক্ষীর অনুরূপ মূর্তিপূজা আশপাশের অনেক গ্রামে চালু হয়ে গেছে,

এখানকার সেবায়েতগণ একথা খুব জোর দিয়েই বলেন। তাঁরা আরো বলেন, ঐ সমস্ত পূজা বা থান অনেক পরের। কাকদ্বীপের বিশালাক্ষীকে অবশ্য বহু পুরানো পূজা বা থান বলতে চান। কাকদ্বীপের পাশে ভাগীরথীর শাখা থাকায় এখানকার মন্দিরটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। কাঁটাবেনিয়ার প্রাচীন লোকদিগের নিকট হতে জানা যায় বর্তমান বিশালাক্ষীর মন্দিরের পাশ দিয়ে হুগলীর একটি শাখা ছিল। বর্তমানে সেটি খাল হয়ে গেছে। জুমড়ীর কাছ থেকেই সেই স্রোত বয়ে গেছে। বর্তমানে তার চিহ্ন নেই।

কাঁটাবেনিয়ার বিশালাক্ষী মূর্তির বিশেষত্ব আছে। দেবীর পরনে গোলাপী শাড়ি, চার হাত, ডানদিকের উপরের হাতে খড়্গ, নিচের হাতে ঘণ্টা, বামদিকের উপরের হাতে শঙ্খ, নিচের হাতে পাত্র। দেবী কালভৈরবের উপর দণ্ডায়মানা, দেবীর মূর্তিটি প্রায় তিনফুট। এটি দারুমূর্তি। পুরো মূর্তিটি সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সিংহাসনটি আরো একটি কাঠের সিংহাসনের উপর অবস্থিত। দেবীর সামনে শিবলিঙ্গ, বামদিকে কয়েকটি নুড়ি, এদের নারায়ণশীলা বলে। সামনে বড় দেবী ঘট, ঘটটি তামার পাত্রের উপর বসানো। এই ঘটটি কয়েক'শ বছরের পুরানো বলে স্থানীয় সেবায়েত জানালেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দেবীর মূর্তির পার্শ্বে একটি কাঠের নির্মিত ব্যাঘ্র মুণ্ড বহুকাল পূর্বে থেকেই সযত্নে রক্ষিত আছে। এটি দেবীপূজার বিশষ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বারুইপুরের বিশালাক্ষী

বারুইপুরের আদিগঙ্গার তীরবর্তী (বর্তমানে মজে গেছে) চৌধুরীবাবুদের নির্মিত মন্দিরে বিশালাক্ষীদেবীর পূজা অতি প্রাচীন বলে কথিত হয়। এখানে ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠান করেন। নিত্যপূজা ছাড়া প্রতি বৎসর দুর্গা অষ্টমীতে খুব জাঁকজমক সহকারে পূজা হয়। এখানে ছাগবলির ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কর্মকার (যাঁরা বলি দেন) ছাগবলি দেন। বলির পূর্বে অবশ্যই খাঁড়া ও ছাগকে পুরোহিত পূজা করেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে খাঁড়াটি মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে ছাগের গলায় ঠেকান। তারপর কর্মকার বলির কাজ সমাপ্ত করেন। লাল নোটেশাক মায়ের পূজার প্রধান উপকরণ। এ নিয়ে এখানে একটি কিংবদন্তী আছে। মা নাকি কোন একদিন মন্দির থেকে বেরিয়ে সামনের একটি নোটেশাক বাগানে গিয়ে নোটেশাক তুলছিলেন। বাগানের মালিক চোর ভেবে তাড়া করতে দেবী মন্দিরের দিকে আসেন। চাষী পিছন পিছন এসে মন্দিরে দেখেন দেবী বিশালাক্ষীর হাতে নোটেশাক। সেই থেকে নোটেশাক হয় দেবীর পূজা ও ভোগের উপকরণ। বারুইপুরে বিশালাক্ষী মায়ের মূর্তির বিশেষত্ব লক্ষণীয়। দেবীর দারুমূর্তি, দ্বিভুজা, বটুক ভৈরবের উপর দণ্ডায়মানা। বটুক ভৈরব উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। দেরীর এক পা ভৈরবের মস্তকে ও অপর পা ভৈরবের পায়ের দিকে। দেবীর ডানহাতে খড়্গ, বামহাতে সিন্দুর কৌটা। গলায় মুণ্ডমালা, পরিধানে শাড়ি-ব্লাউজ, পায়ে নূপুর ও সর্বাঙ্গে নানা অলঙ্কার। যাঁরা পূজা দিতে আসেন তাঁরা শাঁখা ও নোয়া দিয়ে যান। দেবীর সামনে বাঁদিকে ষষ্ঠীর নুড়ি, শিবলিঙ্গ, মাঝে শীতলা, ধারে মনসা। দেবীর ডানদিকে নারায়ণের শীলা আছে। দেবীর বেলপাতা ও জবাফুল দিয়ে

পূজা হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন হয়ে থাকে। দেবীর মন্দিরের জানালায় ভক্তদের অসংখ্য ঢিল বাঁধা। এগুলি মানতের সাক্ষীস্বরূপ, মনস্কামনা পূর্ণ হলে পূজা দিয়ে যান।

বারুইপুর সখের বাজারে (কাছারী বাজার) একটি বিশালাক্ষীর মন্দির আছে। স্থানীয় অতিশয় সংগতিসম্পন্ন চিংড়ি-পরিবার দেবীর বিশাল নাটমন্দির বানিয়ে দিয়েছেন। এ মন্দিরটিও আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত। যথারীতি এখানে নিত্যপূজা হয়। বহু ভক্ত এখানে যাতায়াত করেন। মন্দিরটি একটি ট্রাস্টির হাতে দেওয়া আছে।

হেরম্ব গোপালপুর গ্রামের বিশালাক্ষী

চব্বিশ পরগণার পাথরপ্রতিমা থানার হেরম্ব গোপালপুর গ্রামের বিশালাক্ষী সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ভিন্নরূপ। একই মূর্তি বিশালাক্ষী ও বনবিবি নামে পরিচিত। বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার যখন দেবীর পূজা হয় তখন তাঁকে বনবিবিমা বলা হয়। অন্য সময়ে এঁকে বিশালাক্ষী বলা হয়। ঠাকুরাণ নদীর এক সুঁতীর পাশে এই মন্দির অবস্থিত। দেবী বিশালাক্ষীর দুই হাত, এক হাতে কাতান, তিনি শিবের উপর দণ্ডায়মানা। তাঁর দুইপাশে দুই দাসীমূর্তি, দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, মাথায় মুকুট, সুসজ্জিতা। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা পূজা ছাড়া ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমার আগের মঙ্গলবার রাতে দেবীর বিশেষ পূজা হয়, ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠান করেন। গ্রামের মঙ্গলের জন্যই পূজা হয়ে থাকে। গ্রামদেবী রূপে বিশালাক্ষী এখানে প্রতিষ্ঠিতা। কাঠুরিয়া মৌলে-বাউলে ও মৎস্য শিকারীগণ জঙ্গলের পথে ঝড় বৃষ্টির সম্মুখীন হলে বিশালাক্ষীকে স্মরণ করেন। এঁদের মতে বিশালাক্ষী ও বনবিবি মা এক দেবী নন।[৩]

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে 'বাসলী' নামক প্রবন্ধে অষ্টাদশভুজা বিশালাক্ষীর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু চব্বিশ পরগণায় এই মূর্তি বিরল। অভিচারিকা দেবীরূপে ব্যাঘ্রবাহিনী দশভুজাদেবী বিশালাক্ষী সাগরদ্বীপে দেখা যায়। দেবীর মুণ্ড প্রতীক পূজা হয়, উত্তর চব্বিশ পরগণার অনেক থানে। হাড়োয়া থানার বিদ্যাধরী নদীর তীরে চিংড়িমারার ট্যাঁক নামক স্থানে দেবীর মুণ্ড প্রতীক আছে।

চব্বিশ পরগণার বহুস্থানে বিশালাক্ষীর পূজা হয়, কিন্তু বিশালাক্ষীর পালাগানের অস্তিত্ব সর্বত্র মেলে না। চব্বিশ পরগণার বাইরেও বিশালাক্ষীর পালাগানের বিশেষ পরিচয় লাভ করা যায় না। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত বিশালাক্ষী পালার দুটি প্রধান রূপ দেখা যায়। যথা — ১) পালাগানের রূপ, ২) গীতিনাট্যের রূপ। পালাগান হিসাবে বিশালাক্ষীর যে পালাটি চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত আছে এটি অর্বাচীনকালের রচনা। বারুইপুর থানার বেগমপুর গ্রামের শ্রী সুবর্ণ মণ্ডল পালাটি রচনা করেন। এই অঞ্চলের অনেক আসরে তিনি পালাটি গান করেছেন বলে জানান। বলাবাহুল্য সুবর্ণ মণ্ডল পালাগানের একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। বিশালাক্ষী পালা গীতিনাট্যের রূপে যেটি এই অঞ্চলে

প্রচারিত বা আসরে পরিবেশিত হয় এটির রচয়িতা হলেন আটঘরা গ্রামের গোষ্ঠ মণ্ডল। এটিও অর্বাচীনকালের রচনা। গীতিনাট্যের ধারায় এটি আসরে পরিবেশিত হয়। চব্বিশ পরগণার বহু আসরে এ পালাটি গান করেছেন বলে গোষ্ঠ মণ্ডল এক সাক্ষাতকারে জানান। পালাটিতে বহু চরিত্র থাকায় আসর পিছু অনেক খরচ পড়ে যায়, সে কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে যেখানে বিশালাক্ষী পূজা করে সেখানেই এই গানের আসর বসে বলে জানা যায়।

ক্ষেত্রানুসন্ধানে বিশালাক্ষীর যে দুটি পালা সংগৃহীত হয়েছে এ দুটির কাহিনী কাকদ্বীপ, করঞ্জলি ও মহিষাদলের বিশালাক্ষীদেবীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু এর উৎস এই অঞ্চলের প্রচলিত লোককথা। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে গোষ্ঠ মণ্ডল ও সুবর্ণ মণ্ডল এ মতের সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের বিশালাক্ষী সম্পর্কিত লোককথা ও কাঁটাবেনিয়া কাকদ্বীপের বিশালাক্ষী সম্পর্কিত লোককথা নিয়ে যে অখণ্ড কাহিনী রচনা করেছেন তাতে তাঁদের প্রতিভার উৎকৃষ্টতার পরিচয় লাভ করা যায়।

সুতরাং সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় সংগৃহীত বিশালাক্ষীর পালা দুটি সাম্প্রতিককালের রচনা হলেও এর অবয়ব গড়ে উঠেছে লোক পরম্পরাগত বিশালাক্ষী সম্পর্কিত কিংবদন্তীমূলক কাহিনী সূত্রে। এই কাহিনীর সমর্থন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বিভিন্ন প্রাচীন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেও নিশ্চিত হওয়া গেছে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে লব্ধ বিশালাক্ষীর দুটি পালাগানের মধ্যে গোষ্ঠ মণ্ডলের নিকট হতে প্রাপ্ত পালাটি সংক্ষিপ্তাকারে ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে করায় সুবর্ণ মণ্ডলের পালাটি সম্পূর্ণ উৎকলিত হল।

বিশালাক্ষীপালা (কাহিনী সংক্ষেপ)

দেবী বিশালাক্ষী পদ্মযোনী ব্রহ্মার সৃজিত ধরাধামে নিজের পূজা প্রচারের কথা ভাবলেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশে প্রথমে এলেন পাতালদেশে। সেখানে তিনি মাঝি-মাল্লাদের দুঃখদুর্দশা দূর করে তাদের কাছে নিজের মাহাত্ম্যপ্রচার করতে চাইলেন। তিনি এক বৃদ্ধার বেশ ধরে এলেন ফটিক ও কালো নামে জেলের নিকট। তাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনে ছদ্মবেশীদেবী বিদায় হয়ে গেলেন, আর সেইদিন তাদের জালে প্রচুর মাছ পড়ল। সেই সাথে দেবী বিশালাক্ষীর দারুমূর্তি তাদের জালে উঠে এল। চারিদিক স্বর্গীয় সৌরভে ভরে গেল। মূর্খ জেলেরা দেবীমূর্তি চিনতে না-পেরে তা নৌকার একধারে রেখে মাছ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাছ গুছিয়ে রেখে তারা পরদিন প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করে এবং নৌকায় শুয়ে নিদ্রা যায়। তখন দেবী স্বপ্নে কালু জেলেকে নিজের পরিচয় দিয়ে জেলেপাড়ায় দারুমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। পরদিন প্রভাতে কালু স্বপ্ন পেয়ে চিন্তা করছে, এমন সময় অভয় ঠাকুর সেখানে এসে উপস্থিত। অভয় ঠাকুর নরেন জমিদারের বাড়ির পূজারী ব্রাহ্মণ। তিনি তাদের বোঝালেন ছোট জাত জেলেদের ঘরে ঠাকুর দেবতা রাখা উচিত নয়। জেলেরা

অভয় ঠাকুরের কপট কথায় বিশ্বাস করে এবং কালু জেলে নিজেই মাথায় করে দেবীকে জমিদার নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে রেখে আসে। নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কন্যা রত্নাদেবী বিশালাক্ষীর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু রত্নার স্বামী গণেশ সম্পূর্ণ নাস্তিক। বিশালাক্ষীর প্রতি রত্নার অনুরাগ গণেশ সহ্য করতে পারেন না। নগেনবাবুর নায়েবমশাই বিপিন ঘোষালের সাথে গণেশ শলাপরামর্শ করে শ্বশুরের সম্পত্তি হস্তগত করতে চান ও ষড়যন্ত্র করে বিশালাক্ষীর পূজা বন্ধ করতে চান। বিশালাক্ষীর পূজা বন্ধের অছিলায় দেবীর ভক্ত গোলককে কৌশলে ধরে এনে জমিদার নগেন চক্রবর্তীর অন্ধ কারাগারে হাত পা বেঁধে নিক্ষেপ করেন। ঘটনা পরম্পরায় জেলেপাড়ায় পুরুষ ও মহিলা তারা লাঠিসোঁটা দা বঁটি নিয়ে জমিদারের বাড়ি আক্রমণ করে ও গোলককে মুক্ত করে নিয়ে যায়। সেই সাথে দেবী বিশালাক্ষীর মূর্তিও জেলেপাড়ায় নিয়ে চলে যায় এবং সমস্ত জেলেরা মিলে দেবীর মন্দির নির্মাণ করে বিশালাক্ষীপূজা করে। নগেন চক্রবর্তীর বিশালাক্ষীর মন্দির শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে।

এদিকে রত্না মায়ের মূর্তি মন্দিরে দেখতে না পেয়ে ঘরে দেবীঘট বসিয়ে পূজা করতে থাকেন। একদিন গণেশ রত্নাকে জানায় তাঁর অফিসের মামলার কথা, টাকা তছরুপের দায়ে চাকুরী তো যাবেই সেইসাথে জেলজরিমানা দুইই হতে পারে। এই কথা রত্নাকে জানাতে মামলার দিন দেবী বিশালাক্ষীকে পূজা করে মামলায় যেতে বলেন কিন্তু গণেশ দেবীর পূজা করতে রাজী নন। অবশেষে দেবীবিশালাক্ষী দৈববাণীতে গণেশকে জানান, "আমি জানি গণেশ, বিশ্বের আদিশক্তিকে তুমি বিশ্বাস করো না, তাই আজ তোমার অন্তরে বিশ্বাস জাগাতে শঙ্খচিল হয়ে যখন তোমার মাথার উপর ঘুরতে থাকবো তখন তুমি কোর্টের মধ্যে প্রবেশ করবে"। এই কথা শুনে গণেশ বিস্মিত হয়ে যান। দৈববাণী মাথায় রেখে মামলা করতে কলকাতায় আসেন। এদিকে রত্না স্বামীর মঙ্গলকামনায় পূজার অর্ঘ্য নিয়ে জেলেপাড়ায় বিশালাক্ষীর মন্দিরে পূজা দিতে যান। পথে বিপিন ঘোষালের লোকজন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে সাগরদ্বীপের জঙ্গলে চলে যায়। এই খবর জানতে পেরে কালু জেলের পুত্রতুল্য গোলক জেলে বন্ধুদের নিয়ে দেবীর সেবিকা রত্নাকে উদ্ধার করতে সেখানে উপস্থিত হয়। বিপিন ঘোষাল রত্নার শ্লীলতা নষ্ট করতে যখন উদ্যত হয় তখনই গোলকের দলবল সেখানে গিয়ে রত্নাকে উদ্ধার করে ও বিপিনকে বেঁধে নিয়ে করঞ্জলিতে আসেন।

মেয়ে রত্না নিরুদ্দেশ ও দেবীবিশালাক্ষীর জেলেপাড়ায় আনার বা আসার ঘটনায় জমিদার নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে যান। বহু লাঠিয়ালসহ নিজে বন্দুক নিয়ে জেলেদের উচিত শিক্ষা দিতে তিনি জেলেপাড়ায় উপস্থিত হন। তাঁর বন্দুকের গুলিতে ফটিক জেলে প্রাণ হারায়। তারপর কালু জেলেকে আক্রমণ করতে যাবে এমন সময় রত্না সহ গোলক এসে সেখানে উপস্থিত হয়। কন্যা রত্নার মুখে সব কথা শুনে নগেন চক্রবর্তীর সম্বিৎ ফেরে। নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং কালু ও গোলককে বুকে জড়িয়ে

ধরে। সবাই মিলে দেবীবিশালাক্ষীর পূজার ব্যবস্থা করেন। গণেশ মামলায় বেকশুর খালাস পেয়ে ফিরে দৌড়াতে দৌড়াতে করঞ্জলির কাঁটাবেনিয়ার জেলেপাড়ায় উপস্থিত হন। সেখানে স্ত্রী, শ্বশুর সবাইকে একসাথে দেখে ও সমস্ত অবগত হয়ে বিশালাক্ষীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ফিরে আসে। মহা ধুমধামে সেখানে বিশালাক্ষীর পূজা দেওয়া হয়। জমিদার দেবীর পূজায় বেইমান বিশ্বাসঘাতক বিপিন ঘোষালকে বলি দিতে চাইলে দেবীবিশালাক্ষী সেখানে আবির্ভূত হয়ে এই গুরুতর কাজ থেকে জমিদারকে নিবৃত্ত করেন ও সাকার মূর্তিতে তিনি সেখানে পূজাগ্রহণ করেন। সেই থেকে মায়ের পূজা প্রচার হয়। পালাশেষে বিশালাক্ষীমায়ের পূজাপ্রচারের ঘটনাসূত্রে একটি লৌকিক ধ্যানমন্ত্রেব উল্লেখ করা হয়, যা নিম্নরূপ —

ঁবিশাল বদনা দেবী বিশাল নয়নোজ্জ্বলে।
দৈত্যমাংস স্পৃহে দেবী বিশালাক্ষী নমোহস্তুতে।।
ঁপ্রাতঃকালে কুমারী, কুমুদকালী কায়া জপ্যমালা জপন্তী।
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকশিত বদনা, চারুনেত্রা বিশালা।।
সান্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিত কুচযুগা, মুণ্ডমালা পতাকা।
যা দেবী হেমবর্ণা ত্রিজগৎজননী, যোগিনী যোগমুদ্রা।।
ঁও বিশালাক্ষৈ নমঃ—

বিশালাক্ষীর গান (সম্পূর্ণ পালা)

দেবীবিশালাক্ষী যুগ যুগ ধরে ধরাধামে নিজের পূজা ও মাহাত্ম্য বজায় বেখেছেন। তিনি মহামাতৃকারূপে নরের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা। কখনো শাস্ত্রীয় দেবীদুর্গার আকৃতি ভেদ বা চণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী, কখনো তিনি চৌষট্টি যোগিনী কালীর সহচরীগণের অন্যতমা। কখনো দেবী ডাকিনী বা রঙ্কিনী রূপে ভক্তের পূজিতা আবার কখনো তিনি মানবী, ধার্মিকা নারী, দেবী নিত্যার ভক্ত। কখনো তিনি তান্ত্রিক মহাদেবী বা মহাবিদ্যা। কখনো তিনি বৌদ্ধদেবী, বজ্রজান বা সহজযানীদের উপাস্যা, আবাব কখনো তিনি সহজিয়া বৈষ্ণবদের দেবী।

হে দেবী বিশালাক্ষী মহামায়া জগৎতারিণী
হে দেবী দীনদয়াময়ী পতিতপাবনী
হে দেবী সর্বংসহা ঐশ্বর্যশালিনী
হে দেবী ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী। এস মা—

মাগো, তোমার মহিমা আমি কিছুই জানি না, তুমি কৃপা করে আমার এই আসরে এস মা। তুমি আমাকে যা বলাবে আমি তাই বলব। হে কৃপাময়ী বরাভয়দায়িনী তোমার ইচ্ছায় আমি আসরে তোমার গুণগান করি।

শুন শুন নগরবাসী শুন দিয়া মন।
ক্ষিতি মাঝে বিশালাক্ষী মায়ের পরিচয় এখন।।

উড়িষ্যার অশ্বমুখী দেবী বিশালাক্ষী।
দাক্ষিণাত্যে পূজা পান নাম বিশালমারী।।
কোথাও বা মুণ্ড মূর্তি দেবী মহামায়া।
অনুপম মুখ তাঁর ধড়হীন কায়া।।
বাঁকুড়ায় ছাতনায় দেবী আছেন বহুদিন।
বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর পূজে নিশিদিন।।
পোড়া মাছ আর নৈবেদ্য সেথা দেবীর অতি প্রিয়।
চৈত্রমাসে ভক্তগণ পূজা দিতে যেও।।
বীরভূম নান্নুরে দ্বিজ চণ্ডীদাস পূজে।
ভক্তিভাবে ডাকলে সেথা মায়ের কৃপা পাবে।।
করুণাময়ী মা যে তিনি করুণার ধারা।
ভক্তিভাবে প্রণাম জানাই তুমি জগৎ তারা।।
মেদিনীপুরে আছেন দেবী বরদা পল্লীতে।
রাজা শোভা সিংহের বংশধর পূজিত পিরীতে।।
পঞ্চ মুণ্ডির আসনে সেথা দেবীর অধিষ্ঠান।
তন্ত্রের জননী রূপে পূজে ভক্তগণ।।
হুগলী জেলার কলাছড়ায় করেন তিনি স্থিতি।
হাতি, ঘোড়া ছলন পেলে হন বড় প্রীতি।।
ষোড়শ উপচারে যেবা দেবীর পূজা দেয়।
বিশালাক্ষী দয়াময়ী রাখেন তাঁর পায়।।
বারুইপুরে আছেন দেবী যুগ যুগ হতে।
চৌধুরী জমিদার বাড়ী পূজে শুদ্ধ মতে।।
আদিগঙ্গার পথ বেয়ে যত বেনে যায়।
হেথায় নামিয়া মায়ের বহু পূজা দেয়।।
পাথরপ্রতিমা থানা সুরেন্দ্রনগর গ্রাম।
তথায় বিশালাক্ষীর বিবিমাতা নাম।।
সেথা তন্ত্রমতে পূজা পায় দেবী বিশালাক্ষী।
সব জাত পূজা দেয় হয়ে শুদ্ধ মতি।।

বহু আনন্দে আছেন দেবী কাঁটাবেনে গ্রামে।
সেথায় আছেন দেবী বিশালাক্ষী নামে।।
আড়াই সের চালে সেথা নিত্যসেবা হয়।
ব্রাহ্মণ আলয়ে দেবী পরম সুখে রয়।।
নয়াপুকুর মলঙ্গার নিকট বিশালাক্ষীর থান।
বৎসরান্তে পূজা দেন যত ভক্তিমান।।
কাকদ্বীপের বিশালাক্ষী অনন্তকাল আছে।
নদীপথে যারা যায় পূজে তাঁর কাছে।।
হাওড়ার শাঁকরাইলে দেবীর নিত্যপূজা হয়।
সাক্ষাৎ জননীরূপে দেবী সেথা রয়।।
পাতালদেশে বিশালাক্ষী অতি মনোহরা।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন অসীম তাঁব দয়া।।
আরও কত স্থানে আছে দেবীর লীলাক্ষেত্র।
কত আর বর্ণিব বল স্বল্প জ্ঞান মাত্র।।
বিশালাক্ষী মহাদেবী জগতের সাব।
কবি সুবর্ণ গান করে বিশালাক্ষী মার।।

বিশালাক্ষীর বন্দনা

কি বন্দিব শিশু আমি স্বর্গ ছেড়ে এস তুমি
(ওমা) অবনীতে এস বিশালাক্ষী।
কে জানে তোমারি তত্ত্ব তুমি নিত্য তুমি সত্য
জিনি কুন্দ দশন উজ্জ্বল।
সৌম্য বদন ছবি যেন প্রভাতের রবি
শ্রুতি মূলে সুবর্ণ কুণ্ডল।
তথা বলি কর্ম জ্যেষ্ঠ (?) তাহা জিনি যুগ্ম ওষ্ঠ
পক্ক বিম্ব পায় তিরস্কার।
নাসামূলে দোলে মতি গৃধিনী জিনিয়া শ্রুতি
চামর নিন্দিত তব কেশ।
মুখে হাস্য মৃদু মন্দ বাহু পরে বাজুবন্দ

করে শঙ্খ সুবর্ণ কঙ্কণ।

কণ্ঠে হার গজমতি মণি মুকুতা পাতি

কঙ্কন কিঙ্কিণী ঝনঝন্।

শ্রুতি রূপা দক্ষ কর (?) পরিধানে পীতাম্বর

পায়ে বাজে সোনার নূপুর।

আসরে থাকি আজ উরগো জগৎ মাঝ

নায়েকের বিঘ্ন কর দূর।

কবি সুবর্ণের গান বেগমপুরে যার ধাম

পিতা ঈশ্বর গোপাল মণ্ডল।

গীত।। জয়মা তারিণী জগৎজননী তুমি দীনহীনের মাতা—

ডাকি বারে বারে এস গো জননী পূজিব তোমার চরণ দুখানি

দয়া কর মোরে জগৎ জননী দানব দলনী মা আমার—

করুণা করিবে অভয় দিবে যত জীবে তোমার চরণ পূজিবে

দেখা দাও মোরে আজিকার আসরে গাইব তোমার গুণগান।

জাগরণ

কথা।। একদিন হরগৌরী কৈলাসে একাসনে বসে আছেন। দেবী হরের পদসেবা করছেন মনের ভক্তিতে। হঠাৎ গৌরীর নয়ন হতে অশ্রু ঝরে পড়ল শিবের চরণে। চমকে উঠে শিব শক্তিকে বলছেন — প্রিয়ে ,তোমার অশ্রু ঝরে পড়ল মোর চরণে, কি দুঃখ হয়েছে প্রিয়ে, বল না আমারে।

গৌরী : প্রভু, অবনীর মাঝে আছে অমূল্য ধন নর, বারবার যেতে ইচ্ছা হয় তাদের মাঝে। মানবের কল্যাণ করি মোর পূজা প্রচারিব। কৃপাকরি প্রাণনাথ আজ্ঞা দেহ মোরে।

হর : হরগৌরী এক আত্মা জানে সর্বজনে, কেমনে দিব যে বিদায় বল না আমারে! যাও ব্রহ্মা আছেন ব্রহ্মালোকে, আজ্ঞা লহ তাঁর সনে।

কথা।। এত শুনি গৌরীদেবী শিবে প্রণমিয়া, চলিল ব্রহ্মালোকে চিন্তিত হইয়া।

গীত ।। মাতা চলে ধীরে ধীরে হেঁট মুণ্ড করি গো

ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মার কাছে চলে ধীরে ধীরে গো

চিন্তাবেশে চিন্তাময়ীমা ভাবেন মনে মনে গো

কেমনে জানাব আমি ব্রহ্মার নিকটে গো

ঐ ভাবিতে ভাবিতে মাতা গেল ব্রহ্মার নিকটে গো। (মাতন)

কথা ॥ ভাবতে ভাবতে মাতা ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে, ব্রহ্মাকে স্তুতি করছেন ...

ওঁ রক্ত বর্ণং চতুর্মুখং, দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরং,

হংসবাহন দেবং, ব্রহ্মাণং নাভৌ ধ্যায়েৎ।

ব্রহ্মা ঃ কে তুমি, কি কারণে ভাঙলে মোর ধ্যান, কি চাও হেথা?

মাতা ঃ ঠাকুর, মনে বড় আশা জেগেছে, মানবসমাজে গিয়ে তাদের কল্যাণ করে ঘরে ঘরে পূজা প্রচার করব। আজ্ঞা দিন প্রভু।

ব্রহ্মা ঃ যাও দক্ষিণবঙ্গে। সেথা পাতালদেশ করেছি সৃজন। তথা গিয়ে ঘরে ঘরে দাও কল্যাণদৃষ্টি। অবতার হয়ে সেথা কর পূজা সৃষ্টি।

কথা ॥ আদেশ পেয়ে মাতা কৈলাসেতে গেলেন, মহেশ্বরকে ডেকে মাতা বলতে লাগলেন।

মাতা ঃ প্রভু, দক্ষিণবঙ্গে পাতালদেশে যেতে আজ্ঞা দিলেন ব্রহ্মা, এবার আপনি বিদায় দিন ,যাই ত্বরা করে।

হর ঃ যাও প্রিয়ে, তোমা বিনে শূন্যঘর রইল মোর পড়ে, পূজা শেষে ফিরে এস কৈলাস শিখরে।

গীত ॥ আমি যাই যাই যাই প্রভু সে পাতাল ও দেশে

পূজা নিয়ে ঘরে ঘরে আসিব কৈলাসে।

আশীর্বাদ কর প্রভু আসন যেন পাই

কি বেশে যাইবে মাতা ভাবেন মনে তাই।

বিদায় হয়ে মাতা তখন চলেন পাতালদেশে—

কথা ॥ বিদায় হয়ে মাতা পাতালদেশে যায়, ভোলানাথ মনে মনে এই কথা কয়।

আমাকে রেখে তুমি পূজা নিতে যাচ্ছ, আমিও পরে যাব। এবার মাতা ভাবছেন কি বেশে তিনি যাবেন। সেই পরামর্শ নিতে তিনি বিষ্ণুর কাছে গেলেন। মাতা বিষ্ণুকে বলেন — ঠাকুর, পাতালদেশ ব্রহ্মা সৃজন করেছেন, তথায় পূজা প্রচারিতে মন করেছি। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর মোরে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু কি বেশে সেথা যাব তা আমাকে বলে দিন।

এত শুনি বিষ্ণু তখন ধ্যানে রত হইল

মাতাকে ডাকিয়া তখন বলিতে লাগিল।

নহে কালি, নহে দুর্গা, নহে ত চামুণ্ডা

মধ্য বেশা হয়ে তুমি পূজা লও সেথা।

কথা ॥ এইকথা শুনে মাতা বিদায় হয়ে যায়, বিদায়কালে বিষ্ণুদেব এই কথা কয়।

হরগৌরী পাতালদেশে পূজা প্রচার করতে চলেছে, আমি সেথা যাব, দেখব কেমনে পূজা লয় নরের ঘরে ঘরে। মাতা বিশালাক্ষী তখন দক্ষিণবঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

গীত ।। মাতা চলে ধীরে ধীরে হস্তে খড়্গা ধরি গো মাতা চলে পাতাল দেশে গো—

বামহস্তে খড়্গা নিল মা, আর হস্তে ডালা গো পাতালদেশে গো—

আর হস্তে পদ্ম নিল মা, অন্য হস্তে ঘণ্টা গো পাতালদেশে গো—

মস্তকেতে স্বর্ণচূড়া মার, গলে স্বর্ণমালা গো পাতালদশে গো—

এলাইয়া কেশরাশি পায়ে সোনার নূপুর গো পাতালদেশে গো—

মহিষাদলে আসি মাতা উপনীত হল গো পাতালদেশে গো—

কথা।। মহিষাদলে এসে মাতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার রূপধারণ করে ধীরে ধীরে এক জেলেপাড়ায় উপনীত হন। দেখেন, এক দরিদ্র জেলে একগাছা জাল নিয়ে মৎস্য ধরতে যাচ্ছে। তাকে দেখে মাতা এই কথা কন। ও বাপু জেলে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

জেলে : কেগা বাছা তুমি? ঐটুকা মেয়ে, একা কোথায় যাচ্ছ? তোমার মা-বাপ লাই।

মাতা : আমার মা-বাপ স্বর্গে। তোমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবে?

জেলে : আহারে! ঐটুকা বাচ্ছা মা-বাপ বিহনে পথে পথে ঘুরি বেড়াচ্ছে। তা ওবাছা, আমি এই বুড়ো মানুষ, খাটতিখুটতি পারিনে, নদীতে মাছও তেমন হয় না, দুবেলা পেটে অন্নও জোটে না, বুড়ীটা শুকিয়ে মরছে। তোরে কোথায় নেযাব বাছা।

মাতা : নিয়ে চল না বাবা, আমি আজ তিনদিন কিচ্ছু খাইনি। আমায় দুটো খেতে দিলে তোমার খুব ভালো হবে।

জেলে : এ্যাঁ, বাবা বলছ? সারাজীবন ছেলেপিলের মুখ দেখিনে, বুড়ো বয়সে কি ঝকমারীতে পড়লাম রে বাবা! তা চলো— আমার যদি একমুঠো হয়তো তোমারও এক মুঠো হবে। তবে আমার যা জুটবে তোমার কিন্তু তাই খেতি হবে বাপু।

মাতা : হ্যাঁ বাবা, তুমি ভক্তি করে যা দেবে আমি তাই খাব।

কথা।। মাকে সঙ্গে নিয়ে জেলে বাড়ীর দিকে যায়, জেলেনী বাড়ীতে বসে এই কথা কয়। হায়রে পোড়াকপাল আমার, সারাটাজীবন দুঃখু-কষ্ট আর গেলুনি। একটা ছেলে পিলেও হলুনি, বুড়োবয়সে মাছ ধরতেও পারে না। আজ দুদিন প্যাটে অন্ন গেলুনি, না খেয়ে আর কতদিন বাঁচব? এর থেকে বিষ খেয়ে মরা অনেক ভাল।

জেলে : বউ ও বউ।

বৌ : ঐ বুড়োঢোকনা আবার ফিরে আসছে। একখুনি তো গেল, তা মাছটা ধরল কখন। আজ আবার শুধুহাতে এলে হয়, ব্যবস্থা করে ছাড়ব।

জেলে : বউ তুই তাড়াতাড়ি দোর খুলে ফাঁকে আয়, দেখ কি কাণ্ড বেধেছে।

বৌ : ওসব কাণ্ডফাণ্ড রাকো, আগে কি এনেচ দাও। আর খিদে সহ্য হয় না।

জেলে : দুত্তোর, এখনো নদীতেই যাইনি, আর খাওয়া! তুই আয় দেখবি তো আয়।

বৌ ঃ দেখ দেখ, বুড়ো ঢঙের আক্কেল দেখ। নিজেদের প্যাটে ভাত জোটে না, আবার এক সং এনে হাজির করেছে। তা বলি হ্যাগো বাছা, তোমার কপালে দুটো চক্কু নি ? কত সুট-বুট-পরা বাবুরা যাচ্ছে, ওদের কাছে খেতে চাইতি পারনি। একতালা দুতালা বাড়ী রয়েচে, সেখানে যেতে পার নি। আমরা খেতে পাইনে আর আমাদের কাছে এয়েচ মরতি।

মাতা ঃ না মা। ধনীর অহংকারের অন্ন আমার আবার সহ্য হয় না। গরীবের চোখের জলে-ভেজা খুঁদ অন্ন আমার খেতে বড় ভালো লাগে মা।

বৌ ঃ অ্যাঁ, তুই আমাকে মা বলে ডাকলি ? আমরা আঁটকুড়ো মানুষ। আমাকে মা বলে ডাকার কেউ নেই, তুই আমাকে মা বলে ডাকলি।

জেলে ঃ বউ, ও বড়ো আশা করে আমার সঙ্গে এয়েছে রে! ওকে কিছু বলিসনি। তাড়াতাড়ি যা আছে কিছু খেতি দে।

বৌ ঃ ঘরে কি আছে যে তাই ওকে খেতি দিবো ?

জেলে ঃ কিছু নেই ? থাম্ থাম্, পাড়াতে গে দেখি, কারোর হাতেপায় ধরে প'খানেক খুঁদ ধার করে আনতি পারি কি।

বৌ ঃ আজ মঙ্গলবার, কেউ কি তোমায় ধার দেবে ?

মাতা ঃ কেন মা, তোমার ঘরে তো কিছু আছে। তাই আমায় খেতে দাও না মা।

বৌ ঃ ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েচে। পয়লা বোশেকে দুটো ভালোভাত খাবো বলে অনেক দিন আগে একখুঁচি চাল ভাঁড়ে করে লুকিয়ে রেখিছি।

মাতা ঃ ঐ চাল রান্না করে দাও না মা, বাবা এবার অনেক চাল কিনে আনবে দেখো।

বৌ ঃ তবে এক কাজ করি, ঘরের পেছনে একটা মানকচু বড় হয়েছে, ওটা তুলে আনি, ভাতে দে ভাত রেঁধে দিই।

জেলে ঃ তবে তাই কর, আমি ততক্ষণ একছানা জাল টেনে আসি। যদি কিছু হয়।

মাতা ঃ দাঁড়াও বাবা, তুমি তো আজ দুদিন কিছু খাওনি।

জেলে ঃ তাতে কি হয়েছে মা, ও আমার বেশ ওব্বেশ আছে।

মাতা ঃ দাঁড়াও বাবা। মা ? তোমার সেই চাল থেকে দুটো চাল আর এক গ্লাস জল দাও।

বৌ ঃ আচ্ছা দিচ্ছি মা।

কথা॥ জেলেবউ এক গ্লাস জল আর চার-ছটা চাল এনে মায়ের হাতে দিল, মায়ের হাতের ছোঁয়ায় চাল অমৃত-সমান হল। সেই চাল-জল মাতা জেলেকে খেতে দিয়েছিল।

জেলে ঃ আ-হা-হা-হা, এ যে সুধামত লাগল। আমার পেট যেন ভরে গেল। বউ রে, এ চাল তুই কোতায় পেয়েচিস রে ? আমার গায় যেন বলশক্তি হল রে। আজ আমি দেখব কোথায় মাছ আছে।

মাতা : হ্যাঁ বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি এস। এলে একসাথে খাবো।

জেলে : না মা, নদীতে এখন মাছ হয় না, কখন আসব তার কোন ঠিক নেই। তোমরা খেয়ে নিও। দেরী কোরো না।

কথা।। এই বলে জেলে একগাছা জাল ঘাড়ে নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেল।

জেলে : ওরে বাবা! একটানে এত মাছ! এতো বয়ে নেযান দায়। আজ আমার বউ আমার খুব ভালোবাসবে। বলি ও বউ, বউ রে — বাইরে বেরো, বাইরে বেরো!

বৌ : বুড়ো ঢোকনা আবার বোধহয় ফিরে এল। একখুনি গেল, দেখি আবার কোন কাণ্ড করে ফিরল। বলি কি হয়েছে?

জেলে : এই দেখ্ কত মাছ!

বৌ : এত মাছ কোথায় পেলে গো?

জেলে : ওরে বাবা! একটানা দিচি, মাছ যেন গুইলে আসতিচে।

বৌ : তাহলে সোনা মেয়েটা এয়েছে বলে গো। মেয়েটার খুব আয় পায় আছে গো।

মাতা : হ্যাঁ মা, আমি জন্মে মায়ের মুখ দেখিনি। বাবা স্বর্গে যাবার সময় বলেছিল, মা, তুই যেখানে যাবি তোর অন্নের কষ্ট হবে না।

বৌ : ভাল হয়েছে মা, তুই যখন এই গরীবের ঘরে এইচিস, আমাদের ঘরজোড়া হয়ে থাক মা। আমি তোর বে'দে ঘরজামাই করে রাখব।

মাতা : হ্যাঁ মা, আমি যখন এসেছি, আমায় রাখলে তোমাদের পাড়া ছেড়ে যাব না।

কথা।। এইরূপে মা আমার জেলের ঘরে থাকে। জেলেদের পাড়ায় খুব উন্নতি হয়। গ্রামের হাল কিছু চেনা যায় না। মেদিনীপুরের মহিষাদলের রাজা শোভাসিংহের সেনাপতি নৌকায় করে হাওয়া খেতে বার হয়। ঘুরতে ঘুরতে নদীতীরের জেলেপাড়ার দিকে আসে। জেলেদের বাড়ীঘর দেখে সেনাপতি অবাক হয়ে যায়। রহস্য জানার জন্য এক ভিখারীর বেশধারণ করে জেলেপাড়ার মধ্যে ঢোকে।

ভিখারী: মা, দুটো ভিক্ষে পাই মা, আজ দু'দিন কিছু খেতে পাইনি মা।

বৌ : বলি ও বাছা, তুমি কোথা থেকে আসচ হ্যাঁ?

ভিখারী: নদীর ঐ পারের ঐ গ্রামটা থেকে আসছি মা। এমন পাপী রাজার দেশে-দুটো ভিক্ষেও জোটে না মা। দুটো খেতে দেনা মা।

কথা।। মাগো, মেয়েদের স্বাভাব কি মরলেও যায়? সুযোগ পেলে পেটের সব কথা কয়। একে একে ভিখারীর কাছে সব কথা বলে।

বৌ : ও বাছা, আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে এয়েছে। তার দোয়ায় সবাই খেতিপরতি পারতেচে। তুমি একেনে একটা ঘরবেঁধে থাক। তোমাকে আর ভিক্ষে করতি হবি নি।

ভিখারীঃ আচ্ছা মা, আজকে আমি যাই। আমার যা কিছু আছে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে কাল চলে আসব।

কথা ॥ এই কথা শুনে সেনাপতি নগরে ফিরে যায়। মহারাজকে ডেকে তখন এই কথা কয়। মহারাজ, আমি মহিষাদলে গিয়েছিলাম। সেখানকার জেলেরা বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে গেছে। প্রত্যেকের বাড়ী ঘর হয়েছে, আর আনন্দের সীমা নেই।

রাজা ঃ সে কি? কেমন করে তারা ধনবান হল।

সেনাপতি ঃ আমি শুনে এসেছি, কোথা থেকে নাকি একটা মেয়ে এসেছে, তার দয়ায় তাদের এই অবস্থা।

রাজা ঃ তারা মহাজনের কাছ থেকে টাকা সুদে নিত, জাল-ছড়া বাঁধা দিত, তুমি এক কাজ কর সেনাপতি, তুমি যেমন করেই হোক জেলেপাড়া থেকে মেয়েটাকে ধরে আমার এই রাজপ্রাসাদে এনে দাও।

কথা ॥ এই কথা শুনে সেনাপতি মহিষাদলে যায়, অন্তর্যামী মা বিশালাক্ষী অন্তরে দেখিবারে পায়। স্বপ্নযোগে বিশালাক্ষী সবার এই কথা কয়।

গীত ॥ ওঠো ওঠো জেলে জোলা উঠে দেখ চোখে রে

তোদের মাকে লয়ে যাবে রাজার লোক আসে রে

অভয়ারূপে এসেছিলাম অভয় দিতে এই গ্রামে

মোরে জোর করে লয়ে যাবে উঠে রক্ষা কর রে

মহাপাপী শোভা সিংহ কু-আশা করেছে ভেজন

কু-আশা জেগেছে যখন অকালেতে মরবে সে।

কথা ॥ মায়ের স্বপ্ন পেয়ে জেলেরা সব ঘুম থেকে উঠে পড়ে। তারা ছুটে আসে বালিকা-বেশী বিশালাক্ষীর কাছে। দূরে সত্যসত্যই দেখে রাজার লোকজন সৈন্যসামন্ত জেলেপাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। তখন তারা বালিকাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এসে রক্ষার উপায় জানতে চায়। তখন মাতা বলে —

রাজার লোকজন আমায় ছুঁতে নাহি পারবে

মহিষাদলে পা দিতেই আমার দেহ নুড়ি শিলা হবে।

আজ থেকে যত জেলে মোর নুড়ি পূজা করবে

ভক্তি ভরে নুড়ি পূজলে বিপদ নাহি হবে।

দেখতে দেখতে রাজার লোক জেলেপাড়া ঘিরল

জেলে-জেলেবৌ সব উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগল।

সেনাপতি : সৈন্যগণ, তোমরা জেলেপাড়া ঘিরে রাখো। আর ঘরে ঘরে খোঁজ কর, কোথায় সেই বালিকা? বৃদ্ধজেলেকে প্রহার করে জানতে চাও কোথায় রেখেছে তাকে?

দোহার : এই বুড়ো, মেয়েটিকে কোথায় রেখেছিস?

১ম দো : আমি তো জানি নে বাবা, সে কোথায় গেছে।

২য় দো : জানো না (মারিতে লাগিল), বল কোথা সে মেয়েটি?

১ম দো : মাগো—কোথায় গেলি মা। একবার এসে দেখ তোর বুড়ো বাপের দুর্দশা।

মাতা : দাঁড়াও, ঐ বুড়ো মানুষটাকে মেরনা। আমি সেই বালিকা, নিয়ে চল মোরে।

দো : ভাই সব, ঐ মেয়েটিকে বন্ধন করে নিয়ে চল।

কথা ॥ রাজসৈন্য বালিকাকে যেই ধরবার জন্য যায়, সঙ্গে সঙ্গে মা আমার অন্তর্ধান হয়। অসংখ্য শিলারাশি সৃষ্টি যে হল, অবাক হয়ে পাত্রমিত্র মায়ের লীলা দেখল।

দো : ভাই সব, আশ্চর্য ব্যাপার, কোথা গেল সে বালিকা? পড়ে রইল শুধু অসংখ্য শিলা? চল ,মোরা যাই রাজার কাছে। সবকথা নিবেদন করি তাঁর কাছে।

কথা ॥ এই কথা বলে তারা দেশে ফিরে যায়। মহারাজকে ডেকে তখন এই কথা কয়। মহারাজ, অপূর্ব সুন্দরী বালিকা দেখেছি, এই নয়নে। জোর করে তারে যেই ধরিবারে যাই, নিমেষে মিশিয়া যায় বাতাসের গায়। অসংখ্য শীলা নুড়ি পড়ে থাকে সেথা, আমাদের সব চেষ্টা হয়ে গেল বৃথা।

রাজা : কি অভূতপূর্ব কথা শোনালে মোরে। কাল প্রভাতেই যাবে সেই মহিষাদলে। নুড়ি যত পড়ে আছে আনিবে হেথায়। কিছুমাত্র না পড়ে থাকে ঐ জেলেপাড়ায়।

কথা ॥ এই বলে মহারাজ সুখে নিদ্রা যায়, দয়াময়ী মা আমার শিয়রে বসে স্বপন দেখায়।

গীত ॥ শোন শোন শোভা সিংহ শুনরে স্বপনে —
আমি মাতা বিশালাক্ষী আছি ত্রিভুবনে
দীন হীনে কৃপা করতে এসেছি এখানে।
বাহুবলে কেহ মোরে নারিবে জিনিতে
ভক্তিভরে ডাকলে পরে থাকি তার ঘরে।
অহংকারীজনের থেকে থাকি বহু দূরে
ভক্তি যদি থাকে তোর পাইবি আমারে।
এ জনমে নাহি পাবি জন্মান্তরে পাবি
ব্রাহ্মণের কুলে জন্মে মোরে পূজা দিবি।
জেলেপাড়ায় গিয়ে যদি কর অনাচার
সবংশে নিব্বংশ হবি বলে যাই তোমার।

কথা ॥ এই বলে মা আমার অন্তর্ধান হলেন। দেখতে দেখতে নিশি প্রভাত হয়ে গেল। নিদ্রা ভেঙে শোভা সিংহ ভাবতে লাগল— সে কি! মাতা বিশালাক্ষী এসেছে আমার রাজ্যে অথচ আমি এমন পাপী যে তাঁর চরণ দর্শন না করে তাঁকে অপমান করলাম। আমি নিজেই যাব সেই মহিষাদলে। মায়ের চরণধুলা নিয়ে নিজের প্রায়শ্চিত্ত করব। আর মা যদি দেখা দেন তবে তাঁকে নিয়ে এসে আমার সুবর্ণ মন্দিরে স্থাপন করে নিত্য পূজা করব।

কথা ॥ এই বলে কত আড়ম্বর করে মাকে আনতে রাজা চলেছেন।

গীত ॥ রাজা চলে তখনি গো রাজা চলে তখনি
ঐ মাকে আনতে মহারাজ চলে দ্রুতগতি গো
কতই বাদ্যবাজনা চলে, রাজার পশ্চাতে গো
আর দামামা দুন্দুভি বাজে, পাখোয়াজ সারাঙ্গি গো
আর কত শত শঙ্খ বাজে, ঘন্টা ঝাঁঝরি গো
সেতারা বেহালা বাজে, পিয়ানো, কানাড়া গো
ঐ জয় জয় ধ্বনি ওঠে, রাজসৈন্য মাঝে গো। (মাতন)

কথা ॥ এইভাবে রাজা মাকে আনতে চলেছেন। এদিকে ছদ্মবেশী বিশালাক্ষীমাতা জেলেকে ডেকে বলছেন, বাবা, রাজা কত সাজসজ্জা করে আমাকে নিতে আসছে। আমি রাজাকে ধরা দেব না। নুড়ি রূপে আমি আর থাকব না। আমি বিশালাক্ষীমূর্তি ধারণ করব। সেই মূর্তিকে তোমরা জেলেপাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলে পূজা দিয়ে রাজা আসার আগেই নদীর জলে বিসর্জন দিবে।

জেলে ঃ মাগো, তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি মা।

মাতা ঃ দুঃখ কোরো না বাবা, তুমি যখন যেভাবে আমাকে ডাকবে আমি যেখানেই থাকিনা কেন তখনই এসে দেখা দেব।

কথা ॥ মা আমার করুণাময়ী। যুগে যুগে কত রূপধারণ করেন। কখনোও বা দুর্গা, কখানোও কালী, কখনোও মা চামুণ্ডা, কখনোও বা চতুর্ভুজা গলে মুণ্ডমালা, কখনো তিনি সিংহবাহিনী দশপ্রহরণধারিণী আবার কখনো তিনি ব্যাঘ্রবাহিনী নারায়ণী, আবার কখনো দেবী অশ্বমুখী, কখনোও বিশালমারী। এবার তিনি যে রূপধারণ করলেন —

দেবীর পদতলে যেন শিব পড়ে আছে শব
তার উপর নৃত্য করে দেবী মনোহর।
চতুর্ভুজা দেবী তিনি রূপে অনুপমা
জগৎজোড়া খ্যাতি তাঁর ত্রিগুণাতীত গুণা।
দেবীর দক্ষিণহস্তে শোভে বিশাল খড়্গ খরতর

অপর হস্তে ঝুলছে এক ঘণ্টা বৃহত্তর।
বামহস্তে বাজায় মাতা দিব্য মঙ্গলশঙ্খ
অপর হস্তে ধরে আছেন জীবের কৃপাপাত্র।
বিশালাক্ষী গৌরবর্ণা মাথায় বিশাল চূড়া
পট্ট বস্ত্র অঙ্গশোভে যতই থাকুক খাঁড়া।

কথা॥ এইরূপে মা বিশালাক্ষী নুড়ি থেকে দিব্যমূর্তি ধারণ করলেন। তখন জেলে জেলেনীকে বলে—ওরে বউ, আর কেঁদে কি হবে, মাকে তো ভাসিয়ে দিতে হবে, চল, মায়ের কথামতো পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করে মায়ের পূজা দিই আর যত জেলে আছে তাদের মায়ের ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিই।

গীত ॥ ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী বিশালাক্ষীর পূজা দিব
কোলের সন্তান সুখে রবে মায়ের নামে ভিক্ষা দিলে
হাতের শঙ্খ লোহা হবে মায়ের নামে ভিক্ষা দিলে
জরা ব্যাধি মুক্তি হবে মায়ের নামে ভিক্ষে দিলে
হারানিধি ফিরে পাবে মা, মায়ের নামে ভিক্ষা দিলে।

কথা॥ এইভাবে ভিক্ষা করে সমস্ত পাড়ার লোক পূজা আরম্ভিল। পূজা শেষে মাকে মাথায় নিয়ে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে জেলেরা নদীতে ভাসাতে যায়। এমনসময় শোভাসিংহ জেলেপাড়ায় পৌঁছান। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। অবশেষে দেখেন গ্রামবাসী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছে। তখন শোভাসিংহ রাজা কাঁদতে কাঁদতে বলে—বল বল ভাই সব, মাকে তোমরা কোথায় রেখেছো? মাকে আমায় দাও, মাকে আমার পবিত্র মন্দিরে রেখে নিত্যপূজা দেব।

সমবেত : ওগো পাপী রাজা, তোমার জন্যে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, এই নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম। ঐ দেখ মায়ের দিব্যমূর্তি জলে ভেসে যাচ্ছে।

রাজা : কি বললে, তোমরা মাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছ? মাগো, আমি তোর অজ্ঞান ছেলে। একটি বার আমায় দেখা দে মা।

কথা॥ রাজা তখন পাগলের ন্যায় কাঁদতে লাগল, তাই দেখে দয়াময়ী মায়ের দয়া উপজিল। দিব্যমূর্তি নিয়ে মাতা জলের উপর উঠে সবাইকে দেখা দিলেন। মাকে দেখে তখন রাজা মা মা বলে মূর্ছা গেলেন। মুহূর্তে মাতা জলের ঘূর্ণিপাকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হতবাক হয়ে সবাই বাড়ীতে ফিরল, রাজার প্রাণবায়ু কাঁটাবেনিয়ায় এক ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম নিল। এদিকে মা বিশালাক্ষী ভাসতে ভাসতে ভাবতে লাগলেন।

গীত ॥ ভাসতে ভাসতে জননী ভাবে মনে মনে
দীন হীনের কল্যাণ আমি করিব কেমনে।
মহিষাদলের ধীবরেরা নারিল রাখিতে
পুনরায় ধরা দিব জেলেদের হাতে।

এইভাবে দীর্ঘদিন দেবী সলিলেতে রয়
অবশেষে অনন্ত জেলেকে স্বপনেতে কয়।
আমি দেবীবিশালাক্ষী ভাসি জলের পরে
করুণা করিব যত দীনহীন নরে।
এই কথা বলে মাতা অদৃশ্য হয়ে যায়
মুহূর্তে অনন্ত জেলের ঘুম ভেঙে যায়।

কথা ॥ একদিন কাঁটাবেনের দরিদ্র অনন্ত জেলে নৌকাযোগে নদীতে জাল টানতে গেল। দয়াময়ী মায়ের দয়া উপজিল। বহু মাছেব সাথে দেবী অনন্ত জেলের জালেতে আটকাল। একা জাল টেনে তুলতে পারল না।

দোহারঃ ওরে হেবলো, দাঁড় ছেড়ে জাল ধর, তুলতে পারছি না রে।

২ দো ঃ তুই টান-টান আর নেকামো করিস নে। দু-চারটে চাঁদা চুনো পড়েছে কিনা, বলে জাল তুলতে পারিনে। মরানি কোটাল, ঢেরাতো ঘোরে না। বৌ-ছেলে এবার না খেয়ে শুকিয়ে মরবে। ঠাকুর কতদিন এভাবে চালাবে জানিনে। তুই জাল এখন ছেড়ে দে— আরও দু'চারটে পড়ুক।

দো ঃ ওরে না না, একবার জালটা ধরে দেখ না, আমি জালটা ধরে রাখতি পারিনে।

২ দো ঃ কই দেখি! হ্যাঁ তাই তো। কত মাছ পড়েছে রে। টান টান।

দো ঃ ওবে ভাই, মাছ তো বহু পড়েছে, কিন্তু ওটা কি র‍্যা? হাত পা মতো দেখা যাচ্ছে, মড়া নাকি র‍্যা?

২ দো ঃ যা হয় হোক, টেনে তোল। পরে দেখা যাবে। নে হয়েছে তো? দেখ, জালটা একটু কাত করে দেখ, ওটা কি?

দো ঃ ওরে, একটা ঠাকুর রে। ঐতো হাতে শঙ্খ, ঘণ্টা, খড়্গ। পায়ের তলায় আবার ঐ মহাদেবের মত কি শুয়ে রয়েছে? মূর্তিটা মনে হয় কালী-টালি হবে।

২ দো ঃ দুর দুর, বাপের কালে শুনিনি কালীর হাতে শঙ্খঘণ্টা থাকে।

দো ঃ নে, যা হয় হোক, নৌকার এক ধারে রাখ। মাছগুলো ঝেড়ে নে, অনেক রাত হয়ে গেছে, ঘুমুতি হবে। আবার তো ভোরে মাছ বেচতি যাবি, তাড়াতাড়ি নে।

গীত ॥ ভেটকী ইলিশ পমপ্লেট আর গাঙবোল
বাগদা ট্যাংরা পারশে আর গাঙশোল।
নিহেড়ে মোচাচিংড়ি, আর চিতলমাছ
ফ্যাঁসা, বোগো, তরোয়াল আর ট্যাঁপামাছ।
সেই সঙ্গে ওঠে জালে বিশালাক্ষীদেবী
দেখে শুনে জেলেরা সব পটে আঁকা ছবি।

কথা ॥ এইভাবে মাকে তারা নৌকাতে রাখল। মাছচিংড়ি গুছিয়ে রেখে সুখে নিদ্রা গেল। সেইসময় মা আমার স্বপনে বলতে লাগল।

গীত ।। শুন শুন বলি অনন্ত শুনরে স্বপনে— অনন্ত শুনরে স্বপনে
আমি দেবীবিশালাক্ষী গো উঠেছি তোর জালে রে— অনন্ত শুনরে স্বপনে
প্রভাতকালে উঠে জেলে লয়ে যাবি তীরে রে— অনন্ত শুনরে স্বপনে
পত্রের কুঠি নির্মাণ করে রাখিবি আমারে রে— অনন্ত শুনরে স্বপনে
যাহা পাবি হাতের কাছে তা দিয়ে পূজিবি রে— অনন্ত শুনরে স্বপনে
ভক্তিভাবে পূজা দিলে তোর সোনার সংসার হবে রে—অনন্ত শুনরে স্বপনে।

কথা ।। দেখতে দেখতে নিশি প্রভাত হয়ে গেল, নিদ্রা ভেঙে অনন্ত জেলে চমকে উঠল, স্বপনের কথা জেলে ভাবতে লাগল। * * *

অনন্ত : ওরে! কাল রাতে জালে যা উঠেছে, ওটা মা বিশালাক্ষী ঠাকুর। জাল চাপা দিয়ে রেকিচিস? শিগগির নৌকো তীরে নে চল। একখুনি মায়ের থান তৈরী করে পূজা দেব।

কথা ।। এই বলে তারা নৌকা নিয়ে তীরেতে পৌঁছাল, বনের কাষ্ঠ আর গাছের পাতা দিয়ে ঘর নির্মাণ করল। মাকে ধরাধরি করে তারা সেই ঘরেতে বসাল। অনন্ত হেবলোকে ডেকে বলতে লাগল।

অনন্ত : ওরে হেবলো, মায়ের থান হোলো, পূজা দিতি হবে, তুই বন থেকে চাড্ডি ফুল তুলে নে আয়।

২ দো : আরে ভাই শুধু ফুল দিয়ে পূজা দিবি? ডালা দিবি নি?

অনন্ত : আচ্ছা সে আমি দেখচি, তুই ফুলটা নেআয়।

কথা ।। হেবলো ফুল তুলতে গেল। অনন্ত তখন মনে মনে ভাবছে, আমি এখন মায়ের ডালা দেব কি দিয়ে। মা তো বলেছে, যা হাতের কছে পাবি তাই দিয়ে পূজা দিবি। আমার কাছে এখন আছে মাছ আর মদ। এ দুটোই তো আমাদের কাছে খুব প্রিয়। এই মাছ পুড়িয়ে আর মদ দিয়ে মাকে পূজা দেব।

কথা ।। এই বলে অনন্ত কিছু মাছ পুড়িয়ে আর কিছু মদ দিয়ে মায়ের নৈবেদ্য সাজাল, ফুল আর নৈবেদ্য সহযোগে মনমানসে দেবীর পূজা করল। একে একে জেলেপাড়ার সবাই নদীর তীরে গেল, পূজা শেষে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। পোড়ামাছের প্রসাদ তাদের অমৃতসমান হল।

দো : ভাই অনন্ত, এ মাছ তুমি কোথায় পেলে? এতো মাছপোড়া নয়, যেন সুধা।

২ দো : এটা মায়ের দোয়া রে ভাই, মায়ের দোয়া।

কথা ।। সেই হতে মা বিশালাক্ষীর মাছ ও মদ দিয়ে পূজা দেওয়া হয়, যে যা চায় মা তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেয়। অনন্ত জেলের পাড়ার লোকের মায়ের কৃপায় দুঃখ দূর হয়। এই কথা বাঁশবেড়িয়ার নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানতে পারে। লোকজন ডেকে তখন এই কথা কয়। আচ্ছা তোমরা বলতে পার? বৎসরকাল যাবৎ জেলেপাড়ায় মহাধুমধামে পূজা হচ্ছে, ওরা আড়ম্বরে মাকাল ঠাকুরের পূজা করে, এই অসময়ে কি পূজা করছে?

২ দো ঃ বাবু, অনন্ত জেলের জালে একটা ঠাকুর উঠেছে। নাম নাকি বিশালাক্ষী। পোড়ামাছ আর মদ দিয়ে ওরা পূজা দেয়, সেই থেকে অনন্ত জেলের যত উন্নতি। আর শুধু তাই নয়, জেলেপাড়ার সবাই এখন খুব সুখেই আছে।

দো ঃ ছি ছি! মাছপোড়া দিয়ে তারা দেবীর পূজা দেয়? আবার তার সাথে মদ? এতো অনাচার! দেবীকে নিয়ে ওরা তামাসা করছে! মূর্খ জেলে জানে না ঠাকুরদেবতার মহিমা? তোমরা এক কাজ কর, কাল প্রভাতে সদলবলে গিয়ে সেই দেবী প্রতিমাকে নিয়ে এস। আমার পবিত্র মন্দিরে রেখে ফলমূল মিষ্টান্ন দিয়ে মাকে পূজা দেব।

কথা॥ এই কথা বলে জমিদার নিজেই বহু লোকজন নিয়ে জেলেপাড়ায় মাকে আনতে গেলেন আর জেলেদের ডেকে তিনি বলতে লাগলেন।

জমিদার ঃ শোন অনন্ত, তোমরা ঠাকুর নিয়ে ছেলেখেলা করছ। পোড়ামাছ, মদ দিয়ে ঠাকুরপূজা—এতো কখনো শুনিনি! তোমরা মহাপাপ করছ!

অনন্ত ঃ এ যে মায়ের আদেশ বাবু, আমরা তাঁর আদেশ মতই পূজা করি বাবু।

জমিদার ঃ না এ কখনো হতে পারে না। কোন দেবদেবীর পূজা পোড়ামাছ আর মদ দিয়ে হয় না। তোমরা ঐ ঠাকুর আমাকে দাও, আমি আমার মন্দিরে রেখে ষোড়শ উপচারে নিত্যপূজা দেব।

অনন্ত ঃ না, তা দেব না। প্রাণ থাকতে আমরা আমাদের মাকে দেব না। তোমাদের ঘরে তো মাচণ্ডী আছে। আমরা কি তা আনতে যাচ্ছি? না আমাদের কোনদিন পূজা দিতে দাও? আমরা আমাদের মাকে দেব না।

জমিদার ঃ কি? এত বড় স্পর্ধা, আমার মুখের উপর কথা? তোমরা যদি সহজে না দাও, আমরা জোর করে তোমাদের মাকে নিয়ে যাব।

অনন্ত ঃ আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমরা আমাদের দেবীকে ছাড়ব না।

কথা॥ এইভাবে জেলে ও জমিদারের লড়াই বাঁধল, জেলেপাড়ায় মাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হল।

গীত ॥ লড়াই বাঁধিল গো তাদের লড়াই বাঁধিল
এক দলে ঢাল তরোয়াল আর দলে লাঠি গো
মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়েছিল গো লাঠালাঠি হয় গো
জমিদারের লাঠির ঘায় কত জেলে মরে গো
মায়ের কৃপায় তারা জীবন ফিরে পায় গো
দেখে শুনে জমিদারের লোক পিছু হটে যায় গো
মরা মানুষ প্রাণ পায় একথা জমিদারে বলে গো।

মহারাজ, বড় আশ্চর্যের কথা! আমাদের লাঠির ঘায় যত জেলে মারা পড়ে, কি

একটা জল ছেটোতে তারা পুনঃ প্রাণ পেয়ে উঠে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আমাদের লোকজন সব ঘায়েল হয়ে পালাতে শুরু করে, কতক সেখানে মরে পড়েও আছে।

জমিদার : সে কি বলছ তোমরা? পরাজিত হয়ে ফিরে এলে? এতো জমিদারের কলঙ্ক। না, তা হয় না। তোমরা লড়াই চালাও। মাকে আমরা যেমন করে হোক নিয়ে যাব।

কথা॥ এইভাবে তিনদিন তিনরাত লড়াই চলেছিল। জমিদারের লোকজন আবার জমিদারকে বলল। জমিদারবাবু, আর আমরা লড়াই করতে পারছি না। আপনি অন্য একটা ব্যবস্থা করুন।

জমিদার : তোমরা এবার লাঠি ফেলে জেলেদের কাছে যাও। ওদের ডেকে একটা বৈঠকে বস। দেখ, তারা কি বলতে চায়।

কথা॥ এই বলে তারা দাঙ্গা থামাল। জেলেদের ডেকে তারা একত্রে বসল। জমিদার অনন্ত জেলেকে ডেকে বলতে লাগলেন।

জমিদার : অনন্ত ভাই, আমি তোমাদের জমিদার, ব্রাহ্মণ মানুষ, তোমরা আমাদের সাথে লড়াই করো না। আমি তোমাদের মাকে আমার দেবালয়ে রেখে নিত্যসেবা দেব।

অনন্ত : আমরা আমাদের মাকে দিতে পারি, তা আমাদের কিছু শর্ত থাকবে জমিদার বাবু, যদি আপনি তা মেনে নেন তবেই আমরা মাকে দিতি পারি। মা আমাদের এখানে অনেক কষ্টেই আছে। আমরা সময়মত তার সন্ধ্যাও পর্যন্ত দিতে পারি না। ছেলেবউ সবাই মিলে আমাদের নদীতে যেতে হয়। তাছাড়া ভালো ভালো ফলপাকড় আমরা কোথায় পাব? মায়ের একটা ভালো ঘরও পর্যন্ত দিতে পারি না।

জমিদার : বল, তোমাদের কি শর্ত? তোমরা যা বলবে আমি তাই মেনে নেব।

অনন্ত : বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার দেবীর পূজা ও মেলার আয়োজন করতে হবে। সেইদিনের প্রথম পূজা আমাদের দ্বারা হবে। তারপর অন্য সবাই পূজা দেবে। আর এক শর্ত হল— জেলেপাড়ার পুরুষ এবং নারী যার যখন ইচ্ছা পূজা করতে যাবে। তাদের সেই সুযোগ দিতে হবে।

জমিদার : তোমাদের এই দুই শর্ত আমি মেনে নিলাম। তোমরা মাকে আমায় দাও।

কথা॥ জমিদারের লোকজন মনের আনন্দে জেলেদের কাছ থেকে মাকে গ্রহণ করেছিল। চতুর্দোলায় নিয়ে মাকে ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠা করল। মহাধুমধামে সেথা বিশালাক্ষীর পূজা আরম্ভ করল। দলে দলে লোকজন দেখতে এল।

গীত ॥

বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণবাড়ি মায়ের পূজা হয় গো
দলে দলে লোকজন পূজা দিতে আসে গো
জাত, অনজাত যত মায়ের কাছে যায় গো
পোড়ামাছের নৈবেদ্য কেহ নিয়ে আসে গো

ফলমূল ডালা সাজিয়ে কেহ দিয়ে যায় গো
মহাধুমধামে সেথা মহাপূজা হয় গো
কুলীন ব্রাহ্মণেরা ইহা নাহি সয় গো
তারা জাত অনজাতের বাড়ি ঢুকতে নিষেধ করে গো।

দো ঃ দেখেছো ভাই সব, জমিদারের কাণ্ডকারখানা। জাতপাত বলতে আর কিছুই রাখলে না। বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণ আমরা, কাওরা, বাগদী, মুচি, মেথর সব বাড়ির ভেতর ঢুকছে। তারা আবার মাকে পূজা দিচ্ছে। কোথা থেকে জাত, অনজাতের ঠাকুরবাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে নরেন্দ্রনাথ এ কি করছে বলতো ভাই সব? আমরা নরেনবাবুকে একঘরে করব। কোন কাজে আর ওকে বলব না, কি ওর বাড়ি যাবই না।

কথা।। এই কথা তারা বলাবলি করছে, এমনসময় জমিদার নরেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলছেন— ভাই সব, আগামী মঙ্গলবার মায়ের জাতপূজা, আমি ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সেবার আয়োজন করেছি, আপনাদের নিমন্ত্রণ, আমার বাড়ি গিয়ে পায়েজল দেবেন।

দো ঃ আপনি আর ও কথা বলবেন না। আপনার হতে আমাদের বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণ-কুলের মানসম্মান আর রইল না। যত সব ছোট জাত নিয়ে আপনার ওঠাবসা। ছোট-লোকের ঠাকুর এনে এ কি ছোটলোকোমি করছেন? ঐ পূজা বন্ধ করুন। নইলে আপনাকে আমরা একঘরে করব।

কথা।। এই কথা শুনে জমিদার নতশিরে বাড়িতে ফিবলেন। সেইদিন থেকে ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। দলে দলে জেলে, মৌলে সেথা পূজা দিতে যায়, দরজা বন্ধ দেখে সবাই নিরাশ হয়ে যায়। এইভাবে মায়ের পূজা সাতমাস বন্ধ হয়ে গেল।

অপর দিকে মেদিনীপুরের রাজা শোভাসিংহ কাঁটাবেনিয়ার দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিনোদ চক্রবর্তীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন, নামগ্রহণ করেছেন বিভূতি চক্রবর্তী। মায়ের কৃপায় বিভূতি চন্দ্রকলার মত বড় হয়ে ওঠে। একদিন মা বিশালাক্ষী স্বপনে তাকে জানায়—

গীত ।। শোন শোন ও বিভূতি আমার কথা শোন
আমি আছি অনাহারে তোর ঘুমে এত মন?
আমি দেবীবিশালাক্ষী সর্ব জীবের মাতা
ধরার বুকে হলাম আমি দীনদুঃখীর ত্রাতা।
ভক্তিভরে পূজা দিয়ে যাবে যে মহলে
কাষ্ঠমধু নৌকাভরে আনবে সকলে।
মহলযাত্রীর বধূগণ পূজে যদি মোরে
সিঁথির সিন্দূর অক্ষয় রবে বিশালাক্ষীর বরে।
বাঘভাল্লুক আমার ভৃত্য আমার বাধ্য তারা

মা বলে ডাকলে আমায় পথ দেখাবে তারা।
পুত্রহীনার পুত্র দিই ধনহীনার ধন
ভক্তিভাবে ডাকলে আমায় রাখি মানির মান।

কথা॥ মা বিভূতিকে আরো বলতে লাগলেন—বিভূতি, প্রভাতে উঠে বাঁশবেড়িয়ার জমিদারের বাড়ি যাবি, সেখানে আমি বহু কষ্টে আছি, আমাকে এনে তোর বাড়িতে রাখবি। সর্বজাতি মিলে আমায় পূজা দিবি। এই স্বপন দিয়ে মাতা বাঁশবেড়িয়া যায়, জমিদারের শিয়রে বসি স্বপনে জানায়— শুন শুন নরেন্দ্রনাথ বলি যে তোমারে, তার কতদিন বন্দী করে রাখবি এই ঘরে। কাল প্রভাতে কাঁটাবেনের বিভূতি আসবে নিতে, তার হাতে তুলে দিবি অতি সমাদরে। পাঁচশতবিঘা জমি নিষ্কর লিখে দিবি, ধরাধামে আমার নামের জাহির হবে। এক দুই তিন কথা যদি মনে নাহি রয়, সবংশে নিব্বংশ জেন করব তোমায়। এই কথা বলে মাতা অন্তর্ধান হলেন, শয্যা ছেড়ে নরেন্দ্রনাথ উঠে বসলেন। পরদিন প্রভাতে বিভূতি শয্যা-ত্যাগ করে পিতাকে বলছে, পিতা আমি জমিদারবাড়িতে মাকে আনতে যাব।

দো : ওরে বাবা, তারা তো জমিদার, আর তুই দীনহীনের ছেলে, তোর কাছে তারা মাকে দেবে কেন? তা তুই যখন মায়ের আদেশ পেয়েছিস, জমিদার বাড়ি থেকে ঘুরে আয়, যা হয় হবে।

কথা॥ এই বলে বিভূতি জমিদারবাড়ি যায়, বিভূতিকে দেখে জমিদার কাছেতে বসায়।

নরেন্দ্র : বিভূতি তুমি বড় ভাগ্যবান, তাই মা তোমার বাড়িতে যেতে চায়! আমার মত হতভাগ্য কেউ নেই। আমার প্রতিবেশীর চাপে মায়ের চরণসেবা হল না। তবে আমার সঙ্গে একটা কথা দাও— বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার মায়ের যে জাতালপূজা হবে, তাতে মায়ের মহাপ্রসাদের একটা অংশ আমাকে দেবে।

বিভূতি : জমিদারবাবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন মায়ের পূজা কাঁটাবেনিয়ায় হবে, পুরুষানুক্রমে মায়ের প্রসাদ এই জমিদারবংশে আসবে। এই কথা শুনে জমিদার মায়ের দরজা খুলে দিল, বিভূতি মহাধুমধাম করে নিজ মস্তকে করে মাকে নিয়ে গেল। বিশালাক্ষীর আদেশমত জমিদার পাঁচশতবিঘা জমি মায়ের নামে দিল। বিভূতি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এবার নগরে বের হল মাকে পূজা দেবে বলে।....

গীত ॥ কৃপা কর, কৃপা কর ও আমার জননী কৃপা কর
এমন গুণের দয়াময়ী মা না দেখি কোথায়
ভক্তিভাবে পূজা দিলে মা হারানিধি পায়
মায়ের নামে ভিক্ষা দিলে মা সন্তান সুখে রয়
ভক্তিভাবে পূজা দিলে ব্যাধিমুক্তি হয়।

কথা॥ এইভাবে মায়ের পূজা কাঁটাবেনিয়ায় বিভূতির বাড়ি হল, মা তখন মনে মনে

ভাবতে লাগলেন, করগুলির বোসেদের জামাই বড়ই নাস্তিক। ওকে দিয়ে আমার পূজা না করালে আমার পূজার প্রচার হবে না। কৃষ্ণকান্তের স্ত্রী সরমা পরম ভক্তিমতী। সে আমাকে নিত্যপূজা করে। অথচ কৃষ্ণকান্ত কিছুতেই তা সহ্য করতে পারে না। কৃষ্ণকান্ত গয়ায় চাকরী করেন। ফিরে এসে দেখেন সরমা বিশালাক্ষীর পূজা করছেন।

কৃষ্ণকান্ত ঃ সরমা, তুমি পূজা করছ? তুমি তো জান, আমি এসব বিশ্বাস করি না? আমি চাকরী করে মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছি আর তুমি বারোমাসে তেরোপার্বণ করে টাকা- পয়সা নষ্ট করছ? এই সব পূজা তুমি বন্ধ কর।

সরমা ঃ না না, ওকথা বোলোনা গো, ও কথা বলা পাপ।

দো ঃ তুমি সরে যাও, ও ঘট আমি ফেলে দেব।

কথা ॥ জোর করে বিশালাক্ষীর ঘট কৃষ্ণকান্ত ফেলে দিয়েছিল, সরমা স্বামীব পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

গীত ॥ পায়ে ধরি ও প্রাণনাথ ফেল না মোর মাকে
আশা করে এনেছিগো পূজিব ঘরে বসে।
পায়ে ধরে বিনয় করি মান্য কর মাকে
মাকে না পাইলে প্রভু মরিব গরল খেয়ে।
যোগী ঋষি, ধেয়ান করে যে চরণ পাবার আশে
মহাকাল সেই চরণ বক্ষে ধরে শয়ন করে থাকে।
মহাপাপ কোরো না প্রভু নরকে ঠাঁই হবে
বিশালাক্ষী মা ক্ষমা কর মোর নাস্তিক স্বামীকে।
অজ্ঞানে স্বামীর জ্ঞান দাও গো ফিরায়ে —

কথা ॥ যা যা, দূর হয়ে যা, বলে সরমাকে দূরে সরিয়ে দিল। অন্তর্যামী মা আমার অন্তরে জানিল। কৃষ্ণচন্দ্রের উপর মায়ের ক্রোধ বেড়ে গেল। তাঁর একমাত্র কন্যার শরীরে জ্বরা ব্যাধি দিল। কৃষ্ণকান্ত গয়াধামে চাকরী করত। সেখানে তিনলক্ষ টাকা তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত হল। এই অভিযোগে তার চাকরী চলে যায়। কোর্টে মামলা হল, সব সম্বল শেষ হল। দারিদ্র্যের জ্বালায় মন নরম হল। রোগের জ্বালায় কন্যা তার শয্যায় পড়ে আছে, ওদিকে মামলার দিন কৃষ্ণকান্তের এসে গেছে। হারলে মামলায় জেল ও জরিমানা দুইই হবে জানে। সরমাকে ডেকে তখন বলতে লাগল, বল বল সরমা, এ বিপদ থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পাব।

সরমা ঃ প্রাণনাথ, আমার মনে হয় বিশালাক্ষী মায়ের কোপে আমাদের এই দশা। তুমি মাকে ডাকলে পরে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারব।

কৃষ্ণকান্ত ঃ ও গো সরমা, আমি মহাপাপী, মায়ের কাছে আমি যে পাপ করেছি, আমার ডাকে কি আর মা সাড়া দেবে?

সরমা ঃ ওগো প্রাণনাথ, কু-সন্তান হতে পারে, কুমাতা কখনো হয় না। আমরা কাতর কণ্ঠে ডাকলে মা নিশ্চয়ই পদচ্ছায়া দেবেন।

কৃষ্ণ ঃ তাই যদি মনে কর, কাল আমার মামলার শেষ দিন। আজ এখুনি চল কাঁটাবেনিয়ায় মায়ের মন্দিরে পূজা দিয়ে আসি।

কথা ।। এই বলে তারা কাঁটাবেনিয়ায়, যায়। মায়ের কাছে মানত করে এই কথা কয়।

গীত ।। মাগো কর গো করুণা আজ আমায়

বিপদকালে ও জননী দেখা দাও গো আজ আমায়।

না জানিয়া ও জননী অপরাধ করেছি আমি

ক্ষমা করে জননীগো দয়া কর আজ আমায়।

সরমা ঃ মাগো, করজোড়ে বিনয় করে বলি তোমার কাছে, তোমার দয়ায় আমার স্বামীর এই বিপদ যদি কাটে, অনাহারে গলায় খড়ের কুটো বেঁধে নগরে নগরে ভিক্ষা করব, বাড়ীতে তোমার প্রতিমা করে নিত্যসেবা দেব। যতক্ষণ চারণগণ নিত্য তোমার গুণগান গাইবে, দন্তে তৃণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকব।

কথা ।। এই মানত করে তারা বাড়ীতে ফিরল, নিশিযোগে মা তখন স্বপ্নে দেখা দিল। শুন ওরে কৃষ্ণচন্দ্র বলি গো তোমারে, আমার নাম বিশালাক্ষী জানে সর্ব নরে। সর্বলোকে আছে আমার মান্য সবার ঠাঁই, হয়তো কারোর শীতল করি নতুবা জ্বালাই। অহংকারে মত্ত হয়ে আমার পূজার ঘট ফেলে দিয়েছিলি, সেই পাপে তোর এই দুর্দশা। তুই যখন মা বলে ডেকেছিস, আমি তোকে উদ্ধার করব। কাল প্রভাতে উঠে স্নান করে আমার ঘটে প্রণাম করে কোর্টে চলে যাবি। যতক্ষণ না কোর্টের শিখরে শঙ্খচিল দেখবি ততক্ষণ কোর্টে প্রবেশ করবি না। যখন শঙ্খচিল দেখতে পাবি, তাকে প্রণাম করে কোর্টে ঢুকে যাবি। আর বাড়ী ফিরে এসে আমার গানপূজা দিবি, চরণামৃত নিয়ে তোর কন্যার সর্বাঙ্গে লেপে দিবি। এই বলে মা আমার অন্তর্ধান হয়ে গেল, নিদ্রা থেকে উঠে কৃষ্ণ ভাবতে লাগল।

কৃষ্ণ ঃ তাই তো, এ কি স্বপন দেখলাম। মা তাহলে সত্যসত্যই আমাকে কৃপা করেছেন। দোহাই মা—মা যখন বলে গেল, মায়ের নাম স্মরণ করে আমি কোর্টে যাব। যদি মা দয়া করে তবে আমি ঘরেতে ফিরব। আজ আমার মামলার শেষ দিন। সরমা, আর হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে না।

সরমা ঃ না প্রভু, তুমি অমন কথা বোলো না। তুমি একমনে মায়ের নাম স্মরণ করে যাও, মা তোমার সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। এই কথা বলে কৃষ্ণকান্ত কোর্টে চলে গেল, কাঁদতে কাঁদতে সরমা পূজায় বসে গেল।

কোর্টে কৃষ্ণকান্ত এদিকে ওদিক চায়
শঙ্খচিল, কোথাও তিনি দেখিতে না পায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণ ভূমিতে বসিয়া পড়িল
মামলা শুরু হতে আর পাঁচমিনিট রহিল।
মা-মা বলে কৃষ্ণকান্ত কাঁদে ডাক ছেড়ে
উপরেতে দেখে চেয়ে শঙ্খচিল আসে উড়ে।

কথা॥ ডাক শুনে মায়ের অন্তরে দয়া হয়েছিল। তাই কোর্টের ছাদে শঙ্খচিল হয়ে মা উড়ে এসে বসলেন। কৃষ্ণকান্ত মাকে তখন ভক্তিভাবে প্রণাম করে আস্তেব্যস্তে হৃষ্টমনে কোর্টে প্রবেশ করলেন।

বিশালাক্ষী মায়ের লীলা কে বুঝিতে পারে
বেকসুর খালাস পেল মায়ের দয়ার তরে।
কাঁটাবেনে এসে কৃষ্ণ মায়ের প্রণাম জানায়
পুষ্পচন্দন, ফুলফলে পূজা দেয় মায়।
রোগগ্রস্ত কন্যা তাঁর রোগমুক্ত হল
আদেশমত কৃষ্ণচন্দ্র মায়ের মন্দির করে দিল।

কথা॥ এবার সরমা গলায় কুটো বেঁধে ভিক্ষা করতে গেল।

মাগুনগীত

মাগুন দাও মাগুন দাও গো, ও আমার জননী মাগুন দাও—
এমন গুণের দয়াময়ী মা দেখিনি কোথাও।
মা বলে ডাকলে মা পদচ্ছায়া দেয়।।
সাতগ্রাম মেঙেপেতে মায়ের গানপূজা দিল।
বদনভরে সবাই একবার হরি হরি বল।।
বিশালাক্ষী মাতা বলে আমায় ওল দিয়ে যে পূজিবে।
বোলহীন বেটাবেটী বোল ফিরে পাবে।।
ভক্তিভরে ঝাঁটা দিয়ে পূজা যে করিবে।
পঙ্গুশিশু পায়ে হেঁটে পর্বত লঙ্ঘিবে।।
পোড়ামাছ জোড়াপাঁঠা মদ্যসহ যে দিবে।
বিশালাক্ষী মা বলে তার ঘরে স্থায়ী হয়ে রবে।।
আড়াই সের তণ্ডুল অন্ন দিয়ে যে পূজিবে।
আমার দয়ায় সাতপুরুষ তার মহা সুখে রবে।।

রোগশোক ব্যাধি যত আছয়ে জগতে।
ভক্তিভরে মোরে পূজলে সব দূরে যাবে।।

অষ্টমঙ্গলাগীত

ও রামো ও রামো রামো হে ও রামো রামো রামো
ভক্তিভরে শুন সবে দেবীর অষ্টমঙ্গলা নামো রে -
বিশালাক্ষী মহাদেবী মহিয়সী মহালক্ষ্মী
বিপদতারিণী শঙ্কাহরণী দীন দয়াময়ী হে
ভক্ত হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী সর্ববাঞ্ছা পূর্ণকারী
শতকোটি প্রণাম জানাই কৃপা কর জননী হে।
ভক্তিভরে শুন সবে অষ্টমঙ্গলা রে।
দেবীর পদতলে শিব পড়ে আছে শব
তার উপর নৃত্য করে দেবী মনোহর হে
চতুর্ভুজা দেবী তিনি রূপে অনুপমা
জগৎজোড়া খ্যাতি তাঁর ত্রিগুণাতীত গুণা হে।
ভক্তিভরে শুন সবে অষ্টমঙ্গলা রে
দেবীর দক্ষিণহস্তে বিশাল এক খড়্গ খরতর
অপর হস্তে ঝুলছে দেখ ঘণ্টা বৃহত্তর হে ...
বামহস্তে বাজায় মাতা দিব্য মঙ্গলশঙ্খ
অপর হস্তে ধরে আছেন জীবের কৃপাপাত্র হে ... ভক্তি ভরে।
বিশালাক্ষী গৌরবর্ণা মাথায় বিশাল চূড়া
পট্টবস্ত্রে অঙ্গ শোভে যতই থাকুক খাঁড়া হে . . .
পাতালদেশে ছিল গ্রাম কাঁটাবেনে নাম
মহিষাদলে ছিলেন তিনি রাখেন জেলের মান . . .
শোভা সিংহের কৃপা করে আসেন কাঁটাবেনে
বিভূতি নাম তাঁর জানে সর্বজনে
ভক্তিভরে শুন সবে অষ্টমঙ্গলা রে।
ধীবরজাতির বাস ছিল কাঁটাবেনের ভীতে
নদী বয়ে গেছে সেথা ভরা তলানীতে
বিশালাক্ষী এলেন তাদের করুণা করিতে

সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর অনন্তদেব সাথে হে . . .

কালু জেলে, হরিসাধন ভাগ্যবান অতি

কৃষ্ণকান্ত, সরমাদেবীর হয় পরম গতি।

এই তিন মাতা বিশালাক্ষীর দেবদেবীর পালা সাঙ্গ হেথা করি হে—

অধম সুবর্ণ বলে রাখ মোর পায় হে

শঙ্খঘণ্টা বাজাও সবে বল হরি হরি হে। . . . *(কাহিনী সমাপ্ত)*

সিদ্ধেশ্বরের গান

এদিকে মহালক্ষ্মীকে পাঠিয়ে দিয়ে সতীনাথ কৈলাসে স্থির থাকতে পারেন না। তিনিও দেবীর পিছু পিছু পাতালদেশে এসে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান আর মা বিশালাক্ষীর লীলা প্রত্যক্ষ করেন। অবশেষে কাঁটাবেনিয়াতে এসে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করে এখানে মায়ের লীলা দেখেন। মনে মনে ভাবেন বিশালাক্ষীর সাথে আমারও পূজা না হলে বিশালাক্ষীর পূজা সম্পূর্ণ হবে না। তাই তিনি তাঁর লীলাপ্রচার করার মানসে চিন্তিলেন মনে মনে।

বিভূতির দুধের গাই নাম কপিলা

তার দুধে পূজা পায় বিশালাক্ষী মা।

কয়েকদিন কপিলাব দুগ্ধ নাহি হয়

গোয়ালাকে ডেকে বিভূতি এই কথা কয়।—

দেখ গোয়ালা, আমার মনে হয় কপিলার দুধ চুরি হচ্ছে। তুমি কপিলাকে লক্ষ্য রাখ।

লুকিয়ে থেকে গোয়ালা দেখে কপিলাকে

বনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে অনেকক্ষণ থাকে।

বনের মধ্যে গোয়ালা গিয়ে অবাক হয়ে গেল

কপিলা তার নিজের দুধ এক শিলার মাথায় দিল।

দোহারঃ বাবু, আপনার কপিলা বনের মধ্যে ঢুকে এক কালো পাথরের মাথায় দুধ ঝরিয়ে দিয়ে আসে, আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম।

গায়ক ঃ তাই নাকি? আচ্ছা, আমি নিজ চক্ষে দেখব কপিলার দুধ কি হয়?

এই চিন্তা করে বিভূতি গাছের আড়ে থাকে

কপিলা বনে গিয়ে শিলার পরে দুধ দিতে থাকে।

বিভূতি দেখল, এই শিলাটি হল একটা শিবলিঙ্গ। কপিলা নিয়মিত এরই মাথায় দুধ দিয়ে যায়। বিভূতির অনুচর বিভূতিকে তখন এই কথা কয়—

দোহার : বাবু—এই শিলাটি নিয়ে বিশালাক্ষীমার মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা করুন। লোকজন ডেকে এটিকে খুঁড়ে তুলে নিয়ে চলুন।

কথা ।। অনুচরের কথামত বিভূতি লোক দিয়ে মাটি খুঁড়ে শিলাটি তুলতে চাইল। মাটি খুঁড়ে পুকুর হল কিন্তু শিলাটি তুলতে পারল না। চিন্তান্বিত বিভূতি গভীর নিদ্রা যায় শিয়রে বসে সিদ্ধেশ্বর এই কথা কয়—

আমি দেব সিদ্ধেশ্বর কৈলাসেতে বাস
বিশালাক্ষীর সাথে পূজা পাব এই করেছি আশ।
বিশালাক্ষী সিদ্ধেশ্বর পৃথক কভু নয়
একই শক্তির দুটি রূপ শাস্ত্র মতে কয়।
একই সাথে ভুবন মাঝে দোঁহে অবতীর্ণ
সাধু ব্যক্তির সহায় হই দম্ভীর করি চূর্ণ।

দোহার : শোন বিভূতি, তুমি আমার এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। আমার তুলতে পারবে না। বিশালাক্ষী সিদ্ধেশ্বর আমরা কাছাকাছিই আছি। তুমি আমাদের দোঁহের একই সাথে পূজার ব্যবস্থা কর।

কথা ।। এই কথা শুনে বিভূতি জঙ্গল হাসিল করে সেখানে মহাসমাদরে পূজা আরম্ভিল।

বিভূতির পূজা পেয়ে সিদ্ধেশ্বর খুবই প্রীত হলেন, কিন্তু জগজনে না পূজলে তাঁর মাহাত্ম্য-প্রচার হবে না। অবশেষে দরিদ্রের কল্যাণ করে জগতে পূজা নিতে মনস্থ করেন। সিদ্ধেশ্বর দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ হরিসাধনকে কৃপা করবেন বলে স্থির করলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিসাধন, অন্ন বিনে তার আঁতে বহে দড়ি
তৈল বিনে হরিসাধনের তনুতে ওঠে খড়ি।
বড়ই দরিদ্র সে ভিক্ষা করে খায়
তার শিয়রে বসে সিদ্ধেশ্বর স্বপন দেখায়।
শুন শুন হরিসাধন আমি সিদ্ধেশ্বর,
আমার প্রসাদে তুমি হবে অধীশ্বর।
সপ্তঘড়া ধন আছে আমার পুকুরেতে
যক্ষপতি আগলে আছে বহুদিন হতে।
শীঘ্র করে তুলে এনে রাখ যতন করে
ভক্তিভরে নিত্যপূজা দিও হেথা মোরে।

খোয়া ।। স্বপন দেখে হরিসাধন চমকিয়া ওঠে, স্বপনের কথা তখন মনে মনে ভাবে।

কথা॥ কোথা বা সিদ্ধেশ্বর কোথা বা সাতঘড়া ধন। দেখা যাক স্বপ্ন যখন দেখলাম, যাই দেখি। সত্যি সত্যি এক দীর্ঘকায় কুৎসিত পুরুষ সাতঘড়া ধন আগলে নিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে আছে। হরিসাধনকে দেখে ঘড়া রেখে তরতর করে জলে নেমে গেল। হরিসাধন সিদ্ধেশ্বরের প্রণাম করে ঘড়াগুলো ধরল। আস্তেব্যস্তে সাতঘড়া ধন বাড়ী এনে তুলল, আর ঘটস্থাপন করে তখন সিদ্ধেশ্বরের পূজা আরম্ভিল। পরদিন হরিসাধন সিদ্ধেশ্বরকে আবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে আদেশ দিলেন —

গীত ।। বলি তোরে শোনরে সাধন বলি তোরে শোন .....

বিশালাক্ষীর জাতের দিন আসিছে সম্মুখে
আড়ম্বরে অনুষ্ঠান করবে মহা সুখে।
রাস দোল দুর্গোৎসব সবই পূজা হবে
লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা বাদ নাহি যাবে।
মহামায়া বিশালাক্ষী আছেন যখন ঘরে
সেই হেতু কোন মূর্তি গড়া নাহি হবে।
ঘটস্থাপন করে সর্বদেবের পূজা দেবে
এতে তুষ্ট হবেন সর্বদেব তবে।
ঘরে ঘরে মেঙেপেতে পূজা মোরে দিবে
এইভাবে মোর পূজার কথা সবার কাছে কবে।
এই বলে সিদ্ধেশ্বর হলেন অন্তর্ধান
হরিসাধন বিছানা ছেড়ে ভাবেন মনে মন।

কথা॥ পরদিন প্রভাতে হরিসাধন শয্যাত্যাগ করে বিভূতির বাড়ী গেল। বিভূতিকে ডেকে হরিসাধন বলে শোন বিভূতি, সিদ্ধেশ্বর এসেছেন আমাদের এই কাঁটাবেনেতে। বিশালাক্ষীর সাথেই তাঁর পূজা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, সর্বদেবদেবীর পূজা হবে কিন্তু কোন মূর্তি চলবে না। এই কথা শুনে বিভূতি সর্ব দেবদেবীর ঘটপূজার ব্যবস্থা করল। সেই থেকে কাঁটাবেনে গ্রামে বিশালাক্ষীর মন্দিরে বিশালাক্ষী ছাড়া সব দেবদেবীর মূর্তিপূজা বন্ধ হল।

কৃপা পেয়ে হরিসাধন সিদ্ধেশ্বরের পূজা আরম্ভিল
অনাহারে গলে খড়ের কুটো বেঁধে দ্বারে দ্বারে গেল।
শুন শুন প্রতিবেশী ভাইজনেরা বলি তোমাদের কাছে
দেব সিদ্ধেশ্বর এসে মোদের পদছায়া দিয়েছে।
বাবার নামে ভিক্ষা দাও গানপূজা হবে
সপরিবারে এসে তোমরা প্রসাদ লয়ে যাবে।

গান ॥ মাগুন দাও মাগুন দাও গো, তোমরা প্রতিবেশী মাগুন দাও—

কাঁটাবেনের বাসিন্দারা ভাগ্যবান অতি

দেবতাদের আগমন হেথা, করতে তাদের গতি।

বহু জন্মের সাধন ফলে হেথা জন্ম হয়

কবি সুবর্ণ বলে একথা মিথ্যা কভু নয়।

সাতগ্রাম মেঙেপেতে সবাই গানপূজা দিল

শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে সবাই হরি হরি বল।

অষ্টমঙ্গলা

সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিদাতা দেবের প্রধান

কৃপা গুণে ফলে উষর জমিতে ধান।

গো মহিষাদির যদি দুগ্ধ নাহি হয়

সিদ্ধেশ্বরের কৃপায় তার বালতি ভরে যায়।

কাঁটাবেনের চক্রবর্তী অতি ভাগ্যবান

তাঁদের ঘরে স্থিতি করেন ত্রিদেব প্রধান।

(কাহিনী সমাপ্ত)

অনন্তদেবের গান

কথা ॥ কাঁটাবেনিয়া গ্রামে দেবীবিশালাক্ষী ও সিদ্ধেশ্বরের পূজা প্রচার হল। তা দেখে বৈকুণ্ঠবিহারী হরি ভাবতে লাগলেন। হরপার্বতী সিদ্ধেশ্বর ও বিশালাক্ষী নামে পাতালদেশে পূজা পেলেন, কিন্তু হরিহর এক আত্মা একথা সর্বজনে জানে, তবে কেন একা থাকি এই স্বর্গধামে। মহান প্রেমের প্রতীক অনন্তদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের পাপতাপ দূর করে শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করতে চান। প্রথমে তিনি ব্রহ্মার সৃষ্ট পাতালদেশে যাবেন বলে মনস্থ করেন।

এই বলে অনন্তদেব প্রস্তরমূর্তি ধরিল

গাঙ্গুড়ের জলে ভ্রমিতে লাগিল।

কালু জেলে ভাগ্যবান সেথা মাছ ধরতে গেল

অনন্তদেব তার জালে গিয়ে যে উঠিল।

কালু জেলে মূর্তি নিয়ে তীরেতে রাখিল

নিদ্রাকালে শিয়রে তার স্বপন দেখাল।

শুন ওরে কালু জেলে তোরে যাই বলে
চিনতে মোরে পারিলি না রেখে গেলি মোরে।
আমি দেবঅনন্ত আছি নদীকূলে
ভক্তিভাবে তোমরা মোরে নিয়ে যাও তুলে।
দীনহীন নীচজাতির কল্যাণ লাগি এসেছি হেথা
যে মোরে ভক্তি করে থাকি আমি সেথা।
স্বপ্ন পেয়ে কালুজেলে চমকিয়া ওঠে
শয্যা ছেড়ে দৌড় দিয়ে নদীকূলে ছোটে।
দিব্যমূর্তি সেথা যেন শয়ন করে আছে
কালু জেলে আছাড় খেয়ে পড়ে তাঁর পায়ে।

কথা ।। কালু জেলে অনন্তদেবের পায় আছাড় খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। আর সব জেলেভাই তথায় এসে গেল। কালুকে এমন ভাবে পড়ে থাকতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। অনন্তদেবের কৃপায় কালু সুস্থ হয়ে উঠল।

কালু ঃ ভাই সব এই মূর্তি আমরা কোনদিন তো দেখিনি। প্রভু আমাকে স্বপ্নে জানালেন ইনি অনন্তদেব, দীনহীন নীচজাতির কল্যাণের জন্য তিনি এখানে এসেছেন। প্রভুর মূর্তিখানা দেখ কি সুন্দর —

দিগম্বর কৃষ্ণ মূর্তি হাতে সুন্দর ব্যাজন
অনন্তশেষ ছত্র ধরে অতি সুশোভন।
মস্তকপার্শ্বে দুই দিকে দুই বিদ্যাধরী তনু
দুই পার্শ্বে ধ্যানরত কত ঋষি মনু।
সবার আসনতলে নানাজাতের পাখি
পাদদেশের দুই দিকে অর্ধ দুই নারী।
সৌম্য কান্তি সু-পুরুষ দেব অনন্ত
কালুজেলে পেয়ে তাঁকে খুশীর নেই অন্ত।

কথা ।। তোমরা সব অনন্তদেবকে ধর। মাথায় নিয়ে গিয়ে আমাদের জেলেপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করে পূজা আস্তি দেব, কিন্তু অনন্তদেবের লীলা বল কে বুঝতে পারে, বহুজনে দেবের তুলতে না পারে। কালুজেলে একা যেই অনন্তদেবকে ধরে, মুহূর্তে প্রস্তর মূর্তি যেন শোলার মত হল। কালু জেলে তখন একাই সেই প্রস্তরমূর্তি মাথায় করে নিয়ে জেলেপাড়ায় এল এবং মহাধুমধামে সেথা পূজা আরম্ভিল। এই কথা শুনে বিভূতি চক্রবর্তী অনন্তদেবকে দেখতে এল।

বিভূতি ঃ কালু ভাই তোমরা তোমাদের অনন্তদেবকে আমার কাছে দাও। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ বলছি তোমাদের দেবতাকে আমি আমার দেবসিদ্ধেশ্বর ও দেবীবিশালাক্ষীর সাথে পূজা করব।

২য় দো ঃ না ঠাকুরমশাই অনন্তদেব যখন কৃপা করে আমাদের জেলেদের ঘরে এসেছেন আমরা কিছুতেই তাঁকে কারোর হাতে তুলে দেব না। আপনাদের সিদ্ধেশ্বর, বিশালাক্ষী আপনাদের কাছে থাক, আমাদের অনন্তদেব আমাদের কাছে থাক। আমরা ভিক্ষা করে পূজা দেব, তবু তোমাদের হাতে অনন্তদেবকে তুলে দিতে পারব না।

কথা ।। অপমানিত হয়ে বিভূতি চক্রবর্তী লোকজন নিয়ে বাড়ীতে ফিরলে অনন্তদেবকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করে শুধু বলল প্রভু, তোমার যদি ইচ্ছা হয়তো আমার কাছে এসো।

নিশিতে কালুজেলে সুখে নিদ্রা যায়
শিহরে বসে অনন্ত দেব স্বপনে জানায়।

কালু, তোমরা আমাকে এখানে রাখতে পারবে না। আমাকে তোমরা বিভূতির বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। সিদ্ধেশ্বর, বিশালাক্ষী যেখানে থাকে আমিও সেখানেই থাকি। তোমার ভক্তিতে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার আমার যে জাতের পূজা হবে তাতে তোমার বংশের পূজা আমি আগে নেব। তারপর অন্যের।

স্বপ্ন দেখে কালু কাঁদিয়া ফেলিল
প্রভাতে বিভূতির বাড়ি অতি কষ্টে গেল।
বিভূতিকে ডেকে কালু বলিতে লাগিল—

কালু ঃ ঠাকুরমশাই, আপনি অতি ভাগ্যবান। আপনাকে অপমান করে আমি অন্যায় করেছি। দেবঅনন্ত নিজেই আপনার বাড়ী আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর আদেশ বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বিশালাক্ষী ও সিদ্ধেশ্বরের যে জাতের পূজা হবে—সেই সাথে অনন্তদেবের ও হবে। তাতে আমার বংশের পূজা তিনি আগে নেবেন তারপর অন্যের।

বিভূতি ঃ তুমি অতি ভাগ্যবান কালু। প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর পূজা হবে। আমি বেঁচে থাকতে এর কোন ত্রুটি হবে না। চল চল, তোমার সাথে তোমার বাড়ীতে যাই। ঠাকুরকে আমি নিজ মস্তকে নিয়ে আসব।

কথা ।। এই বলে বিভূতি কালুর বাড়ী গেল
অনন্তদেবকে মস্তকে নিতে বহু চেষ্টা করল।

বিভূতি কিছুতেই অনন্তদেবকে নাড়াতে পারলেন না। তাঁর লোকজনও না। অবশেষে বিভূতি ব্রাহ্মণ হয়ে কালুজেলের পায়ে ধরে মিনতি করল ভাই কালু তুমিই প্রভুকে নিয়ে আমার বাড়ী চল। কালুজেলে ভক্তি ভরে অনন্তদেবের পায়ে প্রণাম করে অনায়াসে অনন্তদেবকে নিল মাথায় তুলে। অনন্তদেবকে নিয়ে কালু বিভূতির বাড়ী এল। মহাসমারোহে বিভূতি অনন্তদেবকে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিশালাক্ষী, অনন্তদেব আর সিদ্ধেশ্বর এক স্থানে রইল। অনন্তদেব সেই রাত্রে বিভূতিকে স্বপ্নে জানান—

নাম আমার অনন্তদেব থাকি সর্বভূতে
রোগশোকতাপ হরি আনন্দ দিই চিতে।
পুত্রহীনার পুত্র দিই বাক্যহীনের বাক্য

নির্ধনের ধন দিই ত্বরাই হতভাগ্য।
পূজা মোরে দিবে যেই নিরামিষ রান্না
নিজ হাতে ঘুচিয়ে দিই তার বুকেব কান্না।
বিশালাক্ষীর সাথে মোর পূজা দিবে যে
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে আমায পাবে সে।
অনন্তদেব বলে জেনো আমি করুণাময়
ভক্তিভবে মোরে পূজলে সংসারে সুখ রয়।
ইহকাল পরকালের তাপ দূর করি
যত পাপ করুক জীব সব আমি হবি।
জেলে, মৌলে কাঠুরিয়া যে ভক্তিভাবে ডাকে
নিজে গিয়ে রক্ষা করি বাঁচাই আমি তাকে।
ফলমূল উপচারে পূজা যে করিবে
অনন্তদেব অন্তরে তার মহা সুখ দিবে।

দেবী বিশালাক্ষী চব্বিশ পরগণার বহু পূজিতা লৌকিক দেবী। এই অঞ্চলের বাইরে বিভিন্ন জেলাতেও দেবীর পূজাচার দেখা যায়। দেবীর যে পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও পালাগানের মধ্যে পাওয়া যায় তাতে তাঁকে আদিম মানবগোষ্ঠীর জাদুবিশ্বাস জাত দেবী বলে মনে করা হয। তাঁব পূজাচারের মধ্যে আছে তামসিক প্রভাব। মদ, মাংস, পোড়া মাছ, ঝাঁটা, ওল প্রভৃতি নৈবেদ্যের মাধ্যমেও বোঝা যায় দেবী বিশালাক্ষী ভারতের একান্ত আদিম সমাজের প্রভাব প্রসূতদেবী। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় দেবীর প্রধান সেবক হল জেলে-মৌলে-বাউলে-কাঠুরিয়া। পরবর্তী কালে বর্ণ ব্রাহ্মণ দেবীর পূজানুষ্ঠান করেন। দেবীর নৈবেদ্যে লাল নটেশাক ও সব্জী ব্যবহারের ফলে অনুমান করা যায় তিনি এই অঞ্চলের কৃষিদেবী রূপেও বিশ্বাস অর্জন করেছেন। সুতরাং দেবী বিশালাক্ষী চব্বিশ পরগণার জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত এক লৌকিক দেবী যিনি রোগ শোক, কৃষি সহায়ক, মৎস্য শিকার, ঝড়-তুফান মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি অধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিড়ম্বনা থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। সাধারণ লোকবিশ্বাসে তিনি মহামাতৃকার অংশ বিশেষ।

সুন্দরবন তথা চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবী বিশালাক্ষীকে অবলম্বন করে যে লোকায়ত পালা রচিত হতে দেখা যায় তা অধিক প্রাচীনকালের না হলেও বিশালাক্ষী সম্পর্কিত ঐতিহ্যমূলক সুপ্রাচীন কাহিনীরই লোক প্রচলিত ধারা। লৌকিক দেবী বিশালাক্ষীর অলৌকিক মহিমা ও মাহাত্ম্যসূচক লোকায়ত দেবীপালার মধ্যে স্থানীয় ভূপ্রকৃতি ও জনজাতির জীবনধারার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে দেবীপালা হিসাবে বিশালাক্ষী পালার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

১. সাক্ষাতকার : অনন্তকুমার মান্না (৫০), গ্রাম - পূর্ব সুরেন্দ্রনগর, পো: কোয়েমুড়ী। বিভূতিভূষণ আড়ি, দ: কাশীপুর, পাথর প্রতিমা, দ: ২৪ পরগণা, তাং ১৫.৬.১৯৯২।

২. সাক্ষাতকার : প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (কাকদ্বীপ বিশালাক্ষীর সেবাইত), ১৬.১.৯৬।

৩. সাক্ষাতকার : শৈলেন চক্রবর্তী (৫০) ও ধীরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (৭০), গ্রাম কাঁটাবেনিয়া, পো: করঞ্জলি, দঃ ২৪ পরগণা।

দেবীপালা ঃ নারায়ণী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী নির্ভর পালাগান-সাহিত্যে লৌকিকদেবী নারায়ণী এক উল্লেখযোগ্য নাম। চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগান আলোচনায় এটি দেবীপালার অন্তর্গত। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের মত নারায়ণীর পূজা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। এই সমস্ত পূজায় মানুষের জীবনধারণের জন্য আকুল আকুতি প্রকাশিত হয়। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় পরিবেশে সাধারণ মানুষের জীবিকা ও জীবনযাপনের সহায়ক শক্তিহিসাবে বনবিবি, নারায়ণী, দক্ষিণরায় প্রমুখ লৌকিক দেবদেবীগণ পূজিত হন। জেলা চব্বিশ পরগণায় দেবীনারায়ণীর থান, পূজা ও পূজাসংক্রান্ত আড়ম্বরাদি দেখে প্রতীতি জন্মে যে, দেবীনারায়ণীর লীলাক্ষেত্র এই অঞ্চলেই। সুন্দরবন ও নদীনালা সংলগ্ন স্থানসমূহে তাঁর ভক্ত সংখ্যা অধিক। বৎসরের বিশেষ সময়ে দেবীর গান-পূজার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে মেলা বসে। নারায়ণীর সাকার পূজার অনতিদূরে বনবিবিরও পৃথক মূর্তি পূজার ব্যবস্থা থাকে। এই অঞ্চলের লোকসমাজ বনবিবি, নারায়ণী, মোবারক গাজী, বরকন গাজী, দক্ষিণরায় প্রমুখ দেবদেবীগণকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত লৌকিক দেবদেবী বলে মনে করেন। প্রচলিত লোককথা, পালাগান ও দেবদেবীর পূজা-সংক্রান্ত নানা আচার- আচরণ ও সংস্কারাদির মধ্যে উক্ত সত্য খুঁজে পাওয়া যায়। লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস অনুসারে লোকশিল্পীগণ বনবিবির পালা, মোবারক গাজীর পালা ইত্যাদির ন্যায় নারায়ণীর পালাগান করেন এবং তাঁদের দ্বারাই চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে নারায়ণীর বিভিন্ন পূজাচার ও মাহাত্ম্য অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ আছে। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে দেবীনারায়ণী রোগশোক প্রতিকারিণী শক্তিরূপে পূজিতা হলেও মৌলিক তাৎপর্যে তিনি সুন্দরবনের অরণ্যসঙ্কুল পরিবেশে জেলে, মৌলে ও এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের বিঘ্ননাশকারী দেবীরূপে পূজিতা হন।

চব্বিশ পরগণায় দেবীনারায়ণীর দুই ধরনের মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ও বারা (কাটামুণ্ড) মূর্তি। পূর্ণাঙ্গ যে মূর্তি ক্ষেত্রগবেষণাকালে দৃষ্ট হয়, তাতে দেবীর

কোথাও দুই হাত আবার কোথাও চার হাত। বাহন কোথাও ব্যঘ্র কোথাও সিংহ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীনারায়ণীর কোন বাহনই থাকে না। দেবীর পাথরের নুড়িপূজাও বিরল নয়। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু নারায়ণীর যে-মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন তা হল "সিংহ কিংবা বাঘের উপর শিব শায়িত, তাঁর বুকে নারায়ণী কমলাসনে উপবিষ্ট, মুকুট নেই, মাথার উপরে কেশগুলি কুণ্ডলী করে স্থাপিত। চোখেমুখের ভাব যেন তীব্র অভিচারিকাদেবী বলে মনে হয়।"[১] চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রানুসন্ধানে একক নারায়ণী মূর্তি বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্যানিং থানার নারায়ণপুরে বাহনহীন দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির ন্যায় এক দারু নির্মিত নারায়ণীমূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

এ অঞ্চলে সাধারণভাবে যেসমস্ত নারায়ণীর মূর্তি দেখা যায় তার অধিকাংশই চতুর্ভুজা। দেবীর বামহাতে ধনুক ও ডানহাতে তীর। অপর দুই হাতের একটিতে (দক্ষিণ) বরাভয় মুদ্রা অপরটি সাধারণত মুক্ত থাকে। চতুর্ভুজা নারায়ণীর সবক্ষেত্রে হাতে প্রহরণ থাকে না। কোন কোন মূর্তির ডানহাতে পদ্ম ও বামহাতে শঙ্খ থাকে। অপর দুই হাত মুক্ত থাকে। দ্বিভুজা যে নারায়ণীর মূর্তি, সেক্ষেত্রে একটি হাতে খড়্গ ও অপরটিতে খেটক (ঢাল) থাকে। দেবীর গাত্রবর্ণ হরিদ্রা, রক্তবস্ত্র পরিধান ও সালংকারা রূপে দেখা যায়। সিংহ বা ব্যাঘ্রবাহনে দেবীর মূর্তি 'যুদ্ধং দেহি' ভাব। কোন কোন স্থানে নারায়ণী জগদ্ধাত্রীদেবীর মূর্তির ন্যায় কান্তকোমল। নারায়ণীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীর যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে তা হল—

সিংহ স্কন্ধাধিরূঢ়ং নানালংকার ভূষিতাং
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং
রক্তবস্ত্র পরিধানং বালার্কসহশীতনুং।
রত্নেদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে
প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং, ধ্যায়েত্তাং ভবসুন্দরীম্।।[২]

চব্বিশ পরগণায় দক্ষিণরায় ও নারায়ণী নামে যে বারামুণ্ড পূজিত হয় তাতে নারায়ণীর বারামূর্তি অনেকখানি দক্ষিণরায়ের বারামূর্তির মত, একটি মূলগত তফাৎ, তা হল দক্ষিণরায়ের গুম্ফ আছে, নারায়ণীর নেই। গুম্ফহীনতা দেখে এটিকে নারীমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই মূর্তি নিয়ে মতভেদ আছে। এটিকে কেউ বলেন নারায়ণী, কেউ বলেন বনবিবি। কারণ দক্ষিণরায় ও বনবিবি উভয়েই ভাঁটি অঞ্চলের অধিপতি। এই অঞ্চলেই এই দুই দেব-দেবীর অধিক পূজার প্রচলন আছে। দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর কর্তিত মুণ্ডর উপরে শঙ্কু আকৃতির যে মুকুট, তাতে লতাপাতার ছবি আঁকা। মূল মুণ্ড অপেক্ষা শঙ্কু আকৃতির মুকুটটি বড়। টানা নেত্র যুগলে অসাধারণত্বের প্রকাশ। দুপাটি দাঁত কোথাও বাইরে প্রকাশিত, যেন দাঁতে দাঁত চেপে আছে। কোথাওবা এর বিপরীত। মুণ্ডমূর্তির মধ্যে থেকে এক কঠিন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বর্তমান। এই মুণ্ডমূর্তি আদৌ নারায়ণীর কিনা এ বিষয়ে গভীর গবেষণার অবকাশ আছে। বারামূর্তিদ্বয় বিশেষ কোন দেবদেবীর নামে চিহ্নিত হলেও এটি প্রকৃত তাৎপর্যে নৃমুণ্ড। বিশাল মুকুটযুক্ত মুণ্ডদুটির মধ্য থেকে দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরণের ভাব

লক্ষ্য করা যায়। যুগ্মবারা বা মুণ্ডমূর্তি প্রকৃতপক্ষে কৃষিভিত্তিক আদিম নৃগোষ্ঠীর উর্বরতা-জাদু-বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রতীক।

যেকোন লৌকিক দেবদেবীর উৎসসন্ধান করলে দেখা যায় যে তার মধ্যে রয়েছে আদিম লোকবিশ্বাস। যেমন জলাজঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে ভয় সর্পের। সর্পের কবল থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ সর্পকে পূজা করে। সর্পপূজাকে কেন্দ্র করে (Snake Cult) গড়ে ওঠে সর্পদেবী মনসার অবয়ব। আবার জঙ্গলে বাঘের থেকে মানুষ ভয় পায়, শুরু হয় আদিম মানুষের মধ্যে ব্যাঘ্র-পূজা। ব্যাঘ্রউপাসনাকে কেন্দ্র করে (Tiger cult) গড়ে ওঠে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশু-পরিবেষ্টিত পশুপতির অবয়ব। সিন্ধু সভ্যতার উৎখননে এমন পশুপতি-মূর্তির আবিষ্কার হয়েছে। এই পশুপতি শাস্ত্র -পুরাণের প্রভাবে হয়ে ওঠেন দেবাদিদেব মহেশ্বর বা মহাদেব। তেমনি কোন একসময়ে আদিম মানুষের ধারণায় সিংহবাহনা নারায়ণীর অস্তিত্বকল্পিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

এই অঞ্চলের নারাণী লোকসমাজে পূজিতা নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী নন। ইনি একান্তভাবেই আঞ্চলিক লৌকিক দেবী। বনবিবির জহুরানামা ও প্রচলিত পালাগানে তিনি দক্ষিণরায়ের জননী নারায়ণী বলে পরিচিতা। তাঁর স্বামী দণ্ডবক্ষমুনি। বনবিবির নিকট পরাস্ত হয়ে তিনি বনবিবিকে সই বলে সম্বোধন করেন ও প্রাণভিক্ষা চান। বনবিবি নারায়ণীকে সসম্মানে মুক্তিদান করেন ও সন্ধিস্থাপন করেন। সেই থেকে আঠার ভাঁটিতে বীরাঙ্গনা হিসাবে বনবিবি ও নারায়ণীর মূর্তিপূজা হয় বলে কথিত হয়।

ক্ষেত্র অনুসন্ধান লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এবং লৌকিক পালাগানের বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, নারায়ণী কোন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নারী বা শাস্ত্রীয় নারী নন। নারায়ণী মৌলিক তাৎপর্যে লোকবিশ্বাসজাত লৌকিক দেবী, যাঁর বিশিষ্ট রূপ বারা মুণ্ডমূর্তিতে প্রতিফলিত হয়। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ব্যাঘ্রবাহন নারায়ণীর উৎপত্তি কর্তিত মুণ্ডপূজা থেকে, যা নাকি দক্ষিণরায়ের কর্তিত (বারা) মুণ্ডপূজার সাথে পূজিতা হন। এই যুগ্ম বারাপূজা "লৌকিক বৈশিষ্ট্যে কৃষিসহায়ক আদিম উর্বরতা জাদুবিশ্বাস সঞ্জাত কাণ্ডবিহীন কর্তিত নৃমুণ্ডপূজা।"[৩] সামগ্রিক বিচারে মনে হয়, পৌরাণিক প্রভাবে আদিম জাদুবিশ্বাসজাত মুণ্ডমূর্তি কালক্রমে পূর্ণায়ত লৌকিক দেবী বা দেবমূর্তিতে পরিগণিত হয়েছেন। নারায়ণীর উৎস ও বিকাশের ধারায় এই ইতিহাস প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রচলিত পালাগানের গায়েনগণকেও নারায়ণীর আদি বারামুণ্ডরূপের বন্দনা করতে দেখা যায়।

এস মাতা নারায়ণী ধরি তোমার পায়
শুভদৃষ্টি দিও মাগো অধমের সভায়।
ভাঁটির দেশের জননী তুমি জগৎ মাতা
অধম সন্তান গায় তোমার পুণ্যকথা।
দক্ষিণরায়ের জননী তুমি স্বামী দণ্ডবক্ষ
বাদাবনে এসে হলে সকলের রক্ষ...।

বারামুণ্ডরূপে তুমি ছিলে বর্তমান
পূর্ণ জগদ্ধাত্রীরূপে হইলে প্রমাণ।।

উৎকলিত অংশটি গায়েন সুদিন মণ্ডলের নিকট হতে ক্ষেত্রগবেষণায় প্রাপ্ত নারায়ণী পালার প্রারম্ভিক বন্দনা অংশ থেকে গৃহীত। এই সমুদয় দিক থেকে মনে হয় প্রথমে লোকবিশ্বাসে দেবী জলাজঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের কাছে পূজা পেতেন। পরে সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে ভক্তিপ্রাবল্যে দেবীনারায়ণীর মূর্তি কল্পনা করা হয় ও লোককবিদের সৃষ্ট ছড়ায়, গানে ও লোককথায় দেবীর পরিচিতি বাড়ে ও ব্যাপক পূজার প্রচলন হয়। দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর ব্যাপক বারাপূজার প্রচলন দেখে মনে হয় এই দেবীর উৎস লোকসমাজের অনেক আদিতে। মোটের উপর বলা যায় নারায়ণী মৌলিক চরিত্রবৈশিষ্ট্যে আদিম লৌকিক দেবী। কালক্রমে শাস্ত্রীয় প্রভাবে পৌরাণিক দেবীনারায়ণী নামে অভিহিত হওয়া ও পূর্ণ দিব্যমূর্তিতে পূজিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

নারায়ণীর পূর্ণমূর্তির পূজা হয় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের যেকোন শনি ও মঙ্গলবার। আর বারামুণ্ড পূজা হয় পৌষ সংক্রান্তি থেকে পুরো মাঘ মাসের যে কোন দিন। দেবীর পূর্ণাঙ্গমূর্তিপূজা হয় এককভাবে, আর বারাপূজা হয় দক্ষিণরায়ের সাথে যুগ্মভাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারায়ণীর নিত্যপূজা হয়। আবার কোন স্থানে দেবীর বাৎসরিকপূজা হয়। নারায়ণীর পূজানুষ্ঠান করেন বর্ণব্রাহ্মণ। পূজার বিশেষ কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই। পুরোহিত দর্পণেও দেবীর পূজাপদ্ধতির কথা নেই। নিতান্ত লৌকিক ধারায় দেবীর পূজা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীর ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায় যা পৌরাণিক প্রভাবপ্রসূত বলে মনে হয়। এই ধ্যানমন্ত্র নারায়ণীমূর্তির সাদৃশ্য কিছু থাকলেও বৈসাদৃশ্যই বেশি। নারায়ণীদেবীর পূজারীর সাক্ষাতকারে জানা যায় যে, এই পূজা কিছুটা লক্ষ্মীপূজার মত করেই অনুষ্ঠিত হয় ও গ্রামের সার্বিক মঙ্গলকামনা করা হয়।[৪]

নারায়ণীর পূর্ণাঙ্গমূর্তিপূজা সাধারণত গৃহস্থ বাটীতে হয় না। গ্রামের সাধারণ স্থানে এই পূজা হয়। নারায়ণীর নামে দেবোত্তর জমিও দেওয়া থাকে। বট, অশ্বত্থ, পাকুড় প্রভৃতি বৃক্ষতলে দেবীর থান দেখা যায়। থান বলতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মাটির দেওয়াল, খড় বা টালির ছাউনি, কোথাও ইটের গাঁথুনীযুক্ত ঘর। দেবীর সব চাইতে পুরানো মন্দির খাড়িতে। ডাকার্ণবে খাড়ির নারায়ণীর উল্লেখ আছে। তাতে এই থানকে চৌষট্টি তান্ত্রিক পীঠের অন্যতম বলা হয়েছে। "পূজার প্রাধান্য ও পূজাক্ষেত্রের প্রাচীনতা দেখলে মনে হয় নারায়ণীপূজার উৎপত্তিকেন্দ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 'খাড়ি' নামক স্থানে। এখানে এই দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির বা পাকাথান আজও অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে। এর ভিত্তির ইট লক্ষ্য করলে আদি পাঠানযুগের বলে মনে হয়। খাড়ি এখন নগণ্য পল্লী, কিন্তু চব্বিশ পরগণা জেলার তথা সারা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন।"[৫]

রাজপুরের নারায়ণীর মন্দিরটিও প্রাচীন। ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী মনে করেন, এই

নারায়ণী মদন রায় জননী নারায়ণী, তিনি মদন রায়কেও দক্ষিণরায় বলতে চান।[৬] এছাড়া বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামের নারায়ণীতলার নারায়ণীর প্রাচীনত্ব জানা যায় না। প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলেন নারায়ণীর থানটি জঙ্গলপত্তনে। এমনই বহু থান আছে যাদের ইতিহাস কালের অতলে বিলীন হয়েছে। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে, নারায়ণীর বেশির ভাগ থান নদীর ধারে। মাঝি-মাল্লারা নৌকা বেয়ে নদী পথে যাবার সময় 'মা নারায়ণীর নামে-বদর বদর বল' বলে ধ্বনি দিয়ে থাকেন। এখন অবশ্য নদী অনেক জায়গায় মজে গেছে, আছে কেবল নারায়ণীর থানগুলি।

নারায়ণীর পূর্ণাঙ্গমূর্তিপূজায় পুরুষ অপেক্ষা মহিলা ও শিশুদের আগ্রহ বেশি। নারায়ণীর পূর্ণাঙ্গমূর্তি পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূজার বেশ কিছুদিন আগে থেকে মেয়েরা সরা বা মালসা নিয়ে মাঙন করতে বার হয়। মাঙন করারও বিশেষ রীতি আছে। গ্রামের মেয়েরা একত্রিত হয়ে একটি দিন ধার্য্য করে, তারপর নির্দিষ্ট দিনে সবাই এসে নারায়ণীর থানে জড়ো হয়। একটি খড়ের আঁটি ভিজিয়ে থানে রাখা হয়, তারপর পাশের কোন নির্দিষ্ট পুকুর থেকে স্নান করে উঠে ভিজে কাপড় ছেড়ে খড়ের আঁটি থেকে একটি করে খড় নিয়ে গলায় বেঁধে মাঙন করতে পাড়ায় পাড়ায় বার হয়। এই রীতিকেই গলায় 'কুটো বেঁধে মাঙন' বলা হয়। সমস্ত মেয়েরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দলে ২-৩ জন করে থাকে। সারাদিন মাঙন করে সন্ধ্যার আগে সবাই এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়। এই পদ্ধতিতে মাঙন করাকে বলে 'দেশপালামাঙন'। ঐ একই মাসে কাছাকাছি সময়ের ব্যবধানে কয়েকটি উৎসব বা পূজা আছে। যেমন — দেওয়ান গাজী, বিবিমা, সীতামা, মানিকপীর ইত্যাদি। এই উৎসবগুলোকেও একসাথে 'দেশ পালাপুজো' বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাঙন শেষে সমস্ত চাল বিক্রি করে যা পয়সা হয়, সেই পয়সা সবাই ভাগ করে নিয়ে ঐ সমস্ত পূজায় অংশগ্রহণ করে ও মাঙনের পয়সায় পূজা দেয়। উক্ত নিয়ম মেনে কেউ মাঙন করে আবার কেউ বিচ্ছিন্নভাবে মাঙন করে পূজা দেয়। নারায়ণীপূজার দিনই স্থান বিশেষে ঐ থানের পাশেই বনবিবি ও বিবিমার হাজত হয়। কোথাও নারায়ণীপূজা উপলক্ষে পালাগান ছাড়া যাত্রা, পুতুলনাচ, তরজা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। দেবী-মূর্তির সামনে সশিষ-ডাবযুক্ত ঘট বসান হয়, তার উপর থাকে কাপড়, গামছা, শোলার ফুল ও মালা। কঞ্চির তীর মূর্তির চারকোণে পুঁতে লালসুতা দিয়ে দেবীমূর্তিসহ বা কেবল দেবীঘটটিকে ঘিরে রাখা হয়। সাধারণ পূজাস্থলের চারদিকে থরে থরে পূজার ডালা দেওয়া হয়। ধূপ, ধূনা, প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বেলে দেবীর পূজা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতেই বারাপূজার প্রচলন অধিক। জঙ্গল অধ্যুষিত প্রায় প্রতিটি গৃহস্থই এই পূজা করেন। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে অপারগ (অসমর্থ) ব্যক্তিগণ জোড়া মূর্তি ক্রয় করে ভিন্ন দুই স্থানে একটি করে মূর্তি বসিয়ে পূজা দেন। কোন কোন গৃহস্থ একাধিক স্থানেও জোড়ামূর্তি পূজা দেন। বহির্বাটিতে বেদীনির্মাণ করে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বারাপূজার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া জঙ্গলে বা গাছের ডালে এ পূজা হতে দেখা যায়।

বর্ণব্রাহ্মণ ছাড়া সাধারণ নিম্নবর্ণের হিন্দুও এই পূজানুষ্ঠান করেন। পূজার উপকরণ অতি সাধারণ। চিনির সন্দেশ, বাতাসা ও সাধারণ ফলমূল সাধারণত নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালিয়ে ধূপ ধুনা ও ফুলদূর্বা দিয়ে দেবীর পূজা হয়। দেবীর পূজায় তান্ত্রিক আচার আছে। দেবীর জাতাল পূজা মদ, মাংস ও বলিদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পূর্ণমূর্তিপূজাতে এই তান্ত্রিক আচার বিরল। অথচ ডাকার্ণব গ্রন্থে তান্ত্রিক দেবীরূপে নারায়ণীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ক্যানিং থানায় নারায়ণপুর গ্রামে (পালাগানে উল্লিখিত) দেবীনারায়ণীর পূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার দেবীনারায়ণীর সাথে ঘুটিয়ারী শরীফের মোবারক গাজীর বিশেষ সম্পর্ক আছে। মোবারক গাজী ভাটির অঞ্চলে আসার আগে নারায়ণপুরের দেবীনারায়ণীর নিকট এসে অপরা/অপোড়া পৃথিবীর সন্ধান জানতে চেয়েছিলেন বলে মোবারক গাজীর পালাগানে উল্লেখ আছে। দেবীনারায়ণীর থান থেকে কিছু দুরে মোবারক গাজীর দরগা আছে। নারায়ণীর মন্দির ও দেবীমূর্তি কমপক্ষে আড়াইশত বৎসরের পুরানো বলে প্রচলিত ধারণা। নারানপুরের নারায়ণী গ্রামদেবী রূপে পূজা পান। এই অঞ্চলটি পূর্বে সুন্দরবনের অন্তর্গত ও বিদ্যাধরী নদীর তীর, ছিল বর্তমানে নদীর চিহ্নমাত্র নেই। এই জঙ্গলে একটি পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়। এটি আনুমানিক ৪-৫ কিলোগ্রাম ওজন। কালোপাথর, মায়ের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ এখানে স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে সেই নুড়ি পূজা হয় এবং একটি সিংহাসনে দেবী নারায়ণীর দণ্ডায়মান দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নারায়ণীর এমন মূর্তি বিরল। এই দারুমূর্তিটি কত বছর আগে কে নির্মাণ করেছিলেন তা জানা যায় না। মূর্তিটি সাড়ে তিন থেকে চারফুট উচ্চ। দেবীর চার হাত। বামদিকের উপর হাতে শঙ্খ ও ডানদিকের উপর হাতে চক্র। সাক্ষাতকারে জানা যায় দুটি হাত খালি থাকায় বর্তমান পূজারী গদা ও পদ্ম দিয়ে রেখেছেন। দেবীর কোন বাহন নেই। দেবীর কানে পাশা জাতীয় অলংকার, নাকে নাকছাবি, গলায় হার, মাথায় ত্রিচূড় চূড়া। মাথার চুল চূড়ামত করে গোছান। পরনে লালপাড়যুক্ত সাদাশাড়ি, কখনো বা রঙীনশাড়ি পরানো হয়। মূর্তিটি অনেকখানি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির মত। এটি প্রাচীন বাংলার মূর্তি শিল্পের প্রভাব জাত মূর্তি।

নারানপুরের নারায়ণীর গ্রামদেবীরূপে নিত্য অন্নাদি দিয়ে পূজা বা ভোগারতি হয়। বাৎসরিক পূজা হয় জৈষ্ঠ্য পূর্ণিমায়। এইসময় দেবীর অঙ্গরাগ হয়। দেবী শাক খেতে পছন্দ করেন বলে লোকবিশ্বাস। শস্যক্ষেত্র থেকে শাকসব্জী তুলে নিয়ে দেবীকে মন্দিরে উঠতে দেখেছেন, এমন কথিত হয়। সেকারণে ক্ষেতে নতুন ফসল হলে গ্রামবাসীগণ প্রথম শস্য দেবীর সেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। এমনকি গরুর দুধ হলেও প্রথম দোহনের দুধ দেবীর উদ্দেশ্যে দিয়ে যান। বাৎসরিক পূজার সময় এখানে ছাগবলি হয়। বলি সাধারণত মানত-কারীরা দিয়ে থাকেন। ৬-৭ টি বলি হয়। এছাড়া ফাল্গুন মাসের শুক্ল তিথিতে এখানে সমগ্র গ্রামভিত্তিক হরিনামের আসর বসে। সাতদিন ধরে এই হরিনাম উৎসব চলে। এক মঙ্গলে

দেবীর ঘট বসে আর এক মঙ্গলবারে ঘট তোলা হয়। গ্রামে কলেরা, বসন্ত হলেও দেবীর কাছে মানত করে এই নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বৈশাখ মাসে ঝারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ১লা বৈশাখ দেবীর নুড়ি পাথরের উপর জলের ঝারি দেওয়া হয়। এটি একমাস চলে। এই একমাস প্রত্যহ তিনবার করে দেবীর অন্নভোগাদি হয়। ঝারা সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত চলে। তারপর দেবীকে সিংহাসনে তুলে দেওয়া হয়। এই নিয়ম বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে। হিন্দু, মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা দিতে আসেন। কুকুরে কামড়ালে এখানকার পুরোহিত স্বপ্নে-পাওয়া মায়ের ওষুধ দিয়ে থাকেন। এটি অব্যর্থ ওষুধ বলে বিশ্বাস। প্রতি রবিবার এই ওষুধ দেওয়া হয়। নীলবাতি, বারুণীর স্নান প্রভৃতি তিথিতে এখানে বেশি লোক সমাগম হয়।

নারায়ণপুরের নারায়ণীর মাহাত্ম্য ব্যাপক। স্থানীয় মানুষ ছাড়া বহু দূর দূর থেকে মানুষ রোগ, শোক, বিষয়-সম্পত্তি, সাংসারিক অশান্তি প্রভৃতি সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য, দেবীর কাছে আসেন, মানত করেন ও পূজা দেন। দেবীর কৃপায় এখানে মানত করে বহু মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখনও তাঁদের কেহ দূরে থাকলেও দেবীর পূজার জন্য বহু অর্থ সাহায্য করে থাকেন। দেবীর মন্দিরও বর্তমানে এই রকম ভক্তদের সাহায্যে বেশ সুন্দর ও সুগঠিত হয়েছে। দেবীনারায়ণীর নামে বর্তমানে একবিঘে জমি আছে। পূর্বে বহু সম্পত্তি ছিল, বর্তমানে তা বিক্রয় হয়ে গেছে। ফলে মেলার আড়ম্বরাদি কিছু কমে গেছে বলে জানা যায়। এখনো লোকের বিশ্বাস, দেবীনারায়ণী গ্রামের সমস্ত মানুষজনকে রক্ষা করেন। নারায়ণপুরের বিশিষ্ট ক্ষেত্রঅনুশীলনের সূত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, দেবীনারায়ণী বিভিন্ন মূর্তিতে ও নানাভাবে বিভিন্ন স্থানে পূজিত হন এবং এই পূজার অঙ্গ হিসাবে প্রায় সর্বত্র সংশ্লিষ্ট দেবীর পালাগানের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তিগত ও গ্রামগত মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে নারায়ণীপূজা ও দেবীর পালাগান অনুষ্ঠিত হয়।

চব্বিশ পরগণায় বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় বনবিবি বা দুখের পালার মধ্যে এবং বনবিবি জহুরানামায় নারায়ণীর প্রসঙ্গ আছে। বনবিবির পালাগানে যেহেতু নারায়ণীর কথা আছে সেইহেতু বনবিবির পালাগানকে অনেক স্থানে নারায়ণীপালা বলে গীত হয়। কোথাওবা বনবিবির পালার 'ধনা-দুখের' অংশটি গেয়ে পালাগায়কগণ বনবিবি ও নারায়ণীর দোহাই দিয়ে পালা শেষ করেন। কোন কোন পালাগায়ক বনবিবির জহুরানামা পুঁথির বনবিবি ও নারায়ণীর জন্মকাহিনী অংশকে নারায়ণীপালা বলে গান করেন। পালাগায়ক সুদিন মণ্ডল একটি স্বতন্ত্র নারায়ণীর পালা গান করেন। পালাটি তাঁর নিজের লেখা বলে তিনি দাবি করেন। এই পালায় নারায়ণীর মাহাত্ম্য প্রচারের যে কাহিনী আছে মূল বনবিবির পালায় তা নেই। গায়েন সুদিন মণ্ডল নারায়ণীর পালা গাওয়ার সময় বনবিবি ও শাজঙ্গুলী উভয়ের জন্মবৃত্তান্তটি সংক্ষেপে বলে নারায়ণীর পালায় প্রবেশ করেন। এই অংশে বনবিবি ও নারায়ণীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পেলেও নারায়ণীর মাহাত্ম্য বেশি করে দেখানো হয়েছে। পালাগানের রীতি

অনুযায়ী তিনি প্রথমে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, গুরুবন্দনা, নায়েকবন্দনা ইত্যাদি সেরে মূল পালাগানে প্রবেশ করেন। পালাটি গাইতে প্রায় তিনঘণ্টা সময় লাগে। পালাটি নিম্নরূপ —

নারায়ণীর পালা

বন্দনা

এস মাতা নারায়ণী ধরি তোমার পায়।
শুভদৃষ্টি দিও মাগো অধমের সভায়।।
ভাঁটির দেশের জননী তুমি জগৎ মাতা।
অধম সন্তান গায় মাগো তোমার পুণ্যকথা।।
দক্ষিণরায়ের জননী তুমি স্বামী দণ্ডবক্ষ।
বাদাবনে এসে হলে সকলের রক্ষ।।
বারামুণ্ড রূপে তুমি ছিলে বর্তমান।
পূর্ণজগদ্ধাত্রীরূপে হইলে প্রমাণ।।
বনবিবির সাথে মাগো সই পাতিয়েছিলে।
তার মান রাখতে ভাঁটি ভাগ করে নিলে।।
মাঝিমাল্লা মৌলে বাউলে আর কাঠুরে।
তোমার স্মরণে তারা বিপদ হতে তরে।।
দয়াময়ী মা তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু।
তোমার দোয়ায় গায় সুদিন সুচারু।।
সিংহবাহনে দেবী মোর আসরেতে এস।
নায়েকের গৃহে মাগো অটল হয়ে বস।।
রক্তবস্ত্র পরিধানে স্বর্ণ চূড়া মাথে।
চতুর্ভুজা দেবী তুমি তীরধনুক হাতে।।
যেমন দয়া করেছিলে মাঝিমাল্লার তরে।
তেমনি দয়া কর আমার আসরের পরে।।
যেমন দয়া করেছিলে খাড়ির ঠাকুর রঘুনাথে।
তেমনিভাবে থাক নায়েকের সাথে।।
চব্বিশ পরগণায় বাড়ী পিতা গোপাল মণ্ডল নাম।
বারুইপুর থানায় বেগমপুর ধাম।।
নারায়ণী স্বপ্নে মোরে পরিচয় দিল।
তাঁর মাহাত্ম্য দেবী গাইতে বলিল।।
ভক্তি শক্তি নাহি কিছু দেবীর গান গাহি।
সুদিন মণ্ডল দেবীর পাদপদ্ম স্মরি।।

জগৎজননী মা নারায়ণী ধরি তব পালা।
অধম সন্তান চরণে, কোরো না অবহেলা।।

কথা ।। প্রাচীনকালে আমাদের এই সুন্দরবনে' আঠারভাটি' নামে এক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন দণ্ডবক্ষমুনি। নিষ্ঠাবান সেই ব্রাহ্মণরাজার স্ত্রী ছিলেন সতীসাধ্বী নারায়ণী। তাঁদের এক পুত্র সন্তান ছিল, নাম দক্ষিণরায়। তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। নরবলি দিয়ে পূজা করতেন এবং সেই মাংস খেতেন। তাঁর এই দুর্নীতির জন্য রাজ্যের প্রজারা দক্ষিণরায়কে খুব ভয় করত।

ধোয়া ।। অহংকারের ভার ঠাকুর কোনদিন সইতে না পারে।
দর্পহারী দর্পচূর্ণ করার লাগি দিনে দিনে ভাবে।।

কথা ।। এই কথা ভেবে দর্পহারী নারায়ণ স্বর্গে মনে মনে চিন্তা করে মক্কার শহরে বেরাহিম নামে তাঁর এক ভক্তকে পয়দা করলেন। বেরাহিমের স্ত্রী ছিল ফুলবিবি, কিন্তু তাঁর কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় দারগ্রহণ করেন। নাম তাঁর গুলালবিবি।

ধোয়া ।। আল্লার রসুলে গুলালবিবির গর্ভে সন্তান এসেছিল।
আর ফুলবিবির আদেশে বেরাহিম তারে বনবাসে দিল।।
বনমধ্যে গুলাল বিবির দুই সন্তান প্রসব হল।
দৈববাণী শুনে বিবি তাদের নাম শাজঙ্গুলী ও বনবিবি রাখিল।।

কথা ।। মাগো আমরা যাঁরে ঈশ্বর বলি, মুসলমানরা তাঁরে বলে আল্লা। সেই আল্লার মর্ত্যে দুই পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। দর্পহারী দয়াময় তাঁর এই দুই পুত্রকন্যাকে দিয়ে নরখাদক অহংকারী দক্ষিণরায়ের দর্পচূর্ণ করার ব্যবস্থা করলেন।

পাঁচাল ।। বনমধ্যে বনবিবি শাজঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করায় গুলাল বিপাকে পড়েছিল।
কন্যা সন্তান ফেলে রেখে বিবি শাজঙ্গুলীকে কোলে তুলে নিল।
বনের যত হরিণ ছিল তারা বনবিবির মানুষ করেছিল।
আল্লা তালার কৃপায় দেবী অলৌকিক ক্ষমতা পেল।।

ধোয়া ।। এদিকে গুলালবিবি বনমধ্যে শাজঙ্গুলীকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
কারার শেষে বেরাহিম গুলালের খোঁজে বনমধ্যে যায়।
বেরাহিমকে দেখে গুলাল অনেক গোসা করেছিল
করজোড়ে বেরাহিম তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল।
গুলালকে নিয়ে বেরাহিম ঘরে ফিরতে চায়।
কোথায় ছিল মা বনবিবি সেখানে এসে দাঁড়ায় গো ও তার মায়া —

কথা ।। মাগো, গুলালবিবি ও শাজঙ্গুলীকে নিয়ে বেরাহিম ঘরে ফিরতে চায়। বনবিবি তখন তথায় এসে শাজঙ্গুলীর হাত ধরে বলে কোথায় যাবে ভাই? আঠারভাঁটিতে আমাদের নামের জাহির করার জন্য আল্লাতালা আমাদের মর্ত্যে পাঠিয়েছেন, সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে?

এই কথা শুনে শাজঙ্গুলী বোনের হাত ধরেছিল।
পিতামাতা ত্যাগ করে তারা মদিনাতে গেল।।

কথা ।। মদিনাতে গিয়ে তারা খোদার দোয়া মেঙেছিল, দোয়া নিয়ে বনবিবি ও শাজঙ্গুলী আঠারভাঁটিতে এল। আঠারভাঁটির বিখ্যাত নাম জুড়ি। এই জুড়িতে এসে তারা মোকাম বানিয়েছিল। মোকাম থেকে শাজঙ্গুলী ভীষণ আজান হেঁকেছিল। সেই আজান শুনে দক্ষিণ-রায় ভীত হয়েছিল। তখন দক্ষিণরায় তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে বললেন, দেখে এস তো কে আজান দিচ্ছে? এতো আমার বন্ধু বরখান গাজী নয়। তুমি ওকে এখান থেকে একেবারে দূর করে দাও। আমার রাজ্যের সীমানা না জেনে ওরা হয়তো এখানে ঢুকে পড়েছে।

এই আদেশ পেয়ে অনুচর জুড়িতে এসেছিল।
দেখে দুইবাহু তুলে বনবিবি শাজঙ্গুলী নামাজ পড়ছিল।।

কথা ।। অনুচর তাদের কাছে গিয়ে বলে, দেখ, তোমরা কারা জানি না, তবে জাতে মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। এটা দক্ষিণরায়ের রাজত্ব। তাঁর আদেশ, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এ কথা শুনে বনবিবি সনাতনকে বলেন, তোমার রাজার কাছে গিয়ে বল, এখন থেকে মা বনবিবি ভাঁটির দেশের অধিশ্বরী। এখানে নরখাদক দক্ষিণরায়ের থাকার কোন অধিকার নেই।

ধোয়া ।। এই কথা শুনে অনুচর ঘরে ফিরে গেল।
একে একে সব কথা রায়েরে কহিল।।

কথা ।। এই কথা শুনে দক্ষিণরায় রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যত দেও-দান-ভূত-প্রেত-ডাকিনী নিয়ে বনবিবির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু দক্ষিণরায়ের জননী নারায়ণী সেখানে উপস্থিত হয়ে দক্ষিণরায়কে নিরস্ত্র করলেন। বললেন, তোমার যুদ্ধে যাওয়া হবে না। কারণ স্ত্রীলোকের সাথে যুদ্ধ করা তোমার সাজে না। তুমি বীর। বীরের উচিত বীরের সাথে যুদ্ধ করা। বরং তুমি থাক, আমি যাই।

গীত ।। (ঝাঁপতাল) নারীর সাথে জিতিলে তোমার নাহি হবে খ্যাতি
হেরে গেলে খোয়াবে তোমার কুল মান জাতি।
আওরাতে আওরাতে লড়া ভাল শাস্ত্রমতে কয়।
খ্যাতি বরং আছে তাতে করিলে তারে জয়।।

অতএব বাবা দক্ষিণরায়, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমাকে আমি এ যুদ্ধে পাঠাব না। বরং আমি যাই, তুমি থাক। এই কথা বলে মা নারায়ণী সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন আর মায়ের আদেশ দক্ষিণরায় মাথা পেতে নিলেন।

গীত ।। (সাততালে তেহাই) কি বলিব বিধাতারে
সাজ সাজ বলে তখন মা নারায়ণী চলিল
যুদ্ধসাজে সৈন্যগণ সব অগ্রসর হইল গো।

পাঁচালগীত।। ওমা নারায়ণীর লীলা বল কে বুঝিতে পারে গো

ভূত-প্রেত-দেও-দান যুদ্ধসাজে সাজে গো .... আজ নারায়ণীর বরে
শত শত ভূত-প্রেত উল্লাসেতে নাচে গো .... ঐ
দেও-দান-ডাকিনীগণ নাচে তালে তালে গো .... ঐ
কেহ নাচে ধীরে ধীরে কেহ নাচে জোরে গো .... ঐ
কেহ বলে মার মার কাট কাট মুখে গো .... আজ নারায়ণীর বরে
উল্লাসেতে যুদ্ধসাজে নাচিল সবেতে গো .... ঐ
সেনাগণের নৃত্য দেখে নারায়ণী হাসে গো .... ঐ
সেনাগণের অগ্রে মাতা চলে ধীরে ধীরে গো .... ঐ
নানা বাদ্য বাজে তালে আকাশ বাতাস কাঁপে গো ...... আজ নারায়ণীর বরে
মার মার বলে দেবী অগ্রসর হল গো .... ঐ
জুড়িতে ছিল বনবিবি যুদ্ধসাজে সাজে গো .... ঐ
দুইদল মুখোমুখি আসি উপস্থিত হল গো .... ঐ

কথা ।। নারায়ণীর সৈন্যসামন্ত দেখে শাজঙ্গুলী প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিল। জঙ্গুলীর ভীত অবস্থা দেখে বনবিবি তার পিঠে এক করাঘাত করে বলেন, তুমি ভয় পাও কিসে শাজঙ্গুলী? তুমি খোদাতালার নাম স্মরণ করে খুব জোরে আজান দাও, দেখবে ঐ ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, দেওদান সব ফুৎকারে উড়ে যাবে। বনবিবির কথা শুনে শাজঙ্গুলী দুবাহু উর্ধ্বে প্রসারিত করে খোদার নামে মোনাজাত করে আজান দিয়েছিল, খোদার কৃপায় নারায়ণীর ভূত, প্রেত হাওয়ার ভরে উড়ে পালাল। অবাক হয়ে মা নারায়ণী তখন চতুর্ভিতে ফিরে দেখে মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন, বললেন, হায় সর্বনাশ! এক মুসলমানের ছেলে আজান দিল আর আমার সমস্ত সৈন্যসামন্ত সব পালাতে শুরু করল।

পাঁচালগীত ।। এই দৃশ্য দেখে নারায়ণী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
নিজেই তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।।

নারায়ণী ঃ শোনরে বলি ও বনবিবি মুসলমানের মেয়ে।
আজ আমার সাথে যুদ্ধ করে তুই মর পরানে।।

বনবিবি ঃ শোন শোন নারায়ণী বলি ও রায়ের জননী।
উচিত শিক্ষা দেব তোকে দেখহ এখনি।।

নারায়ণী ঃ হানিলাম তোর অঙ্গে চক্রবাণ এখন।
রক্ষা কর বিবি তোর বাহুতে ক্ষমতা কেমন।।

বনবিবি ঃ চেয়ে দেখ নারায়ণী মোর কলেমার জোর।
তোর চক্রবাণ দেখ এই ভূমে দিলাম গোর।।

কথা ।। প্রথম বাণ খসে যেতে নারায়ণী চমকিয়া উঠিল। মুষল মুদ্গর বাণ হাতে নিয়ে দেবী ভাবিতে লাগিল।।

নারায়ণী : এই বাণ ছাড়িলাম বিবি তোমার দিকেতে।
রক্ষা নাহি পাবে তুমি জেন কোন মতে।।

বনবিবি : আজান হাঁকি ধূসর বাণ জুড়ি, বনবিবি আমি।
ভীষণ মুষল খান খান করি চেয়ে দেখ তুমি।।

কথা ।। ধূসর বাণের জোরে যখন সে বাণ খান খান হল, ক্রোধে তখন নারায়ণী জ্বলে উঠল। অগ্নিবাণ হাতে নিয়ে দেবী করে মার মার। অগ্নিতেজে বনবিবির সম্মুখে হলো আগুয়ান।।

নারায়ণী : শোনরে বলি ও মোল্লার মেয়ে বলি যে তোরে
অগ্নিবাণে পোড়াইব এই জঙ্গল মাঝারে।

বনবিবি : চেয়ে দেখ নারায়ণী তোর বাণের কি ক্ষমতা।
বরুণবাণে অগ্নি নিভে আনিল সমতা।।

কথা ।। অগ্নিবাণ ব্যর্থ দেখি মা নারায়ণী ভাবে মনে মনে, নাগপাশ নিয়ে দেবী চিন্তেন তখনে। বিধাতার কি ইচ্ছা দেবী বুঝিতে নাহি পারে, আদ্যাশক্তির স্মরণ করে দেবী নাগপাশ ছাড়ে।

বনবিবি : শোনরে বলি নারায়ণী দণ্ডবক্ষের নারী।
তোর শতেক বাণ আমি পাসরিতে পারি।।
গরুড়বাণ ছাড়িলাম নাগ রক্ষা কর এবে।
নাগ সব পলাইল গরুড় দেখে যবে।।

কথা ।। মুষল, অগ্নি, নাগপাশ ব্যর্থ হল দেখে বনবিবির ক্ষমতা ভেবে দেবী বিস্মিত হন। বীরজায়া, বীরমাতা তখন বিপদ গনেছিল, হাঙ্গরবাণ তূণে ছিল তা হাতে তুলে নিল।

নারায়ণী : শোনরে বলি ও মোল্লার মেয়ে রক্ষা কর এবে।
হাঙ্গরবাণ ছাড়িলাম আমি তোমার উপরে।।
হাড় মাংস কুচে বাণ খান খান করিবে।
কেমনেতে রক্ষা পাস দেখি এই জঙ্গল মাঝারে।।

কথা ।। খোদাতালার লীলা বল কে বুঝিতে পারে, ভীত মনে বনবিবি আজান হাঁকে ধীরে। আল্লার দোয়ায় দেবীর বাণ ফিরে গেল, এবারেও বনবিবির জয় হয়েছিল। যত বাণ ছিল দেবীর একে একে মারে, খোদার দোয়ায় বিবির ছুঁতে নাহি পারে। বাণ গেল রসাতলে কলেমার গুণে, তখন রায় জননী নারায়ণী ভাবে মনে মনে।

গীত ।। (ঝাঁপতাল) জান বৃথা হবে আজি শেল পাশ উঠাইল গো
বনবিবির পরে বেড়া বাণ নিজে চালাইল গো।
বাণ ঘোরে চতুর্ভিতে কলেমার গুণে গো
বিপাক দেখিয়া বিবির বাক্য নাহি মুখে গো।
বরকতের ঝোলাবিবি নিজে নিকালিল গো।
এছম পড়িয়া ঝোলা জমিনে ডালিল গো।
ঝোলার গুণেতে বাণ হইল খান খান গো।

নারায়ণী দেখে তাহা ভাবিল নিদান গো .... বাণ গেল রসাতলে কলেমার গুণে..

বুঝিয়া তখন বাণ ফুরাইল গো .... ঐ
রথ হতে নারায়ণী গোসায় নামিল গো ...... ঐ
ছোরা হাতে লইয়া তখন করে মার মার গো .... ঐ
ছোটে যেন নারায়ণী বাঘিনীর মত গো ...... ঐ
খঞ্জর লইয়া মারে বিবির উপরে গো ...... ঐ
লাগিল বিবির গায়ে যেন ফুল হয়ে ঝরে গো .... ঐ
আঘাত না করে ছোরা দোয়া ফতেমার গো .... ঐ
নারায়ণী দেখে বলে এ কি অবতার গো ...... ঐ
না লাগে বিবির গায়ে ফুল সব ঝরে গো ...... ঐ

কোল ধোয়া ।। বাণ নারায়ণীর সর্বশেষ হয়েছিল। দন্ত কড়মড়িয়ে তখন জমিনেতে পড়ল। বিশাল ঘুষির ঠেলা নারায়ণী মারে বিবির গায়, খোদার এমন দোয়া ছিল বিবি স্থির হয়ে রয়। আমি কি বলব কারে, আমার কপালে সকল করে, কি বলব কারে।

পাঁচাল ।। আমি রাগভরে মারলাম ঘুষি বিবির গায়ে।
কপালের ফেরে ঘুষি গেল ফসকাইয়ে।।
পুনরায় নারায়ণী ক্রোধে লাথি তুলেছিল।
এত অহংকার আল্লা সহিতে নারিল।।
লাথি তার বৃথা গেল বিবি দূরে দাঁড়াইয়াছিল।
দৌড়ে গিয়ে নারায়ণী বিবির কোমর জড়িয়েছিল।।
হস্তিতে হস্তিতে যেন এবার লড়াই বেধে গেল।
নারায়ণীর তেজে বিবি দুর্বল হয়ে গেল।।

কথা ।। বহুক্ষণ ধরে বনবিবি নারায়ণীর সাথে লড়াই করে বলহীন হয়ে পড়ল। নারায়ণী যখন তার কোমর পাকড়ে ধরে, বিবি তা সামলাতে না পেরে ভূমে আছড়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে নারায়ণী বিবির বুকে চড়ে বসে।

বুকে চড়ে চুলে ধরে বিবির মাথা ঠোকে ভূমে।
জ্ঞান হারিয়ে বনবিবিমা থাকে অচেতনে।।

কথা ।। বিবির অচেতন ভাব দেখে নারায়ণী সহাস্য বদনে বুক হতে নেমে ভাবে বিবি গেল আজি মরে, কিন্তু বনবিবি আল্লার দোয়ায় ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পায়। তারপর তিনি বরকত জননীর স্মরণ করে আর বলে—

গীত ।। (আড়া খেমটা)

আহা কোথা আছ মাতা এসে দাও গো দেখা
ওগো বরকত জননী।
ও মা তোমার দোয়া নিয়ে আমি এসেছি এখানে

দারুণ নারায়ণীর হাতে পরান যায় এখনি।।
ও মা কোথা আছ তুমি বরকত জননী।
কৃপা করে আজি দেখা দাও এখনি।।

কথা ।। মা বনবিবির কাতর ডাক বরকতবিবি শুনতে পেল। তখন খোদাতালার আদেশে বিবি ঝড়বৃষ্টি নিয়ে সেখানে এল। দৈববাণী ধীরে ধীরে বনবিবির কর্ণগোচর হল। মা বরকতবিবি হাওয়ার সাথে বলতে লাগল। আমার নাম স্মরণ করে তুই আজান হাঁক ভূমিতলে পড়ে, আমার দোয়াতে রায় জননী ঠিকরে পড়বে জমিনের উপরে। দৈববাণী শুনে বিবি কলেমা উচ্চারিল, মা বরকত-বিবির দোয়ায় নারায়ণী ভূমিতলে পড়িল।

ধোয়া ।। ওগো ভূমিতলে যবে পড়ে নারায়ণী নিজে, তখন সবল হয়ে বনবিবি তার বুকের উপর চড়ে গো। — আমি কি বলব কারে, তার কপালে.....

কথা ।। নারায়ণীর বুকের উপর যখন বনবিবি চেপে বসেছিল, এমন সময় বরকান গাজী সেখানে উপজিল। বরকান গাজীকে দেখে নারায়ণীর বুকের উপর থেকে বনবিবি নেমে এলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত গাজীকে বলতে লাগলেন।

সকল কথা শুনে গাজী দোঁহার মধ্যস্থতা করল।
কাতর হয়ে উভয়ে নিরস্ত্র হল।।
দেবী বিবির দ্বন্দ্ব জেন কভু ভাল নয়।
দ্বন্দ্ব ভুলে উভয়েতে বন্ধু ভাব হও।
গাজীর কথা শুনে দোঁহে নিরস্ত্র হল,
মহানন্দে দুজনেতে সই পাতিয়েছিল।
বনবিবির কথায় সেদিন হতে নরবলি বন্ধ হয়েছিল।
আঠারভাঁটির মানুষজন শান্তি লাভ করল।।

কথা ।। বরকানগাজীর পরামর্শে নারায়ণী ও বনবিবি সই পাতিয়েছিল। খই, দই, চাল, কড়ি, দুইহস্তে নিয়ে উভয়ে সেথা দণ্ডায়মান হল। উভয়ের হাত আজ একত্রিত হল। হিন্দু-মুসলমানের আর কোন ভেদ রইল না। তোমরা হিন্দু-মুসলমান জাত-অনজাত আমার আসরে আজ যে যেখানে আছ, দুই মায়ের নাম করে এই অনুষ্ঠানে আমাদের হাতে চাল, পয়সা দিলে সবাই পরম শান্তিতে থাকতে পারবে। সংসারে ছেলেপুলে ভাল থাকবে। যাঁরা বিধবা তাঁরা অন্তরে নারায়ণী ও মা বনবিবির নাম স্মরণ করে কড়িদান করলে সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করবে। যাঁরা সন্তানের মা তাঁরা দুধের রঙের মত মনটা সাদা করে নারায়ণী ও বনবিবির নামে আমাদের হাতে কড়িদান করলে তাদের সন্তান প্রতিষ্ঠালাভ করবে ও সুখে থাকবে। যারা অন্ধ তারা চক্ষু ফিরে পাবে। যে যেমন মনস্কামনা নিয়ে কড়ি করবেন দান, মা বনবিবি নারায়ণী তাঁদের পুরাবে মনস্কাম।

বরকানগাজীর মধ্যস্থতায় উভয়ের বন্ধুত্ব হওয়ায় উভয়ে পরম সন্তোষলাভ করে। উভয়ে একাসনে বসে পরস্পর বলাবলি করে এবং একে অপরকে অভয় দিয়ে বলেন এই

আঠারভাটি আজ থেকে দোঁহে ভাগ করে নেব। একভাগে থাকবে তুমি অপর ভাগে থাকব আমি, আমরা কেউ কোনদিন কারোর উপর হিংসা করব না।

আঠারভাটি ভাগ করে বোনবিবি জঙ্গুলীকে সঙ্গে করে নিল, ভুরকুণ্ডে এসে বিবি আপন মোকামে উপবিষ্ট হল। লক্ষ লক্ষ সালাম দোঁহে দোঁহাকার দেয়। হস্ত প্রসারণ করে দোঁহে দোঁহার বুকে জড়িয়ে এই কথা কয়। আঠারভাটি সমস্ত লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, আকাশ, বাতাস ও সমস্ত নরনারীকে সাক্ষী রেখে আমরা যে বন্ধুত্ব করলাম এ বন্ধুত্ব আমাদের চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। বনবিবি নারায়ণীকে বলেন, যখন তুমি সই বলে আমাকে ডাকবে, আমি তখনই তোমার কাছে আসব। আর নারায়ণীও বলেন, তুমিও যখন সই বলে আমাকে ডাকবে, আমি তোমার কাছে যাব। এই কথা বলে বনবিবি শাজঙ্গুলীকে নিয়ে ভুরকুণ্ডায় গেল। সেখানে বসে দোঁহে পরামর্শ করল। দেখ শাজঙ্গুলী আঠারভাঁটির দখল আমরা পেলাম, এবার এই আঠারভাঁটিতে আমরা বাদাবন সৃষ্টি করে যাব, এই কাজে তুমি দেরি না করে নেমে পড়। যে যে দেশে বনবিবি বাদাবন সৃষ্টি করেছিল সেই সেই দেশের নাম শুনুন সর্বজন —

পাঁচাল ।। বনবিবিমার দোয়া আজ বুঝিতে না পারি গো ..... বনবিবিমার দোয়া
ভাইবহিন দুজনে চলিতে লাগিল গো .... ঐ
ছাঁটি বাদা বসাইতে চলে গাঁয়ে গাঁয়ে গো .... ঐ
জঙ্গলে মোকেদ হয় পিছে পিছে ধায় গো .... ঐ
দক্ষিণেতে এড়োজোল সহদ্দ কবিয়া গো .... ঐ
ভবানীপুরেতে বিবি পৌছিলেন যাইয়া গো .... ঐ
বেতাখাল পার হইয়া রাজপুরেতে যায় গো .... ঐ
তারপরে বিয়াড়ীতে যাইয়া পৌছিল গো .... ঐ
সেথা হইতে বিবি যায় মাখালগাছায় গো .... ঐ
করিয়া বাদার সৃষ্টি আসরিতে যায় গো .... ঐ
ময়নাডাঙ্গা আমলানি সৃষ্টি সে করিয়া গো .... ঐ
হাসনাবাদের বীচে দেবী পৌছেন তখন .... ঐ
তা বাদে পাটলিগ্রাম কাটাখালি হদ্দ গো .... ঐ
ছাটি বাদা বসাইয়া করিয়া সরহদ্দ গো .... ঐ
ফিরিয়া আইলেন বিবি খুশি হয়ে মনে গো .... ঐ
ভুরকুণ্ডের মোকামে দেবী বসেন আসিয়া গো .... ঐ
বোনবিবিমার দোয়া আজ বুঝিতে না পারি গো। .... ঐ

এদিকে মা নারায়ণী পুত্র দক্ষিণরায়কে নিয়ে কেঁদখালির চরে উপস্থিত হলেন। আপন মোকামে বসে দেবী ভাবিতে লাগিলেন সমগ্র আঠারভাঁটি একসময় আমার ছিল, কিন্তু এখন থেকে এর অর্ধেক বন মাতা বনবিবিকে দিতে হল। বনবিবির পূজা এখন থেকে সবাই করবে,

আমার নাম হয়তো আর কেউ করবে না। অথচ আমার পূজা এই আঠারভাঁটিতে প্রচার করতে হবে।

একদিন মা নারায়ণী উত্তরভাগের নিকট বিদ্যাধরী নদীর তীরে বসে আছেন আর কিভাবে আঠারভাঁটির অর্ধেক অংশে নিজের পূজাপ্রচার করা যায়, সেকথা ভাবছেন। এমনসময় একদল মাঝি নৌকা বেয়ে সুন্দরবনের বীচে কাঠকাটতে যাচ্ছে। মা নারায়ণী তখন মনে মনে ভাবছেন প্রথমে এদের দিয়ে তিনি পূজাপ্রচার করবেন। মা তখন তাদের ডেকে বলছেন :

মা : ও বাবা মাঝিমাল্লারা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ নৌকা বেয়ে?

মাঝি : আমরা জঙ্গলে কাঠ ও মধু সংগ্রহে যাচ্ছি।

মা : তোমরা জঙ্গলে এসেছ, তা তোমরা মা নারায়ণীর পূজা করে এসেছ? বনে বাঘভাল্লুকের ভয় তোমাদের নেই?

মাঝি : সে কি গো বুড়ীমা ? তুমি দেখছি কোন খোঁজখবর রাখ না। এসবের ভয় আগে খুব ছিল, এখন আর নেই। এখন এই জঙ্গলে এক নতুন মা এসেছেন, তাঁর নাম বনবিবিমা। মায়ের এমনই দোয়া, বাঘ তো দূরের কথা, একটা মশাও পর্যন্ত আমাদের, ছুঁতে পারে না। আমরা সেই বনবিবিমার পূজা করে এসেছি।

কথা ।। মাঝিমাল্লার মুখে নারায়ণী বনবিবির এমন প্রশংসা শুনে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি এতদিন আঠারভাঁটির অধীশ্বরী ছিলাম। আমার পূজা কেউ করে নি, আজ বনবিবির পূজা সর্বলোকে করবে। আচ্ছা, আমিও ঐ মাঝিমাল্লার কাছে পূজা মাঙব।

মা : বলি ও মাল্লারা, তোমরা আমার কথা লবে। আজ হতে তোমরা নারায়ণীর পূজা করবে। নারায়ণীর পূজা করলে বনেজঙ্গলে বাঘেব ভয় থাকবে না, অন্ধ চক্ষু ফিরে পাবে, খোঁড়া পর্বত লঙ্ঘাবে, পুত্রহীনা পুত্র পাবে, সকল ব্যাধি দূর হবে, গোলাভর্তি শস্য হবে, সংসারে পরম শান্তিতে বাস করবে, যে যেমন মনস্কামনা নিয়ে পূজা করবে, তার তাই পূরণ হবে।

মাঝি : ওরে বাবা! কি বলছ বুড়ীমা, একটা ওষুধে এত রোগ সারবে? নারায়ণীর পূজা করলে কিচ্ছু হবে না বুড়ীমা! নারায়ণীর পূজা করলে তার বেটা বাঘ হয়ে আমাদেব ধরে ধরে খাবে। তুমি যতই বল বুড়ীমা, আমরা ঐ নারায়ণীর পূজা করছি না, আমরা করব বনবিবিমার পূজা! আমাদের কোন আঘাবিঘে থাকবে না।

কথা ।। মাঝিমাল্লাদের মুখে এই কথা শুনে মা নারায়ণী অন্তরে খুব দুঃখ পেলেন। মনে মনে ভাবলেন, যে করেই হোক, ওদের কাছ থেকে পূজা আমার পেতেই হবে। তখন তিনি আবার মাঝিদের ডেকে বলতে লাগলেন—

মা : দেখ মাঝি, তোমরা আজ আমার কথা নাও। বনে এসে আজ হতে তোমরা মা নারায়ণীর পূজা দাও। আমার আশীর্বাদে তোমাদের ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে, একগুণে লক্ষগুণ হবে, একপয়সা হতে লক্ষপয়সা হবে।

ধোয়া ।। এই কথা বলে মা নারায়ণী তখন অদৃশ্য হয়ে যায়। আর পিছন ফিরে মাঝিগণ মাকে আর দেখিতে না পায়। দেখিল বেদীর উপর আছে দুটি বারা। এই দেখে মাঝিগণ হল আত্মহারা।।

কথা ।। মাঝিরা তখন পরস্পর বলাবলি করছে, একি দৃশ্য দেখলাম ভাই? আমরা কার সাথে এতক্ষণ কথা বলছিলাম। দেখ, দেখ! বুড়ীমা যেখানে বসেছিল সেখানে দুটি বারামূর্তি আছে। এতো দেখছি দক্ষিণরায় আর নারায়ণীর বারা। তাহলে কি আমরা মা নারায়ণীর সাথে এতক্ষণ কথা বলছিলাম? আরে ছাড়ো তো ভাই, কোথাকার কে নারায়ণী, তোমরা তাকে নিয়ে পড়েছ। চল, মা বনবিবির নাম করে আমরা কাজে চলে যাই। নরখাদক রাক্ষসের জননী নরায়ণী, তাকে আবার মানুষ পূজা করে!

ধোয়া ।। এই কথা বলে তারা নৌকা বেয়ে মা বনবিবির জয়ধ্বনি দিতে দিতে জঙ্গলেতে গেল। আর কাঠ, মধু সংগ্রহ করে দেশের দিকে ফিরল গো। ওরে ও তার মায়া।

কথা ।। নৌকা বেয়ে যখন তারা দেশে ফিরছিল, ঠিক সেই জায়গায় উত্তরভাগের নিকট বিদ্যাধরী নদীর তীরে যেখানে তারা মা নারায়ণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল সেখানে উপস্থিত হতে না হতে বিনা মেঘে বজ্রপাত ও প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা শুরু হল। উথালপাতাল নদীতে মাঝিদের একটি কাঠের নৌকা ডুবে গেল। তখন জীবন বিপন্ন দেখে মাঝিদের মা নারায়ণীর কথা মনে পড়েছিল। আর উচ্চৈস্বরে তারা "মা নারায়ণী, রক্ষা কর" বলে ডাকিয়া উঠিলরে, ও তার মায়া বোঝা ভার।

মাঝিগণ তখন বলাবলি করতে থাকে, দেখ ভাই সব, তোমরা নৌকা এইখানে বাঁধ, এস, আমরা এখানে মা নারায়ণীর পূজা করি। মা নারায়ণীর পূজা না দেওয়াতে আমাদের এই দুর্দা। এই কথা শুনে মাঝিগণ নৌকা হতে নামিল, নানা ফুল ও ফলমূল সহযোগে তারা নারায়ণীর পূজা করেছিল। অন্তর্যামী মা নারায়ণীর দেলে দয়া উপজিল, দৈববাণী করে মা আমার এই কথা বলিল। দেখ মাঝিগণ, তোমাদের অহংকারের জন্য আজ তোমাদের এই দশাশা। আজ থেকে তোমরা মা নারায়ণীর পূজা ভক্তিভরে করবে আর আমার থানের ফুল নিয়ে একশ আট বার "মা নারায়ণী, রক্ষা কর" বলে সেই ফুলটা মস্তকে স্পর্শ করে নদীতে ছুড়ে ফেলবে। তাহলে যে কাঠের নৌকাটি জলে ডুবে গেছে তা ভেসে ডঠবে।

ধোয়া ।। এই কথা শুনে বড়মাঝি ফুলহস্তে একশ আট বার মা নারায়ণীর নাম যে জপিল। আর রক্ষা কর মা নারায়ণী বলে নদীতে ফেলিল।

কথা ।। মুহূর্তে সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা সব থেমে গিয়েছিল, ডুবে যাওয়া কাঠের নৌকাটি পুনঃ ভাসিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি দিয়ে নারায়ণীর, তারা দেশে ফিরে গেল।

কথা ।। এরপর মাঝিগণ মা নারায়ণীর গুণের কথা সবারে জানাল, আর গলায় কুটো বেঁধে দ্বারে দ্বারে মা নারায়ণীর নামে ভিক্ষে করে মায়ের গানপূজা দিয়েছিল।

ধোয়া ।। ভিক্ষা মেগে তারা যখন মায়ের গানপূজা দিল,
মা নারায়ণী তখন আপন মোকাম হতে শুভদৃষ্টি দিল।

কথা।। দৈববাণী করে দেবী মাঝিমাল্লাদের এই কথা বলেছিল— গলায় কুটো বেঁধে যে আমার গানহাজত দেবে, শূন্যভাণ্ডার তার ভরাভাণ্ডার হবে। মা নারায়ণীর নাম করে যে প্রভাতে উঠবে, সন্তানহীনার সন্তান হবে। আমার থানের মাটি নিয়ে যে অন্ধ ও খোঁড়া সর্ব

অঙ্গে মাখবে, মা নারায়ণীর কৃপায় তাদের পা সেরে যাবে ও চক্ষু ফিরে পাবে। এই কথা শুনে মাঝি-মাল্লারা দেশে মায়ের নামপ্রচার করল। সেই থেকে উত্তরভাগের নিকট বিদ্যাধরী নদীর তীরে ঢোঁসার নিকট প্রতিবৎসর ১লা মাঘ দেবীর পূজা হয়ে থাকে। বহু অন্ধআতুর গিয়ে এইখানে নারায়ণীর নামে পূজা দেয়, আর মাঝিমাল্লারা এখান থেকে নৌকা বেয়ে যাবার সময় বলে, 'মা নারায়ণীর নামে বদর বদর বল'।

মাঝিমাল্লাদের মধ্যে পূজাগ্রহণ করে মা নারায়ণী এবার মনে মনে ভাবছেন মাঝি-মাল্লারা তো আমার পূজা করল, কিন্তু সমগ্র দেশবাসী তো আমার পূজা করবে না। এই কথা ভেবে নারায়ণী স্থির করলেন, খাড়িতে গিয়ে তিনি তাঁর মাহাত্ম্যপ্রচার করবেন।

এই কথা ভেবে জননী লোকালয়ের দিকে চরণ বাড়াল
অবশেষে এসে তিনি খাড়িতে উপনীত হল।
শুন শুন শ্রোতাবৃন্দ বলি তোমাদের কাছে,
রায়দীঘির নিকট খাড়িতে তার প্রমাণ কিছু আছে।

খাড়িগ্রামের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নাম তাঁর রঘুনাথ চক্রবর্তী। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তানের জন্য কত ঠাকুরের কাছে মানত করেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় না। ব্রাহ্মণীও বিশ্বাস ছাড়েন নি। প্রত্যহ তিনি নানান ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা করেন ও পূজা দেন। এমনই একদিন প্রার্থনার সময় ব্রাহ্মণ মা মা বলে চিৎকার করে উঠলেন। সেইসময় সেইপথ দিয়ে দেবীনারায়ণী বাতাসের উপর ভর করে সেখানে এসে উপনীত হলেন এবং ব্রাহ্মণের আকুল প্রার্থনা শুনতে পেলেন।

ধোয়া ।। মা করুণাময়ী নারায়ণী আমার তখন ভাবে মনে মনে।
পূজার স্থান পেলাম আমি এই ব্রাহ্মণের স্থানে।।

কথা ।। খাড়িগ্রামের নিষ্ঠাবান অপুত্রক ব্রাহ্মণ রঘুনাথ চক্রবর্তীকে দিয়ে তিনি তখন পূজা-প্রচারের কথা ভাবতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে পর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সুখে নিদ্রা গেল। শেষ প্রহরে মা নারায়ণী ব্রাহ্মণীকে স্বপ্নযোগে বলতে লাগলেন, দেখ ব্রাহ্মণী, তোমরা নিঃসন্তান। তোমাদের আকুল প্রার্থনা শুনে আমি হেথায় অবতীর্ণ হয়েছি। আমার পরিচয় আগে বলে যাই শোন।

এ জগতে সবার আমি নারায়ণী মা।
মা বলে ডাকলে কারোর দুঃখ রবে না।।
আমার নাম নারায়ণী দক্ষিণরায়ের জননী।
আঠারভাঁটির দণ্ডবক্ষ তিনি মোর স্বামী।।
স্বপনযোগে বলি তোরে সন্তানলাভের কথা।
যেমন বলিব তা না করিবে অন্যথা।।
প্রভাতকালে শিয়রদেশের বালিশ তুলিবে।
দেখিবে সেথায় এক গাছের শিকড় পাবে।।

ব্রাহ্মকালে স্নান সেরে পূর্বমুখ হয়ে।
গঙ্গাজলে বাটবে তাহা পরিষ্কার শিলে।।
হাতের চন্দ্রস্থানে লয়ে তাহা নারায়ণীর স্মরিবে।
জিহ্বার মধ্যস্থল দিয়ে তাহা চেটে চেটে খাবে।।
তাহলে নিশ্চয় জেন তোমার গর্ভে সন্তান আসিবে।
নিদ্রাভঙ্গে সকল কথা ব্রাহ্মণেরে বলিবে।।
স্বপ্ন দিয়ে মা নারায়ণী দূরে সরে গেল।
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী আজ উঠিয়া বসিল।।
দুটি পদ ধরে ব্রাহ্মণের এই কথা কয়।
উঠ উঠ প্রাণেশ্বর আজি বলি গো তোমায়।।

কথা ।। ব্রাহ্মণী স্বপ্নের কথা ব্রাহ্মণকে ডেকে শোনাল। কথা শুনে ব্রাহ্মণ যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ব্রাহ্মণী বালিশের নীচ থেকে ঔষধ বার করে ব্রাহ্মণকে দেখাতেও তবু যেন অবিশ্বাস থেকে গেল। বলল, কোথাকার কে নারায়ণী, তার নাম কখনো শুনিনি, তোমাকে ওষুধ দিয়ে গেছে, আমার ওসব বিশ্বাস হয় না। তুমি কোথা থেকে কি একটা এনে আমাকে দেখাচ্ছ। আমাদের কপালে কি আর সন্তানাদি আছে তাই হবে? না স্বামী, ওসব কথা তুমি মুখে এন না। এই ঔষধ দিয়েছেন আমার নারায়ণী মা। তোমার কাছে মিথ্যা আমি কভু না বলিব। একজনের অপরাধে দুইজন ভুগিব। যার কাছে যা বলিনা কেন স্বামী, তোমার কাছে তো আমি কখনো মিথ্যা বলি না। তাছাড়া মায়ের দেওয়া ঔষধের কথা তোমাকে কেন বা মিথ্যা বলব।

ধোয়া।। এই কথা বলে ব্রাহ্মণী মায়ের দেওয়া ঔষধ সেবন করেছিল, মা নারায়ণীর কৃপায় তার দেহ শান্ত হল। যথাসময়ে ব্রাহ্মণীর উদরে সন্তান আসিল। তা দেখে ব্রাহ্মণ আনন্দিত হল গো। ও তার মায়া।

মা নারায়ণীর কৃপায় ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হয় গো	....	মা নারায়ণীর কৃপায়
একমাস কালে তার একাং শরীর গো	....	ঐ
দ্বিতীয় মাস কালে তার চক্ষে পড়ে নীর গো	....	ঐ
তৃতীয় মাস কালে তার হাড়ে মাস জোড়া	....	ঐ
চতুর্থ মাস কালে সন্তানের মক্কা গেল গড়া গো	....	ঐ
পঞ্চম মাস কালে তার পঞ্চম ফুল ফোটে গো	....	ঐ
ছয়মাস কালে কোলে ঋজুক পাল ওঠে গো	....	ঐ
সাতমাস কাল যখন ব্রাহ্মণীর হয় গো	....	ঐ

ব্রাহ্মণকে ডেকে তখন বলিতে লাগিল, দেখ স্বামী, তোমার কাছে একটা গোপন কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু এ সংসারে তোমার পিতামাতা তো কেউ নেই, আমি কার কাছে বা জানাব। একমাত্র তুমি আর আমি। সপ্তম মাস গর্ভ স্ত্রীলোকের হলে সাধ খেতে ইচ্ছে জাগে। তাই আজ আমার সপ্তম মাস পূর্ণ হল, তুমি কিছু সাধের বাজার করে আন, আনন্দে উল্লসিত

হয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সাধের বাজার করে এনে দিয়েছিল।

ধোয়া ।। সপ্তফল সপ্তমিষ্ট আয়োজন হল।
পঞ্চ এয়ো ডেকে ব্রাহ্মণীর সাধভক্ষণ করাল।।

কথা ।। এইভাবে সাতমাস যায়, আটমাস যায়, নয়মাসের পর যখন দশমাসে পড়িল, অকস্মাৎ ব্রাহ্মণীর প্রসববেদনা উঠিল। প্রচণ্ড গর্ভযন্ত্রণায় ব্রাহ্মণী কাতর হয়ে মা নারায়ণীর কথা ভুলে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে নারায়ণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি আমাকে ডাকছ কেন, মা নারায়ণী তোমার গর্ভে সন্তান দিয়েছেন, যার বরপুত্র তোমার গর্ভে, তুমি সেই মাকে ডাক। করুণাময়ী মা তিনি তোমার যন্ত্রণা নিবারণ করবেন।

ধোয়া ।। হস্তজোড় করে ব্রাহ্মণী নারায়ণীর স্মরণ করে মাটিতে মাথা ঠুকেছিল,
মা নারায়ণীর কৃপায় তাঁর পুত্র প্রসবিল গো।.... দিন গেল ......

কথা ।। মা নারায়ণীর বরপুত্র ব্রাহ্মণীর ঘরে জন্মগ্রহণ করল, আর তা দেখে ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ তখন মা নারায়ণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মা নারায়ণীর পূজা করার কথা মনে মনে ভাবল, কিন্তু নারায়ণীর কেমন মূর্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন, তা নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ মাকে তো ব্রাহ্মণ কোনদিন দেখেনি। তাই ব্রাহ্মণ একদিন শুদ্ধাচারে মাকে স্মরণ করে নিদ্রা গিয়েছিল আর মা নারায়ণী স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণকে আপন স্বরূপ বোঝালেন।

কত রূপে ঘুরি আমি জগৎ মাঝে রে।
যে যেভাবে ডাকে আমি কৃপা করি তারে।।
চতুর্ভুজা নারায়ণী আমি হরিদ্রাবরণ।
সিংহপৃষ্ঠে সদাই বেড়াই করি আরোহণ।।
তীরধনুক খড়্গ ঢাল প্রহরণ হাতে।
মণিমুক্তা চূড়া শোভে আমার মাথে।।
রক্তবস্ত্র পরিধানে আমি নারায়ণী।
ভাটির দেশে জেন আমি সবার জননী।।
আমার স্বরূপ আজি তোমায় জানালাম।
শতজন্মের পুণ্যের ফল আজ তোমায় দিলাম।।
খাড়িগ্রামে মোর নামে মন্দির এক করিবে।
তথায় ভক্তিভাবে মোরে প্রতিষ্ঠা করিবে।।
নারায়ণীর নিত্যপূজা তথায় হইবে।
বৎসরান্তে নিত্য আড়ম্বরে গানপূজা দিবে।।
এই কথা বলে জননী অদৃশ্য হয়ে গেল।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে রঘুনাথ উঠিয়া বসিল।।

কথা ।। শয্যাত্যাগ করে ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবছেন, তাই তো এখনই মায়ের মন্দির নির্মাণ

করে মায়ের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করে পূজার ব্যবস্থা করা দরকার। মা আমার এই বয়সে পুত্রসন্তান দিলেন, এ তো তাঁর অপার করুণা। এই বলে রঘুনাথ মহাড়ম্বরে মায়ের মন্দির নির্মাণ করে মা নারায়ণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এবং ব্রাহ্মণী গলায় কুটো বেঁধে প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে পুত্রের হাত ধরে ভিক্ষে মেগে মায়ের গানপূজা দিলেন, আর সেই হতে মা নারায়ণীর চতুর্ভুজা মূর্তিপূজা আঠারভাঁটিতে প্রচার হল।

পূর্বাপর আলোচনায় দেখা যায় যে, চব্বিশ পরগণা বিশেষত দঃ চব্বিশ পরগণায় নারায়ণী লৌকিক দেবী হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়। নারায়ণীপূজা বিভিন্নভাবে চব্বিশ পরগণার প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর ন্যায় নারায়ণীপূজার সঙ্গে নারায়ণী পালাগানের অনুষ্ঠানও সাধারণ ঘটনা। বনবিবির পালা বা বনবিবির জহুরানামার অংশ বিশেষ অবলম্বন করে লোককবি ও শিল্পীগণ সাধারণত নারায়ণীর পালা পরিবেশন করেন। পূর্ণাঙ্গ নারায়ণীপালা হিসাবে উপরে বর্ণিত পালাটি যেমন একদিকে নারায়ণীপালার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে তেমন নির্দেশ করে চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগানের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে।

পাদটীকা

১. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১০৭। পৃঃ ৫৩৯।

২. ঐ

৩. ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, তৃতীয় খণ্ড, ভারতের জনগণনা ১৯৬১, দক্ষিণরায়, পৃঃ ৫৩৯।

৪. জ্যোতিষ মুখার্জী, বেগমপুর (বারুইপুর), সাক্ষাতকার।

৫. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১০৯।

৬. প্রসিত রায় চৌধুরী, আদিগঙ্গার তীরে, ১৯৮৮, পৃঃ ৫৩,

দেবীপালা ঃ দুর্গা (দুর্গার শঙ্খ-পরিধান)

চব্বিশ পরগণার প্রচলিত লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানগুলির মধ্যে দেবীদুর্গা বা দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালা অন্যতম। পালাগান আলোচনায় দুর্গার শঙ্খ-পরিধান লোকায়ত পালাটি দেবীপালার অন্তর্গত। দেবীদুর্গা ও মহাদেবকে অবলম্বন করে এই পালাটি রচিত ও পরিবেশিত হয়। দেবীদুর্গা বাংলা লোকবিশ্বাসে বিভিন্নরূপে বিরাজমান। তিনি চণ্ডী, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নামে পূজিতা হন। দেবী চণ্ডীরূপে তিনি শবর প্রধান কালকেতুর নিকট পূজাগ্রহণ করেছেন, কালীরূপে অরণ্যবাসী তান্ত্রিক যোগীর পূজা পেয়েছেন, দেবী অন্নপূর্ণারূপে সুরথরাজার নিকট পূজাগ্রহণ করেছেন, মহামায়া দুর্গারূপে রামচন্দ্রের নিকট পূজা পেয়েছেন এবং পরবর্তীকালে তিনি মহাশক্তি শিবের ঘরণী গৌরীরূপে সমগ্র বাঙালী সমাজে পূজা পেয়েছেন। দেবীদুর্গা যেমন একদিকে দশভুজা মহাশক্তির প্রতীক, তেমন অন্যদিকে তিনি বাঙালী পরিবারের কন্যা। আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবীদুর্গা পৌরাণিক তত্ত্বে ও গবেষকদের বিচার-বিশ্লেষণে যাই হোন না কেন, তিনি সাধারণ বাঙালী পরিবারের ব্যথাতুর মাতৃহৃদয়ের আদুরে দুলালী উমা।

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত পালাগানের ঐতিহ্যসূত্রে দেখা যায় যে, দুর্গার শঙ্খ-পরিধান পালাগান বিশেষ পূজাপদ্ধতি বা পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ নয়। সাধারণত স্বাধীনভাবে পূজা-প্রসঙ্গ ছাড়া এই পালাগান পরিবেশিত হয়। অবশ্য ক্ষেত্রগবেষণায় এই তথ্য লাভ করা যায় যে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে মনসার পালাগান অনুষ্ঠানের সময় মনসা-পালার শাখা কাহিনী হিসাবে দুর্গার শঙ্খ-পরিধান-পালাটি পরিবেশিত হয়। তথাপি বলা যায় দুর্গার শঙ্খ-পরিধান পালাটি বিশেষ কোন পূজাপদ্ধতি বা পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ নয়।

দুর্গার শঙ্খ-পরিধান পালাটি চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের অন্যান্য লৌকিক পালাগুলির ন্যায় পরিবেশিত হয়। সেই অনুসারে এটির পরিবেশন-বৈচিত্র্যও দেখা যায়। সাধারণত পালাগান দুইটি ধারায় পরিবেশিত হয়। যথা পাঁচাল বা পালাগানের ধারা, অপরটি লোক-

নাট্যের ধারা। এই দুই ধারাতেই দুর্গার শঙ্খ- পরিধান পালাটি পরিবেশিত হয়। চব্বিশ পরগণার সীমান্তঘেঁষা অঞ্চলগুলিতে এ পালা 'রয়ানী' রীতি ও 'ঘোষা' রীতিতে গাইতে শোনা যায়।

লোকসমাজের প্রথানুসারে দুর্গার শঙ্খ- পরিধান পালার আসরে কিছু আচরণীয় প্রথা লক্ষ্য করা যায়। যে বাড়িতে এই পালাগান অনুষ্ঠিত হয় সেই বাড়ির গোলারধারে, ঠাকুর-ঘরে বা আসরে গায়ক প্রথমে একটি জলপূর্ণ দেবীঘট বসান। ঘটের মুখে আম্রপল্লব ও সশিশ ডাব, নতুন একটি বস্ত্র বা গামছা, একপাতা সিন্দূর ও হাতের 'ন' বা লোহা দেওয়া হয়। তারপর ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে নৈবেদ্য সাজান হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ঘট-প্রতিষ্ঠা'। ঘটপ্রতিষ্ঠার পর পালাগায়ক বন্দনাদি করে গান বা পালা শুরু করেন। পালাগান শেষ হলে যখন অষ্টমঙ্গলা শুরু হয় তখন পালাগায়ক এয়োদের উদ্দেশ্যে বলেন, মা ভগবতীর নাম করে যে সিঁদুর পরে তার স্বামীর পরমায়ু বাড়ে, যে দেবী ভগবতীর নাম করে শঙ্খ পরিধান করে তার হাতের শঙ্খ 'লোহা' হয়ে যায়। এইরূপ স্বামী, পুত্রকন্যা প্রভৃতি কেন্দ্রিক সাংসারিক নানাবিধ মঙ্গলকামনা করে পালাগায়ক এক দীর্ঘগান করেন। তাঁদের মূলবক্তব্য থাকে, 'আপনারা দু-চার পয়সা দিয়ে দেবীভগবতীর নামে এখান থেকে শঙ্খ ও সিন্দূর নিন, আপনাদের সন্তানাদি সবাই সুখে থাকবে।' এই বলে ঘটের সিন্দূর এয়োদের সিঁথিতে, শঙ্খে দেওয়া হয় এবং ঘটে যে 'নোয়া' থাকে তা নায়েকের স্ত্রীকে পরিয়ে দেওয়া হয়, আর ঐ দেখাদেখি কোন মহিলা যদি নোয়া চান তাহলে তাঁরা বাইরে থেকে নোয়া কিনে এনে গায়কের হাতে দেন, গায়ক সেই নোয়া দেবীঘটে ছুঁইয়ে সেই এয়োর হাতে পরিয়ে দেন। তারপর নৈবেদ্যাদি বিতরণ ও হরিনুটের পর দেবীপূজার শঙ্খ পরিধান পালার আসরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালাটি গড়ে উঠেছে বাংলার লোকসমাজে বহুল প্রচলিত শিব-পার্বতীর কলহ ও শঙ্খ-পরিধানের পারিবারিক কাহিনীকে অবলম্বন করে। লোকসমাজে দেবীদুর্গা অলৌকিক ও বাস্তবতার ছায়ায় বাঙালীনারীর আদর্শ। বাংলার নারীসমাজের অধিকাংশই দেবী দুর্গার তত্ত্বকথা বোঝেন না, কিন্তু তাঁরা জানেন, উমা দীর্ঘদিন তপস্যা করে মহাদেবের মত স্বামী পেয়েছেন। তাঁদের অভাবের সংসারে কলহ থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব মিল। দুর্গা পরম সতী, স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে তিনি কোন মতেই মনে স্থান দেন না। এমনকি পতিনিন্দা তিনি সহ্য করতে পারেন না। অপরদিকে মহাদেব গাঁজাভাঙ খেয়ে শ্মশানে মশানে পড়ে থাকলেও দুর্গাকে তিনি যেমন ভয় পান তেমনি ভালও বাসেন। দুর্গা ছাড়া তাঁর এক মুহূর্ত সহ্য হয় না। বাইরে যতই তিনি শিথিলচরিত্র হোন, আপন পত্নীর স্থান তাঁর নিকট অনেক উর্ধ্বে। বাঙালীসমাজ যে পৌরাণিক আদর্শে গড়ে উঠুক না কেন এই সমাজের নারীগণ মহাদেবের মত স্ত্রীঅনুগত, প্রয়োজনে অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে পারেন এমন স্বামী কামনা করেন। সেকারণে হরপার্বতী দেবদেবীর ভূমিকায় থাকলেও বাংলার ঘরে ঘরে তাঁরা একান্ত আপনজন। বাঙালী কন্যা, জায়া ও মাতাদের বিশ্বাস, আশুতোষ মহাদেবকে বিল্বদলে

তুষ্ট করতে পারলে তাঁর মত স্বামী পাওয়া যায়, তাঁদের নিত্যসঙ্গী দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও দাম্পত্য জীবনের অনন্তশান্তিলাভ করা যায়। এই বিশ্বাসে বাঙালী কবিরা ও মায়েরা শিবদুর্গাকে নিয়ে কত কথা, গান, গল্প, ছড়া ইত্যাদি রচনা করেছেন যার অধিকাংশই লোককথা হিসাবে প্রচলিত। এমন এক লোককথা-কেন্দ্রিক বাঙালীর অতি প্রিয় পালাগান হল দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালা।

বাঙালী-হিন্দু-বধূর অতিশয় প্রিয় ও শখের বস্তু হল উজ্জ্বল সিন্দূর, শুভ্রসুন্দর শঙ্খ ও টকটকে আলতা। এগুলি তাঁদের কাছে পবিত্র বস্তুও বটে। বাঙালীনারীর একমাত্র স্বপ্ন, এই তিনটি বস্তু নিয়ে যেন তাঁরা মরতে পারেন। এতেই তাঁদের নারীজীবনের সার্থকতা। স্বামীর সাথে তাঁদের বাস্তবে মধুর সম্পর্ক থাক আর না থাক, স্বামীর দেওয়া সিন্দূর ও শঙ্খের অমর্যাদা সাধারণত তাঁরা করেন না। বাংলায় প্রবাদ আছে 'বুড়োর কোলে বুড়ি হয়ে যেন মরতে পারি।' প্রচলিত এই প্রবাদের মধ্যে বাঙালীসমাজের গৌরীদানপ্রথা ও কৌলীন্য-প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লোকবিশ্বাস-জাত হরপার্বতীর দাম্পত্য আদর্শ উক্ত প্রথার পরিপোষক। প্রবাদের এই অর্থ আজও হিন্দু বাঙালী-নারীসমাজ বিস্মৃত হন নি। শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা সর্বস্তরের হিন্দু এয়োরমণী এই বিশ্বাস থেকে একেবারেই বিচ্যুত হতে পারেন নি। সুতরাং শাঁখাসিন্দূরের দাবী এয়োস্ত্রীগণ তাঁদের স্বামীর কাছে করেই থাকেন। স্বামী তা না দিতে পারলে স্ত্রীর গঞ্জনা তাকে শুনতেই হয়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাঙালী-হিন্দুপরিবারে যারা অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটাতে হিমসিম সেই পরিবারের গৃহকর্তার পক্ষে খুব কষ্টকর হয় স্ত্রীর শঙ্খ ভেঙে গেলে তা কিনে দেওয়া। এই নিয়ে বহু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড প্রায়ই ঘটে থাকে। সুতরাং বাঙালী-গায়ক-কবিগণ সমাজের এই চিত্র তাঁদের গানে ও কথায় ফুটিয়ে তুলবেন এটি স্বাভাবিক। হরগৌরীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে গৌরীর শঙ্খ-পরিধানের শখ প্রতিনিবৃত্ত করা আত্মভোলা ভিখারী মহাদেবের পক্ষে কত কষ্টকর, এই নিয়ে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিরূপতা ও পিতৃগৃহে গমন, গৌরী বিনে শিবের নিঃসঙ্গতা ও ব্যাকুলতা খুব সুনিপুণভাবে পালাগায়কগণ তাঁদের এই পাঁচালগানে ফুটিয়ে তুলেছেন। রঙ্গরসিকতায় ও বাস্তবতায় পালাটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বাঙালীহিন্দু পরিবারে এমন সুন্দর চিত্র খুব কম পালাগানেই আছে। সেইদিক থেকে বিচার করলে দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালাটির সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট।

দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালাটির কাহিনী ছোট। মহাদেব, দুর্গা, নারদ ও মেনকা এই স্বল্প চরিত্র নিয়ে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। পালাটিতে জনতা একটি চরিত্র। পালাগায়ক নিজে কখনো মহাদেব, কখনো দুর্গার ভূমিকায় কথা বলেন। মাঝেমধ্যে জনতা বা শ্রোতার নিকট থেকে উত্তর বা কথা আদায় করে নেন, অথবা কথার ফাঁদে শ্রোতা পড়ে গিয়ে মূল গায়কের পাণ্টা জবাব দেন। দোহারগণও বিভিন্ন চরিত্রে কথা বলেন। আসরে পালাটি গীত হবার সময় গায়ক, দোহার ও শ্রোতা সবাই একাত্ম হয়ে পড়েন। হারমোনিয়াম, কাড়ানাকাড়া, বাঁশী, করতাল, ঝাঁঝ প্রভৃতি বাদ্যযোগে দুর্গার শঙ্খ-পরিধানের পালাটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

চব্বিশ পরগণায় দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালার বহু গায়ক আছেন। প্রত্যেক মনসামঙ্গল

পালাগানের গায়ক এই পালাটি গান করেন। ক্ষেত্র বিশেষে অনেকে এই পালাটি বাদ দিয়ে মনসার পালাগান করেন। পৃথকভাবেও দুর্গার শঙ্খ-পরিধান-পালা গীত হয়। দুইজন পালা গায়কের নিকট হতে দুটি পালা সংগৃহীত হয়েছে। কোন পালার লিখিতখাতা বা পুঁথি পাওয়া যায়নি। গায়কের আসর ও সাক্ষাতকার হতে এ পালাটি সংগৃহীত হয়েছে। গায়েন অনিল হাজরা, সুদিন মণ্ডল প্রমুখ পালাগায়কের নিকট হতে প্রাপ্ত পালার কাহিনীগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পালা পরিবেশন রীতিপদ্ধতি উভয় শিল্পীর বা দলের পৃথক। এই অধ্যায়ে সংযোজিত দুর্গার শঙ্খ -পরিধানপালাটি অনিল হাজরার সংগৃহীত ও গীত। এটি পালাগানের পূর্ণাঙ্গরূপ হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় উৎকলিত হয়েছে।

বাঙালী কবি ও পালাকারগণ দেবীদুর্গার হাতে শঙ্খ-পরিধান করিয়ে তাঁকে বাঙালী ঘরের বধূ করে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দেবীদুর্গা কে? আদিতে তিনি কি ছিলেন এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। বাঙালীর মনে তিনি বিভিন্নরূপে, বিভিন্ননামে বিরাজমানা। তিনি চণ্ডী, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নামে লোকসমাজে পূজা পেয়ে থাকেন। রামায়ণ-পূর্বযুগ থেকে শক্তিসাধনা সমাজে প্রচলিত আছে। বর্তমানে বাঙালীর সমাজজীবনে দুর্গাপূজা বা শারদীয়াপূজা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পূজারূপে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীজাতির আশা- আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া সবই এই পূজার মধ্যে প্রতিফলিত। বিদ্যা, সিদ্ধি, ধন, প্রতাপ, শক্তি ও শস্য এই কটি সাধারণত বাঙালীর কাম্য। সেই চাওয়া-পাওয়ার প্রতীক শারদোৎসব। এখানে দশভুজাদুর্গা মহাশক্তির প্রতীক। সরস্বতী বিদ্যাদায়িনী, লক্ষ্মী সম্পদদায়িনী, গণেশ সিদ্ধিদাতা, কার্তিক বীরত্ব ও সাহসের প্রতীক এবং নবপত্রিকা বা কলাবৌ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপূজা বা মাতৃকাপূজা। যার কৃপায় অধিক শস্যলাভ সম্ভব। সর্বোপরি শিবের পূজা বাঙালীর ত্যাগতিতিক্ষা বা বৈরাগ্যের পূজা। অতএব দুর্গার সপরিবারের পূজা বাঙালীমননের এক পূর্ণাঙ্গপূজা। যদিও উল্লিখিত দেবদেবীগণকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট সময়ে পূজার ব্যবস্থা আছে, তথাপি দুর্গাপূজার সাথে ওই সমস্ত দেবদেবীর পূজা করা হয় সম্ভবত ওই একই কারণে। তাই দুর্গাপূজা বাঙালীজীবনের বড়পূজা এবং এই পূজাকে কেন্দ্র করে বাঙালীর সমাজজীবনে এত উচ্ছ্বাস। চণ্ডী গ্রন্থে অর্গলা স্তুতিতে 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি' বলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

বর্তমান এইরূপ চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে আরও অনুমান করা যায় যে, আদিতে দেবীর এতরূপের প্রকাশ ছিল না। তিনি মহাপ্রকৃতি বা মহামাতৃকারূপে বা উর্বরা-শক্তির প্রতীকরূপে কৃষিসভ্যতা শুরুর প্রাক্‌কালে কৃষি সহায়ক দেবীরূপে পূজা পেয়েছেন। এর প্রমাণ সিন্ধুসভ্যতার অনেক প্রত্ন-নিদর্শনের মধ্যে আছে। নারীকে কেন্দ্রকরে শস্যক্ষেত্রের উর্বরাবৃদ্ধি ও শস্যবৃদ্ধি-জনিত জাদুবিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। বৃক্ষারূঢ়া নারীর পূজাজ্ঞাপক শীলমোহর থেকেও প্রত্ন-বিশেষজ্ঞগণ দশভুজা দুর্গার মূর্তির একটি ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা বলতে চান, বৃক্ষের বহু শাখাপ্রশাখা যেন ঐ নারীর হাত—তাই তিনি বহুভুজা বা সহস্রভুজা পরবর্তীকালে সামাজিক ক্রম-বিবর্তনের সূত্রে তাঁকে অষ্টাদশভুজা,

দশভূজা, চতুর্ভূজা বা দ্বিভূজা রূপে দেখা যায়। তাঁর সহস্রভূজা রূপের সমর্থন পাওয়া যায় চণ্ডীর ধ্যান মন্ত্রে। যা নিম্নরূপ—

শূলাদ্যস্ত্র সহস্র মণ্ডিত ভূজামুক্তদ্বক্ত পীনস্তনীং।
আবদ্ধা মৃতরশ্মিরত্ন-মুকুটাং বন্দে মহেশ প্রিয়াম।।

দেবীর মহিষাসুরমর্দিনীর রূপের ইতিহাস আবার কিছুটা পৃথক। এই প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত গবেষণা 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "মহিষমর্দিনীদেবী সম্বন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই মতে দুর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের ব্যাইর্গো (Virgo) দেবী— ইনি সমর-প্রিয়াদেবী। এই ভূমধ্যসাগরঅঞ্চলবাসীগণ কর্তৃক মন্খেমর জাতির বিজয়ই মহিষমর্দিনী-দেবীর মূর্তির মূলকথা। মন্খেমরগণ একটি মিশ্র নৃজাতি, খানিকটা ক্যাস্পিয়ান, খানিকটা অস্ট্রলোইড, কিছুটা অ্যালপাইন। ইহাদের সংস্কৃতির সংগে মহিষের একটা বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে গো যেরূপ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল মন্খেমরগণের মধ্যে মহিষও সেইরূপ পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মন্খেমর মর্দনই হইল মহিষমর্দন; ভূমধ্যসাগরীয়গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাইর্গো বা দুর্গা; তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মন্-খেমর বিজয়ী রূপ ধারণ করিল দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তিতে"। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি শীলমোহর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। যার বয়স সাড়ে-তিন হাজার বৎসর। এটি কোন এক স্ত্রীদেবতা কর্তৃক মহিষবধের প্রত্ন-নিদর্শন। খ্রীস্টপূর্বকালের সুমেরীয়া থেকে যা খুঁজে পাওয়া গেছে।

চতুর্ভুজা স্ত্রীদেবতা কর্তৃক শূলদ্বারা মহিষ বধের প্রত্ন-নিদর্শন বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার ধপধপি গ্রামের দক্ষিণরায়ের মন্দিরে রক্ষিত আছে। এটিকে 'শক্তি' নামে পূজা করা হয়। মূর্তিটির উপর সিঁদুরের প্রলেপ বহুকাল ধরে পড়তে থাকায় এর প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত ছিল। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত শ্রী রঞ্জন চক্রবর্তীর আনুকূল্যে মূর্তিটির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে সমর্থ হই। প্রত্নবস্তুটি সাদা বেলে পাথরে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। চব্বিশ পরগণায় প্রাপ্ত এটি একটি বিরল প্রত্ন-নিদর্শন। বারুইপুর 'সুন্দরবন সংগ্রহশালায়' চতুর্ভুজা দুর্গার পদতলে মহিষ, এরূপ কালপাথরের মূর্তি রক্ষিত আছে মহিষমর্দিনী দুর্গা, সিন্ধু ও চব্বিশ পরগণায় বহু প্রচলিত লৌকিক দেবী দুর্গার (শঙ্খ-পরিধান) পালাগানে ও দুর্গা সম্পর্কিত নানা কথা উপকথায় প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে পশু সম্পৃক্ত ধর্ম বিশ্বাসের ফলে এক-একটি পশুকে অবলম্বন করে যে ধর্মীয় ধারা বা কালট্ গড়ে উঠেছিল তারই ফলশ্রুতি সিংহবাহিনী দেবীদুর্গার সাথে মহিষবাহিত অসুরের লড়াই দেখানো হয়েছে এবং মহিষাসুরকে পদদলিত করে সিংহবাহিনী দেবীদুর্গার জয় দেখানো হয়েছে বা মহামাতৃকাব জয় ঘোষিত হয়েছে বলে মনে হয়। বর্তমানে সেই প্রাচীন ইতিহাস নব্য, ও পরিবর্তিত ভাবধারায় চাপা পড়ে শুভশক্তি কর্তৃক অশুভশক্তির বিনাশ এই ভাবধারায় পর্যবসিত হয়েছে। দুর্গাপূজার ও দুর্গাদেবীর তাৎপর্য ও ইতিহাস সম্ভবত এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। দেবীদুর্গা কালক্রমে বাংলার গৃহস্থ ঘরের কন্যা হয়ে উঠেছেন।

দেবীদুর্গাকে বাঙালী কন্যা, জায়া, মাতা রূপে কল্পনা করে আপন পবিবারের একজন করে নিয়েছেন। শাক্ত পদাবলীতে বাঙালী কবিগণ বাঙালী-পরিবারের একমাত্র দুঃখ, পালিতা কন্যাকে পরের হাতে তুলে দেওয়ার সাথে উমাকে শিবের হাতে অর্পণ করার প্রতীক ব্যবহার করে কত গান রচনা করেছেন। বাঙালীর ঘরে ঘরে তাই শোনা যায় আগমনী ও বিজয়ার গান। সুতরাং সাধারণ বাঙালী পরিবারের যে সুখদুঃখ হরগৌরীর সংসারে থাকবে এটা স্বাভাবিক। সেকারণে ভক্ত গায়ক দেবীর হাতে শঙ্খ পরাবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এখানে হর দরিদ্র কুলীন বাঙালী আর দেবীদুর্গা সেই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, পতিব্রতায় যিনি বাঙালীনারীর আদর্শ।

ভক্ত কবি বা গায়ক হরগৌরীকে দিয়ে যতই কৃষিকর্ম করান, মৎস্যশিকার করান বা শঙ্খ-পরিধান করান না কেন তাঁদের অলৌকিকত্বকে কখনো ভোলেননি, লৌকিকতার ফাঁকে ফাঁকে অলৌকিকত্বের লুকোচুরি খেলা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। বাংলার লোকসমাজ তাঁদের প্রিয় দেবদেবীকে নিজেদের জীবনজীবিকার অঙ্গীভূত করে একান্ত আপন করে নিয়েছেন। এখানেই, "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা" কথার সার্থকতা নিরূপিত। দুর্গার শঙ্খ-পরিধান পালায় উল্লিখিত সত্য জীবন্ত রূপে পালাগায়কগণ তাঁদের গানের আসরে পরিবেশন করেন। এ গানের বা পালার সাহিত্যমূল্য বা উৎকৃষ্টতা এখানেই নিহিত আছে। পালাগায়ক অনিল হাজরার নিকট হতে সংগৃহীত 'দুর্গার শঙ্খ-পরিধান' পালাটি নিম্নরূপ—

দুর্গার শঙ্খ পরিধান পালা।

একদিন হরপার্বতী হরিষ অন্তরে।
বিরাজ করেন দোঁহে কৈলাস শিখরে।।
হর প্রতি জিজ্ঞাসেন দেবী হৈমবতী।
শঙ্খ-পরিধানের ইচ্ছা হইয়াছে বলবতী।।

কথা।। প্রাণনাথ, কিছু শঙ্খ পরিয়ে দিন আমাকে। শিব তখন বলেন, দেখ হৈমবতী, যেদিন ভিক্ষায় যাই সেইদিন খেতে পাই, যেদিন ভিক্ষায় যাই না সেইদিনে খেতেও পাই না। এই অবস্থায় তোমার শঙ্খ পরানোর কড়ি আমি কোথায় পাই বল? শ্মশানে মশানে থাকি শঙ্খ আমি কোথায় পাব? বরং তুমি তো রাজার ঝিয়ারী, শঙ্খ-পরিধান হেতু যাওনা বাপের বাড়ী। সেকি! পিতা মোর গিরিরাজ মাতা মেনকাসুন্দরী, বিবাহ দিতে চায়নি আপনি ভিখারী। ইচ্ছাকৃত স্বামীতে বরণ করেছি আপনারে। শঙ্খ পরিবার তরে যাই যদি আপন পিত্রালয়ে, অপমান তিরস্কার করে যদি তাড়িয়ে দেয় আমারে?

মহাদেব ঃ তিরস্কারের ভয় যদি থাকে তব মনে, শুধু হাতে থাক প্রিয়া আপন ভবনে।

দেবী ঃ দেখ কার্তিক গণেশ, পায়ে ধরে এত কাকুতি মিনতি করলাম, তবু তোমার পিতা শঙ্খ পরিয়ে দিলেন না। আমি সেইহেতু বাপের বাড়ি যাব। তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে?

কার্তিক ঃ হ্যাঁ মা, বহুদিন মামার বাড়ি যাইনি আপনি যদি যান তবে যাই।

কথা।। ধীরে ধীরে গৌরীমাতা কার্তিক গণেশকে নিয়ে করিল গমন। পশ্চাতে ছিল নারদ ভাগ্নে কুটিলভাবে মামাকে ডেকে বলে ঘন ঘন।

নারদ : মামা, সর্বনাশ হয়ে গেল। মামীমা চলে যাচ্ছেন। শঙ্খ পরতে চেয়েছিলেন, আপনি নাকি তা দেন নি, তাই রাগ করে চলে যাচ্ছেন বাপের বাড়ি।

মহাদেব : কি হবে নারদ? ভগবতী ছাড়া তো আমি কৈলাসে একা থাকতে পারব না। এখন উপায় বলে দাও।

নারদ : সেই তো, আপনি মামা বুদ্ধিতে সুধীর। আপনার জন্য বুদ্ধি আমার করতে হবে বাহির। যাক অদূরে আপনি একটা বন সৃষ্টি করুন। সেখানে আপনি এক বাঘের রূপধারণ করে অপেক্ষা করুন। আপনাকে দেখে মামীমা ভয় পেয়ে কৈলাসে চলে আসবেন।

মহাদেব : দেখিস বাবা নারদ, বেফাঁস কিছু হবে না তো? তুই আমার সংগে থাকবি তো?

নারদ : মামা, নারদ যেখানে আছে সেখানে আপনার কোন ভয় নেই, আপনি চলুন।

গীত।। বাঘ : কোথা যাও ও সুন্দরী বলে যাও আমারে
ক্ষুধায় আমার জঠর জ্বলে খেতে দাও আমারে।

দেবী : না না, আমি যাব বাপের ঘরে দাওনা রাস্তা ছেড়ে
অধিক বেলা হল ও বাঘ যাব পিত্রালয়ে।

বাঘ : আগে খাব তোর কচি ছেলে পরে তোরে ধরে খাব
ক্ষুধায় আমার জঠর জ্বলে খেতে দাও আমারো।

নারদ : মামীমা, আপনি বৃথা ভয় পাচ্ছেন। বাঘ আপনার বাহন, আপনি চলে আসুন।

দেবী : যুক্তিদাতা নারদ তুমি উপায় বল মোরে
কেমনে বাঘের হস্তে রক্ষি মোরে এবারে।

নারদ : শুন শুন ও মামীমা বলিগো তোমারে
আপন বাহনপৃষ্ঠে চাপহ এবারে।

কথা।। হাসিতে হাসিতে গৌরী ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চাপিবারে চলে।
লজ্জা পেয়ে ভাঙড় ভোলা চলে আপন ঘরে।

মহাদেব : নারদ! নারদ সর্বনাশ হয়ে গেল বাবা, তুমি যুক্তিদাতা নারদ, আমাকে এমন যুক্তি দিলে আমি দেবাদিদেব মহেশ্বর, শেষ পর্যন্ত তোমার মামীমা এসে আমার পৃষ্ঠে চাপছে। যদি ঐ পায়ের ধূলা একটি বার আমার মস্তকে দেয় তাহলে দেবতারা দেবতা বলে মানবে?

নারদ : দিত না মামা, দিত না। আপনি ভয় করতে গেলেন কেন? আমি তো আপনার পিছনে রয়েছি! আপনি ভয় করে পালালেন কেন? তাই বলে মামীমার এতদূর স্পর্দ্ধা যে আমার মামার মাথায় পা দিয়ে যাবেন।

মহাদেব : আরে সে যে আমার পিঠে চাপতে আসছে, তুমি কি তা দেখলে না?

নারদ : তবে চলুন কৈলাসে ফিরে চলুন।

মহাদেব ঃ না নারদ কৈলাসে গিয়ে আমি তো একা থাকতে পারব না।

নারদ ঃ তবে আর একটা যুক্তি শুনুন। অদূরে একটা মায়ানদী সৃজন করে দিন। আপনি তাতে একটা মায়া ভগ্নতরী সৃষ্টি করে নিজেই কাণ্ডারী হয়ে যান। মামীমা যেই ওপারে যেতে চাইবেন, আপনি পারের কড়ি চাইবেন। মামীমা শুধুহাতে যখন যাচ্ছেন, কড়ি দিতে পারবেন না। মামীমা তখন সুড়সুড় করে কৈলাসে ফিরে আসবেন।

মহাদেব ঃ দেখিস বাবা, পা'র ধুলো আর দেবে না তো?

নারদ ঃ কেন মামা, মামীমার পার ধুলো দেখে আপনার কি বড্ড ভয়?

মহাদেব ঃ হ্যাঁ বাবা, স্ত্রীর পায়ের ধূলা মাথায় পড়লে দেবতারা কি আমাকে মানবে?

নারদ ঃ কেন মামা, আপনি কি মায়ের কালী অবতারের কথা ভুলে গেলেন? আপনি তো সাদরে তাঁর পদযুগল বক্ষে ধারণ করেছিলেন। দেবীগঙ্গা তো আপনার মস্তকে আগডুম বাগডুম হয়ে বসেই রয়েছেন।

মহাদেব ঃ ও সব কথা ছাড় বাবা। কবে কি হয়ে গেছে ওসব কথা ভুলে যাও।

নারদ ঃ এবার আর পা'র ধূলা দেবে না মামা, আপনি চলুন, আমিও আপনার কিছু পিছু যাচ্ছি।

(বাদ্য ... মায়ানদীর সৃষ্টি ... নিঝুম পরিবেশ)

দেবী ঃ একি! নদী এখানে কি ভাবে হল! যাই হোক, কার্তিক, গণেশ, তোমরা দেখ তো কোন কাণ্ডারী আছে কিনা?

গীত ।। কাণ্ডারী কাণ্ডারী বলে ডাকে গৌরীদেবী
মস্তক ঠুকিছে আমার দেবাদিদেব কিশোরই।

কথা ।। গৌরীদেবীর ডাকে মহাদেব তাঁর সেই ভগ্নতরীটি নিয়ে ধীরে ধীরে দেবীর নিকট এলে পর দেবী বলেন, ও কাণ্ডারী, তুমি আমাদের পার করে দেবে? পার করা যখন আমার কাজ পার তো করবই। তবে পারের কড়ি?

বল বল ও কাণ্ডারী বলি যে তোমারে,
তিনজনের পার করিতে কত কড়ি লবে?
তিনজনের পার করিতে তিনকাহন কড়ি,
কিন্তু কার রমণী ধনী তাই ভেবে মরি।

দেবী ঃ ওরে বাবা, এ মাঝি বলে কি! তোমার পার করে দেবার দরকার পার করে দেবে। আমি কার ঘরের রমণী তা তোমার জানার দরকার কি?

মহাদেব ঃ না, মানে আমি ভাবছিলাম, কেমন তোমার স্বামী? এই কচি দুটো বাচ্চা নিয়ে তোমাকে একা ছেড়ে দিয়েছে? তোমার এই ভরা-যৌবন নিয়ে বাড়ির বাইরে বের হলে কিভাবে? তার কি একটা লজ্জা ঘৃণা নেই।

দেবী ঃ দেখ কাণ্ডারী, আমার স্বামী বড় গরীব মানুষ, তাই পয়সাকড়ি দিতে পারে নি, আমি বাপের বাড়ি যাচ্ছি। এসে তোমার পয়সাকড়ি দিয়ে যাব।

মহাদেব : শোন, শোন, শোন! এ রকম ক'ঘর তুমি মজিয়েছ? পারের কড়ি না দিয়ে তুমি পার হতে চাইছ? পারের কড়ি দিয়ে তবে যাবে।

অর্ধ রাস্তায় যায় দেব তরীখানি লয়ে
কড়ি দাও কড়ি দাও বলে ঘন ঘন কয়ে।

দেবী : একি, চারিদিকে ঘোরতর মেঘ! কাণ্ডারী, তুমি আমাকে পার করে দাও। আমাকে বাপের বাড়ী যেতেই হবে।

মহাদেব : না না, তোমার বাপের বাড়ি যাবার আর দরকার নেই। অত্যন্ত দুর্যোগ, তুমি কৈলাসে ফিরে যাও। কৈলাসে তোমার বাড়ি, তুমি সেখানেই যাও।

দেবী : বুঝতে পারছি কাণ্ডারী, এ ঝড়বৃষ্টি তুমিই এনেছ। কেমন পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ মেঘ এল কোথা থেকে?

মহাদেব : ঝড়বৃষ্টি কি আমার বাবাকেলে যে ঝড়বৃষ্টি আমার কথা শুনবে?

দেবী : তবে তুমি থামাতে পারবে না? আমি থামিয়ে দিই?

গীত।। নৌকার উপরে মাতা তখন ভীমামূর্তি ধরে
গণ্ডুষে জল শুষ্ক হইল চক্ষের নিমেষে,
এপার হতে ওপারে যায় নির্বিঘ্ন হয়ে,
পার হয়ে চলে যায় পুত্র সংগে লয়ে।

মহাদেব : ও বাবু মেয়ে, শোন শোন। তুমি চলে যাচ্ছ, কড়ির উপায়?

দেবী : নদীর মাঝে যখন ঝড়বৃষ্টি এল তখন তুমি থামাতে পারনি, আমি থামিয়েছি, আর এখন কড়ি চাইতে তোমার লজ্জা করে না?

মহাদেব : ঝড়বৃষ্টি কি আমার বাপকেলে? কড়ি দাও কথা কও!

শুন শুন ও কাণ্ডারী, বলি গো তোমারে, কড়ির বদলে তোমার পদধূলি দেব।

মহা : নারদ! নারদ, সর্বনাশ হয়ে গেছে! আবার তোমার মামীমা পদধূলি দিতে চায়। আমি দেবাদিদেব মহেশ্বর, আবার তুমি আমাকে অপমান করতে চাও। তোমার পরামর্শে আমি কাণ্ডারী হয়ে একি বিপদে পড়লাম রে বাবা।

নারদ : কোন ভয় নেই মামাবাবু, কোন ভয় নেই! নারদ যখন আপনার সংগে রয়েছে, কোন চিন্তা নেই।

মহা : তোমার আর কোন কথা শুনবো না নারদ! আমি এখনই কৈলাসে ফিরে যাব। কিন্তু! কৈলাসে গিয়ে তো একা থাকতে পারব না! এ কি বিপদ!

নারদ : একটা যুক্তি আছে মামা। আপনার মাথার ঐ পাগড়ি দেখে ভয় হচ্ছে। ওর জন্যেই হয়তো আপনি ধরা পড়ে যাবেন।

মহা : তবে কি আমি নেড়া হব?

নারদ : না নেড়া হতে হবে না। মাথাটা ভালো করে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিন। আর কিছু শঙ্খ ভাঙাবাক্সে করে নিন। শাঁখারীর বেশ ধরে আপনি রাস্তার ধারে বসবেন, আর আমি

মামীমাকে আপনার কাছে পাঠাব। আপনি শাঁখা পরিয়ে মামীমাকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনবেন।

মহা ঃ দেখিস বাবা নারদ, তোর মামীমা যা-তা নয়। যে ঝড়ের মত উড়ছিল, ঐ অবস্থায় দেবীর পা এসে আমার ভুঁড়িতে যদি ক্যাঁত করে পড়ে, তা হলে পোঁটাপাঁটি সব বেরিয়ে যাবে!

নারদ ঃ ও মামীমা, এই একজন বুড়ো শাঁখারী এসেছে, কিছু শাঁখা পরলে হয় না। শাঁখার জন্যে বাপের বাড়ী আর যাবার দরকার কি? এই তো রাস্তার উপর শাঁখারী। কিছু পরে নিন।

দেবী ঃ এই বুড়োশাঁখারীর কাছে শাঁখা পরব?

মহা ঃ এ বাপু, বুড়ো বুড়ো কোরো না, পরমায়ু খ্যায় (ক্ষয়) হয়ে যাচ্ছে।

দেবী ঃ বুড়ো নয়তো কি? তোমার চাঁপদাড়ি সব পেকে রয়েছে।

মহাদেব ঃ ও রকম হয়। আমি বড় চিন্তাযুক্ত লোক। তাই পেকেছে।

দেবী ঃ ঐ দাঁত পড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি!

মহা ঃ ফ্যান খেয়ে দাঁত পড়ে গেছে। তুমি জান না, আমি অত্যন্ত ভাতের মাড় খাই।

দেবী ঃ ফ্যান খেলে কি দাঁত পড়ে? কড়াই ভাজা, মাংসের হাড় চিবুলে না হয় দাঁত পড়ে।

মহা ঃ আমার গেছে। তাই বলে আমি কি বুড়ো? যাক্ তুমি শাঁখা পারবে তো এস।

দেবী ঃ আমার কাছে তো একটাও কড়ি নেই, কি করে শাঁখা পরি? আমি বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এসে শাঁখার কড়ি দেব, কিন্তু শাঁখার দাম কত?

জোড়াশঙ্খ দেব প্রিয়ে দশকাহন কড়ি
কিন্তু কার রমণী তুমি আমি তাই ভেবে মরি।

দেবী ঃ আরে বাপুরে, এক কাণ্ডারী পার করতে গেল সে, বলে তুমি কার রমণী। আবার শাঁখারী বলে তুমি কার রমণী। তুমি শঙ্খ পরিয়ে দেবে, কিন্তু আমি কার ঘরের রমণী, সে কথা তোমার জানবার দরকার কি?

মহা ঃ সবার দুটো করে হাত থাকে আর তোমার বাঁশঝাড়ের মত একগাদা হাত কিনা তাই জিজ্ঞেসা করছি।

পিতা মোর গিরিরাজ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়
ভিক্ষা করে খান গো তিনি শ্মশানেতে রয়।

মহাদেব ঃ ভালো ভালো ও গো ধনী বলি যে তোমারে
ভালো ভালো শঙ্খ আছে পরাব এবারে।
জয় শিব বলে দুর্গা হস্ত বাড়াইল
জয় দুর্গা বলে শিব শাঁখা হাতে নিল।

মহা ঃ কিন্তু না, নতুন বস্ত্র না-পরে এলে শঙ্খ পরানো যাবে না। নিময়কানুন তো কিছু আছে বাপু। যাও শিগগির নতুন বস্ত্র পরে এস।

দেবী ঃ কার্তিক, গণেশ, তোমরা আমার মায়ের কাছে থেকে নতুন একখানা বসন চেয়ে আন। আমি তাই পরে শঙ্খ-পরিধান করব।

কার্তিক ঃ না মা, আমি যেতে পারব না। সে যে খুটখুটে বুড়ী, কাপড় চাইতে যাই, আর

আমার তাড়া করুক। বছরে একবার তোমার সাথে যাই, তিনটে রাত পোয়াতে না পোয়াতে বলে বাড়িব পথ দেখ। আমি বাপু যেতে পারব না। আমার বাপ না হয় ভিখারী, তাই বলে তোমার মায়ের কথা আমার সহ্য হবে না।

দেবী : শাঁখারী, তবে তুমি বস, আমি মায়ের কাছ থেকে কাপড় চেয়ে আনছি।

কথা ।। এই বলে মা আমার বাপের বাড়ি গেল। আর মায়ের কাছে শঙ্খ-পরিধানের জন্য একটি কাপড় চাইল।

মেনকা : কোথাকার শাঁখারী, শাঁখা পরে পরে বুড়ো হয়ে গেলুম, এমন কথা তো কখনও শুনিনি যে, নতুন বসন না-পরলে শাঁখাপরা যায় না? এ দাসী-আমাদের ঘরে কোন কাপড় চোপড় থাকে তো একখানা দে।

দাসী : এই নাও দিদি, এই কাপড়টা বাক্সে পড়ে ছিল—

প্রথম কাপড় দান করিল ও তার নাম মেঘডুম্বুর,
সেই কাপড়ের শব্দগুলো গেল বহুদূর।
সেই কাপড়ে মহামায়ার বেশ নাহি হল,
দাসীকে ডাকিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল।

দেবী : মায়ের কাছে কাপড় চাইলাম, তা এই ময়লা কাপড় কি আমার শোভা পায়, এ কাপড় আমি নেব না।

মেনকা : হ্যাঁরে দাসী, আমার সোনার বরণ গৌরীকে তুই এই মেঘের মত কাপড় দিয়েছিস? আর ভালো কাপড় থাকেতো দে।

আর এক কাপড় দান করিল তার নাম খড়্গামুটি,
সেই কাপড় লয়ে দাসী যায় গুটি গুটি।
সেই কাপড়ে মহামায়ার বেশ নাহি হল,
দাসীকে ডাকিয়া পুনঃ বলিতে লাগিল।

দেবী : মায়ের কাছে বহুদিন পরে এসে একটা কাপড় চাইলাম, তাও আবার তার কানামুড়ো ছেঁড়া কাপড়। মাগো, তুমি কি আমার সংগে ঠাট্টা করছো? এই কাপড় আমি নেব না।

মেনকা : হ্যাঁ দাসী, তুই কি মারধোর খাবি নাকি, অনেকদিন পর গৌরী এল, আর তুই কখনও ময়লা কাপড় দিচ্ছিস, কখনও ছেঁড়া কাপড় দিচ্ছিস। আর কি কাপড় নেই? দেখ, আর যদি ভালো কাপড় থাকে তো দে। নইলে আমার বাক্সে একটা কাপড় আছে, গৌরীকে দে। যদি এটা পছন্দ না হয় বলিস, আর কাপড় নেই, ও যেন বাড়ী ফিরে যায়।

শেষ কাপড় দান করিল গৌরীদেবীর হাতে
পাটে পাটে গৌরীদেবী লাগিল খুলিতে।
সেই কাপড়ে লেখা আছে তেত্রিশ কোটি দেবের নাম
তা দেখে গৌরীদেবী আনন্দে উৎখান।
সেই কাপড় পরে দেবী শঙ্খ পরতে গেল
তেলহলুদ লয়ে দাসী যোগাতে লাগিল।

মহা ঃ বেশ সুন্দর কাপড় পরেছো। এই কাপড় এতক্ষণ কোথায় ছিল শুনি। খুব ভালো দেখতে হয়েছে। তুমি কার ঘরের রমণী, কি তোমার নাম বল দেখি। এই রকম কাপড় পরে এলে আমার শঙ্খ পরাতে কোন আপত্তি নেই। দেখি, একবার হাতটা বাড়াও তো দেখি—

জয় শিব বলে দুর্গা হস্ত বাড়ায়িল।
জয় দুর্গা বলে শঙ্খ পরাতে লাগিল।

দেবী ঃ একি, আমার নাম দুর্গা—এ বুড়ো শাঁখারী জানল কি করে। আচ্ছা (শ্রোতাদের দিকে), এই বুড়োটার আমার স্বামীর মত কণ্ঠস্বর নয় কি?

দোহার ঃ হ্যাঁ হতে পারে, যে-যার স্বামীর গলার স্বর তার জানা থাকে। এ যদি তোমার স্বামী হবে, এর অন্যান্য চিহ্ন কিছু নেই?

দেবী ঃ হ্যাঁ তা আছে, আমার স্বামীর মাথায় জটার পাহাড়, এর নেই।

দোহার ঃ আরে বাবা, মাথায় ঐ কাপড়ঘেরা রয়েছে, ওর ভেতরই সেটা আছে। কাপড়টা একবার সরিয়ে দেখ না।

দেবী ঃ কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে, নারদ তো সবসময় আমার স্বামীর পিছু পিছু থাকে, সে বা কোথায়?

"হরে নারায়ণ হরে নারায়ণ হরি নারায়ণ"।

দেবী ঃ এই তো নারদ। তুমি কোথায় ছিলে বাবা। এই বুড়োর পাল্লায় পড়ে আমার জীবন যায় আর কি। কোথাকার শাঁখারী তা কে জানে, কেবল শাঁখা পরিয়ে দশকাহন কড়ি চাইছে। আমি এখন কি করি। কড়ি এখন কোথায় পাব বাবা?

নারদ ঃ এ বাপু বুড়ো, মায়ের কাছে কেবল কড়ি চাইছ কেন? তুমি জান, আমি কে, মাথা গুঁড়ো করে দেব। মামীমার এক ভিখারীর সংগে বিয়ে হয়েছে, তার কাছে কোন কড়ি নেই। আচ্ছা মামীমা, আপনি একটু সরে দাঁড়ান, আমি বুড়োকে বুঝিয়ে বলছি। মামা, এবার না ফিরিয়ে ছাড়বেন না। বাগে যখন পেয়েছেন, একটু শাস্তি দিয়ে নিন।

মহা ঃ হ্যাঁ বাবা, শাস্তি মানে, ঠিক যুক্তি করছ তুমি (চাপাস্বরে)। কইগো বাপু মেয়ে, আমার কড়ি দাও, নইলে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব।

দেবী ঃ নারদ, এ কি বলে? আমি হরের ঘরের রমণী। এতদূর এর স্পর্দ্ধা। শাঁখারী হয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে চায়?

দাড়াও দাঁড়াও ও শাঁখারী বলি গো তোমারে
হাত কেটে শঙ্খ আমি ফেরাবো তোমারে।
ক্ষান্ত হও ও সুন্দরী বলি গো তোমারে
তুমি হাত কেটে কি পুরীধামের জগন্নাথ সাজিবে।

দেবী ঃ তা নাতো কি? তুমি সামান্য শাঁখারী, আমি হরের ঘরের রমণী তা কি তুমি জান না?

মহা ঃ লজ্জা লেগেছে তোমার? কাশীধামের ভোলানাথ, সে হয় আমার মিতে। সেই সুবাদে বলি গো ধনী আমার সঙ্গে যেতে।

দেবী : তাহলে তুমি আমার স্বামীর মিতে? ওই জন্যে তুমি আমাকে যেতে বলছ? যাক্‌গে আমি চিনতে পারিনি। তুমি আমার স্বামীর মিতে যদি হবে, কৈলাসে তো কোনদিন যেতে দেখিনি। তুমি যখন শাঁখারী, কৈলাসে গিয়ে তো তুমি আমার শাঁখা পরিয়ে দিতে পারতে, এর জন্য বাপের বাড়ি আমার আসার দরকার কি ছিল?

নারদ : মামীমা, তুমি একটু সরে দাঁড়াও। আমি বুড়োকে বুঝিয়ে বলছি — মামা, সহজে ধরা দিলে কিন্তু মামীমাকে জব্দ করা যাবে না। একটু প্রকারান্তরে ঘুরে দাড়ান।

দেবী : নারদ, তুমি বুড়োর কানে কানে কি বললে?

নারদ : কই, আমি তো কিছুই বলি নি। কি বলেছি?

শ্রোতাগণ : না না, কিছু বলে নি।

দেবী : এতবড় দুর্বাক্য বলছে, তবু তুমি কিছু বলছ না?

নারদ : এ বাবু বুড়ো, তুমি আমার মামীমাকে দুর্বাক্য বলছ কেন?

মহা : এ বাপু ছোক্‌রা, তুমি বড় বড় কথা বলছ। দেখছ, আমার বিরাট ভুঁড়ি, এই ভুঁড়ির ঠোকরে তোমার মাথা গুঁড়ো করে দেব। চুপ করে বসো ওখানে।

নারদ : হ্যাঁ বাবা, আমি এখানে এই চুপ করে বসে রইলাম।

মহাদেব : কই, কড়ি দিচ্ছ না, নইলে আমি এখান থেকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব।

দেবী : নারদ, এত বড় দুর্বাক্য বলছে, আর তুমি কিছু বলছো না। কার্তিক-গণেশকে ডাকব?

নারদ : মামীমা, কার্তিক-গণেশকে ডাকবেন না, একেবারে তুলকালাম বেধে যাবে। একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মহাদেব : (নিচু গলায়) ও নারদ, কার্তিক-গণেশ এলে এখন কি হবে?

নারদ : মামা, চুপ করে বসুন, আমি ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি। মামীমা, কার্তিকগণেশকে ডেকে কাজ নেই। আপনি বরং মামার পাগড়ি ধরে মারুন টান, আর আমি পেছন থেকে মেরে দিই দুমদাম।

দেবী : তুই পারবি তো বাবা, আমি পাগড়ি ধরি আর তুই পিছন থেকে দুমদাম মারবি?

কথা ।। গৌরীদেবী মহাদেবের মাথার কাপড় টানতেই দেখে মাথায় অর্ধচন্দ্র।

দেবী : একি, কপালেতে অর্ধচন্দ্র তুমি প্রাণনাথ আমার!

শাঁখারীর বেশ ধরে নিতে এলে আমায় ?

মহাদেব : তুমি কুচুনীর বেশেতে একদিন দিয়েছ লাঞ্ছনা,

তাই শাঁখারীর বেশেতে দিলাম গঞ্জনা।

* * * * *

হরগৌরী একই সাথে কৈলাসেতে গেল
শঙ্খ-পরিধানপালা আজই সম্পূর্ণ হইল।
প্রেমানন্দে সবাইমিলে একবার হরি হরি বল। *(সমাপ্ত)*

দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালাগানটি চব্বিশ পরগণার বহু পাঁচালি গায়ক গান করেন। দুর্গার শঙ্খ-পরিধান পালাগানটি সাধারণত একক বা স্বতন্ত্র পালাগান হিসাবে পরিবেশিত

হয়না। অধিকাংশক্ষেত্রে মূল মনসা পালার অঙ্গ হিসাবে শিবের চাষপালার সূত্রে দেবীর শঙ্খ-পরিধানের বিষয়টি গীত হয়। গৃহকর্তা বা 'নায়েক' অথবা দর্শক-শ্রোতাদের অনুরোধে অন্যান্য পালাগানের সঙ্গেও দেবী দুর্গাব শঙ্খ-পরিধান পালাটি 'শাখাপালা' হিসাবে কথিত হয়। অবশ্য ক্ষেত্র-গবেষণায় দেখা যায়, যে পরিস্থিতিতেই দেবীর শঙ্খ-পরিধান পালা গীত হোক না কেন তার প্রারম্ভ আনুষ্ঠানিক ভাবে দেবীব 'ঘট বসান' প্রথাটি পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয়। পালাগানের শেষে এয়োদের মধ্যে দেবীঘটের শাঁখা-নোয়া-সিঁদুর পরার লোকাচার অনুষ্ঠিত হয়, যার কেন্দ্রে থাকেন মূল-গায়ক। দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালাটি প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রীয় দেবী আদ্যাশক্তি দুর্গা এবং দেবাদিদেব মহেশ্বরের লৌকিক রূপ। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কলহ ও সুখদুঃখের লোকপ্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করে পালাগানটি গড়ে উঠেছে। শাস্ত্রীয় দেবদেবীগণ চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগায়েনদের রচনায় এবং পরিবেশনায় পালাগানের ঐতিহ্যে হয়ে উঠেছেন সাধারণ নরনারী। দৈব মহিমা নয়, জীবনরসই দুর্গার শঙ্খ-পরিধানপালার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সহায়কগ্রন্থ

- শ্রী উদয় সেন, দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী।
- বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, বাংলা গাথাকাব্য (১৯৬২)।
- আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।
- পল্লব সেনগুপ্ত, পূজাপার্বণের উৎস কথা।
- শ্রী শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৩৯৯, পৃঃ ৫৪।
- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন।

দেবীপালা ঃ সন্তোষীমা

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানগুলির মধ্যে সন্তোষীমার পালা অন্যতম। পালাগান আলোচনায় এই পালাগানটি দেবীপালার অন্তর্গত। সন্তোষীমার পালা বাংলা পালাগান সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন। দেবীর পূজা-সংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে প্রাচীন নয়, আনুমানিক বিংশ শতকের মাঝামাঝি অথবা তারও পরে এই পূজার প্রচলন হয়। এই জেলার শহরতলী অঞ্চলে দেবীর পূজানুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষ দেবীর নাম শুনলেও পূজাদি করেন না। ক্ষেত্রগবেষণায় জানা গেছে চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনঘেঁষা গ্রামগুলিতে এই দেবীর নামও অনেক মানুষ শোনেননি। দেবীর পূজায় মহিলাগণের উৎসাহ উদ্দীপনা অধিক থাকে। পুরুষদের পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে খুবই কম দেখা যায়, কিন্তু শিশুর উপস্থিতি যথেষ্ট। কারণ শিশুদের পরিতোষ করে প্রসাদ প্রদানের বিধি এই পূজার প্রধান অঙ্গ হিসাবে পালিত হয়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তোষীমার পূজানুষ্ঠান করেন। এছাড়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ দেবীর কৃপা প্রার্থনা করেন। দেবী সন্তুষ্টি বিধান করেন বলেই সন্তোষীমা। মানুষ মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে শান্তিলাভের আশায় সন্তোষীমাতার চরণে আশ্রয় নেন। দেবীর ভক্তের বিশ্বাস তাঁর কৃপাদৃষ্টি পেলে সাংসারিক সমস্ত সমস্যা মিটে গিয়ে সুন্দর ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সবরকম,মনের কষ্ট, অর্থকষ্ট বাধাবিঘ্ন, দাম্পত্যজীবনের অশান্তি এবং সবরকম অশুভ ভাব দূর হয় এবং শুভ ফল প্রদান করেন দেবীসন্তোষীমাতা। কলিযুগে সন্তোষীমাতা সর্ব দুঃখকষ্ট বিনাশিনী, প্রতিটি মানুষের পরম শান্তিদায়িনীরূপে অবতীর্ণা বলে তাঁর ভক্তগণ মনে করেন। দেবীর ভক্তদিগের বিশ্বাস যে, দেবীর 'ব্রত' বা 'উদযাপন' করলে নারী বৈধব্য যন্ত্রণাদি পায়.না এবং স্বামী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ নিয়ে যাবজ্জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করতে পারেন।

সন্তোষীমাতার মূর্তি অতি সুশ্রী। দেবী চতুর্ভুজা, সালঙ্করা, প্রহরণধারিণী। তাঁর দক্ষিণহস্তে কৃপাণ, বাম ঊর্ধ্ব হস্তে ত্রিশূল, দক্ষিণ নিম্ন হস্তে বরাভয় মুদ্রা ও বাম নিম্ন হস্তে প্রসাদপূর্ণ পাত্র। দেবী পদ্মাসনা, কোনরূপ বাহন দৃষ্ট হয় না। তাঁর পরিধানে রক্তবস্ত্র, মাথায় চূড়া, সর্বাঙ্গে নানা অলংকার। দেবীলক্ষ্মীর ন্যায় তাঁর ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি। দেবীর পদমূলে জলপূর্ণ কুম্ভ থাকে, কোথাও শস্যপূর্ণ কুম্ভ দৃষ্ট হয়।

শুক্রবার দেবীসন্তোষীমাতার 'বার'। চব্বিশ পরগণা শুক্রবার দিনটিই সন্তোষীমাতার পূজার বার হিসাবে মান্য হয়। দেবীর পূজার জন্য অন্য কোন তিথিনক্ষত্রের প্রয়োজন হয় না। যেকোন শুক্রবার মাতার পূজা বা পূজা 'উদ্‌যাপন' করা যায়। উদ্‌যাপন বিষয়টি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। ব্রতিনী যেকোন মনস্কামনা নিয়ে সন্তোষীমাতার নিকট মানত করেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে দেবীর পূজার আয়োজন করেন। একেই বলে উদ্‌যাপন। কোন বিশেষ মনস্কামনা পূরণের জন্য পরপর ষোল শুক্রবার ব্রতপালন করতে হয়। শেষ শুক্রবারের পূজাকেই উদ্‌যাপন বলে। ব্রতিনী উদ্‌যাপনের দিন সামর্থ্য অনুযায়ী পূজার আয়োজন করেন। কয়েকজন ব্রতিনীর সাক্ষাৎকারে জানা গেছে, উদ্‌যাপনের দিন কমপক্ষে আড়াই সের খাজা ও চিনির রসযুক্ত পুরী ভোগ দিতে হয়। নৈবেদ্য হিসাবে থাকে ছোলাশাক। সম্ভব হলে অন্যান্য মিষ্টান্ন, পায়েসাদি দিয়ে দেবীকে ভোগ দেওয়া যায়। এছাড়া ভিজে ছোলা, ফলমূল, গুড় দেবীর পূজার উপকরণ। কোনরকম টক বস্তু দেবীর পূজায় একেবারেই নিষিদ্ধ।

সন্তোষীমায়ের পূজাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি সংস্কার পালিত হয়। এই সংস্কারের মধ্যে সিন্দূর দান, নারিকেল ভাঙ্গা, আত্মীয়, কুটুম্ব ও জ্ঞাতির সন্তানাদির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি প্রধান। পূজার শেষে প্রয়োজনে একে অপরের সিঁথিতে সিন্দূর টেনে দিয়ে সিন্দূরদান সংস্কার পালন করেন। পূজার সময় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে নারিকেল ভাঙ্গা হয় এবং মায়ের নামে জয়ধ্বনি করা হয়। পূজার দিন দেবর, ভাসুর বা কুটুম্ব ছেলেপিলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করার নিয়ম প্রশস্ত। এদের না পাওয়া গেলে অন্য ছেলেপিলের ডাকার প্রয়োজন হয়। দেবীর সবই নিরামিষ উপকরণে পূজা দেওয়া হয়। পূজার সময় কুমারী ও এয়োগণের শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখো হয়ে বসে ছোলা, গুড় হাতে নিয়ে মায়ের ব্রতকথা শুনতে হয়। এইভাবে বসে পুষ্পাঞ্জলিও দিতে হয়। এইদিন কোনরকম টকভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ। ব্রতিনীগণ পূজার আগে পর্যন্ত উপবাসে থাকেন। উপবাসে একান্ত অপারগ হলে রুটি তরকারী গ্রহণ করতে পারেন। পূজার শেষে যেকোন আহার্য গ্রহণ করতে বাধা নেই। দেবীর পূজা সাধারণত বিকেলে বা সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাশেষে যে মন্ত্রে ব্রতিনীগণ প্রণাম করেন তা হল —

নমস্তে শ্রী সন্তোষী মাতাঁরে সর্বদেবানাং পরমা প্রকৃতি
যস্যাতৃপ্তেন পূর্ণ ব্রহ্মরূপ স্বয়ং।।

সন্তোষীমাতার পূজা প্রকৃতপক্ষে চব্বিশ পরগণার ঐতিহ্যগত আঞ্চলিক পূজা নয়। উত্তরভারতে এই দেবীর ব্যাপক পূজাচার আছে বলে জানা যায়। ধীরে ধীরে এই পূজা ভারতবর্ষের বিভিন্ন

দিকে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সর্বত্র তিনি এই নামে পূজিতা নন। দেবী দশমহাবিদ্যারূপে, কোথাও লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা ইত্যাদি রূপে পূজা পান। চব্বিশ পরগণায় তিনি সন্তোষীমাতা নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। দেবীর পূজাচারগত নানা সংস্কারাদির দ্বারা প্রতীতি হয় যে তিনি লৌকিক দেবী। উড়িষ্যায় সন্তোষীমাতার পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। সেখানে দেবীর যে বীজমন্ত্রে ধ্যান বা পূজা করা হয় তা নিম্নরূপ—

ওঁ অম্বে অম্বে অম্বালিকে নমানয়নং সহর্ষিক
সুভদ্রিকা কাম্পল্যবাসিনী ওঁ নমঃ সন্তোষীমাতায়, দুর্গায় নমঃ।।[১]

উক্ত মন্ত্র থেকে দেবীর যে রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর সন্তোষীমাতা নামটি আপেক্ষিক বলে মনে হয়। দেবীকে মহামায়া দুর্গার অংশ বিশেষ বলে চিহ্নিত করা যায়। আর্ত মানুষের মনে সন্তোষ দান করেন বলে তিনি ক্ষেত্রবিশেষে বা অঞ্চল বিশেষে সন্তোষীমাতা নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। সন্তোষীমাতা কোন পৌরাণিক দেবীর নাম নয়। প্রকৃত তাৎপর্যে তিনি শোক-তাপ হরণকারী ও সমৃদ্ধিদানকারী লৌকিক দেবী।

দেবীর প্রহরণাদি থেকে অনুমিত হয় তিনি সমরপ্রিয় কোন জাতির ইষ্টদেবী। দেবীর হাতের কৃপাণ ও ত্রিশূল এই সত্য প্রমাণ করে। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত অনেক শীলমোহরে এমন অস্ত্রের ব্যবহার দেখা গেছে। বর্তমান গবেষক আবিষ্কৃত দক্ষিণ চব্বিশ গরগণার ধপধপি গ্রামে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে 'শক্তি' নামে পূজিত একটি সিন্দূরাচ্ছাদিত শূল ও কৃপাণ হস্তে বেলেপাথরের মহিষমর্দিনী প্রত্নবস্তু আছে যা শুঙ্গ যুগের বলে মনে হয়। হয়তো বা তিনি পৃথিবীর কোন আদিম মনুষ্যগোষ্ঠীর যাদুবিশ্বাস সঞ্জাত দেবী। কালে কালে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবী নারায়ণীর সাথে এই দেবীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দেবী জগদ্ধাত্রীর সাথেও সন্তোষীমাতার মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এছাড়া সন্তোষীমাতার হস্তে বরাভয় মুদ্রা ও কৃপাপাত্র থাকায় দেবীলক্ষ্মীর সমগোত্রীয়া বলে অনুমিত হয়।

দেবীসন্তোষীমাতা জেলা চব্বিশ পরগণার লোকসমাজের বিশ্বাসজাত লৌকিক দেবী না হলেও এই অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে দেবীর পূজার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজাবিধি সম্পর্কে হিন্দি ও বাংলায় নানারূপ পুস্তিকা প্রচারিত আছে। পূজার কালে মহিলাগণ ঐ পুস্তিকা লক্ষ্মীর পাঁচালির মত পাঠ করেন। অবশ্য চব্বিশ পরগণার অনেক পালাকার বা গায়েন সন্তোষীমাতাকে অবলম্বন করে কিছু কিছু পালারচনা করেছেন, যা সন্তোষীমায়ের পূজা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে পাঁচাল বা পালাগানের ধারায় পরিবেশিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর থানার পুনপোয়া গ্রামের শ্রী শ্যামলচন্দ্র সরদার সন্তোষীমায়ের পালাগান করেন। তাঁর মতে এই পালার চাহিদা খুব কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবীর পাঁচালিপাঠ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ের ব্রত উদ্‌যাপনের দিন দেবীর পালাগানের আসর বসে। বর্তমানে ছাপার অক্ষরে যে সব সন্তোষীমায়ের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, এগুলির মধ্যে পণ্ডিত শ্রী কালিপদ বিদ্যারত্ন

সাহিত্যতীর্থ প্রণীত 'শ্রী শ্রী সন্তোষীমাতার পাঁচালি ও ব্রতকথা' পুস্তকটি অন্যতম। যারা সন্তোষীমাতার পাঁচালিগান করেন তাঁদের গানের ও কথার সাথে এই পুস্তকের কাহিনীর বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পালা পরিবেশনকালে গায়কের নিজস্বতা প্রকাশ পায়। কথা, গান ও নৃত্যাদির মাধ্যমে পালাগায়ক পালাটি খুব আকর্ষণীয় করে তোলেন।

গায়েন শ্রী শ্যামল সরদার সন্তোষীমায়ের যে পালাটি গান করেন তাতে তাঁর নিজস্বতা বেশি প্রকাশিত হয়েছে। মূলকাহিনীটি কালীপদ বিদ্যারত্ন প্রণীত শ্রী শ্রী সন্তোষীমাতার পাঁচালি ও ব্রতকথার কাহিনীর সাথে মিল থাকলেও পালার বন্দনাদি বিশেষ কিছু অংশ গায়কের স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ। আসরে পরিবেশিত সন্তোষীমাতার প্রচলিত কাহিনীর বন্দনাটি নিম্নরূপ —

সন্তোষীমায়ের বন্দনা

জয় জয় সন্তোষীমাতা কি গাহিব তব কথা,
ধরাধামে এলে গুণমণি।
কাতর হয়ে যেবা ডাকে তুমি শরণ দাও মা তাকে
মধুর বাক্যে তোষ সুবচনী।।
চতুর্ভুজা পদ্মাসনা মাথায় চূড়া নিভাননা
ত্রিশূল হস্তে কৃপাণধারিণী।
হেমবর্ণা সালংকারা পায়ে নূপুর রক্তাম্বরা
অভয় মুদ্রা বিপদতারিণী।।
পরমা প্রকৃতিরূপে অবতীর্ণা হলেন ভূপে
মাতালক্ষ্মী কভু ভগবতী।
বিশালাক্ষী নারায়ণী শিবজায়া জগৎজননী
শীতলাদি তুমি জগৎধাত্রী।।
কখনও বা বারামুণ্ডে কভু দেখি শিলাখণ্ডে
সব দেবীর তুমি হও দেবী।
যত দেবী পূজে নরে সব পূজা তোমার পরে
শুদ্ধাচার কর তুমি দেবী।।
(ওমা) কালীকুণ্ডলিনী রূপে সাধক হৃদে থাক চুপে
সাধন বিনে সিদ্ধি নাহি দাও।
তুমি জগতের মাতা দুঃখীজনের ঘুচাও ব্যথা
দীনহীনের কোলে তুলে নাও।।
ধরাধামে যত রমণী তারা তোমার চক্ষুমণি
যদি তোমার পূজে ভক্তিভরে।

(তাদের) সকল কামনা সিদ্ধ হয় তোমারি সব গুণ গায়
কৃপা কর দুঃখ তাপ হরে।।
অনাথ আতুর শিশু যত তুমি হলে তাদের মাত
তোমার প্রসাদ দিলে তাদের অগ্রে।
টকখাবার সইতে নার টকদিলে অপরাধ ধর
টক বিনে সবই লও ব্যাগ্রে।।
পুত্রহীনা পুত্র পায় পত্নীত্যাগী পত্নী লয়
তোমার দয়ায় সংসারে আসে সুখ।
ধনহীন ধনী হয় পত্নী যদি পূজে তোমায়
উজ্জ্বল হাসি ভরে সবার মুখ।।
আমি অতি মূঢ়মতি কিছুমাত্র নাহি ভক্তি
কৃপা করে দেহ পদচ্ছায়া।
আসরেতে তোমার কথা গাওয়া নিছক বাতুলতা
কে বুঝে তোমার অসীম মায়া।।
কত আর বর্ণিব বল সন্তোষীমাতার গুণ সব
করজোড়ে কর দেবীর স্তুতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ আশে মানত কর মায়ের কাছে
ফল পাবে শুন ভক্তিমতী।।
নায়েকের কৃপা কর শোক তাপ সবই হর
জগৎজননী তুমি সন্তোষীমাতা।
আসরে আজ করি স্তুতি কোটি প্রণাম তোমার প্রতি
সর্বজীবের তুমি হও বিধাতা।।
অধম শ্রী শ্যামল গায় থানা জয়নগর নিবাস পুনপোয়ায়
ভুলচুক সবই কর ক্ষমা।
আগের কথা পিছে গেলে পিছের কথা আগে এলে
অন্তিমেতে রেখো পায়ে ওগো মা।।

আসরে পরিবেশিত সন্তোষীমাতার কাহিনীটি বন্দনা অংশের উৎকলিত বিবরণ হতে বোঝা যায় কিভাবে উত্তর ভারতের সন্তোষীমাতা পূর্বভারতে বিশেষত চব্বিশ পরগণার স্থানীয় দেবদেবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। এইটিই স্থানীয় সন্তোষীমাতার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যজাত রূপ যা Invention of Local Folk element তথা স্থানীয় লৌকিক উপাদানের অনুপ্রবেশ বা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

সন্তোষীমাতার প্রচলিত কাহিনীটি আসরে কথা ও গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যসহযোগে পালাটি গীত হয়। আসরে সর্বত্র দেবীর ঘট বসানোর রীতি দেখা যায় না।

সন্তোষীমায়ের মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক একটি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে। এটি লোকনাট্যের আকারে লেখা। পাণ্ডুলিপিটি গায়েন সুদিন মণ্ডলের নিকট হতে সংগৃহীত। অযত্নে থাকার জন্য এর আদ্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। পালাটির কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত, যে অংশটুকু রক্ষিত আছে তাতে সন্তোষীমায়ের মাহাত্ম্যপ্রচারের অংশটিই আছে। পুঁথির শেষে কয়েকটি পাতা না থাকায় সন্তোষীমায়ের পূজা কিভাবে হয়েছিল তা জানা যায়নি। এই পালার লেখক বারুইপুর থানার অন্তর্গত রঘুনন্দনপুর গ্রামের পশুপতি পাল। কাহিনীটির আদি ও অন্ত বাদ দিয়ে সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

সন্তোষীমার পালা

গ্রামের মহাজন বীরেশ্বর গরীবদের শোষণ করে যথেষ্ট ধনসম্পদ করেছেন। চারিত্রিক দোষ ভালোমতই আছে। গ্রামের এক দরিদ্র চাষী ক্ষেত্রধর তাঁর কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। সুদের সুদ তস্য সুদ ধরে সে টাকা এমন পরিমাণ হয়েছিল যে, শোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে বীরেশ্বরের লোকজন তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাকে বাস্তুছাড়া করে জমিটি আত্মসাৎ করেছিল। ক্ষেত্রধরের স্ত্রী অভিলাষী খুবই সৎ স্বভাবের মেয়ে। বীরেশ্বরের কু-প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে স্বামী ও পুত্রের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার কোলের শিশুসন্তানটি ঘরে আগুন লাগার পর কি হয়েছে তা জানতে পারেনি। বীরেশ্বরেরই অন্নপুষ্ট এক ব্যক্তি শিশুটিকে নিয়ে সেখান থেকে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে সে রামলাল ডাকাতের হাতে পড়ে। রামলাল ডাকাত শিশুসহ তাকে বন্দি করে রাখে এবং মনে মনে ফন্দি আঁটে, মা কালির কাছে শিশুটিকে বলি দেবেন। এদিকে ক্ষেত্রধর ও অভিলাষী বিশুর হাত ধরে সেই জঙ্গলের পথে যেতে যেতে রামলাল ডাকাতের হাতে পড়ে। ডাকাত তার ছেলে বিশুকে নিয়ে চলে যায়। তারপর তারা এক ব্যাধের কুটীরে এসে পৌঁছায়। সেখানে কয়েকদিন তারা খুব যত্নে থাকে। তারপর সেখান থেকে ব্যাধতনয়ার দেওয়া সন্তোষীমায়ের পূজার ফুল, সিন্দুর নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের পথে যেতে যেতে রাত হয়ে যায়। সেইসময় তুমুলবেগে জলঝড় আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় গাছের ডাল ভেঙ্গে ক্ষেত্রধর মারা যায়। মৃত স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে অভিলাষী কাঁদতে থাকে। তখন যম তার স্বামীকে নিয়ে যেতে চাইলে অভিলাষী নিজেও যমের সাথে যেতে চায়, কিন্তু যম তার সময় হয়নি বলে নিয়ে যেতে রাজী নয়। জোর করে ক্ষেত্রধরকে নিয়ে যেতে চাইলে অভিলাষী মা মা বলে উচ্চৈস্বরে ডাকলে মাতাসন্তোষী সেখানে আসেন। যমরাজের সাথে সন্তোষীমায়ের খুব বাকবিতণ্ডা হয়। সন্তোষীমায়ের ভীষণ মূর্তি দেখে যমরাজ ক্ষেত্রধরকে ফিরিয়ে দেন। তারপর মাতা-সন্তোষীর কৃপায় ক্ষেত্রধর ও অভিলাষীর মিলন হয়, কিন্তু সন্তানের জন্য তাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ওদিকে রামলাল ডাকাত বিশু ও অন্য শিশুটিকে মায়ের কাছে বলি দিতে প্রস্তুত। মায়ের কৃপায় বলি দিতে পারল না। হাতের খাঁড়া আপনা আপনি ডাকাতের হাত থেকে পড়ে গেল। তখন রামলাল নিজেই সন্তান দুটিকে নিয়ে তার মা-বাপের কাছে ফিরিয়ে দিতে আসে। পথে অভিলাষী ও ক্ষেত্রধরের সাথে দেখা হয়, সেখানে তাদের হাতে সন্তান দুটি প্রত্যর্পণ করে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। মাতাসন্তোষীর কৃপায় তারা সব ফিরে পায় ও মায়ের আদেশে পূজার ব্যবস্থা করে। *(সমাপ্ত)*

পুঁথির পাতা ছিন্ন হওয়ায় পরবর্তী ঘটনা কি হল তা জানা যায় না। পুঁথির কাহিনীটিতে অলৌকিকতা থাকলেও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের কথা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বলা যায় লেখকের গভীর গ্রামীণ জীবনবোধ এই কাহিনীতে ধরা পড়েছে।

সন্তোষীমার পালা (সাবিত্রী কথা)

পালাগায়ক শ্যামলচন্দ্র সরদারের গাওয়া সন্তোষীমাতার পালার কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

একদিন গণেশদেবতা এবং তাঁর স্ত্রী কলাবতী একাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁদের পুত্র ছিল (?) কিন্তু কন্যা ছিল না। একদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে গণেশের দুইবোন লক্ষ্মী, সরস্বতী এসেছেন গণেশকে ভাইফোঁটা দিতে। ভাইফোঁটা হয়ে যাবার পর গণেশের পুত্রগণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে বলেন তাদের কে ফোঁটা দেবে? এই বলে তারা কান্নাকাটি করতে শুরু করে। তখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীমহামায়ার কাছে কাতরে প্রার্থনা করেন গণেশের একটি কন্যাসন্তানের জন্য, যিনি গণেশের পুত্রদের ভাইফোঁটা করতে পারবে। এই প্রার্থনায় দেবী-মহামায়া সন্তুষ্ট হলেন এবং মায়া বিস্তার করে সমস্ত আকাশে দিব্যজ্যোতি ছড়িয়ে দিলেন। তারপর সেই জ্যোতি একত্রিত হয়ে পরমা সুন্দরী সন্তোষীমাতার আবির্ভাব হল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হল, ইনি গণেশের কন্যারূপে তাঁর ছেলেদের ভাইফোঁটা করবে। মর্ত্যে এই দেবীর পূজা প্রচারের ব্যবস্থাও হল। প্রতি শুক্রবার যে এই দেবীর পূজা ভক্তিসহকারে চোখের জলের সাথে করবে, সে সর্বসুখ ও সর্বসিদ্ধি লাভ করবে ও সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বলে লক্ষ্মী সরস্বতী তাকে আশীর্বাদ করলেন। সেই থেকে মায়ের পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হল। মর্ত্যে পূজাপ্রচার করতে গেলে মর্ত্যবাসীকে দিয়ে পূজা করানো দরকার, না হলে মর্ত্যের মানুষ তাঁকে চিনবে না বা পূজা করবে না। এই কথা দেবী মনে মনে চিন্তা করে মর্ত্যের কোন এক ভক্তকে দিয়ে পূজা করাবেন বলে স্থির করলেন। তিনি এই ভেবে মর্ত্যে এক বুড়ির বাড়ি এলেন।

সেই বুড়ির সাতসন্তান ছিল। তাদের মধ্যে ছয়জন কাজকর্ম করত, টাকাপয়সা উপায় করে বুড়ির হাতে দিত, ফলে বুড়ি তাদের ও তাদের বৌদের খুব যত্ন করত এবং ভালটামন্দটা করে তাদের খেতে দিত। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রামলাল। সে কাজকর্ম করতে পারত না ও জানত না। কারণ ছোটবেলায় আদরে মানুষ হওয়ার জন্য কোন কাজকর্ম শেখা হয়নি। ফলে বুড়ি তার এই ছেলেকে ও এর বৌকে মোটেই দেখতে পারত না। রোজগারে ছেলেরা খেয়ে

যা অবশিষ্ট থাকত বা তাদের উচ্ছিষ্ট তাকে খেতে দিত এবং তাদের বৌদের উচ্ছিষ্ট রামের বউকে খেতে দিত। এ তত্ত্ব রাম ও তার বৌ জানত না। একদিন ছোট বৌ বুড়ির এই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীকে সে এই কথা জানালে রাম প্রথমে বিশ্বাস করেনি। পরে লুকিয়ে মায়ের কাণ্ড দেখে মনে মনে খুব দুঃখ পায়। তখন সে বাড়ি থেকে চলে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় এবং মাকে চাকরি করতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রী রয়ে গেল বাড়িতে। স্বামী ভাগ্যান্বেষণে যাচ্ছে এই কথা ভেবে ছোট বৌ ভাবী সমস্ত দুঃখকষ্টের আশঙ্কা মেনে নিয়ে স্বামীকে বিদায় দেয়। রাম তার স্ত্রী সাবিত্রীকে যাবার সময় একটি আংটি দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল এই আংটি যখন নাড়াচাড়া করবে তখন আমার স্পর্শ তুমি পাবে এবং সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে। একথায সাবিত্রী রাজী হয়ে গেল, রাজী না হয়েও উপায় ছিল না। তাই যাবার সময় সাবিত্রী বলে—

এ জগতে পতি বিনা নাই কোনও গতি।
পতিই সাক্ষাৎ দেব শুনহ সুমতি।।
নিজগুণে মোর সর্ব দোষ ক্ষমা কর।
কর্ম করে তুমি যেন হও খুব বড়।।

স্ত্রীকে বুঝিয়ে রেখে রামলাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে রামলাল এক ছোট শহরে উপনীত হয়। সেখানে এক শেঠের দোকানে খাওয়া-পরা আর পাঁচ টাকা মাসিক বেতনে চাকরি গ্রহণ করে। ক্রমে রামলালের সততা ও বুদ্ধিমত্তায় শেঠজি তার বেতন অনেক বাড়িয়ে দেয়। এমন কি সেই ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রামলালের উপর ছেড়ে দেয়। আস্তে আস্তে শেঠজির ব্যবসার অর্ধেক মালিক সে হয়ে যায়। এদিকে রামলালের স্ত্রী সাবিত্রীর উপর দিনের পর দিন কাজের বোঝা চাপতে লাগল। তার শাশুড়ি তাকে দুবেলা পেটভরে খেতে দেয় না। এমনকি অত্যাচারের মাত্রা এমন বেড়ে গেল যে, ভাতের মুখ আর সে দেখতে পায় না। গমের ভুষির রুটি ও তরকারীর খোসা সিদ্ধ খেয়ে তার দিন কাটে আর প্রচুর কাজ করতে হয়। সকালে সংসারের সব কাজ সেরে দুপুরের দিকে বনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সন্ধের পূর্বে বাড়ি ফেরে। এই কষ্ট সহ্য করেও সাবিত্রী স্বামীর মঙ্গলের কথা ভেবে ঈশ্বরের কাছে কাঁদে আর বলে, হে দয়াময়, দুঃখকষ্ট যদি দাও তা সহ্য করার ক্ষমতাও তুমি দাও।

একদিন সাবিত্রী কাঠসংগ্রহ করে ফিরছে, পথে দেখে এক মন্দিরে বহু নারীর ভিড়। কাঠের বোঝা নামিয়ে সে তাদের নিকট জানতে পারে যে, এটি সন্তোষীমাতার মূর্তি এবং আরও জানতে পারে যে, এই দেবীর পূজা করলে অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, অজ্ঞানীর জ্ঞান হয়, যার যা কিছু মনের বাসনা সব পূর্ণ হয়। দেবী কলিযুগের জাগ্রতা দেবী। তিনি যার উপর প্রসন্ন হন তাঁর গৃহে ধনধান্য ভরে যায়। সেদিন সাবিত্রী উপবাসী ছিল বলে সেখানে সে পূজার অধিকার পেল এবং তাদেরই ছোলাগুড় নিয়ে ভক্তিভরে চোখের জলে দেবীর পূজা করল। সেই থেকে বনের কাঠসংগ্রহ করে ফেরার পথে সাবিত্রী সন্তোষীমাতার মন্দিরে মনের কথা জানিয়ে কান্নাকাটি করে এবং দেশত্যাগী স্বামীকে ফিরিয়ে দেবার জন্য

প্রার্থনা করে। দেবীসন্তোষীমাতা সাবিত্রীর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে রামলালকে স্বপ্নে তার স্ত্রীর দুর্দশার কথা জানান। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে রামলাল টানা দশ বৎসর পর প্রথম মাসে একশত টাকা ডাকে পাঠায়। পরে পরে আরো বেশি টাকা পাঠায়, কিন্তু সাবিত্রী তাতে খুশি নয়। সে তার স্বামীকে কাছে পেতে চায়, দেবী রামলালকে সেকথা জানান। রামলাল ব্যবসা ছেড়ে-আসা অসম্ভব বলে জানালে দেবীর কৃপায় একমাসের বেচাকেনা একদিনে হয়ে যায়। পরদিন সে দোকান বন্ধ করে ঘোড়ায় চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

সাবিত্রী দেবীর মন্দিরে গিয়ে স্বামীর প্রত্যাগমনের কথা জানতে পারে। দেবীর নির্দেশে তিনবোঝা কাঠসংগ্রহ করে একবোঝা নদীর তীরে, একবোঝা মন্দিরের কাছে আর একবোঝা বাড়িতে ফেলে চিৎকার করে বলে, মা, "তিনবোঝা কাঠ এনেছি, ভূষির রুটি খেতে দাও, বড় খিদে পেয়েছে।" সাবিত্রী তার আগে দেখেছে, তার স্বামী ঘোড়ায় চড়ে ধুলো উড়িয়ে তার পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু তাকে শতছিন্ন শীর্ণ অবস্থায় দেখে চিনতে পারেনি। রাম বাড়িতে মাকে জানায় সে লক্ষপতি হয়েছে। মা তাকে খুব আদর যত্ন করছে। সাবিত্রীর খোঁজ নেওয়াতে মা বলে, কিছু পরে আসবে, একটু বাইরে গেছে। এমনসময় সাবিত্রীর কণ্ঠ শুনে রাম অবাক হয়ে যায়। প্রথমে চিনতে না পারলেও পরে আংটি দেখে চিনতে পেরে সাবিত্রীর ঐ দশার কারণ মায়ের নিকট জানতে চায়। মা কোন কথার উত্তর না দিতে পেরে চুপ করে থাকে। রামলাল স্ত্রীর জন্য ভাল শাড়ি এনেছিল, স্নান করে এসে তা পরতে বলে। এবার সাবিত্রী একটু সুখের মুখ দেখলো। রামলাল একটা বড় বাড়ি কিনে সেখানে গেল। স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী সে সেখানে সন্তোষীমায়ের পূজার ব্যবস্থা করে। পূজার শেষে তার জায়েদের চক্রান্তে তার ছেলেরা সাবিত্রীর কাছে টক চেয়ে না পেয়ে পয়সা চেয়ে নিয়ে টক কিনে খায়। সেই পাপে রাজার লোকজন এসে রামলালকে ধরে নিয়ে যায়। কারণ এতটাকার মালিক সে কিভাবে হল তা জানতে চায়। সাবিত্রী আবার সন্তোষীমায়ের পূজা করে। তার অপরাধের কথা সে মায়ের কাছ থেকে জানতে পারে। ফলে আবার ব্রত উদ্‌যাপন করে সব ছেলেপিলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল বটে কিন্তু টক ও পয়সা হাতে দিল না। ব্রত উদ্‌যাপিত হল। মায়ের কৃপায় রামলাল ছাড়া পেল, তাদের সুখের সংসারে একটি পুত্রসন্তান হল। পুত্রকে হাত ধরে নিয়ে সাবিত্রী নিত্য মন্দিরে যায় ও পূজা দেয়। এবার সন্তোষীমা ভাবলেন, সাবিত্রী প্রত্যহ আসে এবার তিনি সাবিত্রীর বাড়ি যাবেন। একদিন সাবিত্রী ব্রত করছেন, তার পূণ্য কলসীর উপর, পাত্রে প্রচুর ভিজা ছোলা ও গুড় আছে। এমনসময় বিশাল এক মাছি উড়ে এসে পাত্রে বসে। সবাই ভয় পেয়ে পালাল। বাচ্চারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল, কিন্তু সাবিত্রী দেখলো সেই মাছির গায়ে থেকে এক স্বর্গীয় সুগন্ধ বার হচ্ছে এবং জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। সাবিত্রী বুঝলো, ইনি নিশ্চয়ই সন্তোষীমাতা। সাবিত্রী চিৎকার করে বলল, তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না, আমার বড় সৌভাগ্য, যে দেবী আমার পূজার স্থলে এসেছেন। তোমরা সবাই মাছিরূপ দেবীকে নমস্কার কর। সবাই দেবীকে প্রণাম করল, দেবী নিজমূর্তি ধারণ করে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন ও অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সবাই দেবীসন্তোষীমাতার জয়ধ্বনি দিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেই থেকে সন্তোষীমাতার পূজা প্রচলিত হল।

(কাহিনী সমাপ্ত)

সন্তোষীমায়ের কাহিনীর মধ্যে অবাঙালী সংসার জীবনের ছাপ খুবই স্পষ্ট। বর্তমানে দেবীর অলৌকিক প্রভাব বাঙালী জনজীবন ধীরে ধীরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। দেবীসন্তোষীমাতার প্রভাব চব্বিশ পরগণার শহরতলী অঞ্চলে বিশেষ রূপে দেখা যায়। এই জেলার সুদূর গ্রামগুলিতে দেবীর নামের তেমন প্রচার বা প্রভাব নেই। অথচ গ্রামের লোকশিল্পীগণ ও পালালেখকগণ কিছু দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান রচনা করে চলেছেন এবং সেই রচনা পালাগায়কদের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। মহিলাগণ নিষ্ঠার সাথে সন্তোষীমাতার পূজাচারকে আঁকড়ে ধরছেন। বর্তমান সমস্যা জর্জরিত সমাজে পীড়িত মানুষের সান্ত্বনাদান ও আশ্রয়দানকারিণী দেবীরূপে সন্তোষীমাতার প্রভাব বিভিন্ন পূজাচার ও পালাগান শহরতলী অঞ্চলে প্রসারিত হতে দেখা যায়। শহরতলী বা গ্রামাঞ্চলে সন্তোষী মাতার প্রচলিত কাহিনীটি আসরে কথা ও গানের মধ্যে পরিবেশিত হয়। হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে পালাটি গীত হয়। আসরে সর্বত্র দেবীর ঘট বসানোর রীতি দেখা যায় না।

১. ধরণীধর পাণ্ডা, গ্রাম—চাউলিয়া, পো-সানকুয়াঁল, জেলা-জাজপুর, উড়িষ্যা (সাক্ষাতকার)

২. শ্রী কালীপদ বিদ্যারত্ন সাহিত্যতীর্থ প্রণীত শ্রী শ্রী সন্তোষীমাতার পাঁচালী ও ব্রতকথা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ দেবপালা

দেবপালা ঃ দক্ষিণরায়

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে দক্ষিণরায়ের পালা দেবপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণায় তথা বাংলা পালাগান সাহিত্যে বহু আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় দক্ষিণরায়। দক্ষিণরায়ের নাম পাওয়া যায় কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে, মরহুম মুনশী খাতের সাহেব প্রণীত বোনবিবির জহুরানামা ও ধোনা দুখের পালায়, খোদা নেওয়াজ রচিত পীর গোরাচাঁদের কেচ্ছা প্রভৃতিতে। উল্লিখিত তিন গ্রন্থে দক্ষিণরায়কে বিশিষ্ট মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কাব্যে দক্ষিণরায়কে স্থানে স্থানে দেবতা করে তুলেছেন। দক্ষিণরায় আঠার ভাঁটির ঈশ্বর, এ কথা সকল কবির কাব্যে উল্লেখ আছে। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবার এই দেবতার পূজা করেন। দক্ষিণরায়ের যে মূর্তি ব্যাপক ভাবে পূজিত হয় তা দেবতার মুণ্ড বা বারামূর্তি। দিব্যমূর্তি খুবই কম দেখা যায়। বারুইপুর থানার ধপধপি গ্রামে দক্ষিণরায়েরপ্রতিনিধি স্থানীয় এক দিব্যমূর্তির পূজা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের বকখালি, জয়নগর, পাথর, প্রতিমাতেও দক্ষিণরায়ের দিব্যমূর্তি দেখা যায়। কোথাও তিনি ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়, কোথাও অশ্ববাহন দক্ষিণরায়, কোথাও বাহনহীন। দক্ষিণরায়ের ধ্যানমন্ত্রে যে পরিচয় আছে তা হল—

> চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়
> শার্দুলবাহন দক্ষিণরায়।
> আবার
> সাগরসঙ্গম সুন্দরকায়
> ঘোটকবাহন দক্ষিণরায়।

আবার কোথাও পাওয়া যায়—

সাগরসঙ্গম সুন্দরকায়
শার্দুলবাহন দক্ষিণরায়
পঞ্চবক্ত্র সাবিত্রী হস্তে,
সংকটতারণ দেব নমহস্তুতে।[২]

দক্ষিণরায়ের আরও অনেক ধ্যানমন্ত্র আছে, কিন্তু ধ্যানমন্ত্রের সাথে প্রচলিত মূর্তির সাদৃশ্য খুবই কম। তাছাড়া দক্ষিণরায়ের ধ্যানমন্ত্রসমূহ পূজারী কর্তৃক অর্বাচীন কালের সৃষ্টি বলে জানা যায়। দক্ষিণরায়ের দুই ধরনের মূর্তি পূজার প্রচলন আছে যা নিম্নরূপ —
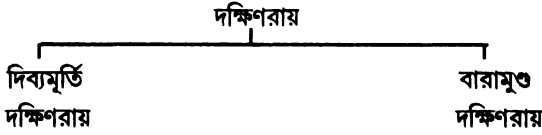
দিব্যমূর্তি দক্ষিণরায়ের মত সুশ্রী ও সুপুরুষ আকৃতির লৌকিক দেবতা অতি বিরল। ধপধপির দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায়ের যে মূর্তিটি আছে হিন্দুযুগের তা এক রাজযোদ্ধাবেশী সুপুরুষের অবয়ব। এক হাঁটু মুড়ে অপর হাঁটু উঁচু করে উঁচু বেদীর উপর বসে আছেন। দীর্ঘ ও বিশাল দুটি চোখ দিয়ে যেন ক্রোধাগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তীক্ষ্নদৃষ্টি, দূরে যেন কাউকে প্রত্যক্ষ করছে। হাতে বন্দুক, কোমরে তরবার। মূর্তির পেছনে আছে ত্রিশূল, তীর-ধনুক, তূণ, কুঠার, ঢাল। দেবতার কাঁধে সাদা ওড়না, পরনে সাদা ধুতি, পায়ে নাগরা জুতা। দেহে নানা অলংকার, যথা হাতে আংটি, রূপার পদক, কানে বানানো ধুতুরা ফুল। এটি ভক্তদের দেওয়া, সম্ভবত পিতলের বা রূপার তৈরি। গায়ে বর্মের আকারে কালো জ্যাকেট। দেবতার সামনেও একটি ত্রিশূল পোঁতা আছে, দেখে মনে হয় দক্ষিণরায়কে মহাদেবে রূপান্তরিত করার ক্ষীণপ্রচেষ্টা আছে। পাশে তাঁর একজোড়া খড়ম, জোড়া-পদলাঞ্ছিত প্রস্তরখণ্ড, মহিষমর্দিনী চতুর্ভুজা 'শক্তি', প্রায় আড়াইশ গ্রাম ওজনের উত্তল প্রস্তর, নিটোল স্ত্রী-চিহ্নরূপ সামুদ্রিক বিরল প্রজাতির কড়ি (এগুলি সর্বদা সিন্দুরে লেপা থাকে), তুলাদণ্ডের আকারে ঝোলান ঝারি, একটি চামরও আছে। দক্ষিণরায়ের মূর্তির আশেপাশে আরও কিছু মূর্তি দেখা যায়। যেমন প্রায় দু-ফুট দীর্ঘ শিবলিঙ্গ, পিতলের সিংহাসনে নারায়ণ দামোদর ও গণেশ।

কোন কোন থানে দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্র বা অশ্ববাহন মূর্তি আছে। দু-এক স্থানে দেবের অনুচর বা ভ্রাতা বলে পরিচিত কালুরায় নামে এক দেবতা থাকেন। এই অঞ্চলের মানুষ দক্ষিণরায়কে বাবাঠাকুরও বলেন এবং দক্ষিণরায়ের থানকে বাবাঠাকুরের থান বলেন। তা ছাড়া ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়ের সাথে ব্যাঘ্রবাহন পঞ্চানন্দের ও ধর্মঠাকুরের অবয়ব গত মিল প্রত্যক্ষ করা যায় (ধর্মঠাকুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) পঞ্চানন্দের থানকেও আঞ্চলিক ভাবে বাবা ঠাকুরের থান বলা হয়। ক্ষেত্র গবেষণায় অনুমিত হয় বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুর দক্ষিণরায় এক এবং অভিন্ন। লোককথা ও পালাগানে উল্লিখিত মহাদেবের বরপুত্র দক্ষিণরায় এবং শিববীর্য জাত অযোনিসম্ভব পঞ্চানন্দ কালের প্রভাবে, শিল্পীর তুলিতে ও লোকবিশ্বাসে সুসাদৃশ্যগত আংশিক ভিন্নরূপে কল্পিত হয়েছেন মাত্র, যার প্রচলিত রূপ বারামুণ্ড।

দক্ষিণরায়ের বারামুণ্ডর গড়ন প্রায় সর্বত্র একই ধরনের। মাথার মুকুটটি জ্যোতির্ময় ও ত্রিকোণাকৃতি। কতকটা পানপাতার মত। তাতে উর্ধ্বগতি লতাপাতা আঁকা। কাটা মুণ্ডের গলা পর্যন্ত ফাঁপা, লাল-কাল রঙে আকর্ণবিস্তৃত বিস্ফারিত নেত্র অসাধারণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, টানা ভ্রূ ও গোঁফ, চওড়া এবং অর্ধবৃত্তাকার চিবুক ও গালপাট্টা। দুপাটি লম্বা দাঁতের সারি বাইরে প্রকাশমান। সাদা রঙের মুখমণ্ডলে আদিমতার চিহ্ন স্পষ্ট। দুটি মুণ্ডমূর্তি একই বেদীতে বসান হয়। একটিতে গোঁফ আছে, অপরটিতে নেই। গোঁফযুক্ত পুরুষ মূর্তিটিই দক্ষিণরায় এবং স্ত্রী মূর্তিটি দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণী বলে কথিত হয়। আবার কেউ বলেন স্ত্রী মূর্তিটি বনবিবি। তবে মুণ্ডমূর্তির একটি যে দক্ষিণরায়ের সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। চব্বিশ পরগণায় চতুর্মুখ বিশিষ্ট পোড়ামাটির বারামূর্তি (দক্ষিণরায়ের বারামূর্তির ন্যায় মুণ্ডমূর্তি) প্রত্ন উৎখননে পাওয়া গেছে। এই চারটি মুখ বারার সামনে, পিছনে এবং দুইপাশে আছে। অর্থাৎ চতুর্দিক যেন সমান ভাবে দেবতা নিরীক্ষণ করছেন। পিছনের মুখটি অবশ্য প্রকাশমান নয়, এই রূপ প্রত্ন নিদর্শন থেকে অনুমিত হয় বারামূর্তি দক্ষিণরায়ের পূজা এ অঞ্চলেব বহু প্রাচীন ঐতিহ্য। এইরূপ মূর্তি বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কঙ্কণদীঘিতে পাওয়া গেছে। দীনবন্ধু নস্কর মহাশয়ের খাড়ি সংগ্রহশালায় ও নরোত্তম হালদার মহাশয়ের গঙ্গারিডি সংগ্রহশালায় যথাক্রমে চতুর্মুখ বারা, বৌদ্ধ ও অসুর প্রভাবপুষ্ট বারামূর্তি সংগৃহীত আছে।

দিব্যমূর্তি দক্ষিণরায়ের বাৎসরিক পূজা ১লা মাঘ হয়ে থাকে এবং বারা মূর্তির পূজা গোটা মাঘ মাস জুড়েই চলে। দিনে ও রাতে এই পূজা হয়। বর্তমান দিনের বেলায় পূজা হতে বেশি দেখা যায়, তুলনায় রাতের বেলা কম। দক্ষিণরায়ের বারাপূজার সময় খড় জ্বেলে আগুন করার নিয়ম আছে। কেউ কেউ বড় বাঁশের লাঠির মাথায় খড় বেঁধে তাতে আগুন ধরায় এবং যাতে সেই আলো বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় তার ব্যবস্থা করে। যখন আগুন জ্বালান হয় তখন উপস্থিত যারা থাকে তারা সবাই উচ্চৈস্বরে বলে, 'দক্ষিণেশ্বর নারায়ণের নামে একবার হরি হরি বল'। এই ধ্বনি দিতে দিতে আগুন চারদিকে ঘোরান হয়। লোকবিশ্বাস এই আগুন যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় ততদুর পর্যন্ত কোন হিংস্র প্রাণী, ভূত-প্রেত, দত্যি- দানব কিছু প্রবেশ করতে পারে না। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষত পারগ ব্যক্তিগণ পূজার সময় ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়ে বেশ জাঁকজমক সহকারে এই পূজা করেন। নানা রকম ফলমূল ছাড়াও নৈবেদ্য হিসাবে কেউ পোড়া মাছ ও মাংস দিয়ে থাকেন। পণ্ডিত প্রবর ব্যোমকেশ মুস্তাফী বলেছেন, "বারা পূজায় হিন্দুরা ছাগ বলি দেয়, মুসলমানেরা হাঁস মুরগী হালাল করে।"

দক্ষিণরায়ের পূজাচারে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সাধারণত মনসাগাছের তলায় দুটি বারামূর্তি (পুরুষ ও নারী) মাটির বেদীর উপর একটি সরা উপুড় করে কাঠি সহযোগে বসান হয়। সামনে ছোট এক ঘট বসান হয়। শোলার ফুল দিয়ে বেদী সাজান হয় এবং বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত শোলার ফুল

বারা ঠাকুরের চূড়ায় বাঁধিয়ে দেওয়া হয় যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। স্থানীয়ভাবে একে 'ঝারা' বলা হয়। পূজার স্থান সাধারণত বাড়ির বাইরে বাস্তুভূমির কোন প্রান্তে, মাঠে, জঙ্গলে, বৃক্ষমূলে, সর্বজনীন পূজা স্থানে অথবা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নির্ধারিত হয়। পূজার পর এ মূর্তি বিসর্জিত হয় না। স্বস্থানেই ধ্বংস হয়ে যায়।

উত্তর চব্বিশ পরগণায় কোন কোন স্থানে পূজায় দক্ষিণরায়ের কোন মুণ্ডমূর্তি থাকে না। বাস্তুর বাইরে মাটির বেদীর উপর জিউলীগাছের তলায় পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, ফুল-দূর্বা, আবির, ডাবেরমুচি দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। মুণ্ডমূর্তির পরিবর্তে থাকে ঘট। ঘটের উপর আম্রপল্লব ডাব, বরণ সজ্জা ও ধানের শিষ থাকে। ফলমূলাদি সহযোগে ব্রাহ্মণগণ পূজানুষ্ঠান করেন। সন্ধের সময় মহিলাগণ শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে পূজা দেয় এবং পরের দিন সকালে এই ঘট জলে বিসর্জন করে। এই পূজাকে স্থানীয় মানুষ বারাপূজা, বাস্তুপূজা, লক্ষ্মীপূজা, বসুমাতার পূজা বা বাস্তুরাজার পূজা বলে।

দক্ষিণরায়ের আর একটি বিশেষ পূজা আছে। একে জাঁতাল বা জাতাল পূজা বলে। জাঁতাল শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে মনে করেন জমকাল শব্দ থেকে জাঁতাল শব্দের উৎপত্তি। কেউ বলেন জাঁকজমক সহকারে পূজাকে জাঁতাল পূজা বলে, কিন্তু এ অর্থ গৌণ। কারণ যেকোন জাঁকজমক সহকারে পূজাকে জাঁতাল পূজা বলা হয় না। সম্ভবত জাত (জন্ম বা আবির্ভাব) উপলক্ষে পূজাকেন্দ্রিক যে মেলা বা উৎসব তাকেই জাতাল বা জাঁতাল পূজা বা উৎসব বলা হয়। বিশেষত লৌকিক দেবদেবীর পূজা বিষয়ক বিশেষ উৎসবকেই জাতাল বা জাঁতাল পূজা বলে। মেদিনীপুর জেলায় জাঁতালপূজা বলতে বৃষ্টি কামনায় পূজাকে বোঝায়। কৃষকেরা সাধারণত এই পূজা করেন। অনাবৃষ্টিতে ফসল যাতে নষ্ট না হয় তারজন্য বৃষ্টি কামনায় এই পূজা করা হয়। এক্ষেত্রে ভাল শস্য জন্মানোর অনুকূল পরিস্থিতি কামনা করাই জাতাল পূজার উপলক্ষ বা তাৎপর্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বারুইপুর থানার ধপধপি গ্রামেও দক্ষিণরায়ের জাঁতালপূজা হয়। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ দক্ষিণরায়ের মূর্তিটি রং করে পুনঃসংস্কার করা হয়। এই পুনঃসংস্কার উপলক্ষে যে উৎসব বা মেলা বসে তাকেই দক্ষিণেশ্বরের জাতাল-উৎসব বা জাতালমেলা বলা হয়।

জাঁতাল পূজা সম্পর্কে দক্ষিণরায় বিষয়ে গবেষক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণিত একটি চিত্র উদ্ধৃত করা যায়। —"জাঁতালপূজা অনুষ্ঠিত হয় সাধারণত বনময় অঞ্চলে গভীর রাত্রে। বনের মধ্যে বা মাঠে প্রয়োজন মত স্থান পরিষ্কার করে মাটির বেদী নির্মাণ করা হয় এবং খেঁজুরগাছের শাখা দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। সাধারণত বেদীর উপর দুটি বারা মুণ্ড স্থাপিত হয়, যার একটি পুরুষ ও অপরটি নারী। নিকটবর্তী উচ্চ বৃক্ষশাখায় লাল ধ্বজা তোলা হয়। গভীর রাত্রে মশাল জ্বালিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, মদ-মাংস-গাঁজা নৈবেদ্য দিয়ে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় হাঁস পাঁঠা, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। বলির পশুপক্ষীর রক্তে পূজাঙ্গন ভেসে যায়। নেশাগ্রস্ত ভক্তগণ কপালে রক্তের টিপ দিয়ে মশাল হস্তে নৃত্য করে এবং অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি ও উক্তি প্রত্যুক্তি করে। পূজার কালে বিশেষত বলির সময় প্রচণ্ড

বাদ্যধ্বনি ও উৎকট চিৎকার করা হয়। জাঁতালে মদ্যপান, অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্তি, যৌন শিথিলতা ও বলিদান, উৎকট চিৎকার প্রভৃতি অবশ্য প্রতিপালিত প্রথা। একটি লৌকিক ছড়ায় জাঁতালের বৈশিষ্ট্য পাঠ করা যায়—

জাতালে মাতাল কাণ্ড
খুনোখুনি সারা
মদ মাগী রক্ত মাংস
সামাল সামাল বারা।"[৩]

অবশ্য জাতাল পূজায় অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্তি বা যৌন শিথিলতা বর্তমানে বিশেষ দৃষ্ট হয় না।

জাতাল পূজার প্রাচুর্য বর্তমানে বিশেষ দেখা যায় না। সুদূর গ্রামাঞ্চলে বা আবাদ অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের জাতাল পূজা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ পূজাপার্বণের ন্যায় দক্ষিণরায়ের জাতাল পূজার ধারাও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট থেকে জাতাল পূজার প্রাচীন বিবরণ এখনো শোনা যায়। বর্তমানে সর্বত্র ব্যাপক ভাবে যুগ্ম বারামুণ্ড বেদীর উপর স্থাপন করে পূজা করা হয়। বলিদান প্রথা কমে গেছে এবং পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য ঘটেছে। পূজাচারের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন দেখা দিলেও সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় অদ্যাপি ১লা মাঘ ব্যাপক ভাবে মুণ্ডমূর্তিতে দক্ষিণরায় পূজিত হন। ক্ষেত্র গবেষণায় দেখা যায় এই পূজা বর্তমানে যেমন মাঠে, চাষের ক্ষেতে ও জঙ্গলে অনুষ্ঠিত হয় তেমনি অনুষ্ঠিত হয় বাস্তুভিটায়। মাঠে বা চাষের ক্ষেতে বারামুণ্ড পূজা হয় তাকে বেনাকিবারা বা হুড়েরবারা বলে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায় সাধারণ মানুষ সুবৃষ্টি ও ভাল ফসল লাভের জন্য এবং সর্বপ্রকার অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য এই পূজা করেন। অনেক স্থানে, বিশেষত ধপধপির দক্ষিণরায়ের মন্দিরে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে দক্ষিণরায়ের পূজা ও মানত করতে দেখা যায়। মানতের প্রধান আচার বলিদান, মাল্যদান, গণ্ডিদেওয়া, ধূনাপোড়ান ইত্যাদি এবং প্রধান উপকরণ হল সোনারূপার পদক, আংটি, ঘোড়া, হাঁস, ছাগল, মুরগী, গরু ইত্যাদি নানা বস্তু। অতি সম্প্রতি ক্ষেত্র গবেষণায় দেখা গেছে যে সন্তান বাসনায়, সন্তানের মঙ্গল বিধান, পরীক্ষায় পাস ও চাকুরী লাভ প্রভৃতির জন্য সাধারণ মানুষ দক্ষিণরায়ের পূজা করেন। ধপধপির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজারীগণ বাতের ওষুধ প্রদান করেন। মন্দিরের সেবাইত লক্ষ্মণ চক্রবর্তী সাক্ষাতকার ভিত্তিতে জানান শস্যের ও ফসলের প্রাচুর্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্যই অধিকাংশ ভক্ত আসেন। ধপধপির বাবাঠাকুরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাত রোগের নিরাময় ক্ষমতা। এছাড়া বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন রোগ বা মনস্কামনা নিয়ে বাবার কাছে আসেন। হাঁপানি, অর্শ, অম্ল, প্যারালাইসিস প্রভৃতি রোগ এখান থেকে ঔষধ খেয়ে সেরে যায়। সেবাইতগণ এই সমস্ত রোগের ওষুধ দিয়ে থাকেন। বাবা দক্ষিণেশ্বরের নামে এক ধরনের ওষুধ প্রস্তুত করা হয়, একে 'বাবার ওষুধ' বলে। ধুতুরা পাতা, কস্তুরী; চুরমোড়ো গঙ্গাজল সহ বেটে এই ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে এই ওষুধ কাজ করে বলে লোকবিশ্বাস আছে। শ-পাঁচ

আনা পয়সা বাবার নামে মুদোবেঁধে এই ওষুধ মাখলে রোগ মুক্তি ঘটে এরূপ ধারণা অদ্যাপি বিদ্যমান। বাবা দক্ষিণেশ্বর নির্দেশিত এই ওষুধ বাবার সেবকদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে বলে জানা যায়। রোগ মুক্ত হলে শনি অথবা মঙ্গলবার ভক্তগণ দলে দলে এসে মানত চুকিয়ে যান। কোন কোন ভক্ত বাবার মন্দিরে গণ্ডি কাটেন। বাবার হাতের আংটি, পদক, গলায় লকেট হার , ত্রিশুল (রূপার) ইত্যাদি সব ভক্তদের দেওয়া। রোগ মুক্ত বা মনস্কামনা পূরণ হলে ভক্তগণ এসব দিয়ে দক্ষিণরায়কে পূজা দেন। এখানে যে সব যাত্রী বা ভক্ত আসেন তাদের অনেকের বাবার 'ভর'[৪] হয়। ভর অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের হয়। পূজার কোন ক্রুটি বিচ্যুতি হলে বাবা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর ভর করে বলে দেন। সেবাইত লক্ষ্মণবাবু জানালেন প্রায় মাঝে মাঝে এমন ভর হয়ে থাকে। তবে সেবাইতদের কোনদিন ভর হয়নি।

বাংলা পালাগান সাহিত্যে দক্ষিণরায়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল তিনি সুন্দরবন তথা আঠারভাঁটির এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি পীর গোরাচাঁদকে আঠারভাঁটির কিয়দংশ দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। বনবিবিকে অর্ধ অংশ ছেড়ে আত্মরক্ষা করেছেন, এছাড়া বরখান গাজীর সাথে খনিয়ায় তুমুল যুদ্ধের পর বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন।

পীর গোরাচাঁদের কেচ্ছায় দক্ষিণরায় সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে তা হল পীর গোরাচাঁদ প্রথমে হাতিয়াগড়ের রাজা চন্দ্রকেতুর কাছে গিয়ে তাঁকে মুসলিম ধর্মে দীক্ষা দিতে চান। চন্দ্রকেতু তাঁর সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তখন তিনি দক্ষিণরায়ের কাছে আসেন।

দক্ষিণরায় দেখে পীরে, পূজিতে লাগিল তারে
কহ তুমি আইলে কোথা হইতে।
কহে পীর গুণধাম, গোরাচাঁদ মেরা নাম
ঘর মেরা দিল্লীর দেশেতে।
খাহেশ হইল মেরা দেখিব মুল্লুক তেরা
এ খাতেরে আসিনু হেথায়।
চন্দ্রকেতুর বয়ান করে কহে সব তার তরে
একে একে শুনিলেন রায়।
তবে রায় খোসাল দেলে গোরায়ের সাথ মেলে
খাড় জুড়ে করে দিল ভাগ।
ভক্তি আর করে যত সে সব কহিব কত
দেখে গোরাই খুশী বাগে বাগ।

বোনবিবি জহুরানামা ও বনবিবির পালাগানের অনেকাংশ জুড়েই আছেন দক্ষিণরায়। এখানে দক্ষিণরায়কে যেভাবে পাই তা হল তিনি আঠার ভাঁটির ঈশ্বর, নরবলি পূজায় তাঁর অতিশয় আগ্রহ, বাঘ ও কুমির সেনা তাঁর অনুগত। সুন্দরবনে মোম, মধু, নুন, খড়ি, জুড়ি ইত্যাদির হাট তাঁরই। দক্ষিণরায় ধোনা মৌলেকে যে পরিচয় দিয়েছেন তা হল—

দণ্ডবক্ষ মুনি ছিল ভাটির প্রধান
দক্ষিণারায় নাম, আমি তাহার সন্তান।
ধোনা বলে ভাটির ঈশ্বর যদি তুমি
মোম মধু তবে কেন নাহি পাই আমি।
রায় বলে ওরে ধোনা বহুদিন হইল
নরবলি পূজা মোরে কেহ নাহি দিল।
যদি তুমি নরবলি পূজা পার দিতে
সাত ডিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে।

কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণরায়কে কখনো মানুষ কখনো দেবতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। কাব্যে পুষ্পদত্ত পিতৃ সন্ধানে যাবার জন্য নৌকা বানাতে রতাই বাউল্যাকে বন থেকে কাঠ কেটে আনতে বলেন। রতাই জঙ্গলে গিয়ে একটা বড় গাছ কেটেছে, কিন্তু সেই গাছের গোড়ায় ছিল দক্ষিণরায়ের থান, তা সে দেখেনি। ফলে দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হয়ে ছটি বাঘ পাঠিয়ে রতাইয়ের ছয় ভাইকে হত্যা করে। শোকেদুঃখে রতাই আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে দক্ষিণরায় দৈববাণীতে বলেন—

আমি দক্ষিণেররায় সর্বলোকে গুণ গায়
আঠার ভাটিতে পূজে সবে।
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয় ভাই জিয়াইব তবে।

রতাই দৈববাণী শুনে পুত্রকে বলিদান দিয়ে দক্ষিণরায়ের পূজা করে। দেবতা প্রীত হয়ে মৃতদের পুনরায় জীবন দান করেন। রায়মঙ্গলের অন্যত্র দেখা যায় গাজীর সঙ্গে যখন দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ হয় তখন গাজীর খড়্গাঘাতে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড চ্যুত হয় এবং সেই চ্যুত মুণ্ডই বারারূপে পূজিত হয়।

বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাঁহার
মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার।
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে।

দক্ষিণরায়ের অলৌকিকত্ব বাদ দিলে তাঁকে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। লোকসংস্কৃতির গবেষক ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী তাঁকে জমিদার মদনরায়ের সাথে এক করে দেখাতে চান। কারণ মদনরায়ের মায়ের নাম নারায়ণী, দক্ষিণরায়ের মাও নারায়ণী (নারায়ণীপালা দ্রষ্টব্য)। লৌকিক দেবী নারায়ণীকে রাজপুরে নিত্য পূজা পেতে দেখা যায়। অনেকে এ কথাও মনে করেন যে দক্ষিণরায় দক্ষিণবঙ্গের প্রভাবশালী সামন্ত বীর, তুর্কী আগ্রাসন প্রতিরোধ করে জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। বীরত্বের জন্য তিনি দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন দক্ষিণরায় সম্পর্কে বলেছেন "অস্ট্রিক মোঙ্গল

জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের জাঙ্গল অনূপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন।"[৫]

ধপধপির দক্ষিণরায়ের পূজার উৎপত্তি সম্পর্কে এখানকার সেবাইত লক্ষ্মণ চক্রবর্তী জানান ধপধপির দক্ষিণরায়ের পূজা ২৫০-৩০০ বৎসর ধরে চলছে। তাঁরা ৬-৭ পুরুষেরও বেশি এই সেবার দায়িত্বে আছেন। তিনি তাঁর পূর্বপরুষের কাছে দক্ষিণরায়ের সম্পর্কে যে পরিচয় শুনেছিলেন তা হল দক্ষিণরায়ের পিতার নাম সুধীররঞ্জন রায়। মুর্শিদাবাদের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন। পাঠানদের আক্রমণে মুকুট রায় পরাজিত হলে সেনাপতি দক্ষিণারঞ্জন রায় পালিয়ে সুন্দরবনের কেঁদোখালিতে আশ্রয় নেন। এখানে সাধনা করে তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন। যখন যা খুশি মূর্তি ধারণ করতে পারতেন। দক্ষিণারঞ্জন রায়ের আর এক ভাই ছিল। তাঁর নাম কালীরঞ্জন রায়। যিনি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে কালু গাজী নামে পরিচিত হয়েছিলন। ইনি সুন্দরবনে কুমীরের দেবতা বলে পরিচিত। সুন্দরবনে দক্ষিণরায়ের বনবিবির ভাই শাজঙ্গুলীর সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। পরে বরকান গাজী উভয়ের মধ্যস্থতা করে আঠার ভাঁটিকে দুই ভাগে ভাগ করে দক্ষিণরায় ও বনবিবিকে দেন।

দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ড, পৌষ সংক্রান্তির উৎসব ইত্যাদির জন্য কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি লোক দেবতার মধ্যে প্রজনন শক্তির প্রতীক। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'র লেখক বিনয় ঘোষ দক্ষিণরায়কে বাঘের দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'চব্বিশ পরগণা হাজার বর্ষ পূর্বে' প্রবন্ধে (বা বক্তৃতায়) মন্তব্য করেন দক্ষিণরায় একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন। আবার গবেষক কালিদাস দত্ত দক্ষিণ ভারতের তামিল তেলেগু বংশীয়দের মধ্যে পূজিত কুট্টন দেবের মূর্তির সাথে দক্ষিণরায়ের বারা মুণ্ডর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলতে চেয়েছেন দক্ষিণ রায় কুট্টন দেব, তিনি দক্ষিণ ভারতেরই আরণ্যক দেবতা। লোকসংস্কৃতির গবেষক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষিণরায় সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ক এক উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে। "দক্ষিণরায় মৌল তাৎপর্যে ব্যাঘ্রদেবতা বা বনদেবতা রূপে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা রহিত। বরং বিপরীত ক্রমে সরেজমিন অনুসন্ধান ও নৃতত্ত্ব লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সর্ববিধ বিশ্লেষণে বোঝা যায়, সুবর্ষণ ও সুশস্য দাতা এবং অশুভ শক্তি বিতাড়ক ও শস্যক্ষেত্রের রক্ষাকর্তা হিসাবে দক্ষিণরায় ঋতুমৌল কৃষি সমাজের শস্যসম্পর্কিত লৌকিক দেবতা। কালের প্রভাবে ও বিবর্তনের ধারায় মূর্তি ও পূজাচারে বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হলেও সামগ্রিক বিচারে দক্ষিণরায়ের আদিম উৎস উদঘাটন করা যায় এবং উপযুক্ত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে উপনীত হওয়া যায় যে দক্ষিণরায় লৌকিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষি সহায়ক আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সঞ্জাত কাণ্ডবিহীন কর্তিত নৃমুণ্ড পূজা।"[৬]

বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস প্রণেতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রায়মঙ্গল কাব্যের আলোচনায় দক্ষিণরায়কে লৌকিক দেবতা এবং সুবর্ষণের পূজা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রসঙ্গত ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার নবতর তাৎপর্যের বিষয় উল্লেখ করেছেন।[৭]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল কাব্যের আলোচনায় রায়মঙ্গল কাব্যের অস্ট্রিক লোকধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন "সম্প্রতি ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গবেষণায় ও পটভূমিকায় রায়মঙ্গলের পশ্চাদপটে নিষাদীয় কৃষিতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছেন।"[৮]

দক্ষিণরায়ের মৌল-তাৎপর্য যাই হোকনা কেন, দক্ষিণরায় বারামুণ্ডপূজা যে দক্ষিণবঙ্গের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা, লোককথা ও পালগান পর্যালোচনা, উভয় প্রকার মূর্তি ও পূজাচার, লোকবিশ্বাস বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মনে হয় দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর বারাপূজা এবং দক্ষিণরায়ের বিদ্যমূর্তিপূজা একই দেবতার পূজা। দক্ষিণরায়ের দিব্যমূর্তিপূজা ও যুগ্মবারা তথা মুণ্ডমূর্তি পূজা সমগ্র ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচলিত আছে বলে জানা যায়। আবার দক্ষিণরায়ের দিব্যমূর্তি ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পূজিত ধর্মঠাকুরের দিব্যমূর্তির যথেষ্ট মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। ধর্মঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের পূজাচার সংক্রান্ত (Ritual) অনেক সাদৃশ্যও দেখা যায়। অতএব ধর্মঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের উৎসগত তাৎপর্য একই কি না তা নিরূপণের জন্য লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্বতন্ত্র গবেষণার অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে দক্ষিণরায়পূজা যেমন জনপ্রিয় তেমন দক্ষিণরায়ের লোকায়ত পালাগান বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রধানত রায়মঙ্গল কাব্য ও বনবিবি জহুরানামা পালা অবলম্বন করে লোকসমাজে একটি দক্ষিণরায় পালার বিস্তৃত ও স্বতন্ত্ররূপের প্রচলন দেখা যায়। দক্ষিণরায় সম্পর্কিত আরও কয়েকটি পালাগান এই অঞ্চলের মানুষের কাছে বিশেষ পরিচিত, যারমধ্যে হারাণ পণ্ডিতের রচিত ও গীত 'দক্ষিণরায়ের গান', বিধুভূষণ চক্রবর্তী প্রণীত 'শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য' ইত্যাদি প্রধান। রায়মঙ্গলকাব্যে গাজী সাহেবের সাথে দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ, পুষ্পদত্ত কর্তৃক দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার বর্ণিত হয়েছে। 'বোনবিবি জহুরানামা' নামক মুদ্রিত পুঁথিতে বনবিবি, নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের কথা থাকলেও বনবিবির মাহাত্ম্যই প্রাধান্য পেয়েছে। হারাণ পণ্ডিত রচিত 'দক্ষিণরায়ের গান' ও বিধুভূষণ চক্রবর্তী প্রণীত 'শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য' নামক কাহিনী দুটিতে কেবল দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হয়েছে। এই কাহিনী দুটিতে বনবিবি, গাজী সাহেব ও নারায়ণীর কথা থাকলেও দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য প্রচারই পালাকার দ্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। বর্তমান গবেষক সংগৃহীত উল্লিখিত পালাদুটির মধ্যে 'দক্ষিণরায়ের গান' পালাটি পালাগানের আঙ্গিকে সৃষ্ট এবং 'শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য শীর্ষক পালাটি (রচনাকাল ২৫ শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল) রয়াণী ধারায় রচিত। পালাদুটিতে বিষয় ভিত্তিক স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়, যা রায়মঙ্গল কাব্যের প্রচলিত কাহিনী থেকে ব্যাতিক্রম। এই অধ্যায়ে দক্ষিণরায় পালার মূল অবলম্বন হিসাবে কেবল কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যের কাহিনী ও বিধুভূষণ চক্রবর্তীর 'শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য' কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হল এবং লোকায়ত পালার নিদর্শন হিসাবে হারাণ পণ্ডিতের ভণিতা যুক্ত 'দক্ষিণরায়ের গান' পালাটি সম্পূর্ণ উৎকলিত হল।

রায়মঙ্গল (দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য)

মহাকায় দক্ষিণরায়কে লীলাবতী রানী পঞ্চপাত্র সাথে এনে বন্দনা করছেন। দক্ষিণরায় আঠার ভাঁটির মালিক। তাঁর ঘোড়ার নাম হীরারাম। দেবের পরনে দিব্যজোড়া, উড়ানি ঘুরানী। তাঁর অলংকার বেশর, কনকের কণ্ঠমালা, কর্ণে কুণ্ডল। হস্তে কামান, বাণে পরিপূর্ণ তরকচ, পিঠে ঢাল, হাতে তলোয়ার, কাটারী, কোমরে ছুরি। কুপি ভাগে মণিচুনি, ভাগে ভাগে মুকুতার ঝুরি। তাঁর সোনার বরণ তনু, সুডোউল জানু, বিশাল আকর্ণ চক্ষু যা দেখে রিপু যেন ভীত হয়। নুন, মোম মধু, তাঁর অধিকারে। মউলে, মালঙ্গী, তাঁর সেবা করে। তাঁর কৃপায় বাঘেরা বিমুখ হয়, সবাই নির্বিঘ্নে জঙ্গল করতে পারে। খনিয়াতে বড়খাঁ গাজীর সাথে তাঁর মহারণ হয়। পরে দুজনের বন্ধুত্ব হয়। কালুরায় তাঁর বন্ধু। তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ান। দক্ষিণরায়ের কৃপায় রণে বনে, রাজস্থানে কোন ভয় থাকে না। তাঁর কৃপায় নায়কের মনস্কামনা পূর্ণ হয় ও গায়েন বায়েনের মঙ্গল হয়।

কবি খাসপুর পরগণায় বড়িষ্যার বিশ্বম্ভর নামে এক সজ্জন গোয়ালার গৃহে ভাদ্র মাসের সোমবার গিয়েছিলেন। সেখানে রাতে তাঁকে গোলা ঘরে (ঠাকুর ঘর) শুতে দেন। ভোরে তিনি স্বপ্নে দেখেন এক মহাজন বাঘ পৃষ্ঠে আরোহণ করে হাতে ধনুশ্বর নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে, নিজেকে দক্ষিণেশ্বর পরিচয় দিয়ে তাঁর নামে পাঁচালি লিখতে বলেন, যা আঠার ভাঁটিতে প্রচার হবে। এর আগে মাধব আচার্য যে পাঁচালি রচনা করেছেন তা তাঁর পছন্দ হয় নি। এবার যে গীত রচিত হবে তা সংক্ষেপে তিনি বলে দিলেন।

নৃপতি প্রভাকর শিবকে আরাধনা করে পুত্রবর লাভ করেন। সদাশিব নিজে পুত্র রূপে তাঁর পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সন্তান বড় হয়ে জঙ্গল কেটে নররাজ্য বানাবেন এবং ধর্মকেতুর কুমারীকে বিবাহ করে দক্ষিণের ঈশ্বর হবেন। প্রথমে পাটুনীকে ছলনা করে পূজা নেবেন, তারপর কালুরায়কে হিজলীর শহরে নরসিংহ নৃপতির নিকট পাঠাবেন দক্ষিণরায়ের পূজার জন্য। সেখানে বীরসিংহের পুত্রকে মেরে পুনরায় বাঁচাবেন ও বলিদান করে পূজা নেবেন। এরপর বড়দহের দেবদত্তকে ছলনা করবেন। তিনি তুরঙ্গ শহরে রাজার নিকট বন্দী থাকবেন। তার পুত্র পুষ্পদত্ত সাতডিঙ্গা নিয়ে পিতৃ অন্বেষণে যাবেন। সুরত রাজা পুষ্পদত্তকে বলি দিতে গেলে পুষ্পদত্ত দক্ষিণরায়ের স্মরণ করলে দক্ষিণরায় সুরত রাজা সহ তার সমস্ত সেনাদের মেরে ফেলবেন। তারপর রাজার পত্নী কান্নাকাটি ও স্তব করলে রাজাকে বাঁচিয়ে দেবেন এবং কন্যা রত্নাবতীকে পুষ্পদত্তের সাথে বিবাহ দেবেন। পিতাপুত্র দুই জনে দেশে ফিরে দক্ষিণরায়ের মন্দির নির্মাণ করে মহাধুমধাম করে পূজা দেবেন। এইরূপে রায়মণি কবিকে পাঁচালি রচনার কথা বলে অদৃশ্য হলেন।

জাগরণ

পাটনে যাবার জন্যে সাধু ডিঙ্গা গড়তে চায়। সেই কারণে জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে রতাই বাউল্যাকে শিরোপা দেন। রতাই তার বড় ছেলে ও ছয় ভাইকে নিয়ে জঙ্গলে প্রয়োজন মত কাঠ কেটে ফেলে। অবশেষে যে বৃক্ষটি তারা কাটতে আরম্ভ করে সেটি ছিল দক্ষিণরায়ের

পূজার গাছ। এতে দক্ষিণরায় বিরক্ত হয়ে তাঁর অনুগত ছয় বাঘকে আহ্বান করে রতাই ও তার পুত্রকে বাদ দিয়ে ছয় ভাইকে বধ করতে আদেশ দিলেন। বাঘ রায়ের কথা মত রতাইয়ের ছয় ভাইয়ের কেবল ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে চলে যায়। রতাই তা দেখে কাতর হয়ে নিজেই কুঠারাঘাতে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন দক্ষিণরায় অন্তরীক্ষ হতে রতাইকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করে বলেন যদি তুমি তোমার পুত্রকে বলি দিতে পার আমার সমক্ষে, তাহলে তোমার ছয় ভাই জীবিত হবে। এই কথা শুনে রতাই আনন্দিত চিত্তে নিজ পুত্রকে স্নান করিয়ে এনে পুষ্পদলে সুসজ্জিত করে রায়ের পূজার বৃক্ষের নিকট উপস্থিত করলেন। তারপর তরবারীর এক আঘাতে পুত্রের মস্তক ছেদন করে বিহ্বল হয়ে পড়লে দক্ষিণরায় তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং অমৃত কুণ্ডের জল দিয়ে পুত্র ও ছয় ভাইকে বাঁচিয়ে দিলেন। এতে রতাই, ছয় ভাই ও পুত্র পরম প্রীত হয়ে কাঠ নিয়ে বড়দহে ফিরলেন ও পুষ্পদত্ত সহ মহাধুমধামে দক্ষিণরায়ের পূজা দিলেন।

সাধু তনয় পিতার নৌকা তৈরি করে দেওয়ার জন্য সুবর্ণ চেঙ্গড়া দুলিয়ে নগরবাসীর মাঝে ঘোষণা করে। তখন পশুপতি কৈলাস হতে বিশ্বকর্মা ও হনুমানকে পাঠালেন। তাঁরা রাজ অনুমতি নিয়ে সাত দণ্ডে সাতখানা ডিঙ্গা বানিয়ে দিলেন এবং তুরঙ্গ নগরে যাওয়ার আদেশ দিলেন ও আশীর্বাদ করলেন। তুরঙ্গ নগরে দক্ষিণদেশপতি সহায় হয়ে থাকবেন বলে জানিয়ে দিলেন।

মদন নৃপতি সিংহাসনে বসে আছেন, সদাগর এসে তাঁকে নমস্কার করে পিতৃ অন্বেষণে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নৃপতি সর্বসুলক্ষণ যুক্ত শিশু সদাগরকে দেখে করুণাপ্লুত হয়ে গেলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সমুদ্রের কষ্ট ভোগ করে দেশান্তরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সঙ্গে দিলেন প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি ও বাণিজ্যের বস্তু। মাতা সুশীলা সর্বদেবদেবীর নিকট প্রার্থনা করে পুত্রকে বিদায় দিলেন। পুষ্পদত্ত দক্ষিণরায়কে স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লেন।

নদী পথে যেতে যেতে পুষ্পদত্ত কর্ণধারকে নানা প্রশ্ন করে। মাটির ঢিপি কেন পূজা করা হয়, কাটা মুণ্ড পূজার কারণ কি ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে কর্ণধার পুষ্পদত্তকে কাটা মুণ্ডর যে ইতিহাস বলেছিল তা হল দক্ষিণরায়ের সাথে বড়খাঁ গাজীর এক সময় তুমুল লড়াই হয়েছিল। বড়খাঁ গাজীর খাঁড়ার আঘাতে দক্ষিণরায়ের মায়া মুণ্ড কেটে ভূমে পড়ে।

বড়খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাঁহার
মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার।।
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোন খানে দিব্য মূর্তি বাঘের উপরে।।

তারপর উভয়ের বন্ধুত্ব হলে পর একের পূজা দিলে অন্য সন্তুষ্ট হয়।

ধনপতি সদাগর পাটনে যাবার সময় দক্ষিণরায়ের বারা কূলে দেখে, হরবরপুত্র ভেবে, পূজা করে যাবার সময়, বড়খাঁ গাজীর অনুচর ফকিরেরা বড়খাঁ গাজীর পূজার জন্য অনুরোধ করে। সদাগর তাদের ঘৃণা ভাবে উপেক্ষা করে চলে গেলে পর ফকিরেরা বড়খাঁ গাজীর কাছে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এবং এর বিহিত চায়। বড়খাঁ গাজী বিষম রেগে গিয়ে

দক্ষিণরায়ের অনুচরদের বিরুদ্ধে ফকিরদের লেলিয়ে দেন। তখন দক্ষিণরায় অত্যন্ত রেগে গিয়ে তাঁর সমস্ত বাঘ সৈন্যদের ভেজিয়ে দিয়ে মুসলমান ফকির নিধন করতে উদ্যত হয়। এই সময় পাত্রের পরামর্শ মত, লোহাজঙ্গদানাকে গাজীর নিকট বৈরিতা সম্পর্কে তথ্য আনতে পাঠান। লোহাজঙ্গদানা বড়খাঁ গাজীকে বৈরিতার কারণ জানতে চাইলে গাজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে বাঘেদের ডাক দিল, কিন্তু বাঘেরা পড়লো চরম ফেসাদে। কারণ দক্ষিণরায়ের ডাকে না গেলে প্রাণ যাবে আবার বড়খাঁ গাজীর ডাকে না গেলে প্রাণ যাবে। অবশেষে যে যার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ভীষণ বাঘেবা গিয়ে দুই তবফে জড় হয়েছে এবং ভীষণ আস্ফালন করে খনিয়াতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

যথা সময়ে বড়খাঁগাজী ও দক্ষিণরায়েব মধ্যে তুমুল লড়াই বেঁধে গেল। উভয়ে উভয়কে শর হানে, কিন্তু কারোর কিছুই হয় না। অবশেষে দেব ভগবান

অর্ধেক মাথায় কালা এক ভাগে চুড়াটালা
বনমালা ছিলিমিলি হাতে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।।

তিনি এসে উভয়ের মীমাংসা করে দিলেন। ভাঁটির সম্পূর্ণ অধিকার দক্ষিণরায়কে দিয়ে গাজীকে বললেন সাধারণ মানুষ উভয়কেই পূজা করবে। গাজীও দক্ষিণরায়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

বড়খাঁগাজী ও দক্ষিণরায়ের কথা শুনে সাধুর তনয় ডিঙ্গা নিয়ে চলতে লাগল। বহু গ্রাম পার হয়ে সাগরদ্বীপ অতিক্রম করে উড়িষ্যায় গিয়ে উপনীত হলে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজ-সৃষ্ট জগন্নাথ দেবের মন্দির দরশন করে পূজা দিল। তারপর সেখান থেকে আবার বেয়ে চলল। পথে কতশত বাধা পেল, সবই ঈশ্বরের কৃপায় দূর হয়ে গেল। রাজদহে যখন উপস্থিত হল তখন সাধুর তনয় আশ্চর্য সব জিনিস দেখল। ভক্ষ্য ভক্ষকেরা সব এক সাথে চলাফেরা করছে। সেখানে কত সোনার ঘর তাঁর একটিতে নারায়ণ বসে আছেন। সামনে কিংকরেরা আছেন, বামে নীলাবতী জায়া। এইরূপ মায়া দরশন করে সাধু এগিয়ে চললেন, কিন্তু সাধুর তনয় যে দৃশ্য দেখল তা আর কেউ দেখতে পেল না। পুষ্পদত্ত সপারিষদ সুরত নৃপতির রাজ্যে এসে উপস্থিত হলে কোটাল এসে তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে যায়। পুষ্পদত্ত উপযুক্ত ভেট সহ রাজসমীপে গিয়ে আত্মপরিচয় দিল—

নিবাস আমার রাজ্য বরদানগরে।
তাহাতে পূজিত যে মদন নৃপবরে।।
দেবদত্ত নাম পিতা তথায় বসতি।
বহুদিন হইল তার পাটনেতে গতি।।
পিতার উদ্দেশ্যে তথা আইনুঁগুণধাম।
পুষ্পদত্ত মোর নাম ভনে কৃষ্ণরাম।।

আত্মপরিচয় প্রদানের পর পথে কি দেখেছে রাজা সুরত তা জানতে চাইলে পুষ্পদত্ত রাজদহের ঘটনা বলল। রাজা সুরত বিশ্বাস না করায় উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন — "যদি দেখাইতে নারি সত্য এই কথা। সাতডিঙ্গা লইয়া কাটিয় মোর মাথা। রাজা বলে সিন্ধু মাঝে যদি দেখি পুরী, হারিব আপন রাজ্য আপন কুমারী।" পুষ্পদত্ত রাজদহে মায়াবী দৃশ্য দেখাতে না পারায় রাজার কোটাল তাকে কাটতে মশানে নিয়ে যায়। তখন সাধুর নন্দন চৌত্রিশ অক্ষরে রায়কে স্তব করতে আরম্ভ করল। পুষ্পদত্তের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণরায় অসংখ্য বাঘ সৈন্য দক্ষিণ দেশে পাঠালেন। ভীষণ যুদ্ধ হল সেখানে। বাঘ সৈন্য সুরত রাজার কাছে এঁটে উঠতে না পারায় দক্ষিণরায় নিজে যুদ্ধ করতে গেলেন এবং রাজাকে পরাস্ত করে মেরে ফেললেন। অবশেষে রানীর করুণ আবেদনে দক্ষিণরায় পুষ্পদত্তের সাথে কন্যা রত্নাবতীর বিয়ে দেওয়ার ও মূর্তি করে দক্ষিণরায়ের পূজার শর্তে রাজার এবং তার লোক লস্করের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। রাজা প্রাণ ফিরে পেয়ে পুষ্পদত্তের সাথে আপন কন্যার বিয়ে দেন। বিয়ের পর সাধু তনয় রাজ অনুমতি নিয়ে কারাবন্দী সমস্ত কয়েদীকে মুক্তি দিলেন এবং অবশেষে পিতাকে এনে অতি যত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আপন পরিচয় প্রদান করে খুশি করলেন। দক্ষিণ পাটনে পিতা পুত্রের মিলন হল।

কন্যার সাথে বিয়ে দিয়ে রাজা সুরত জামাতাকে আপন গৃহে রেখে দিতে চান। একদিন নিশীথে রায়মণি স্বপনে পুষ্প দত্তকে বাড়ির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। পুষ্পদত্ত তখন স্ত্রী রত্নাবতী সহ গৃহে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করেন। রাজার আদেশে নানা ধনরত্নে সাতটি ডিঙ্গা পরিপূর্ণ করে প্রস্তুত রাখা হল। পুষ্পদত্ত বহু বলি সহ দক্ষিণরায়কে পূজা দিয়ে সস্ত্রীক ডিঙাতে উঠলেন। তারপর রাজদহ হতে বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে সপ্ত ডিঙ্গা বড়দহ ঘাটে থামল। বড়দহের নররায় তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর এত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পুষ্পদত্ত দক্ষিণ পাটনের সমস্ত বিবরণ বলেন। দক্ষিণ রায়ের কৃপায় তিনি কিভাবে উদ্ধার পেলেন তার বিস্তৃত বিবরণ শুনে রাজা নিজেই দক্ষিণরায়ের পূজার আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত মানুষ দক্ষিণরায়ের পূজা করেন। পুষ্পদত্ত ও দেবদত্ত সুবর্ণ দেউল বানিয়ে নানা উপচারে দক্ষিণরায়ের পূজা করেন।

গঠিল দক্ষিণরায় বাঘের উপর।
সোনার বরণ তনু রূপ মনোহর।।
পুরোহিত লইয়া সেই সাধুর নন্দন।
পূজিতে লাগিল রায় আনন্দিত মন।।

সদাগর জোড় করে দেবরে স্তব করে। কাতর হয়ে দক্ষিণ রায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে —

অপরাধ ক্ষমা কর বলি জোড় পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি।।
ইন্দু নিন্দ বদন মদন জিনি রূপ।

তোমা বিনে দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ।।
অধমের পূজায় হইবা পরিতোষ। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

এইখানে কাব্য কণ্ডিত, বলে শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় উল্লেখ করেছেন। রায়মঙ্গল কাব্যের কাহিনীরূপ মঙ্গল কাব্যের প্রচলিত আধারে বিশেষ ভাবে বানীরূপ লাভ করেছে, কিন্তু চব্বিশ পরগণায় লৌকিক পালাগানের ধারায় রায়মঙ্গল কাব্যের রীতি পুরোপুরি অনুসরণ কবা হয় না। চব্বিশ পরগণায় দক্ষিণরায় ও গাজীর পালা ভিন্নরূপে প্রচলিত হতে দেখা যায়।

শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য (কাহিনী সংক্ষেপ)

প্রথমে ছিলেন বাবা সুন্দর কাননে।
ঝাউগাছতলে বাবা বিনা আচ্ছাদনে।।

** ** **

কাষ্ঠ কাটিবার কিম্বা মধু অন্বেষণে।
জঙ্গলে যাইত যত জঙ্গুলিয়াগণে।।
মানত করিত সবে পূজি শ্রীচরণ।
কৃপা করে রক্ষাকর মোদের জীবন।।

(সুন্দর কাননের ঝাউগাছতলাটি ছিল বর্তমান ধপধপি নামক গ্রামের একাংশ। ধপধপির প্রাচীন নাম ছিল 'ভিকতাড়া'। এটি সুন্দরবনের একাংশ ভর্তৃমারীর জঙ্গল বা ভাতারমারীর জঙ্গলের অন্তর্গত বলে কথিত হয়। সুন্দরবনে মহলকারীগণের নিকট এই অঞ্চলের এটিই জঙ্গলের প্রবেশপথ ছিল বলে স্থানীয় ভাবে জানা যায়।) সুন্দরবনের ঝাউগাছতলায় দক্ষিণেশ্বরের একটি থান ছিল। এখানে বাবা দক্ষিণরায় কখনো ব্যাঘ্রে কখনো অশ্বে ভ্রমণ করতেন। তিনি জঙ্গুলিয়াগণকে নানাভাবে কৃপা করতেন। সুন্দরবনের এই অংশটি ছিল পূর্বে মদনরায় চৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্গত। তিনি একদিন এই অঞ্চলে নতুন বসবাসকারী প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায়ের জন্য দলবল নিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি না জেনে ঝাউতলায় বাবার থানে প্রস্রাব করেন। তখন বাবা কুপিত হয়ে বোলতা ও ভীমরুল ছেড়ে রাজার লোকজনদের অস্থির করে তোলেন। তখন রাজা এই স্থানের অজ্ঞাত দেবতার প্রতি কাকুতি মিনতি করলে বাবা দৈববাণীতে নিজেকে দক্ষিণেশ্বর ও বনেশ্বর বলে পরিচয় দেন এবং আদেশ দেন—

এইস্থানে কর মোর মন্দির গঠন।
পূজার নিমিত্ত কর ব্রাহ্মণ স্থাপন।।
মধ্যাহ্নে হইবে পূজা সন্ধ্যাতে আরতি।
প্রতিদিন হবে ভোগ কিবা দিবারাতি।।
পূজার বিশেষ দিন শনি মঙ্গলবারে।

বিধিমত বলি হোম আদি উপচারে।।
বানে ভেসে আসিয়াছে উদ্ধব ব্রাহ্মণ।
গাঙের পাশে আছে বসে কর অন্বেষণ।।

তারপর মদনরায় চৌধুরী উদ্ধব পণ্ডিতকে এনে ব্রাহ্মণ হিসাবে নিয়োগ করে পূজার ব্যবস্থা করেন ও ঝাউগাছতলে বাবার আস্তানা নির্মাণ করেদেন।

মাঘমাসে প্রথম দিনে হইল স্থাপনা।
দক্ষিণেশ্বর নাম বাবার হইল ঘোষণা।।
ঘটেতে হইত পূজা ঢিপির উপর।
নিরাকার জ্ঞান করি নামেতে নির্ভর।।
কালক্রমে লীলাময় লীলার কারণে।
নিজরূপ স্বপ্নযোগে দেখান ব্রাহ্মণে।।
বীরভাবে ভীমদেহে অস্ত্র-গুণ ধরি।
রণ সাজ শিরে তাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করি।।
দেখিয়া ভীষণ রূপ ঘোড়ার উপর।
ভয়ে শিহরিয়া উঠি কাঁপে থর থর।।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া মূর্তি ত্রাহি ত্রাহি বলে।
মনে হয় যেন লয় করিবেন কালে।।

উদ্ধব পণ্ডিত বাবার এইরূপ স্বপ্নদর্শন করে দক্ষিণরায়ের অশ্ববাহন ভীষণ আকৃতির মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং এই মূর্তিকে বাবার আদেশে ভক্তিভাবে পূজা করতেন।

একদিন মদন রায়চৌধুরী দলবল নিয়ে ভর্তৃমারীর জঙ্গলে এসে খাজনার জন্য উদ্ধব ব্রাহ্মণকে নানাভাবে বিরক্ত করেন ও খাজনা না দেওয়ার জন্য বন্দী করে রাখেন। এতে বাবার পূজার বিঘ্ন ঘটে। তখন বাবা পুনরায় রাজাকে আপন পরিচয় দিয়ে সতর্ক করে স্বপ্নে জানান—

শুন ওরে জমিদার মদন চৌধুরী।
বাঁধিয়া রেখেছ আনি আমার পূজারী।।
সাগর সঙ্গম হতে উত্তর বাহিয়া।
আঠার ভাঁটিরপথ থাকি আগুলিয়া।।
বনমধ্যে থাকি আমি হয়ে বনেশ্বর।
দক্ষিণের ঈশ্বর আমি নাম দক্ষিণেশ্বর।।
দেখাব তোমারে আজি দিব ভাল শিক্ষা।
কত বল ধর তুমি কেবা করে রক্ষা।।

মদন রায়চৌধুরী বাবার এইরূপ স্বপ্নদর্শন করে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান। বাবার নিকট অপরাধ স্বীকার করে উদ্ধব পণ্ডিতকে মুক্তি দেন ও ব্রাহ্মণের সম্মানে একান্ন বিঘা জমি নিষ্কর লিখে দেন। এতে বাবা দক্ষিণরায় মদনরায়ের উপর প্রসন্ন হন।

একবার মদনরায় চৌধুরীর জমিদারি খাজনার দায়ে নিলামে যেতে বসে ও নিজে কারারুদ্ধ হন। তখন মদনরায় দক্ষিণরায়ের স্মরণ করে কান্নাকাটি করতে বাবা দক্ষিণরায় প্রসন্ন হয়ে তাঁর মুক্তির উপায় বলে দেন।

নবাবের ভুল আছে হিসাব যোগাতে।
করতত্ত্ব পাবে সত্ত্ব আমার বরেতে।।
সন্ধান হইল সত্য স্বপনের কথা।
অপূর্ব ঘটিল ভ্রম কে করে অন্যথা।।
জমিদার মুক্তিপায় নবাব আদেশে।
জমাতে হইল বেশি পায় রাজা শেষে।।

তারপর বাবার মহিমার কথা মদন রায়চৌধুরী প্রচার করেন। চারদিকে দক্ষিণরায়ের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষ ও মহিলাগণ ব্যাপক ভাবে বাবার পূজা করতে থাকে। এই দেখে সুন্দরবনের আর এক দেবতা মোমরাগ গাজীর ঈর্ষা হয়।

মোমরাগগাজী এক সাধক প্রধান।
হিংসা মনে এই বনে করিয়া অবস্থান।।

** ** ** **

বিষম বিবাদ হয় পরস্পর বনে।
হটাহটি চটাচটি তর্জন গর্জনে।।
রক্ষা করেন শান্তিময়ী নারায়ণী এসে।
বিভাগ করিয়া দিল রাখিয়া সন্তোষে।।
দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণে উত্তরে সাধক।
অদ্যাবধি আছে খ্যাত স্মরণে রক্ষক।।

বাবা দক্ষিণরায় জমিদার মদন রায়চৌধুরীকে কৃপা করার পর পাটদহের জমিদার কেশবরায় চৌধুরীকে কৃপা করেন।

একদিন কেশব রায়চৌধুরী নৌকা নির্মাণের জন্য ধোনাই ও রতাই বাউল্যাকে সপ্তরথী কাঠ আনতে বলেন। সপ্তরথী কাঠ যথা-তথা মেলে না। মেলে কেবল দক্ষিণরায়ের অধিকৃত বনে। সেখান থেকে কারোর সাধ্য নেই যে সপ্তরথী কাঠ কেটে আনতে পারে। অথচ কাঠ আনতে না পারলে জমিদার মেরে ফেলবে, আর কাঠ কাটতে গেলে দক্ষিণরায়ের সৈন্য বাঘে খাবে। এমত চিন্তা করে অবশেষে ধোনাই বাবা দক্ষিণরায়ের কাছে কান্নাকাটি করে জঙ্গলে যাবার কথা চিন্তা করে। বাবার কাছে নিজ পুত্রের বলিদানের মানত করে জঙ্গলে সপ্তরথী কাট কাটতে যায়। রাজা এই কথা শুনে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য দেখতে উৎসুক হন। দেবতার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে দলবল নিয়ে বনে এসে বন তোলপাড় করতে থাকেন। দক্ষিণরায় বিরক্ত হয়ে রাজাকে উচিত শিক্ষা দিতে চান। তখন—

বাবার আদেশ পেয়ে চারিদিকে এল ধেয়ে
যেন অসংখ্য ভীমরুলের দল।
বাঘ ভাল্লুক চারিদিকে লম্ফে ঝম্পে ডাকে হাঁকে
কম্পিত করিল বনস্থল।।

এই দেখে রাজা কেশব রায় অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। অবশেষে তাঁর দক্ষিণরায়ের প্রতি অবজ্ঞার কথা স্মরণ হয়।

রাক্ষস বলিয়া তারে নিন্দিনু দক্ষিণেশ্বরে
অজ্ঞানে বলেছি কত মন্দ।
তাঁহারি খেলা মাত্র সকলি দেব চরিত্র
দেবতার সনে করি দ্বন্দ্ব।।

এইরূপে কেশব রায়চৌধুরী নানাভাবে দক্ষিণেশ্বরের স্তব-স্তুতি করে দেব-রোষ হতে নিষ্কৃতি পান ও দেবতার করুণা লাভ করেন।

ধোনামৌলে সপ্তরথী কাষ্ঠের জন্য আপন পুত্রকে দক্ষিণরায়ের সম্মুখে বলি দেবেন বলে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছিলেন।

ছল করি দয়াময় ধনাকে স্বপ্নেতে কয়
দেহ মোরে পুত্র বলিদান।
সত্যরক্ষা কর এবে তবেত, নিস্তার পাবে
স্বহস্তে করহ দুইখান।।

এইরূপ স্বপ্নাদেশ পেয়ে ধোনা একেবারে ভেঙে পড়ল। পিতা হয়ে পুত্র বলি কিভাবে দেবে! তখন বাবা দক্ষিণরায় ধোনার মনোভাব বুঝতে পেরে এক মায়াবৃক্ষ সৃষ্টি করেন ও ধোনাকে কাটতে বলেন। ধোনা সেই সপ্তরথী মায়াবৃক্ষ ছেদন করলে সবাই চমৎকৃত হয়ে যায়।

স্পষ্টভাবে বৃক্ষ কেটে নরমুণ্ড তাতে ঘটে
এযে দেখি ধোনার তনয়।
ধন্য প্রভু ধন্যলীলা ধন্য মায়া ধন্য ছলা
ধন্য তোমার ভকতে সদয়।।
পিতা হয়ে পুত্র ধনে কাটে মাথা কোন প্রাণে
মায়া করি বৃক্ষ কৈল তারে।
যেমন দ্বিখণ্ড হয় তনয়ে প্রকাশ পায়
সত্যে রক্ষা করিল তাহারে।।

তারপর বাবার কৃপায় ধোনার ছেলে প্রাণ ফিরে পায় ও সপ্তরথী কাঠ কেটে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এদিকে কেশব রায় বাবা দক্ষিণরায়ের পূজা দিয়ে দেশে ফিরে দেখে ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে এবং মুটে নৌকা থেকে কাঠ নামাচ্ছে। তখন কেশব রায় আরও চমৎকৃত হয়ে ধোনার কাছে জানতে চান সে কিভাবে কাঠ কেটে আনল। ধোনা সমস্ত বৃত্তান্ত বলে ও বাবা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যকীর্তন করে।

মাহাত্ম্য প্রকাশ জন্য মায়াবৃক্ষ উৎপন্ন
দ্বিখণ্ডেতে সমরূপ ধরে।

দয়াময় দয়া করে প্রাণদান দেন তারে
কাটামুণ্ড জোড়া লাগে বরে।।

বাবার কৃপায় ধোনাইয়ের নৌকা সপ্তরথী কাঠে ভরে যায় ও মুহূর্তে ঘাটে চলে আসে, এইসব বৃত্তান্ত শুনে কেশবরায় বলেন—

ধন্যরে ধোনাই ধন্য জন্মে ধন্য কর্মে ধন্য
ধন্য তোর পিতৃ-মাতৃগণ।
চিরকাল রবে খ্যাতি হবে তোর দিব্যগতি
সেবা করি বাবার চরণ।।

এরপর কাহিনী অংশে কেশব রায় কর্তৃক বাবার স্তব-স্তুতি করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। সবশেষে দক্ষিণেশ্বরের (ধপধপি) সেবাইত বিধুভূষণ চক্রবর্তীর প্রার্থনা ও আর্তি প্রকাশ করে পাঁচালির সমাপ্তি হয়।

সবিনয়ে বিধু কয় (শশি) সদা যেন ভক্তি রয়
ভ্রমে যেন না ভুলি ওপদ।
সেবা করি ঐ চরণ কৃপাকর বিতরণ
হয়ে থাক ভক্তের সম্পদ।।

(সমাপ্ত)

দক্ষিণরায়ের গান

দিক বন্দনা

উত্তরে বন্দি কৈলাসপতি, অন্নপূর্ণা মায়
দক্ষিণে বন্দি গঙ্গা মাতা সাগর জলাশয়।
পূর্বে বন্দি কামাখ্যা মায় হয়ে শুদ্ধমতি
পশ্চিমে মক্কায় রাখি হাজার প্রণতি।
রক্ষাকর্তা আছেন যাঁরা চারিদিক চার কোণে
কোটি কোটি প্রণাম জানাই তাঁদেরই চরণে।
তেত্রিশ কোটি দেবতার যাঁর যে দিকে স্থান
এই আসরে বন্দনা করি রাখি সবার মান।

দক্ষিণরায়ের বন্দনা

এসো বাবা দক্ষিণরায় কালু লয়ে সাথে
বন্দনা করি দোঁহে চরণ রাখ মাথে।
দণ্ডবক্ষ মুনি ছিলেন শিবের প্রতি মন
তাঁর আশিসে পেলেন তিনি তোমা হেন ধন।
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ দিব্য চূড়া মাথে
যুদ্ধ সাজে ঘোর ফের কালুদেব সাথে।

ভক্ত জনের কল্যাণ কর, বৈদ্যের রাজা
কদাচারীর দেখতে নার দাও ব্যাধির সাজা।
তোমার নাম করে যেবা জঙ্গলেতে যায়
ব্যাঘ্রভয় দূর তারে কর মহাশয়।
আঠার ভাঁটির ঈশ্বর ছিলে বড়মুখে
আল্লার দূত এসে তোমার ছাই দিল সুখে।
বড় প্রবল গাজী মিঞা ছিল বড় ট্যাটা
আঠার ভাঁটি এসে তিনি গেড়ে ছিল খোঁটা।
আঠার ভাঁটির ভাগে, বাধে মহারণ
বিশ্বেশ্বর এসে দোঁহার করে নিবারণ।
বনবিবি ও নারায়ণীর আনন্দিত মন
মহা বলী দুই বীর থামিল যখন।
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে বড়পীর আসে
বনবিবি ও নারায়ণী মহানন্দে ভাসে।
বড়পীর দুজনের হস্ত মিলিয়ে বলে
আঠার ভাঁটির রক্ষাকর্তা দুজনেই হলে।
বারা রূপে থাক দেব দক্ষিণের রায়
নায়েকের কর রক্ষা বন্দি তব পায়।
উপস্থিত দর্শকশ্রোতা সবার নমস্কার করি
দক্ষিণরায়ের নামে সবাই বল হরি হরি।
দক্ষিণরায়ের বন্দনা সংক্ষেপে হল সায়
হারাণ পণ্ডিতের প্রভু রেখ রাঙা পায়।
আগের কথা পিছু যদি কভু হয়ে যায়
অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু দক্ষিণরায়।

জাগরণ

কোটি কোটি প্রণাম জানাই গুরু হারণ পণ্ডিতের পায়
তাঁর কৃপায় সুদিন চন্দ্র গায় দক্ষিণরায়।
একদিন হরগৌরী প্রফুল্ল অন্তরে
আসন করে আছেন তাঁরা কৈলাস শিখরে।
যত যোগী ঋষি মহান্ত শিবের আরাধিল
অবশেষে হর-গৌরীর প্রসাদ এনে ছিল।
নন্দী ভৃঙ্গী হর-গৌরীর দুই পাশেতে ছিল

সেই প্রসাদী গ্রহণ করে আনন্দিত হল।
আবার আড়ালে গিয়ে দোঁহে বলিতে লাগল—

কথা।। ভাই ভৃঙ্গী, আমরা চিরদিন হরপার্বতীর অনুচর হয়ে আছি, কিন্তু দেখ মর্ত্যের লোকেরা হরপার্বতীকে কেমন করে সাজায়, নৈবেদ্য দেয়, প্রণাম করে। তা আমরা কি এইভাবে দেবতা হয়ে মর্ত্যে নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করতে পারি না? এইভাবে দুজনের কথা হতে ছিল, ইত্যবসরে অন্তর্যামী ভোলানাথ অন্তরে জানিল।

ধোয়া ।। নন্দী-ভৃঙ্গীর ইচ্ছা ভোলানাথ অন্তরে জানিয়া
হাসিতে হাসিতে দোঁহের আনিল ডাকিয়া ওরে ওতার মায়া ....

ভোলানাথ : দেখ নন্দী ভৃঙ্গী, আমি অন্তরে জেনেছি তোমাদের মনে বড় সাধ জেগেছে, তোমরা আমার মত মর্ত্যে পূজা নেবে। তবে তোমরা যাও এখন, আঠার ভাঁটিতে ত্বরা করহ গমন। সেথা রায়মণি রাক্ষসী আঠার ভাঁটি জঙ্গলের অধীশ্বরী হয়ে আছেন।* তাঁর গর্ভে তোমরা যমজ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ কর।

আজ্ঞা পেয়ে দুই জন হাওয়া ভরে করিল গমন
আঠার ভাঁটির বীচে আসি পৌছিল তখন।

কথা।। জঙ্গলে দণ্ডবক্ষ নামে মহাতপস্বী ও ব্রহ্মচারী এক মুনি ছিলেন। হর-পার্বতীর কৃপায় দণ্ডবক্ষ মুনির সাথে রায়মণির বিবাহ হয়েছিল। তাঁরা একই কক্ষে থাকে কিন্তু মুনিবর স্বামীর কর্তব্য নাহি করে।—

একদিন যায় তাঁদের হাসিতে খেলিতে
দুইদিন গেল তাঁদের গল্প শোনাতে।
তিন দিন কালে তাঁরা সুখে নিদ্রা যায়
নারায়ণীর পুত্রবাঞ্ছা পূরণ নাহি হয়।

তখন হরগৌরী ভাবছেন এইভাবে দণ্ডবক্ষ ও নারায়ণী যদি কাল কাটায় তাহলে নন্দী-ভৃঙ্গীর ইচ্ছা কখনো পূরণ হবে না। তাই হর-গৌরী স্বর্ণ ভ্রমর হয়ে একদিন দোঁহাকার অঙ্গে উড়তে লাগল। তখনই দুইজনে কাম-জ্বরে দগ্ধ হয়েছিল ও দোঁহে মহব্বত করেছিল।

দেবতার লীলা বল কে বুঝিতে পারে
রায়মণির গর্ভ তখন দিনে দিনে বাড়ে।
দশমাস দশ দিন যখন গর্ভ পূর্ণ হল
হর-গৌরীর বরে নারায়ণী যমজপুত্র প্রসবিল।

কথা।। যমজ পুত্রের প্রথমটি তপ্ত স্বর্ণের বরণ হয়েছিল আর কনিষ্ঠ সন্তান কালোবরণ হয়েছিল। সেকারণে মাতা নারায়ণী তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রাখলেন সনাতন আর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দিলেন কালু। দণ্ডবক্ষ মুনি জ্যেষ্ঠপুত্রের আঠার ভাঁটির দক্ষিণের জঙ্গলের অধিকার দিয়েছিলেন। তাই তাঁর অপর নাম হয়েছিল দক্ষিণরায়—

দিনে দিনে দুই জন বাড়ে মহা সুখে
জয় বাবা ভোলানাথ নাম বলে মুখে।

মহানন্দে দুইজনের শৈশব কাটিল
পঞ্চম বর্ষে দুই জনের হাতে খড়ি হল।
চারিবেদ সর্বশাস্ত্র শেখে গুরুর কাছে
যুদ্ধবিদ্যা শেখে দোঁহে জঙ্গলের মাঝে।
মোম-মধু, খড়ি-জড়ির দখল নিল হাতে
বন্ধু হয়ে কালুরায় থাকে সদা সাথে।

কথা।। নারায়ণী ও মুনিবর তাঁদের দুই সন্তানকে 'বুজুর গানের' শিক্ষা দিয়েছিল। সেই শিক্ষাগুণে ও বীরত্বের বলে বনের যত পশুপক্ষি, কীট-পতঙ্গ, ব্যাঘ্র-কুমীর দেও-দান, যক্ষ-রক্ষ, তাঁর বশ হয়েছিল।

বুজুর গানে দক্ষিণরায় জঙ্গল মাতাল
দেওদান রাক্ষসাদি বশ তাঁহার হল।
দক্ষিণরায় মহাযোদ্ধা হলেন মুনির বরে
হেন জীব নাই সেথা তাঁরে নাহি ডরে।
তাঁর প্রতাপে যক্ষ-রক্ষ হার মেনেছিল
আঠার ভাঁটির সকল দিক তিনি দখল করেছিল।
অবশেষে হাসনা নামক জঙ্গলে উপনীত হল
সেইখানেতে ফতেমাবিবি মোকাম গেড়েছিল।
লীলাময়ের লীলা বল কে বুঝিতে পারে
হাসনা এর জঙ্গল রায় দখল করতে নারে।

কথা।। সেই থেকে ফতেমাবিবির হাসনা জঙ্গল হাসনাবাদ নামে পরিচিত হয়েছিল। একদিন ধোনামৌলে ও তার ভাই মোনা আঠার ভাঁটির বীচে কাঠ, মধু সংগ্রহ করতে বের হল। সঙ্গে নিল অনেক নৌকা ও লোক লস্কর। যাবার আগে তারা বনের দেবী বনবিবি, গাজীসাহেব ও তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে পূজা দিয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণরায়ের নাম তাঁরা একবারও করল না। মনের সুখে তারা বিদ্যাধরী নদী বেয়ে গান গেয়ে মহলে চলল—

গীত।। বলরে ভাই আল্লার নামে, সঙ্গে আছে মেহের বানে
বল আল্লা আল্লা সবে, বল আল্লা আল্লা।
বলরে ভাই আল্লার নাম সঙ্গে আছে মেহের বান
বনবিবির নাম মুখে বল।
নদনদী পিছু কর দাঁড়-বটে শক্ত ধর
গাজীবাবার নাম শুধু বল।।
গাজীবাবার নাম লয়ে চল যাই আজ দূরে চলে
করিব যে জঙ্গলেতে বাস।
মোম মধু নৌকা ভরে আসব সুখে দেশে ফিরে
পূর্ণ হবে সকল মন আশ।

কথা।। এইভাবে গান গেয়ে মহানন্দে তারা দক্ষিণে চলল, অবশেষে এসে তারা গড়খালির জঙ্গলে পৌছিল। গড়খালির জঙ্গল ছিল নারায়ণী পুত্র দক্ষিণরায়ের অধিকারে। একথা ধোনামৌলে জানত না। যত সব লোক-লস্কর জঙ্গলে নামিয়ে কাঠ কাটতে ও মধু সংগ্রহ করতে লাগল। এদিকে জঙ্গল তোলপাড় হতে দেখে বনের যত পশু পাখী দূরে সরে যায়, তাই দেখে দক্ষিণরায় কালুকে ডেকে এই কথা কয়—

শুন কালু জঙ্গলেতে এসেছে কোন জন
হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক ধরে আনহ এখন।
এই কথা শুনে কালু জঙ্গলেতে যায়
ধোনামৌলের সাথে সেথা মোলাকাত হয়।

দেখে ধোনা ও মোনা মৌলের লোক লস্কর জঙ্গলের কাঠ, মধু সংগ্রহ করছে। এই কথা গিয়ে কালু দক্ষিণরায়ে কয়। তখন দক্ষিণরায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁর সমস্ত বাঘ সেনাদের আহ্বান করেন—

ধোয়া।। আহা কোথা আছ বাঘ ভাল্লুক দেও-দানো গণ
তোমরা ত্বরায় দেখা দেবে—
ডাক শুনে বাঘ ভাল্লুক দেও-দানো, এল রায়ের কাছে। ওরে ওতার মায়া।

কথা।। শুন শুন বাঘ-ভাল্লুক-দেও-দানোগণ মোর বাক্য লবে। ধোনা মৌলের শিক্ষা দিতে গড়খালি ত্বরায় যেতে হবে। এই কথা শুনে তারা রায়ের পিছু নিয়েছিল, আর গড়খালির জঙ্গলে এসে তারা উপনীত হল। প্রথমে দক্ষিণরায় ও কালুরায় ধোনার কাছে এসে বলে তোমরা কারা এই বনে এসে আমায় না জানিয়ে কাঠ কাটছ?

ধোনা ঃ তোমরা কোথাকার কে হে বাপু, তোমাদের পরিচয় দিতে হবে?

দক্ষিণরায় ঃ আমার নাম দক্ষিণরায়, নারায়ণী তনয়, যারা এই জঙ্গলে আসে তারা আগে আমায় জানায়। তুমি লোক-লস্কর নিয়ে এখনই চলে যাও নইলে সবাইকে বাঘের দিয়ে খাওয়াব। ধোনা মৌলে অত্যন্ত চটে গিয়ে বলে—

কোথাকার কে তুই ঘরে ফিরে যা
না গেলে দেব ঠ্যাঙে কুড়ুলের ঘা।
ঘরে গিয়ে মা বলে ডাকতে নাহি পাবি
এইখান থেকে সোজা তুই যম ঘরে যাবি।
ভাল চাস সরে যা মরবি কেন শেষে
কাঠ-মোম ভোরে নৌকা যাই নিজ দেশে।

কথা।। এই কথা শুনে রায়ের অত্যন্ত ক্রোধ উপনীত হল। তখন তিনি ধনুকের টঙ্কার দিয়ে সমস্ত বাঘ সৈন্যদের আহ্বান জানালেন। আজ্ঞা পেয়ে সমস্ত বাঘ সৈন্য ধোনার লোকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘ-মানুষে যুদ্ধ কভু স্থিতি নাহি হয়, এক এক আছাড়ে সবার প্রাণ চলে যায়। ধোনা শুধু প্রাণে বেঁচে রয়।

বাঘে মানুষে যুদ্ধে ধোনা হার মেনেছিল
হাসিতে হাসিতে রায়-কালু ঘরে ফিরে গেল।

কথা।। এদিকে ধোনা তার লোক-লস্করকে মরতে দেখে আজ্ঞান হয়ে ভূমে পড়ে রয়, তাই দেখে দক্ষিণরায় কালুকে শুধায়।—

দক্ষিণরায় : দেখ ভাই কালু এই ভাবে ধোনা যদি পড়ে মরে যায় তাহলে আমার নাম আর মর্ত্যে কোনদিন প্রচার হবে না। তাহলে কি করা যায় বল ভাই।

কালু : তুমি স্বপ্নযোগে ধোনাকে আপনার পরিচয় দাও তাহলে আমার বিশ্বাস ধোনা তোমার পূজার্চনাদি করবে ও মর্ত্যের সবাই তোমার পূজা করবে।

কথা।। বুদ্ধিমন্ত কালুর কথায় বাবাজী ধোনার শিয়রেতে যায়, আর স্বপ্ন যোগে দক্ষিণরায় এই কথা কয়—

শোনরে ধোনা বলি আমি দেব দক্ষিণেশ্বর
যোদ্ধা বেশে ফিরি আমি বনের ভিতর।
জঙ্গলেতে সবার যেন আমি মহাশয়
ভক্তজনের পুরাই বাঞ্ছা দূর করি ভয়।
সুবর্ষণ দিয়ে আমি ক্ষেত্রে শস্য ফলাই
জল-ঝড়ে মৌলে বাউলের নৌকা বাঁচাই।
জঙ্গলেতে সাপ বাঘ আমি বশ করি
ইচ্ছামত মুণ্ডরূপ, দিব্যরূপ ধরি।
বারামুণ্ডরূপে কভু থাকি বৃক্ষতলে
আছে মোর অধিকার স্থল ও জলে।
ভক্তি ভরে কর পূজা হয়ে এক মন
জীবন ফিরে পাবে জেন মৃত সকল জন।
স্বপ্ন দিয়ে দেব রায় হলেন অন্তর্ধান
চেতন পেয়ে ধোনা মৌলে ভাবে মনে মন।

কথা।। চেতনা পেয়ে ধোনা উঠে বসে দেখল তার সমস্ত লোক-লস্কর মরে পড়ে আছে, আর তার নিকটের একটি বৃক্ষতলে দুটি বারামুণ্ড বেদীর উপর আছে। জঙ্গলে এইরূপ দুটি বারামুণ্ড দেখে ধোনার স্বপ্নের কথা মনে হল। তখন ধোনা মনে মনে ভাবল স্বপ্নের কথা অনুযায়ী আমি বনফুল তুলে এই দুটি বারামুণ্ড পূজা করি। তারপর যদি আমার লোক-লস্কর প্রাণ ফিরে পায় তাহলে সবাই মিলে বাবা দক্ষিণরায়ের নামে গান-পূজা দেব। এই বলে ধোনা বনের ফুল তুলে পূজার আয়োজন করে ও কেঁদে কেঁদে বলে—

গীত ।। আজ্ঞান আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
কৃপা কর দেব দক্ষিণরাও।
অহংকারে কটু বলে করেছি পাপ ও চরণতলে
দিব্য রূপে একবার দেখা দাও।

কথা।। এই রূপে ধোনা মৌলে কত অনুনয় বিনয় করে দক্ষিণরায়কে স্তুতি করেছিল, কিন্তু দক্ষিণরায়ের তাতে হৃদয় টলল না। তখন ধোনা কুঠার দিয়ে বুক চিরে বারামুণ্ডর সামনে রক্ত ঝরিয়েছিল আর মুহূর্তে পুনঃ অজ্ঞান হয়েছিল। তখন প্রভু দক্ষিণরায় ধোনার সামনে দিব্যমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে বলেন— ধোনা তোর ভক্তিতে আমি তুষ্ট হয়েছি, তুই ঐ বারামুণ্ডর সামনে তোর বুকের রক্তঝরা মাটি নিয়ে সঙ্গী সাথীদের উপর ছড়িয়ে দিবি। তাতে সবাই প্রাণ ফিরে পাবে। এই কথা বলে বাবা অদৃশ্য হয়ে যায়—ধীরে ধীরে ধোনা মৌলে চেতন ফিরে পায়। চেতন পেয়ে ধোনা মৌলে উঠে দাঁড়াল আব রক্ত-ঝরা মাটি নিয়ে সঙ্গীদের উপর ছড়াল।

দক্ষিণরায়ের লীলা বল কে বুঝিতে পারে
বারাতলার মাটি পেয়ে সবাই নড়ে চড়ে।
চেতন পেয়ে একে একে উঠে যে দাঁড়ায়
জয় বাবা দক্ষিণের রায় বলে উচ্চধ্বনি দেয়।

ধোনার সঙ্গী সাথীরা সবাই প্রাণ ফিরে পেলে দক্ষিণরায় ভাই কালুকে বলে তোমরা আমাদের সৈন্য সামন্ত দিয়ে ধোনার ডিঙা কাঠ মোম মধুতে ভরিয়ে দাও। আজ্ঞা পেয়ে কালুরায় বনের সম্পদে ধোনার নৌকা ভরিয়ে দিল। তাই নিয়ে ধোনা আর তার সঙ্গী সাথীরা বাবা দক্ষিণরায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে গড়খালির জঙ্গল থেকে রওনা দিল। বাহ্ বাহ্ বলে তরী চলিতে লাগিল—ডিঙ্গা বাও হে নর হরি নায়ের কাণ্ডারী সঙ্গে লইয়া পবন বেগ।

জঙ্গল হতে ধোনামৌলে তখন তরী ছেড়ে দেয — ডিঙ্গা বাও হে নরহরি
কত শত নদীর ঘাট বেয়ে চলে যায় — "
অন্ত রীক্ষে বাবাজী আমার দেখিবারে পায় — "
ধোনাকে ডাকিয়া তখন ধীরে ধীরে কয় — "
আমার নাম স্মরণ করে ধীরে ধীরে যাবে — "
যত হাঙর কুমীর আমার নামে দূরে চলে যাবে — "
রায়মঙ্গল রায়দীঘি বেয়ে চলে যায় — "

এইভাবে তারা গান গেয়ে দেশের পথে ফিরতে লাগল। বাবাজী এবার রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে এক ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ধোনাকে পরীক্ষা করে। রাক্ষস বিশাল দেহ নিয়ে তাদের নৌকা আগলে দাঁড়ায়। তখন রাক্ষস দেখে ধোনার লোকজন হতাশ হয়ে পড়ে। তখন তারা বাবা দক্ষিণরায়ের নামে কেঁদে কেঁদে বলে—

গীত।। কোথা আছ বাবা দক্ষিণরায় এসো বিপদ কালে
প্রাণ এবার যায় বুঝি ঐ রাক্ষসের কবলে।
দক্ষিণরায়ের নাম শুনে বাবা নিজ মূর্তি ধরে
সশরীরে বাবাজী আমার আসে নৌকো পরে।

কথা।। দক্ষিণরায় বলেন, আমি তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম যে তোমরা মোম মধু পেয়ে

আমার নাম ভুলে গেছ না স্মরণে রেখেছ। দক্ষিণরায়ের এইরূপ ছলনার পরে আবার নৌকা বেয়ে চলে যায় ও আপন মোকামে এসে উপনীত হয়। দেশে ফিরে সবাই একত্রিত হয়ে বাবা দক্ষিণরায়ের নামে গান-পূজার ব্যবস্থা করেছিল। বাবার নির্দেশ মত গলায় কুটো বেঁধে নগরে নগরে ভিক্ষা করে বলি দিয়ে বাবা দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রবাহন দিব্যমূর্তি নির্মাণ করে পূজা দিয়েছিল। আর সেই থেকে দক্ষিণরায়ের পূজা প্রচার হল।

অষ্টমঙ্গলা

কৃপা কর ও আমার বাবাজী কৃপা কর।

নবরকম বলি দিয়ে বাবার কৃপা পায়	—	কৃপা কর
অন্ধ লোকেরা তারা চক্ষু ফিরে পায়	—	”
বাবার নাম করে যেবা শুভ কর্মে যায়	—	”
মনোবাঞ্ছা তার পূর্ণ হয় বাবাজীর কৃপায়	—	”
এমন গুণের দয়াময় দেখিনি কোথায়	—	”
বাবার নামে কুষ্ঠ ব্যাধি সব সেরে যায়	—	”
যত রকম ব্যাধি আছে বাবার নামে উদ্ধার হয়ে যায়	—	”
অপুত্রক মায়েরা পুত্র কোলে পায়	—	”
গাফাটা পাফাটা যাহার ধরিবে	—	”
বাবার কৃপায় সব জেন দূরীভূত হবে	—	”
এইরূপেতে বাবার নামে গানপূজা দিবে	—	”
বাবার নামেতে তার সুফল ফলিবে	—	”
দক্ষিণরায়ের নাম যেবা ভক্তি ভাবে করিবে	—	”
ব্যাঘ্র ভয় সর্প ভয় সব দূরীভূত হবে	—	”
হারানিধি বাবার কৃপায় কোলে ফিরে পায়	—	”
বাবার নামে হাঙ্গর কুমীর দূরে সরে যায়	—	”
বাবার নামে যেবা ক্ষেত্রে ফসল ফলাবে	—	”
সেই ক্ষেত্রের ফসল বাবা সোনার ফসল হবে	—	”
যে বৎসর খরা ডাক দেশেতে ডাকিবে	—	”
বাবার নাম করলে পরে সুবৃষ্টি হবে	—	”
বাবার নামে অষ্টমঙ্গল সংক্ষেপেতে সারি	—	”
মুসলমানে বল আল্লা, হিন্দু বল হরি হরি	—	”

(কাহিনী সমাপ্ত)

সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে দক্ষিণবঙ্গ তথা সুন্দরবন অঞ্চলের আধিপত্য বিষয়ক গাজী-দক্ষিণরায়ের সংঘর্ষ ও মিলনের কেন্দ্রীয় কাহিনী অবলম্বনে মূলত হিন্দু ঐতিহ্যে

রায়মঙ্গল কাব্য এবং ইসলামি ঐতিহ্যে বনবিবি জহুরানামা রচিত হয়েছে। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে বলা যায় "দক্ষিণবঙ্গ তথা সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায় বারামুণ্ডাচার অবলম্বনে যেমন একটি লোক-লোকায়ত ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারা গড়ে উঠেছে, তেমন লোক সমাজের চাহিদা অনুসারে রচিত ও পরিবেশিত হয়ে চলেছে দক্ষিণরায় বনবিবি গাজীর মাহাত্ম্য প্রচার মূলক বৈচিত্র্যময় হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় ধর্মী লোকায়ত পালাগানের মিশ্ররূপ, যা একান্ত ভাবে Performing Contextual Theory তথা প্রদর্শনানুষঙ্গগত তত্ত্বের অনুগামী।"[১০]

প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত পালাগানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লোককবিগণ রায়মঙ্গল পালাটিকে একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ রূপ প্রদান করেছেন মঙ্গলকাব্য ও ইসলামি কাহিনীর আঙ্গিকে। লৌকিক পালাকার বা পালাগায়কগণ বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের প্রচলিত আখ্যান কাব্যকে একান্ত ভাবে অনুসরণ করেন না। সাধারণত উভয় রীতির একটি মিশ্ররূপ দক্ষিণরায় পালায় অনুসরণ করা হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় স্থানীয় আসর অনুসারে দক্ষিণরায় পালা বিশিষ্ট লৌকিকরূপে ও মৌখিকধারায় পরিবেশিত হয়। লোকায়ত পালাকারগণ রায়মঙ্গল কাব্য বা বনবিবি জহুরানামা ভিত্তিক কাহিনীর উপর একান্ত নির্ভর না করে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ জনমানবের ভক্তি ও ভাবপ্রবণতার অনুসারে পালা পরিবেশন করেন। অনেক ক্ষেত্রে গায়েনগণের নিকট পালা-খাতার কাঠামো থাকলেও আসর অনুসারে তা বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় করে পরিবেশন করা হয়। পালা পরিবেশনার ক্ষেত্রে নৃত্য, গীত, সংলাপ, অভিনয় ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিবেশিত হয়। পালাটি যেমন একক ভাবে গৃহস্থ পরিবারে মানত উপলক্ষে, বারাপূজা উপলক্ষে ও দক্ষিণরায়ের থানে পূজা উপলক্ষে গীত হয় তেমনি অন্য পালার আসরে দর্শকের অনুরোধেও গীত হয়। সাধারণত মাঘমাস ব্যাপী কালসীমায় এই পালাগান দক্ষিণবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত পল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

মোটের উপর লৌকিক দেবপালা দক্ষিণরায়ের লোক প্রচলিত ধারাটিকে মিশ্ররীতির বৈশিষ্ট্যময় লোকায়ত পালা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, যা বাংলার লোকসংস্কৃতি তথা বঙ্গ সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মী এক বিশিষ্ট সম্পদরূপে বিবেচিত হয়।

পাদটীকা

১। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু — বাংলার লৌকিক দেবতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ৮৭, পৃঃ ১৭২।

২। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রামনগর, (সাক্ষাতকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)।

৩। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (৩য়), দক্ষিণরায়, পৃঃ ৫৩৪।

৪। 'ভর' হল এক অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা। দেবদেবীর নিকট যাঁরা পূজা দিতে আসেন অথবা বিশেষ কোন ভক্তের উপর বিশেষ কোন দেব বা দেবী ভর করেন। তখন ভক্তের কোন

নিজস্ব জ্ঞান বা বুদ্ধি থাকে না। ভরকারী দেব বা দেবী ভক্তের মুখ দিয়ে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ, অসুখ বিসুখের কবল হতে মুক্তির উপায় ইত্যাদি বলেন। কিছুসময় পর ভক্ত নিজের জ্ঞান ফিরে পান ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর পূর্বের কোন কথা স্মরণ থাকে না। বলাবাহুল্য বিজ্ঞানসচেতন মানুষ 'ভর' বিষয়টিকে নিতান্ত মানসিক বিকৃতি বলতে চান।

৫। ডঃ সুকুমার সেন — ইসলামিক বাংলা সাহিত্য, আনন্দ সংস্করণ ১৪০০, পৃ: ৮২।

৬। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (৩য়), দক্ষিণরায়, পৃ: ৫৩৪।

৭। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য — মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৯৮ পৃ ৯২৫।

৮। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব ১৯৮০, পৃ: ১৫৩।

৯। রায়মণিকে প্রচলিত পালাগানে দণ্ডবক্ষের স্ত্রী নারায়ণী বলা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে নারায়ণীর পুত্র দক্ষিণরায়কেও রায়মণি বলা হয়েছে।

১০। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় — প্রধান অতিথির ভাষণ, রজতজয়ন্তী উৎসব — কৃষ্টি, রবীন্দ্রভবন — বারুইপুর, ১লা মে ১৯৯৮।

দেবপালা ঃ পঞ্চানন্দ

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর লোকায়ত পালাগান সাহিত্যে পঞ্চানন্দের পালা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহ্যময় বাংলা পালাগান সাহিত্যে এটি দেবপালার অন্তর্ভুক্ত। চব্বিশ পরগণার বহু লোকশিল্পী পঞ্চানন্দের পালাগান করেন। বিশেষত বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই দেবতার পূজাচার ও পালাগান বেশি হতে দেখা যায়। জলাজঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলেই পঞ্চানন্দের থান অধিক। বনবিবি, নারায়ণী, বিশালাক্ষীর থান যেমন অধিকাংশ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তেমনি ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে জঙ্গলময় অঞ্চলে (পূর্বে জঙ্গল ছিল এমন) পঞ্চানন্দের থান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে পঞ্চানন্দের থান সংলগ্ন অঞ্চলে জঙ্গলের চিহ্ন না থাকলেও ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে অদূর অতীতে সেখানে জঙ্গল ছিল। এই কারণে অনেকে পঞ্চানন্দকে অরণ্যদেবতাও বলেন।

দেব পঞ্চানন্দের সাথে চব্বিশপরগণার মানুষের এক নিবিড় যোগ প্রত্যক্ষ করা যায়। এখনও নানা জটিল রোগের কবল থেকে বাঁচতে বহু মানুষ পঞ্চানন্দের দ্বারস্থ হন। এই অঞ্চলের লোকসমাজ তথা অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, বাবা পঞ্চানন্দ বৈদ্যরাজ। তাঁর সেবকের দেওয়া দাওয়াই ভক্তিভরে খেলে যেকোন দুরারোগ্য-ব্যাধি সেরে যায়। পঞ্চানন্দ-তলার মাটি নিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিলে শিশু যেকোন রোগ থেকে মুক্তি পায়। সে কারণে অদ্যাবধি চব্বিশ পরগণার লোকসমাজের একাংশ বিশেষত মৃতবৎসা রমণীগণ তাঁদের সন্তান প্রসবের পর সন্তানকে পঞ্চানন্দের কাছে সঁপে দেন। একে 'পঞ্চানন্দের দোর ধরা' বলে। শিশুকে রক্ষা করেন বলে পঞ্চানন্দ শিশুরক্ষক দেবতা। ইহলৌকিক পরিত্রাতা হিসাবে পঞ্চানন্দ এই অঞ্চলের মানুষের মনপ্রাণ জুড়ে আছেন। সৃষ্টি হয়েছে তাঁকে নিয়ে একাধিক পালাগান। পালাগানসমূহে পঞ্চানন্দের বিচিত্র পরিচয় লাভ করা যায়।

চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রানুসন্ধানে পঞ্চানন্দের যে-সমস্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করা গেছে তাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চানন্দের কোথাও দিব্য মূর্তি, কোথাও আদিম মূর্তি। সর্বত্রই

তাঁকে বিশাল চেহারা যুক্ত রূপে দেখা যায়। পঞ্চানন্দের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের মত রক্তিম। পেশীবহুল, স্থূল ও বলিষ্ঠ গঠন। ধামার মত বিশাল সুডৌল ভুঁড়িতে সুগভীর নাভি। মাথায় জটা। কিছু জটা কপালের উপর চূড়ার আকারে গুলান। কিছু সরু জটা বুক ও পিঠের দিকে সুবিন্যস্ত ভাবে ঝোলান। দেবতার তিনটি চোখ। দুটি চোখ বিশাল ও বিস্ফারিত, নাক টিকাল, দাড়ি কামান, গোঁফ দুটি চওড়া ও বিস্তৃত।

আদিম চেহারা যুক্ত পঞ্চানন্দের চোখ দিয়ে যেন ক্রোধাগ্নি ঠিকরে পড়ছে। মুখাবয়বে সৌম্য ভাব রহিত। তিনি যেন দাঁত খামটি মেরে আছেন। কোথাও বা কল্পিত রাক্ষসের মত দুটি কর্তকদন্ত মুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দেবের পরনে এক খণ্ড বাঘছাল। গলায় প্রলম্বিত উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, রুদ্রাক্ষের বালা ও তাগা, পায়ে খড়ম, উচ্চাসনে ইনি উপবিষ্ট থাকেন। প্রহরণ হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিশূল থাকে, নতুবা দুটি হাতই বরাভয় মুদ্রা যুক্ত। এক্ষেত্রে ত্রিশূল ও ডমরু পাশে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চানন্দের গায়ে ও মাথায় সাপ দেখা যায়। পঞ্চানন্দের বাহন সর্বত্র এক নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বিষ্ণুপুর থানায় ও আশপাশের অঞ্চলে পঞ্চানন্দ বাঘের পিঠে ও ঘোড়ার পিঠে দেখা যায়। বারুইপুর থানায় ও আশেপাশের অঞ্চলে বেশির ভাগ পঞ্চানন্দের মূর্তি উচ্চাসনে উপবিষ্ট। তাঁর এক পা ঝোলান ও অপর পা মুড়ে (বিশেষত ডান পা) বাম পায়ের উরুর উপর চাপান। তাঁর আসনটি উঁচু ছোট টেবিলের মত। ভাঙড় থানায় ও তার আশেপাশের অঞ্চলে পঞ্চানন্দ গোভূতের উপর দেখা যায়। গোভূতের নিচে বা পাশে থাকে পঞ্চানন্দের অনুচর পেঁচো-খেঁচো। তার বর্ণ নীল, প্রায় রাক্ষস মূর্তি, কঙ্কালসার দেহ। লোকবিশ্বাস, এদের কুদৃষ্টিতে শিশু পুঁয়েরোগ (রিকেট) আক্রান্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরা প্রেত, ধনুষ্টংকার (টিটেনাস) নামেও পরিচিত। এরা সূতিকা ঘরের শত্রু। পঞ্চানন্দের ভিন্ন প্রকার বাহনের কথা জানা যায় — ব্যাঘ্র, গোভূত ও ঘোটক ছাড়া মামদো, মৃগ, বৃষ, ভল্লুক এমনকি বৃশ্চিক বাহন পঞ্চানন্দ আছে।[১] অবশ্য ক্ষেত্রগবেষণা কালে চব্বিশপরগণায় ব্যাঘ্র, গোভূত ও ঘোটক ছাড়া অবশিষ্ট বাহনগুলি দৃষ্ট হয় নি।

পঞ্চানন্দের পূজানুষ্ঠান বর্ণ ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। পঞ্চানন্দের পূজারী কয়েকজন ব্রাহ্মণের একান্ত সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে জানা গেছে তাঁরা প্রকৃত পক্ষে পঞ্চানন্দের কোন মন্ত্রতন্ত্রে পূজা করেন না। তাঁরা পঞ্চাননের মন্ত্রে পঞ্চানন্দপূজা করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় শিরাকোল গ্রামে ভূপতি চট্টোপাধ্যায়ের বহির্বাটীতে শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দের 'খুব জাগ্রত' থান আছে। তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত পঞ্চানন্দের ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নরূপ—

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণা সাগরং বিভুম্
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানং যজ্ঞসূত্র সমন্বিতং
লোচন ত্রয় সংযুক্তং ভক্তিভিষ্ট ফলপ্রদং
ব্যাধিনাং ঈশ্বরং দেবং পঞ্চানন্দ মহংভজে।[২]

অন্যত্র পঞ্চানন্দের ধ্যানমন্ত্রে পাওয়া যায়—

ভল্লুক বাহন বন্দো পঞ্চানন
নৃত্য গীতে দেহ মন।
অজ্ঞান কিংকরে তোমারে স্মরে
ত্যজ হে শ্যাওড়ার বন।[৩]

মন্ত্রসূত্রে উভয় ক্ষেত্রে পঞ্চানন্দের নাম বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পঞ্চাননের ধ্যানমন্ত্র হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়। এই নিরিখে বিচার করলে পঞ্চানন ও পঞ্চানন্দ এক বলেই মনে হয়, কিন্তু পঞ্চানন ও পঞ্চানন্দের রূপ-বিশ্লেষণ করলে উভয় দেবতার স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

পঞ্চানন হলেন পঞ্চমুখ বিশিষ্ট দেবতা। তিনি শিব রূপে কল্পিত। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে পঞ্চানন সম্পর্কে লিখেছেন—

নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুনগানে।
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন।[৪]

অপর পক্ষে পঞ্চানন্দ শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—
(পঞ্চ + আনন্দ = পঞ্চানন্দ) ভোগানন্দ, ভজনানন্দ, যোগানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ।[৫] শিবের মধ্যেও এই আনন্দ কল্পনা করা হয়। তথাপি লোকায়ত পালাগানের বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন সম্পূর্ণ পৃথক দুই দেবতা হিসাবে কল্পিত হন।

চব্বিশ পরগণায় পঞ্চানন্দের বহু জাগ্রত মন্দির বা থান আছে। বাবা পঞ্চানন্দ বালক বেশে বালকদের সাথে থান সংলগ্ন মাঠে খেলা করেন এমন কথিত হয়। অথবা খেলায় দল গঠন কালে একজন কম হলে সবার অজান্তে কি ভাবে একজন যুক্ত হয়ে সমান হয়ে যায় তা কেউ বুঝতে পারে না। বাবা পঞ্চানন্দ বালক খেলোয়াড়দের ঐ একজন হয়ে এই সমতা ফেরান বলে সবার ধারণা। এই ধরনের গল্পকথা পঞ্চানন্দের অনেক থানে লোকমুখে শোনা গেছে।

পঞ্চানন্দ বহু ক্ষেত্রে গ্রাম দেবতা রূপে পূজা পান। তাঁর পূর্ণ অবয়ব ছাড়া শিলা খণ্ড ও মুণ্ডমূর্তি পূজা হতে দেখা যায়। আমিষ-নিরামিশ উভয় প্রকার নৈবেদ্যর ব্যবস্থা থাকে। পঞ্চানন্দের নামে ছাগ, হাঁস, পাখি, মুরগি বলি হতে দেখা যায়। ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায় পূর্বের তুলনায় এখন প্রাণী বলি অনেক কমে গেছে। অনেক থানে প্রাণী বলির পরিবর্তে লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি ফল বলি দেওয়া হয়। বেশির ভাগ থানে পঞ্চানন্দের নিত্যপূজা হয়। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বাবার বিশেষ পূজা ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া বাৎসরিক পূজা নির্দিষ্ট দিনে হয়। এইদিন বাবার থানে হরিনাম সংকীর্তন, পঞ্চানন্দের গান ইত্যাদি হয়। বহু ব্যক্তি গণ্ডি দেন, মানত চুকোন, বাবার নামে পূজা দেন।

পঞ্চানন্দের ঐকক থান খুবই বিরল। যেখানে পঞ্চানন্দের থান বা মন্দির আছে সেখানে অন্তত একটি শিবলিঙ্গও পূজা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে শীতলা, মনসা, শিবের নুড়ি বা শিবলিঙ্গ, ষষ্ঠী ইত্যাদি দেবদেবী, পঞ্চানন্দের মন্দিরে সেবা হয়। কোথাওবা মন্দিরের

পাশে বিবিমার থান থাকে। এই বিবিমা কোথাও বনবিবি, পাঁচবিবি, সাতবিবি বা নয়বিবি। পঞ্চানন্দের পূজায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাগ বলির ব্যবস্থা থাকে।

চব্বিশ পরগণার লোকবিশ্বাসে বাবা পঞ্চানন্দ বৈদ্যরাজ রোগ-শোক নিবারক দেবতা হিসাবে পূজিত হন। কোন কোন ক্ষেত্রে শস্য দেবতা রূপে তিনি পূজা পান। মুখ্যত তিনি শিশুরক্ষক দেবতা। এই দেবতা তুষ্ট থাকলে শিশু ও গর্ভস্থ ভ্রূণ নির্বিঘ্নে থাকে। বন্ধ্যা নারীর পুত্রবাসনা পূরণ হয়। পশুপাখির রোগ হলেও অনেক ব্যক্তি পঞ্চানন্দের নিকট মানত করেন বলে জানা যায়। মৃতবৎসাগণ পঞ্চানন্দের নিকট মানত করেন সন্তানের দীর্ঘজীবন লাভের আশায়। সন্তান হলে তাঁরা সন্তানকে পঞ্চানন্দের দোর ধরা করে রাখেন। বারো বৎসর যাবৎ তাঁরা সন্তানকে কঠিন নিয়মের মধ্যে রাখেন। এর মধ্যে তাদের মাথার চুল ফেলেন না, নখ কাটেন না, কেউ বাচ্চার হাতে পায়ে তামার বা লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখেন। এই বেড়িকে অনেকে ডাডুকা বলে। বারো বৎসর পূর্ণ হলে সন্তানের মাতা, পিতা বা আত্মীয়স্বজন মানত অনুযায়ী পঞ্চানন্দের থানে এসে মানত চুকিয়ে যান। এই দিন সন্তানের প্রথম ক্ষৌরকর্ম হয় বা ডাডুকা কাটা হয়। মানত অনুযায়ী কেউ সন্তানের ওজনে বাতাসা দেন, জোড়া পাঁঠা বলি দেন, মন্দিরের সামনে বা বাড়িতে হরেকৃষ্ণ নামগান দেন, কেউ বা পঞ্চানন্দের পালাগানের ব্যবস্থা করেন।

চব্বিশ পরগণায় পঞ্চানন্দের ভক্ত সংখ্যা বহু। অবশ্য শাক্ত বা বৈষ্ণবদের মত আলাদা কোন পঞ্চানন্দের সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। তবে দেবতার নামে নামকরণ আছে, এমন বহু ব্যক্তি এই অঞ্চলে আছেন। এই সমস্ত নামের কারণ অনুসন্ধানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে এই শিশু পঞ্চানন্দের দোরধরা বা তাঁর কাছে মানত করে পাওয়া। চব্বিশ পরগণায় পঞ্চানন্দের অনেক মন্দির ইটের তৈরি। মাটির দেওয়াল যুক্ত ঘর ও সামান্য চাল যুক্ত থান কম নয়। প্রায় প্রতিটি মন্দির বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শেওড়া, বকুল অথবা নিমগাছের গোড়ায় অবস্থিত। মন্দিরের গায় বা ঐ সমস্ত গাছে ভক্তদের বাঁধা অসংখ্য ঢিল বা ঢেলা ঝুলতে দেখা যায়। এটি মানত করার একটা রীতি বা পদ্ধতি। সাধারণত একটি, দুটি বা তিনটি মনস্কামনা করে ভক্তগণ বাবার দুয়ারে ঢিল বেঁধে মানত করেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে ঐ ঢিল খুলে মানত চুকিয়ে যান।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে বাবাঠাকুর প্রবন্ধে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুর একই লৌকিক দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বাবাঠাকুর নামটি আদিমতম। পূজাচারে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুরের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও লোকবিশ্বাস এবং পালাগান সাহিত্যে এই তিন লৌকিক দেবতা রূপ, গুণ ও ভাবগত বিচারে পৃথক। বিশেষত পঞ্চানন ও পঞ্চানন্দের দুই ভিন্ন রূপ আছে। চব্বিশ পরগণার বহু থানে পঞ্চানন্দের আদিম ভয়ংকর মূর্তি পূজিত হয় কিন্তু পঞ্চাননের কোন আদিম বা ভয়ংকর মূর্তি দেখা যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাবাঠাকুরের কোন মূর্তিই নেই। শালগ্রাম শিলাকে বাবাঠাকুর বলে পূজা করা হয়। ক্ষেত্রগবেষণা কালে

উক্ত তিন দেবতার মূর্তি ও পূজাচার সম্পর্কে পর্যালোচনা করে প্রতীতি জন্মে যে, মৌলিক তাৎপর্যে দেবতাত্রয় এক ও অভিন্ন, কিন্তু এঁদের বাস্তব অস্তিত্ব পৃথক। পঞ্চানন্দের উৎস আর্যেতর জাতির মধ্যে। তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস ও দেব কল্পনা থেকেই বৈদ্যরাজ পঞ্চানন্দ দেবতার সৃষ্টি। বৌদ্ধ যুগে তাঁর অবয়বের বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। আদিম চেহারা যুক্ত পঞ্চানন্দ মূর্তি ও সৌম্য চেহারা যুক্ত মূর্তি কল্পনার মধ্যেই ধর্মীয় পালাবদলের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বাবাঠাকুরের শিলাখণ্ডে পূজা আদিম মানুষের ভয়-ভক্তি জাত দৈব বিশ্বাসকে সূচিত করে যা এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাসের মধ্যে অদ্যাপি বর্তমান।

বাবাঠাকুরের নিত্যপূজা বারুইপুর থানার অন্তর্গত চিত্রশালী গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার বাবাঠাকুর নন্দিকেশ্বর নামেও পরিচিত। প্রতি সোম-শুক্রবার ও অমাবস্যা-পূর্ণিমার দিন এখানে যাত্রী সাধারণের আগমণ ঘটে। তাঁরা ছলনাদি দিয়ে বা মানত অনুযায়ী বাবাকে পূজদেন, কেউ কেউ মনস্কামনা করে পূজা দেন, সেবাইতের নিকট হতে ওষুধ গ্রহণ করেন।[*] এছাড়া ১লা বৈশাখের তিন দিন আগে ২৭শে চৈত্র (কোন কোন বছর ২৮শে চৈত্র) এখানে বাৎসরিক মেলা বসে ও বাবার পুকুরে স্নান ও মন্দিরে পূজা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র এই মেলা ও পূজা চলে। ২৭শে চৈত্র রাত বারোটার পর থেকে পরের দিন রাত বারোটা পর্যন্ত বাবার পুকুরে স্নান চলে। দুইজন মূল সন্ন্যাসী থাকেন। তাঁদের একজন রাত বারোটার পর ঢাক ঢোল বাজিয়ে স্নান করে বাবাকে পূজা দেন। এঁকে প্রথম সন্ন্যাসী বলে। আর একজন পরের দিন রাত বারোটার আগে বাবার পুকুরে স্নান করে মন্দিরে পূজা দেন। এঁকে শেষ সন্ন্যাসী বলে। এই সন্ন্যাসী স্নানের পরে আর কেউ নিয়ম অনুযায়ী স্নান করতে পারেন না। এই দিন লক্ষাধিক ভক্ত খালি পায়ে সামান্য বস্ত্রে শুদ্ধ ভাবে, গলায় পৈতে ধারণ করে বাবার নামে জয়ধ্বনি করে মন্দিরে আসেন, পুকুরে স্নান করেন ও মন্দিরে পূজা দেন। এঁরা সবাই বাবা মহাদেবের নামে ও বাবার বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের নামে উচ্চধ্বনি দিয়ে এই মেলায় যোগদান করেন। উচ্চধ্বনিগুলি নিম্নরূপ —

১) ত্রিশূলধারীর চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম
২) ভাঙড় ভোলার চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম
৩) তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম
৪) বাবা বড় কাছারীর চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম
৫) জয়রামপুরের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম
৬) বাবা পঞ্চানন্দের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম
৭) বাবা নন্দিকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম
৮) বাবা দক্ষিণেশ্বরের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম ইত্যাদি।

বাবার থানের চরণ মৃত্তিকা বা চন্দন মৃত্তিকা খেলে ও মাখলে সব রোগ দূর হয়ে যায় বলে লোকবিশ্বাস আছে। এছাড়া আছে বাবার ওষুধ। বাবার ভক্ত এই ওষুধ দেন। বাবার নামে শ-পাঁচ আনা পয়সা, বা পাঁচসিকি মুদো বেঁধে ভক্তিভরে বাবার ওষুধ মাখলে বা খেলে

দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস। রোগ মুক্ত হলে মানত অনুযায়ী ছলনাদি দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। কেউ বাড়ি থেকে গণ্ডি কেটে বাবার থানে আসেন। বাবাঠাকুরের ছলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৃষের উপর উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্তি কোথাওবা হরপার্বতীর মূর্তি। মহাদেবের মূর্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গায়ের রং সাদা। এছাড়া সৌম্য মূর্তি পঞ্চানন্দ ও মহাদেবের মূর্তির মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে এই অঞ্চলের মানুষের মনে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, মহাদেব, দক্ষিণেশ্বর ও বাবাঠাকুর সম্পর্কে এক বিভ্রান্তি আছে। গভীর ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় শিব মূলত কৃষি সম্পৃক্ত আদিম দেবতা, তিনি ভক্তের সিদ্ধিদাতা রূপে বিরাজমান, যাঁকে কেন্দ্র করে শৈব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ইনিই পঞ্চানন। বাবাঠাকুর সম্পর্কে লোকবিশ্বাস, তিনি বড়োদের (প্রাপ্তবয়স্ক) পশু-পক্ষীর যেকোন মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা করেন। পঞ্চানন্দ হলেন মূলত অরণ্য দেবতা, তিনি শিশু ও জটিল স্ত্রীরোগ আরোগ্য করেন। সমন্বয়-বাদীরা বলেন পঞ্চানন, মহাদেব, দক্ষিণেশ্বর, পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুর এঁরা সবাই এক ও অভিন্ন। তিনি বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাবে মানুষের মঙ্গল করেন।

জেলা চব্বিশ পরগণায় পঞ্চানন্দের পালাগান খুবই জনপ্রিয়। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে এই পালার জনপ্রিয়তার আধিক্য লক্ষিত হয়, এই অঞ্চলের বহু লোকশিল্পী পালাটি গান করেন। ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত চারটি পঞ্চানন্দের পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। নিম্নলিখিত শিল্পী ও ব্যক্তির নিকট হতে পালাগুলি সংগৃহীত হয়েছে —

১। পঞ্চানন্দের পালা—লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন, গ্রাম-বল্লভপুর, থানা-মন্দিরবাজার।

২। পঞ্চানন্দের গান—শশধর মহিষ, গ্রাম-মৎস্যখালি, থানা-বিষ্ণুপুর।

৩। পঞ্চানন্দের পালা—অনিল হাজরা, গ্রাম-বেগমপুর, থানা-বারুইপুর।

৪। পঞ্চানন্দের গান—(গায়কের প্রাচীন খাতা), রাধাগোবিন্দ গায়েন, বাপুলীর চক্, থানা-জয়নগর।

পালাগানগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষণীয়। বিশেষত পঞ্চানন্দের জন্মবৃত্তান্তটি লক্ষণীয়। লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েনের নিকট হতে প্রাপ্ত পালাগানটিতে পঞ্চানন্দের জন্ম বিষয়ে বলা হয়েছে— কুঁচির নগরে ভদ্রশ্যাম নামে রাজার কন্যা সোহাগীর গর্ভে পঞ্চানন্দের জন্ম। অনিল হাজরার নিকট হতে প্রাপ্ত পালাগানে বলা হয়েছে—পঞ্চানন্দ কুচুনী বাগদিনীর গর্ভে শিবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছেন। শশধর মহিষের গানে ও প্রাচীন খাতায়—শিববীর্য থেকে পঞ্চানন্দের জন্ম হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় প্রাপ্ত পালাগানসমূহের পরিচয় ও কাহিনী সংক্ষেপে লিখিত হল। অনিল হাজরার পঞ্চানন্দের পালা ও শশধর মহিষের পঞ্চানন্দের পালার সাথে মহাদেবের চাষ পালার কতক অংশের সাদৃশ্য থাকায় এ পালার আলোচনা চাষী মহাদেব বা চাষপালা অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে।

শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েনের গীত পালাগানে পঞ্চানন্দের বন্দনাংশে এক ঐতিহাসিক

ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মদনমল্ল (মেদনমল্ল) পরগণার এক সামন্ত রাজা দুর্গাচরণ, তাঁর তালুকে জাফরপুর গ্রামে বাস করতেন কবি দ্বিজ পীতাম্বর। তিনি এই পঞ্চানন্দের পালাটির রচয়িতা। বন্দনাংশে পঞ্চানন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—পঞ্চানন্দ হলেন হরগৌরী সুত। বকুল বৃক্ষ তলে তিনি স্থিতি করেন। তাঁর পরণে বাঘছাল, গলায় হাড়ের মালা, মাথায় জটাজুট, দেহে বিভূতি মাখেন ও জ্যোতির্ময় রূপ। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তাঁকে পূজা করেন, যত দেবতা সবাই তাঁকে নমস্কার করেন। তাঁর পাঁচজন অনুচর সদাই সঙ্গে থাকেন। বুকটান, পিঠটান, ফোড়া, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগ তাঁর বাধ্য। দ্বিজ পীতাম্বরের লেখা পঞ্চানন্দের পালার কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

পঞ্চানন্দের পালা

হরগৌরী একাসনে বসে আছেন। শিব উমার কাছে গোটা দশেক ব্যঞ্জন সহযোগে অন্ন ভক্ষণের বাসনা ব্যক্ত করেন। শিবের কথায় গৌরীর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। ঘরে কোন তণ্ডুল নেই, ধার চাইলে কোথাও পাওয়া যায় না অথচ এই অবস্থায় শিব ভাল জাস-জুস কি ভাবে খেতে চান? এই কথা শুনে শূলপাণি খুব ক্ষেপে যান। নন্দীকে ডেকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করেন। সেখানে ভিক্ষা করে খাবেন কিন্তু গৌরীর সংসারে আর থাকবেন না।

মহাদেব বৃষভেতে আরোহণ করে কুঁচির নগরে কুচির ঘরের উদ্দেশ্যে চললেন। এই নগরের অধিপতি হলেন ভদ্রশ্যাম। তাঁর দুই কন্যা সোহাগী ও সুন্দরী ইন্দ্রের নাচুনীর ন্যায় রূপবতী। সিংহ চতুর্দশীর দিন তাঁরা দুই বোন সরোবরে স্নান করতে যাচ্ছেন এমন সময় বৃষভারূঢ় মহাদেবকে তাঁরা দেখেন। সোহাগী ও সুন্দরীকে দেখে শিবের মনও টলে যায়। শিব তাঁদের ধরতে গেলে তাঁরা সরোবরের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। দৈবের ঘটনায় সেই সময় অধৈর্য শিবের বীর্যপাত ঘটে। বীর্য থেকে কেয়া পুষ্প জন্ম নেয়। শিব চলে যাবার পর সোহাগী সেই স্থানে এসে কেয়া পুষ্প দর্শন করে ও তা হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নেন। সেই থেকে সোহাগীর গর্ভ সঞ্চার হয়। গর্ভ পাঁচমাস হলে পর সোহাগীর জননী তা টের পান ও নগরের দাইবুড়িকে ডেকে কন্যার প্রকৃত অবস্থার কথা জানতে চায়। দাইবুড়ি সোহাগীর মুখে সব শুনে জল পড়ে দেয় ও পঞ্চম মাসে সোহাগীর এক পুত্রের জন্ম হয়।

> পঞ্চম মাসে সোহাগীর এক পুত্র যে জন্মিল,
> সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র নয়ন মেলিল।

দাইবুড়ির পরামর্শে সদ্যোজাত সেই বাচ্চাকে শরবনে ফেলে রেখে আসা হল। শরবনে বাচ্চা ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদতে থাকেন। তখন বৃষভে চড়ে শিব সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছেন। কান্না শুনে শিব বাচ্চার কাছে গিয়ে দেখে চিনতে পারেন যে, এ পুত্র তাঁরই অংশে জন্ম। পাঁচ মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এই শিশুকে শিব পঞ্চানন্দ নাম রাখলেন। শিব পঞ্চানন্দকে নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে গেলেন, পেঁচো, খেঁচো, নেকা ও ব্যাঁকা এই চার সঙ্গী তাঁকে দিলেন।

নয় মাস বয়স কালে পঞ্চানন্দের সঙ্গীরা পঞ্চানন্দকে নিয়ে বেড়াতে বার হল। পথে মানিকপীরের সাথে তাদের দেখা হয়। মানিকপীর ব্যাধির ধুকড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। পঞ্চানন্দ

ও তার চরগণ মানিকপীরের নিকট ব্যাধির ধুকড়ি চাইলেন। মানিকপীর তা দিতে রাজী না হওয়ায় মানিকপীর ও পঞ্চানন্দের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে। এমন যুদ্ধ শুরু হল তাতে সৃষ্টি নাশ হবার উপক্রম। এই অবস্থায় শিব নারদকে উভয়ের মধ্যস্থতা করার জন্য পাঠান। নারদ এসে শিবের কথা তাঁদের জানান ও ব্যাধি অর্ধ অর্ধ ভাগ করে নিতে পরামর্শ দেন। এই প্রস্তাব উভয়ে মেনে নেন। সন্ধির পর মানিকপীর কিনু ঘোষের বাড়ির দিকে গেলেন, পঞ্চানন্দ ব্যাধি নিয়ে কোন্ দিকে যাবেন সেই চিন্তা করতে লাগলেন।

পঞ্চানন্দ ভূপতি ভুবনেশ্বর রাজাকে নিয়ে নিজের পূজা প্রচার করার কথা চিন্তা করলেন। প্রভু স্বপ্নে রাজাকে তাঁর পূজা করার জন্য বলেন, কিন্তু রাজা পঞ্চানন্দকে বলেন কোন দেবতাকে তিনি স্বীকার করতে রাজী নন। তখন পঞ্চানন্দ তাঁর দুই পুত্রকে ধনুষ্টংকার রোগে তুলে নিলেন। তারপর রানীর অনুরোধে রাজা পঞ্চানন্দের পূজা করতে রাজী হন ও পঞ্চানন্দের কাছে গিয়ে পূজার নিয়ম জানতে চান। পঞ্চানন্দ তখন রাজাকে শনি ও মঙ্গলবার পূজা করার পরামর্শ দিয়ে অন্তর্ধান করেন। সেই থেকে মর্ত্যে পঞ্চানন্দ দেবের পূজা প্রচার হয়।

(কাহিনী সমাপ্ত)

লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েনের গাওয়া এই পালাগানটি পঞ্চানন্দের মাহাত্ম্য প্রচার বা বাংলার লোকসমাজের সমীহ আদায়ের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু কাহিনী হিসাবে পালাটি খুব সুসংহত নয়। বন্দনা অংশের সাথে মূল কাহিনীর সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। এখানে মর্ত্যে পূজা প্রচারের কথা আছে কিন্তু স্বর্গে ইন্দ্র রাজা যে পূজা করেছিল সে সম্পর্কে কোন কথা নেই। ভূপতি ভুবনেশ্বর রাজার কাহিনীটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত। কাহিনীর মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতের তেমন স্পর্শ নেই। মানিকপীরের সাথে পঞ্চানন্দের যুদ্ধের ঘটনাটিও অভিনব। পঞ্চানন্দের কাহিনীর সাথে মানিকপীরের সংযোগটি স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। এটি কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। পঞ্চানন্দের জন্ম বৃত্তান্তটি ভদ্রশ্যাম নামে রাজার কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর থানার বাপুলীর চক্ গ্রামে পঞ্চানন্দের পালাগানের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি (খাতা) পাওয়া গেছে। খাতাটি কমপক্ষে ১০০ বৎসরের পুরান। এতে কেবল বন্দনা অংশটি নেই। খাতাটি রাধাগোবিন্দ গায়েন তাঁর পিতা হারানচন্দ্র গায়েনের (পণ্ডিত) স্মৃতি হিসাবে যত্নে রক্ষা করে.রেখেছিলেন। এটি কঞ্চির কলমে লেখা। হারানচন্দ্র গায়েন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রধান শখ ছিল অবসর সময়ে পিরুলী মনসা, লক্ষ্মী, পঞ্চানন্দ প্রমুখের মাহাত্ম্যকীর্তন মূলক পালা রচনা করে গান করা। ঐ অঞ্চলে পালাগায়ক হিসাবে হারান পণ্ডিতের খুব সুখ্যাতি ছিল। তিনি নিজেও লক্ষ্মীর কয়েকটি পালা লিখেছিলেন বলে জানা যায়। পঞ্চানন্দের যে পালাটি তাঁর পুত্রদিগের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে সেটিতে হারানচন্দ্রের হাতের লেখা কিছু অংশ আছে বলে রাধাগোবিন্দ জানান। সেই নিরিখে লেখাটি একশত বৎসরের পুরোনো বলে অনুমান করা যায়, কিন্তু কাহিনীটির ভাষা অনেক প্রাচীনত্বের দাবী রাখে।

প্রাপ্ত পালাগানটি যথাসম্ভব উচ্চারণের পূর্ব অবস্থা বজায় রেখে বর্তমান প্রচলিত

অক্ষরে লেখার চেষ্টা করেছি। খাতাটির কোন কোন অংশ অস্পষ্ট, ছিঁড়ে যাওয়ায় বা বুঝতে না পারার জন্য '?' চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। কাহিনীটির আদ্য প্রান্ত কবি গঙ্গারাম দাসের লেখা। কারণ গঙ্গারাম দাসের ভণিতা সর্বত্রই আছে। কবি গঙ্গারাম দাসের ভণিতা যুক্ত পালাটি নিম্নরূপ—

পঞ্চানন্দের গান

আসরে জতো লক সভারে খণ্ডিবে দুখ
হরি ২ বল সর্ব্ব জোন
গেহে জতো শ্রীমন্তিনী শুন দিএ জএ ধনি।
য়হ রাত্রে গিত জাগোরণ
বড় য়পরুপ ধন্দ জেই রুপে পঞ্চানন্দ
খিতিতে হইবে য়বতার।
প্রমদ ভুদর সঙ্গে নিরবদি টলে সঙ্গে
কৈলাস সিখরে আছে হর।
বামেয়ঙ্গি ভগোবতি নন্দি ভিঙ্গি মহামত্তি
সনমুখে দাড়াএ দুই জোন।
স্থূল কাএ মহামতি মুসা পিষ্টে গনপতি
বন্দিত যত দেব অগনন।
হেন কালে ত্রিপুরী হর বলে শুন গৌউরী
ভিক্ষেয়তে চলিলাম য়ামি।
সখি বিজয়া সঙ্গে পরম কৌতুক রঙ্গে
কৈলাস সিখরে থাক ত্তমি।
এতো বলি চন্দ্রচূড় আরোহন বৃষারুড়
গমন করিল পঞ্চানন।
দেবী বলে বিজআরে তুমি থাক নিজ ঘরে
আমি যাব ছলিতে ত্রিলোচন।
এতেক বলিএ গৌরী পরি হরি নিজ ছবি(?)
মায়া রুপে করেন গমন।
রুপে জিনি বিদ্যেধরি ত্রিভুবন মনহরি
ললাটে জ্বলে ত্রিনয়ন
অঙ্গে পরে আভরন পট্ট বস্ত্র পরিধান
কুচ যুগ শোভে রত্ন হার।
হস্তে কঙ্কন শোভে। ভূজে .... (?)

পদযুগে রতন নপূর।
ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা সুন্দর রবির ছটা
ইন্দু বেড়ি কত তারা তা এ।
রূপ হইল মনহর রতির গরব চুর
কবি গঙ্গারাম রসো গাএ।

দেবীর এরূপ দেখ অতি মনোহরা।
হরমন ছলিতে গমন অতি ত্বরা।।
বৃষ বাহনে যান দেব ত্রিলোচন।
তদগ্রে ভগবতি করিল গমন।।
মায়ায় সৃজিল বিল অতি পিরীত।
জল ছেচি মৎস্য ধরে পঙ্কে ভূষিত।।
কতদূর হইতে শিব দেখিবারে পাএ।
.... হএচে উদএ।।
অতি শ্রীঘ্র তথা এ আইল পশুপতি।
জিগাউসিল কহ রামা তুমি কোন জাতি।।
দেখি এ বদন তোর কত চাঁদ বন্দি।
হিদএ শুদ্ধ নাড়া দেয় কত ছন্দি (?)।।
তোর নাসা দেখি আমি মনে পাই পাখির (?)।
অভিমানে লজ্জা পায় ঠোঁট (?) যত পাখির।।
যখন মদন রাএ ছাড়িলেন তুনু।
ভুরু (?) ছলে তব ঠাঁই সপে গেল ধেনু।।
তোর কনট দেখি অঙ্গ ডুবিল সাগরে।
গৃধিনী হইলে পাখি শ্রাবনের ধারে (?)।।
উচ্চ দুটি কুচ যেন হেম গিরির পাএ।
দেখিএ হরের মন স্থির নাহি হএ।।
তোর ক্ষীন মাজা দেখি মনে পাই লাজ।
পশুরাজ রূপ যেন নব নিরমাজ (?)।।
গঙ্গারাম বলে মোর মনে য়নুমান।
জগতের রূপ হইল এক স্থান।।

না পাইয়া উত্তর, জিজ্ঞাসিল গঙ্গাধর
শুন রামা আমার বচন।
তুমি নও মানবী, কোন দেবের দেবী
হেন বুজ্জি (?) মোর অনুমান।

কিবা রম্ভা কিবা শ্যামা উর্ব্বশী ললনা খেমা (?)
..... সি রাখি (?)
কিবা শচি সদা আর উপমা না পেএ আর
য়ভিমানে সবে হল সুখি।
কি বা উমা বান সুতা তারা মন্দদরি চিন্তা
উপমা বলিতে নাহি জানি।
হেন নএ মোর মতি বিধি দক্ষ সুতে পতি।
কিবা তুমি চন্দ্রের কাহিনী।
শিব বলে রূপবতী দ্রুপদ (?) দুহিতে সতী
সেই হই সনি।
ভোজকন্যা ভানুমতি সত্যভামা সত্যবতী
কিবা তুমি রাধা চন্দ্রাবলী।
এতো বলি গঙ্গাধরে আলিঙ্গন মাগে তারে
শুনি অঙ্গে (?) পিল বাগদিনী।
শুনহ ত্রিপুরারী আশা পুরাইবে গৌরী
আমি হীন জাতি তুমি শুল পাণি।
শিব বলে রুপবতী কি কর বিচার সতী
সকলি হইবে একাকার।
পঞ্চানন্দের পদতলে কবি গঙ্গারাম বলে
ধন্য কলি যুগের ব্যবহার।

পয়ার।। শুনিয়া শিবের বোল কুপিল বাগদিনী।
শুনহে আমার বাক্য দেব পঞ্চানন।।
ষোলশ গোপিনী হতে তোমার পরম সুন্দরী।
কৈলাশে আছেন গৌরী রূপে বিদ্যাধরী।।
তাহার সঙ্গে বঞ্চে কর।
একাকার কবে হবে কহ গঙ্গাধর।।
শিব বলে রুপবতী শুন তাহা বলি।
সত্য ত্রেতা দাপর শেষে হবে কলি।।
সত্য কালে ইন্দ্র চন্দ্র কুলে কৈল দাগ।
চন্দ্রের কলঙ্ক ইন্দ্রের দেহে হইল ভগ।।
দ্বাপরেতে দুর্যোধন অধর্ম করিল।
জেষ্ঠ ভার্যে সম মাতা সভায় আনিল।।

অবিচারে দ্রোপদীকে ধরে আনে কেশে।
দেখি কর্ণ কূটমতি ঘন ঘন হাসে।।
পুনরপি চক্র করি জিনিল পাশায়।
বিধাতা দিলেন ছাই তাহার আশায়।।
ত্রয়োদশ বৎসর বঞ্চিত বনবাস।
এক এক করি কুরু করিল নৈরাশ।।
শেষ দ্বাপরেতে করিলেন প্রবেশ।
রাজ্য ছাড়ি যুধিষ্টির গেলেন স্বর্গবাস।।
কলির শেষেত হবে যবনের জোর।
সব একাকার হবে কলি হবে ঘোর।।
ব্রাহ্মণে শূদ্রানী লয়ে করিবেক ঘর।
হিন্দু মুসলমান সব হবে একাকার।।
এত শুনি বাগদিনী হাস্য বদন।
মোহবানে মহাদেবের হরিলেক জ্ঞান।।
শিব বলে সদয় হইলে রামা মোরে।
আইস হে যাই চল কৈলাশ শিখরে।।
এত বলি মহাদেব ধরি বারে যায়।
ছায়া রুপে ভগবতী ত্বরায় পলায়।।
পুনঃ আইসে বক্ষ বস্তর উদাস করিয়ে।
ক্ষেনেক ক্ষেনেক উরুবস্তর আইসে তুলিয়ে।।
ক্ষেনেক হয় হাতাহাতি ক্ষেনেক তফাৎ।
অবশ হইল অঙ্গ হইল বীর্যপাত।।
মলিন বদন শিব হেঁট মুণ্ডে রয়।
লজ্জিত হইয়া কিছু বাগদিনীরে কয়।।
পলাইয়ে যাও কেনে ভয় কর কারে।
লজ্জা লেগে পলাইলে গেলে কেন দূরে।।
এত শুনি বাগদিনী হইল অন্তর্ধান।
মনেতে ভাবহ তথা দেব পঞ্চানন।।
দেবের দেবতা দেব সর্বশাস্ত্রে কয়।
এ বীর্যে জনমিলেন ত্রৈলক্ষ বিজয়।
এত ভাবি বীর্যপাতে হইল অধিষ্টান।
পঞ্চানন্দের পাদ পদ্মে গঙ্গারাম গান।।

পয়ার ।। নাটগীত কৌতুকে আইলেন দণ্ডধর।
ভালমন্দ কয়ে ঠাই না পাইল উত্তর।।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়ে ভাবেন শূলপাণি।
হেনকালে ক্রোধ করি বলেন ভবাণী।।
কাল কোথা ভিক্ষা অর্থে গেলে শূলপাণি।
তোমার চরিত্র আমি লোক মুখে শুনি।।
পথে রঙ্গ করে সঙ্গে করিলেন আপনি।
শুনিলাম আপন কর্ণে সে নাকি বাগদিনী।।
এক শত অক্ষর তোমার কুচনীর দাদ।
বাদের উপরে বাদ এ বড় প্রমাদ।।
পূর্বে পাটনীর মেয়ে দিলে আলিঙ্গনে।
কহিব এসব কথা ব্রহ্মার সদনে।।
পাটনী কুচনী আর হীন বাগদিনী।
তিন জাতি একত্র শুন শূলপাণি।।
তার গর্ভে জন্মাইল পুত্র এক গোটা।
তে কারণে বলে তারে গাবড়ীর বেটা।।
তার নাকি পিতা তুমি ভাব শূলপাণি।
সে বুঝি তোমার তর্পণে দিবে পানি।।
এত শুনি উত্তর দিলেন শূলপাণি।
আপনার ভালমন্দ না জান আপনি।।
তাহা যদি বলি তবে তাহা হইবে প্রলয়।
পঞ্চানন্দের পাদপদ্মে গঙ্গারাম কয়।।

বীর্য পাতে শূলপানি না দেখিএ বাগদিনী
কিরাত নগরে কৈল গতি।
আচম্বিতে নড়ে চড়ে পঞ্চানন্দ বৈসে ধড়ে
দেখিতে দেখিতে বাড়ে পারা।
হেন কালে মহামতি প্রচণ্ড ধরিয়ে মূর্তি
চক্ষু দুটি গগনের তারা।
বিকট সিকট মাল(?) বদন জিনিআ নাথ
দণ্ড গুলা কড় কড় করে।
ভাহিন্টা খটঙ্গ ধরে নরশির বাম করে
দেখিএ চমক লাগে নরে।

শিরে জটা জুট ভাল, গলাএ হাড়ের মাল।
আকৃতি পিক্রিতি ত্রিলোচন।।
দান দত্তি প্রেত ভূত যক্ষ রক্ষ ভূত
তাহারে বেড়িএ সর্ব্ব জন।
নিজপন করি সঙ্গে পঞ্চানন্দ নাচে রঙ্গে
নর নহে শুন বিবরণ।
রজনী প্রভাতকালে মহাদেব কুত হলে
কৈলাসেতে (?) করিল গমন।
হেথা দেব পঞ্চানন্দ করিল বিসম বন্দ
মাতা রুপে বালক হইল।
ধরনী পড়িএ কাঁদে গগনো পরশে নাগে
মহাদেব তথাএ আইল।
জিজ্ঞাসিল কান্দ কেন আমার বচন শুন
কহ তুমি কাহার তনএ।
নিশ্বাস ছাড়ি আসিছু কহিতে লাগিল কিছু
আপনার নিজ পরিচএ।
কহিতে লাগিল ধন্দ রক্ষদের (?) জেই বন্দ
তাহার বাহন যেই হএ।
শুন নিবেদন করি স্তুতি জেই ঐ রি (?)
তাত মোর সেই মহাসএ।
শুন বলে গঙ্গাধরে যে কথা কহিলে মোরে
শুনিএ আমার হইল ধন্দ।
আমি সেই গঙ্গাধর পুত্র তুমি হইলে মোর
তোমার যে নাম পঞ্চানন্দ।
পশ্চিমেতে ভাগিরথী যাহা পবিত্রতায় অতি
নিমিতে নগরে নিজ বাস।
পূর্ব্বের সাধন ফলে কায়স্ত জাতের কুলে
গান করে গঙ্গারাম দাস।

পয়ার।। শুনিএ হাসেন শিব হিদএ আনন্দ।
আমি পঞ্চানন তোমার নাম পঞ্চানন্দ।।
তোমারে দিলাম ত্যর হও ব্যাধি পতি।
প্রচার করহ পূজা ভারতের খিতি।।

এত শুনি পঞ্চানন্দ বলেন শিবেরে।
কোথা পূজা প্রচারিব কে মানিবে মরে।।
এক নিবেদন করি তোমার চরণ।
গুটি কত ব্যাধি দেহ করিআ সৃজন।।
এত শুনি মহাদেব বসে যোগাসন।
ব্যাধিদের মহাদেব করিল স্মরণ।।
প্রথমে হইল ব্যাধি তড় পটিঙ্গার (?)
কোলটান, পিটটান যোমের দোসর।।
মাহা দাঙ্গ(?) ধদা (ধসা) দুই ব্যাধি উপজিল।
পাএ বলে রাএ তারে সঙ্গে নিল (?)।।
খমকা চমকা শুখ বাকা দুই বোন।
উলবোন হইল আর কত উলবান।
হেও মেও ডা চোরা পশ্চিমে প্রবন।।
পান্ডুর কোরন্ড হইল ছত্তি পিলে আর।
ঘুরি মাহ (?) সন্নিপাত সেহেরা বাঙ্গার(?)।।
ধুম খেএ চমৎকার হইল দুই জন।
যার নামে কম্পমান এ তিন ভুবন।।
ছাওলে ছার মেটে পরেশ পিত্তি আর।
বাই বাই ধাউত হইল, অষ্ট আর।।
এত ব্যাধি দিল তারে করিআ সৃজন।
প্রচার করহ পূজা ভারতো ভুবন।।
এত বলি মহাদেব চলিল কৈলাশ।
পঞ্চানন্দ ভাবি গান গঙ্গারাম দাস।।

ব্যাধি পেয়ে ব্যাধি পতি য়তি আনন্দিত মতি
বসে আছে আপনার স্থানে।
বিনো বাজা এ করে আচম্বিতে মুনি বরে
উপনীত হইল সেই খানে।।
পঞ্চানন্দ বলে বানি শুন দাদা মহামুনি
কি প্রকারে হইবে প্রচার।
নারদ বলে ভাই তোমার সদনে কই
গনপতি করহ সংহার।।

এতেক শুনিএ রাএ ব্যাধিগনের প্রতি কহে
শুন ব্যাধি আমার বচন।
আমার আরতি নিয়ে কৈলাস শিখরে গিয়ে
গনপতি করহ নিধন।।
রাত্রর আরত্তি পেয়ে দুই ব্যাদি গেল ধেএ
উপনীত কৈলাস শিখরে।
ব্যাধি অতি বড় বাড় ভাঙ্গি গনেশের ঘাড়
ঝর ঝরে (?) পৃষ্টে রক্ত ঝরে।।
অন্তরীক্ষে আইসে জাএ কেহ না দেখিতে পাএ
উপনীত রাএর সদন।
রাএর নোঅহিয়ে মাথা কর জোড়ে কন কথা
গনপতি করিলাম নিধন।।
শুনিএ হাসেন রাএ, গঙ্গারাম দাস গাএ
কি বর মাগিব আর আমি।
এই বর মাগি পাএ সুখে যেন কাল জাএ
য়ন্ত কালে স্থান দিও তুমি।।

প্রভাত যামিনী গাতুলি ভবানী
বলে উঠ লম্বদর।
না পেয়ে উত্তর হইল ফাঁপর
প্রবেশে বাসর ঘর।।
উঠ ২ বলি ডাকে পিষ্ঠে রক্ত দেখে
মস্তকে পড়িল বাজ।
বাছা বাছা বলি কান্দে উতরোলি
কে করিল হেন কাজ।।
পুবে মোরকোলে যখন জন্মিলে
দেখিতে আইল দেবগণ।
চতুর্ভুজ তোর দেখি কলেবর
সবে বলে নারায়ণ।।
শনির দৃষ্টে মুণ্ড বিক্ষত হইল খণ্ড
প্রাণে হত হইলে তুমি।
শুল নিএ করে মারিতে শনিরে,
মহাক্ষেপে যাই আমি।।

এতেক বলি এ ত্রিশূল লইয়ে
মহাকোপে নারায়ণী।
গঙ্গারাম বলে নারদ হেন কালে
কৈলাশে আইলেন শুনি।।

পয়ার।। শিবের বিষাদ দেখি জিজ্ঞাসিলেন নমি।
কি লাগিএ রোদন করহ শুনি মামি।।
এত শুনি নিশ্বাস ছাড়িয়া দেবী কন।
হের দেখ গনপতি হয়েছে নিধন।।
পুত্র শোকে কলেবর দহেতো আমার।
কে করিল হেন কর্ম কহ মুনিবর।।
নারদ কহেন মামি কহি বিবরণ।
পঞ্চানন্দ বধিআছে তোমার নন্দন।।
অভয়া বলেন সেই পঞ্চানন্দ কে।
কেমন দেবতা কোথা শুনি আছে সে।।
নারদ বলেন মামি সব জান তুমি ।
মামাকে ছলিতে যবে গিএ ছিলে তুমি।।
সেই শুক্রপাতে পঞ্চানন্দের উৎপত্তি।
তুমি তার মা সেই তোমার সন্ততি।।
দেবী বলে আমি আজি বধিব পঞ্চানন্দ।
নারদ বলে মামি বড় কথা মন্দ।।
নিজ পুত পঞ্চানন্দ তোমাঙ্গযার ।
স্বপুত্র বধিলে নাম হবেক তোমার।।
দেবী বলে কহ বাপ উপাএ ইহার।
কেমনে বাঁচিবে এই গনেশ আমার।।
নারদ বলেন মামি কহি বিবরণ।
পঞ্চানন্দ পূজিলে গণেশ পাবে প্রাণ।।
দেবী বলে এমন কভু না শুনি সংসারে।
মা হএ পুত্রের পূজা কেবা কোথা করে।।
নারদ বলে মামি বলিগো তোমারে।
পুত্রভাবে নন্দ ঘোষ কেন পূজেন কৃষ্ণেরে।।
হিমালয়ের কন্যে তুমি জগতো জননী।
শিব কেন পূজেন তোমার চরণ দুখানি।।

এতেক শুনিআ দেবী বলে দশভূজা।
আগে পুত্র প্রাণ পেলে শেষে করি পূজা।।
নারদ বলেন কভু নাশুনি শ্রবণে।
সেবিলে আপদ জাএ কেবা কারে মানে (?)।।
এতেক শুনিআ দেবী দণ্ডাইল মন।
পঞ্চানন্দের পাদপদ্মে গঙ্গারাম গান।।

নারদের বানী শুনি রে এ গন ডেকে আনি
পঞ্চানন্দ পূজা আরম্ভিল।
স্বর্ণ ঘট রত্ন মালা উপরে হু শুম (?) (রেশম) ঝারা
পুরোহিত নারদ হইল।
অনেক দিব্য উপহার নানা জাতি পুষ্প ভার
নৈবেদ্য রচিল অনুচরে।
পাএ মনোমত পূজা করে পুরোহিত
কৈলাসেতে জয় জয় করে।
তবেত ব্যাধির রাজা নিতে মাএর পূজা
নিজগন সঙ্গেতে নিয়ে এল।
কৈলাস শিখরে গিএ ধরনীতে লুটাইএ
হরগৌরীর চরণ বন্দিল।
পঞ্চানন্দ য়দিষ্টান গণেশ পাইল প্রাণ
উঠিএ বসিল লম্বোদর।
গণেশ পাইল প্রাণ হরি বল সর্বজন
কৈলাসেতে জয় জয় করে।
গঙ্গারাম দাস গাএ এই নিবেদন পাএ
য়বনী মাঝারে দিবে দেখা।
গাএ মধুর বানী সারি এবে তুমি (?)
নাএক মন্দিরে হবে সহায়।। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

গঙ্গারাম দাসের যে আত্মপরিচয় উপর্য্যুক্ত গানের মধ্যে আছে, তার সাথে রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কালিকামঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসের মিলের প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। পঞ্চানন্দের পালাগানে গঙ্গারাম দাস যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

পশ্চিমেতে ভাগীরথী যাহা পবিত্রতায় অতি
নিমিতে নগরে ছিল বাস।

পূর্বের সাধন ফলে কায়স্থ জাতের কুলে
গান করে গঙ্গারাম দাস।।

কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কালিকামঙ্গল কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা হল—

গ্রাম নিমিতা গঙ্গার পূর্বকূল।
সাবর্ণ চৌধুরী সব যাহাতে অতুল।।
গো-মোহিষ পশুপক্ষ বৃক্ষ পরটাট।
রম্য সরোবর তীর সান বান্ধা ঘাট।।
নগর রাজার হাট দেখিতে সুন্দর।
কৈলাশ শিখরে যেন দেব পুরন্দর।।
ভগবতী দাস নাম তথায় বসতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল তাহার সন্ততি।। (শ্লোক ১২৯৪-১২৯৭)

শীতলা বসন্তরায় পালার চন্দ্রভানু রাজার কাহিনীতে কৃষ্ণরাম দাসের যে ভণিতা তা হল—

নাম ভগবতি দাস বসতি নিমিতে।
তার সুত কৃষ্টরাম রচিল কবিত্বে।।

উক্ত দুই কবির আত্মপরিচয়ে নিমিতা গ্রামের উল্লেখ দেখে কৃষ্ণরাম দাস ও গঙ্গারাম দাসের মধ্যে নিকট সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়। কৃষ্ণরাম দাস ও রায়মঙ্গল কাব্য (দক্ষিণরায়) বিষয়ে গবেষকদ্বয় যথাক্রমে ড ঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ও ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় বর্তমান গবেষককে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন বলে সাক্ষাতকারে মন্তব্য করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গঙ্গারাম দাসের পঞ্চানন্দপালার যে হস্তলিখিত প্রাচীন খাতা খেঁজুরতলা গ্রামের হারানচন্দ্র গায়েনের গৃহ থেকে উদ্ধার হয়েছে সেই খাতায় অপর একটি কাহিনী আছে। সেটি হল বসন্তরায়ের পালা। লোকায়ত বসন্তরায় পালার রচয়িতা হিসাবে দ্বিজ পীতাম্বরের নাম পাওয়া যায়। আলোচ্য রচনার সূত্রে দ্বিজ পীতাম্বরের ভণিতায় তাঁর যে পরিচয় লাভ করা যায় তা হল—

সুরধনী সুরতুল্য পরগণা মদনমল্ল
ক্ষিতেপদে শ্রী দুর্গাচরণ।
তাহার তালুকে ধাম জাফরপুর গ্রাম
শ্রী দ্বিজ পীতাম্বর নাম গান।।

শীতলা ও বসন্তরায় পালায় দ্বিজ পীতাম্বরের যে ভণিতা আছে তা অতি সংক্ষিপ্ত যেমন—

রাএর চরণ তলে দ্বিজ পীতাম্বর বলে
নাএকের করিবেক ত্রাণ।

ভণিতা সূত্রে দ্বিজ পীতাম্বরের যে পরিচয় লাভ করা যায় তা হল— মদনমল্ল পরগণার সামন্তরাজা সুরতুল্য শ্রী দুর্গাচরণের শাসন কালে জাফরপুর গ্রামে দ্বিজ পীতাম্বর বাস করতেন। জাফরপুর গ্রামটি বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সোনারপুর থানায় অবস্থিত।

শিয়ালদহ-ক্যানিং রেল শাখায় চম্পাহাটি স্টেশনের ২-৩ কিলোমিটার উত্তরে জাফরপুর গ্রামটি অবস্থিত।

বাংলার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানগুলির মধ্যে পঞ্চানন্দের পালা চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে অধিক প্রচলিত। পঞ্চানন্দ ঠাকুর এই অঞ্চলের লোকসমাজের জীবন জীবিকার সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত এক লৌকিক দেবতা। তিনি বিভিন্ন মূর্তিতে পূজিত হন। মানুষ পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর সকল প্রকার রোগ বৈদ্যরাজ পঞ্চানন্দ ঠাকুরের কৃপায় আরোগ্য হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। পঞ্চানন্দের প্রচলিত পালাগান, মূর্তি, পূজাচার প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে মনে হয় তিনি আদিম জনগোষ্ঠীর বিশিষ্ট লৌকিক দেবতা। সংগৃহীত পঞ্চানন্দের বিভিন্ন পালা ও এই পালাগানের লোক শিল্পীদিগের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে অনুমিত হয় শতবৎসর পূর্বেও চব্বিশ পরগণা তথা জলা জঙ্গল অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলে দেব পঞ্চানন্দের পালাগানের প্রচলন ব্যাপকভাবে ছিল এবং পঞ্চানন্দের পূজাচার উপলক্ষে গীত হত।

পাদটীকা

১। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৮৭ পৃ: ৫১।

২। ভূপতি চট্টোপাধ্যায়, শিরাকোল।

৩। গেপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেতা, ১৯৮৭, পৃ ৫১।

৪। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল 'বিষ্ণু' বন্দনা।

৫। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (সাহিত্য সংসদ)।

৬। চিত্রশালী গ্রামে যে নন্দীকেশ্বরের আয়তকার, পশ্চিমে হেলান, অর্ধপ্রোথিত দীর্ঘ শিলাখণ্ডটি আছে তা প্রকৃতপক্ষে বাবাঠাকুর বা মহাদেব নামে পূজিত প্রচলিত শিলাখণ্ডের অনুরূপ নয়। শিলাখণ্ডটির একদিকে স্ত্রী-চিহ্ন (?) খোদিত। এটি প্রাচীন সুন্দরবন সাফ করার সময় আবিষ্কৃত হয়। ফলে এই শিলার প্রকৃত তাৎপর্য বা তত্ত্ব অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে বলে অনুমিত হয়। বিগত ৫০-৬০ বৎসর এটি নন্দিকেশ্বর মহাদেব বা বাবাঠাকুর এই নামে পূজিত হচ্ছে। তার পূর্বে এই দেবতার কোন মাহাত্ম্য ছিল কিনা জানা যায় না।

৭। সাক্ষাতকার : ইন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেবাইত-'চিত্রশালী মঠ'।

দেবপালা ঃ বেনাকি

চব্বিশ পরগণার বিশেষ জনপ্রিয় পালাগান হল বেনাকিপালা। পালাগান আলোচনায় বেনাকির লোকায়ত পালাগান দেবপালার অন্তর্গত। বেনাকি প্রায় অনালোচিত এক লৌকিক দেবতা। লৌকিক দেবদেবী নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা প্রায় কেউই বেনাকি বিষয়ে আলোচনা করেন নি। বাংলার লৌকিক দেবদেবী বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে অনেক লৌকিক দেবদেবীর প্রসঙ্গ আলোচনা করলেও বেনাকি নামক কোন দেবতার কথা বলেন নি। গবেষক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিনয় ঘোষ; আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখের গ্রন্থেও বেনাকি নামক কোন দেবতার উল্লেখ দেখা যায় না। বেনাকিসম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রথম সর্বভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব বিভাগে পেশ করেন।[১] ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধটি বেনাকি সম্পর্কিত প্রথম মৌলিক রচনা বলা যায়। লৌকিক দেবতা হিসাবে আলোচ্য প্রবন্ধে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বেনাকির তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করলেও কোন প্রকার বেনাকির পালাগানের পরিচয় প্রদান করেন নি।

'বেনাকি' শব্দটি 'বেনাক্ষি' বা 'বেনাক্ষ' শব্দের পরিবর্তিত রূপ, যার অর্থ (বেন + অক্ষি/অক্ষ) দুটি চোখ। বেনাকি দেবতাকে 'বেনাকিবারা' বলা হয়। যার লোকবিশ্বাসগত স্বরূপ দুটি চক্ষু বিশিষ্ট পুরুষ নৃ-মুণ্ড বা বেনাকিবারামুণ্ড। প্রচলিত পুরাকথায় উল্লিখিত অর্থের সমর্থন আছে। বেনাকিবারা কৃষকগণ কর্তৃক শস্যক্ষেত্রে পূজিত হয়, অঞ্চল ভেদে যার রূপ বিভিন্নপ্রকার হতে দেখা যায়। মৎস্যজীবী বা ধীবরগণ কর্তৃক আরও একধরনের পুরুষ নৃমুণ্ড মৎস্যক্ষেত্রে বা ভেড়ি অঞ্চলে পূজিত হয়—যা মাকালঠাকুর নামে পরিচিত। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মৌলে-বাউলে-কাঠুরিয়া কর্তৃক এক দেবীর নৃ-মুণ্ড পূজিত হতে দেখা যায়। একে বিশালাক্ষী বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে মুণ্ড প্রতীকের পূজার কথা জানা যায়। যথা - দক্ষিণ ভারতের কুট্টনদেবর, ফিজিদ্বীপের-বিশলমারি ইত্যাদি।

সুতরাং বেনাকিঠাকুর চব্বিশপরগণার আঞ্চলিক-নামাঙ্কিত লৌকিক দেবতা হলেও এর উৎস তাৎপর্য লোকসংস্কৃতির অনেক গভীরে।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে মাঠের বা ক্ষেত্রের আল-এ বেনাকির পূজা হয়। প্রথমে কাদা দিয়ে একটি বেদী তৈরি করে ও বেদী সংলগ্ন কিছু জায়গা গোময় দিয়ে ভাল করে নিকিয়ে দেওয়া (গোবর দেওয়া) হয়। তারপর জমির মাটি দিয়ে বেনাকি দেবতার মুণ্ড তৈরি হয় এবং সেই মুণ্ড পূজা করা হয়। কোথাও তিন বা পাঁচগোছ ধানগাছ একসাথে বেঁধে সিন্দূর লাগিয়ে বেনাকি দেবতার পূজা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেনাকি হয় কুমিরের দেহ যুক্ত মানুষের মুণ্ড, শুশুক বা হাতির আকৃতি দেহে মানুষের মুণ্ড। আবার কোথাও স্বর্ণগোধিকার সাথে মানুষের মুণ্ড থাকে। ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল একটি সুন্দর মানুষের মুণ্ড পূজা করা হয়। অনেকে এই দেবতাকে হালাকাটা দেবতা বলেন। কাটামুণ্ড যেখানে পূজা হয় সেখানে এই দেবতা বেনাকি বারা নামেও পরিচিত। অনেকক্ষেত্রে হুড়ের বারার কথাও বলা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, শনি দেবতার দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়ে শস্যক্ষেত্রে পড়ে, সেই মুণ্ডটাই বেনাকি বারা রূপে পূজা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষেতের কোলে বা আলের উপর মাটির পূর্ণ মূর্তি গড়ে তার মুণ্ড-ছেদ করে বেনাকীবারা হিসাবে তা পূজিত হয়। কৃষকগণ শস্যদেবতারূপে বেনাকি বারা পূজা করেন। বেনাকির কপালে সিন্দূর ও মাথায় ধানের শিষ দিয়ে পূজা করা হয়। এছাড়া ফুল, দূর্বা, তুলসীপাতা, ধূপ, ধূনা ইত্যাদিও থাকে। গুড়, পাটালী, মোয়া, বাতাসা, চিনির সন্দেশ এই পূজার প্রধান নৈবেদ্য। ধানের ক্ষেতে এই পূজা করা হয় বলে অনেকে বেনাকি পূজাকে ক্ষেত্রপূজা বলেন। যে ক্ষেত্রে পূজা হয় তাকে বলে 'পূজার বন্দ'।

ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় এই পূজায় পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের উৎসাহ বেশি। অবশ্য ক্ষেত্রপূজায় স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উদ্যোগ থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেনাকি পূজার সাথে লক্ষ্মীদেবীরও পূজা হয়। কারণ বেনাকি শস্য দেবতা, লক্ষ্মীও শস্যের দেবী, এই বিশ্বাসে দুই দেবদেবীর পূজা অনেক ক্ষেত্রে একসাথেই হয়। বেনাকি পূজায় ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত পূজানুষ্ঠান করেন। ক্ষেতখামারে বেনাকি দেবতার পূজার প্রচলন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে গৃহে গোলারধারে বেনাকি পূজা করা হয়। সাধারণভাবে বেনাকি নামে লোকসমাজে এই দেবতা পরিচিত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এই লৌকিক দেবতা বেনাকি মদন নামেও অভিহিত হন, অনেকে বেনাকিলক্ষ্মীও বলেন।

চব্বিশ পরগণায় গণেশের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে একাধিক লোকবিশ্বাস আছে। প্রথমত শনি যখন হরের তনয় গণেশকে দেখতে আসেন তখন তাঁর দৃষ্টিপাতে গণেশের মুণ্ড উড়ে যায়। সেই সময় রাজা জনক মতান্তরে জেলেরাজ এক পুষ্করিণীতে স্নান করে জলহাতে তর্পণ করছিলেন, এমন সময় ছিন্নমুণ্ডটি তাঁর হাতে এসে পড়লে সেটি পুষ্করিণীর খোলে জল ছাড়া করে স্থাপন করে স্নান আহ্নিকের কাজ শেষ করেন। সেই থেকে পুকুরের খোলে এইরূপ একটি কাটা বা ছিন্ন মুণ্ডের পূজা প্রচলিত আছে। এই ক্ষেত্রে এই ছিন্ন মুণ্ডকে মাকাল ঠাকুর

বলে এবং এই পূজাকে মাকাল ঠাকুরেব পূজা বলে। লোকবিশ্বাস, মাকাল ঠাকুর জেলেদের আরাধ্য দেবতা। অধিক মাছ পাবার আশায মৎস্য শিকারীগণ মাকাল ঠাকুরের পূজা করেন।

গণেশের কর্তিত মুণ্ড নিয়ে অপর একটি লোকবিশ্বাস হল, গণেশের মুণ্ড শনির দৃষ্টিতে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলার দক্ষিণ মুলুকে পড়ে ঐ মুণ্ড দক্ষিণরায় বারা হিসাবে অথবা নতুন দেহ যুক্ত হয়ে দক্ষিণের দক্ষিণরায় হযেছেন। ঐ কাটা মুণ্ড অথবা সেই দেহহীন বারামুণ্ড বারাঠাকুর হিসাবে গণ্য হন। মধ্যযুগে রচিত হরিদেবের রায়মঙ্গল কাব্যে ঐ ধারণার সমর্থন মেলে। তার থেকে দুটি ছত্র উদ্ধৃত করা গেল.

"আচম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা।
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা।।"[২]

গণেশের ছিন্ন মুণ্ডর কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-এর গণপতি খণ্ডে আছে। সেখানে গণেশের জন্ম সমন্ধে বলা হয়েছে। পার্বতী হরিকে আরাধনা করেছেন পুত্র সন্তান লাভের জন্যে। হরি তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে নিজেই পুত্র রূপে হরপার্বতীব ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বতী তাঁর নাম রাখেন গণেশ। তিনি অযোনি সম্ভব। তাঁর জন্মের কথা যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ।—

এত কহি হৈমবতী সকাতর মন।
অকস্মাৎ দৈববানী উঠিল তখন।।
দুঃখ কেন কর দেবী আপন অন্তরে।
অবিলম্বে প্রবেশহ আপন আগাবে।।
গৃহের ভিতরে তব জন্মেছে নন্দন।
পুত্র তেজে সমুজ্জ্বল কৈলাস ভবন।।
হরিধনে আরাধিল একান্ত অন্তরে।
সেই ফলে পুত্র জন্মে তোমার আগারে।।[৩]

পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর দেবতারা সবাই দেখতে এসেছেন, কিন্তু সূর্যপুত্র শনি আসেন নি। কারণ তাঁর স্ত্রীর অভিশাপে শনি যার মুখের দিকে তাকাবেন তার মুণ্ড পতন হবে। এই কারণে পার্বতীর তনয় গণেশকে শনি দেখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু পার্বতীর অতিশয় আগ্রহের ফলে শনি গণেশের মুখের দিকে তাকান। তৎক্ষণাৎ গণেশের মুণ্ড উড়ে যায় এবং মুণ্ড গিয়ে নারায়ণের দেহের সাথে লীন হয়ে যায়। পরে পার্বতীর কান্নাকাটিতে নারায়ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে উত্তর শিয়রে শয়ন রত এক কুঞ্জরের মুণ্ড কেটে গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করেন এবং গণেশ জীবন পান।

পালাগানের কাহিনীতে পুরাণের এই ঘটনার একটি ছায়া লক্ষ্য করা যায়। পালাগানে গণেশের জন্মের কাহিনীটি সংক্ষেপে হল কৈলাস শিখরে হর-পার্বতী একাসনে বসে আছেন। হৈমবতীর পুত্র বাঞ্ছা হওয়ায় শিবের নিকট সন্তান প্রার্থনা করেন। হৈমবতী পরে একতাল মাটি নিয়ে পুতুল তৈরি করে নাচাতে শুরু করেন। তখন নারায়ণ হৈমবতীর ইচ্ছা পূরণের

জন্য কৌতূহল বশত সেই কাদার পুতুলের মধ্যে প্রবেশ করেন। পুতুল তৎক্ষণাৎ নড়েচড়ে ওঠে। হৈমবতী মহানন্দে সেই পুতুলকে পুত্র বলে কোলে জড়িয়ে ধরেন। নারায়ণ তখন সেই পুতুলের ভেতর থেকে বার হবার পথ না পেয়ে বড় ফাঁপরে পড়েন। তখন তিনি ফন্দি করে শনিকে আনবার ব্যবস্থা করেন।

পার্বতীর পুত্রসন্তান হয়েছে শুনে সমস্ত দেবতা দেখতে আসেন, কিন্তু শনি আসেন না। এতে পার্বতী ক্ষুণ্ণ হয়ে শনিকে আনার জন্য নারদকে পাঠালেন। নারদের কথায় শনি এসে গণেশের মুণ্ডর দিকে তাকানমাত্র তাঁর মুণ্ড উড়ে গিয়ে ধান ক্ষেতে পড়ে। সেই সুযোগে নারায়ণ মুক্তি পান। তারপর পুত্র বিহনে পার্বতী কান্নাকাটি করলে নারায়ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে উত্তর শিয়রে নিদ্রারত এক কুঞ্জরের মুণ্ড কেটে এনে গণেশের ধড়ের সাথে লাগিয়ে দেন ও প্রাণদান করেন। এতে হৈমবতী খুশি হলেন বটে কিন্তু গণেশের পুরান মুণ্ডুর জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে, তিনি সেই মুখ চতুর্দিকে খুঁজে বেড়ান। অবশেষে দক্ষিণ আবাদের ধান ক্ষেতে মুণ্ডকে মা-মা বলে কাঁদতে শুনে পার্বতী সেখানে যান এবং আঁচলে ঢেকে মুণ্ড কোলে তুলে নেন। তারপর ক্ষেতের মাটি দিয়ে ধড় তৈরি করে সেই কাটা মুণ্ডুর সাথে জুড়ে দেন। তখন নারায়ণের কৃপায় তাতে প্রাণ সঞ্চার হয়। এই কাটা মুণ্ডুই হল চব্বিশ পরগণার শস্যদেবতা বেনাকি। কাটা মুণ্ডু পূজা হয় বলে স্থানীয় ভাষায় এঁকে বেনাকিবারা বলা হয়।

কাটা মুণ্ডু পূজা চব্বিশ পরগণার এক প্রাচীন এতিহ্য। এই জেলায় বাস্তুপূজা নামে কাটামুণ্ডুর পূজার প্রচলন আছে। এই পূজাকে অনেকে দক্ষিণদরের পূজা বা বারাপূজা বলে থাকেন। তবে দুই দেবতার লোকবিশ্বাসগত প্রকৃতি ভিন্ন রূপ। বেনাকিবারা পূজা শস্য বৃদ্ধি ও বিষয়-সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে, আর বাস্তু পূজার প্রচলন বাস্তুর সার্বিক মঙ্গলের জন্য। এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, প্রতি বৎসর বাস্তু পূজা দিলে বাস্তুর উপর থেকে যে কোন কুদৃষ্টি কেটে যায় ও গৃহস্থের বাড়ির মঙ্গল হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তু পূজায় একটি মাটির কুমীর তৈরি করে তার উপরে বারামুণ্ডু স্থাপিত হয়।

বারা পূজায় তুলসীপাতা, গোময় ও ধানের শুকনো শিষ দিয়ে পূজা হয়। তুলসীপাতা, গোময় ও ধানের শিষ দিয়ে পূজাকে স্থানীয় ভাষায় 'বাউনীদেওয়া' বলে। বাউনী তৈরি করে এই অঞ্চলের গৃহস্থগণকে এক একটি বাউনী ঘরের চালে বা ছাদে খড়ের বা ধানের গাদায়, শস্য ক্ষেত্রে, গোলার ধারে, ব্যবসায়ীর টাকার বাক্সে ইত্যাদি স্থানে দিতে দেখা যায়। লোকবিশ্বাস, এতে সংসারের, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বেনাকী পূজা ও বাস্তু পূজার মধ্যে পদ্ধতিগত অনেক মিল প্রত্যক্ষ করা যায়।

উত্তর চব্বিশ পরগণায় বেনাকি পূজার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। হাড়োয়া থানার কাকুড়িয়া গ্রামে বেনাকি পূজা ফাল্গুন মাসের বৃহস্পতিবার ক্ষেত্রের আলের উপর মাটির বেদী করে, গোময় দিয়ে লেপে পূজা হয়। বেদীর উপর বড় গোলাকার দুটি বা তিনটি কাদার তাল করে দেওয়া হয়। ঐ গুলিই বেনাকি মুণ্ডের প্রতীক। এ অঞ্চলে বেনাকিপূজাকে ক্ষেত্র পূজা, হালাকাটা পূজাও বলে। জায়গা-জমি, ফসল বৃদ্ধির জন্য অনেকে বেনাকি দেবতার

কাছে মানত করেন ও পূজা দেন। পূজার দিন দেবতার নিকট হাঁসা হাঁস একটি বা দুটি বলি দেওয়া হয়। পূজা শেষে হাঁসের মাংস বাড়িতে রান্না করে খাওযা হয়। পূজার দিন দিনের বেলায় পাণ্ডাভাত ও নিরামিষ খাওয়া হয়। ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত এই পূজানুষ্ঠান করেন। পূজাব উপকরণেব মধ্যে ফলমূল, বাতাসাদি থাকে। পূজা শেষে এগুলি বাচ্ছাদের মধ্যে বিতবণ করা হয়। চব্বিশ পরগণার সর্বত্র বেনাকি পূজায় বলি প্রথা বা মাংসাদি আহারের রীতি প্রত্যক্ষ করা যায় না, ক্ষেত্র বিশেষে এই আচার পালিত হয়।

চব্বিশ পবগণায় বেনাবকির পালাগান শোনা গেলেও এর লিখিত রূপের বিশেষ পবিচয পাওয়া যায় না। গায়কের গুরু পরম্পরায় এই পালাগান দীর্ঘদিন লোকসমাজে প্রচলিত আছে। মৌখিক ধারায় প্রচলিত এই পালার দুটিরূপ সম্প্রতি বর্তমান গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত পালার একটি মুখবন্ধ বা বন্দনা এবং অপবটি বন্দনাসহ পূর্ণাঙ্গ পালাগান। মন্দিরবাজার থানার বল্লভপুর গ্রামের লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েনেব নিকট হতে বেনাকি-মদনের একটি বন্দনা-গীত সংগৃহীত হয়েছে। এই বন্দনা-গীতে রামানন্দ ভক্তের ভণিতা আছে। বন্দনাটি নিম্নরূপ

বেনাকি বেনাক্ষ নাম অনুপম।
তোমার চরণে বন্দি রহুক প্রণাম।।
যেই কালে জন্মিল দেব হরের ভবনে।
দেখিতে আইল দেবে যত দেবগণে।।
শনি দৃষ্টি গণেশের মস্তক খসিল।
আনিয়া হস্তির মুণ্ড গণেশে রাখিল।।
কাটামুণ্ড তুলিয়া দেবী নিরখিয়া চায়।
এই মুণ্ড গণেশের ভবানী তনয়।।
দেখিতে আইল তখন যত দেবগণ।
আজি হইতে নাম তোমার বেনাক্ষ মদন।।
তোমারে পূজিয়া যেবা খন্দে দিবে হাত।
একগুণে শতগুণ তার হবে শস্য জাত।
তোমারে না পূজে যেবা খন্দে হাত দিবে।
আচম্বিতে খন্দ তার শূন্যে উড়াইবে।
অখণ্ড সম্পূর্ণ খন্দ যদি চলে যায়।
ইহার রক্ষা কর্তা তুমি মহাশয়।।
নিজগুণে ধরিলে তুমি গৃধিকা আকার।
পড়িয়া দিলে তবে পরিচয় কার।।
ডাইনে কাটারী আর মুদ্রা বাম করে।
আরোহণ করিল দেব ধান্যের উপরে।।

বেনাকিচরণে মোর মজুক নিজ চিত।
রামানন্দ ভক্ত গায় মধুর সঙ্গীত।।

রামানন্দ ভক্তের ভণিতা যুক্ত এই বন্দনাংশে বেনাকি বা বেনাক্ষ মদন-এর এক বিশেষ পরিচয় পাঠ করা যায়। তাঁর কৃপায় ক্ষেত্রে শস্য ভাল জন্মায় আবার তিনি বিরূপ হলে ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হয়। এছাড়া এই অংশে তাঁর তিনটি রূপের পরিচয় প্রকাশিত। একটি বেনাকির পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় যাঁর দক্ষিণ হস্তে কাটারী ও বাম হস্তে মুদ্রা এবং ধান্যের উপর স্থিতি করেন। দ্বিতীয় পরিচয় হল তাঁর গৃধিকা আকার। তাঁর তৃতীয় পরিচয় হল তিনি বেনাকি বেনাক্ষ। অর্থাৎ দুই চক্ষু বিশিষ্ট কাটা মুণ্ড, যিনি খন্দ বা চাষের অধিপতি।

'বেনাকিমদন' পালাগানের পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় মেলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার পালাগায়ক সুদিন মণ্ডলের নিকট। তিনি বেনাকি মদনের যে পালাটি গান করেন তার লিখিত কোন খাতা নেই। তাঁর বক্তব্য, এ পালাটি তাঁর স্বপ্নে পাওয়া। বেনাকি মদন পালাগান সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, এই পালার মূল কাঠামো অর্থাৎ ঘটনা তিনি গুরু পরম্পরায় পেয়েছেন, কিন্তু পরিবেশন পদ্ধতি ও কাহিনীর বয়ান ও আঙ্গিকগত দিক গুলি তাঁরই সৃষ্টি। সুদিন মণ্ডলের নিকট হতে সংগৃহীত পালাটি নিম্নরূপ —

বেনাকি পালা

বন্দি প্রভু গণ রায়, প্রণতি তোমার পায়
উর প্রভু হরের নন্দন।
নমঃ নমঃ দেব সুত তোমার কীর্তি অদ্ভুত
সর্বনরে করহ কল্যাণ।।
কুম্ভীরের অবতারে বাস করিলে নদীনীরে
মুখমণ্ডল মানব আকার।
(আর) দ্বাপর যুগে জন্ম নিলে গোধিকা রূপে
জলে স্থলে সমান অধিকার।।
কলির মানবের তরে এলেন ধান্যক্ষেত মাঝারে
দিয়ে তোমার রাতুল চরণ।
তাই জ্ঞানহীন মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
আসরেতে দেহ শ্রীচরণ।।
তোমার বাম করে মুদ্রা লয়ে দক্ষিণে কুঠার ধরে
ধান্য ক্ষেত্র রক্ষা কর তুমি।
তোমায় না পূজে ক্ষেত্রে ধান্য কাটে চাষী
অর্দ্ধেক ক্ষেত্রের ধান্য হবে তুষ ভূষি।।
বেনাকি নাম স্মরণ করে বন্দনা শেষ করি,
সবাই মিলে শঙ্খ বাজাও বল হরি হরি।।

কথা ।। বন্দনা হল সায়। ঝেঁতলা মাদুর তুলে দাও গায়। ধরি তবে পালা। তোমরা খেতে পাবে মেলা। ধরি তবে গান। দাঁড়া দাঁড়া নায়েকবাবু দেয়নি চা আর পান।

ধোয়া ।। আহা এস এস বাপ বেনাকি মদন তোমার ধরি দুটি পায়, শুভদৃষ্টি দাওগো বাপ অধমের সভায়।

কোল ধোয়া ।। তোমারে যে না পূজে বাবা ওগো কুদৃষ্টিতে দেখে, ইহকাল নাই পরকাল নাই নরকেতে পচে।

নরম ধোয়া ।। কৃপা করে দাও হে দেখা তুমি হরের নন্দন তুমি না কৃপা করিলে আমার আসবে মবণ-গো আমি কি বলব কারে, আমার কপালে সকল করে।।

অসীম দয়ার সাগর বেনাকিমদন গো,
তুমি স্বর্গপুরে ভগবতীর কোল আলো করো গো
(সেইরূপ) অধমের আসরে একবার দেখা দাও আসিয়া গো
তুমি নাহি এলে বন্দনা সম্পাদন না হয় গো
শ্রী পাদ পদ্ম দান কর অধমের আসরে গো
বাবার মুখে হাস্য মৃদু মন্দ, পায়েতে নূপুর গো
কজ্জল সদৃশ কেশ দেখিতে চমৎকার গো
যে জন ভক্তিভাবে পূজে তার পায় গো
সোনার সংসার হয় গোলা ভরে ধানে গো। ও তার অসীম দয়া।

পয়ার ।। একদিন হরগৌরী প্রফুল্ল অন্তরে।
বিবাজ করেন তাঁরা কৈলাস শিখরে।।
হেন কালে গিরি সুতা কহেন হৈমবতী।
পুত্রের বাসনা মোর জেগেছে মনে অতি।।
মাটির পুতুলি গৌরী নিজে নির্মাণ করিল।
নিজেই সেই পুতুল নিয়ে নাচাতে লাগিল।।
সুদর্শনচক্র হাতে নারায়ণ ধ্যানেতে জানিল।
মহামায়ার বুঝি আজ পুত্রের বাসনা হইল।।
চতুরালি নারায়ণের মায়া বোঝা বড় ভার।
ধীরে ধীরে এলেন তখন মাটির পুতুলির ভিতর।।
মাটির পুতুলি তখন নড়াচড়া করে।
তাহা দেখি দেবী তখন, হাসেন কুতূহলে।।
ধীরে ধীরে মহামায়া মাটির পুতুলি কোলে তুলে নিল।
আস্তে ব্যস্তে সকল দেবতার আমন্ত্রণ জানাল।।

কথা ।। নারায়ণ মাটির পুতুলির মধ্যে ঢুকে বিষম বিপদে পড়েছেন। আর তিনি বের হতে পারছেন না। মহামায়ার কোলের সন্তান হয়ে তিনি কতদিন থাকবেন। বৈকুন্ঠের লক্ষ্মী রুষ্ট হলে তাঁর যে উপায় থাকবে না। একথা লক্ষ্মীর কানে গেলে তাঁকে যে লক্ষ্মীছাড়া হতে হবে।

এই কথা ভেবে নারায়ণ এক ফন্দি যে আঁটিল।
মনে মনে তখন তিনি সরস্বতীকে স্মরণ করিল।।
সরস্বতী মাতা এসে নারায়ণের দরশন দেয়।
শনিকে আমন্ত্রণ জানাতে হৈমবতীর প্রেরণা জাগায়।।

কথা ।। চতুরালি নারায়ণ মনে মনে ভাবলেন একমাত্র শনি এসেই তাঁকে উদ্ধার করতে পারে। শনির দৃষ্টিতে যদি মাটির পুতুলির মুণ্ড উড়ে যায় তাহলে তিনি বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবেন। কয়েকজন রাখাল মাঠে গরু চরাচ্ছিল। তারা তা দেখে পরস্পর বলাবলি করছে —

দোহার : এ ভাই, সোই দেখ রে, নারায়ণ মাটির ভেতর ঢুকছে।
২য় দোহার : নারায়ণের তো খেয়ে কাজ নেই, তাই মাটির ভেতর ঢুকছে।
১ম দোহার : সোই দেখরে ভাই, নারায়ণ কিভাবে সুদর্শনচক্র ঘোরাচ্ছে। আরে রাম রাম।
২য় দোহার : তুইও তবে মাটির ভেতর ঢোক, পরে তুইও চলে আসবি।

কথা ।। নারায়ণের মায়া বোঝা ভার। তিনি মহামায়ার মন পরীক্ষার জন্য মাটির ভেতর ঢুকেছেন মহামায়া আবার তাকে গা হাত পা ঝেড়ে কোলে তুলে নিচ্ছেন। নারায়ণ তখন তাঁকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে।

১ম দোহার : আমার ছেলে এত আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে কেন জানিস?
২য় দোহার : সব দেবতা এসেছে, একজন দেবতা আসেনি বলে ছেলেটা এভাবে কামড়াচ্ছে।
১ম দোহার : তবে দেখ কে আসেনি, তাকে লোক পাঠাও।

নিমন্ত্রণ পেয়ে দেবতারা কৈলাসেতে এল।
কেবলমাত্র গ্রহরাজ অনিমন্ত্রিত ছিল।।
গৌরীদেবী নারদের গ্রহরাজের নিমন্ত্রণে পাঠাল।
গ্রহরাজ কৈলাসেতে আসতে আপত্তি জানাল।।
নারদ বলে গৌরীদেবীর আজ্ঞা যেতে তোমার হবে।
গ্রহরাজ বলে গেলে ভাগ্নার মুণ্ড যে উড়িবে।।
নারদ এসে গৌরীদেবীর এই কথা বলে।
গৌরীদেবী সে কথা গ্রাহ্য নাহি করে।।
পুনরায় নারদ গ্রহরাজের কাছে গেল।
গ্রহরাজ তখন সন্তান দেখিবারে এল।।
মায়ের কোলে যখন সন্তান বসেছিল।
গ্রহরাজ মুখ তুলে সন্তানের মুখ দেখেছিল।।

মুহূর্তে ধড় থেকে মুণ্ড উড়ে চলে গেল।
মুণ্ড হীন ধড় দেখে মাতা কাঁদিতে লাগিল।।
এই কথা মুহূর্তে ভোলানাথের কাছে গেল।
হাতে ছিল ত্রিশূল ভোলানাথ ভূমেতে গাড়িল।
থর থর করে ধরাদেবী কাঁপিতে লাগিল।
করজোড়ে ধরিত্রী ভোলানাথে কহিতে লাগিল।।

কথা ।। হে পরমেশ্বর, তোমার ত্রিশূলের আঘাত আমি তো আর সহ্য করতে পারছি না। কি হয়েছে আমার বল। তখন ভোলানাথ ধীরে ধীরে সব কথা বলেন। হেনকালে চক্রধারী নারায়ণ সম্মুখেতে এলেন। চক্রধারী নারায়ণ তখন গৌরী মাকে বলেন —

ভেবোনা ভেবোনা জননী ভেবোনা মনেতে।
জীয়ন্তে তোমার সন্তান আসবে তোমার কোলেতে।।
সুদর্শনচক্র তখন দেব ঘোরাতে লাগিল।
উত্তর শিয়রে তখন এক কুঞ্জর আছিল।।
কুঞ্জরের মুণ্ড দেব চক্রে ছেদন করিল।
গৌরীদেবীর সন্তানের ধড়ে কাটা মুণ্ড বসাইয়া দিল।।
কাটামুণ্ড জোড়া লেগে দিব্য সন্তান হল।
আদি মুণ্ডর জন্য মাতা আবার কাঁদিতে লাগিল।।
আদি মুণ্ডর জন্য গৌরীদেবী চতুর্দিকে খুঁজিয়া বেড়ায়।
কোনখানে দেবী মুণ্ড খুঁজিয়া না পায়।।
দক্ষিণ আবাদে মুণ্ড মা মা বলে কাঁদিতে লাগিল।
সুদর্শনচক্র হাতে নারায়ণ সম্মুখে এসে দাঁড়াল।।
ভেবোনা ভেবোনা গৌরী ভেবোনা অন্তরে।
ধান্য বনে তুমি একবার দেখনা খোঁজ করে।।
ধান্য বনে মা শোনেন, কে মা মা বলে ডাকে।
ছুটে গিয়ে দেবী কাটা মুণ্ড আঁচলেতে ঢাকে।।
ধরাদেবীর প্রণাম করে তখন মাটি হাতে নিল।
কাটা মুণ্ডর সাথে এক অঙ্গ জুড়ে দিল।।
দক্ষিণ আবাদে দিব্য মূর্তি এক দেখা দিল।
গৌরীদেবী (সেদিন হতে) তাহার নাম বেনাকি রাখিল।।
গৌরীদেবী বলে, বেনাকি মোর কথা লবে।
ধান্যক্ষেত্রের অধিকার আজ হতে তোমায় দেওয়া হবে।।
তোমার নাম না করে যে জন ক্ষেতে ধান ফলায়।
অখণ্ড শ্রীখণ্ড ধান উড়িয়া পলায়।।

তব মুণ্ডমূর্তি ভক্তিভাবে যে জন পূজিবে।
সেই জনের গোলার ধান পরিপূর্ণ রবে।।
তোমায় পূজা করে যে চাষী গোলায় ধান তুলিবে।
সদা সর্বদা তার গোলার ধান আটক রহিবে।।
তোমার পূজে যে চাষী ক্ষেত্রে ধান কাটিবে।
সে চাষীর ধান কোনদিন ক্ষতি নাহি হবে।।
সেই বেনাকির ভক্তিভাবে প্রণাম করি আমি।
দয়া করে এস নায়েকের আসরে হে স্বামী।।
বেনাকির গান সংক্ষেপে এখানে সমাপ্ত হল।
শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে সবাই হরি হরি বল।।

প্যালা বা মাঙনের গান

দোহার : মাঙন দাও মাঙন দাও গো। বাবাজী বেনাকির নামে মাঙন দাও।

গায়ক : যে ব্যক্তি ভক্তিভরে বেনাকির পূজা করে ক্ষেত্রে ফসল বোনে, বেনাকির কৃপায় তার অখণ্ড শ্রীখণ্ড ধান্য ফলে।

দোহার : কৃপা কর ও আমার বাবাজী কৃপা কর (ধোয়া)।

গায়ক : যদি কোন চাষী বেনাকির নাম করে গোলায় ধান তোলে। বেনাকির কৃপায় তার ধান অখণ্ড রহিবে।

দোহার : কৃপা কর .... কৃপা কর।

গায়ক : যে সমস্ত জননী এখানে আছেন তাঁরা যদি গলায় কুটো বেঁধে ভিক্ষা করে ভক্তি ভরে বেনাকির পূজা দেন, তাহলে তাঁর ঘরে কোন অভাব না থাকিবে।

দোহার : কৃপা কর .... কৃপা কর।

গায়ক : তাই আমার কথা নাও, সেই বাবাজীর নামে গান পূজা দেব কিছু মাঙন আমায় দাও। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

চব্বিশ পরগণায় নৃমুণ্ড পূজার প্রচলন বহু প্রাচীন। এখানে নৃমুণ্ড বিভিন্ন নামে পূজিত হয়। যথা বেনাকি মদন, বেনাকিবারা, হুড়ের বারা, ঘারাঝারা, দক্ষিণরায়-নারায়ণীবারা, বিশালাক্ষী, মাকালঠাকুর ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে দুই ধরনের নৃমুণ্ড পূজার অধিক প্রচলন দেখা যা যার একটি বেনাকিবারা অপরটি দক্ষিণরায় ও নারায়ণী। ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায় বেনাকিবারার সাথে দক্ষিণরায় নারায়ণীর মুণ্ডমূর্তি পূজার (Ritual) সাদৃশ্য আছে। আবার দক্ষিণরায়ের বারা মুণ্ডপূজার সাথে দক্ষিণরায়ের দিব্য মূর্তি পূজার মিল আছে এবং দক্ষিণরায়ের দিব্যমূর্তির সাথে ধর্মঠাকুরের মিল আছে। এই প্রসঙ্গে হুড়ের বারার কথা উল্লেখযোগ্য।—

চব্বিশ পরগণায় অঞ্চলবিশেষে বেনাকিবারাকে 'হুড়ের বারা' বলা হয়। হুড়ের

বারা বিষয়টি একটি আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত, যার নাম 'হুড়'। বিশেষ কোন বস্তু লাভ করার জন্য উৎসব বা আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসাবে হুড়োহুড়ি করাকে সাধারণ ভাবে হুড় বলা হয়। হুড় উৎসবটি একদা আবাদ অঞ্চলে নানা সূত্রে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হত বলে শোনা যায়। চব্বিশ পরগণায় হুড় বিষযক কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য লাভ করা যায়। যার মধ্যে কৃষি-কর্মের পূর্বে হুড়, নারীর প্রথম ঋতুমতি হওয়ার কালে হুড়, শ্রাদ্ধপরবর্তী হরিনাম সংশ্লিষ্ট হুড় প্রভৃতি প্রধান।

বর্তমানে মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে (ছত্রভোগ) ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরে জাত-পূর্ণিমায় হুড় এবং ভাঙ্গড় থানার পাঁচুড়ে গ্রামে ধর্মঠাকুরের থানে ধর্মের জাত উপলক্ষে হুড় বিশেষ প্রসিদ্ধ। (ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায় সম্প্রতি ত্রিপুরাসুন্দরীর হুড়ের একটি অংশ স্থানীয় বিবাদের কারণে নালুয়াগ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়)। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের সামনে যে হুড় উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় এ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তীটি হল ত্রিপুরার মহারাজা (মতান্তরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র) এক সময় সুন্দরবনে শিকার করতে এসে ত্রিপুরা সুন্দরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মথুরাপুর অঞ্চল ছিল জঙ্গল ও বাঘ গণ্ডার ভরা। কাছেই ছিল খনিয়ার ডাঙ্গা। এটি ছিল প্রাচীন আঠারভাঁটি অঞ্চল, যেখানে দক্ষিণরায়, গাজী, বনবিবি, নারায়ণীর ছিল আধিপত্য। রাজাদেশে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন পুকুর কাটার কালে যতবার পুকুর কাটা হয় ততবার রক্ত ওঠে ও যতবার মন্দির গাঁথা হয় ততবার মন্দির ভেঙে যায়। তখন ত্রিপুরারাজ দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর স্বপ্নাদেশ পান—ঐ থানের মাটির নিচে একটি পাথর আছে সেটি তুলতে এবং সেইখানে হুড়ের অনুষ্ঠান করতে। এই স্বপ্নাদেশ মান্য করে ত্রিপুরার রাজা মাটি খুঁড়ে পাথর বের করেন ও তার পূজা করেন এবং ঐ উপলক্ষে 'হুড়' অনুষ্ঠান পালন করেন। (স্থানীয়ভাবে এই পাথরকে ধর্ম-পাথর বলে। এটি প্রায় এক ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া ও ছয় ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট কাল পাথর। পাথরখানি দন্ডায়মান বিগ্রহের বেদীর মত। উচ্চতা অংশটির চতুর্দিক প্রায় আধ ইঞ্চি গভীর খাঁজ কাটা। এটির ওজন প্রায় এক কুইন্টল বলে স্থানীয় ভাবে জানা যায়। হুড় অনুষ্ঠানের দিন ব্যাপক ভাবে এই পাথর কাঁধে বা মাথায় তোলার প্রতিযোগিতা চলে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ভক্তি ও শুদ্ধ মন থাকলে দুর্বল ব্যক্তিও অনায়াসে পাথরটি মাথায় তুলতে পারেন) অতঃপর ত্রিপুরাসুন্দরীর মূর্তি ও মন্দির স্থাপিত হয় এবং যথাবিধি পূজার্চনাদির ব্যবস্থা হয়। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে দেবীর আদেশ অনুসারে হুড়ের উৎসব হয়, যেখানে পশু-পক্ষি বলি দিয়ে তার মুণ্ড হীন কাণ্ডনিয়ে কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতা চলে। পূর্বে 'হুড়' অনুষ্ঠানে নরবলির প্রথা ছিল এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর মাহাত্ম্য স্মরণে এই হুড় অনুষ্ঠান সুন্দরবন অঞ্চলে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হত বলে কথিত হয়। বর্তমানে এর আড়ম্বর অনেক কমে গেছে। অনুরূপভাবে ভাঙড় থানার পাঁচুড়ে গ্রামে ধর্মঠাকুর তলায় ধর্মের জাত উপলক্ষে বলি প্রদত্ত পাঁঠার মুণ্ডহীন কাণ্ড নিয়ে অদ্যাবধি 'হুড়' অনুষ্ঠান বেশ উৎসাহের সাথে পালিত হয়।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে জাত-পূর্নিমায় (বুদ্ধপূর্ণিমা) হুড় ও পাঁচুড়ে গ্রামে ধর্মঠাকুরের থানে হুড় উৎসবের আচার আচরণগত বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় অনুমান করা যায়, সামাজিক বিবর্তনের ধারায় ত্রিপুরাসুন্দরীর পুজাচার ও ধর্মঠাকুরের পূজাচার মিলে-মিশে গেছে। অবশ্য ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রধান পূজা হয় জাত-পূর্ণিমার আগের দিন অর্থাৎ চতুর্দশীর দিন এবং হুড়

অনুষ্ঠানটি হয় ঠিক একদিন পর পূর্ণিমার দিন। হুড়ের দিন ধর্মপাথর তোলার প্রতিযোগিতা থাকলেও হুড় অনুষ্ঠানটিকে স্থানীয় ভাবে 'মা ত্রিপুরাসুন্দরীর হুড়' বলে উল্লিখিত হয়।

হুড় অনুষ্ঠানটি যে ভাবে বা যে সূত্রেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন তার সঙ্গে যে বলিদান বা রক্তদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান তা অনুমান করা যায়। হুড়ের প্রকৃত তাৎপর্যের সঙ্গে বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রদত্ত একটি প্রবন্ধের বিষয় উদ্ধৃতি যোগ্য।—

"The critical study of the time, place, nomanclature sacrifice, pouring of blood on the earth, holding of the chopped animal to the sun the name of Dakshin Ray Bara head a Hur-Bara, the ritual practices, the philological reference and other related field materials unfold the real significance of the Hur and leads to the finding that the Hur is a folk ritual demonstrating valour and prowess and besically it is a remnant of human sacrifice relating to the primitive agricultural magic belief of fertility. '[৫]

হুড় অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন প্রকার পালাগানের পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে দক্ষিণরায় ও বেনাকি পালার সূত্রে বিশেষত বারা মুণ্ডমূর্তির প্রসঙ্গে হুড়ের বারার কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। দক্ষিণরায়, বনবিবি, বেনাকিহুড় সম্ভবত একই ভৌগোলিক আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে পরস্পর সম্পর্কিত লৌকিক দেবদেবী। সে কারণে বারামুণ্ড সূত্রে এদের প্রসঙ্গ বিভিন্ন কিংবদন্তীতে ও পালাগানে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

চব্বিশ পরগণার লোকদেবতা বেনাকি এবং সংশ্লিষ্ট লোকায়ত বেনাকি পালাগান বিষয় হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য। বেনাকির মূর্তি, পূজাচার, সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস সংস্কার, প্রচলিত কিংবদন্তী এবং লোকায়ত পালাগানসমূহ বিশ্লেষণ করলে বাংলার লৌকিক গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির নানাবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কালের প্রভাবে বেনাকি সম্পর্কিত লোকপ্রচলিত কাহিনী ও পালাগানে নানারূপ পৌরাণিক ও উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাব পড়লেও আধুনিক লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বেনাকীর প্রভৃত কৃষি উর্বরতামূলক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগানের বিশিষ্ট রূপ।

পাদটীকা

১। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, বেনাকি বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ, সর্ব ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, নৃতত্ত্ব বিভাগ।

২। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস সংকলিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১৯৭৯, সাহিত্য সংসদ।

৩। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৮৭, পৃ: ১৯৪।

৪। শ্রী কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক অনূদিত শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, সন ১৩৫৯, পৃ: ২৩৩।

৫। (Dr. Tushar chattopadhyay Hur-A Folk Ritual, All India Science Congress, Calcutta 1972, 59th Session, Proceedings Part III, Abs No-34, P. 519.

দেবপালা ঃ চাষী মহাদেব

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে বিশিষ্ট পালাগান হল চাষী মহাদেব। পালাগান আলোচনায় এটি দেবপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে মহাদেব কৃষি সহায়ক দেবতা হিসাবে পরিচিত। এই অঞ্চলের জীবন জীবিকার সাথে মহাদেব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বারব্রতপ্রিয় মহিলাগণ থেকে শুরু করে ধনী দরিদ্র সব শ্রেণীর কৃষক সংসার জীবনের নানা সংস্কারের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। যথা— রোগ শোক থেকে মুক্তি পেতে মহাদেবের পূজা, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য মহাদেবের আরাধনা, শিশু রক্ষাকর্তা হিসাবে মহাদেবের মানত, গৃহপালিত পশুপক্ষী সুস্থ থাকা, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহাদেবের পূজাচার এসে যায়। এমনকি কুমারী মহিলাগণ মনের মত স্বামী পেতেও মহাদেবের বারব্রতাদি করেন। চব্বিশ পরগণার জনসমাজে শিব বা মহাদেবের উপাসনা ব্যাপক ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এক সময় এই অঞ্চলে শৈব সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। যার অবশেষ বর্তমান বিশেষত এই অঞ্চলের নাথ ও যুগী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এখনও এঁরা নিজেদের শিব গোত্র বলে পরিচয় দেন। শিবকে নিয়ে লোককথার অন্ত নেই। বিশেষত যে কোন পালাগানের আসরে শিব বন্দনা তো থাকেই তাছাড়া মহাদেবকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা পৃথক গান। মহাদেবকে নিয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন পালাগানের মধ্যে চাষী মহাদেবের পালা অন্যতম।

লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানীগণ মনে করেন মহাদেব আর্যপূর্ব যুগ হতে এ অঞ্চলের মানুষের নিকট পূজিত। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত পশুপতির শীলমোহর দেখে তাঁদের অনুমান সিন্ধু সভ্যতার যুগে শিব পশুপতি রূপে পূজিত হতেন। চব্বিশ পরগণার লোক বিশ্বাসে শিবের সাথে সিন্ধু সভ্যতার উৎখননে প্রাপ্ত পশুপতি মূর্তির অনেক সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তাছাড়া মহাদেব বা শিব কেবল চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক বা লৌকিক দেবতা নন, ইনি সমগ্র ভারতবর্ষের সব শ্রেণীর হিন্দুর নিকট বহুরূপে পূজিত দেবতা। ভারতবর্ষের বহু মানুষের জীবন সম্পৃক্ত নানান আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর ঠাঁই বহুকাল আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত। মহাদেবকে নিয়ে

সৃষ্টি হয়েছে নানা ব্রত কথা, ছড়া, ধাঁধা, গান, কথকতা, পালাগান ইত্যাদি। বিশেষত মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারায় ও শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে অনেক কবি শিবকে নানা ভাবে চিত্রিত করেছেন। বাংলা লোকায়ত পালাগানে শিব নিতান্ত বাঙালী রূপে বর্ণিত হয়েছেন। এইক্ষেত্রে তাঁর দেবত্ব মাঝে মধ্যে উঁকি দিলেও মানবধর্মই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় জলা জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে জেলে সম্প্রদায় বা মৎস্য শিকারীগণ মাকাল ঠাকুরের পূজা করেন। মাকাল শব্দটি মহাকাল শিবের নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহাকাল শব্দ থেকেই ধ্বনি লোপ হেতু মাকাল শব্দের উৎপত্তি। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে মহাদেবের সংস্কারগত বিভিন্ন পূজাচারের মধ্যে মাকাল ঠাকুরের পূজার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া এই অঞ্চলে প্রচলিত মহাদেবের চাষ পালার মধ্যে মাকাল দেবতার পূজার ইঙ্গিত আছে। জেলে সম্প্রদায় মূর্তিহীন মাটির বেদীকে মাকাল ঠাকুরের থান কল্পনা করে পূজা করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মাটির বদীর উপর কাদা মাটি দিয়ে একটি বা দুটি আবক্ষমূর্তি তৈরি করা হয়। মূর্তি অতি সাধারণ ও নির্মাণ পদ্ধতি অতি সহজ। পুকুরের খোল থেকে আঠাল পাঁকমাটি অল্প নিয়ে দুই হাতের তালুতে রগড়ে চার ছয় ইঞ্চি লম্বা ও দুই তিন ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত করা হয়। তারপর তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের কিঞ্চিৎ চাপ দিয়ে নাক ও চোখ করা হয় যা অনেক খানি শিবলিঙ্গেরই মত। এইরূপ মূর্তি তৈরি পদ্ধতি কুষান যুগের বলে কথিত হয়। এটিই মাকাল ঠাকুর। চব্বিশ পরগণায় মাকাল ঠাকুরের মূর্তির ভিন্নতাও দেখা যায়। পুকুর বা ভেড়ি ছেঁচার সময় বা ব্যাপক ভাবে মাছ ধরার সময় জেলেরা পুকুরের খোলে মাকাল ঠাকুরের মূর্তি গড়ে পূজা করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পুকুর সেচন শুরু হলে পুকুরের খোলে কোন এক স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মাটির বেদীর উপর ভাঁড় উপুড় করে দেওয়া হয়। এটিই মাকাল ঠাকুরের মূর্তি বলে কথিত হয় এবং একেই পূজা করা হয়। যতদিন মাছ ধরা কাজ না শেষ হয় ততদিন এই পূজা চলে। মাকাল ঠাকুরের স্থায়ী আবক্ষ বা কেবল মুণ্ডমূর্তিও পূজিত হতে দেখা যায়। মাকাল ঠাকুরের মুণ্ডমূর্তি অনেকখানি প্রচলিত অসুরের মুখের ন্যায়। দেবতার কাঁধ পর্যন্ত কালোচুল, বিশাল ঝুলন্ত গোঁফ, বিস্ফারিত চোখ, কানে কুণ্ডল ও গলায় গলাপটি। এরূপ মূর্তি উত্তর চব্বিশ পরগণায় 'ভেড়ি অঞ্চলে' দেখা যায়।

পুকুরের খোলে মাকাল ঠাকুরের পূজা ও গ্রামাঞ্চলে শিবের লৌকিক পূজার মধ্যে সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়। মাকাল ঠাকুরের পূজার প্রধান উপকরণ বাতাসা। হাজত দেওয়ার মত করে রেকাবি বা কাগজের ঠোঙায় বাতাসা দেবতার কাছে বসিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ফলমূল, চিনির সন্দেশ বাটায় করে বা কলাপাতায় বেদীর সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়। ধূপ প্রদীপ জ্বালা হয়, কিন্তু সন্ধ্যাকালে অবশ্যই দেবের কাছে একটি বিচালী (খড়) জ্বালা হয়। কোন ব্রাহ্মণ পূজা করেন না। বাড়ির যে কেউ বা যারা মাছ ধরে তারাই এই পূজানুষ্ঠান করে। শিবের পূজাতেও অনুরূপ পূজাপদ্ধতি আছে। শিবের পূজায় বিশেষত গাজনের সময় বাতাসার ডালা দেওয়া ও খড়ের আগুন জ্বালান হয়।

মাকাল ঠারকুকে গণেশ রূপেও কল্পনা করা হয়। প্রচলিত লোককথায় উল্লেখ আছে

গৌরীর কোলে শিশু গণেশ আছেন, এমন সময় শনি তাঁকে দেখতে এসেছেন। শনির দৃষ্টি মাত্র গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়ে জনক রাজার হাতে পড়ে। জনক রাজা তখন সরোবরে ডুব দিয়ে পর জল হাতে সূর্যের ধ্যান করছিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি ঐ মুণ্ডটি সরোবরের খোলে জল ছাড়া করে রেখে স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করেন। সেই থেকেই উল্লিখিত মুণ্ডটি মাকাল ঠাকুর রূপে পূজিত হয়। এক্ষেত্রেও দেখা যায় মাকাল ঠাকুর শিবের একটি অংশ বিশেষ।

প্রচলিত পালাগানে শিবের চাষ পালায় দেখা যায় মৎস্য শিকারী রূপে মহাদেব ও গৌরী দেবীকে। তাঁরা যেমন ধানক্ষেত সেচন করে মাছ ধরেছেন তেমনি সেই মাছ মাথায় করে নিয়ে বিক্রি করতে বেরিয়েছেন। অনুমান করা যায় সেই কারণে জেলে সম্প্রদায় হর-গৌরীকে জেলেদের দেবদেবী রূপে কল্পনা করে পূজা দেন এবং প্রচলিত লোকবিশ্বাস, পুকুরের মধ্যে মাকাল ঠাকুরের যে দুটি মূর্তি কল্পনা করা হয় তার একটি মাকাল বা মহাকাল শিব এবং অপরটি তাঁর স্ত্রী গৌরী।

সুতরাং গভীর গবেষণা সাপেক্ষে ও লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় মাকাল ঠাকুরের পূজা ও লৌকিক হরগৌরী পূজা এক ও অভিন্ন। সম্প্রদায় ভেদে শিবের পূজার যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে মাকাল ঠাকুরের পূজা একটি। চব্বিশ পরগণার জেলে সম্প্রদায় মাকাল ঠাকুরের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে আর্যেতর জাতির আরাধ্য দেবতা মহাকাল শিবকেই পূজা করেন।

মাকাল ঠাকুরের যুগ্ম মূর্তির ভিন্ন তাৎপর্য আছে। মাকালঠাকুরের কাদার যুগ্ম কাল্পনিক মূর্তি দেবদেবী সম্পর্কিত নিরাকার ভাবনার অবশেষ রূপে ধরা যায়। যা খ্রীস্টপূর্ব যুগের বলে অনুমান করা হয়। কাদার যুগ্মমূর্তি নারী ও পুরুষ যেমন ভাবা যায় তেমনই একটি অপরটির অনুচর রূপেও কল্পনা করা যায়। যেমন দক্ষিণরায়ের অনুচর কালিকারঞ্জন বনবিবির অনুচর শাজঙ্গুলী, মহাদেবের অনুচর নন্দিভৃঙ্গী, ধর্মঠাকুরের অনুচর কালুরায় ইত্যাদি। সুতরাং মাকাল ঠাকুরের যুগ্ম মূর্তি উল্লিখিত দেবদেবীর আদিতম ধারার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ। যেহেতু প্রাচীন মৎস্যজীবি সম্প্রদায় আদিম জনগোষ্ঠীর একটি শাখা রূপেই বিবেচিত হয়।

চব্বিশ পরগণায় সমৃদ্ধ পালাগানগুলির মধ্যে দেবপালা চাষী মহাদেব অন্যতম। কিভাবে মর্ত্যে ধানচাষ শুরু হল এবং ভাল ফসল পেতে হলে কিভাবে চাষ করতে হয় সে কথা এই পালাগানে আছে। সর্বোপরি এই পালার মধ্যে আছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাঙালী কৃষক পরিবারের জীবন্ত চিত্র। মহাদেব মানুষের অন্নের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে চাষ শুরু করেন। তাই দেখে মর্ত্যবাসী ধান চাষ করতে শেখে ও তাদের অন্নের অভাব ঘুচে যায়, এটিই এই পালার প্রতিপাদ্য বিষয়।

মহাদেবের চাষ পালার মধ্যে কৃষি সভ্যতার প্রথম যুগের প্রতি ইঙ্গিত আছে। বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে ধান চাষের সূত্রপাত কিভাবে হল তারই কথা এই পালার প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই সাথে জড়িয়ে আছে মহাদেব ঘরনী গৌরীদেবীর কথা। গৌরীদেবী অন্নপূর্ণা রূপে ভক্তের

কাছে তথা এই অঞ্চলের লোকসমাজে পরিচিতা। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা। মর্ত্যবাসীর ক্ষুধার অন্ন জোটানোর জন্য তিনি তৎপর। লোকবিশ্বাসের দেবীঅন্নপূর্ণা (মতান্তরে অন্নপূর্ণার কন্যা) পরবর্তীকালে দেবী লক্ষ্মী রূপে পূজিতা হন। লক্ষ্মীকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বহু লোককথা, ব্রত, ছড়া, পালাগান ইত্যাদি। এ বিষয়ে দেবীপালা—লক্ষ্মী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পুরাণে অন্নপূর্ণাকে মহামাতৃকা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। এই বিশ্বাসে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ দেবী অন্নপূর্ণাকে তাদের জীবন জীবিকার নানা সংস্কারের মধ্যে বন্দী করে ফেলেছেন। সুতরাং মহাদেব ও তাঁর ঘরনী দেবী অন্নপূর্ণা স্বাভাবিক ভাবে এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি সংক্রান্ত নানা সংস্কারের সাথে মিশে গেছেন। কৃষি সংক্রান্ত নানা জাদুবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ মহাদেব ও দেবী অন্নপূর্ণার পূজা করেন।

মহাদেবের চাষ পালায় দেখা যায় মহাদেব স্বর্গ থেকে বল্লুকা নগরে এসেছেন কৃষি কার্যের নিমিত্ত। প্রথমে তিনি এলেন ধীবর সম্প্রদায়ের মধ্যে, মৎস্য শিকার যাদের পেশা। এই লোককথার মধ্য দিয়ে যে সত্য প্রতীয়মান হয় তা হল কৃষি সভ্যতা বিকাশের প্রাক্কালে পূর্ব ভারতের বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল মৎস্য শিকার। জলা জঙ্গল অধ্যুষিত নদী নালার দেশ এটি। সুতরাং তাদের প্রধান জীবন জীবিকার ক্ষেত্র নদী ও জঙ্গল। এই পালাগানে সেই কল্পনার ইঙ্গিত আছে এবং পালাগানে বাঘ, জঙ্গল, নদী পারাপার, মৎস্য শিকার, চাষ ইত্যাদির কথা আছে। পালাগানটির মধ্যে কিছু আধুনিকতার প্রলেপ আছে। পালাটি লোককথা জাত। এর উৎস সুদূর অতীতে কৃষি সভ্যতার প্রাক্কালে, যখন সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তার আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল ক্ষেত্রজ সন্তান স্বীকার করে নেওয়ার ইঙ্গিত ও মহাদেবের চাষ পালায় আছে। পঞ্চানন্দ রেবতী কুচনীর ক্ষেত্রজ সন্তান। এই সন্তানকে মহাদেব স্বীকার করেছেন ও কার্তিক গণপতির সমতুল্য বলে মেনে নিয়েছেন। পালাগানের কাহিনী অংশে এই অঞ্চলের তথা বাঙালীর সমাজ বিবর্তনের ইঙ্গিতটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মহাদেবের চাষ পালায় চব্বিশ পরগণা তথা বাঙালী কৃষক পরিবারের চিত্র খুব সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষি নির্ভর এই অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার চিত্র বহন করে চলেছে পালা গানটি। কৃষি কর্মের দৌলতে বাঙালীকে অনেক ক্ষেত্রে প্রবাসী বা পরবাসী হয়ে থাকতে হয়। প্রচলিত কথায় যাকে আবাদ করতে যাওয়া বলে। পরবাসে থাকাকালীন সেখানে নতুন সংসার পাতার ইতিহাস বাঙালীর সমাজ জীবনে নতুন নয়। এমন বহু উদাহরণ বাস্তবে সংগ্রহ করা সম্ভব। তারপর পূর্ব স্ত্রীর প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় স্বামীর প্রত্যাবর্তন বাঙালীর কৃষি নির্ভর সমাজ জীবনের আকছার ঘটনা। ঠিক এই চিত্রটাই মহাদেবের চাষ পালায় বর্তমান। কৃষিকর্মের নিমিত্ত দেব ভোলানাথ মর্ত্যে এলেন। এখানে কুচনীর প্রেমে পড়ে নিজের ঐতিহ্যময় জীবনের কথা ভুলে গেলেন। স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা ভুলে কুচনীদের পরিবেশে থেকে কুচনীর সাথে সহবাস করলেন। তারপর অবৈধ সন্তান

পঞ্চানন্দকে নিয়ে কুচনী মাতার চিন্তা, মহাদেব কর্তৃক তার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা, এ সবই তো বাঙালী লোকসমাজের এক শ্রেণীর কৃষক জীবনের জীবন্ত ছবি। তারপর দেব ভোলানাথকে বিপদ থেকে ফিরিয়ে আনতে দেবী অন্নপূর্ণার ছলচাতুরী মূলক যে প্রয়াস, এ সবই বাঙালী পরিবারেই মেলে। এখানেই এ পালাগানের সার্থকতা ও সাহিত্য মূল্য। শিবদুর্গা এই পালাগানে আর কৈলাসের দেবদেবী নয়, এঁরা মর্ত্যের সাধারণ কৃষক পরিবারের মানব মানবী। বাঙালী কবিগণ ধর্মের মোড়কে বাঙালী জীবনের কথাই বলেছেন। পালাগায়কগণ চারণ কবির মত দিকে দিকে দেশে দেশে বাঙালীর এই জীবনগাথা গেয়ে বেড়ান। মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকবি হরপার্বতীর দোহাই দিয়ে বাঙালীর সমাজ জীবনের নানান চিত্র প্রকাশ করেছেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় রামায়ণ মহাভারত যেমন সমগ্র ভারতবাসীর জীবনালেখ্য ঠিক তেমনি চব্বিশ পরগণার প্রচলিত পালাগানগুলি বাঙালীর জীবনালেখ্য। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালীর সামাজিক ভাবাদর্শ বাংলার লোককথায়, গানে, পাঁচালিতে, প্রবাদ প্রবচনে প্রতিপালিত হওয়ায় বাঙালীর সমাজ জীবনের মূল কাঠামোর তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। সেই দিক থেকে বিচার করলে মহাদেবের চাষ পালা বাংলা সাহিত্যের এক ঐতিহ্যময় অধ্যায়।

মহাদেবের চাষ পালা গাওয়া হয় মনসার পালাগানের সাথে। মনসার গানের দেব অংশ গাইতে গিয়ে পালাগায়কগণ এই অংশটি গেয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে পৃথক রূপেও এ পালা গাওয়া হয়। সেক্ষেত্রে পালাগায়ক মহাদেবের চাষপালা ও দেবী দুর্গার শঙ্খ-পরিধান পালাটি সাধারণত গান করেন। মনসার পালা গাওয়ার সময় এ পালাটি প্রায় প্রতিটি পালাগায়কই গান করেন। ফলে বিভিন্ন পালাগায়কের নিকট মহাদেবের চাষ পালার মূল ঘটনা প্রায় এক থাকলেও পরিবেশনগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

মহাদেবের চাষ পালার প্রকৃত লেখক কে জানা যায় না, বিভিন্ন মঙ্গলকবি তাঁদের কাব্যে মহাদেবের কৃষিকর্মের কথা উল্লেখ করলেও পালাগানের বর্তমান রূপটি পালাগায়কদের নিজস্ব। আরও লক্ষণীয় যে, প্রতিটি পালাগায়ক এই গান করেন নিজস্ব ঢঙে বা নিজস্ব রীতিতে। মূল কাঠামোর সাথে পরস্পর মিল থাকলেও কথা, গান, পরিবেশন কৌশল এক নয়। রঙ্গ রসিকতায় বাদ্যি বাজনায় পালাটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তবে এগানের আসরেও পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের উপস্থিতি অধিক। বর্ণ হিন্দু অপেক্ষা নিম্নবর্ণের হিন্দু পরিবারে এই গানের কদর বেশি। গায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের হিন্দু।

পূর্বে উল্লেখ করেছি মনসামঙ্গলের প্রতিটি পালাগায়ক মহাদেবের চাষ পালা গান করেন। সেগুলি মনসামঙ্গলের সাথে একান্ত ভাবে সম্পৃক্ত। এছাড়া পৃথক ভাবে দুটি পালা সংগৃহীত হয়েছে। পালা দুটির নামকরণ ও কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য আছে। একটি পালার নাম 'মহাদেবের চাষ পালা'। পালাটি সংগৃহীত হয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামের শ্রী অনিল কুমার হাজরার নিকট হতে। অপর পালাটির নাম 'চাষী মহাদেব' পালাটি সংগৃহীত হয়েছে বিষ্ণুপুর থানার মৎস্যখালি গ্রামের শশধর মহিষের নিকট হতে। পালা দুটি

বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবল মহাদেবের চাষ পালাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভেবে উৎকলিত হল। পালাটি নিম্নরূপ —

মহাদেবের চাষ পালা

ব্রহ্মা পৃথিবী সৃজন করার পর তেত্রিশ কোটি দেবতা মর্ত্যে এলেন ব্রহ্মার সৃষ্টি দেখতে। সবাই তাঁর সৃষ্টি দেখে খুশি হয়ে ফিরে গেলেন কিন্তু দেবী ভগবতী খুশি হলেন না। তিনি কৈলাসে ফিরে গিয়ে মহাদেবের চরণ তলে বসে বলতে লাগলেন—

গৌরী : প্রভু মর্ত্যধামে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখি সমস্ত নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে ফিরছে। কেউ গাছের পাতা খাচ্ছে, কেউ গাছের ছাল চিবুচ্ছে। কেউ বা নদীনালার জল খেয়ে পড়ে আছে। আমাকে তারা জগৎজননী বলে ডাকল, কিন্তু আমি তাদের মুখে আহার তুলে দিতে পারলাম না। ওদের অন্নের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে প্রভু।

মহাদেব : না ভাব না ভাব গৌরী না ভাবিয়ো মনে। ওদের খাদ্যের লাগি আমি চাষ করিব বল্লুকাসদনে।

দেবী : তাহলে আপনি নারদকে নিয়ে চাষের ব্যবস্থা করুন।

মহাদেব : মর্ত্যে আমাকে চাষ করতে যেতেই হবে। নরলোক কৃষিকার্য জানে না। খাদ্যের জন্যে তাদের চাষ শেখান প্রয়োজন। তাই আমি বল্লুকাতে চাষ করতে যাব। বাবা নারদ আমি বল্লুকাতে চাষ করতে যাচ্ছি নরলোকের আহার সৃজনের জন্য, তুমি আমার সঙ্গে যাবে বাপ?

নারদ : ঠিক আছে মামাবাবু, আমি এখনই নরলোকে আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত।

মহাদেব : তাহলে ওখানে বাঁশখুঁটি নিয়ে একটা কুঁজি ধুকড়ি করে তো থাকতে হবে?

কথা ।। মহাদেব এই কথা বলে বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে চাষের সরঞ্জাম তৈরি করে দিতে বললেন। কুবেরের কাছ থেকে বীজধান নিলেন তারপর কিছু বাঁশ খুটি নিয়ে নারদকে সাথে করে মর্ত্যে গেলেন চাষ করতে।

গীত ।। চাষ করিতে যায় ভোলানাথ বল্লুকার কূলে গো
কোথায় আছ গৌরী দেবী দাওনা শঙ্খের ধ্বনি গো
আগে চলে দেব ভোলানাথ শেষে নারদ ভাগ্নে গো
বল্লুকার কূলে আসি তারা উপনীত হল গো।

নারদ : মামাবাবু আজ আমরা বল্লুকার কূলে এসে গেছি। আমাদের এবার চাষের কাজ শুরু করতে হবে। ভাল দিন দেখে আমাদের হাল পুণ্য করতে হবে।

কথা ।। এই কথা শুনে মহাদেব হাল পুণ্যের ব্যবস্থা করলেন। তিনি কাম ও ক্রোধ নামে দুটি বলদ সৃষ্টি করে হাল জুড়ে দিলেন। এক পাক দুই পাক তিন পাক কালে, দেব ভোলানাথ গোধনের পৃষ্ঠে বাড়ি মারেন। হাম্বা রবে গরু ডাকে আর ভোলানাথকে এই কথা বলে, একি দেব, আপনি যদি আমাদের পৃষ্ঠে বাড়ি মারেন তাহলে সাধারণ লোকে কি করবে।

না ভাব না ভাব বলদ না ভাবহে মনে
তেত্রিশ কোটি দেবতা পাঠাব তোমাদের লোমকূপের সনে।

গীত ।। একে একে দেবগণে ডাকে ভোলানাথ গো
মুখে তাদের মলয় আর গণ্ডে ওষ্ঠে ধারা গো।
কপালেতে চন্দ্র বসে নয়নেতে তারা গো।
সামনের পায়ের তলার উপর জাহ্নবীর আসন গো
শিঙ্গতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ নিশ্বাসে পবন গো।
কর্ণেতে ঐ কর্ণ বসে সর্ষের তলায় গো।
বিষাণেতে ভীমার্জুন আছে ডাইনে আর বামে গো (?)
গো খুরেতে গঙ্গা আছে বুঝতার সাথে গো (?)
নাভিতে পার্বতী বসে গোবরেতে লক্ষ্মী গো।
ডান পাঁজরে বিষ্ণু বসে বাম পাঁজরে শিব গো।
তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে গোরুর দেহেতে গো।

মহাদেব : তাই বলছি নারদ, আজ থেকে হালপুণ্যের দিন যে গোরুর পৃষ্ঠে বাড়ি মারবে তার জন্ম ঐ চামারের ঘরে হবে। তুমি যেন কোন দিন মের না বাবা।

গীত ।। হাল জোড়ে হাল জোড়ে দেব ভোলানাথ গো
শিঙ্গা বাজায় দেবভোলা বাঁশের উপর বসে গো
এক চাষ, দুই চাষ তিন চাষ দিল গো।

নারদ : মামাবাবু এবার আপনার আর একটি কাজ করতে হবে; ধানের ধামা মাথায় করে মাঠে ছড়াতে হবে।

মহাদেব : ওরে বাবা এই ভুঁড়ির ভারে নড়তে পারছি না, জটার ভারে মাথা তুলতে পারছি না, তার উপর যদি ধানের ধামা মাথায় দাও আমার ভুঁড়ি এবার বাস্ট হয়ে যাবে বাবা!

নারদ : মামাবাবু একবার দেখুন চেষ্টা করে।

মহাদেব : তবে নারদ যখন বলছে, দেখি একবার চেষ্টা করে। দাও দেখি মাথায় তুলে।

কথা ।। ধান্যের ধামা মাথায় নিয়ে দেব ভোলানাথ মাঠে এলেন, আর মনের হরিষে দেব ভোলানাথ তা মাঠে ছড়াতে লাগলেন।

নারদ : মামা ধান্য ছড়ান তো হল, বৃষ্টি না হলে কেমন করে ধানগাছ বার হবে। আপনি বরং বরুন দেবকে স্মরণ করুন। তাহলে বৃষ্টি হবে, এবং ধানগাছ ফুঁড়ে বের হবে

কথা ।। দেব ভোলানাথ তখন সেই খেতের আলে বসে ইন্দ্রের স্মরণ করলেন। আর মুষল ধারে বলুকার কূলে বৃষ্টিপাত হয়েছিল। সেই বৃষ্টির জলে ধান গাছ বার হল এবং দিনে দিনে বাড়তে লাগল। নারদ বেটা তখন সেই জমির কিছুটা কাদা করেছিল।

নারদ : মামাবাবু জমি কাদা করেছি এবং বীজও বড় হয়ে গেছে। এবার আপনার একটা কাজ করতে হবে। বীজ তুলে বীজ রোপন করতে হবে।

মহাদেব : ওরে বাবা। ভুঁড়ির ভারে দম আসছে না, তার উপর যদি মাথা নিচু করে বীজ তুলে বীজ রুইতে যাই তাহলে পোঁটা পাঁটি সব বেরিয়ে যাবে বাবা!

নারদ : তবু একবার চেষ্টা করে দেখুন মামাবাবু।

মহাদেব : আচ্ছা বাবা নারদ তুমি যখন বলছ তাহলে দেখি একবার চেষ্টা করে।

কথা ।। দেব ভোলানাথ মাঠ থেকে বীজ ভেঙে রোপন করতে গিয়ে বড় কষ্ট হওয়ায় বসে পড়েছেন জমির আলে।

নারদ : কই মামাবাবু, আপনি বসে গেলেন ? আগে আপনাকে রোপণ করতে হবে।

মহাদেব : সব কাজ কি আমাকে দিয়ে করাবে নারদ ?

নারদ : সেকি মামাবাবু, আপনি নরলোকের চাষ শেখাতে এসেছেন তাই তো আগে আপনাকে বীজ রোপণ করা দরকার।

মহাদেব : তাই তো বাবা নারদ, বার বার আমি বিস্মরণ হয়ে যাচ্ছি যে আমি নরলোকে শিক্ষা দিতে এসেছি, আমাকেই তো আগে চাষ করা দরকার। চল বাবা, এখনই শুরু করা যাক।

গীত ।। ধান্য রোপণ করে আমার দেব ভোলানাথ গো
আগে রোপণ করে ভোলানাথ শেষে নারদ ভাগ্নে গো
মামাভাগ্নে চাষ করে বল্লুকার কূলে গো।

কথা ।। এমন সময় চার কুচনী তথায় জলকেলি করতে লাগল, মহাদেবকে দেখে তারা বলতে লাগল।

১ম : ঐ দেখরে দিদি ঐ একটা বুড়ো চাষ করছে।

২য় : লোকটা বুড়ো হলে কি হবে দেখতে খুব সুন্দর রে।

১ম : হ্যাঁ গো দিদি, তাই তো দেখছি, লোকটি পেকে একবার ঝুনি নারকেল হয়ে গেছে। বলি ওর উপর তোর মন পড়ে গেল নাকি ?

২য় : আচ্ছা ঐ বুড়োকে আমাদের বাড়ি ডেকে আনলে হয় না?

১ম : তোর যখন মন পড়ে গেছে তাহলে ডেকে আনলেও হয়। চল আমরা সবাই গিয়ে ডেকে আনি।

কথা ।। এই বলে তারা সবাই মহাদেবের কাছে গিয়ে বলছে—

কুচনী : ওগো ঠাকুর আপনি এখানে কি করতে এসেছেন?

মহাদেব : চাষ করতে এসেছি নরলোকের অন্নের সৃজনের জন্যে।

কুচনী : আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন?

মহাদেব : তোমাদের বাড়ি কোথায়? তোমাকে তো আমি চিনি না, তোমার নাম কি ?

কুচনী : আমার নাম রেবতী কুচনী। ঐ গ্রাম দেখতে পাচ্ছেন ওখানেই আমাদের ধাম।

মহাদেব : আমি কাল সকালে তোমাদের বাড়িতে যাব।

কথা ।। নিমন্ত্রণ দিয়ে চার কুচনী বাড়িতে এল। দেব ভোলানাথ কুচনী বাড়িতেযাবেন তাই নারদকে ডাকলেন।

মহাদেব ঃ বাবা নারদ আমার জন্যে রান্না কর, আমি কুচনী পাড়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসি।

নারদ ঃ কুচনী পাড়ায় কেন মামা ? ওখানে গেলে চেলি কাঠ দিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে।

মহাদেব ঃ তোমরা আমাকে কেবল মন্দ ভাব। ওরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি যাব আর আসব। তুমি রান্না-বান্না করে রাখ বাপ।

কথা ।। এই বলে ভোলানাথ রেবতী কুচনীর বাড়ির দিকে চললেন। দেবকে দেখতে পেয়ে রেবতী কুচনী বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে এল। দেবমহিমা জগতে কে বুঝতে পারে।

দেব ভোলানাথের স্পর্শে রেবতীর জঠরে পঞ্চানন্দ দিনে দিনে বাড়ে
দশ মাস দশ দিন যখন পূর্ণ হয়ে ছিল
রেবতীর জঠর হতে পঞ্চানন্দের জন্ম হয়েছিল।
চার কুচনী তখন পরস্পরকে ডেকে কহিতে লাগিল।

কুচনী ঃ ও দিদি, একি ব্যাপার হল গা? রেবতীর একটা ছেলে হয়েছে গো। কোথা থেকে এক বুড়ো এল আর সেই থেকে রেবতীর এই অবস্থা।

অন্য কুচনী ঃ এমা এতো তাহলে ঢ্যামনা ছেলে। একে তো আমাদের সমাজে রাখা যাবে না। একে ব্যানাবনে ফেলে দিয়ে আসা ভাল।

কথা ।। এই কথায় সবাই সম্মত হয়ে কাপড় জড়িয়ে ব্যানাবনে ফেলে দিয়েছিল। সূর্যদেব তা দেখে থাকতে না পেরে তার গায়ে কিরণ দিয়েছিলেন। দেব পঞ্চানন্দ নীলবর্ণ হয়েছিলেন। তার উপর সূর্যের কিরণ পড়ে দেব পঞ্চানন্দের দেহ রক্তবর্ণ হল। ধ্যানে ছিলেন দেবভোলানাথ তা ধ্যানেতে জানলেন। ব্যানাবন থেকে পঞ্চানন্দকে নিয়ে কুচনী গৃহেতে এল। সেই সুযোগে নারদ ব্যাটা পঞ্চানন্দকে ডেকে বলতে লাগলেন।

নারদ ঃ মামা আমাকে একা কুটীরে রেখে আপনি কুচনী পাড়াতে কাল কাটাচ্ছেন আর কুচনীর হাতে খাচ্ছেন? আমি চললুম কৈলাসে। সেখানে গিয়ে মায়ের কাছে সব কথা বলব।

মহাদেব ঃ না বাবা, তোর মামিমার কাছে এসব বললে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

কথা ।। নারদ মামার কোন কথা না শুনে কৈলাসে গিয়ে মহামায়াকে বলতে লাগলেন—

নারদ ঃ সর্বনাশ হয়েছে মামিমা সর্বনাশ হয়েছে। মামা বল্লুকায় চাষ করতে গিয়ে এক কুচনীর বাড়ি গিয়ে উঠল আর কুচুনীর হাতে খেল।

মহামায়া ঃ তাহলে কি উপায় হবে বাবা নারদ। আমার উপায়?

নারদ ঃ আপনি এক কাজ করুন মামিমা। মশা মাছি সৃষ্টি করে বল্লুকায় প্রেরণ করুন। মশা মাছির কামড় সহ্য না করতে পেরে মামাবাবু চলে আসবেন।

কথা ।। এই কথা শুনে মা ভগবতী গায়ের ময়লা তুলে মশামাছি সৃষ্টি করে বল্লুকায় পাঠালেন, আর রেবতী কুচনীর ঘরে শুয়েছিল মহাদেব, মশার কামড়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে রেবতীকে এই কথা বলেন।

মহাদেব ঃ রেবতী, বলতে পার আমার পায়ে কি এমন কামড়াল। জ্বালায় আমার নিদ্রার

ব্যাঘাত হল। আমি জানতে চাই কে ঐ কীট পতঙ্গের সৃষ্টি করেছে। বুঝতে পেরেছি মহামায়া আমার ফেরানর জন্য মশা মাছি সৃষ্টি করে এখানে পাঠিয়েছে। তুমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাও আমি এর ব্যবস্থা করছি।

কথা ।। এই কথা বলে দেব ভোলানাথ শিমুল গাছ সৃষ্টি করলেন। সেই গাছের তুলা থেকে সূতা তৈরি করে মশারি নির্মাণ করে মশাকে জব্দ করেছিলেন। এই কথা নারদ আবার কৈলাসে গিয়ে মহামায়াকে জানালেন।

মহামায়া ঃ বাবা নারদ, তোমার মামাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না? আমার উপায় কি হবে বাবা?

নারদ ঃ আপনি জোঁকা জুঁকি সৃষ্টি করে বল্লুকায় ছেড়ে দিন। কুচনীদের নিয়ে যখন মামাবাবু জল কেলিতে নামবেন সেই সময় জোঁকের কামড় সহ্য করতে না পেরে আপনার কথা মনে করবেন এবং ফিরে আসবেন।

কথা ।। নারদের কথা শুনে দেবী পায়ের ময়লা তুলে জোঁকা জুঁকি সৃষ্টি করে বল্লুকায় ছেড়ে দিলেন। দেব ভোলানাথ যখন কুচনীর সাথে পদ্মবনে স্নান করতে এলেন তখন দারুণ জোঁক দেবের পায়ে ধরল। লম্ফ দিয়ে ডাঙ্গায় উঠে রেবতীকে বলতে লাগলেন বলতে পার কুচনী আমার পায়ে কি এমন কামড়াল। দেহের রক্তে জল লাল হয়ে যাচ্ছে? আমি জানতে চাই কে এমন জীব সৃষ্টি করেছে।

মহাদেব ঃ বুঝতে পেরেছি রেবতী, দেবী ভগবতী আমার ফেরানর লাগি জোঁক সৃষ্টি করে পাঠিয়েছে। তুমি সরে যাও আমি জোঁকের যম সৃষ্টি করছি।

কথা ।। এই বলে মহাদেব নুনের কেয়ারী তৈরি করে জোঁকের মুখে ধরে ছিলেন। নুনের ভয়ে জোঁক তখন দূরে সরে গেল। সেই সুযোগে নারদ কৈলাসে গিয়ে মামিমাকে সব কথা বললেন। তখন দেবী ভগবতী অবাক হয়ে নারদের কাছে আবার পরামর্শ চাইল।

নারদ ঃ এত করেও যখন দেবাদিদেবকে ফেরান গেল না তাহলে আর একটি পথ আছে। আপনাকে বাগদিনীর বেশে সেখানে যেতে হবে।

দেবী ঃ কি করে বাগদিনী সাজতে হয় তা তো আমি জানি না বাবা। তুমি তাহলে বল কি করে বাগদিনী সাজব।

নারদ ঃ তবে আমার কথা শুনুন জননী

গীত ।।

বাগদিনী সাজ সেজে চল গো উমা সঙ্গে চল
কাঁখে নেমা কেলে হাঁড়ি হাতে নেমা ছেঁকনী জাল।
হাতে নে মা ভাঙ্গা সরা তাতে করে সেঁচবি জল।
পথের মাঝে জিজ্ঞাসিলে বোলো গো মা তুমি
গৌরী বাগদিনী আমি পাগল ভোলা স্বামী
গলে তার হাড়ের মালা পরনেতে বাঘ ছাল।

দেবী ঃ বাবা নারদ আমি তো আর পথ চলতে পারছি না বাপ।

নারদ : আর বেশি দূর যেতে হবে না মা, আমরা বল্লুকানগরে এসে গেছি।

দেবী : একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বাবা ? রাস্তার দুদিকে ঐ সবুজ গাছগুলো কি গাছ?

নারদ : বা-বা! অন্নদায়িনীমা দেবীঅন্নপূর্ণা অন্নগাছ চিনতে পারছেন না। আমি আর দেবাদিদেব ভোলানাথ যে ধান চাষ করতে এসেছিলাম এ সেই ধানগাছ মা। এর মধ্যেই শস্য জন্মাবে আর সেই শস্য খেয়ে নর জীবনধারণ করবে। ঐ দেখুন মা নরলোক ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে।

দেবী : তাহলে এর নাম ধানগাছ ? কিন্তু আর কতদূর গেলে তোমার মামাবাবুর দেখতে পাব বাবা!

নারদ : ঐযে ছোট ছোট পাতার কুটির দেখা যাচ্ছে ওখানেই মামা আছেন মা।

দেবী : সে কি নারদ? যে দেহেতে আমরা চন্দনের ফোঁটা দিতে ভয় পাই সেই দেহ নিয়ে ঐ নোংরা কুঁড়ের মধ্যে তোমার মামা আছেন।

নারদ : প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা মা। রেবতী কুচনী ডাকল, মামা অমনি চলে গেলেন। রেবতীর ঘরকে দেবাদিদেব কৈলাস ধাম মনে করেছেন।

দেবী : তাহলে এখন আমার উপায় কি হবে বাবা!

নারদ : ঐ যে ধান ক্ষেতটি দেখা যাচ্ছে ওখানে নেমে আপনি মাছ ধরতে থাকুন, আমি মামাকে ফিরিয়ে আনছি মা।

দেবী : এই সুন্দর ধান আমি কি করে নষ্ট করে মাছ ধরব বাবা।

নারদ : মামাবাবু প্রাণ দিয়ে ঐ ধান গাছ সৃষ্টি করেছেন। ঐ ধানগাছে আঘাত দিলেই তাঁর হৃদয়ে আঘাত পড়বে। তখনই উনি আসবেন। নচেৎ আনা সম্ভব হবে না মা।

দেবী : তবে তুমি যাও আমি ঐ ক্ষেত্রে নেমে ধানগাছের মধ্যে মাছ ধরতে থাকি।

কথা ।। এই কথা বলে নারদ মহাদেবের নিকট গেলেন এবং মহাদেবকে বলতে লাগলেন—

নারদ : মামাবাবু, সর্বনাশ হয়ে গেল। কোথা থেকে এক বাগদিনী এসে সমস্ত ধান গাছ ভেঙে তছনছ করে দিয়ে মাছ ধরছে। শিগগির চলুন। আমি বলতে গেলাম তা কাদা হাতের চড় আমার পিঠে মেরেছে।

দেব : মার খেয়ে তুমি পালিয়ে এলে? আমার ভাগ্নে হয়ে! তোমার কথা শুনে আমারই তো লজ্জা করছে। তোমার দ্বারা চাষের কাজ হবে না বাবা। চাষ করতে গেলে কাঁচা বাঁশের লাঠি চাই। তবে তো চাষ হবে।

নারদ : লাঠি নিয়ে গেলে হয়তো লাঠি উল্টে আপনারই খেতে হবে মামা।

দেব : মারে মারুক, আমার চেহারা যা আছে তাতে দু চার ঘা সহ্য হবেকোন। তুমি বাবা নিজেকে একটু সামলে রেখ।

কথা ।। এই কথা বলে তাঁরা ধান্য ক্ষেত্রে এসে উপনীত হলেন আর মহাদেব বাগদিনীকে ডেকে বলতে লাগলেন—

মহাদেব : বাগদিনী তুমি আমার ধান ভেঙে ক্ষতি করছ কেন?

দেবী ঃ না না, আমি ধান ক্ষতি করছি না। এখানে প্রচুর মাছ, তাই সেই মাছ ধরছি।

মহাদেব ঃ যাও নদীতে গিয়ে মাছ ধর, এখানে নয়।

দেবী ঃ মাছ না ধরলে আমার সংসার চলবে না। এই মাছ না ধরে আমি কিছুতেই উঠব না।

মহাদেব ঃ বাবা নারদ, এ বাগদিনী দেখতে মন্দ নয়। মাছ ধরে ধরুক।

নারদ ঃ চাষ করতে এসে শেষে এক বাগদিনীর দিকে আপনার নজর পড়ে গেল।

দেব ঃ তুই বাবা আমাকে কেবল মন্দ ভাবিস। যে ভাল তাকে ভাল বলতে হয়। আচ্ছা দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করে দেখি। তুমি দাঁড়াও আমি ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করব।

মহাদেব ঃ বাগদিনী তোমার কে আছে ?

দেবী ঃ আমার দুটি পুত্র দুটি কন্যা আছে।

মহাদেব ঃ তাদের নাম?

দেবী ঃ ছেলে দুটির নাম কার্তিক গণপতি, মেয়ে দুটির নাম লক্ষ্মী, সরস্বতী।

মহাদেব ঃ তোমার নাম ?

দেবী ঃ আমার নাম গৌরী বাগদিনী।

মহা ঃ আমারও দুটি মেয়ে ও বউ আছে। তোমাদের নামের সাথে তাদের নাম একেবারে মিলে গেছে। তবে তোমাদের নামের সাথে যখন মিলে গেল তা একটা কুটুম্ব করবে ? সই?

দেবী ঃ কুটুম্ব করতে পারি যদি জল সেচন করে কিছু মাছ ধরে দিতে পার।

মহাদেব ঃ আমার এই ভারী শরীর ভুঁড়ির ভারে দম আসে না, জটার ভারে মাথা নুয়ে আসে আমি জল সেচন করব কিভাবে?

নারদ ঃ মামাবাবু, দেখুন একটু চেষ্টা করে।

মহা ঃ নারদ বেটা নেড়া। তুমি সরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াও। গৌরী বাগদিনী, আমি ওসব পারব না।

দেবী ঃ তবে আমিও কুটুম্ব করতে পারব না।

মহাদেব ঃ তবে দাও, একটা খোলা দাও, জল সেচন করি।

কথা ।। দেবী মহাদেবের হাতে একটা খোলা দিয়ে সরে গিয়ে জল সেচন করতে বললেন ও নিজে একটু দূর থেকে জল সেচন করতে লাগলেন। আজ দেবাদিদেব মহাদেব গৌরী বাগদিনীর প্রেমে পড়ে সরা নিয়ে জল সেচন করতে লাগলেন।

গীত ।। জল সেচন করে তখন দেব ভোলানাথ গো
এক খোলা, দুই খোলা, তিন খোলা ফেলে গো
চার খোলায় পাঁচ খোলায় ছয় খোলা ফেলে গো।
ছয় খোলা ফেলে ভোলানাথ ক্ষেত শুকায়ে ফেলে গো।

দেবী ঃ বাবা নারদ, সব জল তো সেচন করে ফেলল এখন উপায়?

নারদ ঃ আপনি পেছন থেকে আল কাটিয়ে দিন।
দেব ভোলা জল ছ্যাঁচে গৌরী কাটে আলগো।

সাত খোলা, আট খোলা নয় কোলা ফেলে গো
দশ খোলা ফেলে ভোলানাথ কোমরে দিল হাত গো।
এই রূপেতে খাবে তুমি গৌরী বাগদিনীর ভাত গো।
দেবভোলা জল ছ্যাঁচে গৌরী ধরে মাছ গো।
মাছ ধরে গৌরী তখন খাঁচা ভর্তি করে গো।

মহাদেব : বাবা নারদ, আমার জ্বর এসে গেছে বাবা।

নারদ : মামা—একি! জ্বর তো একেবারে তুঙ্গে। নাড়ী ক্ষীণ।

মহাদেব : দেখ তো বাবা, গৌরীদেবী আছে কিনা ?

নারদ : আছে মামা।

মহাদেব : তাহলে আমার জ্বর নেই। দেখ বাবা, গৌরীদেবীকে কিছু বোলো না। তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

গৌরী : আরে মশাই, আপনি জল সেঁচতে সেঁচতে বসে গেলেন? চালিয়ে যান!

মহাদেব : আমি আর পারছি না, উনি বলে ছেঁচুন।

গৌরী : আপনার বড় কষ্ট হয়েছে না। পিছনে লক্ষ্য করে দেখুন আমি কত মাছ ধরেছি। বলতে পার, এত মাছ কি হবে?

দেব : সেদ্ধ করে গল গল করে খেয়ে নাও।

গৌরী : সেকি! এত মাছ খেলে তো মারা পড়ে যাব।

দেব : তবে শুকিয়ে রেখে দাও, কাল চচ্চড়ি করে খাবে।

গৌরী : ওমা! এত মাছ শুকালে এখানে লোকজন তো গন্ধে বসতে পারবে না। তার থেকে এক কাজ করা যাক। কিছু মাছ বিক্রি করলে আমার সংসারের খরচ কিছু মিটবে। তাহলে আপনি চলুন আমার মাছ মাথায় করে নিয়ে। আমি মেয়েছেলে, মাথায় নেব কি করে?

দেব : ওরে বাপ। আমার এই ভারী চেহারা, ভুঁড়ির ভারে নড়তে পারি না, জটার ভারে মাথা নত হয়ে আসছে, তার উপর ঐ মাছ মাথায় নিলে আমার ভুঁড়ি ফেটে যাবে।

নারদ : মামাবাবু, দেখুন একবার চেষ্টা করে!

দেব : নারদ, তুমি বেটা নেড়া চুপ করে বস। আমি ওসব পারব না।

দেবী : তবে আমিও তোমার সাথে যাব না। আমি এই চললাম।

দেব : এই থাম থাম। আস্তে আস্তে আমার মাথায় ঝুড়ি তুলে দাও যেন মাছের জল গায়ে না পড়ে।

কথা ।। মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে দেব ভোলানাথ আগে আগে চলে আর পশ্চাতে দেবী গুটি গুটি যায়—

তোরা কে নিবিলো আয় আমার টাটকা চুনো পুঁটি
মাছের ঝোড়া মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যায়

এ পাড়া হতে মাতা অন্য পাড়ায় যায়
মাছের গায়ে গৌরী তখন পচা বাণ দেয়
মাছের ঝোড়া ফেলে দিয়ে প্রেমের কথা কয়।

মহাদেব : ছ্যা ছ্যা, কি দুর্গন্ধ রে বাবা। এ মাছের ঝুড়ি আমি নিয়ে যেতে পারব না।

গীত।। আজ বাগদিনী সইগো আমার কোন পাড়ায় গেল
তোমরা দেখে থাক যদি আমায় বল
আমার আসতেছিল পাছু পাছু পথ ভুলে গেল
আবার ঘুরিতে ঘুরিতে ভোলা কৈলাসেতে গেল।

মহাদেব : তুমি কেমন মানুষ, এখানে লুকিয়ে আছ। আলিঙ্গন দিতে হবে আমার। বাগদিনী নয় প্রাণনাথ, আমি তোমার গৌরী গো। তোমাকে ফিরাবার তরে বাগদিনী সেজেছি গো। লজ্জা পেয়ে দেব ভোলা হেঁট করে মাথা গো .... বাগদিনী নয়।

মহাদেব : তাহলে এখন উপায়?

দেবী : আমি আপনার চরণ পূজা করতে পারি যদি আপনি পদ্মপুকুরে স্নান করে আমার কৈলাস শিখরে প্রবেশ করেন।

কথা ।। দেব ভোলানাথ পদ্মপুকুরে স্নান করতে চললেন। যেতে যেতে আবার কুচনীর কথা মনে পড়ল। মাঝ পথ হতে আবার পদ্মপুকুরে না গিয়ে রেবতী কুচনীর ঘরে এলেন। দৃশ্য দেখে নারদ আবার মামিমার কাছে গিয়ে বলছে —

নারদ : সর্বনাশ হয়ে গেছে মামিমা, সর্বনাশ হয়ে গেছে। মামা আবার কুচনী পাড়ায় চলে গেছেন।

দেবী : তাহলে কিভাবে স্বামীকে ফেরান যাবে বাবা নারদ, যুক্তি দাও।

নারদ : মামিমা, আপনি মাঝপথে আবার মায়ানদী সৃষ্টি করুন। যাবার পথে বাধা পেলে উনি আর যাবেন না। তা ছাড়া নদী সৃষ্টি করে আপনি পাটনী সেজে থাকুন।

কথা ।। এই কথামত দেবী মাঝপথে মায়ানদী সৃষ্টি করে মাঝির মেয়ে সেজে পারাপার করতে লাগলেন। সেই ঘাটে আজ দেবভোলানাথ এসে উপনীত হলেন।

দেব : মাঝির মেয়ে, আমাকে পার করে দেবে?

দেবী : কেন দেব না? পারের কড়ি দাও, পার করে দেব।

দেব : আমার কাছে একটি কানা কড়িও নেই। জানি না এখানে নদী ছিল কিনা! ভুল করে এসে পড়েছি। তুমি পার করে দাও, তোমার কাঠের তৈরি নৌকা সোনা হয়ে যাবে।

দেবী : ওমা! এই বুড়ো বেটার গেঁটেয় নেই কড়ি, আমার কাঠের তরীতে পা দিলে সোনার হবে নাকি তরী। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না বাপু।

মহাদেব : বড় বিপদে পড়েছি পাটনী, আমাকে পার করে দাও।

দেবী : আচ্ছা, তবে ওঠ, ঐ কিনারায় বস।

কথা ।। এই বলে দেবী নৌকা মাঝনদীতে নিয়ে গেলে দেব তখন দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—

মহাদেব : তোমার স্বামী কেমন মানুষ গা। এই ভরা যৌবনে তোমাকে নদী পারাপারের কাজে ছেড়ে দিয়েছে?

দেবী : আমার সংসারে বড়ই অভাব। স্বামী ভিখারী তাই আমাকে এই কাজ করতে হয়।

দেব : আমি দেবাদিদেব মহাদেব। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ। আলিঙ্গন দিতে হবে আমাকে।

পাটনী নয় ও প্রাণনাথ আমি তোমার গৌরী গো
তোমাকে ফেরাবার তরে মাঝির মেয়ে সেজেছি গো
লজ্জা পেয়ে দেব ভোলানাথ হেঁট মাথা করে গো।

কথা ।। ভোলানাথকে নিয়ে দেবী কৈলাসে উপনীত হলেন। দেখতে দেখতে ছয় মাস গত হল। নারদকে ডেকে দেবী এই কথা বলেন।

দেবী : বাবা নারদ, ধান্য চাষ করে এসেছ তাতে ছয় মাস কেটে গেল, ধান কাটতে যাবে না বাবা? বীর হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে ধান কেটে এস।

নারদ : আপনার আদেশ যখন হয়েছে আমি এখনই যাচ্ছি মামিমা।

কথা ।। নারদ বীর হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে ধান্য কাটতে গেল, কিন্তু ধান্য না কেটে ফিরে এসে দেবীকে বললেন—

নারদ : মামিমা, ধান্য কাটা হলো না। কারণ ধান্যের আদৌ শস্য হয়নি।

দেবী : আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করছি।

কথা ।। এই কথা বলে দেবী বল্লুকার কূলে আপনার স্তনের দুগ্ধ ঢেলে দিলেন। তাতেই ধান্যের শস্য সৃষ্টি হল এবং তারপর মায়ের আদেশে আবার তাঁরা ধান্য ছেদনের নিমিত্ত গেলেন। ধান কেটে গাদা দিয়ে তাঁরা কৈলাসে ফিরে এলেন। তখন দেবী জিজ্ঞাসা করছেন —

দেবী : কত ধান্য হয়েছে, বাবা নারদ?

নারদ : মাত্র আড়াই হালা ধান্য হয়েছে মা।

দেবী : মামা-ভাগ্নে ছয় মাস ধরে চাষ করে মাত্র আড়াই হালা ধান্য? ও ধানের দরকার নেই। যাও, ধান্যে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এস।

কথা ।। দেবীর আদেশ পেয়ে নারদ আবার বীর হনুমানকে সাথে নিয়ে দেবীকে প্রণাম করে আগুন দিতে গেলেন। ধান্যের আগুন ও ধোঁয়ায় দশ দিক ভরে গেল। সেই ধোঁয়া কৈলাস শিখরে এসে পৌঁছাল। দেবী ভগবতী স্থির থাকতে না পেরে ভোলানাথকে ডেকে বললেন কি কারণে কৈলাস শিখর ধোঁয়ায় ভরে গেল দেব?

মহাদেব : সর্বনাশ করেছ গৌরী, সর্বনাশ করেছ। আমি মর্ত্যলোকে যে ধান্য চাষ করেছিলাম তাতে তুমি আগুন দিতে বলেছ? নরলোকের উপায় কি হবে দেবী?

দেবী : আড়াই হালা ধান্য ছ মাস ছদিন ধরে পুড়ছে?

মহাদেব : বুঝতে পারনি দেবী, বুঝতে পারনি। মায়াবী হনুমানের আড়াই হালা মানে সে পর্বত সমান হয়।

দেবী ঃ তাই তো, আমি বুঝতে পারিনি। বাবা নারদ, আবার হনুমানকে নিয়ে তুমি যাও। সমস্ত ধান্যের আগুন জল দিয়ে নিভিয়ে দাও।

কথা ।। নারদ পুনরায় দেবীকে প্রণাম করে বীর হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে বল্লুকার কূলে এসে উপনীত হলেন এবং সমস্ত ধান্য জল দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। কতক পুড়েছে, কতক পোড়েনি, কারোব গায়ে আগুন লেগে বিকৃত হয়েছে। এর ফলে নানা জাতের নানা বর্ণের ধান্য সৃজন হল। এর মধ্যে উৎকৃষ্ট যে পারিজাত ধান্য তা নিয়ে দেবতাদের জন্য কুবেরের গোলায় রাখলেন। আর বাকি ধান্য নারদ ও ভোলানাথ নিয়ে মর্ত্যবাসীর নিকট গেলেন। সমস্ত মর্ত্যবাসীকে ডেকে দেবাদিদেব মহাদেব বলতে লাগলেন—

মহাদেব ঃ আজ থেকে ধান্য সৃষ্টি করলাম বল্লুকা নগরে। এই ধান্য হতে তোমাদের আহার জুটবে। ভোলানাথকে তোমরা কৃষি দেবতা রূপে সদাই পূজিবে। তা দেখে বল্লুকাবাসী আনন্দিত হল। সেই ধান্যের অন্ন খেয়ে তারা প্রফুল্ল হল। সেই থেকে তারা ভোলানাথকে পূজা দিয়েছিল।

শুন শুন মর্ত্যবাসী শুন দিয়া মন,
ধান্য সৃজন করিলাম অন্নের কারণ।
এই ধান্য হতে তোমাদের আহার জুটিবে,
কৃষি দেবতা রূপে তোমরা আমায় পূজিবে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে মাঠে হাল পুণ্য করিবে
হাল পুণ্যকালে গো-পৃষ্ঠে আঘাত না দিবে।
ধান্য রোপণ করে ক্ষেত্রে জল না সেঁচিবে
রোয়া ধান্য মধ্যে কভু মৎস্য না ধরিবে।
ধান্য ক্ষেত্রে আগাছা হতে নাহি দিবে
লোক লস্কর নিয়ে তাহা শীঘ্র তুলিবে।
ধান পুষ্ট হলে পরে বাঁশ ডেলে দিবে
কাটার সময় জন খরচ তাহাতে কমিবে।
ধান্য ছেদন পূর্বে একবার ক্ষেত্রে পূজা দিবে
এক হালা গোছ কেটে গোলার গায় রাখিবে। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

শিব কেন্দ্রিক সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যে সুপ্রাচীন। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন "মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিবপূজা করিতেন। এই শিবের স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা নিম্নে। শূন্য পুরাণে দেখা যায় শিব বুদ্ধ বা ধর্মকে পূজা করিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। বৌদ্ধযুগের শিব কৃষকদিগের দেবতা। পরবর্তী হিন্দু ধর্মের নেতৃগণ শিবের যে প্রশান্ত রজত গিরিনিভ মূর্তি ও সমাধির অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন, বৌদ্ধযুগের শিবে তাহার কিছুই নাই।"[১] এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে, "শূন্য পুরাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৩১ পৃষ্ঠায়) তাহা নগেন্দ্রনাথ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের

সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনে। কিন্তু এই গ্রন্থের বহু নতুন পুঁথির আবিষ্কার হইয়াছে এবং এখন বুঝা যাইতেছে যে, শূন্য পুরাণ নামক কোন গ্রন্থ ছিল না, কারণ কোন পুঁথিতেই এ নামের সমর্থন পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ধর্মপূজাপদ্ধতি, রামাই পণ্ডিত নামক কোন ব্যক্তির রচনা নহে, ধর্মঠাকুরের পুরোহিতদিগের রচনা। পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা।"[২] সুতরাং উপরোক্ত মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, শূন্যপুরাণ ধর্মঠাকুরের পুরোহিতদিগের রচনা এবং তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিব—বুদ্ধ বা ধর্মের অনেক নিচে হবেন এটিও স্বাভাবিক ঘটনা। প্রচলিত গাথাতে শিবের যে মূর্তি বর্ণিত হয়েছে তা বৌদ্ধগণ কর্তৃক বৌদ্ধযুগে কল্পিত হয়েছিল এমন নয়, শিব সঙ্গীতের অন্তর্গত ছোট ছোট কিছু কাহিনী গ্রাম্য কবিদিগের মুখে মুখে প্রচলনের মাধ্যমে শিবের আদি রূপের বিকৃতি ঘটেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য কবিদিগের পালাগানে বর্ণিত শিবদুর্গা নব কলেবর ধারণ করেছেন। আমরা শিবের এই রূপ মূর্তির সাথেই সবিশেষ পরিচিত।

প্রাচীন শিবগণের অঙ্গচ্যুতি হয়ে যে সমস্ত কাহিনী গাথার আকারে নিরক্ষর জন-সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল পরবর্তী কালে তা রামেশ্বর ও কবিচন্দ্র প্রণীত শিবায়ণ, শূন্যপুরাণ, দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত গোরক্ষবিজয় (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড) প্রভৃতিতে কবিগণ সংস্কৃত, পরিবর্তিত ও মার্জিতরূপ দিয়ে নিজেদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। "ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত এই সকল গীত কালক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একটি ভাগ শিবায়ণ প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের রূপ নেয় এবং অপর ভাগ শিবের বিষয় লইয়া রচিত বিভিন্ন ছোটবড় গাথারূপে গীত হইয়া নিরক্ষর জনসমাজের মনোরঞ্জন করিতে থাকে।....... মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ণ, প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত শিবের চাষ পালা, মৎস্যধরা পালা, ভগবতীর শঙ্খ-পরিধান পালা, বাগ্দিনীর পালা, ইত্যাদির মূল উৎস প্রাচীন শিব সঙ্গীতও হইতে পারে। আবার প্রচলিত গাথাগুলি হওয়া অসম্ভব নহে।"[৩]

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী নির্ভর পালাগানের শিল্পীগণ শিবের চাষ পালা বা চাষী মহাদেব নামে যে লোকায়ত পালাগান সৃষ্টি করেছেন তার উৎস প্রাচীন গাথাকাব্য ও পরবর্তী কালে বাংলা মঙ্গলকাব্য হলেও এগুলি এক অনুপম স্বাদের স্বতন্ত্র পালাগান হিসাবে চিহ্নিত হয়। হরগৌরীর পালাগানের সাথে ধর্মঠাকুরের বা ধর্মানুষ্ঠানের কোন মিল নেই। মনসা বা অন্য পালাগানের আসরে দর্শক বা শ্রোতার অনুরোধে এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্য শাখা কাহিনী হিসাবে দুর্গার শঙ্খ-পরিধান ও চাষী মহাদেব পালা গীত হয়। আসর বিশেষে মুখ্যপালা হিসাবেও এ পালাই আসরে গীত হতে দেখা যায়। লোকসমাজে কৃষি সহায়ক দেবতা হিসাবে চাষী মহাদেব মান্য হন।

পাদটীকা

১। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড), পৃঃ ১১১।
২। ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৪০।
৩। ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য্য, বাংলা গাথা কাব্য, ১৯৬২, পৃঃ ১৯৭।

দেব পালা ঃ বসন্তরায়

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে জনপ্রিয় পালাগান হল বসন্তরায়ের পালা। পালাগান আলোচনায় এটি দেবপালার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবী কোন না কোন রোগের অধীশ্বর বা অধিশ্বরী রূপে রোগ নিয়ন্ত্রণ করেন অথবা আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। তেমনি লৌকিক দেবতা বসন্তরায় 'কোরগু' ও 'গলগণ্ড'রোগের অধীশ্বর রূপে রোগ নিয়ন্ত্রণ করেন। কোরগু ও গলগণ্ড রোগ ছাড়া তিনি বসন্ত ও অন্যান্য রোগের ধুকড়ি নিয়ে ভক্তকে ছলনা করেন। কেউ শীতলা ও বসন্তরায়কে উপেক্ষা করলে তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি করেন।

বসন্তরায় শীতলাদেবীর অনুচর রূপে চব্বিশ পরগণার লোক সমাজে কল্পিত। কেউ কেউ অন্যমত পোষণ করেন। শীতলার কোলে যে শিশু আছেন—এই শিশুকে অনেকে বসন্তরায় বলেন। বসন্তরায় হলেন দেবী শীতলার সন্তান। বসন্তরায়ের মূর্তি দেবীর বাম দিকে থাকে। বসন্তরায়ের যে মূর্তি দেখা যায় তা অতি সুন্দর ও সুশ্রী। তাঁর বাসন্তী বর্ণ, মাথায় কোঁকড়া চুল, দুই হাত, ধুতি-পরা ও উড়ুনী কাঁধে ফেলা। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত প্রলম্বিত পৈতা।

পালাগানে বসন্তরায়ের যে পরিচয় আছে তা হল ব্রহ্মার যজ্ঞ থেকে বসন্তরায়ের সৃষ্টি। তাঁর গলায় যজ্ঞ সূত্র, মুখে চেক (?), কপালে চন্দনের উজ্জ্বল রেক (রেখা)। মস্তকে রত্নখচিত উজ্জ্বল চূড়া। তিনি মিষ্টভাষী, তাঁর হস্তপদ সুকোমল ও নির্মল। বসন্তের রাজা হিসাবে তাঁকে অভিষেক করা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে বসন্ত বটুক বলেন। তিনি ব্যাধির দেবতা রূপে এ তিন ভুবনে পূজা পেয়ে থাকেন। তিনি পুষ্পরথ ও অশ্বে চলাফেরা করেন। তাঁর দিব্য বস্ত্র পরিধানে, অপরূপ রূপের জন্য তাঁকে নিশির ঠাকুর (?) বলে মনে হয়। তাঁর মাথার চুল স্তব্ধ জলধির মত (ঘন কৃষ্ণবর্ণ)। তিনি কৈলাসে বাস করেন। কখনোবা তিনি বারায় (?) অধিষ্ঠান করেন।

তুমি দেব চূড়ামনি মানবে কি স্তব জানি
কৃপায় হইবে শূলপাসন।
ভনে পীতাম্বর দ্বিজ উরগো বসন্ত রাজ
দূরিতে সকল রোগ শোক।।
বটু কৈলাস বাসী বারায় বসিল আসি,
হরি হরি বল সর্ব্ব লোক।।

বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরণার জয়নগর থানার অন্তর্গত এক প্রত্যন্ত গ্রাম বাপুলীরচক। এই গ্রামের দুই ভাই বলরাম গায়েন ও গোবিন্দ গায়েন তাঁদের পূর্বপুরুষের হস্তাক্ষর যুক্ত একটি গানের খাতা সযত্নে রক্ষা করে রেখেছেন। এই খাতাটি ঠিক কোন্ সময়ের তা বলা যায় না। বলরাম গায়েনের কথা অনুযায়ী আজ থেকে (১৯৯৩) অন্তত একশত বৎসর আগের কোন এক সময়ের লেখা। এই খাতাতে বসন্তরায় ও পঞ্চানন্দের পালাগান লিখিত আছে। লেখাটি কঞ্চির কলমে বলে অনুমিত হয়। পুঁথিটি বলরামবাবু তাঁর ঠাকুরদা নরনারায়ণ গায়েনের বলে দাবি করেন। তাঁদের পাঁচপুরুষ এই পিরুলী গান বা লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগান করেছেন। কাঁঠালবেড়িয়ার জমিদার সরদার পরিবার এঁদের জ্ঞাতি। গানবাজনার দৌলতে এঁরা গায়েন পদবী যুক্ত হয়েছেন।

বসন্তরায় ও পঞ্চানন্দ পালাগানের খাতার প্রথম ও শেষ কয়েকটি পাতা নেই। বহুল ব্যবহারে খাতার কানার অংশ ছিঁড়ে গেছে। মধ্যে কয়েক জায়গায় লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অধিকমাত্রায় আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের ফলে সব ভাষার অর্থ সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি। ভাষা ও যতি চিহ্ন, লেখার প্রাচীনত্ব নির্দেশ করতে সাহায্য করে খাতাটিতে উজ্জ্বল নীল কালি ব্যবহৃত হয়েছে। জাল বাঁধা বহর সূতার মত কাপড়ের লাল পাড় পাকিয়ে অতি সাধারণ ভাবে খাতাটি বাঁধা। খাতার পাতা মোটা, এপার ওপার লেখা। পুঁথির সম্পূর্ণটাই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের যতি চিহ্নগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমন—

ত্রিপদী।। কর জোড়ে নুটী পায় :. উরগো বসন্ত রায় :.
মর্ত ঘটে হও অধিষ্টান।
শীতলা জননী সাথে :. আরহন পুষ্প রথে :.
শুনগীত লহ বলিদান।|

পয়ার।। শুন শুন সর্বলোক অপূর্ব কাহিনী।
ব্রহ্মার যজ্ঞে উপজিল রায় চূড়ামনি১।

এই খাতায় পঞ্চানন্দের পালায় ব্যবহৃত ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দের যতি চিহ্নর রূপ আলাদা। যথা—

ত্রিপদী।। আসরে জতো নক : সভারে খণ্ডিবে দুখ ;
হরি ২ বল সর্বজোন :৭
গেহে জতো শ্রীমন্তিনী : শুন দিএ জএ ধ্বনি :
য়হ রাত্রে গীত জাগরণ :৭

পয়ার।। নাট গীত কৌতুকে আইলেন দণ্ডধর।:৭
ভালমন্দ কার ঠাঁই না পাইল উত্তর :৮

ত্রিপদী।। কহে সদাগর : : শুন চন্দ্রধর : :
হৃষীকেশ মোর নাম :৯
আমার উৎপত্তি : : গন্ধবেনে জাতি : :
উজানি নগরে ধাম :১০

প্রাচীন খাতাটির লিপি ব্যবহারের মধ্যে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। বিশেষত স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তাক্ষর ব্যবহার লক্ষণীয়।

ল > ন, কর্ণধর > কণ্যধর, পয়ার > পআর।
অহ > য়হ, অপূর্ব > য়পূর্ব,
ণ > ন, গাছে > গাচে, ইত্যাদি।

কাহিনীতে আঞ্চলিকতা (পালা অংশে দ্রষ্টব্য) খুবই প্রকট। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা পালাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। সে দিক থেকেও পালাটির সাহিত্যমূল্য স্বীকার্য। পালাটি কয়েকটি ছোট ছোট কাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কাহিনীতে শীতলা ও বসন্ত রায়ের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রাচারের কথা আছে। বসন্তরায় পালায় যে ছোট কাহিনীগুলি আছে তা নিম্নরূপ —
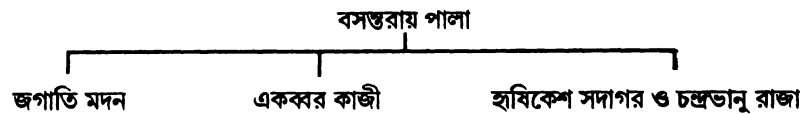
'জগাতি মদন' ও একব্বর কাজীর পালাটি পীতাম্বরের লেখা। গানের ভণিতায় কেবল দ্বিজ পীতাম্বর এই নাম পাওয়া যায়। পীতাম্বর মদনমল্ল পরগণার জাফরপুর গ্রামের লোক। চন্দ্রভাই রাজন পালাতে কিছু অংশ পীতাম্বরের ভণিতা যুক্ত, বাকি অংশ কৃষ্ণরাম দাসের। চন্দ্রভানু রাজা ও হৃষিকেশ সদাগরের কাহিনীটি সম্পূর্ণটাই কৃষ্ণরাম দাসের লেখা। ভণিতায় কৃষ্ণরাম দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে কৃষ্ণরামের যে পরিচয় আছে তা হল —

নাম ভগবতি দাস বসতি নিমিতে।
তার সুত কৃষ্টরাম রচিল কবিত্বে ।।

চন্দ্রভানু রাজা ও হৃষিকেশ সদাগরের কাহিনীতে বসন্তরায়ের কথা উল্লেখ থাকলেও শীতলার

মাহাত্ম্য বেশি কীর্তিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ কৃষ্টরাম দাসের ভণিতা যুক্ত লেখা। সেকারণে এটিকে শীতলার পালাও বলা যায়। 'শীতলা বসন্তরায়ের গান' পালার সাথে, শীতলা পালা গানের কিছু মিল আছে। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীর শীতলা মঙ্গলের কোন কোন ঘটনার সাথে সামান্য কিছু মিল থাকলেও পালা গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষ্ণরাম দাসের শীতলা মঙ্গলে ঘটনা অনেক বেশি, অনেক অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা এসে এখানে ভিড় করেছে, কিন্তু বসন্ত রায় পালায় অপ্রাসঙ্গিক অংশ একেবারে ছেঁটে কেবল মূল কাহিনী শীতলাকে ধরে রাখার চেষ্টা আছে। তাতে পাঠক ও রসজ্ঞ শ্রোতার অতৃপ্তি থাকে না। চন্দ্রভানু রাজা শেষ পর্যন্ত কি ভাবে পূজা দিলেন খাতার পাতা ছিন্ন হওয়ায় তা জানা যায় না। নিম্নে 'শীতলা বসন্ত রায়ের গান' অংশটি লিপিবদ্ধ হল।

জগাতি মদন

বন্দনা

কর জোড়ে লুটিপায়, উরগো বসন্ত রায়,
মর্ত ঘটে হও অধিষ্ঠান।
শীতলা জননী সাথে, আরহণ পুষ্পরথে,
শুন গীত লহ বলিদান।।
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান,
রূপে যিনি নিশির(?) ঠাকুর।
সুবর্ণ মুকুট শিরে, পুষ্প গন্ধে অলি ফেরে,
অতি স্তব্ধ জলধি চিকুর।।
ভনে পীতাম্বর দ্বিজ, ওরগো বসন্ত রাজ,
সরিয়ে সকল রোগ শোক।
বটু কৈলাসবাসী, বারায় বসিল আসি,
হরি হরি বলো সব লোক।।

শুন শুন সর্বলোক অপূর্ব কাহিনী।
ব্রহ্মার যজ্ঞে উপজিল রায় চুড়ামনি।।
গলায় যজ্ঞের সুত মুখ পর চেক।
কপালে উজ্জ্বল শোভে চন্দনের রেক।।
মস্তকে উজ্জ্বল চূড়া রতন মণ্ডিত।
অমৃত জিনিয়া বাক্য অতি সুললিত।।
রমল করপদ শোভে দ্বিজরাজ।
দেখিয়ে আনন্দ বড় দেবের সমাজ।।
দেখিয়ে প্রসন্ন(?) বড় দেবের সমাজ।
অভিষেক করি আইলেন বসন্তের রাজ।।

বসন্ত বটুক নাম শীতলা নন্দন।
ব্যাধির দেবতা তিনি এ তিন ভুবন।।
এ তিন ভুবন রায় চায়ে একে একে।
শীতলা বসন্তে পূজা কোথায় না দেখে।।
দেখিয়ে জ্বলিলেন কোপে রায় চূড়ামনি।
লইতে আপন পূজা উরিল ধরণী।।
না মানে দেবতাগণ জগাতি মদন।
তাহারে ছলিতে প্রভু করিল গমন।।
দ্বিজ পীতাম্বর বলে শুন দিয়ে মন।
নতুন কবিতা আমি করিব বর্ণন।।

পাই এ রাএর ত্বরা, মাথা বেখাপ (?) যত জরা (?)
উপনীত সভার প্রধান।
যারে কৃপা করেন রাএ, এই তিন জাতি হএ
তারে কার নাহিক মরণ।।
রাএর সাতি পেএ, অন্তরে হরিস হএ,
এলেন যত বসন্তের গণ।
স্ব সরেতে(?) উড়ে চেনা, বুইচে বাটুলে দানা,
বাটুলি জঙ্গলে অধিষ্টান(?)।।
পেপুলে পর্বত কালা, পবুনে রুগগুনে জ্বালা,
মষুরে নিক্ষকে(?) রকত চোরা।
চক্ষুদল নানা জাতি, চলাফেরা অতি ভক্তি,
হরিদ্রে হরিণে প্রাণ হরা।
সিলে পর সিলে পচা, বসন্ত বিকট ধসা,
কুদুলে বিকলাঙ্গ নানা জাতি।
হাম দাম পদ্ম সুখা, যারে নাই জাএ রাখা,
উপস্থিত হইল শীঘ্রগতি।।
আইল বসন্ত বেদপ জাএ গনা সেই (?)
ধুকুড়ে কাঙ্গড়ে উপসন।
চাপে গিএ যার পর, পাঠাএ স্বরগ পর,
যাএ সে যে করিয়া নিধন।।
রাএর আরতি পেএ অন্তরে হরিস হএ
এলেন যত বসন্তের গণ।

রাএর চরণ তলে　　　　　দ্বিজ পীতাম্বর বলে
নাএকেরে করিবেক ত্রাণ।।

রাএর আরতি পেএ যত ব্যাধিগন।
ভিন্ন দ্রব্য হল সবে যেইযার বরণ।।
কেহবা হইল অম্বু(?) কেহবা পলাশ।
কেহ নারিকেল চিনি কেহ আনারস।।
কেহ ডাল কেহ চাল কেহ কদলি।
কেহবা হইল শশা কেহ হইল পালি।।
পাকা বেল হল কেহ কেহ বা ধুকড়ি।
দেখিআ বসন্ত রাএ আনন্দিত বড়ি।।
রাএর অশেষ মায়া বোঝা নাহি যাএ।
মায়ারূপে ব্যাধিগণ জড় হলেন তাএ।।
দেখিএ মায়াবি গরু(?) রাএর ভ্রুকুটি।
শত গরু নিরমিল দুইশত পাটি।।
কেহ পৃষ্ঠেতে তুলিয়া দিল ছালা।
ত্যাজিএ জীবের কাএ হল বিগ্র জ্বালা।।
নিমিষে হইলেন রাএ মানবের কাএ।
বসন ভূষণ ছাড়ি গরু সোনে ধাএ।।
হূল করে নিল তবে পোকা ধরে কন্ধে।
ব্রাহ্মণ হইয়া যান বলদের ছন্দে।
বড়দহ থানা মোর যথাএ জগাতি।
গরু লয়ে যান তথা বসন্তের পতি।।
হই হই রবে যান গরু চালাইয়ে।
মদন দেখিল তাহা তথায় বসিয়ে।।
আগি পাড়ি তেরা দিন কোন লোগা হয়ে।
তেরা কোন্ বাবা রহ সমকনা (?) দিখায়ে।।
এতেক বলিয়া মদন বড় ক্রোধ হল।
একশত গরু সব ফিরায়ে আনিল।।
মদনের হুকুমে রাএ আসিল তথায়ে।
দ্বিজ পিতাম্বর বলে শীতলা পায়ে।।

মদন বলেন দ্বিজ রাখিবে মালিকে।
সেতাব মানহ কড়ি করিয়া তালিকে।।

নেকা করি দেখে গরু হল একশত।
আশারি হইল তার টাকা পাঁচশত।।
আপন ভালাই(?) চাহ রাজকর দিয়ে।
বেচাকেনা কর গিয়ে বলদ লইয়ে।।
বিপ্র বলে আশীর্বাদ লহ নাই টাকাকড়ি।
মদন বলেন চমকিত হইলাম বড়ি।।
না দেয় রাজার কর না ছাড়ে বড়াই।
খেদাড়িয়ে দাও দ্বিজে যাক অন্য ঠাঁই।।
এতেক বলিয়া মদন বড় ক্রোধী হইল।
একশত গরু সব কাড়িয়া লইল।।
ধুকুড়ি খুলিয়া দেখে ভক্ষ উপহার।
পাইয়া খেটেরগণ হরিষ অন্তর।।
হইল যতেক দিব্য আপনার পুরি।
পাইয়া আনন্দ হইল মদনের নারী।।
করতলে স্বর্গে যেন পাইলা হেনমনে।
ভক্ষ উপহার পেয়ে রক্ষায় যতনে।।
অমৃত পলাশ(?) গুতাল মধুর।
সবস দাড়িম্ব লেবু পিয়াল খেজুর।
চিনি ফেলিয়া গম কলা তণ্ডুল কদলী।
শশা ফুটি পাকা পাকা খাইতে মধুলি।।
এমনি সময় যারা ভাবিল অন্তরে।
প্রবেশ করিব আজ জগাতির ঘরে।।
প্রবেশ করিল জ্বর পাএ বড় জো।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে জগাতির পো।।
চিনি ফেলি গম কলা আদিতর ধ্বজ।
কোরণ্ড হইল কারও হয়ে গেল কুজ।।
অমৃত পলাশ বেল খেয়ে ছিল যে ।
গলাগণ্ড কারও গোদ হয়েছে।।
মাস ধস(?) কলাই খাইল যতজন।
সাতদিনের বসন্ত হইল তখন।।
কালাজ্বালা পচা চোরা প্রবেশিল তায়ে।
দ্বিজ পীতাম্বর বলে রক্ষা কর রায়ে।।

ব্যাধিগণ চাপাইয়া জগাতির ভবনে।

বদ্যি রূপে রাএ তখন আইল সেইখানে।
যথায়ে ধরণী পতি আছেন মদন।
বদ্দিরূপে বাএ তথা দিল দরশন।।
বদ্দিদেখে মদন শিরেতে হানে হাত।
বিধির ঘটনে মোর হইল ব্যাঘাত।।
যদি মোরে রক্ষা কর বদ্যি মহাশএ।
সর্বস্ব রাখিলাম পণ কহিল এ।।
বলিতে বলিতে সেই জগাতি মদন।
কান্দিতে ২ ধরে বদ্যির চরণ।।
সর্বস্ব লয়েচ বেটা পথে পেএ জো।
এখন কেন পাএ ধর জগাতির পো।।
বসন্ত রাএর মায়া কে পারে বুঝিতে।
প্রথমে আনিআ হিম দিল কোরগুতে।
প্রলয়ে কোরগু ডাকে কর্ণে লাগে তাল।
তার গাএ এনে দিল মরিচের ঝাল।।
জ্বালাএ পরান জাএ রক্ত পড়ে ঝরে।
হাহাকার শব্দ হইল পুরের ভিতরে।।
বড় হেদে জোঁক এনে দিল তার গাএ।
উদর পুরিআ তারা রক্ত পুজ খাএ।।
কন্টক বাদিএ গলাএ দিল শত শত।
রক্ত পুজ খাএ তারা করে মন মত।।
জগাতির দুর্গতি দূর করেন ব্যাদি পতি।
সদএ হইআ কন শেষ ভাগ রাতি।।
শুন শুন বলি বাচা জগাতি মদন।
পরিচএ দিলাম আমি শীতলা নন্দন।।
আজ হইতে রোগতোর খণ্ডিল সকলে।
রাএর আজ্ঞএ ব্যাদি প্রবেশ পাতালে।।
বপু পূর্বেতে যেমনি ছিল হইল তেমনি।
কৈলাস শিখরে গেলেন রাএ চূড়ামনি।।
যামিনী প্রভাত কালে কহিল সবারে।
বসন্ত রাএর মাআ শুন সর্ব্ব নরে।।
শিয়রে বসিয়া কহে পূজার বিধান।
খণ্ডিল যতেক দুঃখ ভক্তির কারণ।।

শীতলা বসন্ত রাএ মূরতি নির্মাণ।
ভুত শুদি আদি করি সভার চক্ষুদান।।
পুরোহিত ডাকি শুভদিন বিচারিল।
স্থান মার্জনা করি পূজাএ বসিল।।
নৈবুদ্যি রচি দিল যত অনুচর।
নানা অর্ঘ্য দিআ আগে পূজে গণেশ্বর।।
যেবা শুনে যত দূর পূজে এক মতি।
বাড়িল সম্পদ সেই মদন জগাতি।।
হইল রাএর পূজা এ তিন সংসারে।
সবেমাত্র নাই পূজে কাজি একব্বরে(?)।।
তাহারে ছলিতে প্রভু করিল গমন।
দ্বিজ পীতাম্বর বলে করিবে কল্যাণ।।

একব্বর কাজি

লইয়া জগাতি পূজা রাএ চূড়ামনি।
শেতলার প্রতি কহে শুন গো জননী।।
হইল আমার পূজা এ তিন সংসারে।
কহ মাতা কোন জন না পূজে আমারে।।
শীতলা বলেন বাচা বলিয়ে তোমারে।
একব্বর কাজি আচে য়বস্তি নগরে।।
বড়ই দুরন্ত সেই একব্বর কাজি।
পীব বিনে না ভাবে সে বড় দাগাবাজি।।
পূজা যদি নিতে পার তাহার নগরে।
তবে আর রিপু নাইএতিন সংসারে।।
এত শুনি রাএমনি অতি ক্রোধ মনে।
উপনীত হইল গিএ কাজির ভবনে।।
শীতলা বসন্ত রাএর প্রতি মেনএ (?)
কাজির নিকটে তবে কহে ডাক দিএ।।
ভিক দেহ বলি তবে ডাকে উভরাএ।
শুনিআ একব্বর কাজি আইল তথাএ।।
হিন্দুর দেবতা দেখি বলে কাজি জেরা।
জিজ্ঞাসিল্ কার ভিক্ষা মাগিলেন তেরা।।
তারা বলেন বসন্ত দেবতা নাই জান।

এমন কথা বদনে কেমন করে আন।।
যখন শুনিল কাজি এই সব বাত।
আল্লা আল্লা বলিএ গোচেতে দিল হাত।।
নহে বাচল হতে বেআপন ভালাই।(?)
বলিতে বলিতে কাজির উকাইল বাই।।
খড়গ খরসান কাজি নেকোয় তলয়ার।
ঘুচিল রাএর মাআ কিছু নাই আর।।
য়ন্তরে লজ্জিত বটু পেএ য়পমান।
পাটাইল ব্যাদিগণ কাজির ভবন।।
ব্যাধি নানা গেল চলে পবনের বেগে।
কাজির পুত্রের গাএ চাপে গিএ আগে।।
জ্বর গাএ থর থর ব্যাধি চাপে তাএ।
মুখে রক্ত উঠে ঘন পড়ে গেল ঠাএ।।
এমনি রাএর মাআ হইল তথাএ।
যেজন পরসে তার সেইরূপ হএ।।
কাজিরে ধরিআ বলে কাজির রমণী।
পরশে প্রবেশ করে পড়িল ধরণী।।
বিষফুট হইল কাজির গুষ্টির দুআরে।
গলে গলগণ্ড পায়ে গোদ চলিতে না পারে।।
তবুতো না লএ মুখে বসন্তের নাম।
মনে ভাবে কাজি আল্লা হল বাম।।
বিচমিল্লাহ ২ তোবা ২ ডাকে।
ছাহেব বছরয়নি রক্ষে করু মকে।।
ফতেমাকে দিল গাজি কলেমা কোরাণ।
কোরাণী পড়িয়া ঘন করেন স্মরণ।।
এতেক দুর্গতি করেন শীতলা নন্দন।
কাজির শিহরে আসি কহেন তখন।।
শুন শুন বলি বাছা কাজি একব্বর।
পরিচয় দিলাম আমি শেতলাদিমার(?)।।
আজ হতে রোগ শোক খণ্ডিল সকলে।
রাএর আজ্ঞেএ ব্যাধি পশিল পাতালে।।
পূর্ব্বেতে যেমন ছিল হইল তেমনি।
কৈলাস শিখরে গেলেন রায় চূড়ামনি।।

যামিনী প্রভাত কালে কহেন সভারে।
বসন্ত রাএর মাআ শুন সর্ব্ব নরে।।
সিয়রে বসিয়া কন পূজার বিধান।
খণ্ডিল যতেক দুক্ষু তথির কারণ।।
শীতলা বসন্ত রাএর মুরতি নির্ম্মাণ।
ভূত শচঙ্গ(?) আদি করি সবার চক্ষুদান।।
পুরোহিত ডাকি শুভ দিন বিচারিল।
স্থান মার্জনা করি পূজাএ বসিল।।
নৈবেদ্য রচিআ দিল যত অনুচর।
নানাঅর্ঘ্য দিয়া আগে পূজে গণেশ্বর।।
যেবা শুনে যত দৃঢ় পূজে একমতি।
বাড়িল সম্পদ সেই কাজির সন্ততি।।
য়বন্তি নগরে পূজার প্রচার হইল।
শীতলার গান পীতাম্বর বিরচিল।।

চন্দ্রভানু রাজা

হইল রাএর পূজা এ তিন সংসারে।
সবে মাত্র নাই পূজে উজানি নগরে।।
ধীরে ধীরে রাজার শিহরে আসি বলেন বচন।
শুন শুন বলি বাছা চন্দ্রভানু রাজন।।
সুগন্ধ বস্ত্র আনিএ করহ মোর পূজা।
নইলে অশেষ প্রকারএ পাইবে সাজা।।
এতেক বলিয়া রাএ করিল গমন।
প্রভাতে উঠিআ রাজা কহেন তখন।।
রাজা বলি কোটালিএ বলি যে তোমারে।
হৃষিকেশ সদাগরে আনহ সত্বরে।।
রাজার আদেশ পাএ কোটাল চলিল।
সাধুর ভবনে আসি দরশন দিল।।
কোটালিএ বলে শুন সাধুর নন্দন।
ভূপতি আজ্ঞে তুমি করহ গমন।।
এতেক শুনিআ তবে সাধুর নন্দন।
রাজার নিকটে আসি দিল দরশন।।
প্রণাম করিআ তবে সদাগর কএ।

কোন কাজে ডাকি আছ কহাএ।।
রাজা বলে শুন ওহে সাধুর নন্দন।
শীঘ্রগতি যাও তুমি হিরণ্যপাটন।।
সুগন্ধ চন্দন সাধুবালা আনি মরে দেও।
সামনাপিকপানি(?) নিয়া গুহ এনেও(?)।।
মনে কিছু সাধু বালা না করিও সংশয়।
খরচ কারণে বাত এক লক্ষ তঙকা।।
প্রসাদ পাইয়া সাধু নিজালএ গেল।
জননীর স্থলে গিএ কহিতে লাগিল।।
মাকে দেখিআ সাধু বলেন ধীরে ২।
আদেশ করহ যাইতে হিরণ্য শহরে।।
সুগন্ধ চন্দনের তরে যাইব পাটনে।
বিদায় হইলাম মাতা তোমার চরণে।।
মনে কিছু না ভাবিও শুন গো জননী।
সংকটে করিবেন রক্ষে শীতলা জননী।।
সপ্তম বহিত্র সাধুর ঘাটেতে আছিল।
গরুর গোবর দিএ ডিঙ্গে উনাইল।।
মানত করিআ দিব্যঘট সঙ্গে নিল।
শীতলা চরণে পীতাম্বর বিরচিল।।

সদাগর ঘাটে গেল ঘুচাইআ মাআ।
পুরের সহিত আর কান্দে যতো মেআ।।
কোথা যাও দেখা দিএ যা একবার।
ফেলিলে শোকের ভার কেন দিলে মোর।।
সাধু বলে ডিঙ্গে সবে বাও তরতরী।
মাএর কান্না আর সহিতে না পারি।।
পাইআ সাধুর আজ্ঞে কাণ্ডার সত্তর।
শেতলা চরণ ভাবি ডাড়ে দিল ভর।।
বহর বাঙ্গাল গন সার গাহিআ যাএ।
আজার টাঙ্গিআ দিল ডিঙ্গে চলে যাএ।।
উজানি নগরের ঘাট পশ্চাত করিল।
পদ্মাবতি আসি ডিঙ্গে দরশন দিল।।
চুচুড়া ফারাস ডাঙ্গা পশ্চাত করিল।
শ্রীক্ষেত্র আসিআ তবে ডিঙ্গে উত্তরিল।।

প্রভুর প্রসাদ পাএ সাধুর নন্দন।
অবিলম্বে তরীপরে কৈল আরোহণ।।
সেতুবন্ধ রামেশ্বর বহিআ চলিল।
সপ্তদহ পঞ্চদহ এড়াইয়া গেল।।
দক্ষিণাকার দেশ বাহে সাধুর নন্দন (?)।
মাআদহে আসি ডিঙ্গে দিল দরশন।।
রন্ধন ভোজন করে সাধুর তনএ।
শীতলা চরণ ভাবি পীতাম্বর গাএ।।

ছাড়ইএ দুঃখ দয়, সদাগর মাআদয়
সুখে করে রন্ধনভোজন।
শুনিআ সখির কথা শীতলা আইল তথা
ছলিবারে সাধুর নন্দন।।
চারিদিকে নীল জল করে খেলা ছল ছল
সমুদ্রেব মাজে হইল পুরী।
অপূর্ব নির্মাণ ঘর সিংহাসন মনোহর
নাচে গাত্র বার বিদ্যেধরী।।
রস আদি নানা তরু সকলে কুসুম চারু
নিবাসে নানান খগগণ।
উড়ে বসে ঝাকে ঝাকে, সঘনে সঘনে ডাকে
কুতুহলে করএ রমণ।।
কে পারে বুজিতে কাজ মাআ এ সুমুদ্র মাঝ
তোলেন বইচ গাছে পলা।
মুর্ত্তি মন্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে অবিরত
মুসারী মটর ছালা ছালা।।
নৃত্য করে অপসরা ব্যাদি অতি মনহরা
গীত গাএ পরম কৌতুকে।।
বড় য়পরূপ তিনি দেখে তাহা সাধুমনি
বিদ্যুৎ তোরনী যেন মুখে।।
সাধু বলে কর্ণধর দেখ অপূর্ব আকার
দিব্যপুরী সমুদ্রের মাজে।।
নানা জন্তু খগবর অপূর্ব কণ্ঠে আর
তোলে পলা বইচের গাছে।।

দেখ ঐ বিদ্যমানে কহিব রাজার স্থানে
প্রমাণ করিব জনে জনে।
এমন অপূর্ব আর নাই দেখি ত্রিসংসার
শুনি নাই এ তিন ভুবনে।।
কর্ণধর আদি একে একে দৃষ্টি দিআ চারি ভিতে
সাধুবিনে কেহ নাহি দেখে।
কর্ণধর কহে হাসি হৃদয়ে এমন বাসি
স্বপন দেখিলে সদাগর।
বড় অপরূপ রূপ কথা কেমনে কহিলে হেথা
লোক নাহি দেখি যে সাগর।।
বলে সাধু করি দন্দ তোমরা বড়ই মন্দ
দেখিতে না পাও কি কারণ।
দেখে তবু নাই বল মোরে উপহাস কর
কি কারণে করয়ে এমন।।
বুদ্ধি মন্ত কর্ণধর উত্তর না দিল আর
বাহ বাহ ফুকারে তখন।
খনেক দিনের পর ভিক্ষা লএ মনহর
উপনীত হিরণ্যপাটন।।
ঘাটে চাপাইল তরী দামামা দুন্দুভি ভেরি
বিউগল বাজাএ কুতুহলে(?)।
সদাগর শুন রাগি হিরণ্য পাটনে আসি
প্রীতি কিছু বলে।।
ভাবিআ শীতলা দেবী বলে কৃষ্ণরাম কবি
সেবকের প্রতি কর দআ।
আসরে করিএ ভর গাএনের দিবে বর
নাএকেরে দিবে পদ ছাআ।।

হিরণ্য পাটনে সাধু চাপাএ তরণী।
বাজে বাদ্যি দামামদ গড় বিনে বেনী।।
কাঁসি বাঁশী জগোঝম্প বাজাএ মাদল।
মৃদঙ্গ মন্দিরা ঢোল বেহালা তবল।।
সেতারা মন্দিরা ভেরি বাজে সপ্ত সরা।
বাদ্য শব্দে কম্পবান হইল বসুন্ধরা।।

জলজ জিনিআ শব্দ সঘনে আওআজ।
কম্পমান ওই চন্দ্র ভানু রাজ।।
কোটালের বলে রাজা কি কর বসিএ।
হেন বুজি পরদল ঘিরিল আসিএ।।
এক্ষণে সংবাদ জানি কহিবে আসিএ।
জেহএ উপাএ ভাবি জুকতি করিএ।।
শুনিআ কোটাল তবে ধাএ শীঘ্রগতি।
তাহার সঙ্গেতে কতো চলি পদাতি।।
শীর্ঘগতি কোটাল গিয়া চাপিল দজার।
ঘাটে আসি উত্তরিআ দেখে সদাগর।।
কোপে কোতোয়াল করে করিআ গর্জ্জন।
কহ আরে বেটিচদ না বুজি কারণ।।
কহে ছোর কিআ এ চাআ আজ জিনল গেরা। (?)
কহ ছাচ আহাম্বক কাহা তেরা ডেরা।।
রাজা মনে ভেজদিআ তলব সেতাব।
সাধু শুনে কম্পবান কোটালের দাপ।।
কূলে না উঠিতে তোর এতেক গর্জন।
অবিলম্বে চলে সাধু ভেটিতে রাজন।।
ফাঁদি বাদি নারিকেল নিল গআ পান।
যতো তৈল আদি নিল রম্ভা মত্তমান।।
দোলাএ চাপিএ জেসে সাধুর নন্দন।
দুই ধারে সেত (অনুচর) চামর করএ ব্যাজন।।
নৃপতির সেই দেশ বিচিত্র নির্মাণ।
অমরাবতির ওই মনহর স্থান।।
পুরুষ মদন জিনি অতি মনহর।
রমণী পাখিনী জিনি রতির সুসর।।
যোগসিদ্ধা স্থানে স্থানে দেখে মহাযোগী।
ভাবিএ কেশব শিব সংসার ত্যাগী।।
অবিলম্বে উত্তরিল নৃপতির কাছে।
প্রণাম করিল সাধু দেখে মহারাজে।।
আদর করিএ য়তি সাধুর নন্দনে।
বসাইল নিজ পাশে কনক আসনে।।
পরিচয় মাগে তারে বসুমতি পতি।
কৃষ্টরাম বলে ভাবৈ মধুর ভারতি।।

কহে সদাগর : শুন চন্দ্রধর
হৃষীকেশ মোর নাম।
আমার উৎপত্তি গন্ধ বেনে জাতি
উজানি নগরে ধাম।।
তাহে নরপতি শুভজন অতি
শ্রীচন্দ্রণী কায়(?) রাএ।
প্রবল প্রতাপে শঙ্কর রিপুবরাবর
সর্বলোকে গুন গাত্র।।
প্রজার পালন শ্রীরঘুনন্দন
সম্মান তাহার লেখা।
বলে জিনে ভীম গুনেতে অসীম
রূপেতে জুমুদ(?) সখা।।
সেই নরপতি যত্ন করি অতি
পাঠাইয়া দিল মরে।
সম্বক(?) আর চন্দন মানিক রতন
দিব লএ ভূপতিরে।।
এই সে কারণ মোর আগমন
নিবেদিনু মহাশএ।
সুমধুরধ্বনি সাধু মুখে শুনি
রাজা ধন্য ধন্য কএ।।
বুজি অনুমানি তোমার জননী
সাগরের কামনা করি।
তেই পুত্র এমন পাইল রতন
আরাধিএ হরগৌরী।।
বটে ভাগ্যবতী দয়া হীন অতি
হৃদয় নাহিক ধড়ে।
এহেন সন্ততি দূরদেশে স্থিতি,
পাটাএ পরাণ ধরে।।
ধরণী ভূষণ সিরপা তখন
দিলেন সাধুর তরে।
বাসাএ এখন করহ গমন।
আজ্ঞে দিলেন নৃপবরে।।

ধনঞ্জয় নাম পুত্র গুণধাম
সাধুরে তখন কএ।
দিল এক দিএ কহ বিবরিএ
চিত্ততে প্রবোধ হএ।।
নিরুপদ্রবে তরণী লইএ
কত দেশ এড়াইলে।
গ্রাম কত শত বেএ আইলে যতো
কোন খানে কি দেখিলে।।
শীতলার খেলা কহে সাধু বালা
পথের বৃত্তান্ত যত।
প্রথমে উজানি বাহিআ সুরধনী
এড়াইলা স্বদেশ কত।।
গৌর গুন ধাম নবদ্বীপ গ্রাম
বহিএ পশ্চাত করি।
ত্রিধারা ত্রিবেনী বহিআ সুরধনী,
তথা স্নান দান করি।।
তরী লএ রঙ্গে আসিতে সে গঙ্গে
দেখিলাম নিমের গাছে।
অতি মনহর প্রফুল্ল সুন্দর
নানা পুষ্প ফুটি আছে।।
তারপর ঠাটে আসি কালিঘাটে
দেখিলাম কালিকা মাতা।
যাহার মহিমায় দিতে নারে সীমা
হরিহর আদি ধাতা।।
তরণী লইয়া সে স্থান ত্যাজিয়া
হরিষে করিলাম গতি।
সংগ্রাম পশ্চাত করি তরী সাথ
নিলেচলে উপনীতি।।
করি জোড়হাত প্রভুর প্রসাদ
খাইনু ভকতি অতি।
আর সেতু বন্দে আসিআ আনন্দে
পুজিলাম পশুপতি।।

রামের জাঙ্গাল তরলএ বাঙাল
কতদহ্ পাছুরহে।
শুন নরনাথ তরী লএ সাথ
উত্তরিলাম মাআ দহে।।
শীতলা চরণ ভাবি এ এখন
বলে কৃষ্টরাম দাস।
আসরে উরিবে কল্যান করিবে
নায়েকের পুর আশ।।

সাধু বলে শুন রাজা অপরূপ বানী।
মাআ দহে উত্তলাম লইয়া তরণী।।
সমুদ্রের মাঝে এক মনোহর পুরী।
তাহারি উপরে নাচে বার বিদ্যেধরী।।
মুষিক বিড়াল আর শিকি সাপ(?)।
ভক্ষকে ভক্ষক চরে নাহি খাএ ধরি।।
মনহর এক কন্যে সাগরের মাঝে।
তোলেন বিচিত্র পলা বইচের গাছে।।
সাধুযদি কহিলেক এসব বচন।
শুনিয়া কুপিল অতি অবনী ভূষণ।।
শুন সাধু ইহা বুঝি দেখিলেন স্বপনে।
এসব বৃত্তান্ত বল জানে কোন জোনে।।
হেন কথা হেথা না বলিহ্ পুনর্বার।
জুআচোরের মত সাধু দেখি যে তোমার।।
সাধু বলে রোষ কেন কর নর রায়।
যে কহিনু দেখাইব কও বড় দায়।।
রাজা বলে দেখাইতে পার যদি তুমি।
নিজ কন্যা তোমার তরে বিভা দিব আমি।।
অর্ধরাজ্য দিব আর ভাণ্ডারের অর্ধধন।
দেখাইতে না পার যদি কি হবে এখন।।
সাধুবলে ইহা যদি দেখাইতে না পারি।
সত্য সত্য হই কথা সপ্ত ডিঙ্গে হারি।।
মশানে আমার প্রাণ করিহ বিনাশ।
রাজা বলে এই সুত্ত্য তোমার যে ভাস।।

কোটালের আদেশ দিল সাজাও তরণী।
আসি ভাড় কলাএ বসিল নৃপমনি।।
সদাগর কর্ণধার এক নাএ উঠে।
মহানন্দে গেল মাআ দহের নিকটে।।
চারিদিকে নেহালিএ দেখেন ভূপতি।
জলবিনে আর নাহি দেখে চারিভিতে।।
রাজা বলে শুন ওহে সাধুর নন্দন।
কোথাএ দেখিলে পুরী বিচিত্র নির্মাণ।।
কোথা কন্যা তোলে পলা বইচের গাছে।
সাধু বলে নিবেদন শুন মহারাজে।।
প্রমাণ ইহার মোব আছে কর্ণধার।
এতশুন নরপতি বলে বারে বার।।
সত্য কহ কর্ণধর কি দেখিলে জলে।
এতশুনি কর্ণধর সবিনএ বলে।।
তখন না দেখি কিছু এখন না দেখি।
শুনি চন্দ্র ভানু রাজা হইল বড় সুখী।।
রাজা বলে কোটালিএ শুন সাবধানে।
সাধুবেটা দুষ্টু মতি কাটনে মশানে।।
বাইচে করিএ ঘাটে উত্তরিল রাএ।
শেতলা চরণ ভাবি কৃষ্টরাম গাএ।।

কর্ণধরে সদাগর করি আলিঙ্গন।
করুণা করিএ বলে বিনয় বচন।।
শুন ভাই আমার জীবন অবশেষ।
কি কাজ হেথা আর যাও নিজ দেশ।।
জননীরে কহিবে তুমি অশেষ প্রকারে।
তোমার নন্দন মোল হিরণ্য নগরে।।
মাআ দেখি কহিল গিএ রাজার গোচরে।
দেখাইতে না পারিল নৃপতির তরে।।
এই হেতু মশানে হইল নিপাতন।
নৃপতিরে কহিবে সকল বিবরণ।।
হেথা অনুচরে আজ্ঞে দিল নৃপবরে।
করে ধরি লএ জাএ কাটিতে সাধুরে।।

পাছে পাছে কর্ণধর চলিল তাহার।
মনে ভাবে সাধু পুত্র না বাঁচিবে আর।।
কেহ বেগে সদাগরে ঠোকা মারে গায়ে।
শতেক পদাতিক চলে তাহার পশ্চাতে।।
দ্রুত গতি উত্তরিল দক্ষিণ মশানে।
বাঁধিএ রাখিল নিএ সাধুর নন্দনে।।
হাতে পায়ে ডোর দিল তোকদির গলে।
অশেষ দুর্গতি দিএ রাখে সেই স্থলে।।
কাতর হইয়া বড় সাধু হৃষিকেশ।
শীতলা ভাবিএ স্তব করিল অশেষ।।
জগৎ জননী মোর কি হইল দশা।
যতো কিছু শুনি হইল তোমার ভরসা।।
দূরদেশে আনি মরে কলে দুর্গতি।
তিল অর্ধ দয়া না হইল সেবকের প্রতি।।
পাইলাম পরম তাপ উদ্ধার কর মোরে।
রহুক মহিমা তোমার জগৎ ভিতরে।।
আনাইএ দূর দেশে কেন কর বদ।
সার করি নাম তোমার ঐ রাঙা পদ।।
বারেক পদ দেহ কর পরিত্রাণ।
এত স্তব করে সাধু ভাবিএ নিদান।।
নাম ভগবতি দাস বসতি নিমিতে (নিমতায়)।
তার সুত কৃষ্টরাম রচিল কবিত্বে।।

চন্দ্রাবতী নামে দাসী দেবীর বলিলা।
কোন বুদ্ধি কর মাগো জননী শীতলা।।
আপন পূজার হেতু সাধুর নন্দনে।
আনাইলে দূর দেশে হিরণ্য পাটনে।।
মশানেতে কাটে তারে কোটাল জেএ।
ভয়পেয়ে ভাবে তোমার সাধুর তনএ।।
বারেক সদয় হয়ে করহ উদ্ধার।
সেবক মরিলে পূজা না হইবে প্রচার।।
শুনিআ পরিকর মুখে সাধু দুক্ষু পাএ।
উঠিল তোলা দেবী জ্বলে কোপে কাএ।।

গাধার উপরে দেবী সাজেন আড়ম্ব।
মাতাএ করিল কুলা কাঁখে হেম কুম্ভ।।
স্মরিল বসন্ত রাএ তুরকি ঘোড়া এ।
কলেবর শোভা করেন শন জড়াএ।।
হাতে শোভে শরাসন তূণ পূর্ণবান।
চাঁদ করে চকমক পৃষ্টে ঢাল খান ...... (?)
জ্বরাসুর জ্বরবান পাত্র পঞ্চ জন।
বিচিত্র বর্ণ ব্যাধিগণ না জাএ বর্ণন।।
নারদ আসিএ কন মধুর ভারতি।
আমার বচন দেবী কর অবগতি।।
সেবক উপরে কেন এত বড় সাজ।
সদা শিব শুনিলে পাইবে বড়লাজ।।
হেলাএ জিনিলে যম পুরন্দর আদি।
ধরাতলে এমন প্রবল কেবা বাদি।।
শুনিআ মুনির মুখে স্থির হএ কাএ।
স্বপনে রাজারে দেবী সেই রূপ কএ।।
আমি শীতলা দেবী শুন বলি রাএ।
আমারে ভাবিলে সবই দুক্ষু দূরে জাএ।।
আমার সেবকসাধু হৃষিকেশ বটে।
বন্দ করে রাখি আছ মরণ নিকটে।।
খালাস করিআ পূজ শেতলা পদেতে।
নইলে করিব বধ রাজ্যের সহিতে।।
স্বপনে শুনিআ রাজা নাহল এমন।
কোথাকার তোলা দেবী জানে কোন জন।।
হেথায় অনুচরে আজ্ঞে দিল নৃপবরে।
করে ধরে নিয়ে যাও কাটিতে সাধুরে।।
বামহাতে কেশ তার দক্ষিণ হাতে অসি।
রাহু গ্রাসিল যেন পূর্ণিমার শশী।।
শীতলারে ডাকে সাধু কাঁপিতে কাঁপিতে।
ভয়ে কর্ণধর বুক না পারে বাঁধিতে।।
জানিল তোলা দেবী অবিলম্বে কাজ।
পাঠাইল ব্যাধিগণ রাজপুর মাঝ।।
কবি কৃষ্ণরাম বলে রস মাএ বোল্।
কোতোয়াল লই পড়িল গণ্ডগোল।।

দুই হাতে বাতে ধরে খাড়াখানা পড়ে দূরে
হাত হইতে খসে পড়ে চুল।
তবে ব্যাধি বুক্কি চাপে ধরণী পড়িয়া কাঁপে
গোটা নাল ভাঙিল বহুল।।
যত সৈন্য ছিল বেড়ি সবে যায় গড়াগড়ি
পাছে ভীল(?) আছে প্রাণ ঘটে।
কর্ণধর কাছে ছিল সাধুরে অভয় দিল
জানাইল দেবীর মায়া বটে।।
ব্যাধিগণ ঝাঁক ঝাঁকে হিরণ্য পাটন ছেঁকে
ব্রাহ্মণ পাড়য় গণ্ডগোল।
বসন্তে রহিল পড়ি, গলা করে ঘড় ঘড়ি
মুখে নাহি স্বরে কার বোল।।
যোতিনী ব্রাহ্মণী যত সদাচারী অবিরত
দিন মধ্যে তিনবার স্নান।
আহার নিয়ম নাই রাএর ব্যামো সেই ঠাঁই
শয্যায় অমনি জল পান।।
কুলবধূ মনোহরা রূপ জিনি অপ্সরা
চন্দ্র সূর্য না দেখে বদন।
ছারখার কলেবর ভাঙে শঙ্খ মনোহর
পড়িয়ে কোথায় বিবশন।।
অস্থির হইলা আগে শরীর জ্বালিয়া ভাঙ্গে
বসন্ত তাহার পর হয়।
রক্তদল মৈশাদল আর ব্যাধি যে সকল
অকালেতে করিল প্রলয়।।
ঘরে ঘরে বৈদ্য পাড়া যাতনা সভার বাড়া
পর উপকারে না যায় খোঁজা।
সোনা চতুর্মুখ আর কিছুই না করে কার
বোঝার ঘাড়েতে হইল বোঝা।।
কামার রহিল পড়ি লোহা যায় গড়াগড়ি
প্রভাকর জাতি বড় জানি।
তার ঘর এই জড়ি সাধুরে দিয়েছে বেড়ি
ঘাতে ধরে চোখে পড়ে ছানি।।
ধনি বড় আলনারা কুম্ভে উদরি সারা
না বাজায় সেকারণ পুরী(?)।

পাপ ব্যাধি অতিসার ধরে রোগ স্বর্ণকার
বলে সোনা না করিব চুরি।।
কলুর বলদ পড়ে গাছ আর নাহি নড়ে
আপনারা শয্যায় কাতর।
কবি কৃষ্টরাম গায় উচিত সাজাই হয়
তেলের বাড়াও কেন দর।।
গর্ভিনীর গর্ভ খসে শোণিতে বসন ভাসে
ভেদানি কামড়ে রক্ষা নাই।
তাতে জেগিরী ধরে বাত (?) নাড়িতে না পারে হাত(?)
হাত বিনা উপায় কামাই।।
কি আর করিবে রাজা ধোপার কাপড় কাচা
অমনি রহিল বোল মাখা।
জ্বরায় ধরিল ঝোলা ভ্রমরিতে ধরে তোলা
সংশয় রহিল প্রাণ রাখা।।
পড়িল দোয়াল গাই বাছুরীর সীমা নাই
গাড়ল ছাগল লাখে লাখে।
গোয়ালা বলে বুদ্ধি জল দিয়ে দুগ্ধ বেচি
তেই হেন ঠেকিলাম বিপাকে।।
মহামারি একটানে আহিরিল সকল প্রাণে।
মহিষ আইল বলটুটি।
...... (?)নড়ি পক্ষ, কুকুরী বিড়াল লক্ষ,
......(?) ছাগল ...... হয়ঘুটী।।
বাগদী খাদাল জাতি, জ্ঞান নাহি দিবারাতি
অমনি কোতায় চক্ষু বুজে।
মন্দা অগ্নি তত হবে পেট ভোরে যত খাবে
কচ্ছপ কাঁকড়া শামুক কুঁচে।।
নেড়া মাথা চাপ দাড়ি, ঘন্টা মথা(?) দীমের বাড়ি
হানা দিল নানান প্রকার।
পীরের হাজত খানা ফয়দা উঠাইতে মানা,(?)
পন্থা চলিতে নারে আর।।
কুকুর ছটফটী, জতেক যাহার বাটী,
ডাকিতে শকতি নাহি আর।
বয়দা জাপাডেতা, কেবা তোলে নয়ছাতা(?)
হাঁস মরে হাজার হাজার।।

মাজারে ফকবে মরে পেআদায(?) স্মবণ করে
কেমনে মাগিব আর ভিক।
কেবামত ঘাটে ঘাটে, বেবয পোদের বাটে
আপনারে মানে ধিক।।
বসন্তের জ্বরপতি শতশত পড়ে ছাতি
উট গাধা ঠাই ঠাই ধোকে।
প্রমাদ পড়িল নানা ঘোড়া নাহি খায় দানা
ঘাশুড়িয়ে মরে তার শোকে।।
বানরে ছাড়িল ভাত বানুরীর মাথায হাত
হানিয়ে হইল ধড়ফড়ে।
মাষ কাটা বেদে আর বিপত্তি তাহার ঘর
পাখি যারা মারা যায় পোড়ে।।
বেড়ায় মহল দিয়ে হাজার মুচী গিযে
হানা দিল ঘোর নেবা।
কোন ব্যাধি নাহি হবে কবি কৃষ্টবাম বলে,
শীতলা দেবীর কর সেবা।।

মাব ডাকে দেবী গগন মণ্ডলে।
এখান রাজার পুরী জিয়ন্ত সকলে।।
গাধার অবধি নাই উট যত মরে।
বিপরীত গন্ধ চারিদিকে ভরে।।
রাজার প্রধান পুত্র চন্দ্রসেন নাম।
বালা মন্ত্র প্রবেশিল বাহিরএ প্রাণ।।
আর পুত্র বিরুপাক্ষ রুপে রতি পতি।
মন্দা অগ্নি তাহার শরীরে করে গতি।।
জএ সিংহ আর পুত্র সর্ব্ব জয় গাএ।
অতিসার মহাদুষ্ট ধরে গিএ তাএ।।
কনকপদ জিনি আর অনুজ তাহার (?)
রূপেতে তুলনা দিতে নাহি অন্য তার।।
বিষম মিরিগি ব্যাধি ধরিল তাহারে।
পড়িল অপর লোক বিপরীত জ্বরে।।
নৃপতির গলাএ হইল গলগণ্ড।

দুই পাএ ধরে গোদ বিষম কোরগু।।
দারুণ রোগের জ্বালাএ রানী চিন্তিত অত(?)।

(খাতার পরবর্তী অংশ ছিন্ন।)

ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রাপ্ত বসন্তরায়ের পালাটি পালাগান সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন যা পালাগান হিসাবে প্রাচীনত্বের ও দাবী রাখে। পালাগান সমূহের লিখিত রূপেব পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বসন্তরায়ের পালা ও পঞ্চানন্দের পালা ব্যতিক্রম। পালাটিব মধ্যে একদিকে যেমন পালাগানের প্রাচীন রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তেমনি তৎকালীন এই অঞ্চলের লোকসমাজের আচার আচরণ, ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদিব পরিচয় জানা যায়। পালাগানটিতে কমপক্ষে একশত বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলেব মানুষের ভাষা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাসের উপাদান ও ভৌগোলিক পবিচয বক্ষিত আছে।

দেবপালা ঃ গ্রহরাজ শনি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেব-দেবী-কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগান আলোচনায় গ্রহরাজ শনি দেবপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণায় শনিঠাকুর বড়ঠাকুর নামে পরিচিত। তাঁর পূজাকে বড়ঠাকুরের পূজা এবং ব্রতকে বড়ঠাকুরের বার বলা হয়। গ্রাম বাংলায় এই পূজার প্রচলন সম্প্রতি বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায়। শনি ঠাকুরের স্থায়ী মন্দির থাকলেও তা সংখ্যায় খুবই কম, কিন্তু প্রতি শনিবার রাস্তার মোড়ে, জনবহুল স্থানে, বাজারে এই দেবের মূর্তি দেখা যায়। গৃহে শনি দেবতার পূজা হয় না, তিনি কুলদেবতা বা গ্রামদেবতাও নন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ শনি ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ করে সেবা করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোট খড়ের বা টালির চালাঘরে দেবতার অধিষ্ঠান। নিরাশ্রয় অবস্থায়ও শনিঠাকুরের মূর্তি বিরল নয়। শনি ঠাকুরকে দেখে মানুষের ভক্তি অপেক্ষা ভয়ই বেশি। সংসার জীবনে কোন কু-প্রভাব অর্থাৎ ইহলৌকিক বিঘ্ন আচমকা যাতে না আসে তার জন্যই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার প্রবণতা দেখা যায়। অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস, জীবনে যত বিঘ্ন আসে সব শনির দশাতেই। সুতরাং বিঘ্নহীন জীবন যাপনের জন্য শনিঠাকুরের সন্তুষ্টি বিধান একান্ত আবশ্যক বলে মানুষ মনে করে। প্রকৃত পক্ষে লোকবিশ্বাসে শনিদেবতা হলেন বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দেবতা। 'শনি' নাম উচ্চারণ করলে বিঘ্ন হতে পারে এই বিশ্বাসের কারণে তাঁকে 'বড়ঠাকুর' বলা হয়।

শনিদেবতার কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও মহাভারতে আছে। শনি সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যা উল্লেখ আছে তা হল "সূর্যের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী ছায়ার গর্ভে দুই পুত্র শনি ও সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। চিত্ররথের কন্যা এঁর স্ত্রী। এক সময় শনি ধ্যানমগ্ন ও পূজারত ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয়ে সুন্দর বেশভূষা করে তাঁর কাছে এসে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন, কিন্তু ধ্যানমগ্ন শনি স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না এবং তাঁর ঋতু রক্ষাও করলেন না। এতে স্ত্রী ক্রুদ্ধা হয়ে স্বামীকে শাপ দেন তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সেই বিনষ্ট হবে।

পার্বতীর পুত্র গণেশ জন্মগ্রহণ করলে দেবতারা পুত্র দর্শন করতে এলেন। সেই সঙ্গে শনিও আসেন, কিন্তু তিনি পার্বতীর পুত্র গণেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। কারণ স্ত্রীর অভিশাপে তিনি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন সেই বিনষ্ট হবে। পার্বতী এ কথা অবিশ্বাস করে শনিকে তাঁব পুত্রমুখ দর্শন করতে বললেন। তখন শনি বাধ্য হয়ে গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দৃষ্টিপাত করা মাত্র গণেশের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। পুত্রকে মস্তকহীন দেখে পার্বতী শনিকে শাপ দিলেন। এর ফলে শনি খোঁড়া হয়ে গেলেন।"[১]

কাশীরাম দাসের মহাভারতে বনপর্বে সূর্যপুত্র শনির কথা উল্লেখ আছে। সেখানে শনি শ্রীবৎস রাজার বিচারে লক্ষ্মীর নিকট ছোট হয়ে যাওয়ায় রাজার দেহে প্রবেশ করে বহু দুঃখ কষ্ট দেন।

অন্তরীক্ষে থাকে শনি, কহিছে আকাশবাণী
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দড়
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি।[২]

বহু দুঃখ কষ্ট দেবার পর শনিদেবতা রাজাকে আশীর্বাদ করেন। দুর্ভাগ্য অন্তে রাজা শ্রীবৎস প্রজাদের নিয়ে বসে আছেন, সেই সময় শনি আকাশবাণী করে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেন—

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ সকলি আমার ভক্ষ্য
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর রাক্ষস কিন্নর নর
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে।।

*** *** ***

কহিতে কহিতে শনি আইল মরুত ভূমি
যথা সভামধ্যে সর্বজন। ·
আরক্ত পিঙ্গল বর্ণ রূপ যেন তপ্ত স্বর্ণ
পরিধানে সুরক্ত বসন।।

*** *** ***

দেশে যাহ নৃপবর একছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ হাজার বছর।
পুত্র পাবে শত জন কন্যারত্ন মহাধন
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর।।

*** *** ***

শ্রীবৎসকে দিয়া বর অন্তর্ধান শনৈশ্চর,
গেল শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে।[২]

অনুমান করা যায় মহাভারতে বর্ণিত শনির পরিচয় থেকেই শনি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ভয়ভীতি ও দুর্ভাগ্য অন্তে সৌভাগ্যলাভ এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। এই বিশ্বাস বিংশ শতকের শেষপর্বে যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় পূর্বে তেমন ছিল না বলে জানা যায়।

পুরাণাদিতে শনিদেবতার মূর্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল তাঁর আরক্ত পিঙ্গলবর্ণ, তপ্তস্বর্ণের মত রূপ, তিনি সুরক্ত বসন পরেন। প্রচলিত পাঁচালিতে তিনি নীলাম্বর। হাটে, মাঠে, পথে লোকালয়ে যে শনিমূর্তি পূজা হয় তা সাধারণত চতুর্ভুজ, শকুন বাহন, দেহ ঘন কৃষ্ণবর্ণ বা ঘন নীল বর্ণ। তাঁর দক্ষিণ হাতের উপর হাতে তরবারী, নিচের হাতে আশিস মুদ্রা। বাম হাতের উপরে ত্রিশূল নিচের হাতে পদ্ম। কোন কোন ক্ষেত্রে শনিদেবতার সম্পূর্ণ কৃষ্ণমূর্তি। তাঁর মাথায় চূড়া, গলায় ফুলের মালা ও নানা বহুমূল্য অলঙ্কার, নীল বসন, কাঁধে উড়নী, পায়ে নূপুর, হাতে বালা ইত্যাদি অলঙ্কার থাকে। কোথাও শালগ্রামে শনি পূজার প্রচলন আছে। কেউ কেউ কেবল ঘটে শনি ঠাকুর কল্পনা করে পূজা করেন।

শনিদেবতার পূজার উপকরণ হল,— পাঁচটি গোটা ফল, গোটা পান সুপারী, কালো পাড় ধুতি, লোহার আসন, অঙ্গুরীয়, মধুপর্কের বাটি, মাষ কলাই, কৃষ্ণ পুষ্প, সোয়াসের পরিমাণ শিরণী, ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদি। এছাড়া মূর্তির সম্মুখে থাকে পিতল বা মাটির ঘট, আম্র পল্লব, সশীষ ডাব, পুষ্প, দূর্বা, গামছা, মাটি, সিন্দুর ও ধান্য। অপরাজিতা ফুল, ধূপ, ধুনা ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকে। প্রতি শনিবার শনিদেবতার পূজা হয়। ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠান করেন। শনি ঠাকুরের ব্রত সাধারণত মহিলারাই পালন করেন। ব্রতিনী উপবাসে থাকেন। যতক্ষণ পূজা না হয় ব্রতিনী অন্ন স্পর্শ করেন না। পূজা শেষে প্রসাদ পেয়ে তারপর অন্নাদি গ্রহণ করেন। শনি দেবতার প্রসাদ বাড়ির মধ্যে আনা হয় না। পূজা স্থলে ভক্তদের দেওয়া হয়। বাড়িতে যাঁরা আনতে চান তাঁরা লোকজনদের বাড়ির বাইরে ডেকে প্রসাদ বিতরণ করেন। পূজা শেষে ব্রাহ্মণ শনির পাঁচালি পাঠ করেন।

সম্প্রতি শম্ভুনাথ বিশ্বাস বিরচিত শনির পাঁচালি নামে একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ দেখা যায়। তাতে সুমঙ্গলকথা ও শঙ্খপতি সদাগরের কথা নামে শনির মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাহিনী আছে। কাহিনী দুটি অতি সংক্ষিপ্ত। সুমঙ্গল কথা নামক কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

সুমঙ্গল কথা

শ্রীহরি নামে এক ব্রাহ্মণের একমাত্র সন্তান হল সুমঙ্গল। কৃষ্ণের কাছে কামনা করে এই সন্তান লাভ হয়েছে। সন্তান অল্প বয়সে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তিনি কৃষ্ণ ভক্তিতে অস্থির হয়ে সংসার ত্যাগ করে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। তারপর মাতা-পিতা বিয়োগ হওয়ার পর গয়ায় পিণ্ড দান করে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীবৎস ভূপতির রাজসভায় আসেন এবং তাঁর দুটি সন্তানের শিক্ষার ভার নেন। সেই সময় শনি তাঁর দেহে প্রবেশ করে সুমঙ্গলের বুদ্ধি হরণ করেন। শেষে নিজেই ছাত্র হয়ে তাঁর কাছে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে শনির পরিচয় পাননি। শেষে পরিচয় জেনে নিজের দুর্ভাগ্য দূর করার জন্য শনিকে বলেন—

আমার উপরে আছে তোমার কটাক্ষ।
কিসে যাবে বল দেখি হইয়া স্বপক্ষ।।
শনি বলে বলি তবে শোন মহাশয়।
মম ভোগ দশবর্ষকাল মাত্র হয়।।

তৎসত্ত্বেও শনিদেব ব্রাহ্মণের শনি মুক্তির উপায় বলে দেন। দশ দণ্ড সময় শ্রীহরিকে একমনে স্মরণ করলে তাঁর থেকে শনির কোপ দূর হবে। এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ জাহ্নবীর তীরে গিয়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করতে থাকেন, কিন্তু দশ দণ্ড পূরণ হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ উঠে পড়েন। তাতেই শনির কোপ আরো বেড়ে যায়। রাজপুত্রদ্বয়কে শনি অন্যত্র লুকিয়ে রেখে রাজপুত্রের অনুরূপ দুটি মায়ামুণ্ড নির্মাণ করে হরির ধ্যানরত সুমঙ্গলের উরুর উপর স্থাপন করেন এবং রাজাকে স্বপ্নে তা দেখান। রাজা কাতর হয়ে পুত্রের গৃহশিক্ষকের আচরণে বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণকে কারারুদ্ধ করেন। সেখানে দশদণ্ড একমনে হরির ধ্যান করে সুমঙ্গল শনির প্রভাব মুক্ত হন। রাজাও তাঁর সন্তান ফিরে পান। তারপর রাজা ও বিপ্র সুমঙ্গল শনি দেবতার পূজা করেন। পূজার বিধিও দেবতা বলে দেন—

নীল বসন, কৃষ্ণ তিল, তৈল যে দিবে।
মুগ মাষ কলাই সংগ্রহ করিবে।।
কৃষ্ণবর্ণ ঘট চাই করিতে স্থাপন।
পঞ্চজাতি ফল ফুলে করিবে অর্চ্চন।।

** ** **

পূজা অন্তে করিবে আমারে প্রণাম।
নবগ্রহ স্তোত্র পাঠে লইবেক নাম।।
পরেতে প্রসাদ খাবে করিয়া যতন।
সর্বপাপে মুক্ত হবে আমার বচন।।
অভক্তিতে যেই আনি প্রসাদ খাইবে।
অল্পদিনে কৃতান্তের ভবনে সে যাইবে।।

শঙ্খপতি সদাগরের কাহিনী

শঙ্খপতি একজন সদাগর। তিনি একশত জাহাজ নিয়ে বাণিজ্যে যান। যাত্রাকালে গঙ্গাতীরে এক ব্রাহ্মণকে শনিপূজা করতে দেখে সদাগর শনিপূজা শুরু করেন। তাতে শনি তুষ্ট হয়ে তাঁকে বহু ধন সম্পদ দান করেন। একদিন পূজায় ত্রুটি হওয়ায় শনি কোপদৃষ্টি দেন। তাতে শঙ্খপতি চুরির দায়ে ধরা পড়েন ও বিদেশে রাজার কারাগারে বন্দী হন। তারপর শনির পূজা এক মনে এক ধ্যানে করায় শনি সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে স্বপ্ন দেখান ও রাজা শঙ্খপতিকে মুক্তি দেন। তারপর সেই দেশের রাজা ও শঙ্খপতি শনি পূজা করেন। এইভাবে শনি পূজা প্রচার হয়। ***(সংক্ষিপ্ত)***

সুতরাং পুরাণাদি কাহিনীতে শনিদেবতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় শনি আদিতে অর্থাৎ ব্রহ্মাবৈবর্ত্ত পুরাণে একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। স্ত্রীর অভিশাপে তাঁর দৃষ্টি-দুষ্ট হয়। পার্বতীর অভিশাপে তিনি খোঁড়া হন। মহাভারতে শনির দুষ্ট-দৃষ্টির প্রভাবে শ্রীবৎস রাজা দুঃখ-ক্লিষ্ট হন, প্রচলিত পাঁচালিতে সুমঙ্গলব্রাহ্মণ ও শঙ্খপতিসদাগর কষ্ট-ক্ষীণ হন। অবশ্য মর্ত্যের উভয়েই মেয়াদ অন্তে অশেষ ধনসম্পদের অধিকাবী হন। শনিদেবতা যেন গায়ে পড়ে কোন্দলে অভ্যস্ত। লোকবিশ্বাস তিনি নরের সুস্থ মনকে ব্যস্ত করে তোলেন। সুস্থ জীবনকে দুঃসহ করে তোলেন। তাই সাধারণ মানুষেব মনে শনিদেবতা বিভীষিকাময়। যা কিছু দুর্দৈব সবই যেন শনির প্রভাবে ঘটে। শনি দুষ্ট গ্রহ স্বরূপ। গ্রহেব ফেরে মানুষের জীবনে যত দুঃখ কষ্ট। শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে শনি নামটিও অনিষ্টকারক। তাই তিনি গ্রহরাজ বা বড়ঠাকুর।

শনিদেবতার পাঁচালি পূজাস্থলে পাঠ করা হলেও পাঁচালিগান হতে তেমন দেখা যায় না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হারান পণ্ডিত (খেঁজুরতলা গ্রাম) একটি শনির পাঁচালি লিখে গানের দলে দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। বেগমপুর গ্রামের সুদিন মণ্ডল সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন তিনি হারান পণ্ডিতের লেখা সেই গান কয়েকটি আসরে গেয়েছেন, কিন্তু সে খাতাটি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বারুইপুর থানার রঘুনন্দনপুর গ্রামের পশুপতি পাল শনিঠাকুরের একটি পালাগান লিখে সুদিনবাবুকে দিয়েছেন বলে লেখক জানিয়েছেন। সেটিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। চব্বিশ পরগণার শনিদেবতার পূজা স্থলে শনির মাহাত্ম্য বা পাঁচালি পাঠকরা হয় কিন্তু পালাগানের আসর তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। পুনপোয়ার শ্যামল সরদার উক্ত পাঁচালি অবলম্বনে কয়েক আসর পালা গান করেছেন বলে সাক্ষাতকারে জানান। শনি ঠাকুরের পূজা, গান বা পাঁচালি পাঠ কেবল চব্বিশ পরগণা নয় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হয়ে থাকে বলে জানা যায়। পুরাণাদিতে শনি ঠাকুরের যে পরিচয়ই লাভ করা যাক্না কেন মৌলিক তাৎপর্যে তিনি চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে লৌকিক দেবতা রূপে পূজিত হন। লোকবিশ্বাস, তিনি বিঘ্ন সৃষ্টিকারী লোক দেবতা, কিন্তু পূজার্চনা দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে তিনি যথেষ্ট ধনসম্পদ দান করেন ও ইহলৌকিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কৃপায় লাভ করা যায়।

পাদটীকা

১. সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান।

২. কাশীরাম দাস, মহাভারত, বনপর্ব ।

দেবপালা ঃ ধর্মঠাকুর

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে অন্যতম হল ধর্মঠাকুরের পালা। পালাগান আলোচনায় এটি দেবপালার অন্তর্গত। সমগ্র চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের পূজা বা ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত পালাগানের প্রচার অধিক নয়, তথাপি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকায় ধর্মঠাকুর এক বিশিষ্ট লৌকিক দেবতা যার প্রধান বিস্তার ক্ষেত্র প্রাচীন রাঢ়ভূমি। এই বিশিষ্ট লোক-উৎসবটি অখণ্ড চব্বিশ পরগণায় বিশেষত মজে যাওয়া আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে কিছু পালাগীতিরও প্রচলন দেখা যায়।

চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন নাম প্রচারিত আছে। যেমন—ধর্মনারায়ণ, যমরাজ, ধর্মরাজ, প্রেতপতি, কূর্মদেবতা, সূর্যদেবতা, ধর্মসনাতন, যুধিষ্ঠির, ধর্মঠাকুর, বাবাঠাকুর ও ধর্মনিরঞ্জন। উত্তর চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রগবেষণার সূত্রে দেখা যায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা (বুনো) 'বুড়োবুড়ি পূজা' কে ভাষান্তরে 'মাতোয়া পূজা' বা ধর্মপূজা বলেন।[১]

এই জেলার বাইরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মঠাকুরকে বিভিন্ন নামে পূজা করেন। প্রসঙ্গত যা উল্লেখযোগ্য, ছোটনাগপুরের ওরাং জাতি ধর্মেশ নামে এক দেবতার পূজা করেন। বিহারের কুর্মী নামে আদিবাসী সম্প্রদায় ধর্মকে সূর্য নামে পূজা করেন। আসামের এক পার্বত্য জাতি (মিকির) আরনামপারো নামে এক দেবতার পূজা করেন, যার পূজাচার সূর্য বা ধর্মদেবতার অনুরূপ বলে জানা যায়। উত্তরপূর্ব ভারতের সাংতাম নামক নাগাজাতির এক শাখার মধ্যে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ধর্মঠাকুরের পূজাচারে সূর্যপূজার রীতি প্রচলিত আছে। পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত ইতুপূজা, তপাব্রত পূজা ও মাঘমণ্ডল সূর্যপূজার নামান্তর, যার মধ্যে ধর্মপূজার অনেক সংস্কার পালিত হয়। এছাড়া ধর্মঠাকুর আরও অনেক নামে পরিচিত আছেন। যেমন বাঁকুড়ারায়, দলুরায়, জগৎরায়, মোহনরায়, যাত্রাসিদ্ধিরায়, কালুরায় ইত্যাদি। তিনি কখনো ব্রাহ্মণ বেশে ভক্তের কাছে আবির্ভূত হন, কখনো মুসলমান ফকিরের বেশ ধারণ

করেন। বৌদ্ধধর্ম ত্রিশরণ যথা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিবিধ শরণের মধ্যে ধর্মপূজার বা ধর্মদেবতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন।[২] প্রচলিত মঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরকে ধর্মনিরঞ্জন, ধর্ম সনাতন বলা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবি বলেছেন—

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম
বিশ্বরাজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধনে।। (ঘনরাম চক্রবর্তী)

ধর্মঠাকুরের নামকরণ পূজাচার প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে ধর্মঠাকুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসজাত এক লৌকিক দেবতা। এই দেবতা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ, খ্রীস্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মীয় প্রভাবে নানা সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। ধর্মঠাকুর ও তাঁর পূজা বর্তমানে অন্তেবাসী সম্প্রদায়, মেয়েদের ব্রত কথা ও নানা ধর্মীয় আচার আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা হিসাবেই পূজিত হন।

চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের বিবিধ মূর্তি বা প্রতীক পূজা হতে দেখা যায়। এই অঞ্চলে যেমন ধর্মঠাকুরের নুড়ি বা শিলা দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন প্রকার বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার কোথাও বট বা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বা উন্মুক্ত স্থানে কেবল মাটির বেদীকে ধর্মঠাকুর রূপে পূজা করা হয়। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন ঘেঁষা অঞ্চলে হিন্দুসেনাপতির ন্যায় সুসজ্জিত মহিষবাহন ও হংসবাহন কোথাও বাহন হীন শুভ্রবর্ণ শান্ত-সৌম্য ধর্মঠাকুর প্রত্যক্ষ করা যায়। মহিষবাহন ধর্মঠাকুরকে আঞ্চলিকভাবে যম ধর্ম ও হংস বাহন ধর্মঠাকুরকে সনাতনধর্ম বলা হয়। এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে জয়নগর থানার দঃ বারাসত অঞ্চলের ও করাবেগ অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। যমধর্মের বামদিকে ছাগমুণ্ড বিশিষ্ট এক মূর্তি দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে এঁকে যমের অনুচর বা দক্ষ বলে। যমধর্মের মূর্তি অনেকখানি ধপধপির দক্ষিণরায়ের মূর্তির ন্যায় (দ্রষ্টব্য : দেবপালা অধ্যায়-দক্ষিণরায়)। দেবতা বিস্ফারিত নেত্রে দূরে কাউকে প্রশাসনিক দৃষ্টিতে যেন নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর বামহাতে ধনুক ও ডানহাতে তীর, পিঠে তীরসহ তূণ। কোথাও ধর্মরাজের বামহাতে ধনুক, ডানহাতে গদা ও পিঠে তীর পূর্ণ তূণ দেখা যায়। তাঁর মাথায় গোলাপী উষ্ণীষ, কুণ্ডলীকৃত চুল কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত, মোচা গোঁফ, কানে কুণ্ডল, গলায় চীক বা গলাপটি, পায়ে নাগরা জুতা, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মোজা, হাঁটু পর্যন্ত আঁটোসাটো কাপড় পরা, পিঠে কাঁধ থেকে প্রলম্বিত টেল, কোমরে কোমর বন্ধ বা পেটি থাকে। যমধর্মের হাতে তাগা, গলায় পৈতাও দেখা যায়। তাঁর গায়ের রঙ নীল, কোথাও ঘন সবুজ, স্থূল পেশিবহুল মজবুত গঠন। মূর্তির গঠন এই অঞ্চলে বহুল পূজিত পঞ্চানন্দের মূর্তির ন্যায়। কেবল গায়ের রঙ-এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যমধর্মের পদতলে মহিষ (বাহন) দেখা যায়। তাঁর অনুচর(?) বা দক্ষের মূর্তি অপেক্ষাকৃত ছোট। দক্ষের মাথায় রাজপাগড়ি, খালি গা, ধূসর বর্ণ ও হাঁটুর

উপর পর্যন্ত আঁটোসাটো কাপড় পরা। যমধর্ম এককভাবে পূজিত হতে দেখা যায় কিন্তু সনাতন ধর্ম চণ্ডী, শীতলা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবদেবীর সাথে পূজিত হন। চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের বেশিরভাগ থান বা মন্দিরে মূর্তি থাকলেও ধর্মশিলা বা নুড়ি প্রত্যক্ষ করা যায় এবং মজে যাওয়া আদিগঙ্গার তীরবর্তী বা নিকটবর্তী অঞ্চলে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন কুলপী থানার পাকুড়তলা, চক্রতীর্থ, শ্যামপুর, চণ্ডীপুর, আকড়া-বেড়িয়া, হরিচাঁদা গ্রামে, বারুইপুর থানার বোলিবামনি গ্রামে ধর্মঠাকুরের মূর্তি পূজিত হতে দেখা যায়।

ধর্মঠাকুরের আরও বিভিন্ন ধরনের মূর্তি পূজার কথা জানা যায়। যেমন H.H. Risley তাঁর Tribes and Castes of Bengal (1891) 1.241 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ মৎস্যপুচ্ছ বিশিষ্ট নরাকৃতি ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু Archaeological Survey of Mayurbhanj (1911), XCVI. গ্রন্থে উড়িষ্যায় বুদ্ধ ও পৌরাণিক বিষ্ণুর মিশ্র আদর্শে গঠিত মূর্তিকে ধর্মঠাকুরের মূর্তি বলে নির্দেশ করেছেন।[৩] ধর্মঠাকুরের প্রতীক শিলা বা নুড়ি এই অঞ্চলের অনেক থান বা মন্দিরে পূজা হতে দেখা যায়। সিংহাসনের উপর একাধিক পাথরের নুড়ির মাঝে একটিকে ধর্মঠাকুর রূপে কল্পনা করা হয় এবং অন্যান্য শিলাকে বিষ্ণু, শিব, শক্তি (চণ্ডী) শীতলা, মনসা ও গঙ্গার প্রতীক রূপে পূজা করা হয়। বারুইপুর থানার রাজপুর, ধোপাগাছি, নিহাটা কল্যাণপুর, বিদ্যাধরপুর, নড়িদানা ও সীতাকুণ্ডগ্রামে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে এরূপ পূজাভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়া ফলতা থানার মামুদপুর, বুড়ুল, বিষ্ণুপুর থানার চকমানিক, জয়ন্তীপুর, বেহালার মহেশতলা, গাবতলা, সাপারায়পুর, কুলপী থানার চণ্ডীপুর প্রভৃতি থানে ধর্মঠাকুরের নুড়ি ও ঘটপূজা হয়। ধর্মমঙ্গলের লেখক মানিক গাঙ্গুলী রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানের ধর্মশিলাকে কাঁকড়া বিছা সদৃশ বলেছেন। শূন্যপুরাণে কূর্মকে ধর্মঠাকুরের বাহনরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, এই কাব্যে উলূক ও হংসকে ধর্মঠাকুরের বাহন বলা হয়েছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বর্তমানে চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের মূর্তি কল্পনার মধ্যে আঞ্চলিক ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অবশ্য ধর্মঠাকুরের নুড়ি বা শিলা পূজার মধ্যে অন্যান্য অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য দেখা যায়, যা এই পূজার প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবক হলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু। ডোম, যুগী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, জেলে, নাপিত, বাগদী, সদগোপ, ধোপা, ময়রা, আগুরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মপূজায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেখানে অভিজাতদের আধিপত্য, সেখানে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মঠাকুরের সেবার কুলকৌলিক অধিকার খর্ব হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণব্রাহ্মণ ধর্মঠাকুরের সেবার দায়ভার গ্রহণ করে ধর্মঠাকুরকে কূর্মাবতার বিষ্ণু বা নারায়ণের মর্যাদায় বিষ্ণুমন্ত্রে পূজার্চনা করেন। এক্ষেত্রে ডোম, বাগদী, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ ঢাক বাজান, বলি দেওয়া ইত্যাদি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানগুলি পালন করেন।

চব্বিশ পরগণার বাইরে উপর্য্যুক্ত সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মপূজা করেন। যেমন ছোটনাগপুরে ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো, বীরহোর, খন্দ, খবিয়া, ভুইএঞা, বোণ্ডা, জুয়াঙ, শবর, সাঁওতাল, কোরোয়া, পার্বত্য খরিয়া, মালে বা সৌরিয়া, পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতি, আসামের মিকির ফায়েঙলুই, মণিপুর অঞ্চলের মাওনাগাগন, উত্তর পূর্ব ভারতের সাংতাম নামক নাগাজাতি, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী, দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক ভাষাভাষী প্রত্যেক আদিম জাতি, মানভূমের কুর্মী, বাউরী প্রভৃতি জাতির মধ্যে ধর্মপূজার প্রচলন আছে বলে জানা যায়।[৪] বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্মঠাকুরের দেয়াশীর পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন — উগ্রক্ষত্রিয়, কর্মকার, কলু, কুম্ভকার, কৈবর্ত বা ধীবর, গোহালা, গন্ধবণিক, চাষা, ডোমপণ্ডিত, তন্তুবায়, দুলে, ভাণ্ডারী, বাউরী, বাগদী, ব্রাহ্মণ, মাল, মালাকার, ময়রা, মুচি, রজক, রাজপুত, লোহার, হাড়ি, শুড়ি, সদগোপ, সাহানা প্রভৃতি।[৫]

চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রগবেষণা কালে লক্ষ্য করা গেছে যেখানে ধর্মঠাকুরের নুড়ি বা কূর্ম পূজা হয় সেখানে প্রধানত নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ের মানুষ সেবার দায়িত্বে থাকেন, যেখানে ধর্মের মূর্তিপূজা হয় সেখানে পূজানুষ্ঠান করেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের অনেক নাথযোগী তাঁরা নিজেদের শিবের উপাসক বা শিবগোত্র বলে পরিচয় দেন। তাঁরা শিবকে ধর্মঠাকুর বলে মনে করেন। যেখানে মূর্তি পূজা হয় সেক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মঠাকুরকে ধর্মরাজ, যমরাজ, বুদ্ধদেব বা যুধিষ্ঠির বলেন। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায় যে, চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের মূল সেবক যুগীসম্প্রদায়ের ভক্তের অনেকে নিজেদের চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য বা ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় প্রদান করেন। স্থানীয়ভাবে তাঁরা প্রধানত যুগী বা পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত হন।

চব্বিশ পরগণা জেলায় ধর্মপূজার উপকরণ ও আচার-আচরণাদির মধ্যে থান বা মন্দির বিশেষে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ধর্মঠাকুরের যে-সমস্ত থানে ধর্মের নুড়ি বা শিলা পূজা হয় সাধারণত সেখানে ফল বা প্রাণী বলি দেওয়া হয়। ছাগ, পায়রা, বলি-কুমড়ো, হাঁস, মুরগি এক্ষেত্রে বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কোন কোন থানে ঐ সব প্রাণী ধর্মঠাকুরের মন্দিরের নিকট ছেড়ে দেওয়া হয়। অনেকে মানত অনুযায়ী ষাঁড় ছেড়ে দেন।

ধর্মঠাকুরের যে-থানে ধর্মের মূর্তি পূজিত হয় সেখানে সাধারণত কোনরূপ বলি দিতে দেখা যায় না। হাঁস, মুরগি, বোয়ালমাছ, পায়রা, ষাঁড় ইত্যাদি প্রাণী মানত অনুযায়ী ধর্মের নামে মুক্তি দেওয়া হয়। এই মুক্ত প্রাণী স্থানীয় মানুষেরা ধরে খায়। মুক্ত ষাঁড় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের ষাঁড় হিসাবে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। অবশ্য ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায় যে, অনেকে ধর্মের ষাঁড়কে বর্তমানে বলদ করে চাষের কাজে ব্যবহার করেন। ধর্মঠাকুরের থানে মুরগির ডিম, মানকচু, ওল, শ্বেতপদ্ম, বোয়ালমাছ ধর্মপূজার বিশেষ উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া থাকে নানারকম ফলমূল, চিনি-সন্দেশ-বাতাসার ডালা এবং ডালার উপর

পৈতা। কেউ ধর্মঠাকুরের নিকট ধূপবাতি জ্বেলেও পূজা দেন। ধর্মপূজার দিন স্থানীয়ভাবে গৃহস্থ বাড়িতে পান্তাভাত (শীতল) খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

ধর্মঠাকুরের কোথাও নিত্যপূজা হয়, কোথাও বাৎসরিক পূজা হয়। যেখানে দেবতার প্রতীক শিলা বা মূর্তি আছে সেখানে সকাল সন্ধ্যা ধূপবাতি প্রদীপ জ্বেলে শীতল সন্ধ্যা ও ডালা পূজা দেওয়া হয়। এছাড়া জাঁকজমক সহকারে বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঠাকুরের যেখানে কোন মূর্তি বা নুড়ি শিলা নেই, আছে কেবল মাটির বেদি, সেক্ষেত্রে সাধারণত বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়। বাৎসরিক পূজাকে সাধারণভাবে 'ধর্মের জাত' বলে। বৈশাখ মাসের বুদ্ধপূর্ণিমার দিন ধর্মঠাকুরের জাত পূজা হয়।

ধর্মঠাকুরের জাতপূজা উপলক্ষে পূজার প্রধান অঙ্গ হিসাবে ধর্মের ঝাঁপ পালিত হয়। ধর্মের ঝাঁপ অনেকখানি শিবের গাজনের ঝাঁপের মত। যাঁরা ধর্মের ঝাঁপে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের ধর্মের সন্ন্যাসী বলে। ধর্মঠাকুরের কাছে মানত করে যাঁরা রোগমুক্ত বা সমস্যামুক্ত হয়েছেন সাধারণত তাঁরাই ধর্মের সন্ন্যাসী হন। ধর্মের ঝাঁপ বাঁশবাঁধা উঁচু ভারা বা সাঙার উপর থেকেই অনুষ্ঠিত হয়। সাঙার নিচে থাকে ছেঁকুল কাঁটার পালা, খেঁজুর গাছের কাটা মাথা, লোহার বঁটি, পাটফুল (ফলাহীন বড় মাছ কাটা বঁটির কাঠ অংশের উপর অর্ধ পঞ্জরাকৃতির লোহার পাত সিন্দূর মাখিয়ে সাজান থাকে) ইত্যাদি বস্তু। ধর্মের সন্ন্যাসীগণ সাঙার উপর থেকে ধর্মপূজার শ্বেত পদ্মফুল হাতে নিয়ে ধর্মের নামে ধ্বনি দিতে দিতে হাত উঁচু করে টান টান হয়ে বিপজ্জনকভাবে ভারার নিচে পেতে রাখা বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ধর্মঠাকুরের পূজা প্রতি শনি ও মঙ্গলবার এবং পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বৈশাখী পূর্ণিমার দিন থাকে ঠাকুরের জাতপূজা। পূজানুষ্ঠানের দিন ভক্তগণ মানত অনুযায়ী জোড়াশিবের ছলন মাটির খেলনা ঘোড়া, গরুর দুধ, জমির নতুন ফসল, ওল, কচু, পদ্মফুল, বোয়ালমাছ, মুরগির ডিম, ইত্যাদি উপকরণসহ পূজা দেন, গণ্ডি কাটেন, হাতে মাথায় ধুনো পোড়ান। বৈশাখী পূর্ণিমার একমাস আগে থেকে ডোমসম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মমন্দির কেন্দ্রিক দশ-বারোটি গ্রামে ঢাক বাজিয়ে ধর্মের জাতের সংবাদ ছড়িয়ে দেন এবং চাল পয়সা আদায় করেন। স্থানীয়ভাবে এই প্রথাকে 'ধর্মের ঢাকে বাড়ি পড়া' বলা হয়। এই অঞ্চলে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া 'ধর্মের ষাঁড়' লোকবিশ্বাসে ধর্মঠাকুরের প্রতীক রূপে মান্য হয়। শস্য ক্ষতি করলেও কৃষক একে আঘাত করে না। প্রাচীন ব্যক্তির অনেকেই ধর্মের ষাঁড় দেখতে পেলে গায়ে হাত দিয়ে বা দূর থেকে নমস্কার করেন। স্থানীয় ভাবে গরুর প্রথম বাচ্চা আসার সময় হলে প্রথমে ধর্মের ষাঁড় দেখানোর প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে ধর্মঠাকুর রোগ-শোক প্রতিকারক লৌকিক দেবতা রূপে পূজিত হন। লোকবিশ্বাস, ধর্মঠাকুর আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আর্ত মানুষকে মুক্তি দেন। কুষ্ঠ, অন্ধত্ব ও বিবিধ চর্মরোগ তাঁর আজ্ঞাবহ। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, ছুলি রোগ হলে রোগগ্রস্ত মানুষ ধর্মঠাকুরের নিকট মানকচুর মানত করেন। শ্বেতী

(ফুল) ও পদ্মকাঁটা হলে শ্বেত পদ্ম ও বোয়াল মাছের মানত করেন। অনেক সময় শিশুদের বোল ফুটতে দেরী হয়। ধর্মদেবতার নিকট ওল দিয়ে পূজা দিলে শিশু তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে। এছাড়া বাত রোগ, খোঁড়া বা পোলিও রোগে এবং মেয়েদের গোপন রোগে ধর্মঠাকুরের তেলপড়া, জলপড়া, বিশেষ কার্যকরী ওষুধ বলে প্রচলিত বিশ্বাস। বন্ধ্যানারী সন্তানলাভের পর ধর্মঠাকুরের নিকট গণ্ডিকাটা, হাতে মাথায় ধুনা পোড়ান ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধনমূলক অনুষ্ঠান করেন। এছাড়া সংসারের সুখসমৃদ্ধি, জমির ভাল ফসল, অধিক দুধ, মামলা মকদ্দমায় জয়লাভ, মেয়ের বিবাহ, ছেলের চাকুরি ইত্যাদি ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধির জন্য ধর্মঠাকুরের নিকট মানত করে পূজা দেবার রীতি প্রচলিত আছে। সুবর্ষণের জন্য গ্রামভিত্তিকভাবে ধর্মঠাকুরের নিকট পূজা দিতে শোনা যায়।

ধর্মঠাকুরের তেলপড়া বা জলপড়ার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি পালিত হয়। রোগী বা রোগীর অভিভাবক বাটি বা শিশিতে তেল বা জল নিয়ে বাবার ঘটে ঢেলে দিয়ে তা পুনরায় ধরে নেন। অথবা তেল বা জলের পাত্র মন্দিরে বা থানে কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে পরে তুলে নেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস, বাবার দৃষ্টি ঐ তেল বা জলের উপর পড়ে। বাবার কৃপাদৃষ্টি তেল বা জলের উপর পড়ে বলেই এটি তেলপড়া বা জলপড়া বলে কথিত হয়। ঐ তেল বা জলপড়া ভক্তিভরে ব্যবহার করলে ধর্মঠাকুরের কৃপায় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আবোগ্য হয়, বিশেষত বাতরোগে ধর্মঠাকুরের তেলপড়া অব্যর্থ ওষুধ রূপে এই অঞ্চলের লোকসমাজে ব্যবহৃত হয়।

ধর্মঠাকুরের থানে হাতে মাথায় ধুনো পোড়ানর একটি বিশেষ রীতি এই অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত আছে। ব্রতিনী নিজের জন্য বা সন্তানাদির জন্য মানত করে হাতে মাথায় ধুনো পোড়ান। ব্রতিনী প্রথমে ধর্মঠাকুরের থান বা মন্দিরের নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করে কাপড় না নিংড়ে গণ্ডি দিয়ে বাবার মন্দির তিন, পাঁচ বা সাতবার প্রদক্ষিণ করে ধর্মঠাকুরের দরজা বা থানের সামনে দেবতার দিকে মুখ করে পদ্মাসনে বুদ্ধদেবের মতন বসেন। তার পর তাঁর দুই হাতে ও মাথায় একতাল পরিমাণ আঠাল কাদা দিয়ে তার উপর জ্বলন্ত অঙ্গারসহ নতুন মালসা দেওয়া হয় এবং তাতে মাঝে মাঝে ধুনো ছেটান হয়। এই অবস্থায় মহিলা, শিশু, কিশোর কিশোরীরা ঐ ব্রতিনীর কোলে বসে ধর্মবাজের নিকট হাতজোড় করে বা মাটিতে মাথা রেখে নমস্কার করে উঠে যান। অবশেষে ব্রতিনী নিজে সাষ্টাঙ্গে ধর্মঠাকুরের নিকট নমস্কার করে উঠে পড়েন। একেই বলে 'হাতে মাথায় ধুনো পোড়ান' অনুষ্ঠান। হাতে মাথায় ধুনো পোড়ানর রীতি অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর থানেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের থানে বা মন্দিরে ধর্মঠাকুরের পালাগান অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকশিল্পীগণ সাধারণত এই পালাগান করেন। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পালাগানের ন্যায় ধর্মঠাকুরের পালাগান এই অঞ্চলে ব্যাপক অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ হল ধর্মঠাকুরের গান কেবল ধর্মঠাকুরের থানেই অনুষ্ঠিত হয়, কোন গৃহস্থ

বাড়িতে হয় না। চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের থান বা মন্দির খুব বেশি নয়। তাছাড়া এই অঞ্চলে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগান যাঁরা করেন (যথা মানিকপীর, বিবিমা, শীতলা, মনসা প্রভৃতি) তাঁরা ধর্মঠাকুরের গান সাধারণত করেন না। আবার যাঁরা ধর্মঠাকুরের গান করেন তাঁরা অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর গান কদাচিৎ করেন। ফলে ধর্মঠাকুরের গানের শিল্পীও নিতান্ত কম। এছাড়া ধর্মঠাকুরের গান গাইতে ১-১২ দিন সময় লাগে। অপর পক্ষে অন্যান্য পালাগান গাইতে, ১-৩ দিন সময় লাগে।

চব্বিশ পরগণায় ধর্মমঙ্গলের দুটি কাহিনী গীত হতে শোনা যায়। একটি হরিশচন্দ্রের কাহিনী, অপরটি লাউসেনের কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর লেখক রাজারাম দাস এবং লাউসেনের কাহিনীর লেখক রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী। হরিশচন্দ্রের কাহিনীটি ছোট এবং লাউসেনের কাহিনীটি বিশাল। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর একটি পুঁথি অক্ষয়কুমার কয়াল কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। পুঁথিটির নাম ধর্মের গীত। এটি রূপরাম চক্রবর্তীর লাউসেনের কাহিনী অপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থের সময় কাল সম্পর্কে কবি ভণিতায় বলেছেন—

পক্ষ পক্ষ রস মহী শক সম্বৎসর।
বাদশাহা অরঙ্গশাহা দিল্লীর ঈশ্বর।।

এই পয়ারটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় কবির কাব্যরচনার কাল ১৬২২ শকাব্দ বা ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ। (কবির লেখা আরও দুটি গ্রন্থ হল নারায়ণীমঙ্গল ও সত্যপীরের পাঁচালি। নারায়ণীমঙ্গলের রচনাকাল শোভাসিংহের রাজত্বকাল অর্থাৎ সতের শতকের শেষ ভাগ) ধর্মের গীত গ্রন্থের কবি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা হল—

পিতামহ গোকুল বসতি পূর্বাপর।
দশরথ নাম পিতা গুণের সাগর।।
তনয় উত্তম তিন রাজারাম জ্যেষ্ঠ।
অভিরাম জয়কৃষ্ণ ভাজন কনিষ্ঠ।।

কবি নিজের বাসভূমির যে পরিচয় দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

পশ্চিমে মাগুরা সীমা পূর্বে মেদনমল।
মধ্যখানে ভাগীরথী সুধাসম জল।।
গঙ্গার পশ্চিম কূল যেন সুরপুর।
উত্তম শিহরবালি শোভাতে সুন্দর।।
মাগুরায় বসতি শিহর বালি গ্রাম।
তালুক আলেয়াকু বড় গুণধাম।।

ভাগীরথীর তীরবর্তী শিহরবালি গ্রামটি বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত। কবি কোথাও বংশপরিচয় দেননি, অনুমান করা যায় তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু। কারণ কবি অন্যত্র নিজেকে পালাগায়ক বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই অঞ্চলে বসবাসকারী কোন উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষ পালাগায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমনটি জানা যায় না।

(রাজারাম দাস ও তাঁর রচনা সম্পর্কিত তথ্য ও আলোচনা সূত্রে অক্ষয়কুমার কয়াল ও ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি)। কবি রাজারাম দাস লিখিত হরিশ্চন্দ্র পালার 'উপক্রম' কাহিনীটি নিম্নরূপ —

উপক্রম

কবি নিজে দেবদেবীর পাঁচালগান করেন তিনি একদিন আষাঢ় মাসের এক রাতেগান করে ফিরছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে ধর্মের গীত রচনা করতে বলেন। কবি দুটিপদ লিখে পাঁচালি গানের চাপে আর লিখতে পারেননি। কবির ডান পায়ে কুষ্ঠক্ষত ছিল, তা আরও বেড়ে যায়। কোন ওঝা-বৈদ্য তা সারাতে পারেননি, তখন কবি এক ভোরে স্বপ্নে ধর্মের গান রচনা করার আদেশ পেলেন এবং ধর্মের গান রচনায় মন দিলেন। তাঁর লিখিত কাহিনীটি নিম্নরূপ। —

ধর্মঠাকুর ঃ হরিশ্চন্দ্রের পালা

হরিশ্চন্দ্রের রাজসভায় একদিন ধর্মঠাকুর ছদ্মবেশে এসে তীর্থভ্রমণের পাথেয় চাইলে রাজভাণ্ডারী পঞ্চরত্ন দিতে চাইলেন, কিন্তু ধর্মঠাকুর রাজপুত্রদের আশীর্বাদ না করে রাজার দান গ্রহণ করতে চাইলেন না। রাজা ছিলেন অপুত্রক। সন্ন্যাসী বিমুখ হয়ে যেতে দেখে তিনি মনের দুঃখে সন্ন্যাসীর সাথে তীর্থভ্রমণে গিয়ে প্রাণত্যাগ করতে চাইলেন। তখন সন্ন্যাসী দয়াপরবশ হয়ে এক পুত্র দেবার শর্ত সাপেক্ষে একটি পদ্মফুল দিলেন এবং তা শতরানীকে খাওয়াতে বললেন। রাজা ফুলটি নিয়ে পাটরানী মদনাকে ডেকে ফুলের মাহাত্ম্য জানিয়ে শতরানী মিলে খেতে বললেন। মদনা পদ্মের একটি করে পাপড়ি সপত্নীদের দিতে গিয়ে নিজের ভাগে মূল ছাড়া আর কিছুই রইল না। তখন তিনি ক্ষোভে দুঃখে সেটি ছুড়ে ফেলে দিতে রানীর এক দাসী তা কুড়িয়ে এনে রানীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাওয়ালেন। প্রত্যেক রানীর একটি করে বাচ্চা হল। মদনার গর্ভে যে সন্তান জন্মেছিল তার নাম রাখা হল লুইচন্দ্র। লুইচন্দ্র শশিকলার মত বাড়ে এবং বিদ্বান হয়ে পিতার অধিক প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে। অন্য নিরানব্বইটি ভাই খেলাধূলায় মত্ত হয়ে লেখাপড়া না শিখে মূর্খ হয়ে গেল। তখন ধর্মঠাকুর নিজের পূজা প্রচারের জন্য দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে উনশত মূর্খভাইকে লুইচন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিলেন।

এদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্র লুইচন্দ্রকে রাজা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মঠাকুরের চক্রান্তে রাজা লুইচন্দ্রকে গো-বধের মিথ্যা রটনায় হত্যা করতে আদেশ দিলেন। রাজপুরোহিতের পরামর্শে লুইচন্দ্রকে হত্যা না করে দেশান্তর করা হল। লুইচন্দ্র বনে গিয়ে ধর্মপূজা করতে থাকেন। একদিন ঘুরতে ঘুরতে লুইচন্দ্র পল্লব নগরের রাজা হেরম্বের রাজ্যে উপস্থিত হয়ে ভবানীর উপাসক হেরম্ব রাজাকে ধর্মপূজা করতে বলেন। রাজা ধর্মপূজা করার নামে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে কোটালকে আদেশ দিলেন মশানে লুইচন্দ্রকে কেটে ফেলার জন্যে। কোটাল লুইচন্দ্রকে কাটার প্রস্তুতি নিলে ধর্মরাজ সমস্ত কুষ্ঠ রোগকে আদেশ দিলেন হেরম্বরাজাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য। তখন হেরম্বের ইষ্টদেবী ভবানী নিরপরাধ ভক্তের বিপদ বুঝে চঞ্চল হলেন।

পরে ধর্মঠাকুর ও ভবানীর মধ্যে আপস হল যে ধর্মঠাকুর রাজার পূজা নিয়ে সকলকে বাঁচিয়ে দেবেন।

তারপর ধর্মঠাকুর অলস্তি গলস্তি দেহ নিয়ে আতুর মূর্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। এইরূপ পচা দেহ নিয়ে শ্মশানে গিয়ে কোটালের নিকট লুইচন্দ্রের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। তখন কোটাল পচা ও লুইকে একসঙ্গে বধ করতে বললেন। কোটালের এইরূপ ধৃষ্টতায় ধর্মরাজ সমস্ত কুষ্ঠ ব্যাধিকে চারভাগে ভাগ করে পূর্বদিকে ধবল, উত্তরে হিঙ্গুলিয়া, পশ্চিমে সিন্দুরিয়া, দক্ষিণে ঝিঞ্জিনার নেতৃত্বে কুষ্ঠ ব্যাধিগণকে পাঠিয়ে রাজসৈন্যদের মধ্যে হাহাকার জাগিয়ে তুললেন। এই পর্যন্ত কাহিনীর পর পুঁথি খণ্ডিত। এর পরের ঘটনা অনুমান করা যায় হেরম্ব রাজার রাজ্য কুষ্ঠ ব্যাধিগণ কর্তৃক ধ্বংস হবে। তারপর রাজা ভক্তিভরে ধর্মের পূজা করবেন, রাজ্যের সবাই প্রাণ ফিরে পাবে ও রাজকন্যা চন্দ্রকলার সাথে লুইচন্দ্রের বিয়ে দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দেবেন।[৬]

লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুর কেন্দ্রিক দ্বিতীয় পালাগানটি হল লাউসেনের কাহিনী। এই কাহিনী অবলম্বন করে অনেক কবি কাব্য রচনা করেছেন। ময়ূরভট্ট, আদিরূপরাম, খেলারাম, মানিকরাম, রূপরাম, শ্যামপণ্ডিত, সীতারাম, প্রভুরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, হৃদয়রাম সাউ, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, রামকান্ত রায়, ধর্মদাস বৈদ্য, বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ কবিগণ ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত তেগাছি গ্রামের মহেন্দ্র নস্কর লাউসেনের কাহিনী অবলম্বন করে ধর্মঠাকুরের একটি পালাগান সৃষ্টি করেছেন। এই পালার কিয়দংশ ঐ গ্রামের পালাগায়ক রাধাকান্ত সরদারের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত পালাগানের গুরুবন্ধনটি নিম্নরূপ :—

হাজারিগান গুরুবন্ধন, যার বাড়ী ঝাঁঝরায়।
তাহার সহিত দীননাথের সঙ্গীত শেখা হয়।।
তাহার বংশধর আরও যত ছিল।
ধর্মসংকীর্তন করে স্বর্গপুরী গেল।।
তাহার একপুত্র কালিচরণ নাম ধারি।
ধর্মসংকীর্তন করতে করতে গেল স্বর্গপুরী।।
তাহার পুত্র রাধাকান্ত নাম ধারি।
আপনাদের মাঝে দেখ নাম সংকীর্তন করি।।
এইখানেতে রইল গান বল হরি হরি।।

উপরে বর্ণিত পালাগানের মুখবন্ধটি 'গুরুবন্ধন' হিসাবে স্থানীয় ভাবে চিহ্নিত হয়। সাধারণত পালাগানের পূর্বে লোকসমাজে সর্বত্র লোকশিল্পীগণ আসর বন্দনা, গুরুবন্দনা ইত্যাদি বন্দনা গান করেন, কিন্তু চব্বিশ পরগণার ধর্মঠাকুরের পালাগান সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষক এই তথ্য লাভ করেন যে, ধর্মঠাকুরের পালাগানের গায়কগণ গুরুবন্ধন কথাটি

ব্যবহার করেন। সম্ভবত গুরুবন্দনা কথাটি ভাষান্তর হয়ে গুরুবন্ধন রূপ লাভ করেছে। প্রকাশ থাকে যে, পালাগায়ক রাধাকান্ত সরদারের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের কালে পালাকার সুস্পষ্টভাবে গুরুবন্ধন শব্দটি উল্লেখ কবেন। মনে হয় এটি শুধু গানের ভূমিকায গুরুবন্দনা নয় সমগ্র পালাগানের ক্ষেত্রে গুরুর উপস্থিতিকে মান্য করার প্রতীক।

রাধাকান্ত সরদার ধর্মঠাকুরের যে-পালাটি গান করেন তা সৃষ্টিপত্তন থেকে অষ্টমঙ্গলা অবধি চব্বিশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে বলে জানান। এই চব্বিশটি পালা গাইতে তাঁর ১১-১২ দিন সময় লাগে। সৃষ্টিপত্তন, গৌড়পতি, গৌড়যাত্রা, ঢেঁকুরপালা, কলিঙ্গরাজার পালা, লাউসেনের জন্ম, আখরাপালা, বাদলপালা প্রভৃতি বিভাগগুলির নাম। ধর্মঠাকুরের পালার শেষ বিভাগটি হল বাদলপালা। এই পালা গাওয়ার পর পালাগায়ক অষ্টমঙ্গলা গান করেন। রাধাকান্ত সরদাব অষ্টমঙ্গলা গাওয়ার পর বিশেষ আচার আচরণের মধ্য দিয়ে ঘটভাসান গানটি করেন। ঘটভাসান গানটিই প্রকৃতপক্ষে আসরে ধর্মমঙ্গল পালার শেষগান এবং এই গানের পর আসর ভঙ্গ হয়। রাধাকান্ত সরদার কর্তৃক গীত পালাগানের কোন লিখিত খাতা নেই। তিনি স্মৃতি থেকেই পালাগান পরিবেশন করেন। পালাগায়কের মুখে শ্রুত সৃষ্টিপত্তন পালাটি নিম্নরূপ—

ধর্মঠাকুরের পালা (সৃষ্টিপত্তন)

নাহি ছিল মহী পূর্বকথা কহি
শূন্যে ছিল নিরঞ্জন।
শূন্যে করি ভর ছিলেন মায়াধব
নাহি ছিল দেবগণ।।
রবিশশি আদি নাহি ছিল গ্রহাদি
নাহি ছিল প্রাণিবর্গ।
দেবতন্ত্র কাল নাহি ছিল ধরণী পাতাল
নাহি ছিল পুরুষ বামা হে।।
চিন্তা করি ধর্ম উলুকের জন্ম
হল না সার মাঝে।।

উলুক জন্মগ্রহণ করেই বলে প্রভুগো! ক্ষুধায় আমার জীবন জ্বলে যায়, আমায় কিছু খেতে দিন। এই সকাতর বাণী শুনে প্রভু উলুকের মুখে পীযূষ তুলে দিলেন।

কিছু খেতে বাড়ে বল, হল তার সুখদয়।
কিছু যাহা পড়িল তাহা হল জলময়।।
উলুক বলে শুন প্রভু আমার পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
আমি তোমার বাহন তোমার বহিব সর্বক্ষণ।।
উলুকের কথা শুনি প্রভু নিরঞ্জন।

উলুকপৃষ্ঠে আরোহণ করিল তখন।।
উলুকের পৃষ্ঠেতে প্রভু উঠিতে যেই যায়।
তাহার পৃষ্ঠের পালক খসে পড়ে রয়।।
সেই পালক দেখ ভাই জলে ভেসে যায়।
ঐ পালক হতে রাজহংসের জন্ম হয়।।
রাজহংস যখন চারিদিকে বিচরণ করে।
প্রভু ডাকে হংস মোর শুন অনুরোধ ওরে।।
করজুড়ে হংস বলে প্রভু নিরঞ্জন।
কি কর্ম করতে হবে বলুন এখন।।

তখন নিরঞ্জন হংসরাজকে বলেন, শোন হংসরাজ, সপ্তপাতালের তলে পৃথিবী রয়েছে, সেখান হতে মৃত্তিকা আনতে হবে। সেই মৃত্তিকা না এলে পৃথিবী সৃষ্টি হবে না।

একথা শুনিয়া হংস কহিল তখন।
সপ্তপাতালে যেতে হবে যে মরণ।।
ধর্মনিরঞ্জন বলে হংসরাজ শুনরে এখন।
জয়ধর্ম নিরঞ্জনের নাম রাখিবে স্মরণ।।
কোন বাধা নাহি পাবে বলি যে তোমার।
সত্ত্বর আসিবে তুমি নিকটে আমার।।

ধর্ম নিরঞ্জনের মুখে এই আশ্বাস পেয়ে হংসরাজ মনে সাহস পেল। তখন জয়ধর্ম নিরঞ্জন বলে সমুদ্রে ডুব দিল।

এক দুই তিন পাতাল পার হয়ে যায়।
ধর্ম নিরঞ্জনের নাম মনে জপে যায়।।
চতুর্থ পাতাল পার হয়ে পঞ্চমেতে গেল।
ধর্মরাজের নাম তখনও স্মরণ করে গেল।।
ষষ্ঠ সপ্তম পাতাল যখন পার হয়ে গেল।
মৃত্তিকা দেখিয়া হংস ধর্ম ভুলে গেল।।
বিস্তারিয়া দুই ঠোঁট মৃত্তিকা কামড়ায়।
মৃত্তিকা নিয়ে হংস ঊর্ধ্বপানে চায়।।
হংস যখন ঊর্ধ্বপানে উঠিতে লাগিল।
উলুক আর নিরঞ্জন হরষিত হল।।
অর্দ্ধরাস্তা এসে হংসের মৃত্যু হয়ে গেল।
ধর্মের বাতাসে হংস ভাসিয়া উঠিল।।
ধর্মরাজকে উলুক বলে প্রভু নিরঞ্জন।
মৃত হংস ভেসে ওঠে দেখি যে এখন।।

ধর্ম আর উলুক যখন হংসের কাছে যায়।
মৃত হংস দেখে ধর্ম মনে দুঃখ পায়।।
পদ্মহস্ত বুলাইল হংসের গায়েতে।
জয়ধর্ম নিরঞ্জন বলে হংস দাঁড়াইল সম্মুখেতে।।

হংসকে পুনঃ জীবনদান করে ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করেন তুমি তো সপ্তপাতালে গিয়েছিলে, সেখানে কি পৃথিবী দেখতে পেয়েছ? ধর্মের কথা শুনে হংসরাজ বলে প্রভু সপ্তপাতালের তলে আমি পৃথিবী দেখে আনন্দে ধর্মের নাম ভুলে যাই। দুই ঠোঁটে মৃত্তিকা কামড়ে আমি যখন উপরে উঠি তারপর আর কিছুই মনে নেই।

মুখ বিস্তার কর হংস বলে ধর্মরায়।
মুখের মধ্যে মৃত্তিকা আছে জানহ নিশ্চয়।।
বিস্তাবিল হংসরাজ মুখ সেইক্ষণে।
গালে হাত দিয়া ধর্ম মৃত্তিকা পাইল তখনে।।
কড়াই সমান মৃত্তিকা প্রভু হাতে পায়।
(বলে) এই হতে পৃথিবী গড়িব নিশ্চয।।
হাতে লয়ে মৃত্তিকা প্রভু মর্দন করিল।
কড়াই সমান তাহা বাঁটুল সমান হইল।।
ধীরে ধীরে প্রভু তাহা মর্দন করে যায়।
দেখিতে দেখিতে তাহা বেলের সমান হয়।।
হেন কালে ধর্মরাজের কপালে ঘাম এসে গেল।
সেই ঘাম বাম হস্তে ছুড়ে ফেলে দিল।।
ঘাম হতে অপূর্ব এক সুন্দরী জন্মাল।
সুন্দরী দেখে ঠাকুর আনন্দিত হল।।

ঘটকালি ।। ওহে কন্যা, আমি পৃথিবী তৈরি করব মনে করেছি। তুমি বরং আমাকে বিয়ে কর। কন্যা বলে, তুমি আমার জন্ম দিয়েছ, আমি তোমায় বিয়ে করব কি করে? ধর্ম জেদ ধরে আমাকে বিয়ে করতে হবে। কন্যা তখন বলে, আমার নাম শক্তি, আমার বিয়ে করার ক্ষমতা তোমার নেই। এই বলে কন্যা যেই ছুটে চলে যায়, ধর্ম তখন কন্যার পিছু ধেয়ে যায়।

প্রথমে কন্যা ছোটে পিছনে ধর্ম ছুটে যায়।
ধর্মরাজের পিছনেতে পৃথিবী হয়ে যায়।।
সুমেরু পর্বত হল পৃথিবীর মূল।
চন্দ্রসূর্য তারা হল বর্ণনায় অতুল।।
তারপর কন্যা যখন দক্ষিণে ছুটে যায়।
তাহারও পশ্চাতে দেখ পৃথিবী সৃজন হয়।।
পশ্চিমেতে মুখ করে কন্যা যে ছুটিল।

ধর্মবাজ তাহার পশ্চাতে ছুটে গেল।।
উত্তর মুখে কন্যা যখন ফিরিয়া দাঁড়ায়।
ধর্ম বেত খসে তখন স্বর্ণচম্পক হয।।
ধর্মবাজ বলে কন্যা দাঁড়াওরে এখন।
তোমায় বিয়ে করব না শুন বিববণ।।

কথা।। কন্যা বলে, ঠাকুর আমি দাঁড়াবনা, আমি দাঁড়ালে তুমি জোর করে আমাকে বিয়ে করবে। ধর্মরাজ বলেন, ধর্ম কখনো মিথ্যা কথা বলে না। আমি তোমায় বিয়ে করব না।

প্রভু বলে শুন শক্তি বলিযে তোমারে।
ছুটে তোমার কষ্ট হল জানি যে ওরে।।
চম্পকফুলের ঘ্রাণ নিলে কষ্ট যাবে দূরে।
এই শুনে কন্যা তখন ঘ্রাণ নিল প্রাণ ভরে।।
প্রথমবার ঘ্রাণ নিয়ে শান্তি নাহি হল।
দ্বিতীয়বার ঘ্রাণ নিতে অনুমতি চাইল।।
নিরঞ্জন কহে কন্যা বলি যে তোমারে।
এই ফুল দিলাম তোমায় রাখ জীবন ভরে।।
দ্বিতীয়বার কন্যা পুনঃ ঘ্রাণ নিয়েছিল।
তাহাতেও কন্যার মনে শান্তি নাহি হল।।
তৃতীয়বার কন্যা যখন ঘ্রাণ নিয়েছিল।
হেনকালে চম্পক কোথায় মিলে গেল।।

তৃতীয়বার চম্পকফুলের ঘ্রাণ নিয়ে কন্যার গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। তা বুঝে শক্তিদেবী ধর্মের কাছে কাতরভাবে জানায় এই অবস্থায় তিনি কোথায় থাকবেন? কন্যার কথা শুনে ধর্ম তখন বলেন অজয় নদীর তীরে মায়া ঘরবাড়ি আছে, তুমি সেইখানেতে গিয়ে থাক।

মায়াঘরে তুমি কন্যা প্রসব করিবে।
ধর্মনিরঞ্জনের নাম সর্বদা লইবে।।
এইকথা শুনিয়া দেবী প্রভুর চরণধুলি নেয়।
মায়া ঘরবাড়ির সন্ধানে শক্তি তখন যায়।।

(সৃষ্টিপত্তন সমাপ্ত)

রাধাকান্ত সরদারের নিকট হতে সংগৃহীত ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিপত্তন পালাটি উৎকলিত হল। সৃষ্টিপত্তন গাওয়ার পর তিনি ধর্মঠাকুরের পালার কাহিনী অংশে প্রবেশ করেন। কাহিনী অংশ শেষ করে 'অষ্টমঙ্গলা' ও 'ঘটভাসান' গান করেন। ঘটভাসান ধর্মঠাকুরের পালার শেষ গান। রাধাকান্ত সরদারের নিকট হতে কাহিনী অংশের ইছাই ঘোষের পালা এবং অষ্টমঙ্গলা ও ঘটভাসান গানটি সংগৃহীত হয়েছে। ইছাই ঘোষের পালাটি অনেক বড়। সে কারণে গ্রন্থের অস্বাভাবিক কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এটি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা গেল না।

কেবল অষ্টমঙ্গলা ও ঘটভাসান গানটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হওয়ায় তা উৎকলিত হল। পালাগায়কের মুখে শ্রুত অষ্টমঙ্গলা অংশটি নিম্নৰূপ —

অষ্টমঙ্গলা

প্রথমে সেবক ছিল ঘোষ মহারাজা।
অতুলপ্রসাদে সে কবিল ধর্মপূজা।।
দ্বিতীয় সেবক ছিল অনাদির আদি।
প্রচুর উপচারে পূজে ধর্ম মহারাজে।।
তৃতীয় পূজিল সেই কালুডোম।
নিজ অধিকারে দেখে ধর্মনাম সর্বক্ষণ।।
নিজ স্ত্রী পুত্র মরে শুনরে ভাই।
লাউসেনের পদাবলী সর্বক্ষণ বলে যাই।।
ধর্মের সেবক বলে আমি হই ডোম।
এই জন্যে পূজা করি ধর্মরাজ যম।।
চতুর্থে পূজারী ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পুত্র কেটে বলি দিয়ে করে ধর্ম পূজা।।
(সেই থেকে উইয়ের জন্ম হয় ভারতে)
পঞ্চমে পূজারী ছিল হরিহর বাগদিনী।
দেখিলে শূলের উপর গেল স্বর্গপুরী।।
ষষ্ঠে সেবক ছিল কর্ণধর নামে।
সেইজন ধর্মপূজা করে অতুলদীঘির পাড়ে।।
অতুলদীঘির পাড়ে জোড়া হাতি মাথা নাড়া দেয়।
তবেতো ধর্মের পূজা সফল যে হয়।।
সপ্তমে সেবক ছিল গৌড়পতি নামে।
গৌড়পতি মহারাজা জানে সর্বজনে।।
সর্বজন পূজা করে শুন সবে ভাই।
এত দান করিবার ক্ষমতা কারো নাই।।
নবমে সেবক ছিল শুন সর্বজনে।
শিমুলার রাজা ছিল হরিপাল নামে।।
দশমে সেবক ছিল শুন ওরে ভাই।
কলিঙ্গের রাজা ছিল ধর্মপূজা করে যাই।।
গৌড়পতি লাউসেনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।
তাঁর রাজত্ব ধ্বংস করে সে কেড়ে নিয়েছিল।।
একাদশে সেবক ছিল শুন ওরে ভাই।
এবার আমি বলে যাই সোম ঘোষ তাই।।

সোম ঘোষের বেটা ইছাই ঘোষ হয়।
ধর্মপূজা ত্যাগ করে রাজ্য করে জয়।।
ছয় পুত্র মারে সে বড় বলবান।
দুর্গার বলেতে সে হয়েছে পালোয়ান।।
দ্বাদশে সেবক ছিল লাউসেন রাই।
তিনি কশ্যপনন্দন এবার বলে যাই।।
শুন বলি লাউসেন বলি যে তোমারে।
তুমিতো স্বর্গে ছিলে পাঠাল শাঁপভরে।।
বঞ্জাবতীর গর্ভে তোমায় ঠাকুর পাঠালে।
তুমি সব উদ্ধার করে স্বর্গে চলে গেলে।।
অখিলেশ্বর পাঠায়েছে রথ দেখহে এখন।
অখিলেশ্বরের চরণ পাবে জেনো সর্বক্ষণ।।
লাউসেন বলে শুন বলিগো তোমারে।
এবার পিতামাতার বলে আসি দেখ ওবে।।

লাউসেন পিতামাতার নিকট গিয়ে বলেন অখিলেশ্বর রথ পাঠিয়েছে, আমার চলে যাবাব সময হয়েছে, যদি তোমরা আমার সাথে যেতে চাও তাহলে ঐ রথে চড়ে এস আমরা স্বর্গপুরে চলে যাই। তখন পিতামাতা লাউসেনকে বলেন—

শুন বলি ওরে বাছা বলি ওরে যাদুধন।
পরে যেও বলি আমি বলি ওরে শোন।।
তোমার পুত্র যারা তারা বড় বাচ্চা হয়।
এ রাজত্ব করবে কেবা শুন মহাশয়।।
এ রাজত্ব চোর আর ডাকাতে যে লবে।
তোমার বাচ্চারা সব রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।।

তখন লাউসেন বলে, জননী তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করো না। অখিলেশ্বর হলেন ধর্ম নিরঞ্জন, তাঁর কৃপা থাকলে সবাই সুখে থাকবে। অখিলেশ্বর যে রাস্তায় মতি দেয় সেপথে বাধা দেবার শক্তি কারো নেই।

যাবে যদি তুমি এসে রথে কর আরোহণ।
যদি নাহি যাবে আমি যাবরে এখন।।

তখন লাউসেন তিন রানীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, অখিলেশ্বর রথ পাঠিয়েছেন স্বর্গপুরে যাবার জন্য, তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে? কিন্তু তাঁরাও কেউ যেতে রাজী হলেন না। তখন—

লাউসেন চলে যায় রথের উপরে ভর করে।
কর্পূরসেন গেল তাহার সঙ্গে যে ওরে।।

দুই ভাই স্বর্গে তারা চলে যে গেল।
অষ্টমঙ্গলা শেষ করে এবার ঘট ভাসাই চল।।

অষ্টমঙ্গলা গান শেষে পালাগায়ক ঘটভাসান গান করেন। ঘটভাসান গানটি নিম্নরূপ —

ঘটভাসান গান

নমস্কাব করি গুরু সর্বজনে	—	হরি নারায়ণ হে
তারপরে বন্দি আমি সত্যনারায়ণে	—	,,
তাহার পরেতে বন্দি সবস্বতী মায	—	,,
তোমাকে বন্দি আমি রেখ তোমার পায	—	,,
নমস্কাব কবিযা আমি ঘট বিসর্জন কবি	—	,,
এই কাজে দিওনা বাধা সঙ্গে থাকে হরি	—	,,
যেই হরি সেই নাম সেই সংকীর্তন	—	,,
যেই না ভজে সে অকাল পাষাণ	—	,,
যেই জন ভজে সে স্বর্গে মুক্তি পায়	—	,,
তবে তো তাহারে অখিলের পতি সঙ্গে করে নেয়	—	,,
তাপসের পতি বাবা করগো দয়া	—	,,
দাও দাও দান সবে করি ঘট বিসর্জন	—	,,
আর বুদ্ধের (?) পতি বাবা করগো দয়া	—	,,

ধর্মঠাকুরের থানে ঘটবসান যুগী সম্প্রদায়ের মানুষ বা সেবাইত। পালাগানের শেষে সেই ঘট ভাসিয়ে দেন পালাগায়ক। ঘটভাসান অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। মূল পালাগায়ক দেবতা, বিশিষ্ট মনীষী, নায়েক পক্ষের প্রতি সদস্যের নাম, পূর্বপুরুষের নাম, পালাগানের দলের প্রত্যেকের নাম ইত্যাদি এক এক জনের নাম ধরে বন্দনা করেন আর দোহারগণ 'হরি নারায়ণ হে' এই স্থায়ী ধরে রাখেন। প্রত্যেক নামের সঙ্গে সঙ্গে পূজারী বা পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের ঘটে একটু করে জল দেন এবং নায়েক পক্ষ থেকে একজন একটি করে সুপারী মূল পালাগায়কের হাতে দেন। সব নাম বলা শেষ হলে নায়েক পক্ষ থেকে একটা গামছা (নতুন) পালাগায়কের গলায় দেওয়া হয়। পালাগায়ক সেই গামছা গলায় দিয়ে চামরে করে হলুদগোলা জল (শান্তিজল) নিয়ে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের মাথায় দেন। তখন ধর্মঠাকুরের মাথা থেকে ফুল পড়ে যায়। সেই ফুল পড়ে গেলে পর ধর্মের ঘট সরিয়ে দেওয়া হয়। এর পর শান্তিজল নিয়ে ধর্মঠাকুরের মন্দিরের চারিদিকে ও মাঠে ছড়ান হয়। স্থানীয়ভাবে বিশ্বাস যে, ধর্মের মন্দিরের চারিদিকে এই শান্তিজল ছড়ালে ধর্মঠাকুরের কৃপায় চারিদিকের লোকজন পশুপাখি সবাই ভাল থাকে। শান্তিজল ছড়ানোর পর পালাগায়ক গান শেষ করেন বা আসর ভঙ্গ করেন। ক্ষেত্র বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে বলে জানা যায়।

ধর্মঠাকুরের পালাগানের রীতি-পদ্ধতি অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পালাগানের থেকে

পৃথক। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মিলও প্রত্যক্ষ করা যায়। ধর্মঠাকুরের পালাগানের আসরের বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল এখানে উদ্ধৃত করা হল। যেমন— ধর্মঠাকুরের পালাগানের দলে আট-দশ জন লোক থাকেন। প্রত্যেকের পরনে ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, কোমরে বাঁধা একটি নতুন গামছা থাকে। মূল গায়কের হাতে চামর ও মন্দিরা, পায়ে ঝাঁঝর ও কোমরে বড় বড় ঘুঙুরের বেল্ট থাকে। দলের অন্যান্য লোকেদের হাতে মন্দিরা, কোমরে ঘণ্টা বা ঘুঙুর ও পায়ে ঝাঁঝর থাকে। প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে গান করেন। তাঁরা হাতে ও পায়ে তাল রেখে গান করেন। ধর্মঠাকুরের গানের 'এলোসুর'। অন্যান্য পালাগানের সুরের সাথে এ সুর মেলে না বলে পালাগায়ক জানান।

জেলা চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরের নামাঙ্কিত মন্দির বা মূর্তি পূজা ব্যাপক নয়, কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজাচার, ব্রত ও সংস্কার কতিপয় লৌকিক দেবতা ও ব্রতোৎসবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। গভীর গবেষণা সাপেক্ষে বিশেষত ধপধপির বিখ্যাত দক্ষিণরায়ের পূজা, চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে মাঘমণ্ডল ব্রত, প্রভৃতির মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজার অবশেষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পাদটীকা

১। সাক্ষাতকার, নিমাই সরদার (৫০), নওয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, থানা-হাড়োয়া। অধীর সরদাব (৫৫), শীতলিয়া, বালিখাল পাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, থানা-সন্দেশখালি।

২। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৮ম সংস্করণ, পৃ· ৬৭৫-৭৮।

৩। ড ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৮ম সংস্করণ, পৃ: ৬২৩-২৫।

৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৮ম সংস্কবণ।

৫। ডঃ অমলেন্দু মিত্র, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ১৯৭২, পৃ: ২৫১।

৬। অক্ষয়কুমাব কয়াল রচিত প্রবন্ধ, রাজারাম দাসের 'ধর্মের গীত', 'আদিগঙ্গা' পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানু-মার্চ ১৯৯৮, সম্পাদক - শক্তি রায়চৌধুরী।

- ❑ দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, (১ম ও ২য় খণ্ড)।
- ❑ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব।
- ❑ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

সাক্ষাতকার ঃ অক্ষয়কুমার কয়াল, নরোত্তম হালদার, কালিচরণ কর্মকার, কৃষ্ণকালী মণ্ডল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিবিপালা

বিবিপালা ঃ বনবিবি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানে বনবিবির লোকায়ত পালাগান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালাগান আলোচনায় বনবিবির পালা বিবিপালার অন্তর্ভুক্ত। চব্বিশ পরগণায় বিবিমার পূজা কোন সুদূর অতীতে শুরু হয়েছিল তা বলা যায় না। এই অঞ্চল বহু প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী স্থান। সুতরাং এখানকার বিবিপূজা প্রাচীন সুসভ্য মানুষের এতিহ্যবাহী এক পূজা, যে পূজার অস্তিত্বগত সাদৃশ্য মেলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে বিবিমা নানা নামে পূজিতা হন। যেমন সাতবিবি, নয়বিবি, একুশবিবি, বনবিবি ইত্যাদি। এই সমস্ত দেবীদের নিয়ে পালাগানও প্রচলিত আছে। সাতবিবি, নয়বিবি বা একুশবিবি কেবল চব্বিশ পরগণা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। এমন কি মহেঞ্জোদড়োর খনন কার্যে পাওয়া গেছে পাশাপাশি দণ্ডায়মান সপ্ত মাতৃমূর্তি। চালুক্য শিলালিপিতে ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী প্রমুখ সপ্তমাতৃকার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতে আছে সপ্ত ক্যানিংগেস। বাংলার পশ্চিম ভূভাগে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে গ্রাম্যদেবী সাত বাহিনী, সাতসিনী বা সাত ভগিনীর ব্যাপক পূজাচার আছে। এছাড়া দক্ষিণভারতে আছে পোলেরাম্মা, আনাকাম্মা, মুখ্যালাম্মা প্রমুখ সপ্তমাতৃকা। সুতরাং এই সপ্তমাতৃকাদেবীর অস্তিত্ব সুদূর অতীতেও ছিল এবং বর্তমানে এই দেবীর পূজা চব্বিশ পরগণায় সাতবিবি, নয়বিবি, একুশবিবি, বনবিবি ইত্যাদি নামে পূজিতা হন। বিবিমা কাল্ট এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চব্বিশ পরগণার পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া হুগলী প্রভৃতি জেলার আদিবাসীগণ ও বর্ণহিন্দুগণ পৌষ সংক্রান্তি বা ১লা মাঘ সাধারণভাবে বড়াম বা বড়ামচণ্ডীর পূজা করেন। এই পূজার সাথে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের বনবিবির পূজাচারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হাতি ও বাঘের কবল থেকে রক্ষা পেতে ঐ অঞ্চলের মানুষ বড়ামদেবীর পূজা করেন, ঘুড়ি ওড়ান। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের মানুষ বাঘের কবল থেকে নিস্তার পাওয়ার বিশ্বাসে

বনবিবিমার পূজা করেন ও ঘুড়ি ওড়ান। মেদিনীপুর বাঁকুড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলের বড়াম দেবীর সাথে কেবল বিবিমা নয়, নারায়ণীর সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। দেবী নারায়ণীর ন্যায় ঐ অঞ্চলের মানুষ লতাপাতা আঁকা বড়ামচণ্ডীর মুণ্ড মূর্তি পূজা করেন। এই পূজায় পশুপক্ষী বলি ও নাচগানের ব্যবস্থা থাকে। পৌষসংক্রান্তি বা ১ লা মাঘ দেবীর পূজা হয়। পশ্চিমরাঢ়ের রঙ্কিনীদেবীর পূজার সাথে চব্বিশ পরগণার বনবিবি নারায়ণী, মেদিনীপুরের বড়ামচণ্ডীর পূজার অতি নিকট সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়।

চব্বিশ পরগণায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে অনেক নারীমূর্তি দেখা যায়। সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কাকদ্বীপ গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রের প্রত্নসম্পদ সংগ্রহগুলির মধ্যে খেলনা পুতুলের মত একই ধরনের ছয়টি নারীমূর্তি দেখা যায়। দুটি মূর্তির কোলে সন্তান, অর্থাৎ মাতৃকা মূর্তি, অপর চারটি মূর্তির কোলে সন্তান নেই। ঐ ছয়টি মূর্তিই মাতৃকা মূর্তি। ছয়টি মূর্তিই ছাঁচে গড়া পোড়ামাটির দণ্ডায়মান মূর্তি। এঁদের মাথায় ত্রিচূড় মুকুট, উন্নত নাসা, পীনোন্নত বক্ষ, ম্যাক্সির মত পোশাক পরিহিতা, পায়ে জুতা ও তন্বী। সন্তানযুক্ত ও সন্তানবিহীন মূর্তিগুলির মধ্যে নির্মাণগত সাদৃশ্য থাকায় এগুলি একই দেবী বা মাতৃকা মূর্তি হিসাবে ধরা যায়। গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত সন্তানবিহীন পূর্ণাঙ্গ মূর্তিটি উপরের বর্ণনা অনুযায়ী গঠিত। এটি পাওয়া গেছে ৬ নম্বর লাট (লট) ধানি নামক স্থান থেকে। সন্তান কোলে ঐ একই প্রকারের ত্রিচূড় মূর্তিটি পাওয়া গেছে ১১ নং লাটের অন্তর্গত পুকুরবেড়িয়া গ্রামে। সন্তান ক্রোড়ে অর্ধভগ্ন মূর্তিটি এবং আরও দুটি পাকুড়তলায় পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া গেছে বলে নরোত্তম হালদার মহাশয় জানান। আমরা জানি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু স্থানে এরূপ মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালায়ও এরূপ মূর্তি রক্ষিত আছে। পুতুল সদৃশ মূর্তিগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেন রোমদেশীয় নারীমূর্তি, কেউ বলেন মিশরীয়, কেউ বলেন গ্রীক। এককথায় বিদেশিনী। আবার প্রাচীনত্ব বিচারে কেউ এঁকে কুষাণযুগের বলে মন্তব্য করেন এবং তাঁদের মতে ইনি হলেন ত্রিচূড় যক্ষিণী।[২] উত্তর চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির 'ব্যাঘ্রদেবী' (বালান্দা প্রত্নসংগ্রহশালা, হাড়োয়া, এম. এ. জব্বার সংগৃহীত) মূর্তিটির কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এই সব নারীমূর্তি কোন প্রভাবজাত, কিসের প্রতীক এবং এগুলি বনবিবি নারায়ণীর সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা সে বিষয়ে আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা একান্ত প্রয়োজন বলে বর্তমান গবেষক ও বর্তমান গবেষণা পরিচালক (ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়) বিশেষভাবে মনে করেন।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে বনবিবির লৌকিক পরিচয় তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা পালাগান সাহিত্যেও লৌকিক দেবী বনবিবি এক উল্লেখযোগ্য নাম। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবী মানুষের রোগশোকের প্রতিকার করেন, কিন্তু বনবিবি রোগশোকের প্রতিকারিণী শক্তি নন, তিনি হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন। বিশেষত সুন্দরবনের কালান্তক রয়েল বেঙ্গল টাইগার-এর কবল থেকে দেবী এই অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করেন।

দেবীর মাহাত্ম্য ছড়ায়, গানে, মন্ত্র-তন্ত্রে সর্বোপরি এই অঞ্চলেব লোকবিশ্বাসে প্রচারিত ও প্রত্যয়িত। সে কারণে বনবিবিকে অনেকে হিন্দু অরণ্যদেবী, বন-দুর্গা, বন-চণ্ডী, বন ষষ্ঠী ও বিশালাক্ষী বলেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ দেবীকে পূজা করেন, বিশেষ করে জীবন-জীবিকার জন্য সুন্দববনের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত, তাঁরাই দেবীর প্রধান ভক্ত। স্বাভাবিক কারণে জেলে, মৌলে, কাঠুরিয়া ও বাউলে দেবীর প্রধান সেবক।

বনবিবি চব্বিশ পরগণা তথা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত অরণ্যদেবী। সপার্ষদ বনবিবি ও অন্যান্য নামগুলির মধ্যেও সেই সত্য নিহিত আছে। বিশেষত বনবিবি নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বনবিবি হলেন বনের (অরণ্যের) বিবি। বিবি (বীবী) ফার্সী শব্দ। মুসলমানের কুলবধূ বা কুলীন স্ত্রীকে বিবি বলে। ইংরেজ কন্যাদের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আবার বাঙালীর মাতৃ ভাবনার সাথে যুক্ত হয়ে তিনি বনবিবিমা হয়েছেন। বিপন্ন-প্রাণ রক্ষাকর্ত্রীকে বাঙালী মাতৃসম জ্ঞান করেন। সুন্দরবন তথা সুন্দরবন অঞ্চলে জীবিকার জন্য আগত বা বসবাসরত মানুষের প্রাণ প্রতি মুহূর্তে ঝুঁকি-নির্ভর। বনে বা জঙ্গলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যিনি রক্ষা করেন তিনি বনবিবিমা। বনে বা অরণ্যে রক্ষাকর্ত্রী বনদেবী মুসলমান আমলে বনবিবি হয়েছেন। তাঁরাও দেবীকে ভক্তির আতিশয্যে মুসলিম ঘরের কুলীন মাতৃসমা কুলবধূ রূপে দেখেছেন। প্রচলিত পালাগানে উল্লেখ আছে দেবীর জন্ম বনে ও তাঁর সমস্ত কর্ম বনে বা জঙ্গলে। সে অর্থে তিনি বনবিবি নামে পরিচিতা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পালাগানগুলি প্রচলিত লোককথা থেকে সৃষ্ট বলেই এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। বনবিবিকে নিয়ে লেখা মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত গ্রন্থটির নাম 'বোনবিবি জহুরানামা'। এখানে বনবিবিকে লেখা হয়েছে বোনবিবি। বিভিন্ন গ্রন্থসূত্রে জানা যায় মুসলিম ধর্ম প্রচারার্থে আরব দেশ থেকে যে সমস্ত মুসলমান নারী বা পুরুষ স্বধর্ম প্রচারার্থে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ভাই ও বোন বলে পরিচয় দিতেন। এই সূত্রে চব্বিশ পরগণায় আগত (এইরূপ কথিত) মোবারক গাজী, তাতাল গাজী, কামাল গাজী, দেওয়ান গাজী, রক্তান গাজী, বরকান গাজী প্রমুখ পীর-ফকিরগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই বলে পরিচিত। যে মুসলিম মহিলা চব্বিশ পরগণার ভাটি অঞ্চলে মুসলিম ধর্মাদর্শ বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন, সম্ভবত তিনি উক্ত আউলিয়াগণের নিকট 'বোন' বলেই পরিচিতা ছিলেন। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে তিনি বোনবিবি নামে পরিচিতা হয়েছিলেন প্রসঙ্গক্রমে এরূপ অনুমান করা যায়। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বনবিবি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ইনি আদি পাঠান যুগের কোন মুসলমান সাধিকা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারিকা অভিজাত মহিলা ছিলেন, সে কারণে প্রথমে মুসলমান সমাজে বহুজন পূজ্যা হন, পরে ভক্তির প্রাবল্যে দেবীপদে উন্নীত হন।[৩]

শাজঙ্গুলী বনবিবির ভাই বলে পরিচিত। এই নামটিও বিশেষ অর্থ বহন করে। 'শা' ক্ষিপ্রগতি-বোধক শব্দ,' জঙ্গুলী' শব্দের অর্থ জঙ্গলে যিনি থাকেন বা চলাফেরা করেন।

সুতরাং 'শা-জঙ্গুলী' শব্দের আক্ষরিক অর্থ জঙ্গলে যিনি ক্ষিপ্রগতিতে চলাফেরা করেন। 'শা' শাহ্ (বাদশাহ) শব্দজাত বলে শাজঙ্গুলী হলেন জঙ্গলের বাদশাহ। আবার ইনি বনবিবির অনুচর বলেও লোকসমাজে পরিচিত। চব্বিশ পরগণায় সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলে আর্ত মানুষের নিকট অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই দুই ব্যক্তিত্ব দেবদেবী স্বরূপ।

বনবিবির কোলে আছে দুখে নামে একটি শিশু। দুখে শব্দটি দুঃখী শব্দের আঞ্চলিক রূপ। অর্থাৎ দারিদ্র্যক্লিষ্ট অসহায় মানুষ দুঃখী। কিন্তু পালাগানে উল্লিখিত দুখের সাথে এই দুখের মিল কষ্ট কল্পিত। কারণ বনবিবির কোলে যিনি আছেন তিনি শিশু আর ধনামৌলের নৌকার কর্মী দুখে নিশ্চয় শিশু নয়। প্রকৃতপক্ষে বনবিবিমার কোলের শিশু সন্তানটি বিশ্বের সমগ্র মানবের প্রতীক। সন্তান ক্রোড়ে মাতৃকার বহু নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন শিশু গণেশ ক্রোড়ে মাতা দুর্গা, যীশু ক্রোড়ে মাতা মেরী, কৃষ্ণ ক্রোড়ে মাতা যশোদা, বসন্তরায় ক্রোড়ে মাতা শীতলা, সন্তান ক্রোড়ে মাতা ষষ্ঠী, মাতা ওলাবিবি বা আসনবিবি প্রমুখ। প্রকৃত তাৎপর্যে বনবিবি অরণ্যদেবী হিসাবে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে পূজিতা হলেও তিনি আদিম মানুষের পূজিত মাতৃকাপূজার অংশ বিশেষ।

লোকসংস্কৃতির গবেষক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত অরণ্যদেবীর দুটি রূপের কথা বলেছেন। একটি হিন্দু, অপরটি মুসলিম। হিন্দু রূপটি নারায়ণী, চণ্ডী, বনদুর্গা হিসাবে পরিচিত এবং মুসলিম রূপটি বনবিবি রূপে খ্যাত।[৪] সুতরাং বনবিবি হিন্দু-মুসলিম ধর্মচিন্তার এক সমন্বিত বা মিশ্রিত অরণ্যদেবী, যাঁর উৎসগত তাৎপর্য নিহিত আছে প্রচলিত লোকবিশ্বাসের অনেক গভীরে।

চব্বিশ পরগণায় বনবিবির মূর্তি ও পূজাচার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর ন্যায় বনবিবির আকৃতি উগ্র বা ভয়ঙ্করী নয়। শান্ত-সৌম্য, ভক্ত-বৎসল ও দয়াবতী রূপেই তিনি পল্লীবাসীর কাছে পরিচিতা। পৌরাণিক দেবীদেরই মত তিনি লাবণ্যময়ী। বিবিমার ভাবমূর্তি দুধরনের। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে এক রকম ও হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে কিছু ভিন্ন। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে বিবিমা খানদানী মুসলিম কিশোরী। মাথায় বন্য লতাপাতা আঁকা টুপি, বিনুনী চুল, টিকুলী, নানারকম হার, পরনে পিরাণ বা ঘাঘরা পাজামা, পায়ে জুতা, মোজা, কোন কোন ক্ষেত্রে গায়ে পাতলা ওড়নাও থাকে। দেবীর দুটি মুক্ত হাত, হাতে কোথাওবা আশাদণ্ড থাকে। বাহন মুরগি বা বাঘ। কোলে একটি শিশু পুত্র। কেউ বলেন বালকটি দক্ষিণরায় আবার কেউ বলেন দুখে। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে বনবিবির আকৃতি অন্য রকমের। দেবীর বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় মুকুট, গলায় হার, আশাদণ্ড থাকে না, দুটি হাত। কোথাও বাহন বাঘ, কোথাও বাহন মুক্ত। কোলে শিশু থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাও থাকে না। সব থানে বনবিবির মূর্তি পূজা করা হয় না। মাটির বা ইটের বেদীর উপর কাদার তাল করে ফুল দূর্বা দিয়ে পূজা করা হয়। কাদার তাল আবার কোথাও তিনটি, কোথাও সাতটি, আবার কোথাও বা একটি। এই রূপ পূজার রীতি সম্ভবত দক্ষিণবঙ্গে মুসলিম-প্রাধান্যকালে নিরাকার বিশ্বাসের জের অথবা আদিম মাতৃকাপূজার অঙ্গ হিসাবে লৌকিক ধারায় প্রবহমান।

ক্ষেত্র বিশেষে বনবিবির পূজা দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি পল্লীতে পূজা অপরটি জঙ্গলে পূজা। পল্লীতে যে-পূজা, তা কোথাও এককভাবে কোথাও সাধারণীভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে পল্লীতে যে-পূজা হয় তাতে আড়ম্বর বেশি, ভক্তিভাব তদপেক্ষা কম। বিশেষ করে বারোয়ারী পূজাতে বাদ্যি বাজনার আড়ম্বর এত বেশি হয় যে, সেখানে ভক্তিভাবনা প্রায় থাকে না বললেও চলে। এই সমস্ত থানে দেবীর বহু ছলন আসে। কোন কোন থানে দেড়শ-দুশোরও অধিক ছলন আসে। বিশাল মেলা হয়। এককভাবে কেউ পূজা করলেও গ্রামের লোকজন তাতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আড়ম্বর খুবই কম থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বনবিবির পূজা সাধারণী পূজা হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গলে যাঁরা যান তাঁদের বিবিমার পূজার বৈশিষ্ট্যই আলাদা। এখানে আড়ম্বরের থেকে ভক্তি ভাবই অধিক। কারণ জঙ্গুলেগণ প্রাণের দায়ে দেবীর পূজা করেন। কোন রকম অনাচার হওয়ার উপায় নেই। জঙ্গলে যাবার আগে এক সপ্তাহকাল তাঁরা খুবই শুদ্ধভাবে থাকেন। কোন রকম ময়লা কাপড় পরেন না, স্ত্রী সংসর্গ করেন না, স্নান করে বাসি কাপড় পরেন না। মোটের উপর যতখানি শুদ্ধভাবে থাকা যায় সেইভাবেই থাকেন, তারপর জঙ্গলে যাবার দিন বাড়িতে ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করে জঙ্গলে যান। জঙ্গলে নেমেও প্রথমে ভক্তি সহকারে দেবীর পূজা করে তবে বনে কাঠ সংগ্রহ বা মধু সংগ্রহ ইত্যাদি করেন। আবার কাজ শেষ করে বিবিমার পূজা দিয়ে বাড়ি ফেরেন। যতদিন বাড়ির লোক জঙ্গলে থাকেন ততদিন বাড়ির মেয়েরা আলতা, সিঁদুর পরেন না, আমিষ খান না এবং নিত্য বাড়িতে বিবিমার পূজা করেন। ছলনের কাছে নিয়মিত সন্ধ্যা দেওয়া, পূজা অর্ঘ্য দেওয়া, এমন কি হত্যে দেওয়াও পর্যন্ত করে থাকেন। জঙ্গলে গিয়ে প্রত্যেক দল এক বা একাধিক মোরগ মায়ের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেন। তারপর দেশে ফিরে জাঁকজমক সহকারে বনবিবির পূজা করেন। মহলকারীদের বিশ্বাস কোনরকম অনাচার হলে দেবীর বাহন বাঘের কবল থেকে রেহাই নেই। বিভিন্ন পীর পয়গম্বরের দোহাই দেওয়া অনেক মন্ত্রতন্ত্রও তাঁরা ব্যবহার করেন, বাঘের কবল থেকে বাঁচবার জন্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঝড়খালি অঞ্চলে বসবাসকারী বাউলে নরেন্দ্রনাথ রায় (৬০) ও ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৫৮)-এর সাক্ষাতকারের (২২.১০.'৯৩) ভিত্তিতে অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানা গেছে, যা নাকি জঙ্গলে প্রবেশের সময় ও আপদকালীন অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। জঙ্গলে ওঠার আগে জঙ্গলবন্ধের যে মন্ত্রটি ধীরেনবাবু আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন তার একটি হল—

"পূর্বে ডাক, পশ্চিমে ডাক, উত্তরে ডাক, দক্ষিণে ডাক
আমার এই ডাকের মধ্যে যে করিবি ঘা
আল্লা মহম্মদের মাথা খা।
আমার এই কথা যদি নড়ে
আল্লা মহম্মদের মস্তক যমুনায় ভাসে।"

তবে বাঘ চার-পাঁচ হাতের মধ্যে এসে গেলে তিনি যে 'নিদান' মন্ত্রটি আবৃত্তি করেন তা তিন-চারটি কথা। সেটি তিনি শোনাননি।

পাথরপ্রতিমা থানার দক্ষিণ কাশীপুর গ্রামের শ্রী বিভূতিভূষণ আড়ী (৬৫) দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর জঙ্গলে যাচ্ছেন, বর্তমান গবেষক তাঁর সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে (ইং ১৫.৫.১৯৯২) বনবিবির পূজা সংক্রান্ত যে তথ্য জানতে পেরেছেন তা এইরূপ— তাঁরা জঙ্গলে কাঠ, মধু ইত্যাদি সংগ্রহে যাবার আগে বাড়িতে বনবিবির পূজা করেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে নৌকা নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হন। কাছেই মইপিটের জঙ্গল। জঙ্গলে নামার আগে নৌকাতে আর একবার পূজা করা হয়। এবার কাঠকাটা সাঙ্গ হলে বনে বনবিবির পূজা দেওয়া হয়। পূজার উপকরণ হল ফুলমালা, শাঁখা, ঘুমসি, গামছা, ধূপ, বাতাসা, সন্দেশ ইত্যাদি। বনবিবির পূজায় সবক্ষেত্রে শাঁখা ব্যবহৃত হয় না। পূজার পর মাঝি শুদ্ধাচারে নৌকাতে রাতে শুয়ে পড়েন, তারপর সুবিধা ও অসুবিধা স্বপ্নে জানতে পারেন। সব মাঝির ক্ষেত্রে দেবীর আদেশ হয় না। বিভূতিবাবু জানালেন, বনে বিপদ-আপদ হলে মন্ত্র কেবল একটাই, তা হল ভক্তি ও আবেগ মথিত 'মা' ডাক। তিনি কেবল বাঘ দেখেছেন তাই নয়, বাঘকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন এবং বাঘের মুখ থেকে তাঁর সহকর্মী একজনকে ছাড়িয়েও এনেছেন। দীর্ঘদিন তিনি জঙ্গল করেছেন কিন্তু কোনদিন তাঁর কোন বিপদ হয় নি। শুধু তাই নয়, তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জানালেন মায়ের কৃপায় তাঁর কোনদিন কোন বিপদ হবে না। তাঁর মায়ের ভরও হয়। বিপদে পড়ে মাকে ডাকলে বরা, পাখিরূপে মা আসেন। তখন তাদের গায়ে হাত দেওয়া যায়। তারা মাঝে মাঝে নৌকার সিঁদুরও মেখে থাকে, তখনই চেনা যায় যে, মা এসেছেন। প্রচণ্ড মেঘ উঠলে বা নদীতে বিপদ হলে বিশালাক্ষীকেও তাঁরা স্মরণ করেন।

পাথরপ্রতিমা থানার হেরম্ব গোপালপুর গ্রামে এক বিশালাক্ষীর মূর্তি পূজা হয়। বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার যখন মায়ের পূজা হয় তখন বিশালাক্ষীদেবীকে বনবিবি বলে পূজা করা হয়। এখানকার উপপ্রধান (১৬.৫.৯২) অনন্ত মান্না জানালেন, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস বিশালাক্ষী ও বনবিবি একই। তবে বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার পূজার সময় দেবীকে বনবিবি বলা হলেও অন্য সময় বিশালাক্ষী বলা হয়। এখানকার এক পুরোহিতের মতে বনবিবি ও বিশালাক্ষী পৃথক দেবী।

কেচ্ছাকাহিনীতে বনবিবির যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় বনবিবি মানবী। তিনি খোদাতালার নির্দেশে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা মক্কার বেরাহিম নামে এক ফকির, মাতা গুলালবিবি। এক নির্জন জঙ্গলে পরিত্যক্তা মায়ের গর্ভে (যমজ) শাজঙ্গুলী ও বনবিবির জন্ম হয়। বনবিবি পালাগানে মানবী রূপে চিহ্নিত হলেও অলৌকিক শক্তি তাঁর করায়ত্ত। মায়াশক্তির দ্বারা তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। এ যেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যধারার দেবদেবীদের মত। মঙ্গলকাব্যের থেকে মুল যে পার্থক্য তা হল-মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন না। অলক্ষ্যে থেকে ভক্তের কাছে পূজা আদায় করেন। এখানে বনবিবি নিজেই মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভক্তকে রক্ষা করে পূজা গ্রহণ করেছেন। এ দেবী প্রতিহিংসা পরায়ণা নন, কোথাও তাঁর নির্মমতা প্রকাশ

পায়নি। নারায়ণীর সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করেও তিনি নারায়ণীকে প্রাণে না মেরে সই পাতিয়েছেন এবং অধিকাব ভাগাভাগি করেছেন। দক্ষিণরায়কে বন্দি করে এনেও তাঁকে ক্ষমা করেছেন। ধনামৌলের সাথে কোন সংঘাতে না গিয়ে তাঁর কন্যা চম্পার সাথে দুখীর বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সর্বোপরি তাঁর অপার দয়া-দাক্ষিণ্য লাভ করে রাখাল দুখে ধন্য হয়েছে ও চৌধুরী বনেছে। এছাড়া মহলকারী মৌলে, বাউলে ও কাঠুরিয়াদের জঙ্গলে রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে নিজেকে জাহির করেছেন। সুতরাং সুন্দববন অঞ্চলে তিনি মুসলমানের নিকট বোনবিবি ও হিন্দুর নিকট বনদেবী রূপে পূজিতা হলেও সার্বিক ভাবে সব শ্রেণীর মানুষের নিকট তিনি 'বোনবিবিমা' এই নামেই বিশেষ পরিচিতা। সুন্দরবনের মত শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে মহলকাবী হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে তিনি একমাত্র বক্ষাকারী দেবী। মহলকারীদের বিশ্বাস, দেবীর ইচ্ছা হলে জঙ্গল থেকে ফিরবে নতুবা বাঘের পেটে যাবে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জঙ্গলে যাবার প্রাক্কালে দেবীর মূর্তি পূজাই কবেন।

চব্বিশ পরগণায় বনবিবির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রচলিত কাহিনী ও পালাগানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বনবিবিকে নিয়ে অনেক পুঁথি লেখা হয়েছে। মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত 'বোনবিবী জহুরা নামা' নামে একটি পুঁথি আছে। সেখানে পাঁচালিকাব নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

মোহাম্মদ খাতের কহে অছি করি সার *
হাবড়া জেলার বিচে বসতি যাহার।।
বালিযা গোবিন্দপুরে কদিমি মোকাম *
মোহাম্মদ হেছামুদ্দিন বাবাজির নাম।।

"বোনবিবীর জহুবা নামা কন্যার পুথি" নামে আর একখানি ছাপান পুথির সন্ধান মেলে। পুথিটি আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত। পুথির ভণিতায় মোহাম্মদ মুনশীর কথা আছে।

তেরোশ পাঁচ সাল বারই ফাল্গুনে *
কলমে বিদায় করিলাম ভেবেগুণে।।
বলে মোহাম্মদ মুনশী জনাবে সবার *
ভুরসুট কানপুরে বসতি আমার।।

মোহাম্মদ খতের ও আবদুর রহিম রচিত পুঁথির কাহিনীদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে এবং পালাগায়কদের গাওয়া গানের সাথে ও উল্লিখিত পুথির মূল কাহিনীর অনেক সাদৃশ্য আছে।

'বোনবিবি' পালাগানকে মোটামুটি তিনটি শাখায় বিভক্ত করা যায়। যথা (১) বোনবিবি ও শাজঙ্গুলীর জন্ম, (২) নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের সাথে বোনবিবি ও শাজঙ্গুলীর যুদ্ধ ও বন্ধুত্ব, (৩) ধোনামৌলের মহল যাত্রা বা দুখের কাহিনী। পালাগায়কগণ মূলত ধনামৌলের মহল যাত্রা বা দুখের কাহিনীটি গান করেন। এই পালাটি খুব জনপ্রিয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় যত পাঁচালগায়ক বা পালাগায়ক আছেন তাঁদের

প্রায় প্রত্যেকেই এই পালাটি গান করেন। ক্ষেত্রগবেষণায় এই পর্যন্ত যে কটি পালাগান সংগৃহীত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু পরিবেশন পদ্ধতি প্রত্যেকের কিছু পৃথক। বিশেষ করে পালাগায়কগণ হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে বা রগড় করার ক্ষেত্রে নিজস্বতা দেখান। পালার শেষে পালাগায়ক মাগনের বা ভিক্ষার গান করেন। সুর, তাল, লয়ে এ গানটি হয়ে থাকে। মা বোনবিবির দোহাই দিয়ে উপস্থিত দর্শক বা শ্রোতাদের কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়া হয়। ভিক্ষার গান মূল পুঁথিতে নেই। আসর বিশেষে গায়ক নিজেই উপস্থিত বুদ্ধিমত কথা তৈরি করে গান করেন। ফলে গানের স্টাইল এক হলেও বিভিন্ন পালাগায়ক বিভিন্নভাবে এই গান করেন।

বোনবিবী জহুরা নামা ও 'বনবিবির পালা' ছাড়া অখণ্ড চব্বিশ পরগণায় বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচারমূলক আরো একটি আসর বসে, এটিকে দুখের যাত্রা বলে। পুরো যাত্রাঢঙে এই অনুষ্ঠান হয়। বোনবিবি জহুরা নামা কাহিনীটি সংলাপের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু চরিত্র এনে পালাটি বেশ জাঁকজমক করে তোলা হয়। দুখের যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলেও দুখের পালাগানটি বেশি অনুষ্ঠিত হয়। কারণ দুখের যাত্রাতে যে সময় ও যত চরিত্রের প্রয়োজন হয় বা আনুষঙ্গিক লাইট, মাইক ইত্যাদির প্রয়োজন হয় দুখের পালাতে তা হয় না। বলা চলে অল্প খরচেই দুখেরপালা গাওয়া যায়। ফলে দুখের যাত্রার প্রচলন অনেক কম, পালাগানের প্রচলন তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রথম অংশ বনবিবি ও শাজঙ্গুলীর জন্ম কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

বনবিবি ও শাজঙ্গুলীর জন্ম

মক্কার শহরে বেরাহিম নামে এক ফকির বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ফুলবিবি, তাঁরা খুব সুখে বাস করেন কিন্তু দুঃখ একটিই, কোন পুত্রসন্তান নেই। তাই একদিন বেরাহিম মোদিনাতে গিয়ে রছুলের গোরে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানান। গোর হতে নবীজি বেরাহিমের কথা শুনে আকাশবাণী করে জানান কোরাণে তার সন্তানলাভের কথা আছে, কিন্তু ফুলবিবির উদরে সে সন্তানের জন্ম হবে না। একথা শুনে বেরাহিম বাড়িতে ফিরে গিয়ে ফুলবিবিকে সব কথা শোনান এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে পুনরায় বিয়ের জন্য মক্কার শহরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। ঘটনাক্রমে সাহাজলিল নামে এক ফকিরের সাথে আলাপ হয় এবং এক বিবাহ-যোগ্যা কন্যা গুলালবিবিকে পারস্পরিক সম্মতিতে বিয়ে করেন। শাদির পর বেরাহিম গুলালবিবিকে নিয়ে আপন বাসায় ফিরে এলেন, এতে ফুলবিবি অন্তরে জ্বলে পুড়ে গেলেন। এদিকে খোদা তামাসা দেখার জন্য বেহেস্তের বনবিবি ও শাজঙ্গুলিকে গুলালবিবির উদরে পয়দা হতে হুকুম দিলেন। খোদার হুকুমে দুই ভাইবোন গুলালবিবির উদরে পয়দা হতে মর্ত্যে এলেন। আল্লার কৃপায় বনবিবি ও শাজঙ্গুলি গুলালবিবির উদরে ঠাঁই নিলেন। এই কথা ফুলিবিবি জানতে পেরে বেরাহিমের কাছে পূর্বের প্রতিশ্রুত বর প্রার্থনা করেন যে, গুলালবিবিকে বনে দিয়ে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। এইকথা শুনে বেরাহিমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়লো। অনেক অনুনয় বিনয় করে এই বর প্রার্থনা ফিরিয়ে নিতে বললেন। তাতে কোন

ফল হল না। বেরাহিম ছলনা করে নিয়ে গুলালবিবিকে গর্ভবতী অবস্থায় জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলেন। গুলালবিবি যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি বনে বিসর্জিত হয়েছেন তখন পুরুষজাতির প্রতি তাঁর মন ঘৃণায় ভরে গেল এবং কাঁদতে কাঁদতে আল্লার স্মরণ করলেন। তখন আল্লা হুর চারজনকে বিবির কাছে পাঠালেন। তারপর বিবির দুই যমজ সন্তান হল। একে নিরুপায় অবস্থা তার উপর দুই সন্তানের দায়িত্ব নিতে অক্ষম বোধ করায় গুলালবিবি কন্যা বনবিবিকে জঙ্গলে ফেলে রেখে শাজঙ্গুলিকে নিয়ে চলে যান। তারপর বনবিবিকে হরিণীরা দুধ খাইয়ে বড় করে তোলে। এরপর একদিন বেরাহিম ফুলবিবিকে তাঁর নিষ্ঠুর কর্মের জন্য অভিযুক্ত করেন, তখন সাত বৎসর পার হয়ে গেছে। বেরাহিম অস্থির হয়ে গুলালবিবির সন্ধানে সেই জঙ্গলে গেলেন। আল্লার মেহেরবানিতে গুলালবিবব সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। অনেক অভিযোগ অনুযোগের পর বেরাহিম গুলালবিবিকে ও শাজঙ্গুলিকে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন, এমনসময় কোথা থেকে বনবিবি দৌড়ে এসে ভাই শাজঙ্গুলিকে যেতে নিষেধ করেন।

তারপরে বুঝাইয়া কহে মা-বাপেরে
আমা দোহে ছাড়িয়া তোমরা যাও ঘরে।।
খোদার হুকুমে মোরা যাব বাদাবনে
তোমাদের ঘরে পয়দা হইনু সে কারণে।।

(প্রথম কাহিনী সমাপ্ত।)

বনবিবি পালার দ্বিতীয় পর্বটিকে নারায়ণী পালা বলা হয। কাবণ এই অংশে বনবিবির সাথে নারায়ণীর যুদ্ধযাত্রা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা আছে। পালাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

বনবিবি ও নারায়ণী কথা

পিতা ও মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনবিবি ও শাজঙ্গুলি মদিনাতে গেলেন। সেখানে হাসেম, ফতেমা ও মোবারকের গোরে প্রার্থনা করেন। তখন আল্লার দোয়া রূপে একটি টুপি পেলেন। সেই টুপি নিয়ে উভয়ে ভাঁটির দেশের দিকে রওনা হলেন।

কতদিনে পোঁছে এসে দেশ হিন্দুস্থানে
পার হয়ে গঙ্গানদী খোসালিত মনে।
এসে পূর্বভাগ গায়ে (গাঁয়ে) এড়াইয়া যায়
পৌছেন দাড়ায় এসে ভাঙ্গড় যেথায়।
দেখিয়া ভাঙ্গড় সাহা উঠে হইল খাড়া
আরজ করিয়া কহে দুই হাত জোড়া।

ভাঙ্গড়পীরের কাছে বনবিবি দুই ভাইবোন এসে ভাটির দেশের ঠিকানা জানতে চাইলে ভাঙ্গড় পীর যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা হল—ভাটির ঈশ্বর হলেন দক্ষিণরায়। বনের ভিতর তাঁর বহু শিষ্য। নুন, মোম, খড়ি, জড়ি এখানে প্রচুর আছে। বিভিন্ন স্থানে তিনি হাটমধু বসিয়েছেন। ভাঙ্গড়পীরের মোকাম যেখানে সেটিও দক্ষিণরায়ের রাজত্বের মধ্যে পড়ে। এই

দেশ দখল করতে গেলে প্রথমে রায়মঙ্গল, শিবাদহ এগুলি আগে দখল করতে হবে। তারপর যেতে হবে চাঁদখালি। সেখান থেকে যেতে হবে আন্ধারমানিক। অবশ্য আন্ধারমানিক দখল নিতে বনবিবিকে নিষেধ করেছিলেন। বনবিবি শাজঙ্গুলি ভাঙ্গড় পীরের পরামর্শ মত প্রথমে জুড়িতে এসে আসন করে বসেন। সেখান থেকে শাজঙ্গুলি আজান দিলে দক্ষিণরায় ও তাঁর জননীর ঘুম ভেঙে যায়। আকাশ-কাঁপা সে আজান শুনে রায়মণি (নারায়ণী) ও রায় সনাতন (দক্ষিণরায়) ভয় পেয়ে গেলেন। রায়মণি ও রায়সনাতনের পরিচিত বরখান গাজীর আজানের সাথে এ আজানেব কোন মিল নেই ভেবে এ ফকির কে তা লোক পাঠিয়ে জানতে চান এবং একে তাড়িয়ে দেবার জন্য লোক লস্করও পাঠান হয়, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসায় দক্ষিণরায় নিজেই যুদ্ধে যেতে চান। তখন মা নারায়ণী বনবিবির সাথে যুদ্ধে পুত্র সনাতনকে পাঠাতে ইচ্ছুক নন, কারণ এক নারীর সাথে যুদ্ধে সনাতন যদি জিতে যান তাহলে কোন কৃতিত্ব নেই বরং হেরে গেলে অখ্যাতি হবে। তাই তিনি নিজেই যুদ্ধে যাবাব জন্য মনস্থ করলেন। তিনি যে বাহিনী নিয়ে বনবিবির সাথে যুদ্ধে গেলেন তাতে পুরুষ সৈন্য ছিল একলাখ ছাপ্পান্ন হাজার। এরা শ্মশান ভূতের মত কালো চেহারা যুক্ত। নারী সৈন্য ছিল ছত্রিশ কোটি, এদের ডাকিনী বলা হত।

শ্মশান সমান ভূত সাজে যেন কালদূত
একলাখ ছাপ্পান্ন হাজার
ডাকিনী ছত্রিশ কোটি জুড়িয়া আঠারো ভাটি
সেজে আইল বলে মার মার।।

বনবিবি শাজঙ্গুলির সাথে নারায়ণী সেনাদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হলে বনবিবি ও শাজঙ্গুলিব প্রবল বিক্রমে নারায়ণীর সৈন্যসজ্জা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তখন নারায়ণী সাময়িক ভয় পেলেও রণে ভঙ্গ দেন নি। নিজেই নিজের ক্ষমতাবলে বনবিবির সাথে লড়াই করলেন। নারায়ণীর প্রবল বিক্রমে বনবিবি প্রায় পরাজিত হয়ে শেষে দৈবশক্তির শরণাপন্ন হলেন। তিনি বরকত বলে ডাক দিয়ে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা জানান। তখন বেহেস্ত থেকে বরকত খোদার হুকুমে বনবিবিকে সাহায্য করার জন্য এলেন। তাঁর সহায়তায় বনবিবি নারায়ণীকে পরাস্ত করেন এবং উভয়ে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আঠার ভাঁটির অধিকার ভাগাভাগি করে নিলেন।

বনবিবি বলে সই শুন দেল দিয়া।
সকলে আঠার ভাটি লইব বাটিয়া।।
কারো মনে দুঃখ নাহি দিব কদাচন।
যাও তুমি আপনার ঘরেতে এখন।।

নারায়ণী পালা এখানেই সমাপ্ত। পালাগায়কগণ এই পালাটিকে করুণ রসের মাঝে হাস্যরস সৃষ্টি করে সাধারণের উপভোগ্য করে তোলেন।

বনবিবির পালার তৃতীয় পর্বের নাম 'ধোনামৌলের মহল যাত্রা' বা দুখের পালা। এই

অংশটি পালাগায়কগণ বেশির ভাগ আসরে গেয়ে থাকেন। ক্ষেত্রগবেষণায় এই পালাটি বর্তমান গবেষক একাধিক পালাগায়কের নিকট হতে সংগ্রহ করেছেন। এমনই একটি পালা কেফায়েতপুর গ্রামের (বারুইপুর থানা) শ্রী সন্তোষকুমার ঘোষের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। এটি পালাগানের সম্পূর্ণরূপ। পালাটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল—

ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলির পূর্ণরূপ :

কঃ = কথা, মঃ = মহড়া বা মূল গায়ক, দোঃ = দোহার, প্রঃ দোঃ = প্রথম দোহার, ২ দোঃ = দ্বিতীয় দোহার।

ধোনামৌলের মহল যাত্রা

ধোনাই মোনাই নামে ছিল দুটি ভাই।
বাদাবন করে খায় হামেসা এসাই।।
বরিজহাটিতে ঘর তাহাদের ছিল।
একদিন ধোনাইয়ের মনে বাসনা হইল।।
মোনাইকে ডেকে ধোনাই কহিতে লাগিল ....।

দেখ ভাই মোনাই, আমি মহল করতে যাব, আমার লোকজন দাঁড়ি-মাঝি সব যোগাড় করে দাও। তখন মোনাই ভাইকে বলছে—

গান।। বারণ করি ওরে ধোনা যেওনা বাদাবনে
শুনিয়াছি বাঘেরই ভয় বাঁচবিনাত পরাণে
যত টাকা চাহ তুমি দিব আমি ভাই
তোমার রোজগার আমি খেতে নাহি চাই।

এখন ওসব কথা ছেড়ে দিয়ে ঘরে যাও। তুমি আমার একটিমাত্র ভাই, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব নাই।

কথা।। দেখ ভাই মোনাই, যাইবার কালে আমায় নাহি দিও বাধা। ঘটিবে তাহা, যাহা লিখিয়াছেন নসিবেতে খোদা। দেখ ভাই, তুমি লোকজন সব যোগাড় করে দাও।

দো : আচ্ছা ভাই, আমি লোকজন সব যোগাড় করে দিচ্ছি।

কথা।। ভাইয়ের ইচ্ছাপূরণ করতে মোনাই লোকজন যোগাড় করে দিল, কিন্তু সুখারিতে যাবার পথে একজন লোকের অকুলান হল। তখন ধোনা কহিতে লাগিল—দেখ ভাই মোনাই, দুখে বলে একটি ছেলে আছে মোর জানা। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি দুখেকে নিয়ে আসি।

এই কথা বলে ধোনা দুখের বাড়িতে গেল।
আর দুখে দুখে বলে ধোনা ডাকিতে লাগিল।।

দো : তুমি কে গা, আমায় ডাকছ?

গান।। আমারো সেই দুঃখের কথা চাচাজি কই কার হুজুরে
অতি শিশু শৈশবকালে বাবজান আমার গেছেন মরে
অন্নের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে চাচা পথে পথে বেড়াই ঘুরে।

কথা।। ধোনা বলছে, আমি তোমার চাচা। যখন তোমার পিতা মারা গিয়েছিল তখন তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিল, একে একটু দেখভাল কোরো ভাই। তাই তোমার খোঁজখবর নিতে এলুম। তা তোমার কিভাবে চলছে বাবা।

দো : চাচাজি, কাজ কাম কিছু নাই জানি। তাই গৃহস্থের গরু চরাইতেছি।

ম : সে কি বাবা! তুমি এত বড় ছেলে হয়েছ, কিছু কাজকর্ম কর না? দেখ বাবা দুখে, তুমি আমার সঙ্গে মহল করতে যাবে? শুধু নৌকায় বসে বসে খাবে, কিছুমাত্র মেহনত নাহি হবে। এই নাও বাছা, কিছু টাকা নিয়ে তোমার মাকে দিয়ে এস। এই কথা শুনে দুখে বড় আনন্দিত হয়। আর দুখে মাকে ডেকে এই কথা কয়।

গান।। আর শুনেছ ও জননী ধোনা চাচা মহলে যাবে
সত্যকথা বলছি মাগো চাচা আমার সঙ্গে নেবে
মোম মধু সব নৌকা ভরে আনবে চাচা এই শহরে
দেখবে মাগো নয়নভরে চাচা আমায় বিয়ে দেবে।

ধোয়া।। এই কথা শুনে বুড়ি বলে তাড়াতাড়ি, আর মহল গিয়ে কাজ নাই বাবা, থাক তুমি বাটিগো, আমি জানবো কেমনে............।

ম : আবার দুখে মায়ের পায়ে ধরে বলছে—

গান।। মহলেতে যাই জননী বারণ কোরো না গো তুমি
মহলেতে না যেতে দিলে মাতা গরল খেয়ে মরব আমি
ভাড়া ভেনে কষ্ট করে কতকাল খাওয়াবে মোরে
যাবো আমি ভাটির দেশে মাগো চিন্তা কোরো নাগো তুমি।

ক: ম: এদিকে দুখে মায়ের হাত ধরে নিয়ে ধোনার কাছে গেল। আর ধোনাকে ডেকে বুড়ি কহিতে লাগিল — ভাই ধোনা, আমায় কি জন্য ডেকেছ ভাই?

দো : ভাবিজীগো, নাভাবিও অন্তরে। ব্যাটার মাফিক আমি রাখিব দুখেরে। খোদা চায় ফিরে আসি মহল করিয়ে। আর টাকা কড়ি দিয়ে আমি দুখেকে দেওয়াইব বিয়ে। তখন দুখের মা দুখেকে ডেকে কহিতে লাগিল—

গান।। শোনরে ধোনা বলি তোরে শোন, আমার দুখের করলাম সমর্পণ
এখন হাতে হাতে দিলাম সঁপে, যেন কষ্ট না পায় যাদুধন
ক্ষুধার সময় হলে পরে, খেতে দিও ভাই মোর বাছারে
কাছে রেখো যত্ন করে, যেন কষ্ট না পায় যাদুধন।

ক: ম: এদিকে দুখের মা দুখেকে ডেকে বলছে, বাবা দুখে জঙ্গলে যদি কোন দিন কোন বিপদে পড়িস তাহলে বনে আছে বনবিবিমা, তাঁকে স্মরণ করিস।

ধোয়া ।। বনবিবি না বলতে পার দুখে একবার ডেকোরে মা বলে, সেই সময় সোনার যাদু মা তোমার নেবে কোলে তুলেগো। আমি জানব কেমনে ....।

কথা।। এদিকে ধোনা দুখেকে নিয়ে হলেন বিদায়, আর সুখারিতে এসে দাঁড়ি-মাঝিগণকে

ডেকে এই কথা কয়—দেখ দাঁড়ি-মাঝিগণ, তোমরা এই গণে নৌকার কাছি খুলে দাও। সেই গণে দাঁড়ি-মাঝি নৌকার কাছি খুলে দিয়েছিল, আর বাহ্ বাহ্ বলে ডিঙ্গা বাহিতে লাগিল।

ডিঙ্গা বাহ হে নরহরি, পবন কাণ্ডারী সঙ্গে লইয়া পবন বেগ।
বাহ বাহ বলে ডিঙ্গা বেয়ে চলে যায়
কত শত বাদাবন পার হয়ে যায়।
রাইমণি রায়দীঘি পার হয়ে যায়
গরাণকাটি আসি সবে উপনীত হয়।
গরাণকাটি ঘাট তখন পার হয়ে যায়
হেড়ভাঙ্গায় এসে তখন উপনীত হয়।
হেড়ভাঙ্গা ঘাট তারা পার হয়ে যায়
ঝড়খালি আসি তারা উপনীত হয়।
ঝড়খালি ঘাট তারা পার হয়ে গেল
কেঁদোখালি আসি তারা উপনীত হল।

ম : ধোনা তখন সেই ঘাটে উপস্থিত হয়ে বলে—নরহরি, তোমরা সব এই ঘাটে ডিঙ্গা বাঁধ সারি সারি। এদিকে রায়সনাতন নফরকে ডেকে কহিতে লাগিল, ওরে আবার কে এখানে এল?

দো : দেখুন বাবাঠাকুর, সে বৎসর যে ধোনা মৌলে মহল করতে এসেছিল সেই ধোনা মৌলে মহল করতে এসেছে।

ম : সেই ধোনা মৌলে মহল করতে এসেছে? যাবৎ আমায় নাহি দেয় নরবলি পূজা, ওকে মোম মধু নাহি দিব দেখাইব মজা। যাও ঝড়খালি গিয়ে মধুর চাক সব শুকিয়ে দাও।

দো : জি আজ্ঞে বাবাঠাকুর।

ম : এদিকে ধোনা লোকজন নিয়ে বনে মনের আনন্দে মধুর চাক দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে মধুর চাক সব শুকিয়ে গেল। আর মনের দুখে ধোনা এই কথা বলতে লাগল—

ধোয়া।। বিদেশে আসিলাম লাভ করিবার আশে, আর লাভে মূলে সব খোয়াই বুঝি আমার কপাল দোষে। আমি বাঁচব কেমনে ......।

ম: কথা।। যাই হোক, যদি হয় কোন বিধাতার ফের, তা হলে ভালো মন্দ সব নৌকায় পাওয়া যাবে টের। এই কথা বলে ধোনা পবিত্রভাবে নৌকায় শুয়ে রইল। আর রায় ধোনার শিহরে বসে বলতে লাগলেন, ওরে ধোনা-কি দুঃখ হয়েছে অন্তরে, তুমি অনিদ্রায় অনাহারে নৌকায় আছ শুয়ে।

দো : কে আপনি আসিয়াছেন ওগো দয়াময়, সত্য আজ আমারে দাওনা পরিচয়।

ম : দণ্ডবক্ষ মুনি ছিল ভাঁটির ঈশ্বর। তাহার তনয় আমি নাম দক্ষিণদর, বাদাবন মোম মধু সব সৃজন আমার।

দো : বাবাঠাকুর গো, যদি আপনি ভাঁটির ঈশ্বর এবং মোম মধু সৃজন আপনার হয় তাহলে আমি মোম মধু পাইনা কেন?

ম : ওরে ধোনা, যাবৎ আঁমায় নাহি দাও নরবলি পূজা, মোম মধু নাহি দিব দেখাইব মজা।

দো : বাবাজী গো, আনিয়াছি যত গরীবেরে, বলুন দেখি বাবাজী, আমি দিয়ে যাব কারে?

ম : ওরে ধোনা দৃষ্টি একমাত্র ঐ দুখেরি উপরে।

দো : বাবাঠাকুর, আমার মহলে কাজ নাই, আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

ম : ওরে ধোনা, পালাইবি কোথায় ? সাত ডিঙ্গা ডোবাইব সাগরের জলে, আর সবাইকে খাওয়াইব হাঙ্গর কুম্ভীর দলে।

দো : যদি আপনি একান্ত নরবলি পূজা নেবেন তাহলে আমরা দুটি ভাই এসেছি, দুজনের মধ্যে একজনকে নিন। আমি প্রাণ থাকতে দুখেকে দিতে পারব না।

ম : ওরে ধোনা, আমার অন্য কারুর উপর দৃষ্টি নেই। একমাত্র দৃষ্টি ঐ দুখেরি উপরে।

দো : যদি একান্ত নরবলি পূজা নেবেন, বলুন দেখি বাবাজী, দুখেকে কোথায় দিয়ে যাব?

ম : ওরে ধোনা, আগে লহ মোম মধু নৌকা বোঝাই করে, আর যাইবার কালে দুখেকে দিয়ে যেও ঐ কেঁদোখালির চরে।

কথা।। এই কথা বলে রায়মণি হলেন বিদায়, আর পাশের নৌকায় দুখে জেগেছিল, সকল কথা শুনিবারে পায়। ধোনা দুখেকে ডেকে এই কথা কয়, বাবা দুখে, তুমি আজ দিনটা তাড়াতাড়ি খানা পাকিয়ে রেখে দাও।

দো : চাচাজী গো, আমার কথা শোন, ভিজে কাষ্ঠ আছে নৌকাতে কেমনে পাকাইব খানা।

ম : বাবা দুখে, তুমি আজ দিনটা যা হয় করে খানা পাকিয়ে রেখে দিও। এই কথা বলে ধোনা লোকজন নিয়ে বনে মধু ভাঙতে গেল। আর মনের দুঃখে দুখে কেঁদে কহিতে লাগিল।

গান।। কবে যাবো গো, কবে যাব গো, কবে যাব আমি ঘরে।
বহু দিন হল এসেছি বনে, কতদিনে দেখা হবে মায়েরি সনে।

ম : যাই হোক, মা আমায় বলেছিল, যদি কোনদিন কোন বিপদে পড়িস তাহলে বনে আছে মাবনবিবি, তাঁকে একবার স্মরণ করিস। যাই হোক, এই বিপদ সময় একবার মাকে ডেকে দেখি, কেমন বনের বনবিবিমা।

ধোয়া ।। বনবিবি বনবিবি বলে দুখে ডাকিতে লাগিল, অন্তর্যামী মাবনবিবি অন্তরে জানিল গো। ওরে ও তার মায়া ....।

মা : এদিকে মা বনবিবি জঙ্গুলীকে ডেকে কহিতে লাগিল—

গান।। আমায় কে ডাকলে জঙ্গলে, বনবিবি বনবিবিমা বলে
শুনো ভাই শাজঙ্গুলী, যেতে হবে কেঁদোখালি
কোন বাছার ঐ বিপদ ভারি, তাইতে আমার আসন টলে।

দো : দেখো বুবু, কে কোথায় ডাকছে তাতে তোমার কি?

ম : দেখো ভাই শাজঙ্গুলী, এই আঠার ভাঁটির মধ্যে আমি সবাকার মা। যে আমায় মা বলে ডাকে তার কোনদিন দুঃখ থাকে না। তুমি আমার এই আসন চেপে বস, আমি এখুনি ঘুরে আসব।

গান।। আসনে বোস ভাই তুমি, ত্বরা করে যাচ্ছি বনে এখনই আসিব আমি।
এই কথা বলে মা হলেন বিদায় গো
ঘুরে ঘুরে মা আমার আহ্লাদিত হয় গো
শেষে কেঁদোখালির চরে এসে উপনীত হয় গো।

মঃ কথা।। এদিকে কেঁদোখালির চরে এসে মা আমার দুখেকে দেখে দুখের মায়ের রূপ ধারণ করে কহিতে লাগিলেন।

গান।। এই দেখ এসেছি দুখে আমি তোর মা
আর মা বলে ডাকলে কারু দুঃখ থাকে না
মা বলে ডাকলে পরে মা কি ভুলে থাকতে পারে
অঞ্চলে খুঁদ গুড় বাঁধা, খেয়ো বাপ খিদে পেলে।

মঃ কথা।। এদিকে দুখে মাকে দেখে মনে মনে ভাবতে লাগল, কি আশ্চর্য! এত নদনদী ভেঙে কেমন করে মা আমার কাছে এল? তা ঠিক বাত কহ মাগো তোমারে শুধাই। আর ঝুট বাত কহ যদি তোমার খোদার দোহাই। এই কথা শুনে মা আমার নিজরূপ ধারণ করল আর দুখেকে ডেকে মা আমার শুধাতে লাগলেন। বাবা দুখে, তুমি আমায় কেন স্মরণ করেছ বাবা?

দো : মাগো, চাচা মোর বলে গেছে পাকাইতে খানা, কিন্তু মাগো, ভিজে কাষ্ঠ আছে নৌকাতে, কেমনে পাকাইব খানা। এই তো ভাবনা হতেছে আমার অন্তরে।

ম : দেখো বাবা দুখে, তুমি চাউল ডাউল সব যোগাড় করে দাও, আমি রান্না করে দিচ্ছি। তখন দুখে চাল ডাল সব যোগাড় করে দিল আর মা আমার আতস নামা কলমা পড়ে রন্ধন করতে লাগল।

গান।। সরে বস যাদুমণি সাত ব্যঞ্জন পাকাব আমি
আমার হাতের পাকান খেলে ধোনার কপাল যাবে খুলে
এমনি ধোনা মৌলে খায় নি রে তার বাপের কালে।

ম : বাবা দুখে, এই তো তোমার পাকান হয়ে গেছে, আর তোমার কিসের ভাবনা বাবা?

দ : মাগো, চাচা মোর বলে কয়ে আনিল মহলে, কিন্তু যাইবার কালে চাচা আমার দিয়ে যাবে ঐ কেঁদোখালির চরে। দক্ষিণরায় বাঘ হয়ে খাইবে আমারে। এই তো ভাবনা হতেছে অন্তরে।

ম : বাবা দুখে, যখন তোমার চাচা তোমায় কেঁদোখালির চরে দিয়ে যাবে এবং দক্ষিণরায় বাঘ হয়ে তোমায় খেতে আসবে তখন একটিবার বোনবিবিমা বলে ডেকো।

ধোয়া।। বোনবিবিমা না বলতে পারো দুখে একবার ডেকোরে মা বলে। সেই সময় সোনার যাদু, আমি তোমায় নেব কোলে তুলে গো, ওরে ও তার মায়া ....।

ম : কথা।। এই কথা বলে মা আমার হলেন বিদায়, আর ধোনা মধু ভেঙে নিয়ে নৌকায় এসে উপনীত হয়। আর রায়সনাতন ধোনাকে ডেকে এই কথা কয়। ওরে ধোনা, দেখ কি তামাশা হেথায়। মধু সব ফেলে দিয়ে মোম বোঝাই করে লও। কারণ মধুর থেকে মোমের

দাম অনেক বেশি। চাব ধারের পানি তখন ছিল নোনা পানি, আর মধু ঢেলে দিতে সেথা হল মধুপানি। সেই থেকে সেই ঘাটের নাম মধুখালি হয়েছিল। এদিকে ধোনা বলে মাঝি, আর দেরী কোরো না। চল সব খানা খেয়ে নিই।

এই কথা বলে ধোনা মহল থেকে পৌঁছিল। দুখেকে বলল, কোন ডিঙাতে খানা পাকিয়ে বেখেছ বল? খানা খেয়ে সবাই অবাক হয়ে যায়। এরকম অমৃত খানা তারা কোনদিন খায় নি। খানা শেষে সবাই যে যার নৌকাতে গিয়ে বিশ্রাম নেয়।

ম : পরদিন প্রভাত হলে ধোনা বলে, মাঝি, আর দেরী কোরো না, আর মাঝি বলে কাষ্ঠনাই কিসে হবে খানা। তখন ধোনা দুখেকে ডেকে বলছে বাবা দুখে, তুমি এই বন থেকে কিছু কাঠ ভেঙে নিয়ে এস।

দো : চাচাজী, আমি পারব না। আপনার নৌকায় তো অনেক লোক আছে, তাদের বলুন না।

ম : কি! এত বড় ছেলে, কেবল নায়ে বসে খাবে, আর একটি কথা আমার শুনবে না? এই বলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দুখেকে নৌকা থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। আর দুখে মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে চাচাকে ডেকে কহিল —

গান।। তবে আমি যাইগো ও চাচা, তবে আমি যাইগো যাই
আমায় ফেলে যেয়োনা ও চাচা এসে যেন দেখা পাই
ও ভাই মাঝি পায়ে ধরি, নিও আমায় সঙ্গে করি
পায়ে ধরে যাচ্ছি বলে তোমরা আমার দেশেব ভাই।

ম : এই কথা বলে দুখে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়, বনে যেতে যেতে কেঁদে আবার সেই কথা কয়—

গান।। ও প্রাণ কাঁদেরে, ও প্রাণ কাঁদেরে, পথে যেতে আমার একলা
এই বড় বড় ঝাঁপি বন দেখে লাগে আমার ভয়
কোথায় আছ মা বোনবিবি দেখা দাও আজি আমারে।

ম : এদিকে ধোনা নৌকার কাছি খুলে দিল, আর দুখে দেখে কাঁদতে লাগল।

ধোয়া।। বেহায়া জঙ্গলে দুখে করে হায় হায়, আর খাড়ি হতে রায়সনাতন শুনিবারে পায়গো। ওরে ও তার মায়া ....।

ম : হইল বামন বেটা বাঘেরি আকার। চলিল সত্বরে তখন দুখেরে করিতে আহার। বাঘ দেখে দুখের তখন প্রাণে ভয় হয়। আর মা মা বলে দুখে সেইখানে মূর্চ্ছা হয়ে যায়। নিমেষের মধ্যে মা আমার শাজঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে দুখের কাছে এসে দুখেকে কোলে তুলে নেয়। দুখে দুখে বলে মা আমার ডাকিতে লাগিল। ডাকের সাড়া না পেয়ে মা আমার শাজঙ্গুলীকে ডেকে কহিতে লাগিল। দেখো ভাই শাজঙ্গুলী, দুখে যদি আমার কোলে মারা যায় তাহলে আমার আঠার ভাঁটির মধ্যে কলঙ্ক রয়ে যাবে।

কওসরের পানি ছিল থোড়া মুখে দেয়
দেবামাত্র দুখের তখন জ্ঞানের উদয় হয়।

আর মা আমার শাজঙ্গুলীকে ডেকে এই কথা কয় — ভাই শাজঙ্গুলী, তুমি দেখো কি দাঁড়ায়ে? ব্যাটার যেমন কর্ম তেমনি ফল দাওনা এক ঘায়ে। শাজঙ্গুলী তখন—

গান।। মারিল রায়ের মুণ্ডে বজ্রের চাপড়,
চড় খেয়ে বামন বেটা হইল ফাঁপর।
চড় খেয়ে বামন বেটা ছুটিয়া পালায়,
তাহা দেখে শাজঙ্গুলী খেদাড়িয়া যায়।
বলে কোনমতে নেড়ে বেটা না ছাড়ে আমায়,
এক ঝোপের আড়ালে গিয়া রয়।
তাহা বাদে শাজঙ্গুলী উপনীত হয়এ,
আশা মেরে মাথা ভাঙ্গে দক্ষিণরায়ে।
ভাঙা মাথা হয়ে রায় ছুটিয়া বেড়ায়,
সম্মুখে পড়িল অনন্ত দরিয়ায়।
মহিমার জোরে রায় পার হয়ে যায়,
হাঙ্গর কুমির ডেকে হুকুম দিল রায়।
তোমরা সবে ধর গিয়া জঙ্গুলীর পায়
রায়ের আদেশে কুম্ভীর ধরিল তায়।
তাহা বাদে শাজঙ্গুলী পা ঝাড়া মারে
ছিটকাইয়া পড়ে তারা ডাঙ্গার উপরে।
গাজীর বাটীতে রায় উপনীত হল।
তাহা বাদে শাজঙ্গুলী খেদাড়িয়া গেল।

ম : এদিকে রায়মণি গাজীর বাটীতে এসে উপনীত হলেন। আর গাজীমিঞা রায়কে ডেকে কহিতে লাগিলেন। রায়, তোমার এ হাল কে বানাইল?

দো : দেখ গাজি-মিঞা, ধোনামৌলে মহল করতে এসেছিল এবং দুখে বলে একটি ছেলেকে আমায় নরবলি পূজা দিয়েছিল। সেই তো হল বাদ বনবিবির তরে। সেই আমাকে এই হাল বানাল।

ম : সেইখানে শাজঙ্গুলী উপনীত হয়। আর গাজীমিঞা বৈসহ বৈসহ বলে ধরে দুটি হাত। শাজঙ্গুলী বলে, আমি না বসিব হেথা, বনবিবি ডাকিয়াছে, চল সবে সেথা। গাজীকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে আসি উপনীত হল। মা বলে, ওরে বেটা, কিবা তোর নাম। তোমার পরিচয় দিয়ে বলনা আমায়।

দো : মাগো, সাহা সেকেন্দার আমার পিতার নাম। তাহার তনয় আমি গাজীমিঞা নাম।

ম : মা, বলে গাজীমিঞা, যদি অলি আল্লা আছ বোনের মাঝারে, তবে কেন মানুষ মেরে খায় এই বনের ভিতরে। তা বাবা গাজীমিঞা, তুমি এই ভূতের সঙ্গে বাস কর?

দো : মাগো, ভূত বল যারে সে হয় তোমার ব্যাটা। আর এই বাতে তোমার রয়ে যাবে খোঁটা।

ম : মা বলে, গাজীমিঞা, রায় কিভাবে আমার ব্যাটা হল?

দো : মাগো, প্রথমে রণ আপনার কার সঙ্গে হয়েছিল বলুন দেখি?

ম : প্রথমে বনে রণ হয়েছিল সেই নারায়ণীর সঙ্গে। সেই নারায়ণী হেরে গিয়ে আমায় সই বলেছিল।

দো : মাগো, এই তো কহিলে ভালো। ঐ রায়মণি তোমার সইবেটা হল।

ম : এই কথা শুনে মা আমার লজ্জিত হলেন। আর গাজীকে ডেকে মা আমার কহিতে লাগিলেন। আগে দুখে আমার একটি ছেলে ছিল, এখন তোমরা আমার তিন ছেলে হলে। বল তোমরা আমার দুখেরে কে কি দেবে? তখন গাজীমিঞা বলছেন—

ধোয়া ।। শুন শুন জননী শুন মেহেরবানী আর আল্লাতাল্লা করেছে আমায় ধনের অধিপতি গো, ওরে ও তার মায়া.........।

দো : মাগো, আমি দুখেকে সাত জালা টাকা দেব।

অন্য দো : মাগো, যত টাকা লাগবে আমি দেব।

ম : এদিকে মা আমার দুখেকে ডেকে কহিতে লাগিলেন— বাবা দুখে, তুমি এখন বাড়ীতে যাও, কারণ তোমার মা তোমার জন্য চিন্তা করছে।

দো : না মা, আর আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমায় ছেড়ে গেলে আর আমি তোমায় পাব না।

ম : বাবা দুখে, তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি যখন আমায় ডাকবে আমি তখনি এসে তোমায় দেখা দেব।

দো : একথা সত্য হ্যাঁ মা ?

ম : হ্যাঁ বাবা, একথা সত্য। এদিকে মা আমার সেখো কুম্ভিরনীকে ডেকেছিল। সেইখানে কুম্ভিরনী উপনীত হল। আর মা আমার কুম্ভিরনীকে কহিতে লাগিলেন। দেখো সেখো কুম্ভিরনী, তুমি এখনি আমার দুখেকে পৃষ্ঠে করে নিয়ে দুখের বাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

দো : আচ্ছা মা, আমি এখনই পৌঁছে দিচ্ছি।

ম : এখন দুখে আপন বাড়ীতে এসে উপনীত হল। আর মা মা বলে ডাকিতে লাগিল। ডাকের সাড়া না পেয়ে দুখে তখন কাঁদিতে লাগিল।

গান ।। কোথায় মা, মাগো, এই বিপদ সময় কোথায় মা
এ দাসেরে ফেলে অকূলে তুমিতো মা বলেছিলে
বিপদ সময় নেবো কোলে, কোথা রহিলে লুকাইয়ে
নিষ্ঠুর পাষাণী হয়ে।

ধোয়া ।। মা মা বলে দুখে ডাকিতে লাগিল, অন্তর্যামী বোনবিবি অন্তরে জানিল গো, ওরে ও তার মায়া ....।

ম : সেইখানে মা আমার এসে দুখেকে ডেকে কহিতে লাগিল বাবা দুখে তুমি আবার আমায় ডাকলে কেন ? তোমায় তো এখুনি পাঠিয়ে দিলাম।

দো : মাগো, আমার দুখিনী মা আমার জন্য কেঁদে কেঁদে কালা কানা হয়ে গেছে, সেই জন্যই আমি তোমায় স্মরণ করেছি।

ম : বাবা দুখে, তুমি আমার নাম স্মরণ করে তোমার মার চক্ষে কর্ণে হাত বুলিয়ে দাও। দেখবে এখুনি কালা কানা সেরে যাবে। এই কথা বলে মা আমার হলেন বিদায় আর ধোনার বাড়ীতে এসে উপনীত হন। ধোনার শিহরে বসে স্বপন দেখান— ওরে ধোনা, দুখেকে বাঘের মুখে দিয়ে এসে মহাসুখে নিদ্রা যাচ্ছ, কাল প্রভাতে উঠে দুখের চারতলা বাড়ি করে দেবে এবং তোমার কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে দুখের বিয়ে দেবে। প্রতি বৎসর আমার গান হাজত দেবে। যদি এক দুই তিন কথা রদ হয়ে যায় সবংশে নিব্বংশ হবে বনবিবি কয়।

ওদিকে দুখে মায়ের চোখে মুখে হাত দিল, আর মায়ের কৃপায় দুখের মা দিব্যি জ্ঞানচক্ষু ফিরে পেল। দুখে মায়ের কাছে মাবনবিবির কৃপার কথা বলে। মাতা পুত্র মায়ের নামে সাতগ্রাম মেঙে পেতে গান হাজত দেয়। এরপর মাঙনের গান ও অষ্টমঙ্গলা গেয়ে পালাগানের আসর শেষ হয়। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

বনবিবির পালাগানের পরিবেশন পদ্ধতি প্রায় অন্যান্য লোকায়ত পালাগানেরই মত। মূলগায়ক একজন থাকেন, তিনি পুরুষ হলে কখনও মহিলা সাজেন কখনোওবা ধুতি পাঞ্জাবী পরে হাতে চামর নিয়ে গান করেন। চার-পাঁচজন দোহার থাকেন। তাঁদের হাতে থাকে করতাল, বাঁশী, কাড়া-নাকাড়া, হারমোনিয়াম, ঝাঁঝ ইত্যাদি। আসরও অতি সাধারণ। দর্শকদের জন্য নায়েকবাবুর সঙ্গতি থাকলে চট পেতে দেন নতুবা নারকেল পাতা কেটে বিছিয়ে দেওয়া হয়। মাথার উপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই থাকে না।

বনবিবির পালা পরিবেশনের সাথে কিছু আচার আচরণ পালিত হয়। যেমন মূল গায়ক গান শুরুর আগে সুসজ্জিত হয়ে বনবিবির থানে একটি 'মোকাম' বসান। বনবিবির গানের ক্ষেত্রে মোকাম কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি ব্যবহার না করে আঙচ কলাপাতা (কচি কলাপাতা) ব্যবহৃত হয়। মোকামটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগে থাকে একটি পান, একটি সুপারি, একটি মোমবাতি, একটি ধূপ, একটি মুদ্রা, একটি কলা ও পুরো মোকামটির উপর নতুন একটি গামছা। মাঝের ভাগটি নায়েকবাবুর হাতে গানের শেষে তুলে দেওয়া হয়, বাকি চারটি ভাগ গানী নিয়ে যান। মোকাম যেখানে বসানো হয় সেখানে একটি আশাবাড়িও বসানো হয়। গর্ত খুলে একটি মুদ্রা গর্তে দিয়ে আশাবাড়িটি বসায়। আর থাকে একটি পূর্ণ-পাত্র। যখন মূলগায়ক এই কাজগুলি করেন তখন দলের অন্য দোহারগণ আসরে বসে বনবিবির বন্দনা গাইতে থাকেন। মোকাম বসানো শেষ হলে গায়ক আসরে এসে পাঁচাল-গানের রীতি অনুযায়ী উপস্থিত দোহার, যন্ত্রপাতি, দর্শক প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানান। এই পরিস্থিতিতে গায়কের শ্রদ্ধাবনত ভাবটি ফুটে ওঠে। তারপর মূলগায়ক বন্দনা শুরু করেন। বন্দনার মধ্যে থাকে গুরুবন্দনা, আসর বন্দনা, মায়ের বন্দনা ইত্যাদি। তারপর শুরু করেন মূলকাহিনী। মূলকাহিনী শেষ হবার পর উল্লিখিত মাঙনের গান ও সব শেষে অষ্ট-মঙ্গলা গাওয়া হয়। অষ্টমঙ্গলার আগে মূলগায়ক মোকামের কাছে গিয়ে মোকামে চামর

ব্যজন করে ও হাজতের জন্য যে-বাতাসা থাকে তা লুট দেন। লুটের সময় মূলগায়ক চেঁচিয়ে বলেন মা বনবিবির নামে একবার 'আমিন আমিন বল'। সাথে সাথে চলে বাতাসা ছড়ানো কাজ। উপস্থিত সবাই একটি বাতাসা কুড়োনোর জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করেন তাতে খাদ্য পীড়িত দুর্ভিক্ষের চিত্রটি মনে করিয়ে দেয়। তারপর মোকাম তুলে এসে মূলগায়ক অষ্টমঙ্গলা শুরু করেন। অষ্টমঙ্গলা গাওয়ার সময় দোহারগণ একটি স্থায়ী ধরে রাখেন আর মূলগায়ক মনগড়া বা উপস্থিত বুদ্ধিমত কথা যোগ করে যান। যেমন 'কত মহিমা মা তোমার, তব মায়া বোঝা ভার' এই স্থায়ী ধরে থাকেন আর মূলগায়ক বলেন—

কোথা আছ জননী দেহ পদতরণী
অজ্ঞানন্ত মূঢ়মতি না চিনি তোমায়
তব কৃপা গুণে রাখ চরণে
চরণতরী ভর করে হব পারাপার।
কত মহিমা মা তোমার ... .।

বাংলার ইতিহাসের অনেক উপাদান লোকসমাজের মৌখিক ধারায় লাভ করা যায়। সুন্দরবন তথা চব্বিশ পরগণার ইতিহাস ও ভূগোলের বহুবিধ তথ্য লোকমুখে প্রচলিত আছে। সে কারণে বাঙালীর ইতিহাস ও এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা, এই দুইয়ের জন্য কিছুটা নির্ভর করতে হয় লোকমুখে প্রচারিত বা প্রচলিত গল্প কাহিনীর উপর। তার মধ্যে বোনবিবি জহুরানামা একটি। এই পুঁথির মধ্যে ভাটির দেশের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বেশ কিছু স্থানের নামোল্লেখ আছে। তার কোনটির বর্তমানে নাম পরিবর্তন হয়েছে, কোনটির হয়নি, এই থেকে মোটামুটি আঠার ভাটির একটি ভৌগোলিক সীমারেখা ভাবা যায়। যদিও এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে প্রায় একশত বৎসর আগে। অনুমান করা যায় বনবিবির কাহিনীটি আগে লোকমুখে কিংবদন্তী রূপে প্রচলিত ছিল, মোহাম্মদ মুনশী তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে কাহিনীর মধ্যে কল্পনা থাকলেও কিছু ভৌগোলিক সত্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যেমন কাহিনী অংশে আছে—বনবিবি মক্কা থেকে হিন্দুস্থানে ভাটির দেশে এসেছেন। এখানে বাদাবন সৃষ্টি করে বসেছেন, তার বর্ণনায় কবি বলেছেন—

একে একে ভাটীশ্বরী ভ্রমণ করিয়া।
ভুরকুণ্ডে মোকামে বিবি পৌছেন যাইয়া।।
বসিল যাইয়া এক দরক্তের তলে।
দেখিয়া বাদার সৃষ্টি খুশি হইল দেলে।।
দক্ষিণেতে এড়ো জোল সরহদ্দ করিয়া।
ভবানীপুরেতে বিবি পৌছেন যাইয়া।।
বেতাখাল পার হইয়া রাজপুরে গেল।
তারপরে বিয়াড়িতে (বেড়াল?) যাইয়া পৌছিল।।

সেথা হইতে গিয়া ফের মাখালগাছায়।
করিয়া বাদার সৃষ্টি আসরিতে যায়।।
ময়নাডাঙ্গা সে আমলানি(?) সৃষ্টি সে করিয়া।
হাসনাবাদের বিচে পৌছিল যাইয়া।।
তাবাদে পাঠালি গ্রাম কাটাখালি হদ্দ।
ছাটিবাদা বসাইয়া করিয়া সরহদ্দ।।
কেঁদোখালি দিল বিবি দক্ষিণারায়েরে।
নাহি যায় সেখানে দখল করিবারে।।
এইরূপে বনের প্রধান যত ছিল।
বাঁটারা করিয়া বিবি সবাকারে দিল।।

উদ্ধৃত নামগুলিব মাধ্যমে কাল্পনিক রেখা টানা সম্ভব না হলেও অখণ্ড চব্বিশ পরগণার কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়। এটাকেই এক সময় ভাটির দেশ বলা হত, যা বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের লেখা থেকে জানা যায়। বনবিবির পালাগানের মধ্যে আরও কিছু নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে ভাটির দেশ বা বাদাবনের ভৌগোলিক সীমারেখা কল্পনা করার পক্ষে সহায়ক। বাদাবনে যাবার যে নদীপথ আছে যেখান দিয়ে ধোনামৌলে তার সপ্তডিঙ্গা নিয়ে মহল করতে গিয়েছে তা হল—

দাঁড়ি মাঝি হেথা সব ডিঙ্গা বেয়ে যায়।
কতদুরে যাইতে বরুণহাটি পায়।।
তাবাদে সন্তোষপুর এড়াইয়া চলে।
ধুলিতে যাইয়া পৌছে নিমাশাম কালে।।
রাতকালে রহে ডিঙ্গা বান্ধিয়া সেখানে।
রন্ধন ভোজন করে খোলাসিত মনে।।
সেখান হতে খুলয়া ডিঙ্গা বয়ে চলে যায়।
কানাইকাঠির গঙ্গা রহিল যে বাঁয়।।
রায়মঙ্গল বায়নাতলা এড়াইয়া যায়।
হেড়োভাঙ্গা কলতলি (কুলতলী ?) যাইয়া পৌছায়।।
তারপর সেথা হইতে পার গাঙ্গে গিয়া।
ডাইনেতে বাদাবন দেখে তাকাইয়া।।

** ** **

তারপর সেথা হইতে গড়খালি, (হাতিয়াগড় ? ঝড়খালি ?) গিয়া।
কহে বাত দাঁড়ি মাঝি সবার লাগিয়া।।
দুখেরে কহিল তুমি বসে থাক নায়।
খবরদার নৌকা হইতে না যাবে কোথায়।।

ইহা বলে যায় সবে বনের ভিতরে।
খাড়ি হইতে দক্ষিণারায় পায় দেখিবারে।।
কহে ধোনা দাঁড়ি মাঝি সবার লাগিয়া।
সেতাবি খোলহ ডিঙ্গা কেঁদোখালি লইয়া।।

'বোনবিবি জহুরানামা'য় চব্বিশ পরগণার ইতিহাসের যেকথাই থাকনা কেন, এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান (বিশেষ করে ভাটির দেশ) সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা উদ্ধৃত অংশ থেকে লাভ করা যায়।

বনবিবির পালাগানে ভাটির দেশ তথা চব্বিশ পরগণার বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসমাজের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বনবিবির পালাটি সৃষ্টি হয়েছে ভাটির দেশকে কেন্দ্র করে। পালাটির লিখিতরূপ প্রায় একশত বৎসরের পুরানো। কাহিনীটিতে তৎকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অতীত চব্বিশ পরগণার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিলে দেখা যাবে এই অঞ্চলটি পৌণ্ডক্ষত্রিয় প্রধান অঞ্চল। তারপর আছে কাওরা, বাগদী, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়। এই কয় শ্রেণীর মানুষ খুব দুর্ধর্ষ ও বীর প্রকৃতির। বিশেষ করে কাওরা, বাগদী ও ডোম সম্প্রদায় এঁরা খুবই যুদ্ধপ্রিয়। ক্ষেত্রগবেষণায় জানা গেছে বাগদীসম্প্রদায় চাষবাস করতে পছন্দ করতেন না। কিছুকাল-পূর্ব পর্যন্তও এঁরা ছিলেন জমিদারের লেঠেল। জমিদার ভূমি দিতে চাইলে তা তাঁরা গ্রহণ করতেন না। চাষ-আবাদের ভয়ে বরং পালিয়ে যেতেন। এঁরা পেশায় মৎস্যজীবী। শূকর পালনের ব্যবসাও করেন। নদীপ্রধান এই অঞ্চলের নদীতীরেই গড়ে উঠেছিল এঁদের বাসভূমি। ডোম সম্প্রদায়ের কথা তো লোকছড়ায় স্থান পেয়েছে। যেমন—

আগে ডোম বাগে ডোম ঘোড়া ডোম সাজে
ঢোল মৃদঙ্গ ঝাঁঝর বাজে।

এই লোকছড়াটি রাজা প্রতাপাদিত্যের সৈন্যসজ্জার ইঙ্গিতবাহী বলে অনেকে মনে করেন। প্রতাপাদিত্য সৈন্যসজ্জা করে যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তাঁর সৈন্যদের আগে থাকে ডোম সৈন্য, বাগে অর্থাৎ পাশেও ডোম সৈন্য আর থাকে অশ্বারোহী ডোম সৈন্য। সুতরাং অতীতে যুদ্ধপ্রিয় ডোম সম্প্রদায়ের বাস ছিল এই চব্বিশ পরগণায়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ও ছিল দুর্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় জাতি। কাওরা, বাগদী, ডোম, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় নিয়ে এত কথা ধান ভাঙতে শিবের গীত নয়। বনবিবির পালায় এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ঈঙ্গিত আছে এবং তাঁদের যুদ্ধপ্রিয়তার কথা আছে। পুরুষরা কেবল যুদ্ধ করতেন তা নয়, মহিলারাও যুদ্ধ করতেন। নারায়ণী ও বনবিবির যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে এই সত্যের ইঙ্গিত আছে। নারায়ণীর সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন একলাখ ছাপান্ন হাজার পুরুষ সৈন্য, যাঁরা বাহিনীতে ছিলেন তাঁরা শ্মশানভূতের মত কাল চেহারা যুক্ত, ডাকিনী ছিলেন ছত্রিশ কোটি অর্থাৎ এঁরা মহিলা সৈন্য।

শ্মশান সমান ভূত সাজে যেন কাল দূত
একলাখ ছাপ্পান্ন হাজার।

ডাকিনী ছত্রিশ কোটি জুড়িয়া আঠার ভাটি
সেজে আইল বলে মার মার।।

সৈন্যদের সাথে নিয়ে মাতা নারায়ণীর যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এমন বীরাঙ্গনা নারীর পরিচয় এর আগে আমরা পাইনি। উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলার মধ্যে এমন বীরাঙ্গনার রূপ দেখাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ তা দেখান নি। বনবিবি নারায়ণীর যুদ্ধ বর্ণনা খুবই লোমহর্ষক। বনবিবি ও শাজঙ্গুলীর বিক্রমে যখন নারায়ণীর সমস্ত সৈন্যসজ্জা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, তখন নারায়ণী সাময়িক ভয় পেলেও রণে ভঙ্গ দেননি। নিজেই নিজের ক্ষমতা-বলে বনবিবির সাথে লড়াই করেছেন। অপর দিকে বনবিবিও দেবীর কাছে প্রায় পরাজিত হয়ে দৈবশক্তির শরণাপন্ন হলেন—

সারাদিন জঙ্গ করে কেহ কারে নাহি পারে
বোনবিবি বিপাক দেখিয়া।
মা বরকত বলে ডাকে উদ্ধারিয়া লেহ মোকে
নারায়ণী ডালিল মারিয়া।।
বেহেস্তে বরকত ছিল খোদার হুকুম হইল
বোনবিবি পড়িয়াছে দায়।
কুওতের দোওয়া লিয়া লেহ তারে উদ্ধারিয়া
যেন সেই মারা নাহি যায়।।

দৈবশক্তি নিয়ে বনবিবি নারায়ণীর সাথে যুদ্ধ করে নারায়ণীকে পরাস্ত করেন এবং নারায়ণীও বিবির বশ্যতা স্বীকার করেন।

আঠার ভাটির বিচে অধিকার যে যে আছে
সব শুদ্ধা হৈল তাবেদার।।
আজ হইতে তুমি রাজা আমরা তোমার প্রজা
তুমি কর্তা হইলে আমাদের
তোমার দোহাই দিব তাবেদার হয়ে রব
হরবাতে খেদমতে হাজের।।

এইমত নারায়ণীর সাথে বনবিবির যুদ্ধচুক্তি বাঙলা মুলুকে মুসলিম-বিজয়কে ইঙ্গিত করে। মুসলিম অভিযান ব্যর্থ করতে বাংলার মেয়েরাও সচেষ্ট ছিলেন। বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস থাকলে বনবিবি ও নারায়ণীর সংঘাত ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা তা প্রমাণ হত।

নারায়ণীর সৈন্যবাহিনীতে শ্মশানভূতের মত চেহারা যুক্ত সৈন্যসামন্ত এই অঞ্চলের কাওরা, বাগদী, ডোম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই মনে হয়। এঁদের জীবিকার কথাও বনবিবির গানে আছে। দক্ষিণরায় ভাটির অঞ্চলে মোম, মধু, খড়ি, জুড়ি প্রভৃতির হাট বসিয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। একসময় এখানকার মানুষের জীবিকা এইগুলিই ছিল, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর পর্যন্ত ক্ষীণ হলেও এই অঞ্চলে নুনশিল্প জীবিত ছিল।

বনবিবির পালায় ধোনাই মোনাই-এর ভাতৃপ্রেম, তাঁদের আর্থিক অবস্থার যে বর্ণনা আছে তা থেকে তখনকার দিনের পারিবারিক ছবিটিও ফুটে ওঠে। দুখের ও তাঁর জননীর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র পরিবারের চিত্রটি স্পষ্ট হয়।

পরিশেষে বলা যায় বনবিবির পালাগান বাংলা পালাগান-সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। এই একটি পালার মধ্য দিয়েই আমরা তৎকালীন বাঙালীর বিশেষ করে বাংলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের জীবনজীবিকা, ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির পরিচয় পাই। বনবিবি-নারায়ণী-দক্ষিণরায় এঁরা কতখানি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে হলে ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির যৌথ গবেষণা আবশ্যক। বনবিবির পালাগানে বনবিবি, নারায়ণী, দক্ষিণরায় প্রমুখ চরিত্র প্রতীকী বা 'সিম্বলিক' বলেই মনে হয়। প্রতীকাত্মক বা ঐতিহাসিক যাই হোক না কেন বনবিবির পালা চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে তথা প্রাচীন আঠারভাটির এক বহুল প্রচলিত লৌকিক পালাগান, যা লোকায়ত রীতি-পদ্ধতিতে লোকসমাজে পরিবেশিত হয়।

পাদটীকা

১। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী অভিমুখ, পৃঃ ৩, বিশ্ব সভ্যতার পাদপ্রদীপে সুন্দরবনের বিবিমা।

২। গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা, শারদীয় বনবিবি সংখ্যা ১৯৯৬, সুন্দরবনের প্রত্নানিদর্শন ঃ বনবিবি।

৩। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, বনবিবি (প্রবন্ধ)।

৪। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় (সাক্ষাতকার ভিত্তিক তথ্য)।

বিবিপালা ঃ ওলাবিবি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানগুলির মধ্যে জনপ্রিয় লোকায়ত পালাগান হল ওলাবিবির পালা। পালাগান আলোচনায় এটি বিবিপালার অন্তর্গত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী পালাগানগুলির মধ্যে ওলাবিবির পালা অন্যতম। ওলাওঠা রোগের দেবী হিসাবে ওলাবিবি পরিচিতি লাভ করেছেন। ওলাওঠা রোগের তীব্র যন্ত্রণা থেকে মানুষকে আরাম দেন বা আসান করেন বলে ইনি আসানবিবি নামেও পরিচিতা।

চব্বিশ পরগণায় একাধিক বিবির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিবিদিগের সংখ্যা সাত, নয় বা একুশ। সাতবিবির যে নামের তালিকা পাওয়া যায় সেগুলি সবই রোগের নামকরণে নাম। যথা—ওলা, ঝোলা, টান, টংকার, বাত, বাতবল ও ঝেটুনে। এই নামের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কেউ বলেন ওলাবিবিরা সাতবোন। যথা—ওলা, ঝোলা, ডা, ডংকার, আজগৈ বা আজগোবি, আসান ও ঝেটুনে বিবি। আবার কেউ বলেন সাতবোন হল বনবিবি, ওলা, ঝোলা, চাঁদ, জারিনা, আজগৈ ও মড়ি বিবি। বিশিষ্ট পালাগায়ক আব্দুল জব্বার গায়েনের নিকট হতে সাতবিবির নামের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা হল— ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, দরবারবিবি, আসানবিবি, মড়িবিবি, ঝড়িবিবি ও দুধবিবি। এঁদের বাবার নাম কলমদার। নিজেদের নামের জাহিরের জন্য তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করেন। সুতরাং সাতবিবির নির্দিষ্ট কোন নাম না থাকায় প্রতীতি জন্মে যে, এঁরা সবাই কাল্পনিক লৌকিক বিবি বা দেবী।

'ওলাবিবি' নামটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। ওলা ও বিবি এই দুই শব্দের সমন্বয়ে ওলাবিবি নামে এক কাল্পনিক দেবী পরিকল্পিত হয়েছে। 'ওলা' শব্দের অর্থ হল নামা। ওলাওঠা রোগের ক্ষেত্রে ওলা শব্দটি ভেদ বা পায়খানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওঠা শব্দটি বমি অর্থে প্রযোজ্য। ডাক্তারী পরিভাষায় ওলাওঠা রোগটি বিসূচিকা বা কলেরারোগ নামে পরিচিত, যে রোগের প্রধান লক্ষণ অস্বাভাবিক পায়খানা ও বমি। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে

ওলাওঠা শব্দটি গালি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। 'বিবি' শব্দের অর্থ হল মহিলা বা মান্যা স্ত্রীলোক। এছাড়া বধূ, পত্নী, মুসলমান স্ত্রী ও য়ুরোপীয় রমণীকে বিবি বলা হয়। এটি ফার্সী শব্দ। সুতরাং ওলাবিবি হলেন ওলা নামক এক মান্যা স্ত্রীলোক। প্রকৃতপক্ষে ওলাবিবি হলেন মাতৃ স্বরূপা। তিনি ওলাওঠা নামে রোগের করাল গ্রাস থেকে আর্ত মানুষকে রক্ষা করেন। তিনি রুষ্ট হলে ওলাওঠা রোগে গ্রাম নগর শ্মশান হয়ে যায় এবং তিনি ভক্তের দ্বারা তুষ্ট হলে রোগশোক থেকে মুক্তি দেন ও পারিবারিক সামাজিক সুখ সমৃদ্ধি দান করেন।

ওলাবিবিকে সপ্তমাতৃকার একজন বলে মনে করা হয়।[১] 'সপ্তমাতৃকার' ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিচিতি আছে। পুরাণাদিতে সপ্তমাতৃকা বলতে—গর্ভধারিণী, ধাত্রী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, পৃথিবী ও গাভীকে বোঝান হয়েছে। আরও ব্যাপক অর্থে এই মাতৃকা কোথাও ষোলজন। যথা জননী, স্তন্যদাত্রী গুরুপত্নী, আচার্যপত্নী, পিতৃরমণী, ক্ষেত্রদাত্রী, শ্বশ্রূ পিতামহী, মাতামহী, মাতুলানী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, জ্যেষ্ঠ সহোদরা, ভ্রাতৃজায়া, পুত্রবধূ ও তনয়া। সুতরাং পুরাণাদিতে বর্ণিত মাতৃপরিচয় থেকে পালাগানে বর্ণিত বিবিমা- দিগের সহজেই পৃথক করা যায়। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই মানুষের রোগশোকের আসানকর্ত্রী। এঁদের কৃপায় মানুষ যেমন ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি লাভ করেন তেমনি দেবী রুষ্ট হলে ধনে-প্রাণে মারা পড়েন। এঁরা রোগশোক জর্জরিত নিরুপায় আর্ত মানুষের কল্পিত দেবী।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সপ্তমাতৃকার প্রভাব অপরিসীম বলে জানা যায়। এঁরা সাতবহিনী বা সাতভগিনী নামে পরিচিতা। এঁদের নাম শীতলা, বাসুলী, মনসা, চণ্ডী, রংকিনী, শংখিনী, চমকিনী। চব্বিশ পরগণায় রংকিনী, শংখিনী ও চমকিনীর পূজা না হলেও বাকী চার দেবীর ব্যাপক পূজাচার হয়। এঁদের মধ্যে দেবী চণ্ডী, ওলাইচণ্ডী নামেও পূজা পান। মুসলমান বিজয়ের পর সম্ভবত ওলাইচণ্ডী ওলাবিবি রূপে পূজিতা।[২] এখনও ওলাই চণ্ডীর নামে কোন কোন ক্ষেত্রে পূজাচার হয়। ওলাইচণ্ডী এবং ওলাবিবি এক ও অভিন্ন বলে এই অঞ্চলের লোকসমাজের ধারণা। ওলাবিবির উৎপত্তি সম্পর্কে চব্বিশ পরগণায় একটি লোককাহিনী আছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

ওলাবিবি হলেন চন্দনেশ্বর রাজার কন্যা বিমলা। চন্দনেশ্বর রাজা ছিলেন মুসলমান বিদ্বেষী। তিনি সত্যনারায়ণের সেবক। ধর্মের গোঁড়ামী থাকায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন সত্যনারায়ণ ছাড়া তাঁর রাজ্যে অন্য কোন দেবতার পূজা করা চলবে না। এই কথা ঘোষণা করায় মুসলমানরা তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। তখন সত্যনারায়ণ রাজার এই ভুল ভাঙানোর জন্য নিজেই আপন বিগ্রহের মধ্য থেকে মুসলমান রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন ও নিজেকে সত্যপীর বলে পরিচয় দেন। তখন রাজা সত্য নারায়ণকে সত্যপীর বলে স্বীকার করেন ও আপন কন্যা বিমলাকে সত্যপীরের হাতে অর্পণ করেন। সেই থেকে বিমলা ওলাবিবি নামে পরিচিতা হন। লোককথার এই কাহিনীতে লৌকিক হিন্দুদেবী কিভাবে মুসলিম-বিবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ওলাবিবির বহু থান ও ব্যাপক গান-পূজা-হাজতের প্রচলন আছে। কাকদ্বীপ, জয়নগর, নামখানা, ধোপাগাছি, বারুইপুর, করঞ্জলি, ঘটকপুকুর, বেগমপুর, শীতলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের বহু স্থানে ওলাবিবির থান প্রত্যক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলের আশপাশের জেলাগুলিতেও দেবীর বহু থান প্রত্যক্ষ করা যায়। হাওড়া, হুগলী, কলকাতা, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাতেও ওলাবিবির বহু পরিচিত থান আছে বলে জানা যায়। যেমন মধ্য কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটের দুই পার্শ্বস্থিত দুটি মন্দিরে ওলাবিবির মূর্তি আছে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্ট্রীটের শীতলা মন্দিরে ও বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনের বাঁকারায় বা ধর্মঠাকুরের মন্দিরে ওলাবিবির মূর্তি আছে। বেলগাছিয়ায় ওলাবিবি বা ওলাই চণ্ডী বিশেষ খ্যাত। টালিগঞ্জের বাবুরাম ঘোষ স্ট্রীটের ওলাবিবি বিখ্যাত। হাওড়া শহরে কাসুন্দিয়া ওলাবিবি, বীরভূম জেলার বোলপুর শ্রীনিকেতন মধ্যস্থ প্রাচীন নীলকুঠির নিকট, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা রাজকোট দুর্গের ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিখ্যাত।

ওলাবিবির থান চব্বিশ পরগণার বহু স্থানে থাকলেও, সব থানে দেবীর মূর্তিপূজার প্রচলন নেই। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায় বিবিমার মূর্তি পূর্বে কম ছিল, কিন্তু বর্তমানে বেশ দেখা যায়। দেবীর পাকা থানও খুবই কম। সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে দেবীর থান প্রত্যক্ষ করা যায়। কোথাও দেবীর মাটির বা ইটের দেওয়াল ও খড় বা টালির ছাউনিযুক্ত থান আছে। এইরূপ থানে কোথাও দেবীর মৃন্ময় মূর্তি আছে, কোথাও মাটির বেদী বা ইটের বেদীর উপর মাঝারি অর্ধবল উপুড় করা আকৃতির একটি, তিনটি, পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি 'স্তম্ভক' আছে। যে ক্ষেত্রে দেবীর মূর্তি আছে সেখানে মূর্তির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। দুইবোন পাশাপাশি দণ্ডায়মান থাকেন। এঁরা হলেন ওলাবিবি ও ঝোলাবিবি। দেবীর গায়ের রং হরিদ্রা, পরনে শাড়ি, মাথায় শাড়ির ঘোমটা, পায়ে জুতা, কোথাও মাথায় তাজ থাকে। দেবী কোথাও লক্ষ্মী-সরস্বতী মূর্তির ন্যায় সুসজ্জিতা ও সুশ্রী, কোথাও খানদানী মুসলিম কন্যার পোশাকে সুসজ্জিতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূর্তি, দেড় থেকে দুই ফুটের মধ্যে হয়। দেবীর কোন বাহন নেই। কোথাও দেবীর কোলে শিশুসন্তান আছে। ওলাবিবির দুই হাত, দক্ষিণ হাতে বরাভয় মুদ্রা, বাম হাতে কিছু প্রার্থনা করার ভঙ্গি। হিন্দুর বাড়িতে দেবীর মূর্তি থাকে, মুসলমানের বাড়িতে থাকে না। পূর্বে মুসলমান শ্রোতা বেশি ছিল, বর্তমানে হিন্দু শ্রোতা বেশি বলে লোকশিল্পীর নিকট হতে জানা যায়। দেবীর পূজানুষ্ঠান করেন কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও মীর সাহেব। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মানুষ পরম ভক্তিভরে দেবীর পূজা করেন। দেবীর পূজার নৈবেদ্যর ডালায় ফলমূল অপেক্ষা গুড় বা চিনিরবাতাসা ও চিনির সন্দেশ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেখানে ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠান করেন সেক্ষেত্রে ফুল গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়। যেখানে মীর সাহেব পূজানুষ্ঠান করেন সেখানে বিবিমার পূজায় ফুল ব্যবহৃত হলেও গঙ্গাজল সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। এক্ষেত্রে বিবিমার পূজাকে বিবিমার হাজত বলা হয়। দেবীর হাজতের বাতাসা পরম ভক্তিতে আবালবৃদ্ধবনিতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ওলাবিবির পূজা প্রতিমাসের শুক্লপক্ষে যেকোন দিন হয়। সাধারণত মাঘ মাসের

আশ্বিন দিন থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে দেবীর পূজা হয়। পূজা সাধারণত গ্রামভিত্তিক হয়ে থাকে। কলেরা যখন মহামারী রূপে দেখা দেয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীগণ চন্দ্রপক্ষে ছাগ ইত্যাদি বলি দিয়ে দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করেন। পূজার দিন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মহিলাগণ বিশেষত ব্রতিনীগণ গলায় কুটো বেঁধে, অনাহারে সাতগ্রাম মেঙে-পেতে চালপয়সা ইত্যাদি যা সংগৃহীত হয় তা বিক্রয় করে মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, পাটালি, মোয়া প্রভৃতি কিনে ধামায় করে দেবীর সামনে হাজতের জন্য বসিয়ে দেন। হাজত শেষে ব্রতিনীগণ ঐ হাজতের খাবার খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। অনেক ক্ষেত্রে মহিলাগণ পূজার সাতদিন আগে থেকে জাগরণ করেন। গল্পগুজব, নাচ-গান ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরা নিশি যাপন করেন ও নিরামিষ আহার করেন। যাঁরা মানত করেন তাঁরা বিভিন্ন কৃচ্ছ্রসাধন করেন। পূজার দিন গান হাজত যতক্ষণ না শেষ হয়, মানত অনুযায়ী কেউ দুটি হাত গামছা দিয়ে বেঁধে রাখেন। গান শেষে দেবীকে নমস্কার করে বন্ধন মোচন করেন। সাধারণী বা বাৎসরিক পূজার সময় বিবিমার থানে দেবীর বহু ছলন মানতকারীগণ আনেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায়। ধপধপির পুরানো হাটখোলায়, ধোপাগাছির সাতবিবিমা তলায় কমপক্ষে আড়াইশত ছলন আসে ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায়।

চব্বিশ পরগণায় ওলাবিবির ব্যাপক পূজাচার বা পালাগানের বহুল প্রচলন হওয়ার একাধিক কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হল এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ। অতীতে এই অঞ্চল ছিল জলাজঙ্গল অধ্যুষিত। পানীয় জলের ছিল নিতান্ত অভাব। এখন থেকে (১৯৯৫) কয়েক দশক আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলের মানুষ ব্যাপকহারে পুকুরের দূষিত জল পান করতেন। ফলে জলবাহিত রোগ কলেরা মহামারী রূপে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে ফেলত। আরও অতীতে ছিল সামাজিক অবক্ষয়। মগ, ফিরিঙ্গী প্রভৃতি বিভিন্ন দস্যুদের অত্যাচারে এই অঞ্চলের মানুষের সমাজজীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। এশিয়ার প্রবেশদ্বার এই অঞ্চল ছিল বিদেশী স্বার্থান্বেষীদের অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র। ফলে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের চরম শিকার হয়ে মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বিশেষত রোগের ক্ষেত্রে উন্নত কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। কলেরা রোগ মহামারী রূপে দেখা দিলে মানুষ হয় গ্রাম ছেড়ে চলে যেতেন নতুবা নিরুপায় হয়ে এই রোগের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে ওলাবিবিকে এই রোগের দেবী রূপে কল্পনা করে পূজা করতেন। হিন্দু অধ্যুষিত এই অঞ্চলে প্রথমে ওলাওঠা রোগের দেবী ওলাইচণ্ডী নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, এরপরে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের যুগে তিনি ওলাবিবি রূপে পরিচিতা হয়েছেন। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে বিশেষত বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রায় প্রতিটি গ্রামে একাধিক বিবিমার থান গড়ে ওঠার পিছনে উপর্য্যুক্ত কারণগুলি বিশেষ ক্রিয়াশীল বলে ক্ষেত্রগবেষণায় অনুমিত হয়।

ওলাবিবির পালা চব্বিশ পরগণার নিজস্ব সম্পদ। চব্বিশ পরগণার বাইরের

জেলাগুলিতে ওলাবিবির থান বা মন্দির থাকলেও পালাগায়ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অঞ্চলেরই মানুষ। আবার এই অঞ্চলের পালাগায়কগণই অন্যান্য জেলাতে শিষ্য করে ওলাবিবির গানের প্রচার করে চলেছেন বলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায়। চব্বিশ পরগণার অনেক পালাগায়কের নিকট হতে ওলাবিবির পালার সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্ষেত্রগবেষণায় ওলাবিবির কেবল তিনখানি পালার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, যা নিম্নরূপ—
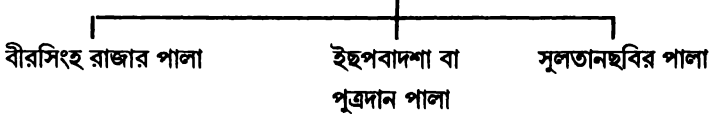
বীরসিংহ রাজার পালা ও ইছপবাদশা বা পুত্রদান পালাটি গান করেন সোনারপুর থানার অন্তর্গত কুসুম্বা গ্রামের আবদুল জব্বার গায়েন। সুলতানছবির পালাটি গান করেন বারুইপুর থানার অন্তর্গত সীতাকুণ্ডু গ্রামের নিতাই ছাটুইয়ের পুত্র প্রবোধ ছাটুই ও বেগমপুর গ্রামের সুদিন মণ্ডল প্রমুখ লোকশিল্পীগণ। আবদুল জব্বার গায়েন দাবী করেন বীরসিংহ রাজার কাহিনীটি তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন একজনের সৃষ্টি। পালাটি অন্য কোন গায়কের নিকট পাওয়া যাবে না। এই পালার জন্য তাঁর খ্যাতি বেশি। সুলতানছবির পালাটি সম্পর্কে প্রবোধ ছাটুই ও সুদিন মণ্ডল জানান , এটি সীতাকুণ্ডু গ্রামের কলমুদ্দিন গায়েনের সৃষ্টি। কলমুদ্দিন নিকট হতে চটারপাড়ের ইয়ারআলি ফকির পেয়েছিলেন, তাঁর থেকে নিতাই ছাটুই ও নিতাই ছাটুই থেকে প্রবোধ ছাটুই, সুদিন মণ্ডল প্রমুখ এই এলাকার পালাগায়কগণ পেয়েছেন। উল্লিখিত পালা তিনটির প্রতিটি, আসরে গাইতে ৩-৪ ঘণ্টা সময় লাগে বলে শিল্পীগণ জানান। মুসলমান গায়েন পালাটি আসরে গান করার সময় প্রথমে একটি আশাদণ্ড পুঁতে মোকাম পেতে নেন। তারপর হাতে চামর নিয়ে লুঙ্গি পরে ও লম্বা মুসলমানি জামা গায়ে দিয়ে পালাটি গান করেন। সুদিন মণ্ডল, প্রবোধ ছাটুই প্রমুখ হিন্দু শিল্পীগণও ঐ একই পদ্ধতিতে মোকাম পেতে গান করেন। তবে হিন্দু গায়কগণ গান করার সময় হাতে চামর রাখেন কিন্তু লুঙ্গি পরেন না। সুলতানছবির পালাটি প্রবোধ ছাটুই গান করেন ওলাবিবির দোহাই দিয়ে। ঐ একই পালা (যার মূল ঘটনা এক) সুদিন মণ্ডল গান করেন আসানবিবির দোহাই দিয়ে। সুতরাং উপর্য্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় ওলাবিবির পূজা বহু প্রাচীন হলেও এই বিবির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগানের পরিবেশন হয় বিভিন্ন নামে। অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবল আবদুল জব্বার গায়েনের গাওয়া ওলাবিবির পালার বীরসিংহ রাজার কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হল। কহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

ওলাবিবির পালা (বীরসিংহ রাজার কাহিনী)

এলাহি আলমিন আল্লা বন্দিলাম খোদা তালায় যার জাহির দুনিয়ার গোসায়। বন্দিলাম ফতেমার কদম যার নাম না শুনিলে হয় মন উচাটন কলমদার বাদশার কন্যা মা বিবিমা।

ভিখারি বাঙালির বেশে যিনি নিজের জাহির করেছিল। সাতদিন অরুণ নগরে ভ্রমণ করে মা আমার বীরসিংহ রাজবাড়ির দ্বারে উপনীত হল, যে রাজা মাকে প্রত্যাখ্যান করল, সেই মা রাজার রাজ্যের ব্যাধিমুক্তি করল। সেই কৃপাময়ী মা এই আসরে এস, তোমায় ডাকি বারে বারে। তব চরণ পাবার আশে আমার এই মনস্কাম। কে বুঝিতে পারে মাগো তব মহিমা অপাব। তব গুণ ব্যাখ্যা দিতে হেন সাধ্য আছে কার। তুমি যে দয়াল অত্যন্ত কে বা বোঝে তোমার অন্ত মায়াতে আছ চূড়ান্ত, তোমার অন্ত পাওয়া ভার। তুমি যার আছ ঘটে পায়না দুঃখ কোন মতে। ত্বরাও যে বিপদ সঙ্কটে তোমার অন্ত পাওয়া ভার।

ওলাবিবি ঝোলাবিবি জীর্ণ মলিন বসন পরিধানে, এলো চুল এলো দুল তেল নাহি তায় অবস্থায় প্রভুর নাম ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেখানে পদার্পণ করেছিলেন সেখানে অমঙ্গল দূরীভূত হয়েছিল। যেখানে ভ্রমণ করেছিলেন সেখানে ব্যাধিমুক্তি হয়েছিল। তিনি একদিন বীরসিংহ রাজার রাজ্যে এসে নিজের নাম জাহির করেছিলেন। বীরসিংহ রাজার রাজ্যে বহু মানুষজন, পশু, পাখি, ইত্যাদি প্রাণী ব্যাধিযুক্ত হয়ে প্রাণে মারা যাচ্ছে। মাওলাবিবি ভাবেন মুণ্ডে, আমার জাহির প্রচার করব বীরসিংহ রাজার রাজ্যে ও রাজ্যে মহামারী ব্যাধিমুক্তি করব। এই ভেবে সাতদিন সমস্ত রাজ্য ভ্রমণ করে এক বৃক্ষতলে আসন করেছিলেন। ক্ষণেক পরে তিনি দেখেন কিছু মহিলা হাতে পূজার ডালা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তখন তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানলেন তারা বীরসিংহ রাজার বাড়ি তেত্রিশ কোটি দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে পূজার আয়োজন হয়েছে সেখানে পূজা দিতে যাচ্ছে। মা ওলাবিবি তখন তাঁদের বললেন, তোমার ঐ পূজার সামগ্রী থেকে কিঞ্চিত ওলাবিবির নামে হাজত দিয়ে যাও। তাহলে তোমাদের কোন অমঙ্গল হবে না বা মহামারী হবে না। পূজার যাত্রীরা তখন মনে মনে ভাবল ও পরস্পর বলাবলি করল এই কাঙালিনী খেতে পরতে পায় না, তাই আমাদের হাতে পূজার উপকরণাদি দেখে খেতে চায়। এটি ঐ বুড়ির খাওয়ার ছল। তাই তারা মায়ের কথা না শুনে ও আশীর্বাদ না নিয়ে গন্তব্যস্থলে গমন করল।

মা ওলাবিবি ভাবেন মনে এরা অবুঝ, এরা আমার কথার ইঙ্গিত কিছু বুঝল না। কাল আমি স্বয়ং রাজবাড়িতে যাব। রাজার কাছে পাঁচকড়া শিরনি চাইব। রাজা পাঁচকড়া শিরনি দিলে রাজ্য মহামারী ব্যাধিমুক্ত হবে। এই ভেবে মা ওলাবিবি ও ঝোলাবিবি পরদিন রাজ-দ্বারে এলেন। রাজা সংবাদ পেলেন যে, দুইজন ভিখারিণী দ্বারে উপস্থিত। তখন তিনি এক নফরকে দিয়ে ভিক্ষাদ্রব্য পাঠালেন। নফর ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে কাঙালিনীবেশী বিবির নিকট গিয়ে বলে মা, তোমরা এই ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে বিদায় হয়ে যাও। মা ওলাবিবি নফরকে বলেন, তোমার রাজার দ্বারে ভিক্ষা নিতে আসিনি, পাঁচকড়া শিরনির জন্য এসেছি, তোমার রাজাকে এই সংবাদ দাও। আমার আশীর্বাদে তোমাদের রাজ্যের মহামারী দূর হবে ও রাজ্যের মঙ্গল হবে। নফর এই কথা শুনে জানাল আমাদের রাজা তোমাদের মত কাঙালিনীর শিরনি দেবেন না, এই ভিক্ষা নিয়ে তোমরা এখনই বিদায় হও। নইলে রাজা রাগান্বিত হয়ে তোমাদের প্রাণে মারতেও পারেন। হয় ভিক্ষা নাও, নইলে অন্যত্র সরে পড়। মা বলেন—

ব্যাটা নফর বলি তোর তরে এই দুনিয়া মাঝে আমি মা বিবিমা নাম ধরি আমি মেরে তারে ফিরে বাঁচাতে পারি। আমাকে মারবে কে?

নফর : এ কেমন কথা কাঙালিনী, তোমরা মেরে বাঁচাতে পার? দেখি তোমাদের কেমন ক্ষমতা ঐ রাজার ফুল-ফল বাগান আছে ঐ বাগানের গাছ সমস্ত মেরে আবার বাঁচাও। তাহলে রাজাকে বলে তোমাদের শিরণি দেবার ব্যবস্থা করব।

মা তখন বৃক্ষ মাঝে কঠোর দৃষ্টিপাত করিল।
কঠোর দৃষ্টিতে বৃক্ষ জ্বলিতে লাগিল।।

নফর মায়ের মহিমা দেখে অবাক হয়ে মায়ের চরণে নমস্কার করে মায়ের ভক্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মা একটি পাত্রে কিছু জল নিয়ে মন্ত্রপূত করে বৃক্ষে ছড়িয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত বৃক্ষের আগুন নিভে গিয়ে পূর্বের ন্যায় তরতাজা শ্যামল বর্ণ ধারণ করল। এই দৃশ্য দেখে নফর বলে-মা আমি অবুঝ, কি বলতে কি বলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমি এখনই রাজাকে বলব এবং রাজা শিরনি দিয়ে আপনাদের খুশি করবেন।

এই বলে নফর ভিক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নফর মায়ের মাহাত্ম্য আদ্যন্ত বললে রাজা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে খড়্গ আনতে বললেন। কারণ ভিক্ষা ফিরিয়ে কাঙালিনী রাজাকে অপমান করেছেন। অতএব এর শাস্তি প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। রাজা হয়ে ভিখারিণীকে শিরনি দান করা এ আরও অপমান। এই কথা মনে করে রাজা খড়্গ নিয়ে রাজবাটীর বাইরে এলেন। তখন অন্তর্যামী মা ওলাবিবি রাজার মতলব বুঝতে পেরে রাজার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই রাজার দেহ জ্বালা করতে লাগল। রাজা তখন জ্বালায় অস্থির হয়ে দুয়ার থেকে কাঙালিনীকে দূর হয়ে যেতে বললেন। মা তখন রাজাকে পাঁচকড়া শিরনি দিতে বললেন, তাতে তার রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে, কিন্তু রাজা কিছুতেই বিবিমায়ের কথা শুনলেন না। তিনি তাঁদের দূর হয়ে যেতে বললেন। মা তখন বললেন শিরনি দিতে কুণ্ঠিত হলে শুধু দোয়া নাও। রাজা তাতেও রাজী না হয়ে ব্যঙ্গ করে বললেন তোমার দোয়ার ঝুলি খুব ভার হয়েছে, তুমি ঐ তালের গামলিতে দোয়া ঢেলে রেখে চলে যাও।

দিলিনা শিরনি রাজা বেটা দোয়া নিলিনা
না রাখলি আমার কথা।
আপন দোষে খাবি তোর একটি মাত্র সন্তান
পুরুষরামের মাথা।।

এই বলে মা অভিশাপ দিয়ে ফিরে গেলেন, রাজা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। রাজা যে তালের গামলিতে মায়ের দোয়া রাখতে বলেছিলেন, মা সেই গামলিতে হাত রেখে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, সেখান থেকে একটি তালশিশু সৃষ্টি হয়েছিল। হাত তুলে নিতে সেই তালশিশু মুহূর্তে বৃক্ষে রূপান্তরিত হল এবং তাতে ভাল ফল সৃষ্টি হল। মা আনন্দে সেই বৃক্ষের চারদিকে ঘুরতে লাগলেন। ঝোলাবিবি বলেন দিদি, তোমার এ মহিমা বোঝা ভার। তুমি এই যে তাল ফলালে এ তাল কি হবে? বিবি বলেন—

আজি বৃক্ষতে ফলিয়ে গেলাম তাল
এ তাল নয় এ তাল হল রাজার ছেলের কাল।

আমি আর এ নগরে থাকব নাই, চল ঐ বনের মধ্যে এক বৃক্ষতলে আসন করি। এই বলে মা বিদায় হলেন।

পরদিন রাজা গাড়ু-গামছা নিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে দেখেন, যেখানে কাঙালিনী বসেছিলেন সেখানে একটি বিরাট তালবৃক্ষ। তাই দেখে তিনি অবাক হয়ে নফরকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন গতদিন বিবিমা পরিচয় দিয়ে যিনি এসেছিলেন এ কীর্তি তাঁরই। কিন্তু রাজা একথা বিশ্বাস করতে চান নি। তিনি বললেন তাঁর পূজায় দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে এই বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন ও তাল ফলিয়েছেন। আমার মন বলে এই বৃক্ষের তালশাঁস যে খাবে সে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি এই গাছের তাল কেটে দাও। নফর রাজার এই কথায় বিশ্বাস না করে তাল কাটতে চাইল না। রাজা তখন তাকে তাল না কাটলে প্রাণদণ্ড হতে পারে বলে জানালেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে নফর সেই তালবৃক্ষে উঠে তাল কাটলো। তালগাছে ওঠার আগে মায়ের কাছে অনেক কান্নাকাটি করে মায়ের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল। অন্তর্যামী মা ওলাবিবি এই ঘটনা জানতে পেরে মালিকের নিকট প্রার্থনা করলেন। নিজের নাম প্রচারের জন্য মালিকের নিকট বিলাপ করে প্রার্থনা করেছিলেন। তখন মালিকের ইচ্ছায় তিন ব্যাধি এসে মায়ের নিকট করজোড়ে উপনীত হল। এই ব্যাধিরা হল ওলাউঠা, টানটঙ্কার ও কালা ব্যাধি। তাঁরা মায়ের নাম প্রচারের জন্য কি করতে হবে তা জানতে চাইলে মা বলেন রাজার দ্বারে যে তাল বৃক্ষে তাল ফলেছে সেই তালের জলের মধ্যে অবস্থান করতে এবং আরও জানালেন এই ফল যখন রাজার ছেলে খাবে তখন যেন তাদের ক্রিয়া করে।

ব্যাধিগণ সেই তালশাঁসের মধ্যের জলে অবস্থান করতে লাগল। নফর সেই তাল কেটে রাজসভায় নিয়ে গেলে রাজা বললেন এই দেবতার আশীর্বাদপূত তালশাঁস আমার একমাত্র পুত্রকে আগে না দিয়ে আমি গ্রহণ করব না। রাজার আদেশে নফর অন্দরমহলে রানীর কাছ থেকে রাজার সন্তানকে আনতে গেলে রানী তাঁর স্নেহের যাদুকে রাজসভাতে পাঠাতে রাজী হলেন না। কারণ তাঁর আশঙ্কা মন্দ লোকে তাঁর সোনার যাদুকে মন্দ করতে পারে বা ব্যাধিগ্রস্ত করতে পারে। নফর এই সংবাদ রাজাকে দেওয়ার জন্য রানীমার ঘর থেকে উঠলে রানীমা তাকে বসিয়ে রাখেন ও ভাবী বিপদের বা অশান্তির আশঙ্কায় নিদ্রারত সোনার যাদুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন। অসময়ে নিদ্রা থেকে জাগানোর জন্য পুত্র মাকে তার কারণ জানতে চাইলে মাতা সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে পুত্র রাজসভায় যেতে অস্বীকার করে। পুত্র বলে—

আমি এই স্বপ্ন দেখেছি তা বলিব আর কত
কোল ছাড়া হব আমি মা তোমার এ জনমের মত।

মাতা শান্ত বাক্যে পুত্রকে তৃপ্ত করে রাজসভায় পাঠালেন। রাজা পুত্রকে দেখে খুশি হয়ে তালশাঁস প্রাণভরে খেতে বলেন। মাতা ওলাবিবি অন্তরীক্ষ থেকে সোনার যাদুকে জানালেন—

তালশাঁস খাসনে যাদু ওইখানেতে দাঁড়া
তালশাঁস খেলে তোর মায়ের করব কোলছাড়া।

অন্তরীক্ষ হতে এই কথা শুনে রাজপুত্র তালশাঁস খেতে চায় না, কিন্তু রাজা জেদ করতে লাগলেন ও বললেন এ তালশাঁস না খেলে দেবতারা অসন্তুষ্ট হবেন। তখন পুত্র নিজহস্তে সে তালশাঁস খেতে চাইল না, পিতাকে মুখে তুলে দিতে বলল। রাজা সেইমত যখন গালে তুলে দিল তা খেয়ে রাজপুত্র ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় লুটিয়ে পড়ল। রাজা ভাবলেন রানীর ঘর থেকে রাজসভায় আসতে পুত্র বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই এমন অবস্থা। রাজা তাকে রানীর নিকট পুনরায় নফরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। রানীমার কাছে গিয়ে পুত্র পুরুষরাম তালশাঁস খেয়ে তার অসুস্থতার কথা জানালে রানীমা নফরকে দিয়ে রাজাকে ডেকে পাঠালেন। রাজা নফরের কথায় রানীমার মহলে এলেন ও নফরকে বদ্যি ডেকে আনতে পাঠালেন।

রাজা রানীমার ঘরে এলে রানীমা বিবিমায়ের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে বিবিমায়ের নামে শিরনি দিতে বললেন। রাজা রানীমার এ কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নানা কথায় রানীকে শান্ত করে রাজসভায় চলে গেলেন। মা বিবিমা বনে থেকে অন্তরে রাজার এ মনোভাবের কথা জানতে পারলেন। তিনি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন এইভেবে যে, রানী শিরনি মাগুতে চায়-রাজা চায় না। তখন তিনি রাজার সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি দিতে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। রানী পুত্রের মুখের উপর মুখ দিয়ে ডাকতে লাগলেন কিন্তু সে আর ডাকের সাড়া দিল না। বৈদ্যরা এসে পুত্রকে দেখে জানিয়ে দিল যে সে আর বেঁচে নেই। রানী তখন মাথা খুঁড়ে কাঁদছে। প্রতিবেশীরা পুরুষরামের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে রানীমা বিবিমার প্রতি রাজার অবিচারের কথা জানান। রানীমার বিশ্বাস বিবিমা তাঁর পুত্রের প্রাণ হরণ করেছেন। প্রতিবেশীরা রানীকে পরামর্শ দিল গঙ্গায় পুত্রের শেষকৃত্য করতে, কিন্তু রানীমা পুত্রকে গলায় বেঁধে বিবিমায়ের অন্বেষণে বের হতে চান। রাজা ও তাঁর লোকজন রানীমাকে অনেক বোঝালেন, শেষে জোর করে গঙ্গায় নিয়ে যেতে চাইলেন। রানীমা মৃতপুত্রকে নিয়ে ঘরে দুয়ার দিয়ে রইলেন। জোর করে নিয়ে গেলে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন বলে জানালেন। অবশেষে তিনি তিনদিন সময় চাইলেন। এই তিনদিন তিনি মৃতপুত্রকে কোলে নিয়ে মাতা বিবিমার নিকট প্রার্থনা করতে চান।

জঙ্গলে থেকে মা বিবিমা জানতে পারলেন যে, রানী তার মৃতপুত্রকে কোলে নিয়ে তাঁর নাম স্মরণ করছেন ও ক্রন্দন করছেন। ঝোলাবিবি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য ওলাবিবিকে ভর্ৎসনা করে বললেন নিজের নাম জাহিরের জন্য এক মাকে পুত্রহারা করতে হবে? বিবিমা তাতে জানালেন তাঁর এরকমই লীলা খেলা। এই কথা শুনে ঝোলাবিবি বলেন-যদি পুত্র শোকে রানী মারা যায় তাহলে তোমার নামের জাহির আর হবে না। কারণ বিবিমার নাম শ্রবণ করে রানীমা যে ভক্তি দেখিয়েছে তাতে তাঁর মত ভক্ত দুনিয়ায় হয় না। তুমি বরং রানীকে দেখা দিয়ে কৃপা কর ও পুত্রকে বাঁচাও। ঝোলাবিবির কথায় মা ওলাবিবি মনে মনে

চিন্তা করে কাঙালিনী বেশে দুজনে রানীমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন ও রানীমার নিকট নিজের পরিচয় দিলেন। তখন রানীমা মায়ের পাদপদ্মে তাঁর মৃতপুত্রকে রেখে মায়ের চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। বিবিমা রানীমার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে জানালেন রানী যদি নগরে ভিক্ষা মেঙে, শিরনি দিয়ে মায়ের নামে গানহাজত দেয় তাহলে তার মৃতপুত্র প্রাণ ফিরে পাবে।

এই কথা শুনে রানী রাজাকে ডেকে বিবিমায়ের ইচ্ছার কথা জানালে রাজা ও রানী উভয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তখন মাতা ইসমাজম দোয়া পড়ে পুরুষরামের গায়ে ফুঁক দিয়ে পুনরায় জীবনদান করেছিলেন। তখন মায়ের আদেশ মত মায়ের চোখের জলে সৃষ্ট তালগাছের পাতা কেটে সেই পাতা টুকরো করে গলায় বেঁধে নগরে ভিক্ষা করে শিরনি মেঙে মায়ের গানহাজত দিয়েছিলেন। সেই থেকে ওলাবিবির নাম জাহির হল।

অষ্টমঙ্গলা

দাও দোওয়া অলি দাও দোওয়া
যে জন তোমার নামে মা গানহাজত দেয় গো দাও দোওয়া অলি দাও দোওয়া
দয়াময়ী মা তাহার রাখিবে বজায় গো ,,
এই স্থানে উপনীত হয়ে যতজন গো ,,
সবাকারে রেখ ঠাণ্ডা হয়ে এক মন গো ,,
যে জনতো নামে মাগো দান করে যায় গো ,,
যেমন কৃপা করেছিলেন মা রাজরানীর তরে গো ,,
সেই রূপেতে কৃপা করবেন রমণীগণের গো ,,
যেমন কৃপা করেছিলেন মাগো, পুরুষরামের তরে গো ,,
সেই রূপেতে কৃপা করবেন যতেক বালকগণে গো ,,
যেমন কৃপা করেছিলেন মা রাজার রাজ্যের তরে গো ,,
সেই রূপেতে দোয়া করবেন এই গ্রামের পরে গো। ,,
এই গ্রামে বসতি করেন যতো জন গো ,,
সবাকারে রেখ ঠাণ্ডা হয়ে এক মন গো ,,
আরজ করে বলি বিবিমায়ের হুজুরে গো ,,
কৃপা করিবেন সকল ভক্তগণের পরে গো ,,
একদিন ইসরাফিলকে নিজে ডাক দিয়ে গো ,,
সোনার শিঙ্গায় দিবে ডাক হস্তী পিঠে গিয়ে গো ,,
আসিয়া ইসরাফিল শিঙায় দিলে ফুঁক গো ,,
একেক শিঙায় হবে বাহান্ন হাজার মুখ গো ,,
পহেলা ফুঁকেতে দুনিয়া হবে মেশামেশি গো ,,
পর্বত ভাঙিবে সেদিন করবে গোঁসাগুঁসি গো ,,
দুই ফুঁকেতে দুনিয়া না বাঁচিবে ঐ গো ,,

সূর্যের তাপেতে জ্বলবে বান্দার মাথার ঘিলু গো দাও দোওয়া
তেসরা ফুঁকেতে দুনিয়া আরজ হয়ে যাবে গো ,,
তাঁহারই করুণায় জন্ম লবে জীব গো ,,
জ্ঞানী গুণী যত আছে এই দুনিয়ার পরে গো ,,
নয়নজল দিলে মাতা পার করিবে তার গো ,,
তাবাদে মারিবে মাতা স্থানে আছাড়িয়া গো ,,
এই রূপে জ্ঞান মোর শুন মন দিয়েগো ,,
আরজ করে বলি বিবিমায়ের হুজুবে গো ,,
কৃপা কবিবেন আসি ভক্তবামেব পরে গো ,,
সকল জনেতে মায়ের কেহ নাহি ভুল গো ,,
মা বিবিমার নামে একবার আমিন আমিন বল গো ,, *(সমাপ্ত)*

ওলাবিবির পালাগান চব্বিশ পরগণায় অতিশয় জনপ্রিয়। এই অঞ্চলের মানুষ ভয়ে ভক্তিতে ওলাবিবির পূজা করেন, গানহাজত দেন। কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে ওলাবিবির থানে পূজা একমাত্র নিদান বলে এই অঞ্চলের লোকসমাজ এখনো বিশ্বাস করেন। গৃহস্থ বাড়ির কেউ কেউ রোগে আক্রান্ত হলে গৃহস্থের প্রধানা, বিবিমার থানে ঢিল বেঁধে মুদো ধরে মানত করেন। রোগমুক্ত হলে বিবিমার নামে গানহাজতাদি দিয়ে মানত চুকোন। পূজার দিন বিবিমার পূজা সংক্রান্ত নানা সংস্কার গৃহস্থ বাড়িতে পালিত হয়। পালাগায়ক বিবিমার পালা গাওয়ার ফলে আশাবাড়ি পোঁতা, মোকাম পাতা, বাতাসা ছড়ান ইত্যাদি নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তিনি মুসলমান হলে লুঙ্গি, মুসলমানী জামা, গলায় লম্বা পুঁতির মালা ও হাতে চামর নিয়ে আসরে গান করেন। হিন্দুগায়ক হলে ধুতি-পাঞ্জাবী অথবা মুসলমান মহিলা সেজে হাতে চামর নিয়ে গান করেন। পালাগায়কগণ বিবিমার আসরে ওলাবিবির পালা ছাড়াও অন্যান্য বিবিমায়ের পালাগান করেন। তবে যে গানের মানত, সেটি অবশ্যই গেয়ে থাকেন। চব্বিশ পরগণায় বহু পালাগায়ক ওলাবিবির পালাগান করেন। ক্ষেত্রগবেষণায় একাধিক পালাগানের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রত্যেক পালাগায়ক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গান করেন। তাঁদের স্বকীয়তা গানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং একই পালাগান করলেও কথা ও সুর, পরিবেশন পদ্ধতি পৃথক। কেবল মূল ঘটনাটি একই থাকে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে যে-সমস্ত পালাগান সংগৃহীত হয়েছে তার একটির কাহিনী সংক্ষেপে এখানে লিখিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে অদ্যাবধি (১৯৯৫) কারোর কলেরা রোগ (ওলাওঠা) দেখা দিলে তার অভিভাবক বা অভিভাবিকা প্রথমে ওলাবিবির কথা স্মরণ করেন, তারপর স্থানীয় ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারের ঔষধে রোগ সারলেও রোগারোগ্যের সমস্ত কৃতিত্ব গিয়ে পড়ে ওলাবিবির উপর অথবা তাঁর ভক্তের দেওয়া জড়ি-বটী অথবা তুকতাকের উপর। এইরূপ বিশ্বাসের ফলে এই অঞ্চলের লোকসমাজে

ওলাবিবির পূজা, গান, হাজত ও পূজাসংক্রান্ত নানা সংস্কার অতিশয় শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। ওলাবিবি-সংশ্লিষ্ট পূজা-হাজত ও সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে চব্বিশ পরগণায় বিশেষভাবে ওলাবিবির লোকায়ত পালাগান পরিবেশিত হয়।

পাদটীকা

১। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অভিমুখ, পৃ: ৭, বিশ্ব সভ্যতার পাদপ্রদীপে সুন্দরবনের বিবিমা।

২। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৮৭, পৃ: ২১৪ (বিনয় ঘোষের উক্তি)।

বিবিপালা ঃ আসানবিবি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে জনপ্রিয় পালাগান হল আসানবিবির পালা। পালাগান আলোচনায় এটি বিবিপালার অন্তর্গত। ওলা, ঝোলা, টান, টংকার, প্রভৃতি রোগের যন্ত্রণা থেকে আর্তমানুষকে আরাম দেন বা মুক্তি দেন বলেই তিনি আসানবিবি নামে কথিত। সমস্ত ব্যাধির ও সমস্যার আসানকর্ত্রী বলেও তিনি আসানবিবি। লোকাযত পালাগানে তিনি অতীব স্নেহময়ী বিবিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। চব্বিশ পবগণার সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আসানবিবির গানপূজা, হাজত ও নানা সংস্কারাদি পালনের প্রচলন আছে। পালাগানে দেবী রোগ প্রতিকারিকা শক্তি হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সন্তানহীনার সন্তান কামনা পূরণ করেন ও শরণাগতকে রক্ষা করেন।

আসানবিবির বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই, যার থেকে আসান-বিবিকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করা যায়। অন্যান্য বিবিমার ন্যায় দেবীর দুই হাত, গাত্রবর্ণ হরিদ্রা, শাড়ি ও ব্লাউজ পরিহিতা। প্রায় একই ধরনের মূর্তিকে কেউ কেউ ওলাবিবি কল্পনা করে গানপূজা হাজতের ব্যবস্থা করেন। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসানবিবির গান ও ছলন দিয়ে মানত চুকোন ও পূজা-হাজত দেন। পূজার নৈবেদ্যর মধ্যে সাধারণত থাকে বাতাসা, চিনির সন্দেশ, গুড়ের পাটালি ইত্যাদি। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আসানবিবির পূজায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত সংখ্যাধিক্যে নিম্নবর্ণের হিন্দুই দেবীর পূজা-হাজত সংক্রান্ত নানা সংস্কারাদি পালন করেন। ক্ষেত্রগবেষণা কালে দেখা গেছে অনেক থানের প্রধান সেবক নিম্নবর্ণের (বাগদী সম্প্রদায়) হিন্দু। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ আসানবিবি ও অন্যান্য বিবিমাদিগের পূজা হাজতাদি ও নানা সংস্কার পালিত হয়।

চব্বিশ পরগণায় আসানবিবির একটিমাত্র লোকায়ত পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। বারুইপুর থানার সুদিন মণ্ডল আসানবিবির পালাগান করেন। এই পালা অনেক ক্ষেত্রে

ওলাবিবি নামেও গীত হয়। ওলাবিবির পালা নামে একাধিক পালা পাওয়া গেলেও আসান-বিবর পালা (সুলতানছবির পালা) একটিই ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে সংগৃহীত হয়েছে। আসান-বিবির এই পালাটি যাঁরা ওলাবিবির পালা বলে গান করেন তাঁরা আসানবিবির পরিবর্তে ওলাবিবির দোহাই দিয়ে গান করেন। এক্ষেত্রে পালার কাহিনীর কোন পরিবর্তন করা হয় না। এই পদ্ধতিতে গান করার প্রক্রিয়াকে পালাগায়কগণ 'ভাঙটা' পদ্ধতিতে গান বলেন। আসানবিবির মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক সুলতানছবির পালাটি ভাঙটা পদ্ধতির একটি পূর্ণাঙ্গরূপ বলা যায়। কারণ সুদিন মণ্ডলের গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত এই পালাগানটি সুদিন মণ্ডল অপেক্ষা প্রাচীন পালাগায়কগণ ওলাবিবির দোহাই দিয়ে ওলাবিবির পালা হিসাবে গান করেন। আবার সুদিন মণ্ডল খুব জোর দিয়েই বলেন এটিই মূলত আসানবিবির পালাগান। তাঁর গাওয়া আসানবিবির মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক সুলতানছবির পালাটি নিম্নরূপ—

সুলতানছবির পালা

আস্তিক শহরে আচানরিদ বা আচানরিক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান। মা আসানবিবি এই শহরে থাকেন। তিনি বাদশার মন পরীক্ষা করার জন্য রানীর তন্থে ব্যাধি ছেড়ে দিলেন। এমন ব্যাধি দিলেন যা কোন ডাক্তার বা বৈদ্য নির্ণয় করতে পারলেন না। রানীর এই দুর্দশা দেখে রাজা রাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দিয়ে রানীমার কাছেই থাকেন। এইভাবে তো চলতে পারে না। অপুত্রক রাজা রানীর অসুখে খুব মনকষ্ট পেয়ে রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাবেন বলে স্থির করেছেন। মন্ত্রীরা তাঁর এই অভিপ্রায় থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করলেন। তাঁদের পরামর্শে রাজা হাটে-বাজারে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, যে রানীমার ব্যাধি সারাতে পারবে তাকে বহু অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে আর যে কেবল টাকার লোভে আসবে তাকে শিরশ্ছেদ করা হবে।

গ্রামেগঞ্জে হাটে বাজারে ঢ্যাঁড়া দেওয়া হল
পাঁচজন নেশাখোর তা শুনতে যে পেল।

নেশাখোরগণ রানীর অসুখের কথা শুনে পরামর্শ করল তারা বৈদ্য সেজে রাজবাড়িতে গিয়ে রানীমাকে দেখে আসবে। রানীমাকে চোখের দেখা দেখে তারা জীবন সার্থক করতে চায়। তারা তখন রাজার লোকজনদের সাথে লম্বাচওড়া কথা বলে—

এই বলে পাঁচ নেশাখোর করিল গমন
রাজার বাড়ীতে গিয়ে পৌছিল তখন।
যে ঘরেতে রানি আছে দাসদাসী লয়ে
পাঁচজন নেশাখোর পৌছিল গিয়ে।

রানীমাকে দেখে তারা এবার ফিরে আসতে পারলে বাঁচে, কিন্তু রোগ না সারিয়ে ফেরা মহামুশকিল। দক্ষিণ মশানে তাদের পাঁচজনকে বলি দেবেই। তখন তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ছিল, সে একটা মতলব এঁটে বলল—

চন্দ্রমণি মুশকিল আজার
মনুষ্য পিত্ত না হলে ওষুধ হবে না তার।

এই মনুষ্য পিত্ত নিতে হবে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের এবং তাকে একদাম দিয়ে কিনে নিতে হবে। সেই পিত্ত দিয়ে যে ওষুধ তৈরি হবে তা দিয়েই রানীমার ব্যাধিব্যায়রাম সারবে। পাঁচ নেশাখোরের ধারণা ছিল, এটা কখনোই যোগাড় করা সম্ভব নয়, অতএব তাদেরও মুক্তি হবে, লাভের মধ্যে রানীমাকে দেখা হবে।

হাটে-বাজারে-নগরে ট্যাঁড়া দিয়েছিল
ছেলে বিক্রির কথা শুনে সবাই কানে আঙুল দিল।
অবশেষে শহরের প্রান্তে দেখে ভাঙা এক কুঁজি
রাজার লোক তার ভিতর মুণ্ড দিল গুঁজি।

ভাঙা কুঁজির মধ্যে ছিল এক বৃদ্ধ। অত্যন্ত গরীব। সে রাজার লোকের কথায় বহু ধন-রত্নের বিনিময়ে তার বুড়িকে চুরি করে একমাত্র পুত্র সুলতানছবিকে বিক্রয় করতে চাইল। অনেক বুদ্ধি-পরামর্শ করে ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে বুড়ো বুড়িকে চুরি করে রাজার লোকের হাতে সুলতানছবিকে তুলে দিল। যাবার সময় সে তার মায়ের সাথে দেখা করে যেতে চাইলে পাত্রমিত্র তাকে বন্ধন করে মারতে মারতে নিয়ে চলে গেল। এই সময় সুলতানছবির মা পরের বাড়ি ভাড়া ভানতে গেছে (ধান ভানতে)। রাজার লোকের অত্যাচারে সুলতানছবি কেঁদে বলে—

মারিসনে মারিসনে পাত্র জননী নাই কারে কব
তোর বন্ধনে বুক ফেটে যায় বালক হয়ে কত সব।
মা সকলদের ছেলে কোলে হাসছে দেখ হেলে দুলে
আমায় যদিগো কেউ নাওগো কোলে আমি তারে মা বলিব।

সুলতানছবির এইরূপ মা মা বলে ক্রন্দন শুনে মা আসানবিবির অন্তরে দয়া উপস্থিত হল। সখিকে ডেকে (বিমলা) মাতা সুলতানছবিকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা করল —

ধোয়া।। এই কথা শুনে মাতার দয়া উপজিল
ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে শম্ভুমূর্তি নিল (বেদেনীমূর্তি)।

মাতা আসানবিবি বহু মূল্যবান বস্ত্রসকল নিয়ে পাত্রমিত্র যে পথে সুলতানছবিকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। মাতা আসানবিবি তাদের ডেকে বলতে লাগলেন তোমরা ঐ কচি ছেলেটাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন? রাজার লোক তাঁকে পাগলী বুড়ি বলে পথ ছাড়তে বলে। মাতা আসানবিবি বলেন এই রকম আমার একটা পুত্রসন্তান ছিল, সে মারা গেছে। তোমরা এই সন্তানকে আমার কোলে একটু দাওনা বাবা, তোমাদের বহু মূল্যবান বস্তু দেব। এই কথা শুনে রাজার লোকের খুব লোভ হল, তারা মণিমাণিক্যের লোভে সুলতানছবিকে তাঁর কোলে দিয়ে চারদিকে ঘিরে বসে রইল। বুড়ির কোলে সুলতানছবি বসতেই রাজকর্মচারী অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

কওচার পানি মা আমার হাতে তুলে নেয়
পাত্রমিত্রের গায়ে তাহা ছড়াইয়া দেয়।
মায়ের দোওয়াতে সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়িল
এই সময় মা আসানবিবি নিজ মূর্তি ধরিল।

সুলতানকে কোলে নিয়ে মা তাকে সকল কথা বুঝাইল। সুলতানছবিকে রানীমার অসুখের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়ে মা বললেন রাজার লোকজন যখন তোকে দক্ষিণ মশানে বলি দিতে নিয়ে যাবে তখন তুই আমাকে আসানবিবি বলে ডাকিস। আমি তখন এসে তোকে কোলে তুলে নেব, আর কাটতে পারবে না। সুলতানছবি বলল যদি মা তখন আমি ভয়ে তোমার কথা ভুলে যাই তাহলে কি বলব?

আসানবিবি যদি না বলতে পার শুধু একবার ডেকরে মা বলে
ছুটে গিয়ে সোনার যাদু নেব তোমায় কোলে তুলে।

এই কথা বলে মা উধাও হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ কর্মচারীদের জ্ঞান ফিরে এলে চারিদিকে অবাক হয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই কেবল সুলতানছবি দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভাবল তারা কি কোন বেদের মেয়ের ভোজবাজীতে পড়েছিল? যাই হোক সুলতানছবি আছে এটাই তাদের সান্ত্বনা। তারা তাকে বাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা সুলতানছবিকে দেখে বিমোহিত হয়ে গেলেন। অপুত্রক রাজা তাই সুলতানকে একদিনের জন্য সিংহাসনে বসিয়ে বাদশা সাজাতে চান। কারোব কোন কথা না শুনে রাজা নানা অলঙ্কারে তাকে সুসজ্জিত করলেন। সুলতান তা একে একে টেনে ফেলে দিয়ে বলে—

আভরণে নাই প্রয়োজন শুনহে রাজন
আভরণে কি কাজ আছে নিকট হল যার মরণ।
আভরণ দাও এই বেলাতে আসানবিবি নাম লেখা যাতে
মৃত্যুর পরে আওরস খানায় (?) যেন আমায় না হয় যেতে।

এই কথা শুনে রাজার চরম ক্রোধ উপস্থিত হল। ঘাতককে ডেকে তাকে দক্ষিণ মশানে কোতল করতে আদেশ দিলেন। ঘাতক সুলতানকে নিয়ে দক্ষিণ মশানে যায়। দক্ষিণ মশানে সুলতানছবিকে নিয়ে গিয়ে ঘাতকের মনে খুব দয়া উপস্থিত হয়। তখন সুলতানকে বলল যদি তোর কাউকে দেখার ইচ্ছা হয় বা খাবার ইচ্ছা হয় তো বল তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সুলতান তখন বলে, সে তার মাকে ডাকতে চায়। এই কথায় ঘাতক কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেও সুলতানকে সেই সুযোগ দেয়। সুলতান তখন বলে—

কোথা আছ ও জননী কোথা রইলে লুকায়ে
একবার দাও দরশন দেখে শ্রীচরণ জন্মের মত যাই বিদায় হয়ে।
ওমা তুমি বলেছিলে বিপদ সময় নেব কোলে
তবে কেন বইলি দূরে নিষ্ঠুরা পাষাণী হয়ে।

মা আসানবিবি সুলতানছবির ক্রন্দন শুনে শ্বেত মক্ষিকা হয়ে দক্ষিণ মশানে গেলেন। তিনি

ঘাতকের উদ্যত কাতানের উপর ঘোরাফেরা করতে ঘাতক কাতান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই সুলতানকে আর কাটতে পারল না। তখন মা আসানবিবি রাজা আচানরিদকে স্বপ্নে বলেন—

শুনরে আচানরিদ শুন দিয়া মন
তোমার শিয়রে ফকিরের মেয়ে ঘুমে এত মন।
আসানবিবি নাম মোর দিলাম পরিচয়
তোমা হতে যেন আমার নামের জাহির হয়।

এই বলে মাতা রাজাকে পাঁচবৈদ্যের ধূর্তুমির সকল কথা সবিস্তারে বললেন এবং রানীর মুক্তির সকল পরামর্শ দিলেন। বিবিমা রাজাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, রানীকে সারাতে হলে মনুষ্যরক্ত পিত্তের কোন প্রয়োজন নেই, কাল ফজরে উঠে বাদশাহী পোশাক ত্যাগ করে ফকিরের বেশ ধারণ করে গলায় কুটো বেঁধে আসানবিবির নামে সাতগ্রাম মাগুন করতে হবে ও সেই মাগুন করা পয়সায় আমার গান-হাজত দিতে হবে। যেখানে আমার মোকাম হবে ওজু ও গোসল করে সেই স্থানের মাটিতে পানি মেশাতে হবে। সেই মাটি খাওয়ালে রাননীর ব্যায়রাম দূর হয়ে যাবে। তার পরদিন ফজরে উঠে সুলতানছবিকে রাজহস্তীর পিঠে চাপাতে হবে, সোনারূপার চীজ উপহার দিতে হবে এবং সুলতানকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

এই এক দুই তিন কথা যদি মনে নাহি রয়
সবংশে নির্বংশ করব এই অধম ফকিরের মেয়ে কয়।

এই কথা স্বপ্নে বলে মা আসানবিবি উধাও হয়ে যান। স্বপ্ন পেয়ে রাজা দ্বাবীকে ডেকে তৎক্ষণাৎ সুলতানছবিকে আনতে আদেশ দিলেন।

এত শুনি দ্রুত গতি দ্বারী সেথা যায়
দেখে দক্ষিণ মশানে সুলতান নেই ঘাতক কাঁদে উভরায়।

দ্বারী ঘাতকের হাত ধরে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা ঘাতককে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার তোগদীরের, কিন্তু সুলতানছবি কোথায়? ঘাতক এই কথায় কাঁদতে লাগল। রাজা পিছন ফিরতেই দেখলেন মসনদের পাশে করুণাময়ী আসানবিবির দোয়ায় সুলতানছবি দাঁড়িয়ে আছে। রাজা তখন স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে রাজহস্তীতে চড়িয়ে, সোনারূপার চিজ পরিয়ে তার বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

এদিকে সুলতানছবির মা ভাড়া ভানতে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে বুড়োকে জিজ্ঞাসা করে তার সুলতান কোথায়। বুড়ো মিথ্যা বলে যে, নোনা গাঙের বাদায় গিয়েছিলাম, বাছাকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে। বিশ্বাস না হয় দেখ আমার গায়ে আঁচড় কামড়ের দাগ আছে। বুড়ো কাস্তে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে গায়ের কাটা দাগ দেখায়। বুড়োর কথা শুনে বুড়ি মূর্ছিতা হয়ে যায়। কেঁদে কেঁদে তার দুটো চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

কিছুদিন পর সুলতান হাতির পৃষ্ঠে করে বাড়ি ফেরে। ছেলেকে হাতির পৃষ্ঠে দেখে বুড়োর হাতির পৃষ্ঠে চড়ার খুব শখ হয়। সে তখন বলে—

ও বাপ সুলতান আমাদের হতে তোর দুঃখ হল বড়ি
তুই হাতির পিঠ থেকে নাম আমি একটু চড়ি।

এই কথা শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা বুড়োকে মারতে যায়। কারণ সে টাকার লোভে সুলতানকে বিক্রি করেছে। সুলতান তার বাবাকে মারতে নিষেধ করল। তারপর মা আসানবিবির নাম করে মাটি নিয়ে তার মায়ের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতে বুড়ির চোখ ভাল হয়ে যায়। তারপর বুড়ি সুলতানছবিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। মায়ের কোলে বসে সুলতান একে একে সব কথা বলে। বুড়ি পুত্রের কাছে আরো জানতে চায়, কিভাবে মায়ের দোয়া পাওয়া যায়। তখন সুলতানছবি মা আসানবিবিকে স্মরণ করতে মা আসানবিবি জানান— আমার নাম আসানবিবি দিলাম পরিচয়, আমার নাম স্মরণ করে যে জন গলায় কুটো বেঁধে অনাহারে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করে সেই পয়সায় গান-হাজত দেয় এবং আমার মোকাম স্থানের মাটি 'কওসার পানি'র সাথে মিশিয়ে যেকোন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের খাওয়ায় তার সমস্ত ব্যাধি-ব্যায়রাম দূর হয়ে যায় ও আমার কৃপা পায়।

এই কথা বলে মা সুলতানকে আশীর্বাদ করে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন আর সুলতান-ছবিকে হাত ধরে নিয়ে মা আসানবিবির নামে প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে বুড়ি ভিক্ষা করতে লাগলেন—

মাগুন দাও মাগুন দাও, মা সকলে মাগুন দাও
একগুণ দিলে তোমাদের লক্ষগুণ হয়।
মায়ের নামে চাল পয়সা দিলে তোমাদের সন্তান সুখে রবে
মায়ের নামে মাগুন দিলে ব্যাধি ব্যায়রাম দূরে যাবে।

(কাহিনী সমাপ্ত)

চব্বিশ পরগণার জনপ্রিয় লোকায়ত পালাগানগুলির মধ্যে সুলতানছবির পালাটি অন্যতম। পালাগায়ক সুদিন মণ্ডলের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে জানা গেছে বিবিমার পালাগানের আসরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্যান্য পালাগানের সাথে সুলতানছবির পালাটি গাওয়া হয় এবং দর্শকদের দিক থেকে এই পালা গাওয়ার জন্য বেশি অনুরোধ আসে। আসানবিবির পালা সাধারণত বিবিমাপূজা, হাজত ও লোকসংস্কারের অঙ্গ হিসাবে চব্বিশ পরগণা তথা সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকসমাজে লোকশিল্পী কর্তৃক লোকায়ত পালাগান হিসাবে পরিবেশিত হয়। পালাগায়কগণ বলেন, এই পালাটি ভাঙটা করে যেকোন পীর বা বিবির গান গাওয়া যায়। এই নিরিখে বিচার করলে বলা যায় সুলতানছবির পালাগানটি ভাঙটা গানের একটি বিশিষ্ট রূপ।

বিবিপালা ঃ সাতবিবি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের ধারায় সাতবিবির পালা অন্যতম। পালাগান আলোচনায় এটি বিবিপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে সংখ্যাতত্ত্বমূলক কিছু বিবির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের নিয়ে একাধিক পালাগানের প্রচলনও প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন সাতবিবি, নয়বিবি ও একুশবিবি। এঁরা সবাই মাহাত্ম্যপ্রচারিকা বিবি নন। সাতবিবি ও নয়বিবির পালাগানে উল্লিখিত বিবিগণ মাহাত্ম্যপ্রচার করেছেন, কিন্তু একুশবিবির পালায় যে একুশজন বিবির নাম পাওয়া যায় তাঁরা এক বাদশার স্ত্রী হিসাবে পরিচিতা, মাহাত্ম্যপ্রচারিকা নন। একুশবিবির পালায় কেবল আওরজবিবির মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। বিবি পালাসমূহে বর্ণিত বিবিগণ প্রত্যেকেই ভক্তকে অযাচিতভাবে কৃপা করেন। মানবজীবনের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুর্বিপাক থেকে আর্তমানুষকে রক্ষা করেন ও নানাভাবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। এই নিরিখে বিচার করে মাহাত্ম্যপ্রচারিকা বিবিদিগের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা ক) শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশে আর্ত মানুষকে মাতৃরূপে রক্ষাকারী বিবি; যেমন— বনবিবি, খ) রোগশোক নিবারণকারী বিবি, যেমন— ওলাবিবি, আসানবিবি, গ) ভক্তের ইহলৌকিক প্রার্থনা বা সন্তানহীনার সন্তানদানকারী বিবি। যেমন— দরবারবিবি, আওরজবিবি ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক যে-সমস্ত বিবিমার পালা সংগৃহীত হয়েছে তাতে বিবিদের যে নামের উল্লেখ আছে তা সর্বত্র এক নয়। যেমন পালাগায়ক সুদিন মণ্ডলের নিকট হতে সাতবিবির যে নামের তালিকা পাওয়া গেছে তা হল— ১) ওলাবিবি ২) ঝোলাবিবি ৩) ডাবিবি ৪) ডঙ্কারবিবি ৫) আজগৈবিবি ৬) আসানবিবি ও ৭) ঝেটুনেবিবি।

পালাগায়ক শশধর মহিষের নিকট হতে প্রাপ্ত সাতবিবিমার নাম হল— ১) ওলা ২) ঝোলা ৩) কালা ৪) টান ৫) টংকার ৫) বাত ও ৭) বাতবলবিবি।

বিষ্ণুপুর থানার খ্যাতিমান পালাগায়ক বসন্তকুমার গায়েনের নিকট হতে নয়বিবির

নামের যে তালিকা পাওয়া গেছে তা হল— ১) ওলা ২) ঢোলা ৩) জহর ৪) আজগোবি ৫) ওসল ৬) মড়ি ৭) আসান ৮) দড়মড়ি ও ৯) কুড়ুনেবিবি।

বাংলার লৌকিক দেবতাগ্রন্থের লেখক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু সাতবিবির যে নামোল্লেখ করেছেন তা হল— ১) ওলা ২) ঝোলা ৩) আসান ৪) আজগৈ ৫) চাঁদ ৬) বাহড় ও ৭) ঝেটুনে বিবি।

এছাড়া আরও যে-সমস্ত পালাগায়কের নিকট সাতবিবির নাম পাওয়া গেছে সে ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বিবিমাগণ সর্বত্র এক নামে পরিচিতা নন এবং নামের ভিন্নতা তাঁদের অস্তিত্বের কাল্পনিকতাকেই নিশ্চিত করে।

কোন কোন লোকসংস্কৃতির গবেষক মনে করেন উক্ত সাতবিবি শাস্ত্রীয় মতে পূজিতা সপ্তমাতৃকা। যথা— ১) ব্রাহ্মী ২) মহেশ্বরী ৩) বৈষ্ণবী ৪) বরাহী ৫) ইন্দ্রাণী প্রমুখ। হিন্দুর মান্যা সাতজন স্ত্রীলোককেও সপ্তমাতৃকা বলে। যথা— ১) গর্ভধারিণী ২) ধাত্রী ৩) গুরুপত্নী ৪) ব্রাহ্মণী ৫) রাজপত্নী ৬) পৃথিবী ও ৭) গাভী।

এই সপ্তমাতৃকার সাথে সাতবিবির কোন সাদৃশ্য নেই। বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার সাতবাউনী বা সাতবনদেবী (চমকিনী, রঙ্কিনী, সনকিনী প্রমুখ) জঙ্গল মহলের অন্যান্য পল্লীতে পূজিতা জামমালা দেবীর সাতভগিনীর (বিলাসিনী, কাজিজম, বাসলী, চণ্ডী ইত্যাদি) সহিত আকৃতিতে ও পূজার পদ্ধতিতে বেশ সাদৃশ্য আছে। এই সপ্তমাতৃকা বা সাতটি দেবীর একত্র অবস্থায় পূজার প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে প্রাপ্ত একটি মৃন্ময় ফলক শিলের উপর সাতটি নারীমূর্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। Mr. Earnest Maky তার "Early Indus Civilization" নামক পুস্তকে উক্ত সাতটি নারী মূর্তিকে দেবীর বলে মন্তব্য করেছেন, তাঁর মতে ঐ শিলে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি শীতলা ও তাঁর ছয় ভগ্নীর।[১] সুতরাং চব্বিশ পরগণার কেচ্ছাকাহিনী ধারায় যে সাতবিবির পরিচয় লাভ করা যায়, এঁদের অস্তিত্ব লোকবিশ্বাসের অনেক গভীরে। ভারতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উল্লিখিত বিবিদের পুজো হয়।

চব্বিশ পরগণায় অসংখ্য বিবিমার থান আছে। জলাজঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বনবিবির একক থান যেমন আছে তেমনি পাঁচবিবি, সাতবিবি, নয়বিবির থানও আছে। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে বিবিমার স্তুম্ভক পূজা হয়। কোন রকম মূর্তি সেখানে থাকে না। স্তুম্ভকগুলি নির্মিত হয় সাধারণত মাটি বা সিমেন্টের বেদীর উপর। পাশাপাশি তিনটি, পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি স্তুম্ভক (স্তুম্ভক হল বড় নারকেলের মালা উপুড় করে রাখলে যেমন হয় ঠিক তেমনি আকৃতির) বেদীর উপর থাকে। যে ক্ষেত্রে মূর্তি থাকে সেখানে মূর্তিগুলি সাধারণত খানদানী মুসলিম পরিবারের কিশোরীর মত। দেবীর মাথায় তাজ, পায়ে নাগরা, দেহে নানা অলঙ্কার থাকে। কোন কোন স্থলনের শাড়ি-পরা ও মাথায় কাপড় দেওয়া মূর্তি দেখা যায়। সাতবিবির মূর্তিগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যময় কোন পার্থক্য নেই।

সাতবিবির উৎপত্তি সম্পর্কে এই অঞ্চলের লোকসমাজে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

সাতবিবির উৎপত্তি

চন্দনেশ্বর রাজার কন্যা হলেন বিমলা। রাজকন্যা বিমলা একদিন প্রমোদ উদ্যানে ঘোরাফেরা করছেন। সেইসময় সত্যনারায়ণ সত্যপীর রূপে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে এক রাজভৃত্য রাজাকে সংবাদ জানায় যে, রাজকন্যা প্রমোদ উদ্যানে নির্জনে এক মুসলমানের সাথে গল্প করছেন। রাজা ছিলেন মুসলমান বিদ্বেষী, তিনি ক্রোধে অন্ধ হয়ে তরবারি নিয়ে ছুটে গেলেন। বিমলার নিকট গিয়ে তিনি সেই মুসলমানকে দেখতে পেলেন না। যেহেতু কন্যা মুসলমানের সাথে কথা বলেছেন ও ঘুরেছেন সেইহেতু তিনি বিমলার মুখ দেখতে আর রাজী নন। তাই তরবারি কোষমুক্ত করে কন্যাকে আঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে এক মহিলা অজ্ঞান হয়ে ভূমে পড়ে যান। বিমলা কিন্তু ঠায় দাড়িয়ে আছেন। তখন রাজা আবার অসি চালনা করেন। আবার একজন ভূমে পড়ে যান। এইভাবে সাতবার সাতজন মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন রাজা চমৎকৃত হয়ে বিমলার অসাধারণত্ব বুঝতে পেরে কন্যাকেই স্তব স্তুতি করেন। তখন রাজার ইষ্টদেবতা সত্যনারায়ণ সেখানে আবির্ভূত হন। তিনি রাজাকে বলেন সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর প্রকৃতপক্ষে একই, কোন ভেদ নেই। আর তুমি যাদের আঘাত করেছ এরা আর কোন দিনও জাগবে না। এরা সাতটি স্তম্ভক আকারে থাকবে এবং এইভাবে এদের পূজা হবে। সেইথেকে এঁরা সাতবিবি নামে পরিচিতা হন। বিবিমার থানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ইটের বা মাটির বেদীর উপর সাতটি স্তম্ভক করে পূজা করতে। সব ক্ষেত্রে সাতটি থাকে না। কোথাও তিনটি, পাঁচটি, সাতটি ও কোথাও বা নয়টি থাকে। লোকবিশ্বাস, এঁরা হিন্দুর মেয়ে ছিলেন বলে এই স্তম্ভকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পূজা দেবার প্রচলন আছে।

ওলাবিবিকে নিয়েও এমনই একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেই কিংবদন্তী বা লোককথা ওলাবিবি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এই লোককথাগুলিতে যে সত্যটি প্রচ্ছন্ন আছে তা হল— হিন্দুর দেবদেবী মুসলমান আমলে পীর ও পীরাণীতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান আদরে পূজিত হচ্ছেন।

চব্বিশ পরগণায় সাতবিবি পালাগানের গায়ক অনেক। এই পালাটি কেউ কেউ সাতবিবি, নয়বিবি, ওলাবিবি, ইত্যাদি নামে গান করেন। 'সাতবিবির পালা' এই নামে গান করেন লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন, সন্তোষ মণ্ডল প্রমুখ শিল্পীগণ। বসন্তকুমার গায়েন, বলরাম জানা সাতবিবির পরিবর্তে নয়বিবি নামে গান করেন। অবশ্য প্রত্যেকের পালার মূল কাহিনী ও পরিবেশন পদ্ধতি পৃথক। রামনগরের সন্তোষ মণ্ডলের নিকট হতে সাত বিবি নামে যে পালাটি সংগৃহীত হয়েছে তাতে সাতবিবি হলেন— ১) দরবারবিবি ২) ওড়িবিবি ৩) ঝড়িবিবি, ৪) ওলাবিবি, ৫) ঈশাণবিবি ৬) ঝেটুনেবিবি ও ৭) আজগৈবিবি। এঁদের মধ্যে দরবারবিবি বড়। এই সাতজন একসাথে নামের জাহির করবার জন্য মর্ত্যে এসেছিলেন।

মর্ত্যে এসে যেভাবে নিজেদের পূজা প্রচার করেছেন সেই কাহিনীটিই সাতবিবি পালাগানের মধ্যে আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

সাতবিবির পালা

বন্দনা

অকুল পাথারে তারা তারক নিস্তারিনী — অকুল পাথারে তারা ......
এঘোর বিপদে এসমা স্থান দিওগো জননী ,,
এস এস মা দরবারবিবি এই আসরেতে এস ,,
সাত বোনেতে এসে মাগো থানে গিয়ে বস ,,
ওড়ি, ঝড়ি, ওলা ঈশান ঝেটুনে আজগৈবিবি ,,
তোমাদের নাম এই আসরে সদা মনে ভাবি ,,
আমি অতি মূঢ় মতি কি বলিতে জানি ,,
নিজগুনে মা জননী বলাবেন আপনি ,,
আমার আসর ছেড়ে যদি মা অন্য স্থানে যাও ,,
কি আর দিব ধর্মের দোহাই আমার মাথা খাও ,,

একদিন বিবিমারা সাতবোন জঙ্গলে আছেন। তাঁরা মনে মনে ভাবছেন, আমরা এখানে থাকলে আমাদের নামের জাহির হবে না। তাছাড়া আল্লাতালার নাম ঠিকমত করতে পারব না। এই কথা ভেবে তাঁরা দরবারবিবির পরামর্শ মত ঘণ্টেশ্বর রাজার কাছে এলেন এবং বিবিমাদের পূজা করতে বললেন, কিন্তু ঘণ্টেশ্বর রাজা কোন দেবীপূজা করতে নারাজ। সাতবিবি পরামর্শ করে রাজাকে অন্তত সাতবিবির একজন দরবারবিবিকে পূজা-হাজত করতে বলেন। রাজা খুব অহংকারের সাথে তাঁদের জানালেন, আমি দরবারবিবির নাম কখনো শুনিনি, তার গানহাজত আমি দিতে পারব না। এই কথা শুনে বিবিমারা আবার জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে মনে মনে ভাবছেন ঘণ্টেশ্বর রাজা যদি আমাদের পূজা বা গান- হাজত না দেন, তাহলে আমাদের নামের জাহির কোনদিনই হবে না। তাই দরবারবিবি ঘণ্টেশ্বর রাজাকে পুনরায় স্বপ্নে বললেন—সাতবিবির নামে গান-হাজত দিতে। তাতেও কোন ফল হল না। তাঁরা আবার জঙ্গলে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা এমন দৃষ্টি দিলেন তাতে রাজার সৈন্যসামন্ত লোকজনের একটি অংশ গলে জল হয়ে গেল। রাজার মন্ত্রী তখন এই দৃশ্য দেখে রাজাকে বলেন— বিবিদের দৃষ্টিতে তাঁর সৈন্যসামন্ত জল হয়ে গেছে। রাজা একথা বিশ্বাস করতে রাজী নন। তিনি মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন কিছু পাথরের মূর্তি গড়ে জঙ্গলে লাইন ধরে বসিয়ে দিতে। সেগুলি জল হয়ে যায় কিনা তা পরীক্ষা করতে চান। মন্ত্রী সেই মত করলে পর, বিবিদের দৃষ্টিতে পাথরও জল হয়ে গেল। তখন রাজা খুব চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন তিনিও বিবিদের দৃষ্টিতে পড়লে জল হয়ে যেতে পারেন। এই চিন্তা করে রাজা বিবিদের গানহাজত দিলেন, কিন্তু তাতেও রাজ্যের অরাজকতা কমল না। কারণ

বিবি-মাগণ তার আগে খুব অপমানিত হয়েছেন, সে জ্বালা তাঁরা ভুলতে পারেন নি। এবার রাজা বিবিদের ধ্যানে বসলেন। তিনি বিবিদের সম্পর্কে কিছু জানেন না, কি ভাবে ধ্যান করবেন? তাই তিনি মা! মা! বলে ডাকতে লাগলেন। তাতেও বিবিদের মান ভাঙল না।

এরপর শুরু হয়েছে ঘণ্টারাজার রানীর নানা ব্যাধি। পায়খানা ও বমি হওয়ায় তিনি একেবারে মৃত্যু-পথযাত্রী। এমন সময় সাতবিবি সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে ঘণ্টারাজাকে বলেন, দেখ রাজা, তুমি যদি আমাদের সাতবোনের নামে এখানে গানহাজত দাও ও আমাদের থাকার নির্দিষ্ট স্থান করে দাও তাহলে তোমার রানী সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন রাজার চেতনা ভাঙল। তিনি সেইখানে সাতবিবির নির্দিষ্ট স্থান করে দিয়ে সাতবিবির গানহাজত দিলেন। আর সেখানকার মাটি নিয়ে রানীমাকে মাখিয়ে দিতে রানীমা সুস্থ হয়ে উঠলেন। রাজা আনন্দিত হয়ে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনে বিবিমাদের গানহাজত দিতে থাকেন। আর সেই থেকে সাতবিবির গান-হাজত মর্ত্যে প্রচার হয়। বিবিগণ রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে যান।

অষ্টমঙ্গলা

ওগো মা ওগো মা কেমনে পার হব বল এঘোর তুফান
আমি অতি মূঢ় মতি কি বলিতে জানি — ওগো মা
কত আর গাইলাম জননী কত কত বাকী — ,,
রেখ রেখ মা জননী রেখ রাঙা পায় — ,,
যেমন দয়া করেছিলে মা ঘন্টেশ্বর রাজায় — ,,
আমার আসরে আছে যত ছোট বড় জন — ,,
পদধূলি দিয়ে মাগো করিবে পালন — ,,
যে রূপ দয়া পেয়েছিল মা ঘন্টেশ্বর রাজন — ,,
সেরূপ দয়া পায় যেন মা আমার নায়েকগণ — ,,
সংক্ষেপেতে সাতবিবির পালা সমাপণ করি — ,,
মুসলমানে বল আমির হিন্দু বল হরি — ,,

(কাহিনী সমাপ্ত)

লোকশিল্পী সন্তোষ মণ্ডল জানান, এই পালাটি লিখেছিলেন কলমুদ্দিন আউলে। তাঁকে কলমুদ্দিন গায়েন বলেও অনেকে চেনেন। তাঁর শিষ্য ইয়ার আলি ফকির, চটারপাড়ে (সীতাকুণ্ড) বাড়ি। গুরু পরম্পরায় সন্তোষবাবু পালার কাহিনী সংগ্রহ করে নিজের মত পালা বাঁধিয়ে নিয়েছেন। এই পালাটি গান করেন মন্দিরবাজার থানার বল্লভপুর গ্রামের শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন। তবে তাঁর সাতবিবির পালার সাথে মকিমপুরের বসন্তকুমার গায়েনের নয়বিবির পালার অনেক সামঞ্জস্য আছে।

সাতবিবিমার পূজাকে কেন্দ্র করে চব্বিশ পরগণার অনেক থানে বিশেষ একটি প্রথা পালিত হয়। পূজার দিন ছাড়া পৌষমাসের যেকোন একদিন বিবিমার থানে পাড়াভিত্তিক

বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। যেদিন যে পাড়ার বনভোজন থাকে সেই দিন সেই পাড়ার কোন এক মহিলা উপবাসে থাকেন এবং তিনিই রান্না করেন। সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তবেই তিনি মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন। বনভোজনের পাকান্ন সবাই বিবিমায়ের প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন। একপাড়ার লোক অন্যপাড়ার লোককে নিমন্ত্রণ করে বনভোজনের সামিল হন এমন ঘটনাও আছে। বনভোজনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, কোনরকম তেল ও মশলা ছাড়া সাদা বেগুন, আলু, ভাতের সাথে সিদ্ধ করে (ভাতে ভাত) কলাপাতা পেতে খাওয়া হয়। সাদা বেগুনের ব্যবহার বনভোজনের কুলকৌলিক প্রথা হিসাবে পালিত হয় বলে জানা যায়। বিবিমায়ের বনভোজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় মানুষের সম্প্রীতির বন্ধন খুবই দৃঢ় হয়। বারুইপুর থানার রাধাবল্লভপুর (ধোপাগাছির নিকট) গ্রামের সাতবিবিমার নামে বনভোজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের সাতবিবিমা গ্রামদেবী রূপেও মান্য হন।

পাদটীকা

১। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ওলাবিবি, পৃ: ২১৪।

বিবিপালা ঃ নয়বিবি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে নয়বিবির পালাটি অতিশয় জনপ্রিয়। পালাগান আলোচনায় নয়বিবির পালাগানটি বিবিপালার অন্তর্ভুক্ত। চব্বিশ পরগণায় বিবিমাপূজা সম্পর্কে বনবিবি ও সাতবিবি অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছি। নয়বিবি সম্পর্কে প্রধান বক্তব্য হল, এঁরা কাল্পনিক বিবি। এই অঞ্চলের লোকসমাজের বিশ্বাস, নয়বিবি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক যন্ত্রণা থেকে আর্ত মানুষকে রক্ষা করেন। তিনি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ও নিজেদের পূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে নানাভাবে ছলনার আশ্রয় নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। ওলা-ঝোলা ইত্যাদি নানা ব্যাধি তাঁর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় নয়বিবির নামের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় এঁরা নয়বোন। এঁদের নাম ওলাবিবি, ঢোলাবিবি, জহরবিবি, আজগৈবিবি, ওসলবিবি, মড়িবিবি, আসানবিবি, দড়মড়িবিবি ও কুড়ুনেবিবি। চব্বিশ পরগণার লোকসামাজে পৃথকভাবে এঁদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয় নি। নয়জনের মধ্যে দু-একজনের নামের দোহাই দিয়ে পালাগান করা হয়। তবে নয়বিবি সবসময় একসাথে থেকে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এরূপ লোকবিশ্বাসের ফলে পালাটি নয়বিবির পালা নামে গাওয়া হয়।

চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপকভাবে নয়বিবির পালা গীত হয়। বহু লোকশিল্পী পালাটি গান করেন। মোকিমপুর গ্রামের বসন্তকুমার গায়েনের নিকট হতে এই পালার লিখিত একটি রূপ সংগৃহীত হয়েছে। পালাটি আয়তনে বৃহৎ ও পালাগানের আঙ্গিকযুক্ত সম্পূর্ণ পালা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দীঘিরপাড় গ্রামের পালাগায়ক বলরাম জানার নিকট হতে নয়বিবির একটি পালা সংগৃহীত হয়েছে। পালার কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। বসন্তকুমার গায়েনের গাওয়া পালাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বন্দনা অংশ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ কাহিনীটিই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হল। উভয় শিল্পীর পালার নামকরণ একই হলেও কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। বলরাম জানার নিকট হতে প্রাপ্ত নয়বিবি পালার কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

নয়বিবির পালা

দিন দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদাতালা একদিন পৃথিবীর দিকে চেয়ে ভাবছেন, তিনি যত বান্দা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তারা সব ঝুটা অর্থাৎ কদাচারী অবিচারী হয়েছে। তাই তাদের নিঃশেষ করার জন্য তিনি তাঁর দোস্ত নূরমহম্মদকে ডেকে একটি মাটির পাত্র নিয়ে তাতে সাত সমুদ্রের পানি, কালা, সান্নিপাত ও সূর্যের কিরণ রাখলেন। সেগুলি পচিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন ওলাওঠার আজার। এটা কোনরকমভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে তাব মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই রোগ আক্রমণ করলে প্রথমে সাত সমুদ্রের পানি বেরিয়ে শরীর জলশূন্য করবে, তারপর সমস্ত তাপ বার হয়ে যাবে এবং সর্বশেষে সমস্ত শরীরে কাঁপ দিয়ে জ্বর এসে কালা হয়ে যাবে। এরই নাম হল ওলাওঠা। এই ব্যাধি নিয়ে মর্ত্যে কে যাবেন এই কথা ভাবতে ভাবতে নূরমহম্মদ-এর কপালে ঘাম এসে গেল। সেই ঘাম মাটিতে নয়ফোঁটা হয়ে পড়ে। সেই নয়ফোঁটা ঘাম থেকে নয়জন বিবির জন্ম হয়। তাঁরা খোদাতালার কাছে গিয়ে বলেন, কেন তাদের পয়দা করা হল? তখন খোদাতালা ওলাওঠার আজার, আতপচাল আর একজোলা কড়ি তাঁদের হাতে দিয়ে মর্ত্যে পাঠালেন। তখন ঐ নয়বোন মর্ত্যে এসে ছলমির বনে এক উঁচু ঢিপির উপর অবস্থান করছেন। সেখান থেকে তিনি দুনিয়ার অনাচারীকে দেখছেন। দেখলেন জরাল নামে এক বাদশার। নয়বিবির একজন বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে জরালবাদশার কাছে গিয়ে তাঁকে হাজত করার জন্য বলেন, কিন্তু বাদশা হাজত দিতে অস্বীকার করে একরকম তাড়িয়ে দিলেন। জরালবাদশার লোকজন গলা ধাক্কা দিয়ে তাঁদের বার করে দিতে তাঁরা এসে ছলমির বনে উপনীত হলেন। সেখানে এসে দেখলেন, জয়দত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। তখন তাঁরা সেই ব্যাধি বিয়ের খাদ্যের উপর ছড়িয়ে দিতে তা খেয়ে জরালরাজার রাজত্বের মানুষের অকালমৃত্যু হল। তখন জরালবাদশা বিরক্ত হয়ে দেশে যত বুড়ি আছে তাদের ধরে এনে কারাগারে রাখছেন ও চাবুক মারছেন। এই ঘটনা বিবিরা জানতে পেরে বাদশার ছেলে হজরতকে এই রোগে নিয়ে নিলেন।

বিবিরা ছলমির বনে আছেন। চারদিকে ওলাওঠায় লোক মরছে। তাই দেখে এক কাঙালিনী তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বিবিরা তাকে বাধা দিলেন। কাঙালিনী কথা বলার সময় এক বিবির মাথায় অসংখ্য চোখ দেখে পরিচয় জানতে চাইলে বিবি পরিচয় দিলেন, তিনি মড়িবিবি। মড়িবিবি কাঙালিনীকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে দিন দুনিয়ার মালিক খোদাতালা নূরমহম্মদকে ডেকে জানতে চাইলেন— সেদিন কার মৌত হবে? নূরমহম্মদ দেখলেন সেটি সেই কাঙালিনীর বেটার মৌত হবার দিন। আল্লার দূত আজরাইল ফেরেস্তা ও জেবরাইল এসে কাঙালিনীর বেটাকে নেওয়ার সুযোগ খুঁজছেন, পাচ্ছেন না। কারণ সে তার মায়ের কোলে আছে। তখন হরি ঘোষের বৌ-এর বেশ ধরে এক দূত এসে ভাড়া ভানবার জন্য তার মাকে ডেকে নিয়ে গেলে অন্য দূত কাঙালিনীর বেটাকে ওলাওঠা দিয়ে মেরে ফেলেন।

কাঙালিনী হরি ঘোষের বাড়ি থেকে কিছু খাবার নিয়ে ফিরে এসে দেখে তার পুত্র মরে আছে। করিমকাঙালও কিছু মুড়ি কোঁচড়ে করে নিয়ে এসে পুত্রের মৃত্যু দেখে কেঁদে ফেলে ও পুত্রকে কবর দেবার জন্য নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। তখন সেই নয়বিবি তাদের বাড়িতে এসে পুত্রকে দেখতে চান। তাঁরা পুত্রকে নেড়ে চেড়ে দেখছেন কিন্তু বাঁচান যাচ্ছে না। তখন আসানবিবি খোদার দরবারে গিয়ে পুত্রের প্রাণ নিয়ে এসে কঙালিনীর পুত্রকে বাঁচান। ছয় হাজার ছয় শত ছত্রিশ দিনের পথ এক নিমেষে গিয়ে ও এসে তিনি এই কাজ করেছিলেন। এদিকে কাঙাল-কাঙালিনী এই বিবিদের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে একটা মুগুর হাতে নিয়ে বসে থাকে। যদি এরা অন্য কিছু হয় তাহলে এই মুগুর দিয়ে তাদের এক এক করে মাথায় মেরে মেরে ফেলবে, কিন্তু যখন দেখে যে তাদের পুত্র বেঁচে গেছে তখন তারা লজ্জায় পড়ে যায়। তখন আসানবিবি বলেন, ওরে কাঙাল, ঐ মুগুরটি তুই বড় আশা করে কেটেছিস আমাদের মারার জন্য, এখন ঐ বাড়িটি আমারও আশা হয়েছে নেবার। ওটা আমাদের দে। আমরা ওটি আশাবাড়ি করব।

মা আসানবিবি কাঙালীর বেটাকে দানা, টাকা, পয়সা, ঘরবাড়ি, বিদ্যা দিয়ে তাকে রাজা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তার সাথে জরালবাদশার মেয়ে জহিনা খাতুনের বিয়ে দিলেন। জরালবাদশা পরে নয়বিবির মাহাত্ম্য শুনে তাদের আরাধনা করলে নয়বিবি তুষ্ট হয়ে তার রাজ্যের সমস্ত মৃত প্রজাবর্গকে বাঁচিয়ে দিলেন। তখন বাদশা তাঁকে হাজত দেবার ব্যবস্থা করলেন। ওদিকে জয়দত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ এসে বিবিদের নিয়ে যেতে চান এবং তেত্রিশকোটি দেবতার দক্ষিণপার্শ্বে রেখে তাঁদের পূজা করতে চান। জরালবাদশাও ছাড়তে নারাজ। করিমকাঙালও ছাড়তে নারাজ। তখন বিবিগণ মধ্যস্থতা করে কাঙাল-কাঙালিনীকে বলেন, তোরা জঙ্গলের মধ্যে গাছের তলায় আমার মাথায় পোকা বাছতে গিয়ে চোখ দেখেছিলিস। এখানে আমাদের নয়টা নুড়ি করে হাজত দিবি। হিন্দু ব্রাহ্মণেরাও তাঁদের পূজা দিলেন। বিবিগণ জরালবাদশাকে বললেন, অন্ততপক্ষে কোন এক ঘর মুসলমানের বাড়ি থেকে মাগুন এনে আমার গানহাজত দেবে। সোম, শুক্রবার তাঁদের হাজতের ব্যবস্থা হয়। আজান হাঁকার জন্য এক মৌলবী রাখার কথা বিবিগণ বলেন। বিবিমাগণ কোথায় যাবেন একথা শুধালে তাঁরা বলেন —

আমি কোরাণেও নেই, পুরাণেও নেই
আমি এক থাকি আমার ঘটে, আর থাকি গায়কের পেটে।

(কাহিনী সমাপ্ত)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার খ্যাতিমান পালাগায়ক বসন্তকুমার গায়েন নয়বিবি পালার যে কাহিনীটি গান করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

নয়বিবির গান

আল্লা দেলের খেয়ালে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষজন সৃষ্টি করেছেন। একদিন তাঁর মনে হল তাঁর সৃষ্টি কিভাবে চলছে তা দেখা দরকার। এই ভেবে তিনি পৃথিবীতে এলেন।

দেখেন ধরিত্রীদেবী ক্রন্দন করছেন। আল্লা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? ধরিত্রীদেবী বললেন, পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাই পাপের ভার তিনি সহ্য করতে পারছেন না। আল্লা জানতে চাইলেন, জগতে কি ধরনের পাপ কাজ হচ্ছে? তাতে ধরিত্রীদেবী জানালেন—কেউ গচ্ছিত ধন চুরি করছে, কেউ বন্ধুর ধন অপহরণ করছে, কেউ চুরি করছে, কেউ হিন্দু থেকে মুসলমান হচ্ছে, কেউ তাঁপা (তামা) ও তুলসী দিয়ে বন্ধুত্ব করে তার মর্যাদা রাখছে না, কেউ টাকা পেয়ে কোরাণ পড়ছে ইত্যাদি।

আল্লা সখি ধরিত্রীকে বিদায় দিয়ে চিন্তা করছেন, এই সৃষ্টি তিনি রাখবেন, না ধ্বংস করে দেবেন। নিজে কিছু সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে দোস্তের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন দোস্ত পরামর্শ দিলেন যে খোদাতালা, দুনিয়ার মানুষকে একবার বুঝিয়ে দেখ।

দুনিয়ার মানুষ, তোদের কপালে ঝাঁটা
কি লাগিয়া আপন পথে দিচ্ছ কাঁটা
যখন উর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে মাতৃগর্ভে ছিলে
তখন সেখানে কি কথা বলে এসেছিলে।

** ** **

চুরি প্রবঞ্চনা কতনা করিছ যাদের লাগি
যখন এ পাপ দেহ নিয়ে নরকে চুবাবে
বলতে পার কে তোদের হবে ভাগি?

আল্লা পৃথিবীর মানুষকে আরো বোঝালেন—

তোমারে করিয়া বাহির বাটী গৃহে দিবে ছড়া ঝাঁটি
স্নান করিবে পবিত্র লাগিয়া।

এইভাবে আল্লাতাল্লা নরের ইহকাল-পরকাল অনেক রকম বোঝালেন, কিন্তু মানুষ কিছুতেই বুঝতে চায় না। তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে কলেমা পড়তে থাকেন। কলেমা পড়তে পড়তে নসিব ঘেমে যায়। সেই ঘাম দেহ দিয়ে জমিনে পড়ল। তখন সেই ঘাম থেকে ভীষণ এক ব্যাধির সৃষ্টি হল। সেই ব্যাধির দুটি মুখ। একমুখে জোয়ার খেলছে, অন্যমুখে ভাঁটা টানছে। মধ্যখানে জ্বলছে আগুন। আল্লা ভাবলেন, এই ব্যাধি দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলে মানুষের নসিব ভেঙে যাবে। ব্যাধিটি তৈরি হল কালা-সন্নিপাত, অপাক-সংযোগ আর বহরের পানি এই তিন বিক্রম দিয়ে। আল্লা অনেক ভেবেচিন্তে এই ব্যাধির এক নামকরণ করলেন —

হিন্দুর হিতার্থ গেছে হইয়া বিকল
হাতে করে তামা-তুলসী আর গঙ্গাজল।
কোন কোন মুসলমান হয়েছে বেইমান
টাকা পেয়ে হাতে করে আল্লার কোরআন।
কুরাণ পুরাণ সব গেছে, বান্দা হয়েছে ঝুটা
সে কারণে পয়দা করলাম নাম রাখি ওলাউঠা।

ওলাওঠা রোগ সৃষ্টি করে আল্লা দোস্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই রোগ নিয়ে দুনিয়ায় কে যাবে? দোস্ত তখন আল্লার শত শত ফকিরকে ব্যাধি নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। এই কথা শুনে আল্লা যত ফকিরকে ডাকলেন। ফকির এলে আল্লা তাঁর আদেশ পালন করতে বলেন, কিন্তু ওলাওঠা রোগের কোন ঔষধ না থাকায় ফকিরগণ তা নিয়ে মর্ত্যে আসতে অসম্মত হলেন।

আল্লা তখন রাগভরে আবার কলেমা পড়তে থাকেন। তখন তাঁর কপাল দিয়ে নয়ফোঁটা ঘাম জমিনে পড়ে নয়জন কন্যার উৎপত্তি হল।

বসিয়া খোদা পড়িছে কলেমা
আচম্বিতে নসিবেতে হইল ঘাম
সেই ঘাম হস্ত দিয়া জমিনে ফেলিল
তাহাতে নয়বিবির পয়দা হইল।

পিতার কলেমাপড়া শেষ হলে নয়জনবিবি পিতার কাছে গেলেন ও কন্যা বলে পরিচয় দিলেন। পিতা তাঁদের পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে নয়জনের নামকরণ করলেন—১) ওলাবিবি ২) ঝোলাবিবি ৩) জহরবিবি ৪) কুড়নবিবি ৫) দড়মড়িবিবি ৬) আজগোবিবিবি ৭) ওছোলবিবি ৮) মড়িবিবি ও ৯) আসানবিবি।

এরপর পিতা কন্যাদের আদেশ করলেন, তোমাদের মর্ত্যে যেতে হবে এবং তোমাদের সাধ্যমত দুনিয়ার পাপী মানুষ ক্ষয় করতে হবে। তখন প্রত্যেক বিবি তাঁদের ক্ষমতা জাহির করে কে কত ধ্বংস করতে পারেন সে কথা বলেন। অবশেষে সন্তান কোলে নিয়ে আসানবিবি বলেন—

বাবা আমার নাম হচ্ছে আসান।
আমার নামে সব যেন হয় আশান।
আসান মা বলে যে ডাকিবে ধরায়।
দোহাই পঞ্চপীর রক্ষিবেন তায়।

নয়জন বিবি আল্লার আদেশ নিয়ে মর্ত্যে এলেন। তাঁরা প্রথমে এলেন ছলমে। সেখানে করিম-খাঁ নামে এক কাঙাল আছে। তার একটি মাত্র ছেলে, নাম সরেজ। নয়বিবিকে পাঠিয়ে দিয়ে খোদা খাতা খুলে দেখলেন এক কাঙালিনীর বেটার মউত।

এত শুনি দোস্ত তখন কেতাব পানে চায়
কেতাব পানে চেয়ে তার ছাতি ফেটে যায়।
শুন ওগো দোস্ত তবে ঘটান বিষম ঘটা।
পয়লা মউত দেখি এক কাঙালিনীর বেটা।

খোদা দোস্তকে আদেশ দিলেন কাঙালিনীর কুঁড়েতে বাজ ফেলতে। দোস্ত যমের কিঙ্করকে ডাকলেন, কিঙ্কর আগুনের ঘোড়া নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পরদিন প্রভাত হলে কাঙাল জন খাটতে গেল, কাঙালিনী সরেজকে নিয়ে বাড়ি রইল। বেলা হলে কাঙালিনী বলছে,

সরেজ, তুই এখন থাক, আমাকে ভাড়া ভানতে যেতে হবে। সরেজ মাকে যেতে দিতে চায় না। তার মনে ভয় জেগেছে। মা বিশ্বাস করে না। তবুও ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে থাকে। তখন সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে হরি ঘোষের বউয়ের ছদ্মবেশে যমের কিঙ্কর এসে কাঙালিনীকে ডেকে নিয়ে যায়। সরেজ মাকে ছাড়তে না চাওয়ায় মা গালাগাল দিয়ে বলে—

শোনরে অবোধ ট্যাঁটা ছেলে হয়ে পরিপাটি
আজ যদি না মরিস ধানভেনে এসে তোর বুকে দিব
তিন কোদালের মাটি। যা বেটা যমের বাড়ি যা।

এই বলে কাঙালিনী গালাগাল করে ঘোষের বাড়ি গেল। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারল ঘোষ গিন্নী তাকে ডাকে নি। অবশেষে কিছু চাল-খুদ নিয়ে বাড়ি এসে দেখে সরেজ ধুলায় পড়ে আছে। তখন মা ভাবল, ক্ষিধেয় বোধ হয় তার এই অবস্থা। কারণ আগের দিন কিছু খেতে দিতে পারেনি। মা রান্না করে ছেলেকে ডাকতে গিয়ে বুঝতে পারল ছেলে আর বেঁচে নেই।

সন্তানের মৃত্যুসংবাদ স্বামীকে শোনালে যদি কাঙাল একমাত্র পুত্রের শোক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে তাই তাকে বলবে না বলে ঠিক করে, কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারে না। কাঙাল কাজ করতে গিয়ে কিছু জলপানি স্বরূপ মুড়ি পেয়েছিল সেগুলি পুত্রের জন্য এনেছে। পুত্রকে আগে খাইয়ে সে নিজে খেতে চায়। হায়! কাঙালিনী পুত্রের মৃত্যুসংবাদ আর চেপে রাখতে পারল না। কাঙাল এই দুঃসংবাদ শুনে একেবারে ভেঙে পড়ল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ছেলের কবর দেওয়ার চিন্তা করে।

এমন সময় নয়বিবি সেই কুঁজির দিকে যাচ্ছিলেন। কাঙাল তাঁদের দেখে নিশ্চিন্ত হল এবং কাঙালিনীকে বলল ঐ নয়জন আর আমরা দুজন মিলে বেটাকে কবর দেব। এই বলা কওয়া করছে, এমন সময় নয়বিবি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। বিবিরা যেতে কাঙাল কাঙালিনীর মৃতপুত্রের কথা জানতে পেরে তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার চিন্তা করলেন। তখন নয়বিবি কাঙাল ও কাঙালিনীকে পাকান কুঁড়ের(?) মধ্যে বসতে দিয়ে অপেক্ষা করছে আর ভাবছে ওরা নয়জন ডাকিনী নয় তো। তখন তারা তাদের ডাকিনী ভেবে মুগুর দিয়ে মেরে, মেরে ফেলতে ষড়যন্ত্র করল। অন্তর্যামিনী নয়বিবি তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেও ক্ষমা করলেন।

বিবি কলেমা পড়ে সরেজকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে কিছুই হল না। তখন আসানবিবি নিজেই সরেজকে কোলে তুলে নিয়ে বসে পড়লেন। যমের কিঙ্কর এসে সরেজকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আসানবিবির কোল থেকে নিতে পারল না। জোর করে নিতে গেলে আসানদেবী মুখব্যাদান করেন ও সেই মুখ থেকে আগুন ঝলকে ঝলকে বার হতে থাকে। তখন যম কিঙ্কর মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে খোদার কাছে চলে যায়। তারপর খোদার ডাকে আসানবিবি খোদার নিকট গেলে আসানবিবির ব্যবহারে প্রীত হয়ে সরেজকে প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। খোদা তাকে ছয় কুড়ি ছয় বৎসর আয়ু দিলেন। সরেজ প্রাণ ফিরে পেয়েছে দেখে নয়বিবি ও কাঙাল-কাঙালিনী অতিশয় খুশি হল।

সরেজ প্রাণ ফিরে পেলে আসানবিবি তাকে বর দিতে চাইলে সরেজ মায়ের কাছ থেকে প্রচুর ধন, গৃহাদি ও বিদ্যালাভ করে। অবশেষে রাজকন্যার সাথে বিয়ের বাসনা তাও পূরণ করেন। সেই দেশের রাজকন্যা শিলামতির সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর কাঙাল-কাঙালিনী সরেজ ও শিলামতি মায়ের নামে গানহাজত দিল। এরপর আছে অষ্টমঙ্গলা।

(কাহিনী সমাপ্ত)

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক বিশিষ্ট পালাগান হিসাবে নয়বিবির লোকায়ত পালাগানটি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়। নয়বিবির পালায় নয়বিবির নামের উল্লেখ থাকলেও মুখ্যত আসানবিবির নাম-মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। এই নিরিখে বিচার করলে নয়বিবির পালাকে আসানবিবির পালা বলা যায়। যেহেতু পালাগায়কগণ নয়বিবি নামে পালাটি গান করেন সেই কারণে পালাটি নয়বিবি নামেই উৎকলিত হয়েছে। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে নয়বিবির পালা বিবিমা পূজা ও পূজা সংক্রান্ত নানা সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে গীত হয়। গৃহস্থগণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এককভাবে মানত অনুযায়ী এই পালাগানের আয়োজন করেন, আবার পাড়া বা গ্রাম ভিত্তিক সাধারণী থানে নয়বিবির লোকায়ত পালাগানের আসর বসে। লোকশিল্পীগণ সাধারণ পোশাকে চামর হাতে নিয়ে আসরে নয়বিবির পালাগান করেন।

বিবিপালা ঃ আওরজবিবি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানগুলির মধ্যে বিশিষ্ট পালাগান হল আওরজবিবির পালাগান। পালাগান আলোচনায় আওরজবিবির পালা বিবিপালার অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য বিবিপালার মত আওরজবিবির পালাগান চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে জনপ্রিয়। এই পালাটিকে অনেকে রঞ্জাবিবির পালা বা একুশবিবির পালা বলেন। পালাগায়কগণ আসরে অন্যান্য বিবিপালা গান করার সময় এই পালাটি গান করেন। আওরজবিবির পালায় আওরজবিবির যে-পরিচয় পাঠ করা যায় তাতে বিবিকে অন্যান্য বিবি অপেক্ষা মাহাত্ম্যগত বৈশিষ্ট্যে কিঞ্চিৎ পৃথকভাবে দেখা যায়। যেমন বনবিবি বনের বিবি বা অরণ্য দেবী, ওলাবিবি-ওলাওঠা রোগেরদেবী, আসানবিবি যেকোন রোগ যন্ত্রণা থেকে আসান অর্থাৎ মুক্তিদাত্রী দেবী, দরবারবিবি ওলা ঝোলা, টান, টংকার ও কালা রোগের দেবী, কিন্তু আওরজবিবি হলেন সন্তানদাত্রী দেবী। তাঁর অধীনে ভেদ-বমি প্রভৃতি মারাত্মক রোগ আছে। এই রোগের দ্বারা তিনি বেইমানকে শায়েস্তা করেন, কিন্তু পালাগানে আওরজবিবিকে কখনোও নির্মম বলে মনে হয় নি। মধ্যযুগের মঙ্গলদেবীর এবং অনেক বিবিমাদের হিংস্রতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি অযাচিতভাবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে উদ্যোগী হন। বেইমানকে শাস্তি দিতে তিনি তাঁর অনুগত রোগসমূহকে আদেশ করেন বটে, কিন্তু অপরাধী ভুল স্বীকার করলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন ও সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দেন।

চব্বিশ পরগণায় বিবিমার বহু থান আছে, কিন্তু বনবিবি ছাড়া অন্য কোন বিবির পৃথক থান দৃষ্ট হয় না। আওরজবিবির নির্দিষ্ট কোন থান বা মূর্তি নেই' সাতবিবি বা নয়বিবির থানে আওরজবিবিকে কল্পনা করে হাজত দেওয়া হয়। সন্তানহীনাগণ বিবিমার থানে আওরজবিবির নামে 'শপাঁচআনা' অথবা পাঁচসিকি মুদো বেঁধে মানত করেন। কেউ বিবিমার থান সংলগ্ন গাছের ডালে ঢিল বেঁধে মানত করেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে ঐ নির্দিষ্ট থানে গানহাজত দেন। কেউ বিবিমার ছলন দিয়েও হাজত পূজা দেন। বিবির যেসমস্ত

ছলন নির্মিত হয় তা সম্রান্ত মুসলমান নারীর মত পোশাক পরিহিত ও অলঙ্কার সজ্জিত। আওরজবিবির কোন বাহন থাকে না। বিবির দুই হাত, হাতে কোন প্রহরণাদি নেই । শিল্পী তাঁর ইচ্ছামত বিবির হাত বিভিন্ন মুদ্রায় স্থাপন করেন। বৎসরের যেকোন মাসে চন্দ্রপক্ষে পূজার ব্যবস্থা হয়। পৃথকভাবে আওরজবিবির পূজার ব্যবস্থা হয় না। দেশপালা বিবিমাপূজার দিন তাঁর পূজা হয়। আওরজবিবির নিকট যাঁরা মানত করে ফল পান তাঁরা গলায় কুটো বেঁধে পাঁচগ্রাম বা সাতগ্রাম মেঙে সংগৃহীত চাল-পয়সায় বাতাসা- সন্দেশ কিনে অনাহারে থেকে দেবীর হাজত দেন। হাজত অন্তে ব্রতিনী দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করে ব্রতভঙ্গ করেন। আওরজবিবির নিকট মানত করে যাঁরা সন্তানাদি লাভ করেছেন তাঁরা আওরজবিবির ছলন দিয়ে পূজা- হাজতের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া যেকোন মনস্কামনা পূর্ণ হলে বিবির গানহাজত পূজা ইত্যাদি দেওয়া হয়। পালাগায়কদের নিকট হতে জানা যায় হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মানুষ আওরজবিবির নামে গানহাজত দিলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ব্যাপারে আগ্রহ বেশি।

আওরজবিবি প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক বিবি। 'আওরৎ' কথা থেকে ভাষান্তরে আওরজ শব্দের উৎপত্তি। আওরত বা আউরৎ আরবী শব্দ, যার অর্থ নারী বা প্রাচীন বাংলা ভাষায় মুসলমানী। কাহিনী অংশে হামামবাদশার একুশজন নারী বা স্ত্রীর কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে। কনিষ্ঠা স্ত্রী রঞ্জাবিবির মাতৃত্বলাভ ও মাতৃত্বের স্বীকৃতি ব্যাপারে যিনি আশীর্বাদ বা কৃপা করেছিলেন তিনি আওরজবিবি। চব্বিশ পরগণায় কাল্পনিক বিবিগণের নাম নেই। আছে শুধু মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পরিচিতি। যেমন বনের বিবি বনবিবি, ওলাওঠা রোগের নিয়ন্ত্রণকারিণী বিবি ওলাবিবি, তেমনি আওরতের বা নারীত্বের সার্থকতা রক্ষাকারী বিবি হলেন আওরজবিবি। এঁর কোন ঐতিহাসিকতা নেই। এই বিবি চব্বিশ পরগণার লোকবিশ্বাসজাত কাল্পনিক বিবি, যাঁর পরিচয় কেবল এই অঞ্চলের পালাগানেই পাঠ করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে আওরজবিবি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মিশ্র সংস্কৃতির দেবী, যিনি দেবী ষষ্ঠীর সাথে তুলনীয়া। দেবী ষষ্ঠীর সন্তানদাত্রী ও সন্তান রক্ষাকর্ত্রীর গুণ আওরজবিবির মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের মুসলিম বিজয়ের সময় দলে দলে হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। নব্য মুসলিম সমাজে এই দেবীর অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। মানুষের ধর্ম পরিবর্তন সহজে হতে পারে কিন্তু কুলকৌলিক প্রথা বা সংস্কার সহজে পরিবর্তন হয় না। সুতরাং হিন্দুদিগের পূজ্যা সন্তানদাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী দেবী ষষ্ঠীর পূজাচারগত সংস্কার পরিবর্তিত হয়ে নব্য মুসলিমদিগের মধ্যে মধ্যযুগে আওরজবিবির গানহাজতে রূপান্তরিত হয়েছে, বলে অনুমান করা যায়।

আওরজবিবির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান চব্বিশ পরগণায় খুবই জনপ্রিয়। আওরজবিবি চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লৌকিক দেবী। এই বিবিসংক্রান্ত সংস্কার সুন্দরবন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এখনও সেই ধারা সমান আদরে এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রতিপালিত হয়। আওরজবিবির পালাগানের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির

সমন্বয় লক্ষ্য কবার মত। মূল কেচ্ছাটিতে আওরজবিবির নামে কোন হিন্দু দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে বলে মনে হয়। গঙ্গাজলে ঔষধ বেটে খাওয়া, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়া, বহুবিবাহ প্রথা, মনের দুঃখে বনে গমন প্রভৃতি এই সমস্ত হিন্দু কালচার এই কাহিনী অংশে আছে। কাহিনীতে কেবল নামগুলি পালটে হিন্দু-ঘেঁষা নামকরণ করলেই পালাটি এই অঞ্চলেব হিন্দুদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য পালাটি চব্বিশ পরগণার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলেই বেশি গীত হয়ে থাকে। এ গানের শ্রোতা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও সংখ্যাধিক্যে হিন্দু। আচার-আচরণগত যে উৎসাহ তা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়।

চব্বিশ পরগণায় আওরজবিবির লোকায়ত পালাগানের শিল্পী বেশি দৃষ্ট হয় না। আওরজবিবির পালাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গায়েন সুদিন মণ্ডলের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। একমাত্র তিনিই পালাটি এ অঞ্চলে গান করেন বলে জানা যায়। তিনি খুব দৃঢ়তার সাথে বলেন এ পালা তাঁর স্বপ্নে পাওয়া। সুদিন গায়েন এ পালাটি অন্যান্য বিবিপালা গান করার সময় গেয়ে থাকেন। তবে শ্রোতাদের অনুরোধে অন্য বিবিপালার সাথে আসরে আওরজবিবির পালাটি গান করেন।

আওরজবিবির পালাকে একুশবিবির পালা বলা হয়, কিন্তু হামাম বাদশার একুশ জন বিবির নামকরণ এই পালায় নেই। এই নাম পালাগায়ক সুদিন মণ্ডল আলাদাভাবে জানিয়েছেন। নামগুলি নিম্নরূপ—

১)	সুখ্যান	২)	সুনীতি	৩)	সুবালা
৪)	সবজান	৫)	সুবরজান	৬)	সায়রা
৭)	সাকিনা	৮)	সাবেরি	৯)	সুরোমা
১০)	মেহেরা	১১)	মেহেদি	১২)	মনুজা
১৩)	মারিয়া	১৪)	মসিনা	১৫)	মায়া
১৬)	মন্তুজা	১৭)	রাবেয়া	১৮)	রোহিনা
১৯)	রমা	২০)	সবেয়ান	২১)	রঞ্জাবিবি।

একুশ জন বিবির কেউই মাহাত্ম্য প্রচারকারী বিবি নন। নামগুলি সম্ভবত কাল্পনিক। চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে আওরজবিবির একটিমাত্র লোকায়ত পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। পালাটি নিম্নে সম্পূর্ণ উৎকলিত হল।

আওরজবিবির পালাগান

নিরঞ্জন নির্বিকার শ্রীরূপ জপে যার
দয়াময় দয়ার সাগর গো আল্লা।
আল্লার কদরূদ বাণী কি বর্ণিতে পারি আমি
কিবা আছে ক্ষমতা আমার।।

আসমান জমিন উহার　　　　　করে উজ্জ্বল অন্ধকার
লক্ষ লক্ষ রবি শশী তারা।
বান্দারে রফার তরে　　　　　আপনি যে পয়দা করে
সৌর পাঠিয়ে দিলে এ দুনিয়া।।
নাহি অস্ত নাহি উদয়　　　　　নাহি তার কোন কায়
সৃষ্টি লয় হয় নিমেষে আঁখির।
বন্দি তোমায় বিবিমাতা　　　　　শ্রীদুর্গা ধাত্রী ধাতা
কৃপা কর এ দীন বান্দাব।।
তুমি না হইলে সদয়　　　　　কেমনে রইব ধরায়
কৃপা কর তব গুণা গাই।
পূর্ব দোস্ত বহাল কর　　　　　কৃপাকর মোর পর
এই আসরে তোমায় সালাম জানাই।।

কথা ।। ছোট বুবুকে ডেকে মা আমার কহিতে লাগিল— কোনখানে গেলে নামের জাহির হবে বল? আল্লা মোদের পয়দা কোরে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমাদের যে কি গুণ আছে তা তো জাহির করা হলো না।

দোহার : তোমার কি গুণ আছে বলনা দিদি ?

গায়ক : শুনবি আমার কি গুণ আছে ? শোন তবে—

গীত।। কী করিতে পারি আমি কি গুণ আছে শোনরে আমার
আমি যদি নির্দয় হই তার যেতে হবে যমের দুয়ার।
শত বৎসর আয়ু যার নিমেষে ক্ষয় করতে পারি
শুকাইয়া সাগর বারি সেথা পাহাড় দিতে পারি।
সন্তানহীনের দিয়ে সন্তান বাড়াতে পারি মানীর মান
গরীবকে করে ধনবান, দিতে পারি সিংহাসন।

গায়ক : শুনলি আমার কি গুণ আছে ?

দোহার : শুনলাম তো, তোমার যে এতগুণ আছে তা জানা ছিল না।

গা : তাহলে আমার সঙ্গে চল।

দো : যাবে তো, কিন্তু কেমন বেশে যাবে?

গা : শোন তবে কেমন বেশে যাব। তুই আমি দুই বোন ফকির সাজব আর আল্লার নামে ফকিরী করব। দুনিয়াতে যাব, সবার মন পরীক্ষা করব ও নামের জাহির করব।

দো : সে কি গো, মেয়েছেলে হয়ে ফকির সাজব কি?

গা : ফকির না সাজলে নামের জাহির হবে কেন ? শুধু ফকির নয় পুরুষ সাজব।

দো : পুরুষ সাজবে তাহলে দাড়ি কোথায় পাবে?

গা : মায়ার দাড়ি তৈরি করব। আমি ফকির সাজলে আমার দেখে তুইও সাজবি।

দো : বেশ তুমি সাজ।

কথা ।। এইবার মা ফকির সাজছেন। শাড়ি খুলে লুঙ্গি পরেছেন, গায়ের অলঙ্কার যত ছিল সব ঝুলিপূরে নিয়েছেন। এইভাবে দুইজন ফকির সেজে আশাবাড়ি আর চামর নিয়ে চলেছেন। হেনকালে মা আমার বললেন—

গা : ঝোলারে, সামনে যে পাকাবাড়িটা দেখা যাচ্ছে বাড়িটা হামাম বাদশার। জাতে মুসলমান। এইখানথেকে বল দেখি, ও বাবা তোমরা কেউ আছ? দয়া করে কিছু ভিক্ষা দাওনা বাবা।

দো : বলতে হয় তুমি বল। আমি মা-বাবা বলে ভিক্ষা করতে পারব না।

গা : তাহলে নামের জাহির হবে কি করে?

দো : কেন ? কিছু ব্যাধি পাঠিয়ে দাওনা, তখনই বুঝতে পারবে তুমি-আমি কে ?

গা : পরীক্ষা করতে গেলে যা ইচ্ছা করতে হবে তাই বলে ?

দো : তবে তুমি যাও। আমি পারব না।

গা : বেশ, আমি যাচ্ছি। বলি ও বাবা, তোমরা কেউ বাড়িতে আছ? দয়া করে কিছু ভিক্ষা দাওনা বাবা। আমরা ফকির। আল্লার দোয়ায় দ্বারে এসেছি।

দো: তোমরা ভিক্ষা নেবে? আজ পর্যন্ত কোন অতিথি ফকির আমার হাতে ভিক্ষা নেয়নি, আর তোমরা নেবে? আমি নিঃসন্তান!

গা : আরে তোহবা তোহবা, আঁটকুড়া রাজার মুখ দেখে আজ দিনটা বিফলে যাবে। আল্লা, আল্লা, আজ ফজবে আঁটকুড়া রাজার বাড়িতে পাঠালে। আজ আমাদের অন্ন হবে না।

দো : তোমরা ভিক্ষা নেবে না ?

গা : ভিক্ষা নেওয়া দূরে থাক, তোমার মুখ দেখে যে মহাপাপ হয়েছে। এতে আমাকে দোজখে যেতে হবে।

খিলেন ।। এই বলে দুই বোন তখন বিদায় হইল
কি অভাগা জন্মেছিলাম ফকির বিমুখ হল।
ওরে ও তুই ডাকরে আল্লা রসুল বলে। আরে ও তুই ডাক তাঁরে।

গা : বাদশা ভাবছে বৃথা ভবে জন্ম নিলাম। দানেতে দুর্গতি খণ্ডন হয় কিন্তু আমি এমন অভাগা জন্মালাম, আমার হাত থেকে কেউ ভিক্ষা নেয় না। আমার বৃথা এ মানব জীবন।

খিলেন ।। আমি রাখব না এ পাপ জীবন, বেঁচে কি বা ফল। আমি যাব রে জঙ্গল। আরে ও তুই ডাক তাঁরে।

কথা।। বাদশা ভাবছেন, এমন সময় বাদশার মেজবিবি বলছেন-বড়দি, সুখ্যান, সবজান-দেখ, নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ রাজ্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, টাকা পয়সা নয়। নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বামী। যাঁর স্বামী নেই, দুনিয়াতে তাঁর কেউ নেই। আমাদের বাদশা ছাড়া আর কে আছে বল! বাদশার মন খারাপ কেন বল তো?

দো : আরে ওর পোড়া মন সব সময় শুকিয়ে আছে।

গা : ছিঃ ছিঃ, স্বামীকে ছোটবড় কথা বলতে নেই। বললে পাপ হয়।

দো : হয় হোক, এমন পোড়াকপাল আমাদের, কারোর একটা সন্তানাদি হল না।

গা : আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, বলি হ্যাঁগা বাদশা, তোমার মন খারাপ কেন?

দো : আজ আমি মরব, এ পাপ জীবন আমি রাখব না। এতগুলো বিবি আমার, কারোর একটা সন্তানাদি হল না।

গা : কত লোকের সন্তানাদি হয় নি, তোমার মত কে কোথায় দুবেলা মরবো মববো করছে?

দো : ওরে, ও যায় যাক। মরে মরুক।

কথা ।। বাদশা ভাবছেন— গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, আত্মহত্যা এ পাপের না হয় খণ্ডন। এ জনমে যদি আত্মহত্যা করি পর জন্মে না জানি কি হবে? এদিকে অন্তর্যামী মা জানতে পেরে বলছেন ঝোলারে, ঐ দেখ, যে বাদশার হাত থেকে ভিক্ষা নিলাম না সে মনের দুঃখে জঙ্গলে মরতে চলেছে। ওকে মরতে দেওযা হবে না। তাড়াতাড়ি ফকির সাজ।

গীত ।। ফকির সেজে দুইবোন তখনি চলিল রে
কেঁদে কেঁদে বাদশা যে পথেতে যায় রে
ফকিব সেজে দুইবোন সে পথেতে ধায় রে।

গা : কারা তোমরা? জঙ্গলের মধ্যে কেন?

দো : আমরা ফকির, তুমি গভীর জঙ্গলে এসেছ কেন সেই কথা বল।

গা : আমি বড় দুঃখী, সেই দুঃখের জ্বালায় এই জঙ্গলে মরতে এসেছি।

দো : এমন কি দুঃখ তোমার?

গীত ।। কি কব তোমাদের কাছে আমার দুঃখের বিববণ
সাত মুল্লুকের বাদশা আমি মরতে যাচ্ছি অকালমরণ।

দো : তুমি যদি সাতমুল্লুকের বাদশা, কি অভাবে মরতে চলেছ?

গীত ।। অভাব কিছু নাই কো আমার বলি গো তোমায়
পুত্রসন্তান নেই আমার এই দুঃখের কারণ
বিবি আমার হয় একুশজন, দুঃখের কথা বলি এখন
বর্তমান থাকতে সবাই, পুত্রের মুখ দেখিনা কখন।

গা : শুনলে ফকির সাহেব আমার কথা? এইবার আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। মৃত্যু ছাড়া আর আমার কোন উপায় নাই।

দো : আর তোমাব মরতে হবে না। আমাদের কথামত কাজ কর, তোমায় মরতে হবে না।

গা : বেশ, তোমরা যা বলবে আমি তাই করব। যদি বল সারাজীবন জঙ্গলে কাটাতে হবে আমি তাই কাটাব ভাই।

দো : তাহলে আমার কথা শোন। ঐ যে আশাবাড়িটা আছে, ঐ বাড়িটা নিয়ে ঐ যে আমগাছটা আছে, ঐ গাছে মার, মারলে একটা আম পড়বে।

গা : অসম্ভব। শুকনো আমগাছে ঘা মারলে পাতা ছাড়া আর কিছুই পড়তে পারে না।

দো : নিশ্চই পড়বে। ঐ বাড়িটার নাম আশাবাড়ি, ঐ বাড়ি লক্ষ্য করে যে যা চায় বা আশা করে, তার সেই আশা পূর্ণ করে।

গা : বেশ, আমি পরীক্ষা করবো। দেখি শুকনো গাছে আম পড়ে কি করে?

খিলেন ।। এই বলে বাদশা আশাবাড়ি নিয়ে আম বৃক্ষ লক্ষ্য করে তখনি ছুড়িল (আরে ও তুই ডাক তাঁরে)।

দো : কি হলো, আম পড়েছে ?

গা : আশ্চর্য! শুকনো গাছে পাকা আম পড়লো!

দো : ঐ আমটি নিয়ে বাড়িতে যাও, তোমার যে একুশজন বিবি আছে, সবাইকে সমান ভাগ করে খেতে বলবে। খেলে প্রত্যেকের একটা করে ছেলে হবে। গঙ্গার পানি দিয়ে বিবিমার নাম করে খাওয়াবে।

খিলেন ।।
বাদশা তখন আম নিয়ে আনন্দিত হল রে
আনন্দিত হয়ে বাদশা চলে দ্রুতগতি রে
আম নিয়ে বাদশা তখন বাড়িতে ফিরিল রে
আম নিয়ে বাদশা তখন ভাবে উভরায় রে
মরার জন্য বনে গেলাম কেমনে মুখ দেখাই রে।

কথা।। যাহোক মৃত্যু তো হলো না, ফিরে এসেছি যখন একবার ডেকেই দেখি। এইরূপ সাত- পাঁচ ভাবছে এমন সময় সেঁজ বিবি বলছে বড়দি, মেজদি, ঐ দেখ বাদশা মরতে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে। মরতে গিয়ে ফিরে এসেছে যখন আমরা কেউ কথা বলব না। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁগা বাদশা, মরতে গিয়ে ফিরে এলে কেন?

দো : মরণ আমার হল না। তার কারণ দুজন ফকিরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হাতে একটি আশাবাড়ি ছিল। বলল এই বাড়ি দিয়ে ঐ আমগাছে মার। শুকনো গাছে আশাবাড়ি দিয়ে মারতেই একটা আম পড়লো।

গা : কই আমটা দেখাও দেখি। বা ! কি সুন্দর!

দো : আরো শোন, ফকির সাহেব আমায় বলল, এই আম খাওয়াবে তোমার একুশজন বিবিকে। প্রত্যেকে খেলে সন্তান হবে।

গা : এই বয়সে কত ফকিরের ওষুধ খেলাম, সন্তান হলো না, আম খেলে সন্তান হবে?

দো : বিশ্বাস কর সন্তান হবে। গঙ্গাপানি দিয়ে বেটে বিবিমার নাম করে খেতে হবে।

গা : ওরে, আয় সব, খাওয়া হোক।

দো : খাওয়া তো হবে, গঙ্গাপানি কোথায়? আমাদের বাড়িতে গাঙ্গাপানি বা থাকবে কেন?

দো : এক কাজ কর, ছোটবিবিকে বল, গঙ্গার ঘাটে থেকে পানি আনুক।

দো : ঠিক বলেছিস, ও ছোটবিবি, ছোটবিবি গো, এই দেখ, বাদশা মরতে গিয়ে ওষুধ এনেছে। খেলে সবার সন্তান হবে। নিয়ম আছে, গঙ্গাপানি দিয়ে খেতে হবে। তুই একটু গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পানি আন।

গা : ছিঃ ছিঃ, এতদূর গঙ্গার ঘাটে আমি যাব, লোকে কি বলবে!

গীত ।। যাবনা যাবনা ঘাটে ওগো মেজদিদি
তোরা থাকতে আমি যাব একি তোদের নীতি
যাই যদি সেই গঙ্গার ঘাটে, পাড়ার লোকে নিন্দে করে
আমি শুনে মরব লাজে, তোদের হবে কি ক্ষতি।

খিলেন ।। পাত্র নিয়ে ছোটবিবি বাড়ির বাহির হল।
বামপদে বিবি তখন দ্রুত হেঁটে গেল।

গা : দিদি, পাত্র নিয়ে বেরুবার সময় বামপায়ে হোঁচট লেগেছে, গেলে অমঙ্গল হবে।

দো : না রে না, তোর চলবাব দোষে হোঁচট লেগেছে, এতে অমঙ্গল নয়, মঙ্গল হবে।

গো : তোরা বয়সে বড়, তোরা যখন বলছিস তাহলে মঙ্গলই হবে।

পয়ার ।। ধীরে ধীরে ছোটবিবি তখনি চলিল।
গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তখন উপনীত হল।।
কেঁদে কেঁদে ছোটবিবি ঘাটেতে চলিল।
হেনকালে কুড়ি জনে কহিতে লাগিল।।

দো : বড়দিদি, ছোটবিবি পানি আনতে গেল। ওকে ঔষধ দেওয়া হবে না। ওর সন্তান হলে আমাদের উপায় কি হবে জানিস? ও তো বাদশার পেয়ারের বিবি। আয়, আমরা সবাই খেয়ে নিই। কলসীর বাসি পানি দিয়ে খাওয়া হবে। আমি এনে দিচ্ছি, তোরা বাট। নে, সবাই খা আর এক কাজ কর, শিলটা এখানে ফেলে রাখ, আমি যা বলব, সবাই সেই কথা বলবি।

গা : আমি পানি নিতে এসেছি। সবাই সন্তানের মা হবে—এই বলে ছোটবিবি ঘাটেতে নামিল। শূন্য হতে মা তখন কহিতে লাগিল।

গীত ।। যাও যাও ছোটবিবি যাও গো ফিরে ঘরে
তোর কুড়ি সতীন যুক্তি করেছে ফাঁকি দিবে তোরে
গৃহকর্মে রত থেকো স্বামীপদে মতি রেখো
বিপদ কালে বিবিমা বলে ডেকোগো অন্তরে।

গা : মাগো, তোমার কথা মত চলব মা স্বামী মন, স্বামী প্রাণ, স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী ছাড়া কিছুই জানি না, জানতে যেন না হয়।

খিলেন ।। পানি নিয়ে ছোটবিবি গৃহেতে ফিরিল
হেনকালে সবাই মিলে কহিতে লাগিল।

গা : দিদি আমি পানি এনেছি।

দো : কখন গেছিস! আজকাল তো যাসনি! তোর বিলম্ব দেখে আমরা কলসীর বাসি পানি নিয়ে ওষুধ খেয়েছি।

গা : আমার জন্য রাখিস নি?

দো : এ মা! তোর ফেলে খেতে পারি? ঐ শিলের উপর একতাল রেখেছি খা।

গা : কই ? দেনা দিদি।

দো : ঐ যা, কতকগুলো পোড়ার মুখো কাক এসে নিয়ে গেল।

গা : কাক ওষুধ নিয়ে গেল ? আমি বুঝতে পেরেছি, তোরা আমার ফাঁকি দিয়েছিস।

দো : বিশ্বাস কর, আমরা সত্যি কথাই বলছি।

গা : তোদের প্রত্যেকের সন্তান হবে, আমার হবে না ? আমি এই শিলটা ধুয়ে খাব।

দো : না, কুকুরে চেটেছে, খাসনি।

খিলেন।। কেঁদে কেঁদে ছোটবিবি শিল পাশে যায়
বিবিমায়ের নামে তখন শিল ধুয়ে খায়।

গা : কোথায় দয়ার বিবিমা, তুমি বলেছিলে বিপদে পড়লে আমার নাম স্মরণ করবি। মাগো, প্রত্যেকের সন্তান হবে, আমার সন্তান হবে না, আমার ফাঁকি দিয়েছে মা।

কথা।। এইরূপে ছোটবিবি কাঁদতে লাগল। শূন্য হতে মা তখন এই কথা বলল।

গীত ।। আর কাঁদিস না রে রঞ্জারানী পড়লো ফাঁদে কুড়িরানী,
কাঁটা দিলে পরের তরে, ফোটে কাঁটা নিজের পায়ে
গর্ভের কাঁটা বিষম কাঁটা, অচল হবে চরণ দুখানি।

গা : আওরজবিবির দোয়ায় সেই দিন হতে ছোটবিবির গর্ভে সন্তান জন্ম নিল।

পয়ার ।। ভাবিতে ভাবিতে জীবন গেল রে।
একমনে একধ্যানে শিল ধুয়ে খেয়েছিল রে।।
দয়াময়ীর দয়ায় তখন গর্ভে সন্তান এল রে।
হেনকালে সবাই মিলে কহিতে লাগিল রে।।

দো : ঔষধ খেলাম প্রায় পাঁচ ছয় মাস হল, কার কি মনে হয় বল দেখি দিদিরা।

দো : ওরে কিছুই হবে না, পোড়া মন, পোড়া কপাল। আম খেলে সন্তান হবে?

দো : ছোটবিবি সামনে আসে না, পাশ কাটিয়ে চলে, ওরে ডাক তো, জিজ্ঞাসা করি।

২য় দো : আচ্ছা, আমি ডাকছি। ও ছোটবিবি, ছোট বিবি গো—

গা : কেন দিদি, কি হয়েছে?

দো : এই দেখ, ঔষধ তো সবাই খেলাম, তোর কি মনে হয়? বল দেখি।

গা : কেন দিদি, তোরা তো খেয়েছিস, আমার তো ফাঁকি দিয়েছিস।

দো : না রে না, তুই তো শিল ধুয়ে খেয়েছিস, তোরই সন্তান হবে।

গা : মায়ের দোয়ায় আমার গর্ভে সন্তান এসেছে।

দো : আহা! কত আনন্দের কথা! আমরা কোলে করে নাচবো রে।

২য় দো : ওর সন্তান হলে চোখে দেখবি কি করে, ছোটবিবি তখন বাদশার প্যায়ারের হবে। তার থেকে ছেলে হোক, আর মেয়ে হোক, আমার কাছে দিবি। গলায় পা তুলে দে শেষ করে দেব।

গা : কি বললি দিদি?

দো : না না, তোর ছেলে হলে গলায় হার করে রাখব। মাটিতে ফেলব না।

২য় দো : তার থেকে ঐ সতীনকে শেষ করি আয়।

দো : না, ধরা পড়ে যাবি, ছেলেটাই শেষ করা হবে।

কথা।। এইভাবে সবাই মিলে যুক্তি করেছিল। পরদিন বাদশাকে ডেকে ছোটবিবি বলতে লাগল—দেখ প্রভু, যতদিন আমার সন্তানসন্ততি না হবে ততদিন তুমি আমার মহল ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। ওরা কুড়ি জন যুক্তি করেছে, আমায় মেরে ফেলবে। বল বল, আমায় ফেলে কোথাও যাবে না?

দো : না, আমি থাকতে পারব না।

গীত ।। ওগো বাদশাজী, অমন কথা আমায় বলো না
মহলেতে রেখে গেলে গো তুমি আমায় আর পাবে না
ওরা কুড়ি জন যুক্তি করেছে, হাঁড়িতে ভাসিয়ে দেবে মোর সন্তানে
সত্য কথা বলছি তোমায় মিথ্যা কভু বলি না।

দো : দেখ, আমি একটা কাজ করতে পারি, তোমার কাছে রশি থাকবে, আমার কাছে ঘণ্টী বাঁধা থাকবে। বিপদ হলে বা প্রয়োজন হলে রশিতে টান দেবে, আমি অমনি আসব।

মিলেন ।। এই বলে বাদশা তখন ঘণ্টা টাঙিয়ে দিয়েছিল
কেঁদে কেঁদে ছোটবিবি সেজবিবিকে কয়,
সপ্ত মাস পূর্ণ হল করি কি উপায়।
নানা চীজ খাওয়ার কথা ছোটবিবি বলেছিল
আর মেজবিবি সবাইকে কহিতে লাগিল।

দো : বড়দি, সেঁজদি, সুখ্যান, সুনীতি, ও রে, আমরা তো যুক্তি করেছি, হয় ছোট সতীনকে মারব নতুবা সন্তান হলে মারব। আজ ছোট কেঁদে কেঁদে কত কি খাবার কথা বলছে।

২য় দো : আমাদের নসিবে তো ঘটল না, ওর দ্বারা যদি খাওয়া যায়। কি কি খাবে বলেছে?

গীত ।। সপ্ত মাস পূর্ণ হল সাধের যোগাড় করি
দধি দুগ্ধ চাঁপাকলা ক্ষীরের লাড়ু পুরি।
আতপ চাল আখের গুড় বড় এলাচ দিবি কর্পূর
হাতঝাড়া আর সিউলি পিঠে কচি আমের করবি চুর।
নিহেড়ে আর সীতেপাটি দুতিন দিনের কসা বাটি
তাতে আলু উচ্ছে দিবি যুক্তিফুল পাস তো নিবি।
বাগদা চিংড়ী কেটে কেটে নানারকম মসলা বেটে
ঝোলে-ঝালে মাখামাখি জিরের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিবি।

কথা।। নানা চীজ আনি তখন সাধ খাওয়া হল। দিনে দিনে দিন তখন পূর্ণ দিন হল। অসহ্য গর্ভের যন্ত্রণা সহিতে নারিল। কেঁদে কেঁদে ছোটবিবি কহিতে লাগিল। বড়দি, মেজদি, সেজদি, আমার মা-বাপ নেই, এই বিপদে তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল।

দো : কেন, তোর বড় কষ্ট হচ্ছে ?

গা : হ্যাঁ দিদি, সহিব কেমনে দারুণ গর্ভের যন্ত্রণা, মরি বুঝি প্রাণে।

দো : তা আমবা কি করব বল?

গা : আমি জানি দিদি, জল আনার দিন অমঙ্গল হয়েছিল।

দো : তোর শুধু ঐ ভাবনা হয়েছে, অমঙ্গল কিসের বল তো ?

গা : আমি কেন দিদি, দুনিয়ায় যত নারী আছে, শুভযাত্রা কালে যদি বাম অঙ্গে আঘাত লাগে, বাম পায়ে হোঁচট লাগে, অমঙ্গল হবেই হবে, তাই বলছি—

গীত ।। আমি ভাবি নিশিদিন কি আছে ভাগ্যে, কিছুই না বুঝিতে পারি
আমার নসিবের লেখা কি লিখেছে খোদাতাল্লা
দিবসে শুনি পেচকের ডাক, শাখায় ডাকিছে ঝাঁকে ঝাঁক
বামচক্ষু নৃত্য করে গো নিয়ত আর বাম অঙ্গ জ্বলে।

দো: শরীর গরম হলে ওরকম চোখ নাচে।

গা : তবে দিবসে শুনি পেচকের ডাক?

দো : তোর জ্বালায় কি পাখি-পক্ষ ডাকবে না ? হ্যাঁরে, ঘরের ভিতর দড়িটা কিসের?

গা : বাদশার সঙ্গে দেখা করার জন্য দড়িটা টাঙান আছে।

দো : টান তো, ঘণ্টার শব্দ পেয়ে বাদশা আসে কিনা দেখি।

গা : একি ! ঘণ্টার শব্দ হল কেন?

২য় দো : একটা বিড়াল লাফিয়ে এপার থেকে ওপার যেতে পায়ে দড়ি লেগে শব্দ হয়েছে।

গা : আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি, এরকম বিরক্ত করলে আর আসব না।

২য় দো : কে তোমার আসতে বলেছে, তুমি যাওনা। এই, আর একবার টান।

গা : আবার ঘণ্টার শব্দ হল কেন?

দো : শুনবে, একটা কি বিরাট মশা গো, তার ডানা লেগে শব্দ হল।

গা : মশার ডানায় শব্দ হতে পারে না।

দো : আমরা কেউ টানিনি, আমাদের কি দরকার?

গা : বেশ এই আমি চললাম, আর আসব না। শতবার শব্দ হলেও আমি আর আসব না। বাদশা রাগ করে চলে গেল, আর আসবে না। আমায় একা ফেলে তোরা যাসনা দিদি।

দো : আমরা কেউ থাকতে পারব না।

গা : অসহ্য গর্ভের যন্ত্রণা সহিতে না পারি, দারুণ গর্ভের যন্ত্রণা, তোদের পায়ে ধরি।

দো : তুই যা যা! আরে যা! চল আমরা চলে যাই।

গীত ।। ওগো মেজদিদি, তোমরা আমায় ফেলে যেওনা
অসহ্য গর্ভের যন্ত্রণা প্রাণে আমি আর বাঁচি না
কুড়ি জন সতীন নয় তোরা, তোরা আমার মা
বিপদে পড়েছি তোরা ছাড়া নাই আর উপায়।

দো : ও বড়দি, কি হবে? ছোট কেঁদে কেঁদে মরবে?

দো : ওরে, আমার বাপের দেশে একটা নিয়ম আছে, নতুন পোয়াতির প্রসবের সময় চোখে সাতপাট কাপড় বেঁধে দিলে আর কষ্ট পায় না।

২য় দো : জিজ্ঞাসা কর যে, চোখে কাপড় বেঁধে দেব?

গা : তাই যদি ভাল বুঝিস, কাপড় বেঁধে দে। এই কথা সবাই মিলে ছোটবিবির চোখে কাপড় বেঁধে দিল, তার কিছুক্ষণ পরে অপরূপ যমজ পুত্র সন্তান হল।

দো : ওরে, কিছুতেই মরছে না। ঘরে থেকে কাতান নিয়ে আয়।

কথা ।। মেজবিবি তাড়াতাড়ি কাতান নিয়ে এল। বড়বিবি কাতান নিয়ে কোপ দিল। বিবিমায়ের দোয়ায় কাতান গুঁড়ো হয়ে গেল। যেমন ছেলে তেমন ছিল, ক্ষতি নাহি হল।

দো : ওরে, ছেলে তো কাটলো না বা মরলো না। এখন উপায় কি বলনা। ও তো অজ্ঞান হয়ে আছে। এক্ষুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

২য় দো : এই, আমি একটা হাঁড়ি এনে দিচ্ছি। হাঁড়ির ভেতর করে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আয়।

কথা ।। মেজবিবি তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নিয়ে এল।

গা : পাপ করতে হয় কুড়ি জন করবো, পুণ্য করতে হয় কুড়ি জন মিলে করব। আমি একা ছেলে মেরে পাপের ভাগী হব কেন? ওরে বাবা, তোরা ছোটবিবির গর্ভে না এসে আমার গর্ভে এলে মরতে হত না। তোদের মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। যখন ভাবি সতীনেরে পেটে হয়েছিস তখন গলায় পা তুলে দিতে ইচ্ছা হয়। কি করব বাবা, হাঁড়ি ডুবিয়ে না দিয়ে ভাসিয়ে দিযে যাই। যদি দানার বরাত থাকে তো বাঁচবি।

খিলেন : এই ভেবে বড়বিবি হাঁড়ি ভাসিয়ে দিল। হেনকালে সবাই মিলে বলতে লাগল— ওরে, সতীনের জ্ঞান ফিরে এলে কি হবে?

২য় দো : থাম, যুক্তি আছে, গোয়ালঘরে কুকুরের বাচ্চা হয়েছে, আমি আনছি। তাই নিয়ে ওর কোলে দে সবাই বলবি, তোর এই সন্তান হয়েছে। দে, চোখের কাপড় খুলে দে।

গো : দিদিরা, আমার কি সন্তান হয়েছে—আমার কোলে দে দেখি।

সুরে দো : এই নে, কাঁউ কাঁউ করনা, কুকুরছানা ধরনা
চাঁদমুখে চুমো খাও, এই নাও এই নাও।

গা : সে কি দিদি, মানুষের পেটে কুকুরবাচ্চা?

দো : বলেছিলাম না, শিল ধুয়ে খাস না, কুকুরে চেটেছে।

গা : তোমরা যতই বল দিদি, চোখে দেখতে না পেলেও আমি কানে শুনেছি যে, মা মা বলে ডেকে কেঁদে উঠেছে।

দো : না রে না, কাঁউ কাঁউ করেছে।

গা : আমি জানি তোরা মেরে ফেলবি, একবার আমার কোলে দে দিদি।

দো : এই নে না তোর ছেলে।

গীত ।। হায় এই আমার ভাগ্যে ছিল
কি অভাগী জন্মেছিলাম, গর্ভে কুকুরছানা হল
বিধি কপালে এই লিখিলি গর্ভে কুকুরছানা দিলি
আমি অতি অভাগিনী, মুখ দেখাব কেমন করে।

বাদশা : কই দেখি, ছোটবিবির কি সন্তান হয়েছে? মানুষের গর্ভে কুকুরবাচ্চা ? ছোটবিবির মুখদর্শন করব না। ছোটবিবিকে ঘোড়াঘরে রেখে এস।

দো : আমরা পারব না। ওকে ছোটবোনের মত ভালবাসি।

বাঃ দো : আমি উজিরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখ উজির, ছোটবিবিকে ঘোড়াঘরে রেখে এস।

দো : চলুন মা, আপনাকে ঘোড়াঘরে রেখে আসি। বাদশার আদেশ শুনলেন তো।

গা : ওরে উজির, সাধের ছোটবিবি হয়ে ঘোড়াঘরে যেতে হল। এ জীবন আমি আর রাখতে চাই না। আত্মহত্যা করব।

দো : আত্মহত্যা মহাপাপ মা। ওরে, সাবা দুনিয়া যদি এক হয়, স্বামী যদি এমন হয় তাহলে কে আছে আর জগতে? আমায় বাধা দিস না।

গীত ।। আর বাধা দিস না উজির আমারে
স্বামী যদি আমার এমন হলো কে আছে এ সংসারে
আমি দায়ে পড়ে পায়ে ধরেছি সতীন হয়ে মা বলেছি
গর্ভে ধরে চোখে দেখলাম না রে, এইকি ওদের মনে ছিল।

গা : দিদি, তোদের মনের আশা পুরণ হলো। আমি ঘোড়াঘরে যাই দিদি।

দো : কি করব বল, তোর ভাগ্যে যা ছিল তাই হল।

গীত ।। কোন মহাপাপে দিদি, আজ এমন হলো
সন্তান বলে কুকুরছানা আমার কোলে নিতে হল
আমি হয়ে কেন মরিলাম না, কেমনে মুখ দেখাই বল
আমি সাধের ছোটবিবি ঘোড়াঘরে যেতে হল।

কথা ।। কেঁদে কেঁদে ছোটবিবি ঘোড়াঘরে গেল। এদিকে সন্তানের সেই হাঁড়ি ভাসতে লাগল। একদিন সররাজ্যের রানীমা ভাবছেন, গঙ্গাস্নান করতে যাবেন। তাই দাসীকে ডাকছেন- ওরে দাসী, আজ ভাল একটা যোগ আছে। আজ গঙ্গাস্নান করলে অনেক পুণ্য হবে।

পয়ার ।। চলরে দাসী, যাই আমরা গঙ্গাস্নানে।
আমি একা যাব না, তোরা আয় দুজনে।।
দাসী নিয়ে সরমা রানী গঙ্গার ঘাটে গেল।
হেনকালে সেই হাঁড়ি ভাসিতে লাগিল।।

গা : ওরে দাসী, চেয়ে দেখ, কি সুন্দর একটা হাঁড়ি ভেসে যাচ্ছে, ঐ হাঁড়িটা আমায় ধরে দে।

দো : ওমা, কে নদীতে নামবে? কুমিরে খাবে যে গো।

গা : এত লোক গঙ্গায় স্নান করতে এসেছে, সবাইকে কুমিরে খাবে?

দো : কে কোথায় তুকতাক করে ভাসিয়ে দিয়েছে।

গা : আমার যে হাঁড়িটা ধরে দেবে, আমার গলার বহুমূল্য হারটা তাকে দেব।

দো : ও রানীমা, আমি যাব।

দো : না গো রানীমা, আমি যাচ্ছি। মরণ হয় হোক, তবু হার গলায় দিয়ে মরবো।

পয়ার ।। ধীরে ধীরে দাসী তখন নদীতে নামিল।
বিবিমায়ের দোয়ায় তখন হাঁড়ি সরে গেল।।

দো : ও রানীমা, হাঁড়ি দূরে সরে যাচ্ছে। আমি ধরতে পারব না।

গা : বেশ, আমি হাঁড়ি ধরবো। হাঁড়ি ধরতে গিয়ে যদি মরি, তোরা ঘরে ফিরে গিয়ে বলিস রানীমা হাঁড়ি ধরতে গিয়ে মরেছে।

পয়ার ।। ধীরে ধীরে রানীমা তখন নদীতে নামিল।
বিবিমায়ের দোয়ায় হাঁড়ি কাছে এল।।
হাঁড়িটা ধরিয়া তখন সরাটি খুলিল।
অপরূপ ছেলেদুটি হাঁড়ির মধ্যে ছিল।।

দো . কি গো রানীমা, হাঁড়ির মধ্যে কি দেখছ।

গীত।। এমন ছেলে কোথাও দেখিনি, ছেলের রূপ যেন কাঁচা সোনা
দাসীগণ, আয় আমার সনে, হাঁড়িই করে ভাসিয়ে দিয়েছে কেমনে?
আবার কোন অভাগীর গর্ভে ছিল, তারে তো মা বল্লিনা।

গা : এই ছেলে নিয়ে আমি বাড়িতে যাব। আমি জন্মের আঁটকুড়ী, যেদিন আমায় মা বলে ডাকবে, সেদিন আমার জীবন সার্থক হবে।

দো : ও রানীমা, কি জাতের ছেলে তার ঠিক নেই, এই তুমি নিয়ে যাবে?

গা : সদ্য প্রসূতির ছেলে, কোন আঁটকুড়ী পোড়াকপালি ভাসিয়ে দিয়েছে, এ আমি বাড়ি নিয়ে যাব। তোরা বলিস, সরমার দুটি সন্তান হয়েছে।

দো : তুমি রাজ্যের রানী, যখন যা বলবে তাই হবে।

কথা ।। সন্তান নিয়ে সরমা বাড়ি ফিরল। সরমার ছেলে হয়েছে বলে সবাই বলতে লাগল। দাসী, এই ছেলের নাড়ীচ্ছেদ করতে হবে। তাড়াতাড়ি দাইমার বাড়িতে যা। বলবি সরমার দুটি সন্তান হয়েছে।

দো : আচ্ছা মা, আমি এখনই যাচ্ছি। বলি ও দাইমা, দাইমা, বাড়িতে আছ?

২য় দো : বলি কারা ডাকাডাকি করছিস?

দো : আমরা সরমার দাসী। রানীমার ছেলে হয়েছে, নাড়ীচ্ছেদ করবি?

২য় দো : যেতে পারি, আমার কি দিবি বল?

গা : মনের আনন্দে যাবি রাজার বাড়ি, মনের মত পাবি একটি পাটের শাড়ি।

কথা ।। দাই নিয়ে দাসী তখন বাড়িতে ফিরিল, ধীরে ধীরে দাইমা তখন কহিতে লাগিল।

গীত ।। কেঁদনা, কোলে এস খোকন যাদুমণি গো
খোকন যাদুমণি আমার খোকন সোনামণি গো
হায়রে হায় খোকন আমার, খোকন খেলা করে রে
রাঙাবৌ আনবে ঘরে খোকন দুদিন পরে রে
ঝুমুর ঝুমুর নাচবে ও বউ আকাশের পরী রে।

কথা।। বিদায় হয়ে দাইমা ঘরেতে ফিরল। ধীরে ধীরে সেই ছেলে বাড়তে লাগল। সুন্দর, আকবর বলে নাম রেখেছিল। দুজনে মিলে তখন পাঠশালাতে যায়। অন্তর্যামী মা তখন ধীরে ধীরে কয়—ওরে বোন ঝোলারে, ওরে, ছোটবিবির কান্না আর সহ্য হয় না। কেঁদে কেঁদে তার দুটি চোখ পচে গেছে। চল ছেলেদুটির মন পরীক্ষা করে আসি।

পয়ার ।। কাঙালিনী রূপ হল হাতে আশাবাড়ি।
কাঙালিনী হয়ে তখন চলে ধীরি ধীরি।।
দুইভাই মিলে যখন পাঠশালাতে যায়।
কাঙালিনী হয়ে তখন সম্মুখে দাঁড়ায়।।

গা : ওরে বাবা, তোরা কারা রে ? তোদের মা-বাপের নাম কি? তোদের নাম কি?

দো : আমরা সররাজার ছেলে, মা—সরমা, আমাদের নাম—সুন্দর, আকবর।

গা : ওরে বাবা, আমরা অনেক দিনের বুড়ি। এই দেশে ভিক্ষা করে খাই, সররাজা ও সরমা জন্মের আঁটকুড়ো, আঁটকুড়ী। ওদের সন্তানাদি হয়নি রে বাবা।

দো : আমরাই তো ওদের ছেলে।

গা : শোন বাবা, তোদের গর্ভধারিণী মা আছে। আমি দেখাতে পারি। যদি একমনে এক প্রাণে বলিস যে, আমাদের মাকে আমরা দেখবো, তাহলে তোদের দেখাতে পারি।

দো : সেকি গো, আমাদের গর্ভধারিণী মা সরমা নয়?

গা : তোরা সরমার কাছে বলবি যে, আমরা তোমারি গর্ভে জন্মেছি?

দো : সেকি? বুড়িমা, মায়ের কাছে এই কথা বলতে হবে?

গা : হ্যাঁ বাবা, ওরে, তোদের মা তোদের জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে।

দো : তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমরা সরমার কাছ হতে বিদায় হয়ে আসি।

গা : তোরা না-আসা পর্যন্ত আমি এই বটতলায় বসে রইলাম। দুইভাই মিলে সরমার কাছে গেল, সরমাকে ডেকে বলতে লাগল—

দো : মা, মাগো, আজ সত্যপরিচয় দাওনা মা!

গা : বাপরে, মায়-বেটার সত্যমিথ্যা কি আছে!

দো : বল মা, আমরা কি তোমার গর্ভে জন্মেছি?

গা : আমার গর্ভে জন্মাসনি তো কার গর্ভে জন্মেছিস?

দো : মাগো, আমরা তোমার সন্তান, আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বল।

গা : ওরে, অভাগিনী আমি, বৃথাই নারীজীবন ধরেছি। গর্ভে সন্তানধারণের ক্ষমতা আমার নেই বাবা, আমি ভাগ্যহীনা।

দো : তাহলে আমাদের হাসি মুখে বিদায় দাও মা। আমাদের মায়ের কাছে যাই।

গা : কি বলছিস বাবা? তোরা যদি চলে যাবি, আমার কে আর মা বলে ডাকবে?

গীত ।। সুন্দর আকবর যদি বিদায় হবি, কে আর ডাকবে মা বলে
ক্ষীর নবনী গোপাল ধরবো কার বদনকমলে
বিদায় হয়ে যাবে চলে, ঘরে রইল এ দুখিনী
দেখে যাস যাদুমণি, মা বলে নবনী বল কেবা খাবে।

গা : তোদের গর্ভে ধরিনি বলে মাকে পেয়ে আমায় ভুলে যাসনি বাবা।

দো : না মা, তোমার কোলে বসে আবার মা বলে ডাকব।

কথা ।। এই বলে দুইভাই বিদায় হলো। কাঙালিনীর সঙ্গে দেখা করতে সেইখানেতে গেল।

গা : আমার কথা বিশ্বাস হল? এইবার আমার অঞ্চল ধরে চক্ষু মুদিত কর। তবে তোদের মাকে যখন দেখা পাবি, আর কিন্তু আমায় দেখা পাবি না। তবে কোন বিপদে পড়লে দয়ার বিবিমা বলে ডাকলে কোন বিপদ থাকবে না।

কথা।। এইরূপে দুইভাই বিবিমায়ের অঞ্চল ধরেছিল। চক্ষুর নিমেষে তারা ঘোড়াঘরে গেল। ও বাবা, ঐ যে মেয়েটা ঘরের মধ্যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে আছে, ঐ তোদের মা। মা বলে ডাক, কোলে তুলে নেবে।

দো : মা, মাগো! আমাদের কোলে তুলে নাও মা।

গা : কে তোরা? আমায় মা বলে ডাকছিস? আমি অভাগিনী, আমার গর্ভে সন্তান হয়নি বাবা।

দো : চেয়ে দেখ মা, তোমারি সন্তান আমরা।

গা : কি করে দেখব বাবা? আমি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে আছি!

গীত ।। কাঁদিস না রে রঞ্জরাণী, হারানিধি তোর ফিরে এল,
নয়ন মেলে দেখ নয়নমণি।

কথা ।। আওরাজবিবিমা আমার শূন্য থেকে দোয়া করেছিল। মায়ের দোয়ায় রানীর অন্ধ চক্ষু দিব্যচক্ষু হল। কে পুত্র, কার পুত্র, বলে কাঁদতে লাগিল।

গীত ।। কে তোরা দুজনে এলিরে এখানে
অভাগিনীর কথা পড়েছে কি মনে ?
আয়রে করি কোলে ডাকরে মা মা বলে
জীবন জুড়াই বাবা, কোলে তুলে নিয়ে।
যেদিন তোরা আমার গর্ভেতে জন্মালি
দশ মাস দশ দিন আমার কত কষ্ট দিলি।
সাধের ছোটবিবি ঘোড়াঘরে থাকি
এ দুঃখ আমার তোদের বিহনে।

কথা।। দুটোছেলে বুকে নিয়ে কত কথা বলছে। এমন সময় বাদশার মেজবিবি দেখতে-

পেয়েছে। বলে দিদিরা, ছুটে আয়। দেখ, ছোটবিবি তো মরমর অবস্থা। চক্ষু পচে গেছে, যে-পাশে শুয়ে থাকে সেই পাশের হাড় থেকে মাংস পচে দুর্গন্ধ ছুটছে আব এখন যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। থাম, আমি দেখে আসি, কার সঙ্গে কথা বলছে। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা। কি কবছে বে মা।

বাদশা : কি বলছো তোমরা?

খিলেন।। বলব কি গো তোমার কাছে, তোমার ছোটবিবি কুলেতে কালি দিযেছে।

গা : বুঝলে, কুলে কালি দিয়েছে। বলি ঘোড়াঘরে থেকে থেকে ও কি মানকুল সব খেয়েছে?

বাদশা : আচ্ছা থাম তোমরা। আমি গিয়ে দেখে আসি।

কথা ।। ধীরে ধীরে বাদশা তখন ঘোড়াঘরে যায়, নিজ পুত্রের মুখ দেখিবারে পায়। কে এই পুত্র, কার পুত্র, ভাবিতে লাগিল, শূন্য হতে মা আমার কহিতে লাগিল—

গীত ।। কি গো বাদশাজী, হারানিধি তোমার ফিরে এল
কোলে তুলে নাও, নয়নমণি ছলনাতে ভেসেছিল,
মোর ছলনায় ফিরে এল।

বাদশা: কার ছলনায় ভেসেছিল আর কে বা ছলনা করেছে কিছু বুঝতে পারছি না।

খিলেন ।। ভাসার মূলে কাল হলো, কাল হলো ঐ কুড়িরানী।

কথা।। প্রথম থেকে সেইদিন পর্যন্ত যা ঘটেছিল, একে একে বিবিমা কহিতে লাগিল। বাদশা সমস্ত অবগত হয়ে সবাইকে ডেকে বলছেন—

বা: কুড়িজন বিবি, তোমরা এদিকে এস।

গা : বলি কি হলো, সবাইকে ডাকছ কেন?

বা: দো: দেখ, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা সত্য বলবে।

গা : নিশ্চয়, আমরা সবাই সত্যকথা বলবো বলবো বলবো!

বা: এই সংসার ক্ষেত্রে কোন স্ত্রী যদি কোন অন্যায় করে, যে যার স্বামীর কাছে সত্যকথা বলে। স্বামী হয়তো রাগের বশে দুটো কটু কথা বলে বা মারধোর করে কিন্তু আল্লাব কাছে কোন পাপ তার থাকে না।

গা : আমরা কোনদিন সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিনি। আর আজ বলব না।

দো : আচ্ছা বল দেখি, রঞ্জার গর্ভে কি কুকুরছানা হয়েছিল?

গা : আমরা সবাই বলছি, দুটো হয়েছে। একটা কি সুন্দর কুকুরছানা গো।

বা: বড়বিবি, আমি প্রথম তোমাকে শাদি করেছি। দোজখে যেতে হয় তোমাকে নিয়ে যাব। বল তো, রঞ্জার গর্ভে কি হয়েছিল?

গা : বলব, আমায় তুমি কিছু বলবে না?

বা: না, কিছু বলব না, সত্যকথা বল।

গা : ওগো, ছোটবিবির সন্তান হয়েছিল। ঐ সতীনরা মারবে বলে গলায় পা দিয়ে রগড়ালে, কিন্তু মরল না। তারপর সতীনরা কাতান এনে এক কোপ মেরেছে। ছেলে কাটল না, কাতান ভেঙে গেল। তারপর বড়হাঁড়িতে করে কোথায ফেলে দিয়ে এসেছে গো।

বা: তাহলে তোমরা সবাই কি বলছ?

দো : আমরা কিছুই জানি না গো। ঐ সতীনের যুক্তি, ঐ তো হাঁড়ি করে ভাসিয়ে দিয়েছে।

বা: যাক এখানে আর কেউ নেই। মেয়েদের মধ্যে তোমরা আর পুরুষের মধ্যে আমি। মরতে হয়তো তোমাদের নিয়ে মরব। বাঁচতে হয়তো তোমাদের নিয়েই বাঁচব। বাড়ির মধ্যে একটা 'পাটনাজ' খুলব। কোথা থেকে দুটো যুবরাজ এসেছে। আমরা লুকিয়ে থাকবো। তোমাদের নিয়ে তো সব ভয়। প্রাণ বাঁচাতে সবাই আল্লাকে ডাক দেখি।

সবাই : ও আল্লা, আমাদের কি হলো গো।

কথা।। এই বলে বাদশা যুক্তি করেছিল। নিচে উপরে ফাঁটা দিয়ে কুড়িজনকে পুঁতে ফেলেছিল।

গীত ।। এই জগতে নারীর মায়া বুঝে ওঠা বিষম দায়
এরা কারো হাসায় কারো কাঁদায়, কারো নিচে নামায়
নারীর হাতে জগৎ বাঁধা, নারীর হাসা আর কাঁদা খেলা
নারীর হতে জীবের সৃষ্টি, নারীর হতে জীবন যায়।

গা : ধীরে ধীবে বাদশা তখন ঘোড়াঘরে গেল। আয় পুত্র, আয় পুত্র, বলে বুকেতে ধরিল। ছোটবিবি তখন কেঁদে কেঁদে বলছে, দেখ, যার কৃপায় আমাদের হারানিধি ফিরে পেয়েছি, আগে সেই বিবিমায়ের নামে গলায় কুটো বেঁধে সাতগ্রাম ভিক্ষা করবো। মায়ের নামে হাজত দেব, তারপর মহলে যাব। তার আগে যাব না।

দো : বেশ, তুমি মাগুন করতে যাও।

গীত ।। হাজতনামা দিবেন সবাই, হাজত মাঙি দ্বাবে গো
হারানিধি কোলে পেয়েছি বিবিমায়ের বরে গো
কোলে পেয়েছি আমি যেমন এমনি কোলে পাবে গো
সর্ব দুঃখ দূরে গেল বিবিমায়ের বরে গো
যেমন সদয় হলে আমার তেমনি নায়েকবাবুর তরে গো—
মনোবাঞ্ছা পুরাও তোমার মহিমা কি বর্ণিতে পারি গো
মোদের প্রণাম লহ জননী, তুমি দয়া করে যাও গো
দাও গো রাঙাচরণ, নাইকো পূজার সঞ্চয় গো
কেমনে মাগো পূজিব তোমার, সম্বল নয়নেরই জল গো।

আসর শান্ত করার গান

গণ্ডগোল করো না মাগো, বিবিমার গান শুনিতে
দেবী যদি নির্দয় হয় মা, কি ঘটাবে কার ভাগ্যেতে।
আসরে যে গোল করিবে, মা হয়ে মোর মাথা খাবে
নই পরের ছেলে মাগো, নিজ ছেলে ভাবুন মনে।
চরণ ধরে বিনয় করি, আসরে কেউ গোল করো না
গোল করলে গান গুলিয়ে যাবে, আমার শেষে দোষ দেবে না।

মা হয়ে সন্তানের গানে বাধা দেবেন কোন পরাণে
গণ্ডগোল করলে পরে আর আপনাদের মা বলব না।

আওরজবিবির পালাগান চব্বিশ পরগণার ঐতিহ্যগত লৌকিক দেবী-নির্ভর পালাগান। এই পালাগানে মানুষের ইহলৌকিক প্রার্থনা ও মানুষের জীবনবোধ বড় হয়ে উঠেছে। পালাগান পর্যালোচনা করলে মনে হয় সাতবিবির প্রত্যেকেই সমগুণসম্পন্ন ও রোগশোক প্রতিকারিণী ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী দেবী। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর দেবী ও মুসলমানের বিবি—এ দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পূজাকালে কেবল আচার-আচরণ, সংস্কারগত পার্থক্য ছাড়া সবাই এক মহামাতৃকার অংশ বিশেষ। দেবী বা বিবির পূজা-হাজতের মধ্য দিয়ে আদিম মাতৃকা পূজাকেই নানাভাবে স্মরণ করা হয়। আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক বিপর্যয়কে ঠেকাতে বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসেও মানুষ জাদুবিশ্বাসে বিশ্বাসী। অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অন্ধ আস্থা আজও মানুষ বিস্মৃত হতে পারেনি। ফলে চব্বিশ পরগণার মানুষ পৌরাণিক নানা দেবদেবী ছাড়াও লৌকিক দেবদেবীর প্রতি গভীর আস্থাশীল। সে কারণে আওরজবিবি, ওলাবিবি, বনবিবি, পীর-গাজী প্রমুখ লৌকিক দেবদেবী এখানকার মানুষের হৃদয়ে অদ্যাপি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

বিবিপালা ঃ দরবারবিবি

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানে বিশিষ্ট লৌকিক দেবী হলেন দরবারবিবি। পালাগান আলোচনায় দরবারবিবির পালাগান বিবিপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণার লোক ঐতিহ্যবাহী পালাগানগুলির মধ্যে দরবারবিবির পালা অন্যতম। দরবারবিবির পালাকে স্বরূপচাঁদের পালাও বলে। পালাটিতে স্বরূপচাঁদকে কেন্দ্র করে দরবারবিবির মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। লোকসমাজে এটি ''বিবিমার পালা'' ও ''বিবিমার গান'' নামেও পরিচিত। 'বিবিমার গান' নামটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বনবিবি, ওলাবিবি, আওরজবিবি, আসানবিবি প্রভৃতি বিবিমার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগানকেই সাধারণ শ্রোতা বিবিমার গান বলেন। পালাগায়কগণ অবশ্য গৃহস্থের মানত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পালাগান করার পর শ্রোতাদের অনুরোধে অন্যান্য বিবিপালা গান করেন।

দরবারবিবি একজন কাল্পনিক বিবি। রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে ছলনা করে আপন মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন বলেই তিনি দরবারবিবি। ওলা, ঝোলা প্রভৃতি রোগ তাঁর আজ্ঞাবাহী হলেও তিনি দয়াবতী। ভক্তকে অযাচিতভাবে দয়া করে কৃতার্থ করতে চান। তিনি সন্তানহীনার সন্তান দান করেন। তাঁর আশীর্বাদে ভক্তের 'ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ' ঘটে। বেইমানকে তিনি যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন।

চব্বিশ পরগণা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতে দরবারবিবির গান হাজতের প্রচলন আছে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা গেছে, চব্বিশ পরগণা জেলাতে দরবারবিবির গান-হাজত ইত্যাদির প্রচলন তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এই অঞ্চলের লোকশিল্পী কর্তৃক দরবারবিবির পালার সৃষ্টি। এখানকার লোকশিল্পী বা পালাগায়কগণ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আমন্ত্রিত হয়ে দরবারবিবির পালাগান করেন এবং তাঁরা এই গানের শিষ্য সেখানে তৈরি করেন। মেদিনীপুর, নদীয়া, অধুনা বাংলাদেশে দরবারবিবির হাজতাদি পূজাব্যবস্থা থাকলেও পালাগান চব্বিশ পরগণার নিজস্ব সম্পদ। এই অঞ্চলের লোকশিল্পীদের নিকট হতে যে পালাগান সংগৃহীত হয়েছে তাতে চব্বিশ পরগণার ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। দরবারবিবির

পালাগানে চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনঘেঁষা অঞ্চলের ছবি বেশি প্রকাশিত। এই অঞ্চলের ভাব-ভাষা, আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রা সুন্দরবনের নদী, বাঘ, জঙ্গল ইত্যাদি দরবারবিবির পালায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি এই গানের বেশির ভাগ শিল্পীও এই জেলার সুন্দরবন অঞ্চল-ঘেঁষা মানুষ।

সাতবিবির মধ্যে দরবারবিবি পৃথক এক বিবি বলে উল্লেখ থাকলেও পালাগানে বর্ণিত দরবারবিবির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে ওলাবিবির সাথে তাঁর নিবিড় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ ওলাবিবি ওলা, ঝোলা, টান, টংকার ইত্যাদি রোগকে নিয়ন্ত্রণ করেন, দরবারবিবিও উল্লিখিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে ওলাবিবি অপেক্ষা দরবারবিবি চরিত্রমাধুর্যে অধিক কোমল। এই পালার মধ্যে বাৎসল্য রসের নিগূঢ় প্রকাশ আছে। পুত্রহীনার সন্তান কামনা ও সন্তান রক্ষার জন্য যে ব্যাকুলতা তা পালাগানটিতে খুব মর্মস্পর্শীভাবে দেখান হয়েছে। দরবারবিবির কৃপা ও সন্তানলাভগত সংস্কার চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন ঘেঁষা অঞ্চলগুলিতে অদ্যাপি পরম শ্রদ্ধার সাথে মান্য করা হয়।

দরবারবিবির উৎস সন্ধান করলে প্রাচীন 'মাতৃকা পূজার' ইঙ্গিতই প্রকাশ পায়। দরবারবিবি এই নামকরণের মধ্যে কাল্পনিক বিবির ইঙ্গিত প্রকাশিত। যে বিবি রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে ছলনা করেছিলেন তিনিই দরবারবিবি। দরবারবিবি কোন নাম হতে পারে না। যেমন—যে বিবি বনে বা জঙ্গলে আপন মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন তিনি বনবিবি, যে বিবি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক যন্ত্রণা থেকে মানুষকে আরাম দান করেন তিনি আসানবিবি (অনেকে ওলাবিবি ও আসানবিবিকে অভিন্ন বলতে চান)। সুতরাং বনবিবি, দরবারবিবি, ওলাবিবি, আসানবিবি প্রমুখ বিবি কেউই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসম্পন্না বিবি হতে পারেন না। এঁরা সবাই কাল্পনিক বিবি, লোকসমাজের বিশ্বাসজাত বিবি। এঁরা হিন্দুর লোকসমাজে 'দেবী', মুসলমান লোকসমাজে 'বিবি' নামে খ্যাতা। বিবিগণ মধ্যযুগের ভয় ভক্তি জাত কাল্পনিক মঙ্গলদেবী। আর্ত মানুষ মধ্যযুগের শিথিল সমাজব্যবস্থায় অসহায় হয়ে কেবল জীবনটুকু টিকিয়ে রাখার আশায় এই সমস্ত কাল্পনিক বিবির অস্তিত্বে আস্থাশীল হয়ে পড়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। অদ্যাবধি সেই লোকঐতিহ্য এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রবহমান এবং তাঁদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান শিষ্য পরম্পরায় টিকে আছে।

চব্বিশ পরগণায় দরবারবিবির কোন মূর্তি বা প্রতিষ্ঠিত মন্দির বা দরগা দেখা যায় না। এই অঞ্চলের বহু স্থানে বিবিমার থানে পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি কাদার বা সিমেন্টের স্তম্ভক থাকে। লোকবিশ্বাসে এ স্তম্ভকগুলির একটি স্তম্ভক দরবারবিবির বলে কল্পনা করা হয়, আলাদাভাবে কোন পূজাচার দেখা যায় না। দেবীর থান কোথাও উন্মুক্ত স্থানে কোথাওবা চার দেওয়ালযুক্ত ঘরের মধ্যে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিবিমায়ের থান বট, অশ্বত্থ পাকুড়, বেল বা নিম প্রভৃতি গাছের গোড়ায় দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে স্তম্ভকগুলিতে তেল দিয়ে জল ঢেলে স্নান করাতে দেখা যায়। তারপর সিন্দূরের ফোঁটা বা সম্পূর্ণ সিন্দূর মাখিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ফুল দিয়ে পূজা করা হয়। পূজানুষ্ঠান সাধারণত মীর বা মৌলবীগণ করেন নতুবা মেয়েরা তেল-জল-সিঁদুর দিয়ে ডালা পূজা দেন। পালাগানের ব্যবস্থা হলে

সেই নির্দিষ্ট দিনে দেবীর তেল, জল, ডালা পূজা পালাগায়ক নিজেই (মূলগায়ক) দিয়ে দেন। কদাচিৎ বর্ণ ব্রাহ্মণ পূজা করেন। নিত্য পূজা বিবিমার থানে সাধারণত হয় না। বাৎসবিক পূজা উপলক্ষে মেলাদি হয়। বিবিমার থানে ছাগ, হাঁস ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। কোথাও লাউ ও কুমড়া ফল বলি দেওয়া হয়। বিবিমার থানে এই অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন মনস্কামনা নিয়ে মানত করেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে বাদ্যি-বাজনা করে মানত চুকোন। অনেকে বিবিমার ছলন দিয়ে মানত চুকোন। সে ক্ষেত্রে ছলনটি খানদানি মুসলমান পরিবারের কন্যার মত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ওলাবিবি ও দরবারবিবির মূর্তির মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

বিবিমার গান ও পূজা চব্বিশ পরগণা জেলার ঐতিহ্যগত পূজা। এই অঞ্চলের সব শ্রেণীর মানুষ এ পূজা করেন। রোগপ্রতিকারক বিবি হিসাবে পরিচিত হওযায় সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা দরবারবিবির উপব প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধারণ মানুষ ওলাবিবি, দরবারবিবি বা আওরজবিবি প্রমুখ বিবির পৃথকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন না। তাঁরা জানেন এক বিবিমা পূজা। তাছাড়া তাঁদের চিন্তা আরো তত্ত্ব-ঘেঁষা। লোকসমাজের অনেককেই বলতে শোনা গেছে 'সবই সেই একই মহামায়ার অংশ'।

দরবারবিবির পালা একাধিক পালাগায়কের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত পালাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় পালাগুলির মূল কাহিনী এক। মূল কাহিনীকে বজায় রেখে লোকশিল্পীগণ বিভিন্ন রঙ্গরসিকতাব মাধ্যমে কিছু ভিন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এই পালার অধিকাংশ গায়ক চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার বাসিন্দা। সুদিন মণ্ডল (বেগমপুর), জ্যোতিষ কয়াল (রামনগর), গোষ্ঠ মণ্ডল (আটঘরা), প্রবোধ ছাটুই (সীতাকুণ্ড), অনিল হাজরা (বেগমপুর) প্রমুখ পালাগায়কগণ দরবারবিবির পালাগান করেন। ইদানীং দরবার-বিবির পালা গীতিনাট্যের আকারে রূপান্তরিত করে পালাগায়কগণ আসরে পরিবেশন করেন। গোষ্ঠ মণ্ডল (আটঘরা) এই পালাটিকে গীতিনাট্যের রূপ দিয়ে আধুনিক কালোপযোগী করে তুলতে চান। তাঁর মতে দরবারবিবির পালা গীতিনাট্যের ধারায় পরিবেশন করলে আধুনিক মনোভাবাপন্ন যাত্রামোদী শ্রোতাও সাগ্রহে গ্রহণ করবেন। এই বিশ্বাসে তিনি দরবারবিবির পালা ছাড়া আরও অনেক পালা নাট্যরূপ দিয়েছেন বলে জানান।

দরবারবিবির পালাগানটি অতিশয় মর্মস্পর্শী। পালার কাহিনীটি অতিশয় দীর্ঘ ও জমজমাট। এই অধ্যায়ের কলেবর অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সম্ভবনায় উক্ত পালার কাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ উদ্ধৃতি সহযোগে লিপিবদ্ধ করা হল। পালাগায়ক অনিলকুমার হাজরার নিকট হতে যে পালাটি সংগৃহীত হয়েছে এখানে তারই সংক্ষিপ্ত কাহিনী দেওয়া হল। মূল কাহিনীটি গাইতে কমপক্ষে চার ঘণ্টা সময় লাগে বলে সাক্ষাতকারে গায়েন অনিল হাজরা জানান। পালাগানটি তাঁর সংগৃহীত লিখিত খাতা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। দরবারবিবির পালার কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

দরবারবিবির পালা

একদিন মা দরবারবিবি পঞ্চব্যাধি নিয়ে দুনিয়ার বুকে অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর পঞ্চব্যাধি হল ওলা, ঝোলা, টান, টংকার ও কালা। পঞ্চব্যাধি নিয়ে মাতা

হয়েছেন অস্থির, মাতা দরবারবিবি গরুড় নগরের রাজা ইছপ বাদশার দ্বারে এসে দ্বারীকে জানালেন, তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করতে চান, রাজা যেন তাঁর কাছে আসেন। দ্বারীর নিকট হতে এই কথা শুনে ইছপ বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না, পাঁচটি টাকা ভিক্ষা স্বরূপ পাঠালেন। ছদ্মবেশী দরবারবিবি সে টাকা নিলেন না, ফেরত পাঠালেন, এবার রাজা পাঁচটি মোহর পাঠালেন। তাও দেবী নিলেন না। দ্বারী ফিরে যেতে রাজা জানতে চান সে কেমন ভিখারী? দ্বারী দেবীর যে বর্ণনা দিলেন—

বদ হাল বদ আকার দেখে লাগে ভয়
ছেঁড়া একটি শুনের চট দিয়ে আছেন গায়।
টাকর মারলে কত ধুলাবালি উড়ে যায়
শোনের মত চুল মাথায় বাতাসে উড়ায়।
চলিতে চরণ পড়ে পাঁজর নড়ে কাশে—
এহেন গাছপালা না দেখি তাহার বয়সে।

রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, এ বুড়ি নিশ্চয় সাধারণ জন নয়। খুব বিচক্ষণতার সাথে বিষয়টি বিবেচনা করে নিজেই গেলেন ভিখারিণীর নিকট। রাজাকে দেখে দরবারবিবি উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন—

এস এস বাদশা তোমায় করি আশীর্বাদ
ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ আজ হউক তোমার।

দেবী আরও রাজাকে জানালেন, তোমার সন্তানাদিকে নিয়ে এস, আমি তাদের আশীর্বাদ করে যাব। রাজা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হয়ে জানালেন তাঁর কোন পুত্র সন্তানাদি নেই। তখন দেবী বললেন—

নিগরু আঁটকুড়া বড়ই অধম
খেয়াঘাটায় নৌকা নাই শুনিতে বিষম।
পাড়া প্রতিবেশী বলে শুন ওরে ভাই
প্রাতঃকালে উঠে আঁটকুড়ার মুখ দেখতে নাই।

এই কথা শুনে রাজার মনে অতিশয় দুঃখ হল। তিনি দেবীর সম্মুখে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। রাজা মরতে উদ্যত হলে দেবী দরবারবিবি তাঁকে মরতে নিষেধ করলেন এবং আশীর্বাদ করলেন—

দেখ বাপ বাদশা আর কাঁদিতে নাহি হবে
তোমার রানীর গর্ভে বৎসর মধ্যে পুত্রসন্তান হবে।

এই কথা শুনে রাজা আনন্দের আতিশয্যে বললেন এক বৎসরের মধ্যে যদি একটি পুত্র সন্তান হয় তাহলে হাজার টাকা ভিক্ষা দেবেন। ভিখারী রাজাকে বললেন, হাজার টাকা অনেক টাকা, তা প্রাণধরে ভিক্ষা দিতে পারবে কেন? রাজা তখন আরও প্রত্যয়ের সাথে বলেন জননী গো—

ঈশ্বর করেছে আমার পুত্রের কাঙাল
ইচ্ছা করলে দিতে পারি ধন ধানের জাঙাল।

ভিখারিণী খুশি হয়ে রাজার মন পরীক্ষা করতে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তাঁর বানীর গর্ভে বৎসর মধ্যে দুটি পুত্রসন্তান হবে। রাজাও জানালেন যদি রানীর গর্ভে দুটি পুত্রসন্তান হয় তাহলে তিনি তাঁকে একটি পুত্রসন্তান ও হাজার এক টাকা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। এই কথা শুনে দেবী দরবারবিবি ইছপ বাদশাকে একটি ফুল দিয়ে বললেন এই ফুলটি ভক্তি সহকারে রানী খেলে বৎসর মধ্যে যমজ পুত্রসন্তান হবে। এই বলে দরবারবিবি অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং রাজা রানীর নিকট এসে সকল বৃত্তান্ত বললেন। রানী জীবনে অনেক ফল ও ফুল খেয়েছেন তাই এই ফুল খেতে অনীহা ছিল, কিন্তু ফুলের এমন মিষ্ট সৌরভ রানীর মন ঘুরিয়ে দিল। তিনি সেই ফুল অতিশয় যত্নের সাথে খেলেন এবং এক বৎসরেব মধ্যেই যমজ সন্তানলাভ করলেন।

সদ্যোজাত সন্তানের নাড়ীচ্ছেদের জন্য সুখ দাইয়ের নাতনী হরি দাইয়ের কাছে পাত্রের গমন ও কথোপকথন খুবই গ্রাম্য রসিকতার মধ্য দিয়ে গ্রাম্য চিত্রটি নিখুঁত ভাবে ধরা পড়েছে। বখশিস নিয়ে দাইমা বিদায় হয়ে গেলে হিজড়েরা এসে হাজির হয়। তারা নাচ-গান, রসিকতা করে পারিতোষিক নিয়ে বিদায় হয়। পরে ব্রাহ্মণ ঠাকুর এসে উপনীত হয়। (ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে নিয়ে এখানে যে রসিকতা তা ব্রাহ্মণ সমাজের অবক্ষয়কেই প্রকাশ করে।) বিদ্রূপ, ভাঁড়ামি ইত্যাদির পর সামান্য পারিতোষিক নিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায় হয়ে যায় এবং বাদশার দুটি সন্তানের নাম রেখে যায় স্বরূপচাঁদ আর অরূপচাঁদ।

পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হলে বাদশা সন্তানকে টোলে ভর্তি করেন। অল্প বয়সে তারা চারি শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে। তাদের নিয়ে রাজা নানা স্বপ্ন দেখেন, রাজার অবর্তমানে তারা কেউ রাজা হবে কেউ মন্ত্রী। কিন্তু তিনি দরবারবিবির কথা একেবারেই ভুলে গেলেন।

মা দরবারবিবি ছলনা করতে আবার রাজাকে এসে ডাকলেন ও পূর্বের প্রতিশ্রুতি পালন করতে বললেন। রাজা হতচকিত ও বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে রানীর নিকট গিয়ে এতদিন রানীর কাছে যে সত্য গোপন করেছিলেন সেই সত্য প্রকাশ করলেন। রানীমা সহধর্মিণীর ন্যায় পরামর্শ দিলেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে। স্বরূপচাঁদ স্কুলে গিয়েছিল, মাতা নিজেই তাকে ডেকে আনলেন। স্বরূপচাঁদ স্কুলে বন্ধু ও গুরু মহাশয়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে মায়ের কাছে এল। মায়ের ক্রন্দন দেখে স্বরূপ শাস্ত্রের অনেক কথা শোনাল। এক এক করে সত্যপালনের উদাহরণ স্বরূপ পরশুরাম, বৃষকেতু, রামচন্দ্র, জেব্রাইল প্রমুখের কথা বলল এবং সেও হাসি মুখে পিতৃসত্য পালনে রাজী আছে তা জানাল। পুত্রের কথা শুনে মাতা ও পিতা উভয়ে ক্রন্দন করতে থাকে এবং হাজার এক টাকা ও স্বরূপচাঁদকে নিয়ে ভিখারিণীর নিকট ভিক্ষা দিতে যান। পথে দেখা হয় পাত্রের সাথে।

পাত্রমশাই রাজাকে এই দুর্দান্ত কাজ থেকে বিরত করে তাঁকে ঘরে ফেরান। রানী ও পুত্রকে মাটির মধ্যে গর্ত খুলে লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়ে নিজেই ছদ্মবেশী দরবারবিবিকে ফেরাতে গেলেন। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে বিবিকে ফেরাতে চাইলেন। পাত্রের কথা

ভিখারিণী বিশ্বাস করলেন না, রাজাকে এসে আসল সত্য বলার জন্য আহ্বান করেন। রাজাও মন্ত্রীর কথায় প্রতারিত হয়ে পাগল সাজে ভিখারিণীর নিকট এসে বলেন—

মাগো বলি আপনার কাছে
আপনার জন্য যে ছেলেটি রেখেছিলাম
তিন দিবস মাটির মধ্যে আছে।

এইরূপ কপট আচরণে মা অতিশয় বিরক্ত হয়ে রাজাকে বললেন—

যেমন আমার কাছে এসে বাদশা কহিলে মিথ্যা কথা—
বেলা ছয়দণ্ডের মধ্যে খাবি জ্যান্ত ব্যাটার মাথা।

এই কথা বলে মা আমার পথে চলে যায়, ব্যাধিগণ বলে মাতা ডাকে উভরায়। ব্যাধিসকল এসে মায়ের কাছে উপনীত হয়, ইছপ বাদশার বৃত্তান্ত শুনে গরুড় নগর ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু মাতা মনে মনে ভাবেন বাদশাকে মারলে তাঁর নামের জাহির হবে না। তখন তিনি বাদশার বেটাকেই মারতে মনস্থ করলেন। গনাপড়া করে জানতে পারলেন বাড়ির মধ্যে মাটির পাটনাজ খুলে মায়বেটায় সেখানে আছে। মাতা দরবারবিবির অনুচরী ওলা, ঝোলা সেখানে গিয়ে নিদ্রাদেবীর সহায়তায় স্বরূপচাঁদকে নিধন করেন। নিদ্রাভঙ্গ হয়ে মাতা দেখেন স্বরূপচাঁদ মারা গেছে, তখন—

বাছা বলে রানী কাঁদিতে লাগিল গো
বাছার শোকেতে রানী নয়নজলে ভাসে গো
ও স্বরূপচাঁদ বাবা আমার গেলিরে কোথায় গো
কাঁদে তোর জনমদুঃখিনী একবার কোলে আয় গো।

এই রূপে ক্রন্দন করে পুত্র শোকে রানী পাগলিনী হয়ে মৃতপুত্রকে কোলে নিয়ে নগরে নগরে ঘুরে বেড়ান। যে দেখে তাঁকে রাক্ষসী ও পাগলী বলে গাল দেয়। রানী মাতা দরবারবিবির নামে শুধু কেঁদে কেঁদে বেড়ান। মা দরবারবিবির মনে দয়া হয়। তখন দরবারবিবি রানীর যাত্রাপথে একটি মায়ানদী সৃষ্টি করেন। নদী দেখে রানী মৃতপুত্রের পচা মাংস সেই নদীতে ধুয়ে হাড়গুলো নিয়ে মালা তৈরি করে গলায় ধারণ করে এগিয়ে চলেন। দেবী তখন মায়াবন সৃষ্টি করে নিজেই বাঘ রূপে রানীর সামনে এসে হাজির হন—

তর্জন গর্জনে বাঘ পাকাল তার আঁখি
লম্ফ দিয়ে পড়ল বাঘ রানীর সম্মুখী।

বাঘকে দেখে রানী আনন্দিত চিত্তে তাঁর সম্মুখে যান। তখন বাঘ মানুষের কণ্ঠে বলে আমি জ্যান্ত মানুষ খাই না, মরা মানুষের হাড় খাই। এই কথা শুনে রানী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন মা দরবারবিবি পুত্রের হাড়গুলো জুড়ে মায়ানদীতে ধোয়ার সময় স্বরূপচাঁদের যে মাংস তিনি আঁচলে রেখেছিলেন তা দিয়ে স্বরূপচাঁদের দেহ তৈরি করে দেন এবং তাতে প্রাণদান করেন। মায়ের ডাকে যেমন শিশু জেগে ওঠে তেমনি মাতা দরবারবিবির ডাকে স্বরূপচাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রানীরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। রানী সম্মুখে স্বরূপচাঁদকে দেখতে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মা দরবারবিবি তখনও বাঘরূপ ধারণ করে সামনে বসে

আছেন। এইবার মা দরবারবিবি রানীকে নিজের পরিচয় দান করলেন—

পয়ার।।

ওরে গোপাল আয়রে আয় জননীর কোলে।
এতদিন কোথায় ছিলিস বাপ আমারে ভুলে।।
বাঘরূপে মা দরবারবিবি দাঁড়াইয়া রয়।
ছুটে গিয়ে ধরে রানী সেই বাঘের পায়।।
মা বলে শোনরে রানী আমার কথা নে।
বাঘরূপে দরবারবিবি আমি দিলাম পরিচয় এখন।।
তোমার স্তবেতে আমি তুষ্ট হয়েছি।
তাই মরাছেলে বাঁচিয়ে আমি কোলে তুলে দিচ্ছি।।
আমার নামেতে সাতগ্রাম মাগুন করিবে।
সাতগ্রাম মেঙে পেতে গান হাজত দিবে।।
আশীর্বাদ করে মা আমার অন্তর্ধান হল।
স্বরূপচাঁদকে নিয়ে রানী দেশে ফিরে এল।।

সন্তান ফিরে পেয়ে রানী চতুর্দিকে মা দরবারবিবির অসীম করুণার কথা প্রচার করলেন। সাতগ্রাম মেঙে পেতে মায়ের নামে গানহাজত দিলেন। সেইদিন থেকে দুনিয়ার বুকে মা দরবারবিবির নাম জাহির হল। এরপর মাঙনের গান ও দেবীর অষ্টমঙ্গলা গেয়ে পালাগায়ক পালাটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। *(কাহিনী সমাপ্ত)*

চব্বিশ পরগণায় পীরপীরাণীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক বহু দরগা বা লোক-বিশ্বাসজাত অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য আছে। এদের মধ্যে দরবারবিবির কল্পনা অন্যতম। বিবিমা পূজা এ অঞ্চলের লোকসমাজে বহু প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত আছে, যা বিভিন্ন পাথুরে প্রমাণাদি সূত্রে সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িকও বলা যায়। বিবিমাকেন্দ্রিক পালাগানসমূহ খুব প্রাচীন নয়, এগুলি মধ্যযুগে বা তারও পরে সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় মানুষের আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সমাজিক নীতি, সমসাময়িক ইতিহাস ইত্যাদি পালাগানসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সমস্ত পালার রচয়িতাগণ ও গায়কগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর বা স্বল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় পালাগানের লিখিত রূপের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। লোকশ্রুতি হিসাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় পালাগুলি এই অঞ্চলে প্রচারিত থেকেছে। লোকবিশ্বাসজাত কাহিনীই পালাগানগুলির উৎস। লোককবিগণ এ পালার রচয়িতা। লোকশিল্পীরাই পালাটি চব্বিশ পরগণা তথা পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গ্রামেগঞ্জে গান করেন।

তথ্যসূত্র

১. ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬ ওলাবিবি।

২. লোকশিল্পী সুদিন মণ্ডল, দীপক মণ্ডল, আবদুল জব্বা র গায়েন (সাক্ষাতকার)।

সপ্তম অধ্যায় ঃ পীর ও গাজীপালা

পীর ও গাজীপালা ঃ মানিকপীর

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পিরুলী পালাগান হল মানিকপীরের গান। পালাগান আলোচনায় এটি পীর ও গাজীপালার অন্তর্ভুক্ত। মানিকপীরের গান এ অঞ্চলে পিরুলীগান নামে পরিচিত।

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত পিরুলীগান কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পীর সম্পর্কিত গানকে সাধারণত পিরুলীগান বলে, কিন্তু প্রচলিত অর্থ আরও ব্যাপক। পীর ও বিবি (পিরাণী) তথা সমস্ত লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কিত পালাগানকেই সামগ্রিক ভাবে এই অঞ্চলের মানুষ পিরুলীগান বলে এবং এই গানের দলকে পিরুলীগানের দল বলে।

'পীর' হল ফার্সি শব্দ, যার অর্থ মুসলমানদিগের মধ্যে ঈশ্বর জানিত পুরুষ। তিনি কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং সবার নিকট অতিশয় মান্য ব্যক্তি বলে চিহ্নিত থাকেন। তিনি পুণ্যাত্মা, মহাপুরুষ বা মুসলমান সাধু। 'আলী' আরবী শব্দ, যার অর্থ হল উন্নত বা উদার। সুতরাং 'পীর আলী' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল উদার মুসলমান সাধু। এঁদের সম্পর্কিত গান ভাষান্তরে পিরুলীগান নামে লোকসমাজে প্রচলিত।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'পীরালী' শব্দটির আরও ব্যাপক অর্থতাৎপর্যের কথা উল্লেখ আছে। যশোহরের মুসলমান রাজা পীর আলীর অন্নস্পর্শ জনিত, মতান্তরে অন্নের আঘ্রাণ জন্য দোষাশ্রিত ব্রাহ্মণ হলেন পিরালী। হিবার সাহেব ঠাকুর গোষ্ঠীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের খুড়ো হরিমোহন ঠাকুর ও তাঁর পুত্র উমানন্দের উল্লেখ করছেন। তাঁরপূর্ব পুরুষদের অন্দরেও কোন এক মুসলমান বিজেতা অন্যায় করে ঢুকেছিল বলে তাঁরা পিরালী হয়েছিলেন। পিরালী ব্রাহ্মণের পৈতা সেই থেকে নেই।

খুলনা জেলার বাগেরহাট পরগণার খাঁজাহান আলীর একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য মহম্মদ তাহির নাম গ্রহণ করে পিরালী নামক এক নূতন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত আছে। যারা ঐ ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারাই পিরালী হয়েছিল। এইজন্য ব্রাহ্মণাদি সব

জাতির ভিতর পীরালী ছিল।[১] সুতরাং এই অর্থে পিরুল হল, একাংশ গোঁড়া বর্ণ হিন্দুদিগের নিকট অচ্ছুৎ জাতি। তাঁদের ভাবনায় যাঁরা পীর ও পীরাণীদের গান করেন তাঁরা পিরুল হন এবং পীর ফকির কেন্দ্রিক পালাগানগুলি পিরুলগান, পিরুলীগান বা পীর ও গাজীপালা নামে পরিচিতি লাভ করে।

পীর-গাজীপালার মধ্যে চব্বিশ পরগণার প্রচলিত মানিক পীরের পালা বিশেষ জনপ্রিয়। মানিকপীর কোন ঐতিহাসিক পীর কিনা তা সঠিক করে বলা যায় না। কেউ বলেন তিনি ঐতিহাসিক পীর, কেউ বলেন কাল্পনিক। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মানিকপীরকে সুফীদের স্বীকৃত পীর বলেছেন। তিনি অনেকটা যীশুর স্থানীয়, কখনও তিনি যীশুর সহিত অভিন্ন। ইনি ইরাণের লোক ছিলেন। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে জরাথুশত্রীয় ও খ্রীস্টান ধর্মের সংমিশ্রণে নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। সুফীরা মানিককে পীর বলেন এবং যীশুর মত দয়ালু ও ব্যাধি নিবারক মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত সুফীদের প্রভাবে মানিকপীরের মত পীর গাজীগণ বাংলার বহু মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন।[২]

পীর গাজীদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার আরও বিশেষ কিছু কারণ ছিল। মুসলমান যুগে পীর গাজীগণ শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বলে জানা যায়। তার ফলে ভয় ও ভক্তিতে সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। তার উপর ছিল এঁদের অলৌকিক সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড ও হাকিমি চিকিৎসা। সাধারণ মানুষ রোগ-শোক-তাপ জনিত নানা দুঃখ থেকে এঁদের দ্বারা মুক্তি পেতেন বা উপকৃত হতেন। সর্বোপরি এঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে বা লোকধর্মের পক্ষে। সে কারণে লোকসমাজে পীর গাজীদের প্রাধান্য প্রবল হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। চব্বিশ পরগণায় অন্যান্য পীর গাজীদের তুলনায় বিশেষত মানিকপীরের গান বা নাম বহুল প্রচলিত ও পরিচিত। সব সম্প্রদায়ের মায়েদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের সন্তানকে মানিক সম্বোধন করে আদর করেন এমন কি কেউ কেউ পুত্রসন্তানকে মানিক নামও রাখেন। 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের লেখক ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস মানিকপীরকে কাল্পনিক পীর বলতে চান। অখণ্ড বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে) তিনি লৌকিক পশুদেবতা রূপে পূজিত। কোথাও তিনি গ্রাম দেবতা রূপে পূজা পান। সে ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধকারী দেবতা রূপে কল্পিত হন।[৩]

চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রাপ্ত পীরমাহাত্ম্য কথা ও পালাগানসমূহে মানিক-পীরের লৌকিক ও অলৌকিক সত্তা প্রত্যক্ষ করা যায়। কাহিনী অংশে মানিকপীর আল্লার দোয়ায় কমরুদ্দীন শাহার পত্নী দুধবিবির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর আর এক ভাই হলেন গজপীর। মানিকপীরের কাহিনীর এই অংশই লৌকিক, বাকি জীবনটাই তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে মানিকপীরের অসংখ্য থান ও লোকসমাজে তাঁর প্রভাব ও মানিকপীর সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্কারাদি থেকে প্রতীতি জন্মে যে তিনি লৌকিক দেবতা, ধর্ম ঠাকুরের সাথে তুলনীয়। মুসলিম বিজয়ের সময় সম্ভবত তিনি মানিকপীর রূপে কল্পিত

হয়েছেন এবং অদ্যাবধি সেই রীতিই প্রবহমান। সুতরাং মানিকপীরকে কাল্পনিক পীর ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।

অখণ্ড চব্বিশ পরগণায় মানিকপীরের বহু স্থান দৃষ্ট হয়। মানিকপীরের একক স্থান যেমন আছে তেমনি অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর সাথে মানিকপীরের মূর্তি পূজিত হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় মানিকপীরের তিন রকম পূজা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমত—পীরের মূর্তি পূজা, দ্বিতীয়ত—তাঁর নিরাকার পূজা ও তৃতীয়ত পীরের প্রতীক পূজা। মানিকপীরের যে মূর্তি পূজিত হয় তা হল—পীর বৃষ বা বলদের পৃষ্ঠে আরূঢ়। চেহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান যুবকের মত। পরনে কুর্তা, মাথায় টুপি, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে আশাদণ্ড ও ব্যাধির জাম্বিল (রোগ পাত্র), গায়ে অনেক ক্ষেত্রে কালো জ্যাকেট দেখা যায়। তাঁর গায়ের রং হলুদ বা সাদা। অধিকাংশ থানে মূর্তি দৃষ্ট হয়। পীরের যে সমস্ত ছলন দেখা যায় সে ক্ষেত্রে অনেক ছলন বাহন রহিত। মানিকপীরের নিরাকার পূজা বিশেষত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলেই হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে মানিকপীরের থান বলতে মাটির বা সিমেন্টের বেদীর উপর মাটির বা সিমেন্টের স্তম্ভক করে পূজা হয়। বিবিমা ও মানিকপীরের স্তম্ভকের মধ্যে আকৃতিগত কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। মানিকপীরের প্রতীক পূজা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। অনেক থানে (স্থানে) বলদ বা বৃষমূর্তি মানিকপীরের মূর্তির পরিবর্তে পূজা হাজত দেওয়া হয়। অনেক থানে মানিকপীরের স্তম্ভকের পাশে আশাদণ্ড পুঁতে মানিকপীর কল্পনা করে পূজা হাজত দেওয়া হয়। মানিকপীর যে ভাবেই পূজিত হোন না কেন তাঁর অবয়ব সম্পর্কে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে যে ধারণাটি সুস্পষ্ট তা অনেক পালাগানের মধ্যেই নিহিত আছে। যেমন—

মাথায় রঙিন টুপি ব্যেধের জাম্বিল
হাতে লয়ে আশাবাড়ি ফেরে মানিকপীর।

পীরের বেশভূষা বাদ দিলে গুণ ও মহিমার বিচারে মানিকপীরের সাথে বৃষবাহন মহাদেবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর সাথে মানিকপীরের মূর্তি যেমন থাকে তেমন একক ভাবে পীরের স্থান কম নয়। এমনই এক মানিকপীরের বিখ্যাত থান বর্তমান দঃ ২৪ পরগণার শশাড়ীর নিকট কন্দমালা গ্রামে। এটি বারুইপুর থানার অন্তর্গত। এই থানটি খুবই জাগ্রত বলে লোকবিশ্বাস। বারুইপুর থানা ছাড়া আশপাশের মগরাহাট থানা, কুলতলী থানা, বিষ্ণুপুর থানা, সোনারপুর, ক্যানিং প্রভৃতি বহু থানার লোক এই থানে মানিকপীরের পূজা হাজত দিতে আসেন। মানত অনুযায়ী কেউ মানিকপীরের ছলন, বৃষ, সোনা বা রূপার চোখ ইত্যাদি নিয়ে যান। এছাড়া নতুন গাভীর দুধ ক্ষীর ইত্যাদি নিয়ে যাত্রীরা এখানে হাজত দিতে আসেন। লোকবিশ্বাস, চোখ উঠলে এখানকার 'চন্নেমিত্তিকে' (চরণ মৃত্তিকা) নিয়ে রোগীর চোখে দিলে তাড়াতাড়ি চোখ ওঠা সেরে যায়। শুধু চোখ ওঠা নয়, চোখের যাবতীয়

রোগ এখানকার চরণমৃত্তিকাতে সেরে যায়। অনেকে মানিকপীরের এই থানটিকে আদি থান বলতে চান। থানটি প্রথমে উন্মুক্ত স্থানে একটি অশ্বত্থগাছের গোড়ায় ছিল। যাত্রীরা অশ্বত্থগাছের গোড়ায় ছলনাদি দিয়ে পূজা করত। বর্তমানে এখানে একটি ইটের ঘর হয়েছে।

চব্বিশ পরগণায় মানিকপীরের আরও একটি বিখ্যাত থান বামনগাছি গ্রামে দেখা যায়। পীরের নামেই এটি পীরতলা নামে পরিচিত। বারুইপুর থেকে (৯৭ বাস রুট) আমতলার দিকে যেতে থানটি পড়ে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পীরের বাৎসরিক মেলা বসে। এই মেলার বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এখানে পীরের ছলন বেশি আসে না কিন্তু দুই থেকে তিনশত বলদ বা ষাঁড়ের মূর্তি প্রতি বৎসর মানিকপীরের ছলন হিসাবে আসে। বাগদী সম্প্রদায় এই পীরের সেবাইত। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আশপাশের দশ-বারোটি গ্রামের মানুষ বিভিন্ন সংস্কার পালন করেন। মেলার দিন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্যাপক ভাবে খেঁজুর গাছের তাড়ি খেয়ে মত্ত অবস্থায় মেলায় অংশগ্রহণ করেন। এটি এই মেলায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে পালিত হয়। এছাড়া এই মেলায় মারপিট জখম ইত্যাদি বাৎসরিক অনুষ্ঠেয় ঘটনা হিসাবে স্থানীয় মানুষের জানা থাকে। বর্তমানে এই প্রকার ঘটনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শান্তিপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ সুস্থ অবস্থায় পীরের থানে আসেন, হাজত দেন, পীরের পুকুরে স্নান করেন, মানত চুকান ইত্যাদি সংস্কার পালন করেন। মানিকপীর এই গ্রামের গ্রামদেবতা রূপে মান্য হন। সমস্ত রোগ-শোক, গো-সম্পদ রক্ষা, ফসল বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য আশপাশের মানুষ পীরের নিকট মানত করেন ও পূজা দেন।

মানিকপীর মিশ্র সংস্কৃতির প্রতীক। জেলা চব্বিশ পরগণায় হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস আছে। মানিকপীর, ওলাবিবি, শীতলা, বনবিবি, সত্যপীর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী যেন সব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন স্থাপন করেছেন। বিশেষত মানিকপীর এই অঞ্চলে বসবাসকারী সব সম্প্রদায়ের গৃহে নানা আচার আচরণ সহ পূজিত হন। মানিকপীর সহ অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগানসমূহ হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট অতিশয় প্রিয় এবং পালাগায়কগণও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। একই আসরে বসে হিন্দু মুসলমান মানিকপীরের পালা শ্রবণ করেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। সুতরাং মানিকপীর মিশ্র সংস্কৃতিজাত লৌকিক দেবতা সে সম্পর্কে কোন সংশয় নেই।

পূর্বে উল্লেখ করেছি মানিকপীর গো-সম্পদ রক্ষক ও বিভিন্ন রোগের কবল থেকে মুক্তিদাতা কাল্পনিক লৌকিক দেবতা। তাঁর গান যাঁরা করেন তাঁরা মানিকপীরের মত পবিত্র ও তাঁর প্রেরিত দূত বলে লোকবিশ্বাস। অবশ্য এই ধারণা এই অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু লোকসমাজের মধ্যে অধিক দেখা যায়। বিশেষত যে সমস্ত ফকির বেশধারী মুসলমান ঢিলেঢালা জামা গায়ে, লুঙ্গি পরে, হাতে চামর, কাঁধে ঝোলা ও একগাল দাড়ি নিয়ে 'মুশকিল আসান কর দয়াল মানিকপীর' বলে দ্বারে এসে দাঁড়ান, অথবা পথে গান গাইতে গাইতে চলে যান তখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুগণই এঁদের বেশি আদর করেন ও চাল পয়সা দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যে গো-সম্পদের উপর অধিক আগ্রহ বা দেবতাজ্ঞান

বলেই হয়তো পীর ফকিরগণকেই এঁরা বেশি শ্রদ্ধা করেন। সুতরাং চব্বিশ পরগণার বাইরে থেকে আসা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যতই ভয়ংকর রূপে এই অঞ্চলে আছড়ে পড়ার চেষ্টা করুক না কেন, এখানকার মিশ্র সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষ অনায়াসে তা প্রতিহত করেন এবং মানিকপীর, বিবিমা বা সত্যপীরের মত মিশ্রসংস্কৃতিজাত লৌকিক দেব-দেবীর গানের আসরে বসে গান শোনেন। কিনু ঘোষ, রঞ্জনা বিবির দুঃখের কথায় যেমন তাঁরা চোখের জল ফেলেন তেমনি কিনু ঘোষের মায়ের দুর্দশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

মানিকপীরের পাঁচালি লেখক একাধিক। তাঁদের মধ্যেই মুনশী মোহম্মদ পিজিরুদ্দীন হলেন বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুর থানার দক্ষিণে রাণা গ্রামের অধিবাসী। তিনি লিখেছিলেন — 'মানিকপীরের কেচ্ছা'। এটি কলিকাতার ৩০ নং মেছুয়া বাজার গওসিয়া লাইব্রেরী থেকে 'আদি ও আসল মানিকপীরের কেচ্ছা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে দুটি কাহিনী আছে, যার একটিতে মানিকপীরের জন্ম বৃত্তান্ত ও অপরটিতে মানিকপীরের মাহাত্ম্য প্রচার বর্ণিত হয়েছে। মানিকপীরের জন্মবৃত্তান্তের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ।—

মানিকপীরের জন্ম

কমরুদ্দিন শাহার পত্নী দুধবিবির গর্ভে আল্লার দোয়ায় গজ ও মানিকের জন্ম হয়। দুই ভাইয়ের রূপে ঘর আলো হয়ে যায়। হীরে দাসী গজ ও মানিকের প্রশংসা করলে অহংকারী দুধ বিবি এমন সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নিজের কৃতিত্ব জাহির করে বলেন—

দুজনা থাকিলে কত লড়কা মিলে
শুন দাসী কহি তোরে
বীজ না রোপিলে কিসে ধান্য ফলে
দেলে দেখ বিচার করে।

অন্তর্যামী নিরঞ্জন দুধবিবির এই কথা শুনে অহংকারীর সাজা দেবার জন্য জিবরিলের মারফৎ আজার পাঠালেন। তাতে দুধ বিবি অচৈতন্য হয়ে পড়লে কমরুদ্দিন শাহ পুত্র রক্ষার কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—

আজার দূরেতে দেব পয়জার মারিয়া।

খোদা কমরুদ্দিন শাহের এই অহংকারে বিরক্ত হয়ে আজার পাঠিয়ে শাহকে কাহেল করে ফেলেন। পতি পত্নীর যখন এমন অবস্থা তখন কমরুদ্দিন শাহ পুত্রদ্বয়কে বাঁচান মুশকিল ভেবে হীরে দাসীকে একটি সন্তান মানিককে পালন করার জন্য দিয়ে দেন। দাসী সেই পুত্র সন্তানকে নিয়ে পথে আসার কালে বদর জেন্দা নানা ভাবে প্রলোভিত করে দশ টাকা দিয়ে পুত্রটিকে কিনে নেন। বদর শাহ পুত্রকে নিয়ে স্ত্রী ছুরতবিবির কোলে এনে দেন। নিঃসন্তান ছুরত বিবি এমন সুলক্ষণ যুক্ত ছেলে পেয়ে যেন চাঁদ হাতে পেলেন।

ছুরত বিবির কোলে মানিককে দিয়ে বদর জেন্দা কিছুদিনের জন্য জাহিরে বের হলেন। বার বৎসর পর ঘরে ফিরে দেখেন ছুরত বিবি ও মানিক এক শয্যায় শুয়ে আছে। মানিককে

চিনতে না পেরে বদর জেন্দা ছুরতকে কু-ভাবেন। রোষে বদর মানিককে একটি বাক্সে বন্দী করে আগুন লাগান। আগুন জল হয়ে গেল। তাতে মানিকের মৃত্যু না হওয়ায় বদর জেন্দা নিজের ভুল বুঝতে পারেন। আল্লার দোয়ায় মানিক বেঁচে যান। এই ঘটনায় মানিক অন্তরে দুঃখ পেয়ে পিতা বদর শাহ ও মাতা ছুরত বিবিকে সালাম করে বেরিয়ে পড়েন। আল্লা দোয়া করে তাঁকে চৌষট্টি ব্যাধির ভার দিয়ে জাহিরের জন্য আদেশ দিলেন। *(সমাপ্ত)*

এরপর মানিক ভাই গজের সাথে দেখা করে গজকে নিয়ে তিনি প্রথম দেরাগ শহরে কালেশাহার বাড়িতে গেলেন। কালেশাহার ঘটনা 'রঞ্জাবিবির পালা' নামে পরিচিত। মূল পুঁথিতে রঞ্জনাবিবির যে ঘটনা লেখা আছে প্রচলিত পালাগানের সাথে তার পার্থক্য যথেষ্ট। বিশেষ করে পরিবেশনের পার্থক্য। হাস্যরসাদি দ্বারা কাহিনীটি লোকরুচির উপযোগী ও জমজমাট রূপে পরিবেশিত হয়। রঞ্জনাবিবিকে দোয়া করে মানিকপীর যান কিনু ঘোষের দ্বারে। এই কাহিনীটি 'কিনু ঘোষের পালা' বলে পরিচিত। মূল কাহিনীর সাথে স্থূল হাস্যরসাদিতে কাহিনীটি সুন্দর। এখানে গজ মানিক কিনু ঘোষ ও মাতা এবং স্ত্রীকে দোয়া করে যান মুরদ কাঙালের বাড়ি। এই কাহিনীটি মানিকপীর পালায় 'মুরদ কাঙালের পালা' নামে পরিচিত। অতিথি বিরাগী মুরদকাঙালের স্ত্রীকে অতিথি অনুরাগী করে তাঁকে দোয়া দিয়ে যান। এইভাবে মানিকপীর ও গজপীর দুজনে দেশে দেশে জাহির করে ফেরেন।

চব্বিশ পরগণার বিশেষ জনপ্রিয় গান হল মানিকপীরের গান। এই অঞ্চলে এই গানের তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যা নিম্নরূপ—

প্রথমত গইলেগান বা গোয়ালে গান। এই গানের গায়ক মুসলমান, কদাচিৎ হিন্দু। দ্বিতীয়ত রাস্তায় গান বা ফকিরি গান, এই গানের গায়ক কেবল ফকির বেশধারী মুসলমান। তৃতীয়ত আসর করে গান বা পালাগান। এই ধারার গায়ক হিন্দু মুসলমান উভয়ই, বরং বলা যায় তুলনামূলক ভাবে হিন্দু বেশি।

প্রথম ধারা ঃ গইলে গানের প্রচলন উত্তর চব্বিশ পরগণায় অধিক দেখা যায়। সন্দেশখালি থানায় শীতলিয়া গ্রামে ক্ষেত্রগবেষণা কালে এই গানের দলের সন্ধান পাওয়া যায়। গৃহস্থগণ গরুর কোন রকম মড়ক বা অসুখ বিসুখ হলে মানিকপীরের নামে মানত করে গোয়ালে এই গানের ব্যবস্থা করেন। সেই সাথে শিরনির ব্যবস্থাও থাকে। গায়কগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোয়ালে খেঁতলা, মাদুর, সপ্ বা খলপা পেতে বসে চার থেকে সাত জন এক দলে মানিকপীরের গান করেন। এই গানকেই গইলেগান বলে। যে বাড়িতেএই গানের আসর বসে সেই বাড়ির গৃহস্থ প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে আসেন, মানিকপীরের গান হাজত শেষ হলে পর সবাইকে শিরনি ও ফলমূল দিয়ে বিদায় দেন।

দ্বিতীয় ধারা ঃ পথেগান বা মানিকপীরের ফকিরি গানের গায়ক কেবল মুসলমান ফকির, এঁরা হাতে চামর ও মহিষের শিঙা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান ও মানিকপীরের গান করেন। গান করেন আর মাঝে মধ্যে মহিষের শিঙায় ফুঁ দিয়ে অনেকখানি শঙ্খের ধ্বনির মত টানা আওয়াজ করেন। এইরূপ গায়ক বর্তমানে আর তেমন দেখা যায় না। আজ থেকে (১৯৯৬) কুড়ি পঁচিশ বৎসর আগে এ রকম গায়ক একক ভাবে চব্বিশ পরগণার পথে পথে মানিকপীরের গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কখনোই গৃহস্থের বাড়ি যেতেন না। এঁদের গানের কয়েকটি ছত্র স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লিপিবদ্ধ করছি যার থেকে এই গায়কদের একটি ছবি পাওয়া যেতে পারে।

মুশকিল আসান কর দয়াল মানিকপীর
বাড়ি বাড়ি যাব না জননী পথে গাইতে হয়
চাল পয়সা যা কিছু মা পথে দিতে হয়
পীরের নামে দান করিলে মা বাড়ির মঙ্গল হয়
মুশকিল আসান। (শিঙার ধ্বনি)

এইরূপ লম্বা এক বয়েত আউড়ে উক্ত ফকিরের দল রাস্তা থেকেই ভিক্ষাগ্রহণ করতেন। এঁদের অনেকে আবার নানান ঔষধ বিক্রয় করতেন ও নানা রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির পরামর্শ দিতেন। বর্তমানে এই গানের ফকির দেখা না গেলেও প্রায় একই ফকির বেশে কিছু গায়ক বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে মানিকপীরের গান করেন। এঁদের কেউ কেউ লক্ষ্মী চরিত্র গান করেন। এইরূপ একজন গায়ক হলেন বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চন্দনেশ্বরের নিকট পাটকেলপোতা গ্রামের আবদুল ফকির (কাওয়াল)। তিনি মহিষের শিঙা আনেন না কিন্তু চামর আনেন। যারা ভিক্ষা দিতে আসে তাদের মাথায় ও গায়ে চামর বুলিয়ে দেন ও নানা রকম ইহলৌকিক আশীর্বাদ করেন। এছাড়া শিশু রোগের ওষুধ (গাছড়া) বিক্রয় করেন। তাঁর গাওয়া গানটি কাহিনী-অংশে 'মানিকপীরের গইলেগান' নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় ধারা ঃ পালাগানের ধারাটি চব্বিশ পরগণায় অতিশয় জনপ্রিয়। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পালাগায়ক মানিকপীরের পালাগান করেন। এরা সাধারণত রাতের বেলায় অথবা বিকাল থেকে গান শুরু করেন। একজন মহড়া বা মূল গায়ক থাকেন আরও কমপক্ষে তিনজন বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র নিয়ে থাকেন ও মূল গায়কের দোহার হিসাবে গান করেন। এই গানের একাধিক পালা ক্ষেত্রানুসন্ধানে সংগৃহীত হয়েছে। প্রতিটি পালাই সাধারণ মানুষের নিকট বিশেষত লোকসমাজে খুবই পরিচিত ও জনপ্রিয়। উত্তর চব্বিশ পরগণা অপেক্ষা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় মানিকপীরের পালাগানের ধারাটির ব্যাপক প্রচলন আছে। গৃহস্থগণ সাধারণত মানিকপীরের নামে গান হাজতের মানত করে গো-সম্পদের সুস্থিতি কামনা করেন, পালাগায়কের নিকট হতে যে সমস্ত পালা সংগৃহীত হয়েছে প্রত্যেকের পালার মূল প্রতিপাদ্য মানিকপীরের মাহাত্ম্য কীর্তন। বলা বাহুল্য মূল কাহিনী মোটামুটি এক হলেও

পরিবেশন পদ্ধতি পৃথক হওয়ায় পালাগান পরিবেশন কালে পালার রস সঞ্চারের তারতম্য ঘটে।

মানিকপীরের কেচ্ছার লেখক অনেক। চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত মানিকপীরের পালাগানের অনেক নিদর্শন ক্ষেত্রানুসন্ধানে সংগৃহীত হয়েছে। এই পীরের পালাগায়কেরও সীমা সংখ্যা নেই। মানিকপীরের যে সমস্ত লিখিত পুঁথির পরিচয় জানা গেছে তা নিম্নরূপ—

ক) মানিকপীরের কেচ্ছা—মুনশী মোহম্মদ পিজিরুদ্দীন

খ) মানিকপীরের গীত — ফকির মোহম্মদ

গ) মানিকপীরের জহুরানামা — জয়রদ্দিন

ঘ) মানিকপীরের গান — নসর শহীদ।

এছাড়া বয়নদ্দিন, খোদা নেওয়াজ প্রমুখ বহু মানিকপীরের কেচ্ছা লেখকের পরিচয় জানা যায়। এঁরা সবাই পাঁচালি ঢঙে মানিকপীরের মাহাত্ম্য লিখেছেন, কিন্তু চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত মানিকপীরের পালাগান—পালাগানের রীতিতে গড়ে উঠেছে। লোকনাট্যের ধারায়ও এগুলি পরিবেশিত হয়। পালাগানের মূল ঘটনা উক্ত লেখক বা কবিদের লেখা থেকে সংগৃহীত হলেও পালাগায়কগণ যখন তা আসরে পরিবেশন করেন তখন সেগুলি স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করে। মানিকপীরের চারটি কাহিনী যুক্ত পালাগান ক্ষেত্রানুসন্ধানে সংগৃহীত হয়েছে। যা নিম্নরূপ—
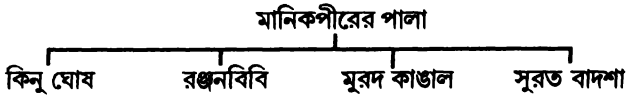
একাধিক পালাগায়ক উক্ত পালা গান করেন, কিন্তু প্রত্যেকের পালার বয়ান ও পরিবেশন পৃথক। কিনু ঘোষের কাহিনী অধিকাংশ পালাগায়ক গান করেন, যেমন গোষ্ঠ মণ্ডল, সুদিন মণ্ডল, অনিল হাজরা, জ্যোতিষ কয়াল, বসন্ত গায়েন, লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন, শ্যামল মণ্ডল, শশধর মহিষ, কুতুবউদ্দিনবক্স (মাটিয়াগাছা, উঃ চব্বিশ পরগণা), মঃ ওয়াজেদ আলি (বুজরুগদীঘা) জাফর আলি, এলাবক্স (উঃ ২৪ পরগণা) প্রমুখ লোকশিল্পী। মুরদ কাঙালের গায়ক তুলনা- মূলক ভাবে অনেক কম। মানিকপীরের রঞ্জনাবিবির পালার গায়ক বারুইপুর থানা ছাড়া কোথাও দেখা যায়নি। পালাগানগুলির মধ্যে বসন্তকুমার গায়েনের গাওয়া গরীব রতন ভণিতা যুক্ত পালাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। এই পালায় চব্বিশ পরগণার অজ্ঞাত ইতিহাসের কিছু উপাদান আছে। সুরত বাদশার পালাটি কেবল কুসুম্বার আবদুল জব্বার গায়েনের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। এ পালার হদিস অন্য কোন পালাগায়কের নিকট পাওয়া যায় নি। এই অধ্যায়ে সংগৃহীত আবদুল ফকিরের 'গইলে গান' ও বসন্তকুমার গায়েনের মানিক- পীরের গান আংশিক উদ্ধৃত হল। অস্বাভাবিক কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কিনু ঘোষ, রঞ্জনা বিবি, সুরত বাদশা ও মুরদ কাঙালের পালাগান কেবল সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত হল।

মানিকপীরের গইলে গান (আবদুল ফকির)

আর হালে আছে হেলো বাছা, গইলে আছে গোয়াল

মানিক পীরের দোয়াতে সব হয়ে যাবে ফল।
গজ মানিক উঠে বলে পীর মানিক ভাই
এ বাড়ি হতে চল মোরা ও বাড়িতে যাই।
এ বাড়ির আপদ বালাই তাড়ায়ে দে যাই
এ বাড়ির গরু বাছুর থাকিবে ভালই।
মুশকিল আসান কর দোহাই মানিক পীর ....
মানিক পীরের দুগ্ধে মাগো সত্য শিরনী হয়
মানিকে ভাঁড়ালে মাগো ক্ষতি হয়ে যায়।
সুবুদ্ধি গয়লার মেয়ে কুবুদ্ধি ঘটিল
বেসালতে * দুগ্ধ রেখে মানিকে ভাঁড়াল।
যাও বেটি গোয়ালিনী আপন বাপের ঘরে
একথা গে বলব আমি নন্দঘোষের তরে।
নন্দঘোষের মা কাঁদে গো হাতে লয়ে বাড়ি
গোল দুয়ারে পড়ে আছে চোদ্দ বোঝা দড়ি।
ঘরে মল গোয়ালিনী বাইরে মল গাই
কতেক বাছুর মলো তার লেখাজোখা নাই।
মানিক পীরের দোয়ায় যখন মুশকিল ঘটিল
কিনু কানু দুই ভাই ভাবিতে লাগিল।
মুশকিল আসান কর দোহাই মানিক পীর ....

এই ভাবে এক লম্বা বয়েত আউড়ে গইলেগানের দল গোয়ালে বসে গো-সম্পদের মঙ্গলের জন্য গান করেন।

মানিকপীরের গান (বসন্তকুমার গায়েন)

বন্দনা

বন্দিলাম মানিক পীর আলামে জাহির
তোয়া পদতলে।
জাহির করিবার তরে আসিয়া দুনিয়া পরে,
আপনি ক্রমেতে প্রকাশিলে।।

---

* বেসাল শব্দের অর্থহল দুধদোহান ও আবর্তনাদি কার্যোপযোগী মৃৎপাত্র। এটি পর্তুগীজ শব্দ। বেসাল স্থান নাম হিসাবেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় নড়িদান গ্রামে 'বেসালের মাঠ' নামে একটি মাঠ আছে। সম্ভবত এই স্থানটি অতীতে গোয়ালারা দুধ দোহনের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করত।

বিরাট তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে লীলা
তুমি মানিক বড় দুনেদার।
তুমি কৃপা কর যারে ধন্য সেই ত্রিসংসারে
অনায়াসে হয় পারাপার।।
ছিলে বদরের ঘরে কামাই করলে দুনেপরে
দুধ বিবি করিল পালন।
বক্ষে ঝুলি লও ফকির মুরতি হও
নাম ধর মানিক রতন।।
তোমাতে ভকতি যার কোন দুঃখ নাহি তার
ধন্য তুমি এই দুনিয়াতে।
গোবৎসাদি সবাকার রোগ শোক নাহি তার
সর্বক্ষণ থাকে কুশলেতে।।
তোমারে না ভাবে যেই মূঢ়মতি অতি সেই
নানা দুঃখ পায় জন্মাবধি।
তুমি কৃপা কর যারে দুঃখ ঘুচাইতে তারে
নাহি পারে হরি হর বিবি।।
আমি অতি মূঢ় মতি না জানি ভকতি স্তুতি
পীররূপে তুমি সনাতন।
গোলাম ইয়াদ করে আসিয়া নায়কের পুরে
নায়কের হবে সুপ্রসন্ন।।
বসতি হাতিয়া ঘর মহারাজ রাজ্যেশ্বর
প্রতাপেতে যেমন তপন।
সেই রাজ্যে মোর ধাম রাজপুর নামে গ্রাম,
বিরচিল গরীব রতন।।

কালু ঘোষের মৃত্যুর পর মৃত্যু সংবাদ সুবল ঘোষ কালুর মাকে দিলে মায়ের যে প্রতিক্রিয়া, পালা অংশে তা নিম্নরূপ—

কালুর মরণ শুনি বুড়ি উল্লসিত হয়ে।
হাসিতে লাগিল বুড়ি উঠানে আসিয়ে।।
হজরালি বলে শুন মানিক জেন্দা ভাই।
এত বড় লক্ষ্মীছাড়ি কোথা দেখি নাই।।
শোক হলে যার শোক নাহি পায়।
আগুন ভেজায়ে দেও বুড়ি মাগির গায়।।
এতশুনি মানিক জেন্দা কলেমা পড়িল।

মানিকের মোউত দাও বিরাট নগরে।।
এতেক শুনিয়া কালু দেলে খুশি হল।
মানিকের তরে মোউত বিরাটেতে দিল।।
এতশুনি বগুরি (?) কত কালা গাই আনি।
মোল্লা ডাকিয়া তদবীর করিল তখনি।।
মানিকের নামেতে সা উঠাইয়া দিল।
মেঠাই শিরনি কত সেইখানেতে আসিল।।
দুগ্ধ কলা নানা চিজ রাখে সেইখানে।
মোল্লায় পড়িল নমাজ আসিয়া সেখানে।।
হাজত পাইয়া মানিক দোলাইল গা।
আগে শুনা দুব করিল চামরের বা (?)।।
এইখানেতে সারিলাম মানিকের বাত।
দিনে দিনে বাড়াবে নায়েকের হাওয়াত।।
আগেকার কথা যদি পিছু হয়ে যায়।
বালক বলিয়া দোষ ক্ষমিবে আমায়।।
বালকের অপরাধ তুমি খণ্ডিয়া না দাও।
তোমার এই কলঙ্কের মাথা খাও।।
যেখানে সেখানে তোমার পূজে যেই জন।
সবাকার আপনি বাবা করিবে পালন।।
তোমার নাম লইয়া যেই জনে চলিবে সদাই।
হস্ত দিয়া মিঞা রাখিবে চিরাই।।
আমরা তোমার গান গাই চরণের আশ।
জম্মে জম্মে হই যেন তোমার ব্রত দাস।।
জন্ম হউক যথা তথা কর্ম অনুসারে।
মন যেন থাকে বান্দা চরণ কমলে।।
গরীব রতন কয় মানিকের পায়।
আল্লা আমিন বল সবাই পালা হল সায়।।

কিনু ঘোষের কাহিনী

কলমদ্দিন বা কমরুদ্দিন আউলের পুত্র হলেন মানিক এবং গজ। মাতা ছুরত বিবি। বাদশার পুত্র, কিন্তু সংসারে কোন আসক্তি নেই। মানিকের মধ্যে সংসার অনীহা অধিক। তিনি ভাই গজকে নিয়ে ফকির হতে চান। ভাই গজ ফকির হয়ে গৃহত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় মানিক সংসারের অসারত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলেন—

কেউ কারু নয় সব মায়াময়, যারে বল আপন আপন
আজ মলে কাল দুদিন পরে, সব হবে নিশার স্বপন।
যারে রাখ বুকে মনের সুখে, মুখে দাওরে ক্ষীর মাখন
মুখে আগুন দিয়ে চলে যাবে ভাই, করবে না আর আলাপন।
ভাইরে কোথা রবে তোর কোঠা বাড়ী, আর কোথা রবে বা সিংহাসন
মরলে কার বা কোঠা কার বা বেটা, এটা কেবল মনের ভ্রম।

মানিক গজকে নানা কথায় বুঝিয়ে ফকির রূপে আপন সঙ্গী করে নিলেন। মানিকের একটা প্রতিশ্রুতি গজকে দিতে হল যে, মা ছুরতবিবি যখন তাঁদের স্মরণ করবেন, মুহূর্তে তাঁরা মাকে দর্শন দিয়ে আবার চলে যাবেন।

দুই ভাই ফকির বেশ ধারণ করে প্রথমে মায়ের কাছে ভিক্ষা নিতে এলেন। মা ছুরত বিবি ফকিরকে ভিক্ষা দিতে এসে পুত্রদ্বয়কে দেখে অবাক হয়ে যান। মানিক মাকে বুঝিয়ে বলেন, মাগো—

আমাদের নাহি দুঃখ নাহি তাপ
আমাদের ঘর ঘর মা আর ঘর ঘর বাপ।

আমরা সুখে থাকতে ফকির হয়েছি। পুত্রের কথায় মা ছুরতবিবি মানিককে ছাড়তে চাইলেও ছোট ছেলে গজকে ছাড়তে রাজী নন। কারণ গজ এখন ছেলেমানুষ, পথে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। মানিক মাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে মানিক তাকে কখনোই ক্ষুধায় কষ্ট দেবেন না। তারপর মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে গজ মানিক বিদায় হয়ে যান।

পথে যেতে যেতে গজ ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লে মানিক দূরে বিরাট নগর নামে একটি গ্রাম দেখিয়ে বলেন ওখানে গিয়ে তোমার খাবার ব্যবস্থা করে দেব। ঐ গ্রামে থাকে কিনু ঘোষ আর তার ভাই কানু ঘোষ। ওরা খুব অতিথি পরায়ণ। ওদের বাড়িতে দুধ ঘি'র অভাব নেই, যত পার খেতে পাবে। এই বলে উভয়ে বিরাট নগরে এসে উপস্থিত হলেন।

কিনু ও কানু ঘোষের মা হীরে গোয়ালিনী অত্যন্ত মুখরা ও গালঠুঁটী। কথায় কথায় গালিগালাজ করে বসে। মানিক ও গজ তাদের বাড়িতে আসতেই গালিগালাজ শুরু করে দেয়। মানিক একটু দুধ চাইলে অনেক কথা বলার পর ঘোল আনল বটে তাতে গোচোনা দিয়ে। অন্তর্যামী মানিক তা বুঝতে পেরে বুড়ির কপটতা প্রকাশ করেন। এতে বুড়ি চটে গিয়ে একটা বাঁজা দামড়ীর দুধ দুয়ে খেতে বলে। মানিক তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে গরুর দুধ দুইলেন সাত ভাঁড়। কৃপণ হীরে গোয়ালিনী এত দুধ সব ঘরে রেখে দিল। ফকিরের ছেলেকে এক ফোঁটা দিতে চাইল না। তাদের সাথে কপটতা করে বিদায় দিতে চায়। তখন বুড়ির পুত্রবধূ সনকাসতী শাশুড়ীর কাছ থেকে এক রকম জোর করে হাজার গালমন্দ শুনে একসের দুধ নিয়ে গজ মানিককে দিল। গজ মানিক সেই দুধ খেয়ে তৃপ্ত হয়ে সনকাসতীকে এয়োস্ত্রী হয়ে থাকার আশীর্বাদ করলেন ও বিপদে পড়ে যখনই ডাকবে তখনই দেখা দেবেন বা উদ্ধার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হীরে গোয়ালিনী আড়াল থেকে দেখেছে যে, ফকির সনকার মাথায় হাত দিয়ে কি বিড়বিড় করে বলছে। মোল্লায় ছুঁয়েছে বলে হীরে সনকার যথোচিত শাস্তি দিতে পুত্র কিনুর কাছে এক নয় আর করে বলে এবং কিনু গরুপেটা পাঁচন বাড়ি দিয়ে সনকাকে আচ্ছা করে দৈহিক নির্যাতন করে।

সহিতে না পারে কিনু, সনকার চুলের মুঠি ধরে
আর বাড়ির উপর বাড়ি তখন সনকাকে মারে—গো।

মার খেয়েও সনকাসতী স্বামীর প্রতি কোনরূপ রুষ্ট না হযে থাকে বিনয় বচনে শান্ত করতে চায়। এমন সময় গজ ও মানিক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন দেখে সনকা কিনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে—

না মার না মার প্রভু ধরি দুটি পায়
ঐ চেয়ে দেখ সেই ফকির দুজন রাস্তা দিয়ে যায়।

কিনু ঘোষ তখন সনকার চুলের মুঠি ছেড়ে ফকির দুজনকে মারতে ছোটেন। সঙ্গে সঙ্গে কিনুর গায়ে কুষ্ঠ ব্যাধি ধরে যায়। গায়ে দুর্গন্ধ ছোটে ও মাছি ভন ভন করে। তখন কিনু ফকিরের কেরামতি বুঝতে পেরে সেই অবস্থায় তেড়ে যায়। বলে—

কি ব্যাটা কুটে নেড়ে ফকিরের ছেলে
(তুমি) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার গায়ে ব্যাধি দিচ্ছ ছেড়ে?
কেহ যদি কইবি কথা, লাঠি মেরে ভেঙ্গে দেব তোর ন্যাড়া মাথা।

মানিকপীর বিরক্ত হয়ে মাথা থেকে হজের কালা ছিল তা ভূমিতে ফেললেন। সেই কালা থেকে কালসর্প হয়ে মানিকপীরের নিকট অনুমতি চাইল কিনু ঘোষের সবংশে নিধন করার, কিন্তু মানিকপীর তাতে নিষেধ করে কেবল কিনু ঘোষকে দংশন করতে বলেন। সর্প এসে তৎক্ষণাৎ কিনুকে দংশন করে। সর্পের দংশনে কিনু ঘোষ মারা যায়। সনকাসতী স্বামীর মৃত্যুতে পাগলিনী হয়ে গেল। শ্মশানে কিনুকে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য করার সময় সনকার মনে পড়ে মানিকপীরের আশীর্বাদের কথা। তখন সতী মানিকপীরের স্মরণ করে। মানিকপীর ব্রাহ্মণ বেশে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে কিনুকে জীবন দান করেন।

মানিকপীরের কৃপায় কিনু প্রাণ ফিরে পেতে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। সনকার কাছে সব কথা শুনে মানিকপীরের প্রতি তার অগাধ ভক্তি এল। সনকার হাত ধরে সাত গ্রাম মেঙে পেতে মানিকপীরের গান হাজত দিল। সেই থেকে বিরাট নগরে মানিকপীরের নামের জাহির হল। *(সংক্ষিপ্ত)*

কিনু ঘোষের এই কাহিনীর লেখক দঃ চব্বিশ পরগণার সীতাকুণ্ড গ্রামের দ্বিজপদ মণ্ডল বলে জানা যায়। পালার মূল কাহিনীটি তিনি প্রচলিত পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছেন কিন্তু লোকনাট্যের আকারে পরিবেশন উপযোগী করে গড়ে তোলার বিষয়ে দ্বিজপদ মণ্ডলের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। মানিক পীর ও বুড়ির কথোপকথন, শাশুড়ি বউ-এর ঝগড়া গ্রামের অনবদ্য চিত্র। স্থূল হাস্যরস সৃষ্টিতে পালাকারের অতীব দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে।

মাঝেমাঝে কাহিনী অতিরঞ্জিত বলে মনে হলেও গ্রামের ঝগড়াঝাটি, স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন বুড়ির চিত্র অঙ্কনে পালাকার সার্থক। পালা পরিবেশনের সময় পালাগায়ক প্রয়োজনমত নতুন সংযোজন ও বর্জন করেন। তাতে পালার রস সৃষ্টিতে কোন ব্যাঘাত হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে বাড়ে।

রঞ্জনাবিবির কাহিনী

গজ ও মানিক দুই ভাই কিনু ঘোষকে কৃপা করে আবার পথে চলতে শুরু করেছেন। চলতে চলতে গজ খুব ক্ষুধার্ত হয়ে দাদা মানিকের কাছে খেতে চান। মানিক তখন কালেশ্বর সওদাগরের গ্রাম দেখিয়ে বলেন ওখানে গিয়ে তোমাকে খেতে দেব। এই কথা বলে গজ মানিক কালেশ্বর সওদাগরের দ্বারে এসে উপনীত হলেন। কালেশ্বর সওদাগরের স্ত্রী রঞ্জনা-বিবি তখন সখিদের নিয়ে বসে তাস খেলছিলেন। ফকিরদ্বয় খানা বলে যখন জিগির জানান তখন রঞ্জনাবিবির এক সখি কিছু ভিক্ষা নিয়ে সেখানে এসে উপনীত হয়। তখন মানিকপীর বলেন—

ভিক্ষার ফকির নয় মা আমরা ভিক্ষা নাহি নেব
রানী রঞ্জনার হাতে খানা খেয়ে দোয়া দিয়ে যাব—

এই কথা শুনে দাসী রঞ্জনাবিবিকে এসে জানায়। রঞ্জনাবিবি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে এক গাছা ঝাঁটা ও কিছু ভিক্ষা দিয়ে দাসীকে বলে পাঠায়—যদি ফকির ভিক্ষা নেয় তো ভাল, নইলে এই ঝাঁটা দিয়ে মারতে মারতে বাগানবাড়ি পার করে দিবি, দাসী এসে গজ মানিককে এই কথা জানাতে গজ ও মানিক খুব ক্রোধান্বিত হলেন, কিন্তু মানিক নিজেকে অতিশয় সামলে নিয়ে চিন্তা করলেন রঞ্জনাবিবিকে দিয়েই তিনি তাঁর নামের জাহির করাবেন তারজন্য বঞ্জনাবিবিকে প্রথমে সুখের স্বর্গ থেকে টেনে আনতে হবে দুঃখের দরিয়ায়। মানিকপীর বলেন—

বিনা দোষে রঞ্জনা তুই কেন গাল দিলি
অহংকারে মত্ত হয়ে আপনার মাথা আপনি খেলি।
এই অভিশাপ করলাম তোরে বন মাঝারে যাবি
পতি পুত্র হারা হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াবি।

এই কথা রঞ্জনাবিবিকে জানাতে রঞ্জনার সখিকে বলে পাঠালেন এবং ভাই গজকে নিয়ে দোয়ার মানিকপীর সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। মানিক গজকে রেখে কালেশ্বর সদাগর বাণিজ্য করতে যেখানে গেছেন সেখানে মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে সদাগরকে বলছেন—দেখ সদাগর, আজ রাত্রিতে তুমি যদি বাড়িতে থাকতে তোমার রানী রঞ্জনার গর্ভে এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করত যে তার চক্ষের জল ও মুখের লালা মাটিতে পড়লে এক এক ফোঁটাতে একটি করে মানিক উৎপত্তি হত। এই কথা শুনে কালেশ্বর একাজ অসম্ভব বলে মনে করেন, কারণ—দেশে ফিরতে ছয় মাস ও আসতে ছয় মাস সময় লাগে। তখন মানিকপীর

একটি হংস পাখিকে ডেকে তার দেহে অসীম ক্ষমতা দিয়ে সওদাগরকে রাত্রের প্রথম প্রহরে রানীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ত্বরাও দয়ার মানিক বলে পাখি শূন্যতে উঠিল
আপন বাগান বাড়ি আসি উপনীত হল।

পাখিকে কালেশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল রাত তৃতীয় প্রহরে সে চলে আসবে এবং পাখির পিঠে চড়ে তার বাণিজ্য তরীতে পৌঁছাবে। এই বলে সদাগর স্ত্রীর নিকট গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলে রঞ্জনা কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করে না। তারপর প্রদীপ জ্বেলে দেখে চিনতে পারে এবং ঘরের দরজা খুলে দেয়। সদাগর রঞ্জনাবিবির নিকট তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত থেকে পাখির ডাকে পাখির কাছে ফিরে আসে। রঞ্জনাকে তার একখানা চাদর দিয়ে আসে, কিন্তু তার মাকে তার আগমনের কথা জানাবার আর সময় হল না। পাখির পিঠে চড়ে সদাগর আপন বাণিজ্য তরীতে গিয়ে পৌঁছাল। এদিকে প্রভাত হলে রঞ্জনাবিবির দাসী, শাশুড়ি রঞ্জনার ঘরে পুরুষের আসার চিহ্ন দেখে তাকে কুলটা বলে ধিক্কার দেয় এবং কালেশ্বরের পূর্বের কথা মত মাতা আয়মনাবিবি রঞ্জনাবিবিকে গুনচট পরিয়ে নিরাভরণ করে ঝাঁটা মারতে মারতে বনবাসে পাঠায়। বনে ঘুরতে ঘুরতে রঞ্জনাবিবি বনের মাঝে চাঁদ ফকিরের কুটীরের কাছে আসে। চাঁদ ফকির তাকে কন্যাসম আদর করে কুটীরে এনে পালন করে। ফকিরের স্ত্রীও তাকে কন্যার মত আপন করে নেয়। চাঁদ ফকিরের কোন সন্তানাদি ছিল না বলে তাদের সমস্ত স্নেহ ভালবাসায় রঞ্জনাবিবি ধন্য হয়ে যায়। সন্তানসম্ভবা রানীর বনের মাঝে ফকিরের কুটীরে কেঁদে কেঁদে দিন কেটে যায়। যখন—

দশমাস দশদিন হইল রানীর গণনা
অকস্মাৎ উঠিল রানীর প্রসব বেদনা।
পুত্র প্রসবিল রানী মানিকপীরের বরে
মানিকপীরের বরপুত্র হল রানীর উদরে।

রঞ্জনার গর্ভে নবজাতক আসায় ফকির ও তাঁর স্ত্রী খুবই আহ্লাদিত হন। দাইকে ডেকে তার নাড়ীচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন। দাই এসে নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে নাড়ীচ্ছেদ করার কালে শিশুর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে ভূমেতে পড়ে ও দপ দপ করে জ্বলতে থাকে। দাই তা মানিক বলে বুঝতে পারে এবং ইচ্ছা করে আরও কাঁদিয়ে অনেক মানিক সংগ্রহ করে। সুচতুর ভাবে দাই রানীকে দিয়ে তা নিজের আঁচলে বাঁধিয়ে নেয়। রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় দাইমা একটি মানিক নিয়ে হবিরশার বাড়িতে গেল। দাইমার হাতে মানিক দেখে চতুর হবিরশাহ দাইয়ের নিকট এর রহস্যের সন্ধান জানতে চান। হবিরশাহ সব জানতে পেরে চাঁদ ফকিরের ঘর থেকে সন্তানটি চুরি করে আনতে বলেন। বহু টাকার লোভে দাইমা রঞ্জনাবিবির সন্তানকে চুরি করে এনে হবিরশাহ বাদশার নিকট দেয়। হবিরশাহ শিশুটির নাম রাখে লালচাঁদ এবং ছয় বৎসর পূর্ণ হলে তাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুলে পাঠায়। পরদিন প্রভাতে সন্তান কোলের কাছে না দেখতে পেয়ে রঞ্জনাবিবি কেঁদে ওঠে। চাঁদ ফকির

ও তার স্ত্রী সন্তানের জন্য এদিক সেদিক খোঁজাখুজি করে। অবশেষে মনে করে বনের মধ্যে হয়তো বাঘেই নিয়ে গেছে। তাকে আর পাবার আশা নেই। তখন রঞ্জনা বিবি বলে—

আমি আর রবনা ও বাবাজী আপনার ভবনে
যে বাঘে নিয়েছে বাছার আমি যাব তার অন্বেষণে
ছিলাম আমি রাজরানী হলাম পথের ভিখারিণী।
পুত্রহারা হয়ে আজি হলাম আমি পাগলিনী।

পুত্র হারা হয়ে রঞ্জনাবিবি ভাবল সে আর এ জীবন রাখবে না। যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এ জ্বালা জুড়াবে। পুত্রের জন্য কেঁদে কেঁদে পথে পথে ঘুরতে থাকে। তখন দয়ার মানিকপীর কেতাব খুলে দেখেন রঞ্জনার দুর্ভোগের বাব বৎসর পূর্ণ হতে আব তিন মাস বাকি আছে। তখন তিনি রঞ্জনাকে এবার মুক্তি দেবার জন্য তার কাছে আসেন। মানিকপীর রঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে সে কাঁদছে। তখন রঞ্জনাবিবি তার সমস্ত দুঃখের কথা জানালে মানিকপীর তার বার বৎসর পূর্বের ঘটনা মনে করিয়ে দেন যে, দুইজন ফকিরকে তুমি খানা না দিয়ে ঝাঁটা মারতে আদেশ দিয়েছিলে। রঞ্জনাবিবির সেই কথা মনে পড়তেই তার সামনের এই ফকিরকে চিনতেপারে। তখনই মানিকপীরের পা জড়িয়ে ধরে অপরাধ ক্ষমা কর বলে কাঁদতে থাকে। দয়ার মানিকপীর রঞ্জনার উপর প্রীত হয়ে তার স্বামী পুত্র ঐশ্বর্য সব ফিরে পাবার উপায় বলে দেন। রঞ্জনাবিবিকে নিয়ে মানিকপীর নিজেই হবিরশাহ বাদশার নিকট গিয়ে লালচাঁদকে দাবী করেন, কিন্তু বাদশা বলতে চায় লালচাঁদ তাদেরই পুত্র। তখন মানিকপীরের কথামত প্রাচীরের এক পারে হবিরশাহর স্ত্রী ওঞ্জনাবিবিকে রাখা হল আর এক পারে লালচাঁদকে রাখা হল, দয়ার মানিকপীরের কৃপায় রঞ্জনাবিবির বুকের দুধ প্রাচীর ভেদ করে লালচাঁদের গালে এসে পড়ল। বাধ্য হয়ে হবিরশাহ লালচাঁদের পাওয়ার ঘটনা অকপটে স্বীকার করল এবং রঞ্জনাবিবির দাবী সাব্যস্ত হল, কিন্তু মানিকপীর হবিরশাহর ও তার স্ত্রীর ব্যবহারে প্রীত হয়ে এক প্রস্তাব দিলেন। তাদের ১১ বৎসরের এক কন্যা আছে নাম তার মরুরজান। তার সাথে লালচাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে বললেন। হবিরশাহ সে প্রস্তাবে রাজী হয়ে উভয়ের বিয়ে দিলেন।

বিবাহ সম্পন্ন হলে মানিকপীর হবির বাদশাহকে পরামর্শ দিলেন চাঁদমালার ঘাটে লালচাঁদকে কিছু দিনের জন্য দান সাধার কাজে নিযুক্ত করতে। যে সমস্ত বিদেশী জাহাজ এই ঘাট পার হবে তারা নতুন রাজার সাথে সাক্ষাৎ করে যাবে নতুবা সব মালপত্র বাজেয়াপ্ত হবে। এমনই এক বিজ্ঞপ্তি জারীর কিছুদিন পর কালেশ্বর সদাগর বাণিজ্য করে দেশে ফিরছিলেন। চাঁদমালার ঘাটে এমন বিজ্ঞাপন দেখে নতুন রাজা লালচাঁদের সাথে দেখা করতে আসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দয়ার মানিকপীর। তিনি লালচাঁদকে ও তাঁর স্ত্রী মরুরজান এবং রঞ্জনাবিবিকে সওদাগরের হাতে সঁপে দিলেন। সওদাগর এসব ব্যাপার কিছু না বুঝতে পেরে কারণ জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জনাবিবি এক এক করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। কালেশ্বর মানিকপীরের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে সপরিবারে পুত্র পুত্রবধূ সহ দেশে ফিরে মানিকপীরের নামে গান হাজত দিলেন। গান হাজত দেবার আগে কালেশ্বরের মা

আয়মনাবিবি ও রঞ্জনাবিবি লালচাঁদকে কোলে নিয়ে গলায় কুটো বেঁধে প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে মাগুন করেছিল ও দয়াল মানিকপীরের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিল।

(সংক্ষিপ্ত)

রঞ্জনাবিবির এই কাহিনীটি অনিল হাজরার নিকট থেকে সংগৃহীত। এটি অনিল হাজরা সন্তোষ ঘোষের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কেউ বলেন, পালাগানটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সীতাকুণ্ডু গ্রামের (চটার পাড়) বাসিন্দা ইয়ার আলী ফকিরের লেখা। আবার কেউ বলেন. এটি কলমদ্দিন সাহেবের (সীতাকুণ্ড) সৃষ্টি। কাহিনীটি খুবই জমজমাট। মানিকপীরের যতগুলি কাহিনী আছে তার মধ্যে এই পালাটি ধারাবাহিকতা ও ঘটনা পরম্পরায় সুন্দর। স্থূল হাস্যরসাদিতে পালাটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

মুরদ কাঙালের কাহিনী

দয়াল মানিকপীর ভাই গজকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর নাম জাহির করছেন। কিনু ঘোষ ও রঞ্জনাবিবিকে দোয়া করার পর মানিক এবার এলেন এক কাঙালকে দয়া করতে। কাঙাল-কাঙালিনীর পাতার কুটীর, দুটি সন্তান নিয়ে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকে। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সঙ্গী। ক্ষুধায় কাতর গজকে আহার করাবার জন্য তিনি এই কাঙালের বাড়ি এলেন। কাঙালের নাম মুরদ। সবাই তাকে মুরদ কাঙাল বলে ডাকে। মুরদ কাঙাল পেশায় ঘরামী। ঘর ছাওয়া হলে খাওয়া জোটে নইলে নয়। এমনি সাতদিন তারা অন্নক্লিষ্ট হয়ে আছে এমন সময়—

মানিক পীর ভাই গজকে নিয়ে সেথায় আসে
অন্ন দাও বলে মানিক দ্বারে ভিক্ষা যাচে।

দ্বারে ফকিরের আগমন শুনে মুরদ কাঙাল ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুরদ কাঙালের স্ত্রী খুব দরজাল প্রকৃতির মেয়ে। সে ঝাঁটা দিয়ে ফকিরদ্বয়কে বিদায় করে দিতে চায়, কিন্তু মুরদ তাতে বাদ সাধে। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভীষণ কলহ শুরু হয়। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী দুজনে যুক্তি করে তাদের ছোট ছেলেকে বন্ধক দিয়ে অতিথি সেবা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। একসের চালের জন্য মুরদ তার ছোট ছেলেকে নিয়ে সওদাগর চাচার বাড়িতে যায় ও বলে—

কি বলিব ওগো চাচা দায়ে পড়ে আসতে হয়
একসের চালের দায়ে চাচা, ছেলে বন্ধক দিতে হয়।
শুন গো চাচা বলি তোরে অতিথি আছে আমার দ্বারে
অতিথি বিমুখ হলে পরে চাচা ঘটবে আমার ভীষণ দায়।

সওদাগর চাচা সন্তান বন্ধক রেখে একসের চাল ধার দেওয়া যাবে কিনা তা জানতে অন্দর মহলে গিন্নির কাছে যায়। গিন্নি তখন সওদাগরকে পরামর্শ দেয় ছেলেটিকে বন্ধক নয়, একেবারে সের পাঁচ-ছয় চাল দিয়ে কিনে নিতে। কারণ মসজিদে একটা ছেলে বলি দিলে নাকি সাতজালা টাকা পাওয়া যাবে। এই কথায় বিশ্বাস করে সওদাগর চাচা মুরদ কাঙালের কাছে এসে ছেলেটাকে একেবারে বিক্রি করে দেবার জন্য বলে, কিন্তু মুরদ কাঙাল তাতে

রাজী না হয়ে কেবল বন্ধক দিয়ে চাল নিয়ে আসে। সওদাগর তখন শিশুটিকে হাতে গলায় রশি দিয়ে বন্দিখানায় ফেলে রাখতে ঘাতককে আদেশ দেয়। ঘাতক যখন তাকে রশি দিয়ে নির্মম ভাবে বাঁধছে তখন শিশুটি কেঁদে কেঁদে বলে—

বাঁধিস না বাঁধিস না ঘাতক, জননী নাই কারে কব
তোর বন্ধনে আমার বুক ফেটে যায়, বালক হয়ে কত সব।

শিশুটি পিতাকে ডেকে কেঁদে বলে—

পিতা বলো বলো এই কথাটি, আমার মায়ের কাছে গো
দুধে ভাতে খেয়ে বাছা পালংকে শুয়ে আছে গো।
মা আমার জনম দুঃখিনী নিত্যই ভাড়া ভানে তিনি
এ সব কথা শুনলে জননী কেঁদে হবে পাগলিনী গো।

সন্তান বন্ধক দিয়ে চাল নিয়ে কাঙাল চলে যায়। সন্তান কেমন আছে কাঙালিনীর এই কথায় ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে যায়। চাল পেয়ে কাঙালিনী উনুনে চাল চড়িয়ে দিয়ে জল আনতে যায়। এদিকে দয়াল মানিকপীর মা লক্ষ্মীকে ডেকে কহিতে লাগিল—

কমলা লক্ষ্মী মা আমার বলে ডাকিতে লাগিল
অন্তর্যামী মা কমলা সেখানে আসি উপনীত হল গো
ওরে ও তার মায়া বোঝা ভার।—

মা কমলা এসে উপনীত হলে মানিকপীর মা কমলাকে কাঙালেব বাড়ি গিয়ে রান্না করতে বলেন। মা লক্ষ্মী কাঙালের বাড়ি যেতে রাজী নন। কারণ কাঙালিনী মুখরা কদাচারী হস্তিনী মহিলা, কিন্তু মানিকপীরের অনুরোধে মা কমলা মুহূর্তে পঞ্চব্যঞ্জন সহ অন্ন প্রস্তুত করে অদৃশ্য হন। আর ঘাটে থেকে জল এনে কাঙালিনী তা দেখে অবাক হয়ে যায়। কাঙালকে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে দুটি স্বর্ণথালায় অন্ন বেড়ে ফকিরকে দিয়ে আসার জন্য বলে। কাঙাল দুই থাল অন্ন ও ব্যঞ্জন সাজিয়ে ফকিরের জন্য নিয়ে গেলে ফকির বলেন, তুমি আরও তিন থালা অন্ন নিয়ে এস। এখানে তোমরা তিন বাপপোয় ও আমরা দুজন এক সাথে বসে আহার করব। কাঙাল ছলনার আশ্রয় নিয়ে ছোট ছেলে এখানে নেই বলে এড়িয়ে যেতে চান, কিন্তু বাবাজী অন্তর্যামী তা বুঝতে পারেন। তখন কাঙাল মানিকপীরের পায়ে জড়িয়ে ধরে বলে—

শুন শুন বাবাজী আমি বলি গো তোমায়
কে আপনি আসিয়াছেন আমায় দাওনা পরিচয়
গো— আমি জানব কেমনে।

কাঙালের এই কথা শুনে মানিকপীর নিজের পরিচয় দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যতক্ষণ না তার ছোট ছেলেকে উদ্ধার করে আনতে পারবেন ততক্ষণ তিনি জল গ্রহণ করবেন না। এই কথা বলে দয়ার মানিকপীর বিদায় হলেন এবং স্বপ্নযোগে সওদাগর চাচাকে জানালেন নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে কাঙালের ছেলেকে কাঙালের বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে, নইলে সর্বনাশ হবে। দয়াল মানিকপীরের এই কথা শুনে সওদাগর চাচা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল

এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাঙালের পুত্রকে বন্ধন মুক্ত করে নিয়ে কাঙালের বাড়িএসে হাজির হল। কাঙাল চাচার এই কর্ম দেখে অবাক হয়ে গেল। তখন সওদাগর মুরদ কাঙালকে বলল দেখ কাঙাল, তোমার বাড়ি যে দুইজন ফকির এসেছেন এঁরা সামান্য নন, ইনি দয়ার মানিকপীর। তুমি এখনই দয়াল মানিকপীরের খানার ব্যবস্থা কর, আর সাত গ্রাম মেঙে পেতে বাবাজীর নামে গান হাজত দাও। এই কথা শুনে মুরদ কাঙাল দয়াল মানিকপীরের নামে গান হাজত দিয়েছিল। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে মুরদকে আশীর্বাদ করে গজকে সাথে নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন অন্যত্র নামের জাহির করতে। **(সংক্ষিপ্ত)**

মানিকপীরের পালাগানগুলির মধ্যে মুরদ কাঙালের পালাটির কাহিনীর গভীরতা অন্যান্য পালার তুলনায় কম। অথচ পালাগায়কদের মতে এই পালাটিই আসরে খুব জমজমাট সহকারে গাওয়া হয়।

সুরত বাদশার কাহিনী

দয়ার মানিকপীর কিনু ঘোষ, রঞ্জনাবিবি ও মুরদ কাঙালকে দয়া করে গেলেন সুরত বাদশার দরবারে। এবার তিনি হা-পুত্রকে পুত্র দান করে নিজেকে জাহির করতে চান।

মানিকপীর তাঁর ছোট ভাই হরজিন্দাকে নিয়ে সুরত বাদশার দরবারে এলেন এবং বাদশার কাছে ভিক্ষা চাইলেন। রাজা ভিক্ষা দিতে এলে মানিক তাঁর ভিক্ষা অগ্রাহ্য করেন। কারণ বাদশা হা-পুত্র। তিনি বাদশাকে দোয়া করতে চাইলেন, কিন্তু বাদশা পীর ফকিরদের উপর বিশ্বাস একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন। পুত্র লাভের জন্য তিনি অনেক ফকির দরবেশের দোয়া মেঙেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নি, আর এই ফকির তাঁর সন্তানের মুখ দেখাবেন এ তাঁর প্রত্যয় হয় না। মানিকপীর তখন আল্লার কাছে প্রার্থনা করে আগে জেনে নিলেন বাদশার নসীবে কোন পুত্র সন্তান আছে কিনা। তিনি জানলেন বাদশার কোন পুত্র সন্তান নেই। তার কারণ পৃথিবীতে আসার আগে তিনি আল্লার নিকট ধনসম্পদ ও পুত্র সন্তানাদির মধ্যে কেবল ধন সম্পদ কামনা করেছিলেন। তাই সুরত বাদশা পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেননি। মানিকপীর তখন আল্লার নিকট সুরত বাদশার পুত্র সন্তান দানের জন্য প্রার্থনা করলেন। নতুবা মানিকপীরের নাম পৃথিবীতে দয়ার মানিকপীর বলে জাহির হবে না। মানিকের জাহিরের জন্য আল্লা সুরত বাদশাকে সন্তান দিতে রাজী হলেন বটে কিন্তু তাঁর হায়াত (পরমায়ু) দিলেন মাত্র বারো বৎসর। আল্লার কথামত তাঁর প্রদত্ত একটি গুলাল ফুল মানিক এনে রাজার হাতে দিয়ে রানীকে খাওয়াতে বললেন এবং মালিকের কথাটিও জানিয়ে দিলেন, রাজার যে পুত্র সন্তান হবে সে বারো বৎসরের বেশি বাঁচবে না। এই কথা শুনে রাজা ফুল নেবেন কিনা চিন্তা করতে লাগলেন। কারণ পুত্র নেই সে বরং ভাল, কিন্তু পুত্র লাভের পর সে যদি মারা যায় তা আরও কষ্টকর। তাই তিনি রানীর নিকট পরামর্শ চাইতে গেলেন। রাজা-রানী এক সাথে বসে অনেক আলোচনান্তে স্থির করলেন যে বাচ্চার বয়স যখন দশ বৎসর হবে তখন তাঁরা দুজনেই আত্মহত্যা করবেন, আর তাঁদের সন্তান দুই বৎসর

বাদশাহী করবে। তাহলে সন্তানের মৃত্যুশোক তাদের আর পোহাতে হবে না। এই কথা চিন্তা করে রাজা ফকিরের দোয়া প্রার্থনা করলেন। তিনি মানিককে জানালেন যতদিন রানীর সন্তানাদি না হবে ততদিন যদি তাঁরা রাজবাড়িতে থাকেন তাহলে তিনি তাঁদের দোওয়া নিতে রাজী আছেন। মানিকপীর রাজার এই কথায় রাজী হয়ে গেলেন ও দোয়া দিয়ে রাজবাটীতে থেকে গেলেন।

ফকিরের দেওয়া গুলালফুল বেটে খেয়ে রানী গর্ভবতী হলেন। দশ মাস দশ দিন পবে রাজাব পুত্র সন্তান হলে মানিকপীর রাজার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিদায় করতে বললেন, কিন্তু বাজা মানিকপীরকে অনুরোধ করে বললেন এখন তাঁর স্ত্রী অপবিত্র আছেন। একচল্লিশ দিন পার হলে রানী শুচিতা ফিরে পাবেন তখন তিনি তাঁকে বিদায় করবেন। দিনে দিনে দুইমাস অতিবাহিত হবার পর মানিকপীর বিদায় হতে চাইলে রাজা বলেন ছয় মাসে যখন পুত্রেব অন্নপ্রাশন হবে তাতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের দাউত করে তাদের নিকট দয়াল মানিকপীবের নাম ও মাহাত্ম্য প্রচার করবেন তারপর মানিকপীরকে বিদায় করবেন। অন্নপ্রাশনে মানিকপীর সন্তানের নাম রাখলেন আলমতাজ। রাজা সমস্ত আত্মীয় বন্ধুদের নিকট মানিকপীরের নাম ও মাহাত্ম্য প্রচার করলেন। মানিকপীর এবার রাজার নিকট বিদায় চাইলেন। এবার বাদশা জানালেন আমার সন্তানকে সুন্নৎ না দিয়ে তোমাকে বিদায় করব না। এই দিন মা-বাবার মনে দুঃখ থাকে, কারণ একটা অঙ্গ ছেদন করতে হয় বলে এই দুঃখ। মানিকপীর সামনে থাকলে রাজা-রানীর কোন দুঃখ থাকবে না। রাজার অনুরোধে আলম তাজের সুন্নৎ দিন পর্যন্ত মানিকপীর থেকে গেলেন। বহু আত্মীয়স্বজন এলে রাজা তাদের নিকট মানিকপীরের দোওয়াব কথা জানালেন। এবার মানিকপীর বিদায় চাইলেন। সুরত বাদশা মানিককে বিদায় করতে চাইলেন না। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানিকের নিকট বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য মনস্থ করে দয়াল মানিকপীরকে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন। বাদশার অনুরোধে মানিকপীর আলমতাজের বিদ্যা শিক্ষার ভার নিলেন। বহুদিন এইভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। মানিকপীর এবার বিদায় নিতে চাইলেন। রাজা এবার বললেন আপনি আমার পুত্রের বাদশাহী শিক্ষা দিয়ে বিদায় নিন। কারণ বাদশার পুত্র বাদশাহী করবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু ন্যায় শিক্ষা না হলে পুত্র দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। রাজ্যে তাতে অমঙ্গল হবে, মানিকপীরের অখ্যাতি হবে। তখন মানিক আবার আলমতাজকে বাদশাহী শিক্ষা দিতে রয়ে গেলেন। বাদশাহী শিক্ষা সমাপন হলে মানিক বিদায় নিতে চাইলেন। এবার বাদশা বলেন আমার ছেলেকে বিয়ে না দিলে আমি আপনাকে বিদায় করব না। যে ছেলেকে আপনার কৃপায় আমি লাভ করেছি সেই ছেলের বিয়ের দিন আপনাকে না দেখতে পেলে আমার দুঃখের দিন হবে, সুখের বিষয় হবে না। আপনি নিজেই কন্যা দেখে ছেলেকে বিয়ে দিলে আপনার সকল কার্য সমাপন হবে। তখনই আপনাকে আমি বিদায় দেব। দয়ার মানিক তখন বড়ই চিন্তায় পড়লেন। কারণ এই ছেলের বারো বছরের বেশি হায়াত নেই। নির্জনে বসে হিসাব করে হিসাবে রাখেন আঁখিঐ ছেলের বারো বছর পূর্ণ হতে আর ছয়দিন মাত্র বাকী। ছয় দিন বাকি দেখে মানিকপীর হায় হায় করে কাঁদতে লাগলেন। বিলাপ করতে

লাগলেন — জাহির করতে এসে আজ আমার ভরাডুবি হয়ে গেল। তখন ছোট ভাইকে সমস্যার কথা জানালে হরজিন্দা দাদাকে পরামর্শ দিলেন আলমতাজকে বিয়ে দিতে। মৃত্যুর ছয় দিন বাকি থাকলেও আল্লা যদি এর জোড় পয়দা করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই এর সাদি হবে। এই কথা শুনে মানিক আলমতাজের পাত্রী খুঁজতে বার হলেন।

তিনি প্রথমে নাসিরশা বাদশার বাড়িতে এলেন। তাঁর কন্যার সাথে আলমতাজের বিয়ের প্রস্তাব দেন। নাসিরশা এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন, কিন্তু যখন মানিক তাকে শোনালেন আজকের দিন ছাড়া তার মৃত্যুর দুটি দিন মাত্র আছে বাকি তখন এই কথা শুনে নাসিরশা তাঁর মত ফিরিয়ে নিলেন। বাদশা বললেন আপনার বাক্য কোন দিন মিথ্যা নয়। অতএব এমন পাত্রের সাথে আমার কন্যার বিয়ে দেব না। এরপর মানিক গেলেন উমিরচাঁদ নামক এক বাদশার নিকট। তিনি জেনেছিলেন উমিরচাঁদের একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। মানিকের প্রস্তাবে উমিরচাঁদ সুরত রাজার পুত্রের সাথে কন্যার বিয়ে দিতে রাজী হলেন, কিন্তু মানিক তাঁকে জানালেন আজকের দিন ছাড়া একটি দিন মাত্র সে জীবিত থাকবে। এই কথা শুনে উমিরচাঁদ সবিনয়ে তাঁর মত ফিরিয়ে নিলেন। এবার মানিক খুব চিন্তায় পড়লেন। মৃত্যুর মাত্র একদিন বাকি। মানিকপীর ভাই হরজিন্দাকে এই সমস্যার কথা জানালে হরজিন্দা পরামর্শ দেন যে এই বাড়িতে যে দাসী আছে তার একটি সর্বসুলক্ষণ যুক্ত মেয়ে আছে। আলমতাজের মৃত্যু দিনের কথা গোপন করে ঐ মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করুন। মানিকপীর এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কারণ মিথ্যা কথা বলে তিনি বিয়ে দিতে পারবেন না। তবুও দাসীর নিকট তিনি প্রস্তাব দিতে চাইলেন। পরদিন তিনি ভাড়ানীর বাড়িতে গিয়ে আলম তাজের সাথে তার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। এই প্রস্তাবে ভাড়ানী যেন এক অলৌকিক দৈববাণী শুনল, বিশ্বাস করতে পারল না। মানিকপীর বিশেষ ভাবে বলতে বিশ্বাস করে নিল। এবার মানিক যখন জানালেন এই বালকের মৃত্যু হবে আজ দ্বিপ্রহরের পরে। তখন ভাড়ানী তার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী হল না, কিন্তু ভাড়ানীর মেয়ে বলে দয়ার মানিককে তুমি প্রত্যাখ্যান কোরো না। এতে আমাদের অমঙ্গল হবে। আমি ভাড়ানীর ঘরে জন্মেও বাদশার বাড়ির বউ হব— এ আমার পরম সৌভাগ্য, এতে তুমি অমত কোরো না। তখন ভাড়ানী মেয়ের কথায় রাজী হয়ে গেল।

মানিক এই রায় পেয়ে রাজার নিকট গেলেন এবং আজই তার বিয়ের আয়োজন করতে বলেন। তখন রাজা মানিকপীরকে সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে সন্তানের বিয়ে দিয়ে আনতে বললেন। কারণ বাদশার ছেলের বিয়েতে মানিকপীর বরযাত্রী হবেন —এতো পুত্রের পরম সৌভাগ্য। দয়ার মানিক আলমতাজকে বর সাজিয়ে নিয়ে ভাড়ানীর বাড়িতে গেলেন এবং সোনাদানা যাবতীয় দিয়ে সাজিয়ে নিজে কলেমাদি পড়িয়ে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গেলেন। বাদশার বেটা বউকে বাসর ঘরে তুলে দিয়ে মানিকপীর নিভৃতে ক্রন্দন করছেন। কারণ তাঁর বরপুত্রের মৃত্যু হবে আজ, এ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন। অথচ নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করবে কে? আজ তিনি আলমতাজের মৃত্যু দৃশ্য দেখার আগেই বিদায় হতে চান।

বাসর ঘরে বউ-বেটাকে দিয়ে মানিক সুরত বাদশাকে খুঁজছেন, দেখেন ছোট ভাই

হরজিন্দার কাছে বসে আছেন। তখন মানিকপীর তাঁকে বিদায় করবার জন্য রাজাকে বলেন। রাজা বলেন আগে আমি আমার বউ বেটার মুখ দেখব তারপর আপনাকে বিদায় করব, কিন্তু মানিকপীর বিদায় না হয়ে রাজাকে বউ-বেটার মুখ দেখতে দিতে রাজী নন। রাজা তখন মনে মনে ভাবছেন দয়ার মানিক এমন নির্দয় বাক্য কোনদিন বলেননি, আজ কেন এমন নির্দয় কথা বলছেন। মানিকপীর রাজার হাত ধরে রেখেছেন, মানিককে বিদায় না করলে তাঁর বউ-বেটার মুখ দেখতে দেবেন না। রাজা অনন্যোপায় হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন দয়াল পীর আমি আপনাকে আজই বিদায় করব তবে বলে যান আমার পুত্রের মৃত্যুর বারো বছর পূর্ণ হতে আর কত দিন বাকি আছে? দয়াল মানিক বলেন তুমি সে কথা শুনতে চেয়ো না। আমার সময় চলে যায় তুমি আমার আগে বিদায় কর। সুরত বাদশা পুত্রের মৃত্যুর সময় না শুনে মানিককে কিছুতেই বিদায় করবেন না ও বউ-বেটার মুখ দেখবেন না। তখন মানিক বলেন—

তোমার যাদুর মৃত্যু বলি তোমার তরে।
আজ মৃত্যু হবে রাত দ্বিপ্রহর পরে।।

সুরত বাদশা তখন বলেন দয়াল মানিক তবে এই কারণে আজ বিদায় হতে চান? তবে দয়াল মানিক.আপনি আমার পুত্রের সকল কর্ম করেছেন এই কর্ম কেন বাকি রাখবেন—আমার যাদুর আজ যদি মৃত্যু হয় তাহলে যাদুর গোরে মাটি দিয়ে যান— আপনার আর কোন কর্ম করতে হবে না। আমার ছেলেকে মাটি না দিলে আপনাকে বিদায় করব না। মানিকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাসর ঘরে গিয়ে বউমাকে বলেন—

আজকে তুমি ঘুমিয়ো না,
আমার যাদু মারা যাবে আজ দ্বিপ্রহর রাতে
মানিকপীরের কাছে আমি এই মিনতি জানাই
আমার ছেলের বিপদ কালে দালান বাড়িতে খবর যেন পাই।

মানিকপীর আবার বললেন তুমি তোমার বউ-বেটাকে দেখেছ, এইবার আমাকে বিদায় করে দাও, তখন রাজা বলেন—

কাল আমি তোমায় বিদায় করব খাঁটি
আমার বেটার মৃত্যু হলে গোরে দিলে মাটি।

তখন মানিকপীর মনে মনে ভাবছেন আমার বরপুত্রের গোরে আমি কেমনে দেব মাটি।

এদিকে আল্লার আরস মহলার মধ্যে আসরাইলকে বলছেন আসরাইল আজ রাত্রে দ্বিপ্রহরে মৃত্যু হবে কার? আসরাইল বলছেন আপনি সব জানেন। আমাকে জিজ্ঞাসা যখন করছেন তখন জানাই আজ দ্বিপ্রহরে প্রথম মৃত্যু হবে সুরত বাদশার ছেলে আলমতাজের। আল্লা তার জান কেড়ে আনতে হুকুম দিলে আসরাইল মুহূর্তে বাদশা-পুত্রের বাসর ঘরে উপস্থিত হলেন। ভাড়ানীর মেয়ে নববধূ তা জানতে পারল। নববধূ দালান বাড়িতে শ্বশুর মশাইকে খবর দিল। সেখানে তিনি বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। মানিকপীর এসে আসরাইলকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জানালেন তুমি যাঁর হুকুম পালন করতে এসেছ তাঁর কাছে

ফরিয়াদ করতে আমার কিছু সময় দাও, এখনো কিছু সময় বাকি আছে। মানিকপীর তখন আল্লাকে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করছেন—

হক হক মওলানা তুমি পর্বতের চূড়া
তুমি যাকে গজব কর সেই হয় গুড়া
তুমি যাকে বাঁচাও বাঁচে সেইজন
কিছুদিনের জন্য বাদশা ছেলেকে বাঁচাও এখন।

মালিক তখন মানিককে জানালেন আল্লার দরবারে তোমার নাম কাটা যাবে। কারণ আমাব কলম কখনো রদ হয় না। বাদশাপুত্রের বারো বৎসরের বেশি হায়াত লেখা নেই। তখন মানিক বলেন—

যদি ওর হায়াত থাকলে বাঁচত
তাহলে রাখুন আমার বাত
আপনার দপ্তরে দেখুন আমার কত বৎসর হায়াত।

আল্লা বলেন তুমি যেভাবে আমার নাম জপ করছ তাতে তোমার হায়াতের কোন সীমা সংখ্যা নেই বরং আরও বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানিক জমিনে মাথা খুঁটে প্রার্থনা করে বলেন আমার হায়াত থেকে শত বৎসর কেটে নিয়ে আলমতাজকে দিন। তখন আল্লা আসরাইলকে হুকুম করলেন আলম তাজকে ফিরিয়ে আনতে। আলমতাজ এলে মালিক তার হায়াতেব সাথে আরও একশত বৎসর যোগ করে দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। পুত্র পুনরায় জীবন দান হওয়ায় সুবত ও মানিক উভযে খুশি হলেন। তারপর মানিক সুরত বাদশার নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এবং সেই থেকে দয়াল মানিকপীরের নাম জাহির হল।

(সংক্ষিপ্ত)

মানিকপীরের পালাগানকে কেন্দ্র করে গৃহস্থ বাড়িতে কিছু সংস্কারাদি পালিত হয়। বিশেষত মানিকপীরের পালাগান যে গৃহস্থ বাড়িতে হয় সেদিন সে বাড়িতে কাঁকড়া ও কচ্ছপের মাংস খাওয়া নিষেধ। অন্য দিন খাওয়ায় বাধা নেই। আবার পালাগানের আসরে পালাগায়ক উল্লেখযোগ্য কিছু নিয়মনীতি পালন করেন। যথা মোকামপাতা, আশাবাড়ি পোঁতা ইত্যাদি। পালাগায়ক পালা শুরুর আগে ওজু ও গোসল করে মাথায় টুপি বা রুমাল দিয়ে একটি কাঁঠালকাঠের পিঁড়িতে (অভাবে যেকোন কাঠের পিঁড়ি) একটি নতুন গামছা পেতে পাঁচটি মোকাম পাতেন। মোকাম পিঁড়ির চারকোণে চারটি ও মাঝখানে একটি থাকে। তারপর পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারী, পাঁচটি কলা ও পাঁচটি রূপার সিকি (অভাবে বর্তমান সিকি), পাঁচটি গোবরলাড়ু, পাঁচটি মোকাম রূপে স্থাপন করা হয়। প্রতিটি গোবরলাড়ুর উপর একটি করে বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পালাগায়ক একটি কলেমা পাঠ করেন। গোবরলাড়ু দেওয়ার কারণ হিসাবে পালাগায়ক জানান গোয়াল হল গঙ্গা এবং গোবরে মা লক্ষ্মীর আসন পাতা আছে বলে গোবর মোকামে লাগান হয়। মোকামের পাশে একটি ছোট বাড়ি (গরু তাড়ান দড়ি লাগান বাড়ি অথবা খেঁজুর ছাঁট) রাখা হয়। সমস্ত পীরগাজীর পালায় মোকাম সাজান এই রীতি পালিত হয়।

মোকাম সাজানোর পর যাঁরা ক্ষীর মালসার মানসিক করেন তাঁরা নতুন মালসায় দুধ, জল, চাল দিয়ে, নতুন ইটের চুলো করে, গোয়ালে রান্না করেন। জ্বালানি হিসাবে নারকেল-পাতা বা পাটকাঠি ব্যবহার করা হয়। ক্ষীরভাত হলে পর কলাপাতার উল্টো পিঠে ক্ষীরভাত ঢেলে ও চিনি, বাতাসা, সন্দেশ দিয়ে হাজতেব কলেমা পড়ে হাজত দেওয়া হয়। পালাগান শেষ হলে বা শেষ হওয়ার পূর্বে তা বিতরণ করা হয়। হাজতের সময় বাতাসা লুঠ দেওয়া হয়। তারপর পালা শুরু হয়।

মানিকপীরের গানের আসরে আশাবাড়ি পোঁতার একটা বিশেষ নিয়ম আছে। আশাবাড়ি না গেড়ে হাজত হয় না। আশাবাড়ি হল পীর বা গাজীর হাতের দণ্ড বা হাতিয়ারের প্রতীক। এটি বেলকাঠের, অনেকখানি খন্তা বা শাবলের মত। মাথায় তিনটি খাঁজ থাকে ও চারটি দাঁতের মত সৃষ্টি হয়। নতুন গামছা জড়িয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎসর্গ করে রাখা হয়। ব্রাহ্মণ উৎসর্গ করলেও এটি মৌলবীর কাছে দেওয়া হয়। তিনি মসজিদে গিয়ে এটিকে বিশেষ নিয়মে শোধন করেন। এটি হল গায়কের আশাবাড়ি। যেকোন পীর, গাজী বা বিবিমার গানের পূর্বে এটি গাড়া হয়। পুরুষ পরম্পরায় যাঁরা গৃহে আশাবাড়ি রেখেছেন তাঁদের বাড়িতে এটি আর পুঁততে বা গাড়তে হয় না। আশাবাড়ি যেখানে গাড়া হয় সেখানে প্রথমে একটা গর্ত করে তাতে ধান, দূর্বা, তুলসীপাতা, দুধ, মধু, তামার পয়সা দেওয়া হয়। তারপর বেলকাঠের দণ্ডটি লাল বস্ত্র জড়িয়ে পোঁতা বা গাড়া হয়। গান শেষ হলে গায়ক এটি নিয়ে চলে আসেন। পালাগায়ক একটি আশাবাড়ি নিয়ে বহু আসরে গান করেন। হিন্দু গায়কগণ গান শেষে আশাবাড়ি নিয়ে গোলার ধারে বা ঠাকুর স্থানে সযত্নে রক্ষা করেন, মুসলমান হলে পবিত্র কোন স্থানে তা রাখেন। এটি পবিত্রতার প্রতীক। বলা বাহুল্য উপর্যুক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট রীতিতে আশাবাড়ি প্রোথিত করে পীরের হাজত ও মোকামের মাধ্যমে মানিকপীরের আসর পত্তন করা হয়।

চামর হাতে মূল গায়ক বা মহড়া গায়ক সপার্ষদ আসরে মানিকপীরের পালা পরিবেশন করেন। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সঙ্গে ব্যবহৃত হয় হারমোনিয়াম, বাঁশী, কাড়ানাকাড়া, করতাল, ঢোলক ইত্যাদি। সম্প্রতি ক্যাসিও বাদ্যযন্ত্রটিও ব্যবহৃত হয়। নৃত্যগীত ও বাদ্যের মাধ্যমে মানিকপীরের লোকায়ত পালাগান আসরে পরিবেশিত হয়। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ সাগ্রহে মানিকপীরের পালার শ্রোতা হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

চব্বিশ পরগণায় মানিকপীর কেন্দ্রিক যে আচার আচরণ, সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, পালাগান ইত্যাদি প্রচলিত আছে, তাতে মানিকপীরের উৎস সম্পর্কে যে ভাবনার উদ্রেক করে তা হল ধর্মঠাকুর ও মানিকপীর এক এবং অভিন্ন। এই মতের সমর্থন পালাগানে আছে। মানিকপীরকে সনাতন ও নিরঞ্জন বলা হয়েছে। আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, পীররূপে তুমি সনাতন। সনাতন নামটি ধর্মঠাকুরের অনেক নামের মধ্যে একটি। দ্বিতীয়ত মানিকপীরের ছায়াসঙ্গী হলেন ভ্রাতা গজপীর। চব্বিশ পরগণায় ধর্মঠাকুরেরও একজন অনুচর মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর নাম দক্ষ বা কালুরায়। তৃতীয়ত মানিকপীরের আজ্ঞাবহ হল হংসপক্ষি, ধর্মঠাকুরের আজ্ঞাবহ তেমনি হংস ও উলুক। চতুর্থত

মানিকপীরের মূর্তির রং সাদা, ধর্মঠাকুরের মূর্তিও সাদা। পঞ্চমত ধর্মঠাকুর রুষ্ট হলে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়, মানিকপীরও কুষ্ঠব্যাধি দিয়ে দুর্বিনীতকে শাস্তি দেন। তাছাড়া লোকবিশ্বাসে উভয় দেবতার কৃপায় গোসম্পদ রক্ষাপায়, সন্তানহীনা সন্তান লাভ করেন, চক্ষুরোগ, যেকোন চর্মরোগ ইত্যাদি আরোগ্য হয়। ষষ্ঠত ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে যেমন ষাঁড় ছেড়ে দেওয়া হয় (ধর্মের ষাঁড়) তেমনি মানিকপীরের উদ্দেশ্যে ষাঁড়বাহন মানিকপীরের ছলন অথবা কেবল ষাঁড়ছলন মানিকপীরের প্রতিরূপ কল্পনা করে দেওয়া হয় (এই রীতি মহাদেবের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করা যায়)। পূজাভাবনার মধ্যেও উভয় দেবতার সাদৃশ্য প্রমাণ করে। গৃহস্থ সাধারণত শুক্লপক্ষে অথবা পূর্ণিমার দিন গোয়াল ঘরে মানিকপীরের পূজার ব্যবস্থা করেন, ধর্মঠাকুরের প্রধান পূজাও শুক্লপক্ষ বা জাতপূর্ণিমার দিন হয়ে থাকে। এমনই বহু প্রমাণ আছে যা মানিকপীর ও ধর্মঠাকুরকে অভিন্নদেবতারূপে কল্পনার সহায়ক। প্রসঙ্গক্রমে অনুমান করা যায়—পঞ্চদশ শতকের পর বাংলায় মুসলিম বিজয় হলে যখন হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধন হয় বা ধর্মান্তরিতকরণ চলে, তখনই খ্রীস্টপূর্ব যুগের ঐতিহ্যময় উপাস্য লোকদেবতা ধর্মঠাকুর সুফী সাধকদের সুফীভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছুটা ইসলামি কায়দায় দয়ার মানিকপীর রূপে পূজিত হচ্ছেন। অদ্যাপি চব্বিশ পরগণা তথা বাংলার লোকসমাজের বিশ্বাস, মানিকপীর অমর এবং তিনি ভক্তের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ হতে রক্ষাকারী কাল্পনিক লৌকিক দেবতা। এইরূপ মন্তব্যের আংশিক সমর্থন মেলে ডঃ সুকুমার সেনের একটি মন্তব্যে। তিনি বলেন, "হিন্দুর দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনীকে মুসলমান পীরপীরাণীর মাহাত্ম্য কাহিনীতে ঢালাই করার প্রচেষ্টা প্রকট হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। ইতিমধ্যে একাধিক লৌকিক দেবদেবী যাঁহাদের মাহাত্ম্য জনসাধারণ অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করে এসেছে তাঁদের প্রতিরূপ মুসলমান জনগনের মধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছে। ফকির মোহম্মদের মানিকপীরের গানে দেখেছি যে মানিকপীর সময়ে সময়ে যেন শিবের ছদ্মবেশ।"[৫]

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যায় যে, মানিকপীরের সাথে এই অঞ্চলে বহু পূজিত সত্যপীর, বা সত্যনারায়ণের পূজাচারেরও যথেষ্ট মিল আছে। ধর্মঠাকুর, মানিকপীর সত্যনারায়ণ এই তিন লৌকিক দেবতার পূজা পূর্ণিমা তিথিতে বা শুক্ল পক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস—সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি লাভ, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ আপদ হতে মুক্তি লাভ ইত্যাদি এই দেবতাদের কৃপায় সম্ভব। সুতরাং এই তিন দেবতার মধ্যে একের বহু প্রকাশের তত্ত্ব ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে।

পাদটীকা

১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গলা ভাষার অভিধান, সাহিত্য সংসদ।
২. ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ।
৩. ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, মানিকপীর প্রবন্ধ।
৪. মহম্মদ পিজিরুদ্দীন, আদি ও আসল মানিকপীরের কেচ্ছা।
৫. ডঃ সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪০০ আঠারো-ভাটির পাঁচালী, পৃ: ৭৩।

পীর ও গাজীপালা ঃ বড়পীর সাহেব

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক জনপ্রিয় পালাগানের মধ্যে বড়পীর সাহেবের লোকায়ত পালাগান অন্যতম। পালাগান আলোচনায় এটি পীর ও গাজীপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে বড়পীর সাহেব বহু পূজিত এক লৌকিক দেবতা। এই অঞ্চলে তাঁর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক স্বতন্ত্র পালাগান প্রচলিত আছে। অনেক লৌকিক দেবতার ন্যায় তাঁর মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া আছে তাঁকে নিয়ে নানা লোককথা, গান, পালাগান, ফকিরি গান ইত্যাদি। চব্বিশ পরগণায় বড়পীর সাহেবের নামে যে পালাগান প্রচলিত আছে তা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা বড়পীব সাহেবের পালা, এরেনশা বাদশার পালা, সুরজ জামালের পালা ইত্যাদি। নাম ভিন্ন হলেও পালার বিষয়বস্তুর তেমন কোন পরিবর্তন নেই। বড়পীর সাহেবকে নিয়ে যে ফকিরি গানের প্রচলন আছে তাকে অনেকে 'বড়পীর সাহেবের অকেয়া' বলে।

বড়পীর সাহেবকে অনেক গবেষক ঐতিহাসিক পীর বলেছেন। 'হজরত বড়পীরের জীবনী' নামে রেজাউল করিম, মৌলবী আজহার আলী, কাজী আসরফ আলী প্রমুখ লেখকগণ গ্রন্থ প্রণয়ণ করেছেন। উক্ত গ্রন্থকার গণের গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে বড়পীরের যে পরিচয় মেলে তাতে তাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে হয়। গ্রন্থে বর্ণিত পরিচয় অনুযায়ী বড়পীরের প্রকৃত নাম পীর হজরত মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাজী। তাঁর পিতার নাম হজরত আবু সালেহ্ মুসা জঙ্গী এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতেমা। তিনি পিতার দিকের ইমাম হাসান এবং মাতার দিক থেকে ইমাম হোসেনের বংশোদ্ভুত। ইংরাজী ১০৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে বা ৪৭০ বা ৪৭১ হিজরীর ১লা রমজান ইরাণের জিলান জেলার নীপ নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি অলির সম্মান পান। আঠার বছর বয়স পর্যন্ত কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বিদাভ্যাস করেন ও পণ্ডিত হন। বাগদাদে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মহান এন্তেকাল বা মৃত্যুর তারিখ ইং ১১৬৬ খ্রীস্টাব্দ বা ৫৬১ হিজরীর ১১ই রবিউল

আউয়াল। তাঁর মাজার বোগদাদ শহরে আছে। তিনি বাংলায় এসেছিলেন কিনা তার সঠিক প্রমাণাদি নেই তথাপি বাংলার বহুস্থানে তাঁর কাল্পনিক দরগা আছে।[১]

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত পালাগানে বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই অঞ্চলের লোকসমাজে তিনি লৌকিক দেবতা রূপে পূজা-হাজত পান। তিনি সর্ব রোগশোক-তাপহর দেবাদিদেব মহাদেবের মত। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী লৌকিক দেবতা। বিশেষত বজ্রাঘাতের আকস্মিকতা থেকে তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন। ঝড়বাদলের দিন যাত্রাকালে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ সংস্কার বশত 'জয় বাবা বড়পীর সাহেব'— বলে বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করেন। মাঝি মাল্লা বিশেষত নদী বা সমুদ্রে যাঁদের জীবিকা তাঁরা নদী বা সমুদ্রে কর্মরত অবস্থায় ঝড়জল শুরু হলে বড়পীর সাহেবের নাম স্মরণ করেন। ঝড় জলের আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে দেবীবিশালাক্ষীকেও স্মরণ করার কথা জানা যায়। পালাগান তথা বিভিন্ন পাঁচালি গ্রন্থে দেখা যায় মোবারক-গাজী, গোরাচাঁদপীর প্রমুখ ঐশী ক্ষমতা সম্পন্ন পীরগণ বিপদে পড়ে বড়পীর সাহেবের স্মরণ করে কৃপাধন্য হয়েছেন। সুতরাং বড়পীর সাহেব শুধু সাধারণ মানুষকে নয়, পীর-গাজীদেরও অভীষ্ট দান করেন। এই কারণেই হয়তো চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অতীব শ্রদ্ধার সাথে শুদ্ধাচারে বড়পীর সাহেবের গান হাজত দিয়ে তাঁর কৃপাধন্য হতে চান। সব পীরের আদিপীর হিসাবে বড়পীর সাহেব এই অঞ্চলের মানুষের কাছে পূজিত হন। হিন্দুগণ তাঁকে দেবাদিদেব মহাদেবের সাথে এক ও অভিন্ন করে ভাবেন এবং উৎসগত তাৎপর্যেও তিনি আদিদেব মহাদেবের সাথে তুলনীয়। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পরবর্তী কালে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণের নিকট মহাদেব বড়পীর সাহেব রূপে পূজিত হন বলে অনুমান করা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট তিনি আদিদেব আদিপীর হিসাবেই পূজনীয়।

বড়পীর সাহেবের বহু কাল্পনিক দরগা চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানে আছে। বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে এর সংখ্যাধিক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। জয়নগর থানার শান্তিপুর গ্রামে বড়-পীর সাহেবের থান খুবই জাগ্রত। এখানে বহু প্রাচীন এক বটগাছের তলায় বাঁশঝাড়ের কোলে বড়পীরের থান আছে। একই থানে বনবিবি, ওলাবিবি ও মানিকপীর আছেন। এই স্থানটি 'বড়পীরতলা' নামে পরিচিত। এখানে বড়পীরের এক বিশাল মূর্তি আছে। ১৩৮০ সালে ২২শে চৈত্র সেবক নকুলচন্দ্র দাস ও তস্য পুত্র পালানচন্দ্র দাস শিল্পী হীরালালকে দিয়ে মূর্তিটি নির্মাণ করান। পীরের মূর্তিটি বিশাল এক সাদা ঘোড়ার উপর আরূঢ়। তাঁর বাম হাতে বন্দুক, ডানহাতে অভয় মুদ্রা, বিশাল লোচন, হাসিখুশি মুখ, গৌর বর্ণ, মুসলিম চাঁপ দাড়ি ও গোঁফ, দীর্ঘ দেহ। তাঁর মাথায় সবুজ পাগড়ি। পাগড়িটির মাঝখানে আস্ত ঝুনো নারকেল উল্টো করে বসানর মত উঁচু ও চারদিকে পাঞ্জাবী পাগড়ির মত বেড়। গায়ে কালো জ্যাকেট, লাল ফুলহাতা জামা, তাতে সাদা ছোপ। পরনে পায়জামা ও পায়ে নাগরা জুতো। পীরসাহেবের কপালে লাল তিনটি ভাঁজ বা দাগ। মূর্তিটি সিমেন্ট বালি দিয়ে নির্মাণ

করা হয়েছে। এক হিন্দু মহিলা এই পীরের দরগায় নিত্য সন্ধ্যা দেন, ধূপ জ্বালেন, প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২২ তারিখে বিশাল মেলা বসে। এটিই বাৎসরিক পূজা। মেলার সময় বড় পীর সাহেবের গান হয়। সেই গানের সাথে মানিকপীর, বিবিমার পালাগান গাওয়া হয়।

বড়পীর সাহেবের সব দরগায় পীরের মূর্তি দেখা যায় না। কোথাও বট, অশ্বত্থ, পাকুড় প্রভৃতি গাছের গোড়ায় উঁচু মাটির ঢিপিকে বড়পীর সাহেবের থান কল্পনা করা হয়, কোথাও ইটের বেদী নির্মাণ করে বড়পীরের থান মনে করা হয়। এ ছাড়া সৌধ মধ্যেও পীরের দরগা আছে। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে, চব্বিশ পরগণায় বহু স্থানে বড়পীরের সাধারণ থান আছে, যেখানে এখনও নিত্য ধূপবাতি দেওয়া হয়, বাৎসরিক অনুষ্ঠানাদি হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসাত থানায় খামারপাড়া-খাসপুর, আমডাঙ্গা থানায় জীরাট গ্রামে, হাসনাবাদ থানায় হরিপুর গ্রামে, হাড়োয়া থানায় শঙ্করপুর গ্রামে, বাদুড়িয়া থানায় আটলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বড়পীর সাহেব খুবই 'জাগ্রত'। উক্ত দরগাগুলির মধ্যে আটলিয়া গ্রামের দরগাটির একটি রোমাঞ্চকর কিংবদন্তী আছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

আটলিয়া গ্রামে বিশ্বম্ভরপ্রসন্ন দাস নামে রুহিদাস সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির বসতি ছিল। ফুলমতী দাস তাঁর পত্নী। সরষের ফুল তুলতে গিয়ে সরষেক্ষেতে একবার ফুলমতীর ওপর দৈবভর হয়। তিনি সেখানে তারকনাথের নামে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে পূজা করার স্বপ্নাদেশ পান। সেই আদেশ মত তিনি একটি থান স্থাপন করে সেখানে পূজা দিতে আরম্ভ করেন। আশপাশের বহু ভক্ত সেই পূজানুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন। অনেকে সেখানকার ফুল মাটি ব্যবহার করে রোগ নিরাময় লাভ করেন। ফুলমতীর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মঙ্গল দাস সেই থানে যথারীতি পূজা দিতেন। মঙ্গল দাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী জীবিকা নির্বাহ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং জীবিকার সন্ধানে নাবালক সন্তানগণকে নিয়ে রুদ্রপুর নামক গ্রামে চলে যান। গ্রাম ত্যাগের পরে মঙ্গলের স্ত্রী শ্রী শ্রী তারকনাথের স্থানটি দেখাশুনা করার জন্য মেসিয়া গ্রাম নিবাসী মোহম্মদ এলাহি বক্স নামক এক সজ্জন ফকিরের হাতে ভার অর্পণ করেন। এলাহি বক্স সাহেব সানন্দে সেই দায়িত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে এই থানকে বড়পীর সাহেবের থান বলে প্রচার করেন। কালক্রমে এই থানের উপর ইটের তৈরি সৌধ নির্মিত হয়েছে। এইটিই অধুনা হজরত বড়পীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহ বলে প্রসিদ্ধ।[২]

এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, চব্বিশ পরগণা তথা অখণ্ড বাংলাদেশে এমনই বহু হিন্দু দেবদেবীর স্থান পরবর্তীকালে পীর বা বিবির দরগায় রূপান্তরিত হয়েছে, যার ইতিহাস এখন লুপ্ত। ফলে পূর্ব সংস্কারবশত হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই সমস্ত দরগায় গিয়ে হাজত দেন, মানত করেন, ঢিল বাঁধেন, বাতি জ্বালান। বিশেষত চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে এই রীতির প্রচলন অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়, যার বিশিষ্ট নিদর্শন আটলিয়া গ্রামের বড়পীর সাহেবের দরগা। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটিও স্মরণ করা যায়।[৩] (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

চব্বিশ পরগণায় পীর-অলি কেন্দ্রিক পালাগানগুলির মধ্যে বড়পীর সাহেবের পালা

খুবই জনপ্রিয়। এই অঞ্চলে পিরুলীপালার দুটি ধারা প্রচলিত আছে। যা নিম্নরূপ—

উক্ত দুই ধারাতেই বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। চব্বিশ পরগণাব দক্ষিণাংশে সুন্দরবন-ঘেঁষা অঞ্চলগুলিতে বড়পীরের পালাগানের প্রচলন খুব বেশি। এই অঞ্চলে যত পালাগায়ক আছেন, অধিকাংশ পালাগায়ক এই পালাটি গান করেন। ক্ষেত্রানুসন্ধানে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে এই পালার উৎস চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার কোন এক অজ্ঞাত লোকশিল্পীর নিকট। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট পালাগায়ক সুদিন মণ্ডল দাবী করেন, এটি তাঁর স্বপ্নে পাওয়া পালা। প্রবোধকুমার ছাটুই নামক অপর এক পালাগায়ক দাবী করেন, এটি তাঁর বাবা নিতাই ছাটুই-এর নিকট হতে সংগৃহীত। আবার নিতাই ছাটুই সংগ্রহ করেছিলেন সীতাকুণ্ড গ্রামের কলমুদ্দিন গায়েনের নিকট হতে। সুতরাং প্রবোধকুমার ছাটুইয়ের বক্তব্য যতখানি যুক্তি গ্রাহ্য, সুদিন মণ্ডলের বক্তব্য ততখানি নয়। কারণ প্রবোধ ছাটুই ও সুদিন মণ্ডল উভয়ের নিকট হতে এ পালাটি সংগৃহীত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, উভয়ের পালার মূলকাহিনী অংশ প্রায় একই। কেবল পরিবেশন কালে নানা কথা উপকথায় পালাটিকে সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘায়িত করা হয়ে থাকে। উভয়ের পালার নাম একই। এই পালাটিকে কেউ বড়পীর সাহেবের পালা, এরেনশা বাদশার পালা, আবার কেউ সুরজ জামালের পালা বলেন।

বড়পীর সাহেবের কাওয়ালীগানের ধারা প্রত্যক্ষ করা যায় সাধাবণত মুসলমান ফকির বা কাওয়ালদিগের নিকট। তাঁরা পালাগানের পরিবর্তে কাওয়ালীসুরে বড়পীর সাহেবের পালা বিভিন্ন পীরের দরগায় গান করেন। বড়পীর সাহেবের কাওয়ালীগানকে 'বড়পীরের অকেয়া' বলা হয়। কাওয়ালীগান দীর্ঘ নয়। অল্প সময়ের মধ্যে এ পালা গাওয়া যায় এবং পীরের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য এই গানের প্রধান উপজীব্য বলে বিবেচিত হয়।

বড়পীর সাহেবের কাওয়ালীগানের ধারাটির বেশি প্রচলন দেখা যায় চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশে। উত্তর চব্বিশ পরগণার হাড়োয়া থানার বকজুড়ি গ্রামের শহীদুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙ্গড় থানার মোঃ আবদুল ফকির, কুসুম্বা গ্রামের জব্বার গায়েন প্রমুখ পালাগায়কগণ এ পালাটি কাওয়ালী রীতিতেই গান করেন। এঁদের গাওয়া গানের কাহিনীর সাথে পালাগানের রীতিতে প্রচলিত বড়পীর সাহেবের পালার কাহিনীর কোন মিল নেই। পরিবেশন পদ্ধতিও সম্পূর্ণ পৃথক। মোঃ আবদুল ফকিরের নিকট হতে সংগৃহীত পালাটি বড়পীর সাহেবের অকেয়া নামে পরিচিত। এই পালাটি তিনি যেমন গেয়েছেন তার কথাগুলি নিম্নরূপ—

বড়পীর সাহেবের অকেয়া

এক বেওয়া বুড়ির একটি পুত্র ছিল এ দুনিয়ায়।
আর বড়পীরের কাছে তারে শিক্ষা দিতে নিয়ে যায়।।

কাতর স্বরে বলে বুড়ি ওগো গজপাক নাম দা।
তোমার তালিম দেব দেখ ছেলেকে যে ঐ আমার।।
তুমি নিরাশ কোরো না মোরে আমার যে করো দয়া।
খালিহাতে ফিরায়োনা পীর আমি যে ঐ বিধবা।।
বুড়ির কথা শুনে পীরের দয়া যে হইল।
ছেলেটাকে রেখে দিয়ে বুড়ি নিজগৃহে ফিরিল।।
এক সপ্তাহ পরে বুড়ি সেই ছেলেকে দেখতে যায়।
দেখে ছেলে খাচ্ছে শুকনো রুটি গজপাক মাংস রুটি খায়।।
এই ঘটনা দেখে বুড়ির প্রাণে লাগল ব্যথা।
মনে মনে বুড়ি তখন বলে এই কথা।।
বলি ওগো গজপিয়া, সকল পীরের শ্রেষ্ঠ তুমি গজপিয়া,
নাইকো তোমার তুলনা।
যা দেখলাম একি সত্য না তোমার ছলনা।।
মুচকি হেসে বড়পীর তখন বলিতে লাগিল
বলি ওগো বুড়িমা তুমি আমার কথা শোনো না
যত হাড়হাড্ডি রেখেছি এক জায়গায় জড় কর না।।

বুড়ি তখন গজপাকের কথা শুনে যত হাড়হাড্ডি ছিল সব এক জায়গায় করিল, বিষমিল্লা বলে পীর সেই মুরগির হাড়েতে ফুঁক দিল।।

আল্লার দোয়াতে সেই মুরগি জ্যান্ত হয়ে যায়।
বুড়িকে ডেকে তখন গজপাক এই কথা কয়।।
বলি ওগো বুড়িমা তুমি আমার কাছে শোন না
যেদিন থেকে তোমার ছেলে এমনটি হবে
সেদিন থেকে তোমার ছেলে মাংস রুটি খাবে।।
এই ঘটনা দেখে বুড়ি অবাক হয়ে যায়।
বড়পীরের চরণ ধরে বুড়ি এই গানটি গায়।

গান।। আমায় ভুলোনা ভুলোনা শেষের দিনেতে ওগো গজপিয়া।
তোমা বিনা কেহ নাই তোমার কাছে ভিক্ষা চাই
তোমা বিনা গতি নাই, এই তুফানঘেরা দুনিয়াতে।
আমি চাইনা হতে হজের হাজি ইচ্ছা নাই মোর হতে গাজী
দোজখে আমি যেতে রাজি যান্নাতে যদি না পাই ঠাঁই।
তোমার নাম নিতে নিতে দুনিয়া হতে চলে যাই।।
আমি জেনেশুনে করেছি পাপ কত যে তার নাইকো হিসাব
কেমন করে দেব হিসাব, তাই ভাবি যে মনেতে।।

চব্বিশ পরগণায় বড়পীর সাহেবের যে লোকায়ত পালাগানটি প্রচলিত আছে তা এ অঞ্চলের অনেক পালাগায়ক গান করেন এবং পালাটি খুবই জনপ্রিয়। পালাটি একাধিক শিল্পীর নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। নিম্নে পালাটির কাহিনী সংক্ষেপে লিখিত হল।

বড়পীর সাহেবের পালা

বোগদাদ শহরে ছিল এরেনশা বাদশা নাম
রাজা বটে কিন্তু তিনি গুণের গুণ ধাম।

আশি হাজার পীরের মধ্যে যিনি বড় সেই, বড়পীর সাহেব বোগদাদ নগরের এরেনশা বাদশাকে করুণা করতে এসেছিলেন। এরেনশা বাদশা পুত্রধনে বঞ্চিত। তিনি আল্লাতালার কাছে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানান, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় না। সেকারণে মন্ত্রীকে ডেকে তিনি বলেন সংসার ত্যাগ করে তিনি জঙ্গলে গিয়ে বড়পীর সাহেবের মুরীদে মুরশীদ দিয়ে কাল কাটাবেন। এই কথা বলে এরেনশা বাদশা বাদশাহী পোশাক ত্যাগ করে ফকির-বেশ ধারণ করছেন, এমনসময় দাসীর মুখে এই সংবাদ শুনে বেগম দৌড়ে এসে বলেন।

কর কি কর কি একি দেখি, ফকিরের বেশ কেন ধরেছ।
ত্যেজে রাজ আভরণ কিসের কারণ তগদীর গলে কেন পরেছ?
রাজ্যধন সকল ছাড়িয়ে কোথায় যাবে আমায় ফেলে
আমায় অনাথিনী করবে এই কি মনে ভেবেছ?

বেগমের কথা শুনে বাদশা তাকে বুঝিয়ে বলেন, জঙ্গলে গিয়ে তিনি বড়পীর সাহেবের ডাকবেন আর প্রত্যহ পাঁচ ওক্ত করে নামাজ পড়বেন। বেগম তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে তারা দুজনে সংসারে থেকে খোদাতালার নামে পাঁচ ওক্ত করে নামাজ করবেন।

এ কথা শুনে বাদশার জ্ঞানের উদয় হল
সেই দিন হতে দিনে পাঁচ ওক্ত করে নামাজ পড়তে লাগল।

এরেনশা বাদশা ও তাঁর স্ত্রী দুজনে বড়পীর সাহেবের নাম ধরে চিৎকার করে কাঁদেন আর পাঁচওক্ত করে নামাজ করেন। তখন বড়পীর সাহেব খোদাতালার কাছে জানালেন, তিনি নিজের নামের জাহির করাতে চান। তিনি বোগদাদ শহরের এরেনশা বাদশাকে পুত্রসন্তান দিয়ে এ কাজ করতে চান। আল্লাতালা জানালেন, এরেনশা বাদশার সন্তান নেই বলে পাঁচ ওক্ত নামাজ করছে, কিন্তু সন্তান হলে একওক্ত নামাজ করবে না। বড়পীর সাহেব সে দায়িত্ব নিয়ে আল্লাতালার দোয়া নিয়ে বোগদাদ নগরে এলেন ও বেগমকে স্বপ্নে জানালেন, তুমি দিনে পাঁচ ওক্ত করে নামাজ পড়ছ বলে আমি সন্তুষ্ট হয়ে এই দাওয়াই শিয়রে রেখে যাচ্ছি। কাল ফজরে ওজু ও গোসল করে এই দাওয়াই কওচার পানির সাথে সেবন করবে। ও'তে তোমার পুত্রসন্তান হবে।

স্বপ্ন দিয়ে বড়পীর সাহেব বিদায় হয়ে যায়
আচম্বিতে বাদশাপত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

পরদিন বাদশাপত্নী বড়পীর সাহেবের স্বপ্নাদেশ মত সেই দাওয়াই কওচার পানির সাথে খেলেন। তাতে তিনি গর্ভবতী হলেন। দশমাস দশদিন পরে বাদশাপত্নী একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। একদিন —

ছেলেটি কোলে নিয়ে বাদশা অর্ধঘণ্টা বসে রইল
ঐ সময়ের মধ্যে এক ওক্ত নামাজ কাজা হয়ে গেল।

এই অপরাধে খোদাতালা জিব্রাইলকে ডেকে এরেনশা বাদশার নামে পাপ লিখলেন। সেই পাপের ফল তাঁর সন্তানের উপরও বর্তাবে। খোদাতালা বাদশার নবজাতকের ভাগ্য লিখতে বললেন—

ছেলেটি বিদ্যায় চারিশাস্ত্র পূর্ণ হবে
যদি বেঁচে থাকে, বাহুবলে জগৎ পরাস্ত করবে
বারবৎসর বারদিনে বেলা দশটায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হবে।

এই কথা লিখতে জিব্রাইলের হাত কেঁপেছিল। ষেটেরার দিন তিনি সন্তানের ললাটে এই কথা না লিখে বারো-এর পাশে একটা শূন্য দিয়ে ১২০ বৎসর করতে চাইলেন, কিন্তু খোদার ইচ্ছায় তাঁর কলমের কালী শূন্য হয়ে যায়। শিশুর ললাটে লিখতে যাবার পূর্বে জিব্রাইল দরজা আটকে বসে-থাকা শিশুর দাইমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যা লিখবেন তা ফেরার পথে জানিয়ে যাবেন। সেই প্রতিশ্রুতিমত এই নির্মম ভাগ্যলিপি দাসীকে জানিয়ে জিব্রাইল বিদায় হয়ে গেলেন।

এই কথা শুনে দাসী মূর্ছা হয়ে গেল
সেই সুযোগে জিব্রাইল শূন্যে মিলিয়ে গেল।

শিশুর বয়স যখন পঞ্চম দিন হয়েছিল, তখন কাজীসাহেব সন্তানের নাম রেখেছিল সুরজ জামাল। ষেটেরার দিন সুরজ জামালের এই ঘটনা শুনে দাসী নীরবে ক্রন্দন করত। এই দৃশ্য বেগমের চোখ এড়ায় নি। তিনি তখন সুরজ জামালকে দাসীর কোলে দিয়ে বলেছিলেন—

ধর ধর দাসী নেরে কোলে, এ আমার নয় তোমারই ছেলে
বাছা আমার সেয়ানা হলে, বলব ডাকতে তোরে মা মা বলে।

দাসী জিব্রাইলের লিখন গোপন রেখেছে, আর মনে মনে দেওয়ালে চুনের ফোঁটা দিয়ে দিন গুনছে। এক এক করে দিন গত হয়ে গেল। সুরজ জামালের মৃত্যুর আর চার দিন বাকী। তখন দাসী তাকে এই সংবাদ জানাবার কথা মনে মনে ভাবে। সুরজ জামাল স্কুলে থেকে ফেরার সময় হয়েছে, এমনসময়—

গৃহকর্ম ছেড়ে দাসী বাড়ির বাহির হল
বেলা চার ঘটিকায় সুরজ বাড়ি ফিরছিল।

সুরজকে দেখে দাসী কেঁদে ফেলে। ঝি-মায়ের ক্রন্দন দেখে সুরজ কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে। তখন ঝি-মা আনুপূর্বিক সকল ঘটনা সুরজকে জানায়। সুরজ তার মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে আর বাড়িতে থাকবে না বলে বিবেচনা করে দেশ ত্যাগ করে। এরেনশা বাদশা ও তাঁর স্ত্রী দাসীর মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে পাগল পাগলিনীপ্রায় হয়ে গেলেন। বেগমের বুক ফাটা বিলাপ—

ঘরে আয়রে সুরজ জামাল দেখবরে তোর মুখ
(যখন) আসমান হতে পড়বে ছুরি (আমি) পেতে দেব বুক।

এদিকে সুরজ জামাল পিতার দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র এক জঙ্গলে গিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। সেইসময় তার পরোপকারের চিন্তা হল। বনের পাশ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় তিনটে ছিঁড়ে (জল যাওয়া ভাঙা অবস্থা) আছে। সেই তিনটে ছিঁড়ে মেরামত করে দেবার কথা ভাবল, কিন্তু এ কাজের জন্য অনেক অর্থ ও লোকজনের দরকার। তাই নিজের হাতের হীরের আংটি বিক্রি করে অর্থ যোগাড়ের জন্য স্থানীয় এক ধনীর বাড়ি গেল।

হীরার অঙ্গুরী নিয়ে সুরজ বাবুর কাছে কয়।
এই অঙ্গুরী রেখে বাবু কিছু টাকা দিন আমায়।

সুরজ জামালকে দেখে সেই ধনী ব্যক্তির খুব পছন্দ হল। আপন একমাত্র তনয়ার সাথে সুরজ জামালের বিবাহ দেবার কথা ভাবলেন। ধনী ব্যক্তিটি সুরজ জামালকে টাকাপয়সা লোকলস্কর দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে, রাস্তার কাজ সেরে তাকে ফিরে আসতে হবে। লোক লস্কর নিয়ে সুরজ জামাল রাস্তার ছিঁড়ে সেরে সবাইকে বিদায় দিয়ে বনের মধ্যে অপেক্ষা করছে। এমনসময় নিত্য অভ্যাস মত ১০১ জন পাইকমবর সেইপথ দিয়ে নমাজে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেকদিন তাঁদের এই ছিঁড়েভাঙার জন্য খুব অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু আজ রাস্তা বাঁধা দেখে, যে এই কাজ করেছে তার উদ্দেশ্যে সকলে আল্লাতালার কাছে অমর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে মৌলবীগণ যখন এই কথা কয়
জঙ্গলে ছিল সুরজ জামাল তার কানে পৌঁছায়।

তখন সুরজ তাঁদের সামনে এসে তার মৃত্যুর কথা জানালে তাঁরা সুরজকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁরা তার মৃত্যু হতে দেবেন না। অথচ মৃত্যুর সময় পরদিন বেলা দশটায়। তখন মৌলবীগণ সুরজকে পরদিন সকালে সেখানে আসতে বলে তাঁরা নমাজে গেলেন।

এই কথা শুনে সুরজ ধনী ব্যক্তির বাড়ি ফরে এলে তাকে ধরে নিয়ে রাজকন্যার সাথে বিয়ে দেন। সুরজের কোন কথা তাঁরা শুনলেন না। অবশেষে সুরজ জামাল একটা চিঠি লিখে রেখে ভোরের বেলা বাসর ত্যাগ করে মৌলবীদের কথামত নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হয়। চিঠিতে লিখে গেল যদি বেঁচে থাকি তাহলে এই প্রদীপ নিভবে না আর ফুলের মালা শুকাবে না। তারপর সুরজ মৌলবীগণের নিকট এলে পর মৌলবীগণ সুরজকে মাঝখানে রেখে সবাই চারদিকে ঘিরে বসে তার মস্তকে হাত দিয়ে থাকেন। দশটা বাজতে যখন কয়েক মিনিট বাকী থাকে তখন বজ্র বারবার এসে ফিরে চলে গেল। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে খোদাতালা জিব্রাইলকে ফকিরের বেশ ধরে সেখানে গিয়ে ছলনা করে আল্লার আদেশ কার্যকরী করতে বলেন। সেইমত জিব্রাইল এসে কৌশলে মৌলবীদের হাত থেকে সুরজকে সরিয়ে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাতে সুরজের মৃত্যু হল। মৌলবীরাও বজ্রের শব্দে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। যখন তাঁদের জ্ঞান ফিরল তখন তাঁরা ১০১ জন মৌলবী স্থির করলেন, খোদাতালার

নামে আর কোনদিন নমাজ করবেন না। এইভাবে যখন তিন ওক্ত নমাজের সময় কেটে গেল তখন খোদাতালা বড়পীর সাহেবকে ডাকলেন—

বড়পীর বড়পীর বলে খোদাতালা যখন ডাক দিল
খোদাতালার কাছে এসে বড়পীর উপনীত হল।

বড়পীর সাহেবকে খোদা নাম জাহিরের জন্য ফকিরবেশে মর্ত্যে যাবার আজ্ঞা দিলেন। বলে পাঠালেন, ঐ একশত একজন মৌলবী যদি নিজেদের পরমায়ু থেকে এক বৎসর করে সুরজ জামালকে দেয় তাহলে সুরজ প্রাণ ফিরে পাবে।

খোদাতালার আজ্ঞা পেয়ে বড়পীর মৌলবী সাজিল
ময়দানেতে গিয়ে তখন উপনীত হল।

বড়পীর সাহেব আল্লার নির্দেশমত মৌলবীদের বললেন এবং মৌলবীগণ এক বৎসর করে একশত এক বৎসর তাকে দান করলেন। তারপর সুরজ জামাল প্রাণ পেয়ে উঠে বসলো। মৌলবীগণ খুশি হলেন। তখন বড়পীর সাহেব নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন—

ভাই সকল আমার নাম বড়পীর সাহেব দিলাম পরিচয়
আশি হাজার পীরের মধ্যে আমার নাম রয়।

বড়পীর সাহেবের দয়ার প্রকাশ দেখে মৌলবীগণ ও সুরজ জামাল অভিভূত হয়ে সেখানে তাঁর নামে গানহাজত দিলেন এবং বড়পীর সুরজকে সাথে নিয়ে সেই রাজকুমারীর কাছে এলেন। বড়পীরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও দয়ার কথা শুনে এখানেও বড়পীরের নামে গানহাজত হল। তারপর সুরজ জামাল ও সুরজবিবিকে সাথে নিয়ে বড়পীর সাহেব বোগদাদে ফিরে এসে পাগল পাগলিনীপ্রায় এরেনশা বাদশা ও তাঁর স্ত্রীকে কৃপা করলেন। তাঁরা সুস্থ হয়ে সাতগ্রাম মেঙেপেতে বড়পীর সাহেবের নামে গানহাজত দিলেন। সেইদিন থেকে বড়পীর সাহেবের নাম দুনিয়ার মাঝে প্রচার হল।

এমন গুণের দয়াময় দেখিনি কোথাও গো
মরাছেলে বাবা আমার বাঁচাইয়া দেয় গো
সেই বাবার নামে যদি মাগুন কর দান গো
যে যেভাবে ডাকবে তারে ডাকের সাড়া দেবে গো।

মুসলমানী পালা পরিবেশনের নিয়ম অনুযায়ী বড়পীর সাহেবের পালা পরিবেশিত হয়। যথা মোকাম পাতা, হাজত দেওয়া ইত্যাদি নিয়ম একইভাবে পালিত হয়। পালাগায়ক চামর হাতে নিয়ে আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গান করেন। হিন্দু গায়ক হলে ধুতি পাঞ্জাবী পরেন, মুসলমান হলে লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরে আসরে গান করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পালা-গায়কের হাতে চামর ও আশাদণ্ড থাকে। কেউ কেউ আশাদণ্ডটি মোকাম পিঁড়ির কাছে পুঁতে রেখে গান করেন।

পালাগায়কগণ এই পালাটি খুবই পবিত্রতা রক্ষা করে আসরে পরিবেশন করেন। সুরজ জামালের প্রাণভিক্ষা চেয়ে বড়পীর সাহেব যখন আল্লার নিকট প্রার্থনা করেন, সেই

প্রার্থনাটি পালাগায়ক আরবী ভাষায় আবৃত্তি করেন। পালাগান চলাকালীন ক্ষেত্রবিশেষে পালাগায়ক মাগুনপাত্র হাতে নিয়ে শ্রোতাদের নিকট হতে কিছু পয়সা মাগুন করেন। একে 'প্যালা তোলা' বলে। পালা শেষে বড়পীরের মাহাত্ম্য গেয়ে, পীরের দোহাই দিয়ে শ্রোতা ও নায়েক পক্ষের মঙ্গলকামনা করে চাল পয়সা আদায় করেন। পরিশেষে মূলগায়ক, দোহার ও শ্রোতাগণ সমস্বরে বড়পীর সাহেবের জয়ধ্বনি দেন এবং আসর ভঙ্গ হয়।

পাদটীকা

১। কাজী আশরফ আলী, হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্য কেরামত, ১৩৯৮।
রেজাউল করিম, মৌলবী আজহার আলী, হজরত বড়পীরের জীবনী।

২। গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬, পৃ: ২৯৯।

৩। "হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পীর-পীরানীর মাহাত্ম্য-কাহিনীতে ঢালাই করবার প্রচেষ্টা প্রকট হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। ইতিমধ্যে একাধিক লৌকিক দেবদেবী— যাঁদের মাহাত্ম্য জনসাধারণ অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করে এসেছে তাঁদের প্রতিরূপ মুসলমান জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছে। ফকীর মোহম্মদের মানিক-পীরের গানে দেখেছি যে মানিক-পীর সময়ে সময়ে যেন শিবেরই ছদ্মবেশ।"
(সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪০০, আঠারো-ভাটির পাঁচালী, পৃ: ৭৩।)

পীর ও গাজীপালা ঃ সত্যপীর

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-কেন্দ্রিক বিশিষ্ট লোকায়ত পালাগান হল সত্যপীরের পালা। পালাগান আলোচনায় এটি পীর ও গাজীপালার অন্তর্ভুক্ত। জেলা চব্বিশ পরগণার প্রায় সর্বত্র হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যনারায়ণের পূজা বহুকাল পূর্ব হতে প্রচলিত আছে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে সত্যনারায়ণ পূজার প্রাধান্য আছে বলে জানা যায়। মহাভারতে উল্লিখিত সত্যবিনায়ক, স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ, বাংলার নাথযোগী জাতির উপাস্য সত্যদেব ও চব্বিশ পরগণা তথা বাংলার হিন্দু মুসলিমের উপাস্য সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ সম্ভবত একই দেবতা বলে লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ মনে করেন। তাঁদের ধারণা, লৌকিক দেবতা সত্যনারায়ণপূজা আদি মধ্যযুগে ভারতে হিন্দুসমাজে প্রথম পরিকল্পিত হয়। পরে মুসলিম বিজয়ের ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় দলে দলে মুসলিম হতে থাকলে তারা পুরানো সংস্কার বিস্মৃত হয় নি। সংস্কৃতি সমন্বয়ের Acculturation প্রক্রিয়ার প্রভাবে হিন্দুদের উপাস্য সত্যনারায়ণের পরিবর্তে সত্যপীর শব্দ ব্যবহার করে পূজার্চনা করেছে। গবেষকগণের এই অনুমান সত্য হলে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর একটি লৌকিক দেবতা, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

এই মতের সমর্থন মেলে চব্বিশ পরগণায় সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরপূজায় ব্যবহৃত নানা উপকরণাদির মধ্যে। দেবদেবীর পূজার ব্যাপারে হিন্দুগণ যেকোন একটি কল্পিত মূর্তি স্থাপন করে পূজা করে, কিন্তু সত্যনারায়ণের পূজায় মূর্তি ব্যবহার খুবই বিরল। সত্যনারায়ণ ও বিষ্ণু একই বলে বর্ণহিন্দুগণ প্রচার করলেও পূজার সময় মূর্তির পরিবর্তে শালগ্রাম শিলা অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়। পূজারী থাকেন অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেতর কোন জাতি। যেক্ষেত্রে কোন রূপ প্রতীক থাকে না সেক্ষেত্রে কয়েকটি লোহার সরু শিক (চার-পাঁচ ফুট লম্বা) মাঝ বরাবর দুভাঁজ করে তার দিয়ে বেঁধে লাল রঙের কাপড় মুড়ে দেওয়া হয়। তখন এটির আকৃতি অনেকখানি গদার মত হয়। এটি পুরোহিতের কাছে থাকে, পূজার সময় তিনি এটিকে

নিয়ে যান। সেক্ষেত্রে এই গদাকৃতি বস্তুটিই সত্যনারায়ণ রূপে কল্পিত হয়। ডোম পণ্ডিত বা পুরোহিতগণ মাটির ছোট ভাঁড় বা পিতলের ঘটি বা ছোটকলসী সিন্দূর মাখিয়ে সত্যপীরের প্রতীক করে নেন, মুসলিম সমাজেও অনুরূপ সত্যপীরের প্রতীক পূজার ব্যবস্থা আছে। অনেক মুসলিমপরিবারে, লোকায়ত ধারা বজায় রেখে, সত্যপীরের হাজতের সময় একটি পিঁড়ির উপর বৃত্ত এঁকে, তার মাঝখানে মাটির একটি ক্ষুদ্র স্তূপনির্মাণ করে, তার উপর ক্ষুদ্র লৌহ অস্ত্র বা ছোরা রেখে, ফুলের মালা দিয়ে, সত্যপীরের প্রতীক নির্মিত হয়। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান প্রায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই প্রতীকে পূজাহাজত দেন। হিন্দুর গৃহে দেওয়ালের গায়ে সিন্দূর দিয়ে নারায়ণের প্রতীক এঁকে শিরনির ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে পূজারী থাকেন ব্রাহ্মণ।

সত্যপীরের পরিচয় সম্পর্কে লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ নানা মত পোষণ করেন। কেউ বলেন সত্যপীর মিশ্রসংস্কৃতির লৌকিক দেবতা, কেউ বলেন ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আবার কেউ বলেন ইনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক পীর। কিংবদন্তী অনুসারে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোন এক কন্যার গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারো মতে বাগদাদের বিখ্যাত সুফী সাধক মনসুর আল্ হাল্লাজ যিনি নির্দ্বিধায় 'আমিই সত্য' ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনিই নাকি মূল সত্যপীর। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন হেতু হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারতা অবলম্বন করেছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার আবির্ভাব সেই উদারতার ফল"।[১]

'বড়সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি' নামক গ্রন্থে কবি কৃষ্ণহরি দাস সত্যপীরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। মালঞ্চার রাজা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ময়দানবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের জন্ম হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। শঙ্কর আচার্য্যের পাঁচালিতে সত্যপীরের ইতিহাস অনেকটা একই রকম। সেখানে সত্যপীরকে আলা বাদশাহের কানীন দৌহিত্র বলা হয়েছে।

সত্যপীরের সৃষ্টি সম্পর্কে চব্বিশ পরগণায় একটি লোককথা প্রচলিত আছে। সেই লোককথাটি হল, রাজা চন্দনেশ্বর ছিলেন সত্যনারায়ণের ভক্ত। তিনি একসময় তাঁর রাজ্যে প্রত্যেককে সত্যনারায়ণের পূজা করতে হবে বলে আদেশ জারি করেন। তাঁর এই গোঁড়া হিন্দুত্বের জন্য মুসলমান প্রজারা তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে থাকে। তখন স্বয়ং সত্যনারায়ণ সত্যপীরবেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করে নেন ও মুসলমানদের স্বধর্মাচরণে উৎসাহিত করেন। তিনি সত্যপীরের সাথে তাঁর কন্যা বিমলাকে বিয়ে দিয়েও তাঁর মুসলিম প্রীতি প্রমাণ করেন। সেই থেকে বিমলা ওলাবিবি নাম নিয়ে পূজিত হন। এই লোককথার বাস্তব ভিত্তি কিছু আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু তৎকালীন একটি সমাজচিত্র তথা হিন্দুমুসলমানের বিষম সম্পর্কের পরিবর্তনের চিত্রটি ধরা পড়েছে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রসংস্কৃতিজাত কাল্পনিক পীর অনুমান করা

যায়। এই সত্য আরও প্রত্যয়িত হয় হিন্দুর গৃহে সত্যনারায়ণের পূজাসংক্রান্ত আচার আচরণাদিগত নানা সংস্কার থেকে।

চব্বিশ পরগণায় সত্যপীরের সাধারণত প্রতীকপূজার প্রচলন দেখা যায়। চব্বিশ পরগণার পাথরপ্রতিমা ছাড়া কোথাও সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের কোন মূর্তি ক্ষেত্রগবেষণা কালে দৃষ্ট হয়নি। সত্যনারায়ণের পূজা বা শিরনি যেখানে হয় ব্রাহ্মণ সেখানে বিশেষত দেওয়ালে সিন্দূর দিয়ে নারায়ণচিহ্ন (স্বস্তিক) এঁকে নেন। এ সম্পর্কে পুরোহিতের বক্তব্য, সত্যনারায়ণ প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের আরাধ্য সত্যপীর। মুসলমানরা কোন মূর্তি পূজা করেন না বলে সত্যপীরের কোন মূর্তি নেই। নারায়ণচিহ্ন এঁকেই পীরের পূজা করা হয় বা শিরনি দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মাটির ছোট স্তূপ বা চার-পাঁচটি সরু শিক দু-ভাঁজ করে লাল কাপড় জড়িয়ে গদাকৃতি করে অথবা মাটির বা পিতলের ছোট ঘট বা ঘটি সিন্দুর মাখিয়ে পূজা করা হয়। এক্ষেত্রে ডোম-পুরোহিত পূজা করেন।

সত্যপীরের পাঁচালি কাব্যগুলিতে সত্যপীরেব মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। "বড়সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি"-তে কৃষ্ণহরিদাস সত্যপীরের বর্ণনায় লিখেছেন—

অকুমারী সন্ধ্যাবতী তার গর্ভে উৎপত্তি
মালঞ্চা করিল ছারখার।
হাতে আশা মাথে জটা কপালে বৃহতি ফোঁটা
বাম করে শোভে অতি বাহার।।
সুবর্ণের পৈতা কান্ধে কোমরে জিঞ্জির বান্ধে
অঙ্গে শোভে গেরুয়াবসন।
বেড়ায় সন্ন্যাসীবেশে ফিরে অন্য দেশে দেশে
নানা মূর্তি করিয়া ধারণ।।

কবি-বর্ণিত এই মূর্তি কোথাও দেখা যায় না। এই কাব্যে সত্যনারায়ণের একটি চিত্র আছে। সেই চিত্র অনুযায়ী তাঁর চেহারা পেশীবহুল দোহারা গড়ন, শ্যাম বর্ণ, মাথায় জটাজুট, মুখে দীর্ঘ গুম্ফ, গলায় মালা, বাহুতে মাদুলির ন্যায় বাজু, দুই হাতে বালা, বামহাতে কমণ্ডলু, ডান-হাতে বাঁকা লাঠি। তাঁর গায়ে হাতকাটা ফকিরি জামা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়-পরা, পায়ে খড়ম ও ডান-কাঁধে ঝোলা। এই চিত্রটি জলরঙের। বস্তুত এরূপ মূর্তিও এ অঞ্চলের কোথাও দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ সত্যনারায়ণের যে ধ্যানমন্ত্র পাঠ করেন তাতে সত্যপীরের সাথে সত্যনারায়ণের মূর্তির কোন সাদৃশ্য নেই। ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নরূপ —

ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীত গুণত্রয় সমন্বিতম্।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং কৌস্তভাভরণং হরিম্।।
নীলবর্ণং পীতবাসং শ্রীবৎ পদভূষিতম্।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং ব্রহ্মাদ্যৈরভি পূজিতম্।।

ইন্দীবরদলশ্যাম শঙ্খচক্র গদাধরম্।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং জগত্পিতরম্ গুরুম্।।[২]

সত্যপীরের শিরনি বা সত্যনারায়ণের পূজা মূলত একই অনুষ্ঠান। নির্দিষ্ট কোন থান এই পূজার জন্য থাকে না। গ্রামের গৃহস্থ পরিবার ঘরের দাওয়ায়, ঘরে, গোলার ধারে বা উঠানে গোময় দিয়ে নিকিয়ে পূজার আয়োজন করেন। পূজানুষ্ঠান করেন ব্রাহ্মণ। বাড়ির একজন পূজার দিন উপবাসে থাকেন। সাধারণত বাড়ির প্রধানা মহিলা উপবাস করেন। পূজায় তাঁর নামে সংকল্প হয়। অনেক হিন্দু পরিবারে প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে সত্যনারায়ণের শিরনির ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এছাড়া বাছা কিছু পূর্ণিমা তিথিতে (যেমন বুদ্ধপূর্ণিমা) হিন্দুগণ শিরনির ব্যবস্থা করেন। পূজার শেষে ব্রাহ্মণ অবশ্যই সত্যনারায়ণের পাঁচালি পাঠ করেন। উপবাসীজন শ্রোতাগণ সহ গৃহস্থ ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ভক্তিভরে তা শোনেন। পাঠ শেষে আমিন আমিন বলে ধ্বনি দেন। এই সাথে পূজানুষ্ঠানও শেষ হয়ে যায়।

সত্যনারায়ণের পূজার প্রধান উপকরণ হল শিরনি। কাঁচাদুধ, পাকাকলা, আখের গুড়, আটা, ডাবের জল, গঙ্গাজল, চালের গুঁড়ো সহযোগে এক উৎকৃষ্ট খাদ্য বানানো হয়। সম্পন্ন পরিবার এই শিরনি ঘন আঠাল মত করে বিতরণ করেন, নতুবা একটু পাতলা করে বহু লোকের মধ্যে বিতরণ করেন। বলা বাহুল্য শিরনি প্রস্তুত করেন ব্রাহ্মণ। বেতের বোনা ধামা অথবা মাটির বর্তুন মেচলাতে শিরনি প্রস্তুত করা হয়। শিরনির আগে গৃহস্থ তাঁর প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করেন, প্রতিবেশীর বাচ্চারা ঘটি, গ্লাস বা বাটি নিয়ে আসে শিরনি নেবার জন্য। বয়স্কব্যক্তিগণ সাধারণত খালিহাতে আসেন। তাঁদের কলার পাতায় করে শিরনি পরিবেশন করা হয়। শিরনি ছাড়া পূজার আরও একটি প্রধান উপকরণ হল নানা ধরনের ফলমূল। শিরনি পরিবেশনের আগে এই কোচা ফলমূল পরিবেশন করা হয়। ফলমূলের সাথে থাকে ভিজে ছোলা, ভিজে মুগডাল ইত্যাদি। শিরনি কোথাও উদরপূরণ করে পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে, কোথাও প্রসাদ হিসাবে স্বল্প পরিমাণ পরিবেশন করা হয়। সত্যনারায়ণের পূজায় খুবই পবিত্রতা রক্ষা করা হয়। পূজা শেষে অনেক স্থানে সত্যনারায়ণের পালাগানের ব্যবস্থা থাকে।

চব্বিশ পরগণার জনসমাজে সত্য নারায়ণের পূজাচারকেন্দ্রিক নানা সংস্কার পালিত হয়। সত্যপীরের পূজা বা শিরনি চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে অতি পবিত্রভাবে মান্য করা হয়। এই অঞ্চলের মানুষজন বিশ্বাস করেন, সত্যপীরের নিকট শিরনির মানত করে কোন মনস্কামনা করলে সত্যনারায়ণ তা পূরণ করেন। এই বিশ্বাসে বেকার যুবক চাকরি পাওয়ার জন্য মানত করেন, কেউ মামলা মোকদ্দমায় জয় লাভের জন্য মানত করেন, ভূমি ক্রয় করে বাবা সত্যনারায়ণের পূজা দেন, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে শিরনি দেন, কোন হারিয়ে-যাওয়া বস্তু ফিরে পেলে শিরনি দেন, সন্তানহীন সন্তানকামনা করে সত্যপীরের নিকট মানত করেন, গৃহে অশান্তি, রোগপীড়া, শত্রুভয় ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতেও মানুষ সত্যনারায়ণের নিকট শিরনির মানত করেন ও মনস্কামনা পূর্ণ হলে শিরনি দিয়ে মানত চুকোন। শুধু তাই নয়, সংসারে যাতে কোনরকম বিপদ বা অশুভ কিছু প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রতি মাসে

পূর্ণিমা তিথিতে এই অঞ্চলের অনেক গৃহস্থ গৃহে সত্যনারায়ণের শিরনির ব্যবস্থা করে থাকেন। লোকবিশ্বাস, সত্যপীরের শিরনি প্রতিমাসে একবার করে দিলে সংসার সমৃদ্ধ হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা গেছে, চব্বিশ পরগণার একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারে সত্যনারায়ণের পূজা বা শিরনি খুবই কম হয়। সম্ভবত এটি ব্যয়সাপেক্ষ পূজা বলেই এমনটি হয়, কিন্তু সত্যনারায়ণের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস অটুট। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন ব্যাপকভাবে সত্যনারায়ণের শিরনি দেবার প্রবণতা দেখা যায়, তেমনটি উচ্চবিত্তদের মধ্যে নেই। এই অঞ্চলের ধনী গৃহস্থের বাড়িতে বৎসরে একবারও শিরনি হয় কিনা সন্দেহ আছে। তাই বলে সত্যনারায়ণের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসভক্তি ও শ্রদ্ধা কোনমতেই কম বলে মনে হয় না। তাঁরা গৃহপ্রবেশাদি অনুষ্ঠানে শিরনি দিয়ে নতুন বাসস্থানের শুদ্ধিকরণ করেন। মোটের উপর সত্যনারায়ণ এই অঞ্চলের মানুষের সমৃদ্ধি, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিঘ্ননাশকারী গৃহদেবতারূপে কল্পিত হন।

সত্যপীরের পালাগান, পাঁচালিপাঠ, পূজাচারগত সংস্কার ব্যাপকভাবে পালিত হলেও জেলা চব্বিশ পরগণায় সত্যনারায়ণের থান বা দরগা তেমন দেখা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে সত্যনারায়ণের থান নির্মাণ করে পূজা শিরনি গান হাজতাদির ব্যবস্থা করা হয়। তবে এই অঞ্চলে দু-একটি স্থায়ী সত্যনারায়ণের থান ও দরগা দেখা যায়। এই জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কালসরা নামক গ্রামে সত্যনারায়ণের দরগা আছে। সেটেলমেন্ট রেকর্ডে (১৯২৮-৩১) এর সত্যতা মেলে। আনুমানিক তিনবিঘা জমির উপর এ দরগাটি আছে। এই দরগার সেবাইতগণ হলেন মুসলমান। প্রতিবৎসর ১৬ই ফাল্গুন এখানে মেলা বসে ও বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতি শুক্লপক্ষের একাদশীতিথিতে এখানে উৎসব অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। বজবজ থানার বাওয়ালী গ্রামে সত্যপীরের স্থান আছে। পাথরপ্রতিমার পূর্ব সুরেন্দ্রনগর গ্রামে একটি সাধারণ থানে বিভিন্ন দেবদেবী যথা আটেশ্বর, বিবিমা, শীতলা প্রমুখের সাথে সত্যপীরের একটি মৃন্ময় মূর্তি আছে। এটি মুসলমানবেশে ঘোটকারূঢ় মূর্তি। এই মূর্তিটি কোন কোন স্থানে মানিকপীরের মূর্তির মত। কাহিনী অংশে বর্ণিত সত্যপীরের কল্পিত মূর্তির সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই। ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে সত্যনারায়ণের থান ব্যাপক দেখা যায় না, কিন্তু হিন্দু গৃহস্থগণ তাঁদের গৃহে বা ঠাকুরঘরে সত্যনারায়ণের একটি নুড়ি রেখে দেন। অন্যান্য দেবদেবীর নুড়ি বা ঘটের সাথে সত্যনারায়ণ কল্পনা করে একটি নুড়ি রাখা হয়। তাতে প্রত্যহ তেল-জল দিয়ে স্নান করিয়ে ফুলদূর্বাসহ নিত্যপূজা করা হয়।

ক্ষেত্রগবেষণাকালে চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থান থেকে সত্যপীরের পালাগান ও মুদ্রিত পাঁচালি সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সোনারপুর থানার কুসুম্বা গ্রামের আবদুল জব্বার গায়েনের নিকট হতে একটি সত্যনারায়ণের পালাগান, অক্ষয় লাইব্রেরী হতে প্রকাশিত 'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণী কথায় দুটি কাহিনী আছে। একটি কাহিনী শঙ্করাচার্যের ভণিতাযুক্ত, অপরটি দ্বিজরামের ভণিতাযুক্ত। দ্বিজরামের ভণিতা যুক্ত পালাটি এই অঞ্চলের অনেক পালাগায়ক সত্যনারায়ণের পালা হিসাবে গান করেন।

'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা' নামক পাঁচালিটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমে আছে সর্বদেবদেবীর বন্দনা, সত্যপীরের বন্দনা, সত্যপীরের রূপবর্ণনা ও মূলকাহিনী। সর্বদেবদেবীর বন্দনাংশে বিভিন্ন দেবদেবী, নদনদী, গ্রহনক্ষত্র, পূজনীয় মানুষ, পীর-ফকির, রাগ-রাগিণী প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এই বন্দনাংশে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সুবিখাঁপীরের নাম উল্লেখ।

কোরাণ কেতাব আর কলমা সংহতি।
সুবিখাঁপীরের পায় প্রচুর প্রণতি।।

চব্বিশ পরগণায় কোথাও এই পীরের দরগা দেখা যায় না বা ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাসের 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে বহু পীরপিরাণীর উল্লেখ আছে কিন্তু সুবিখাঁর কথা নেই। সত্যপীরের বন্দনাংশে সত্যপীর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সর্ব্বজীবে সর্ব্বময় চারি চরাচরে কয়
চন্দ্রচূড় চিন্তে চিন্তামণি।
পূর্বে হয়ে দশ মূর্তি করিলে আপন কীর্তি
সত্যপীর হইলে ইদানীং।

সত্যপীরের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে দ্বিজরামের পাঁচালি অংশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল—

দ্বিজবরে দিতে বর কলি হেতু সত্বর, শ্রীমাধব হইলেন পীর।
ফকিরের সাজে জগতে বিরাজে অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ শরীর।।
যুবত্ব বয়েস সুবেশ মহেশ, বিধুমুখে মধুরিম হাসি।
মস্তক উপর, পাগ মনোহর, নানা ভব বিলাসী।।
বড় বড় কোড়ি গ্রন্থিত গুধড়ি, বাঘছাল থলি শালদণ্ড।
প্রবাল দাড়িম্ব ফল, মুকুতা ঝলমল, মালা মঞ্জিল চণ্ড।।
ঘণ্টা রুণ রুণ, জিকির ঘন ঘন, ঝন ঝন জিঞ্জির শব্দ।
রামেশ্বর বলে, বসি তরুতলে, ব্রাহ্মণ হইল স্তব্ধ।।

'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা' নামাক পাঁচালির কাহিনী অংশটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

সত্যনারায়ণের কথা

প্রবল প্রতাপ পীর পাপতাপহারী।
যেরূপে জাহির তাহা নিবেদন করি।।

দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর। সেখানে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি অতিশয় দরিদ্র। তাঁর স্ত্রী অতি সতীসাধ্বী রমণী। তাঁরা উভয়ে দেবদামোদরকে ভক্তি স্তুতি করেন। ভিক্ষান্নে তাঁদের দিন গুজরান হয়। দেবদামোদর তাঁদের অনেকভাবে ছলনা করেছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁর ভক্তির ত্রুটি হয় না। অবশেষে তিনি ব্রাহ্মণের ভিক্ষার উপর মায়া সৃষ্টি করে ভিক্ষা থেকে বঞ্চিত করলেন। সবাই ব্রাহ্মণকে গালি দিয়ে বিদায় করল, কেউ ভিক্ষা দিল না।

ঘরে ঘরে ফিরে দ্বিজ ডাকে কলস্বনে।
কেহ ঘরে থাকে কেহ থাকিয়া না শুনে।।

কেহ বলে ফিরে মাগ প্রসবিছে নারী।
কেহ বলে নিত্য কি তোমার ধার ধারি।।
কেহ গালি দেয় কেহ বলে দূর দূর।
মারিতে চলিল কেহ হইয়া নিষ্ঠুর।।

এইরূপে বঞ্চিত হয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষোভে ও দুঃখে তনুত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন দামোদর ফকিরের বেশধারণ করে ব্রাহ্মণের নিকট এলেন।

কপটে দয়াল কহে দ্বিজেরে তখন।
ফকিরের আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ।।

এই বলে ফকিররূপে নারায়ণ ব্রাহ্মণের কাছে কিছু খেতে চান। ব্রাহ্মণ তাঁর দুঃখের কথা ফকিরকে জানিয়ে নিজের বসন ফকিরের হাতে দিয়ে বলেন, এই বেচে যা হয় তাতে তুমি আহার কর। কারণ আমার আর কিছুই নেই। তাছাড়া আমার আজ কিছুই ভিক্ষাদি হয়নি। তখন ফকির তাঁকে বাকসিদ্ধি দান করে সত্যপীরের পূজা প্রচার করতে বলেন। কিন্তু—

দ্বিজ বলে যা কহিলে দেওয়ান মহাশয়।
যবনের কার্য্য সে ও ব্রাহ্মণের নয়।।

এই কথা শুনে ফকিরবেশী নারায়ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেন। তখন দ্বিজ ইষ্টদেবের মহিমা বুঝতে পেরে তাঁকে নমস্কার করে আসল পরিচয় জানতে চান। তখন হাসিতে হাসিতে প্রভু দ্বিজে কন তবে—

বিধি মোর বড়ভাই মহেশ অনুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ।।
কৃষ্ণ কেলি মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।।
পরাপর চরাচর আমি যে যাবন্ত।
সুরপুরে ইন্দ্র আমি পাতালে অনন্ত।।
ফকির হইনু আমি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি বাছা সত্যনারায়ণ।।

এই পরিচয় শ্রবণে ব্রাহ্মণের ঠিক বিশ্বাস জন্মাল না। তিনি সত্যনারায়ণকে তিনটি প্রশ্ন করলেন, যথা পীরের শির্নিতে তাঁর প্রীতি কেন, পরমাত্মা বিষ্ণু পীর কেন ও ফকির হয়ে ব্রাহ্মণ শরীর কেন? তখন রাজা পরীক্ষিৎ ও যুগাবতার কলির কথোপকথনের সার অংশ ব্যাখ্যা করে কলিকালের সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা বলেন।

সংক্ষেপে কলির কথা মাহাত্ম্য নির্ণয়।
পড়েছ শুনেছ যত ব্রাহ্মণ তনয়।।
আর সিদ্ধি শুদ্ধি, বুদ্ধি স্ফূর্তি নহে পাপে।
প্রভু হয়ে পীরত্ব পেলাম এই তাপে।।

নাম মাত্র প্রভেদ নৈবেদ্য মাত্র ভেদ।
পীর বলি না জানিবে না ছাড়িবে বেদ।।
প্রকারে অধর্মী জীবে করিতে উদ্ধার।
আইলাম এই স্থানে করি অঙ্গীকার।।

এইভাবে সত্যনারায়ণ আপনার আবির্ভাবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে ব্রাহ্মণকে পূজা প্রচারের জন্য নানা উপদেশ দেন। পূজার নিয়ম হিসাবে বলেন—

সবিশেষ উপদেশ বিশ্বনাথ বলে।
বান্ধিবে বিচিত্র বেদী মনোরম্য স্থলে।।
গোময়েতে সুন্দর সংস্কার করে স্থান।
আলিপনাআদি ধ্বজা পতাকা নিশান।।
বেদীতে স্থাপিয়া পীঠ তাহে দিবে বাস।
ছুরি কাঠারি কিম্বা তাহে খড়্গ চন্দ্রহাস।।
তার চারি তরকে সুচারু চারি তীর।
তার মধ্যে অধিষ্ঠিত আমি সত্যপীর।।

শির্নির নিয়মাদিও সত্যপীর বলে দেন—

উদ্‌ম্মুখে বেড়িয়া বসিবে বন্ধুগণে।
শির্নির দ্রব্যাদি বলি শুন সাবধানে।।
গুড় দুগ্ধ আটা রম্ভা ফল পান গুয়া।
সম্ভব বিভব মত সব সওয়া সওয়া।।
আবির্ভূত চতুষ্টয় করিয়া সংযোগ।
নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিবে ভোগ।।

সত্যনারায়ণের পূজার সবিশেষ বিধি-বিধান শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পুলকিত হয়ে দেবের চতুর্ভুজ মূর্তি দেখতে বাঞ্ছা করলে তিনি তাঁর নারায়ণ মূর্তি ধারণ করে বিপ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। এই দৃশ্য দেখে বিষ্ণু শর্মা বাড়ির দিকে অতি হৃষ্টচিত্তে গমন করলেন।

এদিকে দেবনারায়ণ বিষ্ণু শর্মার শ্বশুর সেজে কিছু অলংকারাদি ও আহার সামগ্রী নিয়ে কন্যার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পিতার আগমনে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে সেবা যত্ন করলেন ও বাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পিতা সমস্ত কুশল জ্ঞাপন করে প্রস্থান করলেন।

এদিকে বিষ্ণুশর্মা নারায়ণ দর্শন করে সত্যপীরের মহিমা জেনে অতি হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘরে সালঙ্কারা সিমন্তিনী বধূকে দেখে অবাক হলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর—

বণিতা বচনে বিপ্র বারিপূর্ণ আঁখি।
চক্রপাণি চিনিতে নারলে চন্দ্রমুখী।।

তখন উভয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পর নিজগৃহে শিরনির আয়োজন করেন। প্রতিবেশীগণ ব্রাহ্মণগৃহে মুসলমান আচার দেখে অবাক হয়ে বিষ্ণুশর্মাকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

কেহ বলে গলার সূতা ফেল পোড়াইয়া।
মাথা মুড়াইয়া মুখে দাড়ি রাখ গিয়া।।
কেহ বলে মাথা মুড়াও মোজা পর পায়।
নেড়া মাথা হলে শির্নি বড় শোভা পায়।

এইরূপ তিরস্কার ও রসিকতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ তাদের শিবনি দিতে বলেন। প্রতিবেশীগণ তখন জানালেন সত্যপীর বলে যদি কোন পয়গম্বর থাকেন তাহলে তোমাব এই কুঁড়েঘর পুড়ে দিব্যঘর হোক। এই কথা শুনে বিষ্ণুশর্মা ঘরে বসে সত্যপীবের জপ করতে সঙ্গে সঙ্গে ঘর পুড়ে গিয়ে সুন্দর মন্দির নির্মাণ হয়ে গেল। তাই দেখে সবাই পয়গম্বরেব প্রতি বিশ্বাস করল ও শিরনি দিয়ে বিষ্ণুশর্মার উপদেশ মত সত্যপীরের পূজা করল। পীরের কৃপায় প্রত্যেকের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দূর হল।

সদানন্দ নামে এক বণিক, কন্যা কামনা করে সত্যপীরের শিরনি মেনে কন্যা লাভ করেন। যথাসময়ে কন্যা চন্দ্রকলাকে পাত্রস্থ করে শ্বশুর-জামাতা দক্ষিণে কলানিধি রাজার রাজ্যে বাণিজ্যে গেলেন, কিন্তু সত্যপীরের শিরনি দিতে ভুলে গেলেন। এই ক্ষোভে সত্যপীব শাস্তি দেবার মানসে কলানিধি রাজার যত ধনসম্পদ এনে সদানন্দের তরী ভরিয়ে দিলেন। রাজা কোটাল মারফৎ এই সম্পদ চুরির সন্ধান পেয়ে শ্বশুর-জামাতাকে কারারুদ্ধ করেন।

এদিকে দীর্ঘদিন শ্বশুর-জামাতা না ফেরায় গৃহে মাতা ও চন্দ্রকলা কান্নাকাটি করে। বিপ্রবাড়ি খড়ি গনাতে যায়। গিয়ে শোনে বিপ্র সত্যপীরের শিরনি মেনে তার পুত্রকে বারো বৎসর পর খুঁজে পেয়েছে। এই বিশ্বাসে চন্দ্রকলা স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্য পীরের নিকট শিরনি মানে। সত্যপীর চন্দ্রকলার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে কলানিধি রাজাকে স্বপ্নে জানিয়ে দিলেন শ্বশুর-জামাতাকে বিনা কারণে বন্দী করে রেখেছ, তাদের মুক্তি দিয়ে দশগুণ ধনসম্পদ দিয়ে সসম্মানে বিদায় কর। নইলে রাজ্যে অমঙ্গল দেখা দেবে। এতে ভয় পেয়ে রাজা কলানিধি যথাযথ সম্মানে তাঁদের বিদায় দিলেন।

বহু ধনরত্ন নিয়ে শ্বশুর-জামাতা বাণিজ্য তরী সহ গৃহে ফিরলেন। এই দেখে চন্দ্রকলা পরম সাদরে পীরের শিরনি দিয়ে পূজা করলেন। শিরনিপ্রসাদ ভক্ষণ করতে করতে তরণীতে উঠতে গিয়ে শিরনি ভূমে পড়ে যায়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে দর্পভরে এগিয়ে যায়। এতে তাদের অপরাধ হয়। সত্যপীর ক্রুদ্ধ হয়ে জামাতাসহ তরী ডুবিয়ে দেন। তখন কন্যা চন্দ্রকলা স্বামীর শোকে আত্মত্যাগ করতে গেলে সত্যদেব ব্রাহ্মণেব বেশ ধরে তথায় আগমন করেন। সদানন্দ ও তাঁর পত্নীকে চন্দ্রকলার শিরনি উপেক্ষা করার অপরাধের কথা বলেন। সত্যপীরের কথা শুনে চন্দ্রকলা সেই শিরনি চেটে খেলে সত্যপীর সন্তুষ্ট হন ও

তরীসহ জামাতা ভেসে ওঠেন। তখন সবার মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। শঙ্খধ্বনি দিয়ে তরণীর যত ধনসম্পদ এনে ঘরে তুলল।

সাধু সওয়া সহস্রের, শির্নি আনি দ্রুততর।
পূজা কৈল পীরের চরণ।
পূর্ণ হৈল মনোরথ পীর প্রতি সাধুসুত
খয়রাত করিল নানা ধন।

** ** **

শির্নি দিলে শুদ্ধভাবে শুনিলে অভীষ্ট লভে।
পুত্র দারা অর্থ ঘোড়া দোলা।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর বুঝি কার্য্য কর নর
শুন প্রভুর অষ্টমঙ্গলা।[৪]

এরপর অষ্টমঙ্গলা গেয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সত্যপীরের মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক জনপ্রিয় পালাগানের নাম হামাম বাদশা। আবদুল জব্বার গায়েনের নিকট হতে সংগৃহীত পালার কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

সত্যনারায়ণের পালা (হামাম বাদশা)

হামাম বাদশা হা-পুত্র, তাঁর সাতবিবি। কোন বিবির পুত্রসন্তান হয়নি। সত্যপীর আপনার নামের জাহির করার জন্য হামাম বাদশার নিকট গেলেন। হামাম বাদশা ভাবলেন ইনি কোন এক ফকির, ভিক্ষা করতে এসেছেন, তাই তিনি নফরকে দিয়ে ভিক্ষা পাঠালেন। সত্যপীর ভিক্ষা না নিয়ে বাদশাকে দেখা করতে বললেন। হামাম বাদশা পীরের সাথে সাক্ষাৎ করলে পর পীর তাঁকে দোয়া করতে চাইলেন। তিনি হা-পুত্র আছেন, তাঁকে পুত্রসন্তান লাভের দোয়া দিতে চাইলে বাদশা ফকিরের কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না। কারণ অনেক ফকিরের পরামর্শ তিনি নিয়েছেন, কিন্তু কোনটিতে কোন কাজ হয়নি। তখন সত্যপীর ধূলফুল নিয়ে বাদশার হাতে দিয়ে তাঁর ছোটরানীকে খাওয়াতে বলেন। এতে তার বেটা-বেটি জন্মগ্রহণ করবে কিন্তু অন্যকোন বিবিকে খাওয়ালে কোন ফল হবে না।

এই কথা শুনে বাদশা ধূলফুল নিয়ে ফকিরকে সালাম করে ঘরে এলেন। তিনি বারো বৎসরকাল যে ছোটরানীর মুখ দর্শন করবেন না বলে বড়বিবির কথা মত নদীর ধারে নির্বাসন দিয়েছিলেন, বাদশা সত্যপীরের নিকট হতে স্বর্গের ধূলফুল নিয়ে সেই রানীর নিকট গেলেন ও ফকিরের পরামর্শ মত তাকে বেটে খেতে বললেন। বাদশা বড়রানীর সত্যভঙ্গ করে ছোটরানীর বাড়িতে সবার অলক্ষ্যে আসায় বড়রানী তা দেখতে পেয়ে সত্যভঙ্গের জন্য বাদশাকে ভর্ৎসনা করে। বাদশা লজ্জিত হয়ে রাজদরবারে চলে গেলে বড়রানী আর পাঁচজন সতীনকে নিয়ে ছোটরানীর বাড়ি এল এবং বিছানায় পড়েথাকা দুটি গুলাল ফুল দেখে ছোট রানীকে প্রশ্ন করে ফুলের মাহাত্ম্য জানতে পেরে হিংসায় জ্বলে যেতে লাগল।

তখন তারা যুক্তি করে ছোটবিবিকে নদীতে স্নান করতে পাঠিয়ে নিজেরা সেই ফুল বেটে ছয়জনে ভাগ করে খেয়ে নিল। রঞ্জনা ফিরে আসতে তারা জানাল সামান্য দুটি ফুল শিল নোড়াতে রাখতে শিল নোড়ায় মিশে গেছে, তোমাকে আর কি খেতে দেব, তখন রঞ্জনা বলল শিল নোড়ায় সব মিশে যেতে পারে না, তোমরা নিশ্চয় খেয়েছ। এই কথা বলাতে তারা রাগ করে চলে এল। তখন রঞ্জনা সত্যপীরের নিকট কান্নাকাটি করতে সত্যপীর স্বপ্নে সেই শিল নোড়া ধুয়ে খেতে আদেশ দিলেন। সত্যপীরের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রঞ্জনাবিবি শিল নোড়া ধুয়ে খেয়েছিল ও গর্ভে বেটাবেটি জন্ম নিয়েছিল। বেটাবেটি ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে বড়বিবি ছলনা করে বাদশাকে শিকারে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং দাইমার সাথে যুক্তি করে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে মাটির হাঁড়িতে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে রঞ্জনার কোলে কুকুরছানা তুলে দিয়েছিল এবং রঞ্জনাকে জানিয়েছিল যে, তার কোলে দুটি কুকুরছানা জন্মগ্রহণ করেছে।

এদিকে মাটির হাঁড়িতে সন্তান বিসর্জন দিলে সত্যপীর ধ্যানে সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে খচখেজেরকে স্মরণ করলেন। খচখেজের নদীর মাঝে এক দ্বীপে সাধনারত দীনু ফকিরের নিকট পৌঁছে দিলেন। দীনু ফকির নদীতে স্নান করতে এসে হাঁড়ির মধ্যে শিশু দুটিকে দেখে তুলে নিয়ে আল্লার নিকট প্রার্থনা করছেন। সত্যপীর তখন দৈববাণীতে জানালেন নদীতে সাজ আঙ্গুল ডুবিয়ে এক আঙ্গুলে জল নিয়ে বিসমিল্লা বলে শিশুর গালে দিলে ওদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়ে যাবে। দীনু ফকির তাই করলেন।

এদিকে হামাম বাদশা শিকার করে বাড়িতে ফিরতে বড়বিবি জানাল তোমার ছোট-রানী কুকুরবাচ্চা গর্ভে ধারণ করে তোমাকে কুকুরের পিতা করেছে। এই সংবাদ শুনে রাজা ছোটরানীর নিকট গিয়ে কথার সত্যতা যাচাই না করে বিশ্বাস করে নিলেন। তখন কুকুরবাচ্চা গর্ভে ধারণ করার জন্য কি শাস্তি হয় তা জানার জন্য যত সব পণ্ডিতদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন। হিন্দু সনাতন ধর্মে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা পরামর্শ দিলেন এই পাপে মাতাকে চামড়ার মোড়কে মুড়ে বাড়ির সিংহ দরজায় বার বছরকাল ঝুলিয়ে রাখতে হবে। তারপর তার মধ্যে মৃত দেহ শুকিয়ে কাঠ হযে গেলে তবে তাকে দাহ করলে ব্রহ্মা অগ্নিদেব স্পর্শ করবে ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। মোল্লা মৌলবীরাও ঐ একই কথা বললেন। হিন্দু মুসলমান সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে পর বাদশা চামারকে ডাকলেন এবং চামের মোড়ক তৈরি করে তার মধ্যে রঞ্জনাবিবিকে বারো বছর রেখে দিলেন। চামের মোড়কে রাখার সময় রঞ্জনা বলেছিল সত্য যদি সত্যপীরের শিলনোড়া ধুয়ে খেয়ে আমার গর্ভে কুকুরবাচ্চা জন্মে তাহলে দুনিয়ায় সত্যপীরের নাম যেন কেউ মুখে না আনে।

সত্যপীর রঞ্জনাবিবির প্রার্থনা শুনে মালিকের নিকট ফরিয়াদ করছেন যদি রঞ্জনা চামের মোড়কে মারা যায় তাহলে দুনিয়ায় আমার নাম কেউ করবে না। তুমি ইউনুস নবীকে সমুদ্রের মাঝখানে মাছের পেটে রেখে উদ্ধার করেছিলে, ইব্রাহিম নবীকে জ্বলন্ত (?) আগুনের কুণ্ডুর মধ্যে রেখে ফুলের বাগান করে তাকে উদ্ধার করেছিলে, তুমি কি পার না রঞ্জনাকে চামের মোড়কে বারো বছর জীবিত রাখতে? আল্লা সত্যপীরের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন এবং চামের মোড়কে রঞ্জনা বারো বছর জীবিত ছিল।

এদিকে দীনু ফকির রঞ্জনার বেটাবেটিকে দ্বীপের মাঝখানে পালন করছেন। তিনি

তাদের নাম রেখেছিলেন আকবর ও মোক্তারবিবি বা মোক্তারী। পাঁচবছর বয়স হলে তারা দীনু ফকিরের কাছে তাদের মায়ের পরিচয় জানতে চাইল। দীনু ফকির তখন আত্মপরিচয় গোপন করে বলেছিলেন আমি তোমাদের আব্বা, আর গাছের ডালে যে হাঁড়িটি ঝুলছে ঐটিই তোমাদের মা। আমি না-মরা পর্যন্ত তোমরা ঐ হাঁড়িতে হাত দেবে না এবং ঐ জননী তোমাদের সন্তান বলে মানবেনা।

দীনু ফকির রঞ্জনার বেটাবেটি পালন করার জন্য আরও বারো বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বেহেস্তে যাবার সময় হয়ে গেলে আল্লা দূত পাঠালেন, ভক্ত দীনু ফকিরের আত্মা কবুল করে আনতে। সাধক দীনু তাঁর অন্তিম সময় জানতে পেরে নিজের উপরে একটি কম্বল চাপা দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আকবর ও মোক্তারী এ ব্যাপার জানতে পারল না। অনেক ডাকের পর তারা বুঝতে পারে যে আব্বা আর নেই। তখন তারা খুব কান্নাকাটি করতে থাকলে সত্যপীর আমিনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর তাদের দুইভাই-বোনকে নিয়ে দীনু ফকিরকে গোর দিলেন। তারপর নানা কথায় তাদের ভুলিয়ে নগরে পাঠালেন, সেখানে তাদের ভিক্ষা করে খাবার পরামর্শ দিলেন ও হামাম বাদশার বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। তখন তারা হামাম বাদশার বাড়িতে গিয়ে মা মা করে ডাকতে লাগল। ডাক শুনে বড়রানী বার হলে তারা ক্ষুধার কথা জানিয়ে ভিক্ষা মাঙল। দুই অপরূপ সুন্দর কিশোর-কিশোরীকে দেখে বড়বিবির খুব দয়া হল। বিবি তাদের মাতাপিতার পরিচয় জানতে চাইলে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে হাঁড়িকে দেখিয়ে বলল এই আমাদের মাতা। তখন বড়বিবি সেই হাঁড়িটা দেখে অবাক হয়ে গেল। তাতে রঞ্জনাবিবির কথা লেখা আছে এবং বুঝতে পারল এরা রঞ্জনার বেটাবেটি। তখন বড়বিবি তাদের বিষ খাইয়ে মারার জন্য বিষ মিশিয়ে খাবার এনেছিল। বাবা সত্যপীর সেকথা অন্তরে জেনে চমকিত হলেন। তখন তার কৃপায় চামড়ার মোড়ক থেকে রঞ্জনার দুফোঁটা চোখের জল তাদের মস্তকে পড়ল। তাঁরা উপরে চেয়ে দেখে বিষয়টি জানতে পারল এবং বিপদের আশঙ্কা বুঝে তারা সেখান থেকে বনে চলে গেল। সেখানে সত্যপীরের সাথে সাক্ষাৎ হল এবং সত্যপীর তাদের আশ্রয় দিলেন।

এরপর সত্যপীর আমিনকে হামাম বাদশার নিকট বলে পাঠালেন, জঙ্গলে এক দরবেশ আছে, তাঁর নিকট দুইটি বেটাবেটি আছে, রাজা যদি আপনার মাথার তাজ খুলে তাদের মাথায় পরিয়ে দিতে পারেন তাহলে তিনি তাঁকে দোয়া করবেন এবং হাপুত্র বাদশা পুত্রলাভ করবেন। এই কথা শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন এবং সত্যপীরকে চিনতে পেরে রাজসভায় নিয়ে এসে তাঁকে শাস্তি দিতে চাইলেন। কারণ এই দরবেশের দেওয়া ধুলফুল খেয়ে তার ছোটরানী কুকুরবাচ্চা প্রসব করে তাকে কুকুরের পিতা করেছেন। তখন সত্যপীর বললেন, তোমার মাথার তাজ খুলে দুই বেটার মাথায় পরিয়ে দিলে এই বেটাই আমার বিচার করে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে। এই কথা শুনে রাজা তাজ খুলে সেই বাচ্চার মাথায় দিতে গেলে চিন্তা করলেন এ কার বাচ্চার মাথায় তিনি তাজ পরাচ্ছেন। তখন এই বাচ্চার পরিচয় জানতে চাইলে সত্যপীর বেটাবেটিকে সত্য পরিচয় দিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন ও রঞ্জনা চামের ব্যাগের মধ্যে কিভাবে আছে তা জানালেন। বাদশা বেটাবেটি সহ সত্যপীরকে নিয়ে গৃহে ফিরে এসে রঞ্জনাবিবির চামের মোড়ক নামালেন। দেখলেন তার

ভেতর রঞ্জনাবিবি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সত্যপীর তখন কিছু পানি নিয়ে ইসমাজম দোয়া পড়ে রঞ্জনাবিবির পূর্বের রূপ ফিরিয়ে দিলেন। বাদশা এই দৃশ্য দেখে সত্যপীরের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়লেন ও রাজপ্রাসাদে সত্যপীরের স্থান নির্মাণ করে নগরবাসীগণের আমন্ত্রণ জানিয়ে পীরের মহিমা প্রচার করলেন। হামাম বাদশা কর্তৃক সত্য পীরের গ‌ হাজত দিয়ে জাহির হওয়ার পর সত্যপীর সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

সত্যপীরের আসরে আহ্বানমূলক গান

কোথা রইলেন সত্যপীর বাপ এস আমার এই আসরে
অধম সন্তানের ডাকে এস বাবা দয়া করে।
আসবে বলে আশা করে, আছি বসে আসন করে
তোমার করুণা বিনা এই আসরে জয় নাই আমার যে।
আমিন ভাইকে সঙ্গে করে এস বাবা দয়া করে
তোমার করুণা বিনা নাম নাই এই আসরে।
কে বুঝিতে পারে বাবা সত্যপীর বল মহিমা তোমার
তব গুণ ব্যাখ্যা নিতে হেন সাধ্য আছে কার।
তুমি যে দয়াল অত্যন্ত কেবা বোঝে তোমার অন্ত
মায়াতে আছে চূড়ান্ত তোমার অন্ত পাওয়া ভার।
তুমি যার আছ ঘটে পায়না দুঃখ কোন মতে
ত্বরাও যে বিপদ সঙ্কটে তোমার অন্ত পাওয়া ভার।

বাড়ির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা

দাও দোওয়া অলি দাও দোয়া
যে জন তো নামে বাবা গান হাজত দেয়
কৃপা করে বাবা সত্যপীর রাখিবে বজায়।
যে জন তো নামে বাবা দান করে যায়
দয়ার সত্যপীর বাবা কৃপা করবে তায়।
এই স্থানে উপনীত হয়ে যত জন
সবার প্রতি কৃপা করবে সত্যপীর হয়ে একমন।
যে জন তো নামে বাবা দান করে যায়
তুমি তাদের প্রতি কৃপা রাখিবে সদায়।
নায়েকের ঘরে যত আছে ত্বরামণি
সবাকার রেখ ঠাণ্ডা সত্যপীর গুণমণি।
এই আসরে উপস্থিত হয়ে যত জন
সবার প্রতি কৃপা রেখ অনুক্ষণ। ....

গানের আসরের নিয়ম

গায়ক প্রথমে আসরে আশাদণ্ড পুঁতে তার সামনে মোকাম পাতেন। তারপর গায়ক ধুতি পাঞ্জাবি বা লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরে হাতে চামর নিয়ে গান শুরু করেন। মূল পালায় প্রবেশের আগে মালিকের নামের সাথে হাসান-হোসেন, মা ফতেমা, আলি কুরমুল্লা অজেয়, মুসলিম ধর্মের বিশেষ সাধক যাঁরা সাধনাবলে উপরওয়ালাকে রাজী করিয়েছেন, তাঁদের নাম স্মরণ করেন। এরপর সত্যপীর বাবাকে আসরে উপনীত হওয়ার জন্য প্রার্থনামূলক গান করে মূল পালায় প্রবেশ করেন।

মোকাম পাতার নিয়ম

কাঁঠালকাঠের পিঁড়ির উপর একটি নতুন গামছা পাতা হয়, তাতে পাঁচটা মোকাম করা হয়, প্রত্যেকটিতে একটি পান, একটি সুপারি, একটি বাতাসা একটি ফুল থাকে। একটি পাত্রে কিছু দুধ ও একঘটি জল থাকে। গান শেষ হলে এই পাঁচটি মোকামের একটি গায়ক নেন আর চারটি নায়েক পক্ষ বা প্রধান উদ্যোক্তাদের দেওয়া হয়। তাঁরা সবাই সেটি প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন। পান সুপারি জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মোকাম তুলে দেবার পর বাড়ির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনামূলক গান করে আসর শেষ করা হয়।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে সত্যপীরের পালাগানের বিশেষ প্রচলন আছে। ক্ষেত্রগবেষণাকালে সত্যপীরের একটি মাত্র পালাগান সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু মুদ্রিত আকারে একাধিক সত্যপীরের পাঁচালির সন্ধান পাওয়া গেছে। হিন্দুগণ সত্যপীরকে নারায়ণরূপে আড়ম্বরের সাথে শিরনি দিয়ে গৃহের মঙ্গলকামনা করেন, মুসলমানগণ সত্যপীরের নামে গানহাজত দিয়ে শিরনি দিয়ে পীরের দোয়া মাঙেন। বর্তমানে সত্যপীরের শিরনির ব্যাপক প্রচলন থাকলেও পালাগানের অনুষ্ঠান তুলনামূলকভাবে কম হতে দেখা যায়। সত্যনারায়ণের পূজা বা শিরনি ব্যবস্থা চব্বিশ পরগণা তথা বাংলার লোকসমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু পালাগান বিশেষভাবে লোকসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সত্যপীরের থান বা দরগা চব্বিশ পরগণায় কম দেখা যায়। কোন কোন থানে সত্য-পীরের মূর্তি দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলে সত্যপীরের পালা গায়ক কম হলেও কাওয়ালী সুরে অনেকেই পীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, এছাড়া পূজা বা শিরনিকালে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত নিজেই সত্যপীরের পাঁচালি পাঠ করেন। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে মিশ্র সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আবর্তে সত্যপীরের পূজাহাজত এবং লোকায়ত পীরপালা জনপ্রিয়রূপে প্রচলিত আছে।

পাদটীকা

১। গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ১ম সংস্করণ, পৃ: ৪৪৭।
২। পুরোহিত দর্পণ (৫ম খণ্ড), সত্যনারায়ণ ব্রত, পৃ: ৯১৩-১৪।
৩। বেঙ্গল সেটেলমেন্ট রেকর্ড, ১৯২৮-৩১।
৪। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা, অক্ষয় লাইব্রেরী প্রকাশনা।

পীর ও গাজীপালা ঃ মাদারপীর

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক প্রচলিত পালাগানের ধারায় বহু পরিচিত নাম হল মাদারপীর। লোকায়ত পালাগান আলোচনায় এটি পীর ও গাজীপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত পিরুলী পালাগানের মধ্যে মাদারপীরের পালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদারগাছের তলায় জন্মেছিলেন বলে তিনি মাদারপীর, মাদারদেওয়ান, শাহমাদার, মাদারসাহেব ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেন বলে কথিত হয়। তিনি পুরুষ নন ও স্ত্রীও নন। "না মরদ আছে না আওরতের নেসানি।"[১] তাঁর আহার ও নিদ্রা ছিল না। তিনি জিন্দা-শাহমাদার, দমেরমাদার। তাঁর পিতা হারুত, মাতা মারুত। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ তাঁকে আগুনের দেবতা বলে মান্য করেন। লোকবিশ্বাস, মাদারপীরকে অবজ্ঞা করলে বাড়ি ঘরে আগুন লেগে যায়। মুরগি পুড়িয়ে মাদারের লুট-হাজত দেওয়ার রীতি আছে।[২]

মাদারপীরকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক পীর বলে মনে করেন। তাঁদের মতে তাঁর প্রকৃত নাম হজরত বদিউদ্দিনশাহমাদার। ১৩১৫ খ্রীঃ সিরিয়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা আবু ইসহাক স্বামী। ডঃ এনামুল হক প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন ১৪৩৪ খ্রীঃ তিনি কানপুর জেলার মকনপুর (সৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর রাজত্বকালে) প্রায় একশত বিশ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন। তিনি অতিশয় সুদর্শন ছিলেন। কথিত আছে, এই কারণে তিনি বোরখায় মুখ লুকিয়ে বেড়াতেন। তিনি বারো বছর পর্যন্ত অনাহার ও একবস্ত্রে সাধনায় মশগুল ছিলেন।[৩] তিনি সুফী সাধক ও সুফী তরীকার অন্যতম বিভাগ মদারীয়া তরীকার প্রবর্তক। সম্ভবত তিনি বঙ্গদেশে আসার পর এদেশে তাঁর তরীকা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, চট্টগ্রাম জেলার মাদার বাড়ি, মাদারশা ইত্যাদি স্থান পীরের স্মৃতি বহন করছে। দক্ষিণবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমায় শাসন গ্রামের হাটখোলায় মাদারপীরের দরগা আছে। বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানায় হরিপুর গ্রামে ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শাঁখশহরে মাদারশাহের কল্পিত দরগা আছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বারুইপুর থানায় মাদারাট নামে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। মাদারাট এই নাম সম্পর্কে লোকসংস্কৃতির গবেষক কালিচরণ কর্মকার মনে করেন, এখানে মাদারপীরের আস্তানা ছিল। তাঁর মতে মাদাব টাট কথা থেকে মাদারাট শব্দটি এসেছে। 'টাট' শব্দটি আঞ্চলিক। বাঁশ বাখারি দিয়ে সৃষ্টি মাচা, তার উপরে থাকে খড়ের ছাউনি, সেখানে বাস করা যায় অথবা অবসর বিনোদন করা যায়। জলাজঙ্গল অধ্যুষিতএই অঞ্চলে সম্ভবত মাদারপীর কোন একসময় এসেছিলেন এবং এই টাটে বসে ভক্তদের সঙ্গ দিতেন। সেকারণে এই স্থানটি মাদাবাট নামে পরিচিত হযেছে।[৪] তবে এ বিষয়ে বলিষ্ঠ কোন সূত্র নেই।

চব্বিশ পরগণায় মাদারপীর বহু পবিচিত নাম। অন্যান্য পীরপীরাণীদের মত মাদার-পীরের পালা ও গান এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রগবেষণায় জানা গেছে অদূর অতীতে মাদারপীরের গানের খুবই প্রচলন ছিল। এ গানের শিল্পীও কম ছিল না, কিন্তু বর্তমানে (১৯৯৩) এ গানের শ্রোতা ও শিল্পী নিতান্তই কম। লোকশিল্পী নকুল মণ্ডল (বারুইপুর থানা) শ্রোতাদের নিকট হতে অনুরোধ এলে আসরে শাখা পালা হিসাবে মাদারপীরের গান করেন বলে জানান। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অনেক মুসলমান লোকশিল্পী এই পালাটি কাওয়ালী রীতিতে গান করেন। বিশেষত ভাঙ্গড় সুলতান, ঘুটিয়ারী শরীফের মোবারক গাজী, হাড়োয়ার গোরাচাঁদপীর প্রভৃতি বিভিন্ন পীরের দরগায় বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে কাওয়াল গানের আসর বসে সেখানে মাদারপীরের গান শোনা যায়। রফিকুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম (বকজুড়ি), আবদুল জব্বার (কুসুম্বা), আবদুল ফকির (পাটকেলপোতা) প্রমুখ লোকশিল্পীগণ মাদারপীরের পালাটি কাওয়াল রীতিতেই গান করেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত পাটকেলপোতা গ্রামের বহু পরিচিত গায়ক আবদুল ফকির (কাওয়াল) মাদারপীরের গান করেন। পীরের গান তিনি কাওয়ালী রীতিতে করলেও পালাগানের আঙ্গিক কিছুটা পালন করেন। তিনি সরাসরি গানে প্রবেশ না করে প্রথমে মাদারপীর ও বড়পীর সাহেবের কিছু কথা বলে নেন। তারপরেই বাদ্য সহযোগে কাওয়ালী রীতিতে গান করেন। তাঁর নিকট হতে যে গান সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ --

মাদারপীর আর বড়পীর সাহেব একদিন বলছেন, আয় ভাই আমরা লুকোচুরি খেলা করি। এই বলে প্রথমে বড়পীর সাহেব লুকালেন। মাদারপীর বড়পীর সাহেবকে খোঁজাখুজি করছেন। কোথাও পেলেন না। দরিয়ার ধারে গিয়ে দরিয়ায় নেমে খুঁজছেন। তিনি দেখলেন বড়পীর সাহেব এক মাছের পেটে লুকিয়ে রয়েছেন। মাদারসাহেব তাঁকে ধরে ফেললেন। এরপর বড়পীর সাহেবের কথামত মাদারপীর লুকালেন। যে-সময় বড়পীর সাহেব দম টানলেন তখনই দমের সাথে তিনি মাথায় গিয়ে লুকালেন। বড়পীর সাহেব সর্বত্র খোঁজাখুজি করলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তখন বড়পীর সাহেব চিৎকার করে বললেন, কোথায় আছ মাদারসাহেব, তুমি বার হয়ে এস। লুকোচুরি খেলায় আমি তোমার কাছে হেরে গেছি। তখন মাদার সাহেব পীরের মস্তক দিয়ে বার হয়ে এলেন। সেই থেকে মাথার মাঝখানটা নরম হয়। বিশেষত বাচ্চাদের এই জায়গাটা ধুকধুক করে বেশ বোঝা যায়। এই অংশটি বলে নিয়ে

তিনি গানে প্রবেশ করেন। মাদারপীর সম্পর্কে একটি সুন্দর সুসংহত কাহিনী সংগ্রহ করে লিখেছেন ছায়াদ আলি খোন্দকার (১৩১৭), তাঁর সংগৃহীত কাহিনীটি নিম্নরূপ —

মাদারপীরের কাহিনী

আল্লার প্রিয় ফেরাস্তা ছিল হারুত আর মারুত। এরা যত কিছু ভেদ কথা ভাল আর বুরা আল্লার দরগায় নিবেদন করত। একদিন এদের আদম আর হাওয়ার সম্পর্ক কেমন তা জানার বাসনা হল। আল্লা তাদের এ বাসনা ত্যাগ করতে বললেন। তবুও তারা তাদের আবদার ত্যাগ না করায় আল্লার ফরমানে আশমান থেকে জমিনে পড়ল—

হারুত হইল মরদ মারুত আওরত,
দুইজনা জরু খছম হইল খুব ছুরত।
আওরত মরদের যেমন বেভার পুসিদায়
সেইরূপ বেভার করেন দুজনায়।

আল্লার হুকুমে মারুতের গর্ভ হল, কিন্তু তা মোচন আর হয় না। তখন মুশকিলে পড়ে তারা আল্লার নাম করে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল।

খারাব হইনু মোরা আপনার দোষেতে
দোজখে পড়িয়া মোদের হইল জ্বলিতে।

ঈশ্বরের তখন দয়া হয়।

মগরের ওক্তে হুকুম হৈল ফেরেস্তায়
আচ্ছা করে বান্ধ কসে মজবুত দোহায়।
আমার মুচ্ছলিগণ নামাজ পড়িলে
সেই ভক্তে বান্ধিবে সে রশি দিয়া গলে।
মজবুত করিয়া জিঞ্জির হাতে পায়ে দিবে
দুইজনা একসাথে মোড়ম্বা করিবে।

বাঁধবার হুকুম শুনে ভয়ে মারুতের গর্ভপাত হল। নবজাত শিশুকে মাদারগাছের তলায় ফেলে রেখে হারুত ও মারুত গায়েব হল। হজরত আলি শিকারে এসে গাছতলায় রূপবান ছেলেটিকে পেয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিবি ফতেমাকে দিলেন মানুষ করতে। মাদারতলায় কুড়িয়ে পাওয়া গেছে বলে নাম হল মাদারদেওয়ান বা শাহমাদার।

পাঁচ-সাত বৎসর বয়স হলে মাদার খেলা করে বেড়ান রাখালছেলেদের সঙ্গে। একদিন রাখালছেলেরা মাদারকে বলে, আজ বড়পীরের শিরনি হবে। মাদার জিজ্ঞাসা করেন, বড় পীর কে? রাখাল ছেলেরা বলে, তার নাম করতে নেই। লেওয়ামাত্রে নাম গর্দ্দান জুদা যে হইবে। মাদার বড়পীরের কাছে গিয়ে বললেন, এস, তুমি বড় কি আমি বড় পরীক্ষা হোক।

আচ্ছা ভাই এইখানে শিরনি রাখিয়া
আমরা তকরির করি একত্রে মিলিয়া।

সত্ত একবার তুমি করো মোর সাতে
হারিলে গর্দ্দান জুদা নাহি হবে তাতে।

বড়পীর বললেন, বেশ কি কাম করিবে তুমি বল বুঝাইয়া।

মাদার বলেন ভাই লুকোচুরি খেল
বোঝা যাবে এইবার হইলে কামেল।

বড়পীরের আগে লুকোবার পালা—

বড়পীর আখেরেতেআজিজ হইয়া
নজর হইতে কোথা গেল ছেপাইয়া।
দরিয়াতে মাছের যে আণ্ডার ভিতরে
কুসুমের ভিতরেতে ছেপায় জহুরে।

মাদার ধ্যানে জেনে বড়পীরকে ধরে ফেললেন। তারপর মাদাবের পালা। মাদার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বড়পীরের শ্বাসে ঢুকে গেলেন। পাহাড়-পর্বত চুঁড়ে মাদারের সন্ধান না পেয়ে বড়পীর বললেন— 'হারিনু তোমার কাছে কোথা আছ বল'। অশরীরী মাদার বললেন—

হাওয়া ভেরে ছেপাইনু নিশ্বাস টানিতে
হাওয়ার সামিলে আছি তোমার দমেতে।

তারপর বড়পীরের মূর্ধা ভেদ করে মাদার বাইরে এলেন—

আখেরেতে মস্তক হইতে খেচিয়া উঠিল
আজতক সেই জায়গা খালি যে রহিল।
ছেরের মর্দ্ধিখানে যাকে ব্রহ্মতালু বলে
দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে।
লাড়কার মালুম হয় হাড় নাই তায়
ধুকধুক করে সেথা সদাসর্বদায়।
খেচিয়া উঠিল মাদার ব্রহ্মতালু হইতে
দম মাদার বলিয়া নাম রহিল দুনিয়াতে।
দমেতে খেচিয়া মাদার দম মাদার হইল
কালে কালে সেই নাম জাহের রহিল।

লুকোচুরি খেলায় বড়পীর হেরে গেলে মাদার বললেন—

আচ্ছা ভাই এই তক হাছেল কালাম
ঝগড়া মিটিয়া সিন্নি করহে তোমাম।
না পাকিতে যে জন নাম লইবে তোমার।
গরদানের পশম এক কাটিবে তাহার

একদিন বাড়ির বাইরে মাদার খেলছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন বিকটাকার যমদূতকে

(মালেকল মওত)। মাদার তাকে নাস্তানাবুত করে এক মৃতের জান কেড়ে নিলেন। মালেকল মওত জীবরিলের কাছে গিয়ে মাদাবেব অত্যাচারের কথা জানালো। জীবরিল এজরাফিলকে পাঠালেন মাদারের কাছে তাকে বুঝিয়ে বলতে।

তরস্ত যাইবে তুমি না করিবে হেলা
বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া নিরালা।

এজরাফিল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আল্লার কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন। তখন পাঠান হল মেকাইল ফেরেস্তাকে। তাঁকে দেখে মাদার আগুনের মত জ্বলে উঠে বললেন—

যাও যাও মেকাইল না শুনিব কথা
তোমার কি ধার ধারি কাম নাহি হেথা
ছামনেতে নাহি কহো বলিনু তোমারে
যাহার লিয়েছি জান সে বুঝিবে মোরে।

তারপব গেলেন আজরাইল। তাঁর দৌত্যও ব্যর্থ হল। তারপর গেলেন বিবি ফতেমা, দুই ইমাম হাসান ও হোসেন, হজরত আলী, হজরত নবী। তারপরে আইল দেখ আপনি ছোবহান। তখন মাদার তাঁর মনের সংশয় আল্লাকে জানালেন, আবদুল্লা আমিনা কেন দোজখ মাঝারে। আল্লা মাদারকে তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন—

এক এক করিয়া কত বোঝায় খোদায়
কিঞ্চিৎ বুঝিল মাদার বসিয়া তথায়।
মাদার বুঝিয়া তখন খামস হইয়া
জান লিয়া দিল তখন হাতেতে সুপিয়া।
দুই হাত জুড়ে করে আরজ হুজুরে
বড়ই করেছি গোনা নাহি চিনে তোরে।

আল্লা খুশ হয়ে বললেন—

তোমার কথার জেদ বাহাল রাখিয়া
গোনাগার বান্দা সবে খালাছ করিয়া
আবদুল্লা আমেনা বাকি যেবা যতো আছে
উম্মতের মধ্যে গোনা যে জন করেছে।
সকলকে মাফ দিলাম তোমার কথায়
বেহেস্তে দাখিল আমি করিব নিশ্চয়।[৫]

মাদারপীরের কেচ্ছাকাহিনীর ধারায় ঐ অংশটি ছাড়া আর তেমন কোন কাহিনী মেলেনি। পরিশেষে মাদারপীর সম্পর্কে বলা যায়, মাদারপীর ঐতিহাসিক হোন বা না হোন তিনি বাংলার জনমানসে শ্রদ্ধাস্পদ পীর। তাঁর বহু কাল্পনিক দরগা এবং তাঁর নামে বহু স্থানের নামকরণ থেকে বোঝা যায়, এককালে মাদারপীরের মাহাত্ম্য নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু বর্তমানে তাঁর এরূপ প্রভাব হীনতার সঠিক কারণ কি তা বলা যায় না। সম্ভবত সুফী সাধনার দিন শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সুফী সাধকের প্রভাব কমে

গেছে। চব্বিশ পরগণায় ক্ষেত্রগবেষণাকালে মাদারপীরের খুব অল্প সংখ্যক থান দেখা গেছে। এ অঞ্চলে মাদারপীরের পূজা, হাজত ও গানের প্রচলন বর্তমানে খুবই কমে গেছে বলে জানা যায়। পিরুলীগানের শিল্পীদের নিকট হতে সাক্ষাতকার ভিত্তিক যে তথ্য লাভ করা গেছে তাতে জানা যায়, পূর্বে এ পালাগানের চাহিদা ছিল বলে অনেকে পালাটি গাইতেন, এখন চাহিদা না থাকায় পালাটি গাওয়া হয় না। ফলে লোকশিল্পীদিগের মুখে মুখে প্রচারিত মাদারপীরের পালাগানটি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল কাওয়ালগণ অনেকক্ষেত্রে খণ্ড পালা হিসাবে পালাটি গান করেন।

পাদ টীকা

১। ডঃ সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪০০, পৃ: ১৪৫।

২। কামিনীকুমার রায়, লৌকিক শব্দকোষ (২য় খণ্ড), ১৯৭১।

৩। ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬, পৃ: ৩২১।

৪। কালিচরণ কর্মকাব, সাক্ষাতকার।

৫। ডাঃ সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য।

পীর ও গাজীপালা ঃ গোরাচাঁদপীর

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে গোরাচাঁদপীরের পালা অন্যতম। পালাগান আলোচনায় গোরাচাঁদপীরের পালা পীর ও গাজীপালার অন্তর্গত। উত্তর চব্বিশ পরগণার হাড়োয়ার বিশিষ্ট পীর হলেন পীরগোরাচাঁদ। হাড়োয়ায় গোরাচাঁদপীরের মাজারাটি মূল মাজার বলে কথিত হয়। এটি বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত। চব্বিশ পরগণা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ও বর্তমান বাংলাদেশে গোরাচাঁদপীরের কাল্পনিক দরগা আছে বলে জানা যায়। চব্বিশ পরগণার অশোকনগর, বামনপুকুর, কামদেবপুর, চন্দনহাটি, খুড়র, ঘোড়ারাশ, নেহালপুর প্রভৃতি স্থানে গোরাচাঁদপীরের নজরগাহ আছে, কিন্তু চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অধ্যুষিত বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে এই লোকদেবতার দরগা দেখা যায় না। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে গোরাচাঁদপীরের কদাচিৎ মূর্তি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে তাঁর যোদ্ধা মূর্তি। আকৃতি বেশ সুন্দর ও বীরোচিত। পরিধানে চোগা-চাপকান, মাথায় পাগড়ি, হাতে তলোয়ার, বাহন ঘোড়া। ব্যাঘ্রবাহন গোরাচাঁদ অতি বিরল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পীরের দরগাসমূহে কাল্পনিক সমাধি দেখা যায়। হাড়োয়ায় গোরাচাঁদপীরের যে সমাধি রক্ষিত আছে (?) এখানে মুসলমান ফকির সেবার কাজ করেন। বাতাসা মিষ্টান্নাদি হাজতের প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভক্তগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পীরের দরগায় ধূপ-বাতি জ্বেলে মোনাজাত করেন। কেউ কেউ গোলাপজল ও পয়সা দিয়ে গোরাচাঁদ পীরের কাছে নমস্কার করেন।

গোরাচাঁদপীরকে ঐতিহাসিক পীর বলা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম হজরত সাহ সৈয়দ আব্বাস আলি মক্কি। পিতার নাম হজরত মোর্ত্তজা আলি করম (সেবেখোদা), মতান্তরে করিম উল্লাহ। পিতার দিক দিয়ে তিনি হজরত নবী মহম্মদের জামাতা (চাচাতো ভাই) হজরত আলির অধস্তন বংশধর। মাতার নাম মায়মুনাবিবি। তিনি হজরত আবুবক্কার সিদ্দিকীর বংশের কন্যা। গোরাচাঁদের জন্ম ৬৯৩ হিজরাব্দ-এর ২১ রমজান এবং মৃত্যু ৭৭৩ হিজরাব্দের ২১ রমজান বা ১১ই রমজান বা ১২ ই ফাল্গুন।[১]

আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে হিজরাব্দ অনুসারে গোরাইগাজীর জন্ম ও মৃত্যু আনুমানিক ১২৭৫—১৩৫৫ খ্রীস্টাব্দ, কিন্তু তা আদৌ সঠিক নয়। কারণ ২৮ বৎসর বয়সে শাহজালালের নেতৃত্বে ভারতে আগমন এবং ১৩৮৪ খ্রীঃ রাধাগোবিন্দের সাথে যুদ্ধ, পরে তাঁর নেতৃত্বে ২২ জন আউলিয়া দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে আসা তত্ত্ব ও তথ্য সঠিক হলে গোরাইগাজীর জন্ম ও মৃত্যু দাঁড়ায় আনুমানিক ১৩৪৫-৪৬—১৪২৫-২৬ খ্রীঃ। গোরাচাঁদের জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে আরও একটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

হাড়োয়া নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পীরগোরাচাঁদের স্মৃতি। ইনি গোরাইগাজী নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম মক্কায় ৬৯৩ হিজরীর ২১ রমজান। মতান্তর হিঃ ৬৬৪ খ্রীঃ ১২৬৫। আনুমানিক ১৩২০—১৩২২ সালের মধ্যে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সময় পীরগোরাচাঁদ ২১জন বীরভ্রাতা সঙ্গে নিয়ে আসেন বালান্দা পরগণায়। দেউলা, দেবালয় বা দেগঙ্গার রাজা চন্দ্রকেতুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পীরগোরাচাঁদ মারা যান ১৩৭৩ সালে। তখন তাঁর বয়স আশি। কুলটী বিহারী গ্রামে কালু ঘোষের গৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁকে হাড়োয়ায় এনে সমাহিত করা হয়েছিল। সমাধির উপর মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দেন গৌড়ের শাসনকর্তা আলাউদ্দিন। তিনি সেই সঙ্গে এক হাজার পাঁচশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। কালু ঘোষ পরিবার দীর্ঘকাল এই সমাধির সেবাইত ছিলেন। পীরগোরাচাঁদের শেষ খাদিমদার বা সেবায়েত ছিলেন শেখ দ্বারা মালিক। এদের বংশধর এখনও বর্তমান, কিন্তু দরগাহের সেবাভার জনগণের উপর।[২]

পীরগোরাচাঁদ আরব থেকে আগত বাইশজন আউলিয়ার একজন বলে কথিত হয়। তিনি যে ২১জন বীরভ্রাতা নিয়ে বালান্দা পরগণায় এসেছিলেন ইসলাম প্রচারার্থে তাঁদের একটি নামের তালিকা পাওয়া যায় যা নিম্নে প্রদত্ত হল।—

১।	শাহ সৈয়দ আব্বাস আলি গাজী	হাড়োয়া, ২৪ পরগণা
২।	শাহ মোহাম্মদ সুফী গাজী	পাণ্ডুয়া, হুগলী
৩।	দারাফখাঁ গাজী বা জাফর খাঁ গাজী	ত্রিবেণী, হুগলী
৪।	শাহ আবদুল্লাহ গাজী	শিরশিনী, বর্ধমান
৫।	শাহ আহমদুল্লা গাজী বা একদিল শা	আনোয়ারপুর, ২৪ পরগণা
৬।	শাহ দাউদ আকবর গাজী	সোহাই, ২৪ পরগণা
৭।	শাহ সফিকুল আলম গাজী	কামারপাড়া, ২৪ পরগণা
৮।	শাহ মোহাম্মদ সৈয়দ গাজী	সালতিয়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা
৯।	শাহ হাসেদুদ্দিন গাজী -	আবেদপুর, মোগলকোট, বর্ধমান
১০।	শাহ কোরবান আলি গাজী	আরামবাগ, হুগলী
১১।	শাহ মোমিনুদ্দিন গাজী	বানডোলা, বর্ধমান
১২।	শাহ ইলিয়াস গাজী	আঁধারমানিক, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা
১৩।	শাহ সৈয়দ আবদুল গাজী	বঙ্গোপসাগরের নিকট

১৪।	শাহ্ আবদুল নাইম গাজী	কোন্নগর, হুগলী
১৫।	শাহ আন্নাম মোল্যা আবদুল আহেদ গাজী	রায়গ্রাম, বর্ধমান
১৬।	শাহ হোসায়েন হয়দার গাজী	পূর্ণিয়া, বাংলাদেশ
১৭।	শাহ্ মোহাম্মদ ফাজিল গাজী	হিঙ্গলগঞ্জ, বাংলাদেশ
১৮।	শাহ্ আবুল ফজল গাজী	ঐ
১৯।	শাহ আবদুল্লাহ গাজী (শাহ সোন্দল)	শিউড়ী, বীরভূম
২০।	শাহ্ মোহাম্মদ হাসান গাজী	হাসনাবাদ, ২৪ পরগণা
২১।	শাহ আবদুল লতিফ গাজী	হরিহরপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা
২২।	শাহ দায়েস গাজী	শিবতলা, ডায়মন্ডহারবার, ২৪ পরগণা

কথিত আছে, এই বাইশজন আউলিয়া পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আগে রায়কোলা বা রায় কোহিলা (বারাসাত মহকুমা) পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন। এই রায়কোলা বাইশ আউলিয়ার স্থান বলে এখনও পরিচিত।[৪]

এত সব তথ্যের ভিত্তিতে পীরগোরাচাঁদকে ঐতিহাসিক পীর বলতেই হয়। লোক-সংস্কৃতির গবেষকগণ ও ঐতিহাসিকগণ অন্তত তাই বলবেন, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর জন্ম মৃত্যুর যে সন তারিখ দিয়েছেন, তাতে কেউ 'সম্ভবত' বা কেউ 'আনুমানিক' কথাটি ব্যবহার করেছেন। গোরাচাঁদপীরের জন্ম, মৃত্যু নিয়ে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন নি। যাঁরা তাঁকে আরবের অধিবাসী বলতে চেয়েছেন তাঁরা তার সঠিক প্রমাণ কোথাও দেননি। বাইশজন আউলিয়া নিম্নবঙ্গে এসেছিলেন এটা ঐতিহাসিক সত্য বলে জানা যায়, কিন্তু সেই তালিকায় গোরাচাঁদপীরের নাম দেখা যায় না। গোরাচাঁদ নামের উপর আব্বাস আলি নামটি আরোপ করা হয়েছে বলে মনে হয়। তাই যদি হয় তাহলে গোরাচাঁদপীর কি আরব থেকে আগত ইসলাম ধর্মপ্রচারক বাইশ আউলিয়ার মধ্যে কেউ নন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আরও কয়েকটি প্রশ্ন বিচার্য। যেমন—প্রথমত গোরাচাঁদপীর তাহলেবি ধর্মান্তরিত কোন মুসলমানের পুত্র অথবা তিনি নিজে ধর্মান্তরিত? দ্বিতীয়ত তিনি কি কোন ধর্মনিরপেক্ষ পূজনীয় উদার হিন্দু, যিনি নদীয়ার আউলচাঁদ প্রবর্তিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বাইশ ফকির বা আউলের একজন? এঁরাইকি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত রায়কোলাতে অবস্থান করেছিলেন? এ ব্যাপারে বাংলার ইতিহাস নীরব। সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রাথমিক ভাবে প্রচলিত কাহিনী, লোককথা বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করতে হবে।

প্রথমত গোরাচাঁদপীর হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছেন এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। কারণ তিনি গোরাচাঁদ নামে পরিচিত। এরূপ নাম কেবল হিন্দুদেরই হয়ে থাকে। সুতরাং শিশু গোরাচাঁদ পরিণত বয়সে মুসলিম আউলিয়াদের সংস্পর্শে এসে পীরগোরাচাঁদ হয়েছেন এবং নাম পরিবর্তন করে পীর হজরত শাহ সৈয়দ আব্বাস আলি মক্কি নাম ধারণ করেছেন। এরূপ অনুমানের আরও কিছু কারণ আছে। গোরাচাঁদ যে সময়ের মানুষ সেই সময় ভৌগোলিক

পরিবর্তনশীল এই বদ্বীপ অঞ্চলে চলছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসন। বিশেষত বর্ণহিন্দুরা তাদের শোষণের সর্বগ্রাসী যন্ত্র বসিয়ে রেখেছিল দিকে দিকে। তাদের অত্যাচারে নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। রাজা চন্দ্রকেতু, আকানন্দ, বাকানন্দ এরা ছিল বর্ণহিন্দু ও তৎকালীন সামন্তরাজা। অত্যাচার ও শোষণ তাদের নিত্য বিলাস। লোককথায় তারা রাক্ষস বলে পরিচিত। তারা মানুষ ধরে খায় এমন কথাও বলা হয়েছে। এই সময় দিল্লীতে ছিল মুসলমান শাসন। ভারতবর্ষের দিকে দিকে শুরু হয়েছিল মুসলিম ধর্ম বিজয়। মুসলমান ফকির আউলিয়াগণ মুসলমান ধর্মপ্রচারের জন্য রাজানুকূল্য নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সম্ভবত সেই সুযোগ নিয়ে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রাজশক্তির সহযোগিতা নিয়ে গোরাচাঁদ মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে সামন্ত প্রভুদের হাতে নির্যাতিত সাধারণ মানুষদের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার সংকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি চন্দ্রকেতু, আকানন্দ, বাকানন্দ প্রমুখ সামন্ত রাজাদের সাথে লড়াই করে শহীদও হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত গোরাচাঁদপীরকে নিয়ে খোদা নেওয়াজ যে-কেচ্ছা লিখেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন গোরাচাঁদ মৃত্যুকালে কানু ও কিনু ঘোষের গাই কবিলার দুধ খেয়ে কয়েকদিন গলাকাটা অবস্থায় বেঁচেছিলেন। কানু ও কিনু ঘোষের পরিবারের লোকেরা দুধ দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাদের জানিয়েছিলেন ইসলাম মতে কবর দিতে। গোরাচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঘোষেরা তাঁকে উত্তরদিকে শিয়র করে দাফন ও কাফন এনে গোর দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যদি প্রকৃত মুসলিম সন্তান হতেন তাহলে ইসলাম মতে কবর দেবার বা না দেবার কোন প্রশ্নই উঠত না। তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান বলেই এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক ছিল। আবার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—কানাই (কানু) ও কিনু ঘোষ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বাইশ ফকির বা আউলের অন্যতম ফকির বা আউলে। গোরাচাঁদ অন্তিমকালে সতীর্থদের সেবা নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তিনি ঘোষেদের গাই কবিলার দুধ খেয়ে শেষ কয়দিন বেঁচেছিলেন এই লোককথা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আউলেচাঁদের ২২জন শিষ্য সম্পর্কে এক অপূর্ব লোককথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, যেমন—"আউলেচাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার।"[৫] অতএব গোরাচাঁদপীর সুফী সাধকদের মধ্যে অন্যতম এরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত পীরগোরাচাঁদ চন্দ্রকেতু নামে রাজাকে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় আরও দক্ষিণ মুলুকে দক্ষিণরায়ের নিকট আসেন। দক্ষিণরায় তাঁকে নির্দ্বিধায় আকানন্দ ও বাকানন্দের মারার পরামর্শ দেন। সামন্ত রাজার প্রতি সামন্ত রাজার দ্বেষ থাকতে পারে কিন্তু দক্ষিণরায় হিন্দু, প্রবল প্রতিপত্তিশালী আকা-বাকার বিরুদ্ধে মুসলমান গোরাচাঁদকে আক্রমণে প্ররোচিত করবেন এটা কষ্ট-কল্পিত। কারণ দক্ষিণরায় ছিলেন ঘোর মুসলিমবিরোধী। প্রচলিত লোককথায় উল্লেখ আছে তিনি বনবিবি, শাজঙ্গুলী ও বড়খাঁ গাজীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং কোন মুসলিমকে তিনি হিন্দুর প্রতি প্ররোচিত করবেন বা সহযোগিতা করবেন এটা ভাবা যেমন কঠিন, তেমনি ভাবা যায় না মুসলমান গোরাচাঁদও দক্ষিণরায়ের নিকট সাহায্য চাইতে গিয়েছেন।

চতুর্থত গোরাচাঁদের মৃত্যুর দুদিন আগে রামলোচন ঘোষ, তাঁর স্ত্রী কালীতারা ঘোষ ও পুত্র কেদারনাথ ঘোষ তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। দীক্ষা নিয়ে তাঁরা কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন না মুসলিম হলেন তা জানা যায় না। তিনি উল্লেখযোগ্য কোন হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছেন বলে কোন কেচ্ছাকাহিনীতে নেই। কেবল চন্দ্রকেতু রাজাকে মুসলমান হতে বলেছিলেন এই মাত্র উল্লেখ আছে। আকানন্দ ও বাকানন্দকে তিনি মেরেছিলেন, তারা মুসলমান হতে চায়নি বলে নয়, তারা অত্যাচারী রাজা ছিল বলে। মানুষ ধরে বিশেষত মুসলমান ধরে তারা দেবতার কাছে বলি দিত। তারা নিত্য নরমাংস খেত বলেও লোককথায় উল্লেখ আছে। এই অপরাধে পীরসাহেব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিলেন। অতএব এই যুক্তিতে অন্ততপক্ষে তাঁকে বহিরাগত মুসলমান বলা চলে না।

পঞ্চমত আউলে গোরাচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের ন্যায় হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট সমান পূজনীয় ছিলেন। হাড়োয়ার গোরাচাঁদপীরের দরগার ভার আগে দীর্ঘকাল কালু ঘোষ পরিবারের হাতে ছিল, পরে তা মুসলমানদের হাতে যায়। বর্তমানে জনগণের উপর দরগার সেবার ভার ন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এই ঘটনা থেকে অগ্রমান করা যায় গোরাচাঁদ নামে কোন এক ব্যক্তিত্ব পূজনীয় হিন্দু ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে গিয়ে আকানন্দ-বাকানন্দের হাতে জখম হয়েছিলেন। সেই কারণে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তিনি সমান শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি মুসলমানের নিকট আদরের গোরাইগাজী আর হিন্দুর নিকট গোরাচাঁদ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যেভাবে গোরাচাঁদপীরকে স্মৃতিতে জড়িয়ে রেখেছেন তাতে বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। ছুৎমার্গী হিন্দু ও রক্ষণশীল মুসলমানের এই মিলনতীর্থ হাড়োয়া ও তার নায়ক পীরগোরাচাঁদ লোকসংস্কৃতি-গবেষকদিগের নিকট যথেষ্ট বিস্ময়কর লৌকিক দেবতা। প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন হাড়োয়ায় গোরাচাঁদপীরের বিশাল মেলা বসে। সপ্তাহকালব্যাপী এই মেলা চলে। পূর্বে মাসাধিককাল চলত। এই শতাব্দীর (বিংশ) চল্লিশের দশকে তা বন্ধ হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাতকার নিয়ে জানা যায় যে, পূর্বের মত এই মেলায় তেমন জলুস নেই। তবুও বিভিন্ন বাদ্য বাজিয়ে তবারুক সাজিয়ে গোরাচাঁদের নামে নানা ধ্বনি দিয়ে বহু ছোন্দল মিছিল আসে। বহু নরনারী অদ্ভুত ঔৎসুক্যে তা প্রত্যক্ষ করেন। মিছিলকারীদের মাঝের আইট মোড়ে সুস্বাদু পানীন ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। পরদিবস অর্থাৎ ১৩ই ফাল্গুন বেউড় বাঁশতলায় বহুলোকের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। পূর্বে এখানে মাংসভাত খাওয়ান হত। যাত্রীরা পীরের মাজারে ধূপবাতি জ্বেলে মনস্কামনা জানিয়ে নমস্কার করে যান। পীরের নামে এখানে জলপড়া, তেলপড়া ইত্যাদি দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাসে হাড়োয়ার পীরগোরাচাঁদ খুব জাগ্রত।

পীরগোরাচাঁদকে নিয়ে অনেক কবি পালাগান রচনা করেছেন। তার মধ্যে মুনশী মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ সাহেব প্রণীত 'গোরাচাঁদ পীরের কেচ্ছা' নামে বহু পুরাতন একটি

মুদ্রিত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। এই পুঁথির অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী, কাহিনী সংক্ষেপ অংশে লিপিবদ্ধ হল। গোরাচাঁদপীরের মাহাত্ম্য কাওয়ালী রীতিতে গান করেন উত্তর চব্বিশ পরগণার বকজুড়ি গ্রামের বিখ্যাত কাওয়াল রফিকুল ইসলাম ও শহীদুল ইসলাম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুসুম্বা গ্রামের আবদুল জব্বার গায়েন ও পাটকেলপোতার আবদুল ফকির কাওয়াল প্রমুখ শিল্পীগণ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোন কোন গায়ক গীতিনাট্যের ধারায় পালাগান হিসাবে এই পালা আসরে উপস্থাপন করেন। ক্ষেত্র গবেষণায় জানা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অপেক্ষা উত্তর চব্বিশ পরগণাতে মুসলমানী পালার প্রচলন অধিক।

উত্তর চব্বিশ পরগণার পীর মাহাত্ম্য-কীর্তনকারীগণ আসরে পীরের মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে পীর সম্পর্কিত প্রার্থনামূলক একটি গান করেন। এই গান তাঁদেরই বাঁধান অথবা অন্য কোন গায়কের সৃষ্ট। এই গানকে তাঁরা পীরের 'সালামী গান' বলেন। গানগুলি তাঁরা কাওয়ালী রীতিতেই করেন। পাটকেলপোতার আবদুল ফকির (কাওয়াল)-এর গাওয়া গোরাচাঁদপীরের এইরূপ একটি সালামী গান নিম্নে উদ্ধৃত হল—

লহোগো আমার ছালাম পীরগোরাচাঁদ।
পীরগোরাচাঁদ আমার মুরশিদ গোরাচাঁদ।।
তোমাকে ছালাম দিবে হিন্দু মুসলমান।
তোমাকে না ছালাম দিলে কাঁদে আমার প্রাণ।।
দিল্লী থেকে বারগোপপুরে করলে বাসস্থান।
কাঁটা ছেড়ে দুগ্ধ দিতে হয় না পেরেসান।
১২ই ফাল্গুন উদয় হল পূর্ণিমারই চাঁদ।।

সালামীগান ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা আরও বড় করে অর্থাৎ অনেক বেশি কথা যোগ করে গান করেন। প্রতিটি পীর বা গাজীর মাহাত্ম্য কীর্তনের পূর্বে তাঁরা এরূপ সালামী গান করেন।

পীরগোরাচাঁদের পালা

হজরত গোরাচাঁদের বাড়ি ছিল দিল্লীর শহরে। মায়ের নিকট হতে বিদায় হয়ে তিনি অমায়া জঙ্গলে বসে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আল্লার স্মরণ করেন। আল্লা খুশি হয়ে কালান্ত নগরে তাঁর জায়গীর দিয়ে পাঠালেন। তিনি প্রথমে চন্দ্রকেতু রাজার নিকট এসে অনেক কেরামত দেখান। লোহার কলা রান্না করেন, বেড়ায় চাঁপা ফুল ফোটান। তবুও রাজা তাঁকে অবহেলা করেন। হামা-দামা নামে দুই বীরকে গোরাইগাজীর সাথে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠালে তাঁরা গোরাইগাজীর কাছে পরাস্ত হয়ে মারা যান। গোরাই তখন চন্দ্রকেতুকে মুসলমান হতে বলেন। তাতে চন্দ্রকেতু রাজী না হওয়ায় তিনি বদ-দোওয়া দেন—

মেরা বাত নাহি রাখ দেমাগ করিয়া থাক
সব তেরা যাবে দাহ পড়ি।

এই কথা বলে গোরাই সেখান হতে বিদায় হয়ে দক্ষিণরায়ের নিকট আসেন। দক্ষিণরায়কে নিজের পরিচয় দিয়ে সেখানে বহু যত্নখাতির পান।

তবে রায় খোসাল দেলে গোরায়ের সাথ মেলে
খাড় জুড়ে করে দিল ভাগ।
ভক্তি আর করে যত সেসব কহিব কত
দেখে গোরাই খুশি বাগে বাগ।

দক্ষিণরায়ের নিকট এসে গোরাচাঁদ জানতে চান, এখানে আর কোন রাজা আছেন কিনা। দক্ষিণরায় জানান হাতিয়াগড় পরগণাতে আকানন্দ ও বাকানন্দ নামে দুই ভাই আছে। তারা শিবের বরে দুর্ধর্ষ বীর। তাদের পিতার নাম মহাদানব। তারা প্রত্যহ একটি করে মনুষ্য ধরে আহার করে।

এই সংবাদ শুনে গোরাইগাজী ছোন্দলকে ডেকে নিয়ে হাতিয়াগড়ে গেলেন। সেখানে তারা এক মোমিনের ঘরে গিয়ে উঠলেন। মোমিনের পূর্বপুরুষ আগে বিহারেতে ছিল। পরে তারা এই রাক্ষসের পুরীতে এসে বাসা করেন। ছোন্দল যেদিন মোমিনের বাড়ি এসে উপস্থিত হয় সেইদিন রাজার কোতোয়াল এসে মোমেনকে একটি আদেশনামা দেন। আদেশনামায় ছিল সেইদিন রাজার মন্দিরে তাদের পরিবারের একজনকে যেতে হবে। ছোন্দল এই কথা জানতে পেরে বলেন—

রমজান বলে মোমিন ভাই আর তুমি ভেব নাই।
এসেছে পীর গোরাই, হুকুমে আল্লার।

এই কথা শুনে মোমিন ভাই দেলে খুশি হয়ে ছোন্দল ও গোরাইয়ের খাসী মেরে রান্না করে খেতে দেন। খানা সেরে গোরাচাঁদ ও ছোন্দল অশ্বে আরোহণ করে রাজার মন্দিরে গিয়ে বসে থাকেন।

এদিকে রাত দ্বিপ্রহরে আকানন্দ মন্দিরে যেতে উদ্যোগী হলে বাকানন্দ এসে আকানন্দকে যেতে নিষেধ করেন। কারণ তিনি রাতে কুস্বপ্ন দেখেছেন যে, মহাযুদ্ধ ও প্রলয় শুরু হওয়ায় সমস্ত রাক্ষস সৈন্য সব মারা গেছে। বাকানন্দ সেকথায় কর্ণপাত না করে দেউল পানে সসৈন্যে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা গোরাইপীরের দেখা পেয়ে পরিচয় জানতে চান। তখন গোরাই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন—

গোরাই কহেন মেরা দিল্লীতে মোকাম।
কুফরি তুড়িয়া ফিরি এই মেরা কাম।।
পয়দা ছৈয়দ কুলে গোরাই নাম ধরি।
তুড়িয়া কুফর যত মুসলমান করি।।
আকানন্দ বাকানন্দ হাতীগড় বাসি।
মারিতে তাদের তরে এত দূর আসি।।

এই কথা বলাতে বাকানন্দ অতিশয় রুষ্ট হয়ে সেনাপতিকে পাঠান। সেনাপতিসহ হাজার হাজার কাফের সৈন্য গোরাইয়ের হাতে প্রাণ হারালে বাকানন্দ নিজেই যুদ্ধে আসেন। বাকানন্দও গোরাইয়ের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন হাতিয়াগড় জয় হল ভেবে ছোন্দলকে নিয়ে

গোরাচাঁদ ফিরছেন এমন সময় আকানন্দ মহাদেবের নিকট হতে চক্রবাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। গোরাইকে ডেকে পুনরায় যুদ্ধের আহ্বান করাতে ক্লান্ত গোরাই আবার ফিরে এলেন। তার ঘোড়াও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেই সময় আকানন্দ চক্রবাণ ছাড়লে তাতে গোরাইগাজীর গর্দান অর্ধেক কেটে যায়। তিনি ভূপতিত হয়ে পড়েন। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার ঘোড়া নিয়ে কাফের নিধনে ব্রতী হন। হাজার হাজার কাফের নিধন করার পর তিনি আকানন্দের সন্ধান পান। আকানন্দ গোরাইয়ের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয়ে পালাচ্ছিলেন। তখন গোরাইগাজী তাঁকে ধরে ফেলে বিষম তলোয়ারের আঘাতে দোজখে পাঠান। তারপর তিনি তাঁর সাথী ছোন্দলকে নিয়ে বারগোপপুরে এসে উপনীত হলেন।

বারগোপপুরে গোরাইগাজী যখন আসেন, তখন বারো দিন কেটে গেছে। অর্ধেক কাটা গলা নিয়ে গোরাই ছোন্দলকে পান আনতে বললে ছোন্দল তা আনতে ব্যর্থ হন। পোড়া ইটের গুঁড়ো (সুরকি) আনতে বললে তাও আনতে ব্যর্থ হন। তখন গোরাইগাজী মৃত্যু সুনিশ্চিত ভাবেন। তখন তিনি ছোন্দলকে ডেকে বলেন—

গোরাই কহেন ছোন্দল তুমি যাও ঘরে।
বালেগুার মাটি কবুল হইল আমারে।।
কোথায় যাইব ছাহেব ছাড়িয়া তোমায়।
তোমা হেন নিধি আর পাইব কোথায়।।
গোরাই কহেন ছোন্দল তুমি শুন মন দিয়া।
আল্লার তরফে মওত পৌঁছিল আসিয়া।।
দুনিয়া ছাড়িয়া আমি হই রওয়ানা।
আজ হৈতে তোমার খেদমত হইল মানা।।

এই কথা বলে গোরাই ছোন্দলকে বিদায় দিয়ে নিজে জঙ্গলের মধ্যে বসে নিরঞ্জন-ভাবনায় রত থাকেন। সেইসময় কিনু ও কানু গোয়ালার ধেনু ঐ জঙ্গলে চরতে যায়। গোরাইপীর নিজের পরিচয় দিয়ে পালের প্রধান কবিলা গাইকে দুধ দিতে বলেন। কবিলাগাই পীরের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আঝোরে দুধ দেয়। রাতে গোয়ালে কিনু দুধ দুইতে গেলে কবিলা পূর্বের মত দুধ দিতে না পারায় নির্যাতিত হয়। দুধ না-দেবার রহস্য কিনু ও কানু জানতে পেরে কবিলা গাইকে আরও নির্যাতন করলে গোরাই তাদের বদ-দোয়া দেন।

কবিলা মারিলি সত্য নাহি জান ঠিকানা।
বাদশার হুজুরে তোরা হবি বন্দখানা।।

এই বদ-দোয়ার কথা শুনে যত গোপ ছিল তারা ভয় পেয়ে গেল। পীরগোরাচাঁদের মাহাত্ম্য তারা বুঝতে পেরে তাঁর কৃপা পাবার জন্য সবাই আকুল হয়ে ওঠে। গোরাইগাজী মৃত্যু শিয়রে ভেবে তাদের অভয় দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়তে বলেন। গর্ত খোঁড়া শেষ হলে গোরাই-পীর উত্তর দিকে শিয়র করে সমাধিস্থ হন। তখন গোপেরা তাকে মাটি চাপা দেয়। এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নফর বলে ঘোষের পোরা ডাকাত হইয়াছিস তোরা
মানুষ মেরে গোর দেও বনে।
বাদশা শুনিলে কালি জনে জনে দিবে শূলি
বিপদ ঘটিবে জনে জনে।।

হাজরা এই কথা দিল্লির বাদশা আলাউদ্দীনের কাছে গিয়ে জানায়। আলাউদ্দীন তোড়লমলকে গোয়ালাদের বেঁধে আনতে আদেশ দিলেন। সেইমত তোড়লমল গোয়ালাদের নিয়ে গিয়ে বাদশার আদেশে কারারুদ্ধ করে রাখেন। এদিকে গোয়ালাদের স্ত্রীসকল গোরাইপীরের কবরের উপর কান্নাকাটি করাতে গোরাই কবরের মধ্যে থেকে আওয়াজ দিয়ে তাদের অভয় দিলেন এবং নিজেই দিল্লিতে এসে স্বপনে আলাউদ্দীনকে আদেশ দিলেন, গোয়ালাদের ছেড়ে দিতে। আদেশ পেয়ে পরদিন বাদশা গোয়ালাদের নাছাড়ার ফলে তাঁর পাত্রমিত্রদেব দেখতে পেলেন না। শুধু দেখলেন যত হিংস্র ব্যাঘ্র তাঁর রাজসভায়। তখন তিনি ভয় পেয়ে গোয়ালাদের ছেড়ে দেন।

গোয়ালারা বাড়ি এলে পর বারগোপপুরে অতিশয় বাঘের ভয় দেখা দেয়। দেশ ছেড়ে লোক পালাতে শুরু করে। তখন গোরাইগাজী অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে বাদশার কাছে গেলেন এবং পেয়ারকে বালাণ্ডায় জায়গীর দিয়ে পাঠাতে বললেন। বাদশা সেইমত সবরকম সাহায্য দিয়ে পেয়ারকে বালাণ্ডায় পাঠালেন। বালাণ্ডায় এসে পেয়ার সমস্ত অধিবাসীকে আশ্বস্ত করলেন ও তিন সাল খাজনা মুকুব করে দিলেন।

পীরের স্বপ্নাদেশে পেয়ার একটা বিশাল দীঘি কাটাতে শুরু করলেন। এই দীঘি কাটাতে গিয়ে রাম হাজরার সাথে তাঁর বিবাদ শুরু হয়। রাম হাজরাকে তিনি বন্দী করে রাখেন। সেখান থেকে কোনমতে পালিয়ে গিয়ে রাম হাজরা দিল্লির বাদশার কাছে উপস্থিত হন। পেয়ারের নামে মিথ্যা করে যা-তা বলেন। বাদশা অত্যাচারী পেয়ারকে শাস্তি দেবার জন্য ডেকে পাঠান। পেয়ার দীঘির কাজ শেষ না করে যাবেন না বলেন। দূত গিয়ে বাদশাকে এই সংবাদ দিলে বাদশা আবার লোক পাঠান পেয়ারকে বেঁধে আনবার জন্য। পেয়ার এবারও তাদের ফেরৎ দেন। তখন বাদশা নিজেই পেয়ারের যথোচিত শাস্তি দেবার জন্য সসৈন্যে বালাণ্ডায় এসে উপস্থিত হন। এই কথা জানতে পেরে পেয়ার সপরিবারে নৌকায় করে ঐ দীঘির মাঝখানে ডুবে মরবার জন্য উপস্থিত হন এবং আলাউদ্দীনের অন্যায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে দীঘির জলে ডুবে মরেন।

পেয়ারের অনুপস্থিতিতে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেয় বালাণ্ডায়। চোর, ডাকুর উৎপাত বাড়ে। তখন গোরাচাঁদ মীরখাঁ নামে এক গরীবকে কৃপা করবেন বলে মনস্থ করেন। অনেক গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে মীরখাঁকে চৌধুরী বানিয়ে দেন। মীরের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি নিজেই রামেশ্বর থেকে পাথর এনে দিয়ে মসজিদ বানাতে বলেন। মীরখাঁ সেই পাথর দিয়ে মসজিদ বানালেন বটে কিন্তু পীরের নির্দেশ মত বারগোপপুরে মসজিদ না-করে সাজাপুরে করেন। এর ফলে পীর তাঁর বদ দোয়া দিলেন। মীরখাঁর সাথে হরি হাজরার কোন

এক বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটে। তখন হরি হাজরা মীরখাঁকে নিধন করবার জন্য খাঁর তাজুয়া নামে এক গোলামকে একশত টাকা দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়। তাজুয়া নারকেলের জলের সাথে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করে।

বদ রক্ত গোলামের জাত কোন কাম করে।
সন্ধিয়া জহর সেই নারকেলেতে পুরে।।
আসিয়া সবকর হোথা ডালিলেক তাতে।
তাজিম করিয়া দিল মীরখাঁর হাতে।।

** ** **

ছটফট করে মীর পালঙ্গে শুইয়া।
মীরেরে ছাড়িয়া গোলাম যায় পলাইয়া।।

মীরখাঁকে মেরে তাজুয়া হরি হাজরার কাছে গেলে তাকে নেমকহারাম বলে গালি দিয়ে মারধোর করে দূর করে দেয়। এরপর পীরগোরাচাঁদ তাঁর সমাধিস্থলে জিয়ারতাদি করার জন্য পরান নামে একজনকে নিযুক্ত করলেন। তিনি তাঁকে দোয়া করে বার্গোবপুরে পাঠালেন।

বার্গোবপুরে যাইয়া করিবে জিয়ারত।।
ভুলিয়া না যাইবে তুমি যাইবে আলবত। *
জাহের করিবে আর এই সব বাত।।
মুছল্লি নামাজি আসি করে জেয়ারত। *
শরিয়ত জারি আর করিবে যাইয়া।।
রোজা ও নামাজ করে মোকেদ হইয়া। *
এতেক কহিয়া পীর গায়েব হইল।।
নিদ্রাছাড়ি পরাণ তখন জাগিয়া উঠিল। *

এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে পরান বালাণ্ডায় এসে উপস্থিত হল। মুল্লুকে মুল্লুকে পীরের আদেশ ও মাহাত্ম্য প্রচার হল। সেই থেকে এখনো পীরের গোরস্থানে যত মুসলমান এসে জিয়ারত করে।

কহে হীন খোদা নেওয়াজ অধীনে লাচার
বর্ধমান জিলার বিচে বসত যাহার।

(সমাপ্ত)

পালাগান-সাহিত্যে যেসমস্ত লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের কোন না কোন মঙ্গল করেন। গাজীপালায় দেখা গেছে মোবারকগাজী জটিল মামলা মোকদ্দমা থেকে রাজা মদনরায় চৌধুরীকে রক্ষা করেছেন, এরেনশা বাদশা পালায় বড়পীর সাহেব বজ্রাঘাতের হাত থেকে সুরজামালকে রক্ষা করেছেন, বনবিবি পালায় বিবিমা বাঘের মুখ থেকে দুখেকে বাঁচিয়েছেন, ওলাবিবি পালায় ওলাবিবি ওলাওঠা নামক কঠিন রোগ ও অন্যান্য রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করেছেন, মানিকপীরের পালায় মানিকপীর

বন্ধ্যা গাভীর দুগ্ধ এনে দিয়ে পূজা পেয়েছেন, একুশবিবি (সুলতান ছবি-আওরজ বিবি) পালায় বিবি কঠিন ব্যাধি নিরাময় করেছেন, হারান সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়েছেন ও সন্তানহীনার সন্তানবতী করেছেন; গোরাচাঁদপীরের পালায় তেমন গোরাচাঁদপীর রাজরোষ বা রাক্ষসের হাত থেকে আর্ত মানুষকে রক্ষা করেছেন। এছাড়া সমাজ কল্যাণমূলক কাজও তিনি করেছেন, যেমন বিশাল এক দীঘি কাটাবার ব্যবস্থা করে তিনি মানুষের জলকষ্ট দূর করেছেন। পীর মোবারক গাজীও অনুরূপ একটি দীঘি কাটিয়ে মানুষের তথা সমাজের উপকার সাধন করেছেন। সুতরাং পীর, গাজী, বিবি, দেব, দেবী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীগণ আর্ত মানুষের কাছে মঙ্গলদূত স্বরূপ। কোন না কোনভাবে তাঁরা মানুষের উপকার সাধন করে পূজিত হয়েছেন।

১। এম.এ.জব্বার, বালান্দা চন্দ্রকেতু ইতিহাস, ১৩৯০, 'গোরাইগাজী' পৃঃ ১০-১১।

২। কমল চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, ১৯৮৭, পৃঃ ৯৬।

৩। পীরগোরাচাঁদের নব মূল্যায়ন, আহসান আহমেদ ও রতন লাহিড়ী, পৃঃ ১৪।

৪। বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পরিপার্শ্ব পার্ষদ পীর গোরাচাঁদ ১৯৮৯, পৃঃ ১০৮।

৫। অক্ষয়কুমার দত্ত, কর্তাভজা প্রবন্ধ, বাংলার লোকসংস্কৃতি পৃ, ১৭৩, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার।

- ডঃ রতন কুমার নন্দী, কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য ১৯৮৪।
- অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।
- গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, পীর গোরাচাঁদ, ১৯৭৮ পৃঃ ১২১।
- এম.এ.জব্বার, বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাইগাজী।
- এম.এ.জব্বার, অতীতের হাড়োয়া।
- ড: গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা-পীর সাহিত্যের কথা।
- মুনশী মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ সাহেব, গোরাচাঁদপীরের কেচ্ছা।

পীর ও গাজীপালা ঃ মোবারকগাজী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের মধ্যে মোবারকগাজীর পালা অন্যতম। পালাগান আলোচনায় মোবারকগাজীর পালা পীর ও গাজীপালার অন্তর্গত। এই অঞ্চলে তিনি গাজীবাবা নামে পরিচিত। চব্বিশ পরগণার বহুস্থানে গাজীবাবার দরগা আছে, কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঘুটিয়ারী শরীফের মোকামটি তাঁর আসল দরগা বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। মোবারকগাজী সম্পর্কিত লৌকিক ছড়ায় বলা হয়—

মোবারক বলেন দুঃখী শুন ফরমান।
ঘুটিয়ারীতে সরোবর করিব নির্মাণ।।
এখনি যাইব আমি মক্কার শহরে।
পানি আনিব আমি হয় ওজ কত্ত পুরে (?)।।
সেই পানি এনে আমি পুখুরে রাখিব।
মক্কা বলিয়া আমি প্রচার করিব।।
আসিয়া পুকুরে সবে করিবে গোছল।
মনের বাসনা তাদের হইবে সফল।।[১]

ভারতবর্ষের বহু মুসলমানের নিকট ঘুটিয়ারী শরীফ একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসাবে মান্য হয়। হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে ঘুটিয়ারী শরীফের দরগায় আসেন, হাজত দেন ও গাজীবাবার পুকুরে শিরনি ভাসান। ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী ও ১৭ই শ্রাবণ বুজুর্গীতে এখানে বড় উৎসব ও মেলা হয়। স্থানীয়ভাবে ৭ই আষাঢ় মোবারক গাজীর দেহরক্ষা দিবস ও ১৭ই শ্রাবণ (বুজুর্গী) তাঁর শ্রাদ্ধাদিকর্ম দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৭ই শ্রাবণের অনুষ্ঠানটিকে 'গাজীবাবার উরস' বলা হয়েও থাকে। গাজীবাবার এই মেলা দুটি হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্র।

মোবারকগাজীকে ঐতিহাসিক পীর বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর জন্ম এই চব্বিশ

পরগণা জেলাতেই বলে কথিত হয়। ঘুটিয়ারী শরীফের দেওয়ানগণ নিজেদের মোবারক গাজীর বংশধর বলে দাবী করেন। তাঁদের প্রদত্ত মোবারকগাজীর একটি কুর্শীনামা লোক-সংস্কৃতির গবেষক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন।[২] এই কুর্শীনামায় মোবারকগাজীকে চন্দন শাহর পুত্র বলা হয়েছে। তাঁর দুই সন্তান মেহেরগাজী ও দুঃখীগাজী। দুঃখীগাজী ঘুটিয়ারী শরীফে পিতার সাথে থাকতেন। পীরমোবারকের সঙ্গে চব্বিশ পরগণার ঐতিহাসিক ব্যক্তি মদন রায়চৌধুরীর সম্পর্ক আছে, যা গাজীবাবার পালায় উল্লেখ আছে। মদন রায়চৌধুরীর সাথে সম্পর্ক আছে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁর। তাঁর শাসনকাল (১৬৬৪-৮৬)। দিল্লির সিংহাসনে তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তাঁর রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ)। বাংলার বার ভুঁইয়ার অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্য মদন রায়চৌধুরীর বন্ধু বলে পরিচিত। প্রতাপাদিত্যের সময়কাল ষোড়শ শতকের ছয় দশক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ১ম দশক পর্যন্ত। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু ১৬১০-১১ অব্দে। তিনি যশোহরের রাজা হয়েছিলেন ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে। মদন রায় ছিলেন প্রতাপাদিত্যের বন্ধু ও সেনাপতি। সুতরাং মদন রায়চৌধুরীর সাথে মোবারকগাজীর সম্পর্ক যদি ঐতিহাসিক ঘটনা হয় তাহলে মোবারকগাজী সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন একসময়ে মাহাত্ম্যপ্রচার করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।[৩]

মোবারকগাজীর পরিচয় প্রসঙ্গে কিছু লোককথা ক্ষেত্রগবেষণাকালে সংগৃহীত হয়েছে। ঈশ-আলি-শা জিলানী ফকিরের শিষ্য মিনি সাজালালী ফকির ও সেখলাল মিঞা (সাদা ফকির) ৩-১১-১৯৯৩-এ এক সাক্ষাতকারে জানান মোবারকগাজীরা আট ভাই। তাঁরা সেকেন্দার শার পুত্র। মোবারকগাজী —ঘুটিয়ারী শরীফ, মুকশুধগাজী—টালিগঞ্জ, কামালগাজী—গড়িয়া, রক্তানগাজী—পুঁড়ির আবাদ, বর্তনগাজী—বারুইপুর কাছারী বাজার বা শখের বাজার, দেওয়ানগাজী—সীতাকুণ্ডু, কালুগাজী (স্থানীয় ভাবে এঁকে বদরপীর বলে) —পিয়ালী পুলের নিচে, সৈয়দ শালার গাজী (শলার)—ইউ.পি.-তে আস্তানা গেড়ে মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন।[৪]

এই নামের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। কেউ বলেন মোবারকগাজীরা সাতভাই, দুই বোন। যথা—কালুগাজী—হিজলী, মোবারকগাজী—ঘুটিয়ারী শরীফ, মুকশুধগাজী বা পাগলাপীর—টালিগঞ্জ, রক্তানগাজী—এড়াচি, কামালগাজী—গড়িয়া, বরখানগাজী—পূর্ববঙ্গ, সালাউদ্দিনগাজী (অজ্ঞাত) ও দুই বোন—শাজঙ্গুলী ও বনবিবি।[৫] ক্ষেত্রগবেষণায় এই বক্তব্য সঠিক নয় বলে জানা যায়। প্রচলিত পালাগান, বোনবিবি জহুরানামা ও প্রচলিত লোককাহিনীতে শাজঙ্গুলীকে বনবিবির ভাই বলা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মোবারকগাজীর সঙ্গে শাজঙ্গুলী ও বনবিবির ভাই-বোনের সম্পর্ক দেখা যায় না।

অনেক প্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতির গবেষক মোবারকগাজীকে বড়খাঁগাজী বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে মোবারকগাজীকে 'পীরমোবারক বড়খাঁ গাজী' বলেছেন।[৬] বিনয় ঘোষ মোবারকগাজীকে 'ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক বড়খাঁগাজী' বলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "অনেক নামে বড়খাঁ

হিন্দু-মুসলমান উভয়-সম্প্রদায়ের জনসমাজে পরিচিত। গাজীবাবা, বড়খাঁ গাজী, গাজী সাহেব, মোবারক শাহ গাজী, বরখান গাজী ইত্যাদি।"[৭] প্রকৃতপক্ষে গিরীন্দ্রনাথ দাস ও বিনয় ঘোষের গ্রন্থে মোবারকগাজী, বড়খাঁগাজী ও গাজীকে নিয়ে এক বিভ্রান্তিকর আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয়। ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায়, মোবারকগাজী, বড়খাঁগাজী ও গাজী এই তিনজনই চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে পৃথক তিন লৌকিক দেবতারূপে মান্য হন। পীরমোবারকগাজীর বিখ্যাত দরগা বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঘুটিয়ারী শরীফে অবস্থিত। কথিত হয় এখানে মোবারকগাজীর মূল মাজার রক্ষিত আছে। মাজারটি লাল সবুজ কাপড় দিয়ে ঢাকা। বাইরে আছে মানিকপীর, বিবিমা-ওলাবিবি, বনবিবি, প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর থান। এগুলি সুসজ্জিত নয়। মূল মসজিদের অনতিদূরে আছে চারিদিকে বাঁধান একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুকুর, এটিই লোককথার পুকুর, যে পুকুরে মদন রায়চৌধুরী আড়াই কোদাল মাটি কেটে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এখানে দেউনী (দেবী) নামে এক শিলা আছে। কথিত আছে ইনি হিন্দুর দেবী। বিদ্যাধরী নদীতে ভেসে এসেছিলেন। মোবারকগাজীর আজ্ঞায় এখানে থেকে গেছেন। যাঁরা গাজীর নিকট মাংস রান্না করে হাজত দেন তাঁরা রান্নার সমস্ত মশলাপাতি এই দেউনীর উপর রেখে গুঁড়ো করে রান্না করেন। দেউনীর উপর গুঁড়ো করা মশলা ছাড়া গাজীর হাজতের রান্না হবে না, এটাই এখানকার প্রচলিত সংস্কার।

ঘুটিয়ারী শরীফের পীরমোবারকগাজীর দরগায় নিত্যপূজা-হাজত ছাড়া বছরে দুটি বড় মেলা হয়। একটি ৭ই আষাঢ় গাজীর তিরোধান উপলক্ষে বা অম্বুবাচীর মেলা, অপরটি ১৭ই শ্রাবণ বুজুর্গী বা (গাজী সাহেবের উরস) বলে পরিচিত। এখানকার অম্বুবাচীর মেলা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুবিশ্বাস জাত মেলা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের জমায়েত এই মেলায় দেখা গেলেও হিন্দুদের মধ্যে মেলাকেন্দ্রিক অনেক আচার-আচরণ দেখা যায়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, এই সময় ধরিত্রী ঋতুমতী হন। সে কারণে কোন হিন্দু অম্বুবাচীর প্রায় সপ্তাহ (সাড়ে চারদিন)-কালব্যাপী ভূমে লোহার কোন আঁচড় দেন না, গর্ত খোঁড়েন না, এমনকি অনেকে গরুর খোঁটাও ভূমে পোঁতেন না। বাড়ির যতীব্রতী (বিধবা) রমণী ও দ্বিজগণ এই কয়দিন পাক-অন্নাদি গ্রহণ করেন না, ফলাদি ভক্ষণ করে ব্রতপালন করেন। কেউ এইসময় ঘুটিয়ারীতে গিয়ে গাজীবাবার পুকুরে শিরনি ভাসান, মোনাজাত করেন ও হাজত দেন।

বলা বাহুল্য ৭ই আষাঢ় বঙ্গে আমন চাষ শুরুর সময়। এক্ষেত্রে মোবারকগাজীর এই মেলা ও ধরিত্রীদেবীর ঋতুমতী হওয়ার প্রসঙ্গ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত কৃষকদের নানা আচার-আচারণ পালনের তৎপরতা দেখে অম্বুবাচীকে ধরিত্রীপূজা (Fartility Cult) বলা যায়। অম্বুবাচী নিবৃত্তির দিন কামরূপ-কামাখ্যায় মহামেলা হয়। অম্বুবাচীর মধ্যে সর্প ভয় নিবারণের জন্য দুগ্ধপান আবশ্যক। পাঠ্যকর্ম, বীজবপন, সাবকাশ শুভকর্ম ও সপ্তাহব্যাপী বিশেষ যাত্রাদি নিষেধ থাকে। সুতরাং মোবারকগাজীর মেলা ও ধরিত্রীপূজার গভীর সাদৃশ্য মোবারকগাজীর ঐতিহাসিকতাকে ভিন্নরূপ প্রদান করে।

ঘুটিয়ারী শরীফের অম্বুবাচীর মেলা ও সেই সংক্রান্ত নানা সংস্কারের সাথে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের সাঁওতালদের অনুষ্ঠিত 'এরকিসীম' উৎসবের কথা স্মরণ করা যেতে পাবে। বাঙালী কৃষিজীবী হিন্দুদের অম্বুবাচী পালন আর সাঁওতালদের এরকিসীম উৎসব উভয়ই আষাঢ়ে নববর্ষা সমাগমে বছরের প্রথম কৃষি উৎসব হিসাবে উৎযাপিত হয়। মোবারকগাজীর সঙ্গে হিন্দুর অম্বুবাচী এবং আদিবাসীদের এরকিসীম উৎসব পালনের কালগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। লোক প্রচলিত কাহিনী বা পালাগানে এই সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

প্রকৃতিগত তাৎপর্যে মোবারকগাজী, বড়খাঁগাজী ও গাজী সাহেবকে ভিন্ন বলা যায়। কারণ এই তিনজনের চরিত্র বৈশিষ্ট্যই পৃথক। মোবারকগাজী সম্পর্কিত যে-সমস্ত পালাগান, লোককথা ইত্যাদি প্রচলিত আছে তাতে তাঁকে কোথাও যুদ্ধপ্রিয়, গোঁড়া মুসলমান বা পরধর্ম অসহিষ্ণুরূপে দেখান হয়নি। কাহিনী অংশে তিনি কোথাও উগ্র মুসলিম মানসিকতা নিয়ে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে নামেন নি। বিপদ গ্রস্ত মদন রায়চৌধুরীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাঁকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য করেন নি বরং মদন রায় ও তাঁর মাতা স্বেচ্ছায় মুসলিম আচার-আচরণ মেনে মোবারকগাজীর হাজতাদি দিয়েছেন। এখানেই যুদ্ধপ্রিয় মুসলিম ধর্মপ্রচারক বড়খাঁগাজীর সাথে মোবারকগাজীর মূলগত পার্থক্য।

"গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি" কাহিনীতে গাজীর স্বভাব চরিত্রের সাথে মোবারকগাজীর চরিত্রের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ কাব্যে গাজী একজন প্রেমিক মজনুর মতই। চাম্পাকে পাবার জন্য তাঁর আকুল প্রচেষ্টা দেখা গেছে। অপরদিকে মোবারকগাজী ছিলেন সংসারবিমুখ। আল্লার করুণালাভের জন্য আকুল প্রচেষ্টায় রত। তাঁর সংসার বৈরাগ্যভাব দেখে তাঁর মাতা তাঁকে তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তাতেও তাঁর সংসারমুখী মন গড়ে ওঠেনি। দুঃখী ও মেহেরগাজীর জন্মের পর সবার অলক্ষ্যে গৌতমবুদ্ধের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। মন্দিরায় তাঁকে বকেয়া খাজনার দায়ে বন্দী করেও ধরে রাখতে পারেন নি। পরবর্তীকালে মন্দিরায়কে এই অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও করুণা করেন নি, কিন্তু মন্দিরায়কে তিনি নিজের হাতের মুঠোয় পেয়েও মুসলিম হতে বলেন নি। কাহিনী অংশে মোবারক গাজীকে অপোড়া বা অপরা পৃথিবীর সন্ধানে ঘুরতে দেখা যায়। এই অপরা পৃথিবীর সন্ধান তিনি খোদাতালার কাছে নিতে পারতেন বা নিজে সিদ্ধপুরুষ, সাধনার দ্বারা অভীষ্ট স্থান বুঝতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে অপরা পৃথিবীর সন্ধান নিতে মক্কায় মহাদেবের নিকট গিয়েছেন। মহাদেবের নির্দেশে তিনি নারানপুরে নারায়ণীর নিকট গিয়েছেন। নারায়ণীকে তিনি মা বলে সম্বোধন করে অপরা পৃথিবীর সন্ধান জানতে চেয়েছেন। তারাহেদে নামক স্থানে এসে তিনি রামচন্দ্র ও তাঁর মাতাকে করুণা করেছেন। এমনকি দেবীনারায়ণী গাজীর পক্ষ অবলম্বন করে স্বপ্নে রামচন্দ্রের মাতাকে তাঁর হারানো পুত্রবধূর প্রাপ্তির জন্য মোবারকগাজীর নিকট ক্ষমা চাইতে বলেছেন এবং মাতা ক্ষমা চাওয়ার পর হারানো পুত্রবধূ ঘরে ফিরে এসেছে।

মোবারকগাজীর হাসা ও চিতা নামে দুইটি বাঘ দেহরক্ষী হিসাবে ছিল। বাঘ দুটিও গাজীর ন্যায় শান্ত স্বভাবের। বাঘকে দিয়ে তিনি কখনো কোন হিংসাত্মক কাজ করান নি। পরোক্ষভাবে ভীতি প্রদর্শন করে নিজের কাজ উদ্ধার করেছেন। সুতরাং মুকুটরায়ের সাথে যুদ্ধকারী গাজী ও দক্ষিণরায়ের সাথে যুদ্ধকারী বড়খাঁগাজীর প্রকৃতি মোবারকগাজীর প্রকৃতির মত নয়। মোবারকগাজী মুখ্যত সাধক। অপরদিকে গাজী বা বড়খাঁগাজী প্রতিহিংসাপরায়ণ মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও কামনা-বাসনায় পূর্ণ মনুষ্য স্বভাবের। অবশ্য কাহিনীগত চরিত্রে প্রত্যেকেই ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

প্রসঙ্গত অনুমান করা যায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলেও তার সংস্কার ও সংস্কৃতিগত এক ক্ষীণ ধারা অক্ষুণ্ণ থেকেছে মোবারকগাজীর মাহাত্ম্য সম্পর্কিত ঘুটিয়ারী শরীফের এই মেলায়। মুসলিম যুগের কোন একসময় সম্ভবত হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি ওলটপালট হয়ে হিন্দুর কোন দেব বা দেবী মোবারকগাজী নামে হাজত পাচ্ছেন আর হিন্দুর দেব বা দেবী 'দেউনা' (দেবিনী বা দেউনী) হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন এবং তাঁর উপর মসলা বাটা হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানের যোগসূত্র আরও নিবিড় করা হয়েছে এইভাবে যে, ঐ শীলার উপর বাটনা বাটা বা মশলা গুঁড়ো না হলে মোবারকগাজীর হাজত হবে না।

ঘুটিয়ারী শরীফের মোবারকগাজী সম্পর্কিত আচার-আচরণ যতই ওলটপালট হোক না কেন এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে কোন চিড় ধরেনি। মোবারকগাজী ও ঘুটিয়ারী শরীফের মাহাত্ম্য দেশেবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মোবারকগাজীর মেলাকে দ্বিতীয় মক্কা ভেবে পৃথিবীর বহু মুসলমান এখানে আসেন। এই মেলায় হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপক সমাবেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘুটিয়ারী শরীফকে কেন্দ্র করে এক বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এখানকার মেলা সম্পর্কে সচেতন ও অনেকরকম সংস্কারগত আচার-আচরণ পালন করেন। ঘুটিয়ারী শরীফের মোবারকগাজীকে কেন্দ্র করে যেমন অনেক আচার-আচরণ পালিত হয় এবং মেলা অনুষ্ঠিত হয় তেমন চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে পরিবেশিত হয় মোবারকগাজীর লোকায়ত পালাগান।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজের জনপ্রিয় পালাগান হল গাজীবাবার গান বা মোবারকগাজীর পালা। এ পালার কাহিনী মদন রায়চৌধুরীর ঘটনা কেন্দ্রিক। দক্ষিণরায়ের পালাতেও এই ঘটনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় (দেবপালা ঃ দক্ষিণরায় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নবাব শায়েস্তা খাঁ (কোথাও মুর্শিদকুলি খাঁ) সিংহাসনে বসে দক্ষিণ মুলুকের মদন রায়চৌধুরীর খাজনা বাকীহেতু তলব করেছেন। নিরুপায় মদন রায় গাজীবাবার মতান্তরে দক্ষিণরায়ের শরণাপন্ন হয়ে এই বিপদ থেকে রক্ষা পান ও সসম্মানে মামলা শেষ করে ঘরে ফিরে বাবার হাজতাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। এই কাহিনীতে মোবারকগাজীর পূর্ণাঙ্গলীলার বর্ণনা নেই। গাজীবাবার পূর্ণাঙ্গলীলার বর্ণনা বা পরিচয় দিয়েছেন গৌরমোহন সেন, তাঁর লেখা "হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি সাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান" ও ফকির মহাম্মদ (ফকির মামুদ) এঁর লেখা "ছহি মোবারক গাজি ও জেন্দা পীরের কেচ্ছা" গ্রন্থে। এই গ্রন্থ দুটির মধ্যে পীরমোবারকগাজীর জন্ম থেকে দেহরক্ষা পর্যন্ত সমস্ত জীবনী বর্ণিত হয়েছে গৌরমোহন

সেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, "আজ পর্য্যন্ত সাহ্ মোবারকের গুণাকীর্ত্তন ও কীর্ত্তির বিষয় বহু ভক্ত ও খাদেমজী-গণের নিকট শুনিয়া আমার এই মূর্খ বুদ্ধিতে সাহ্ মোবারকের জীবন চরিত প্রচার করিতে মনের উদ্বেগ হওয়ায়, কি ভাবে হইবে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, যাহা লোক মুখে শুনি, সেই সব বিষয় মনে মনে গাঁথিয়া আমার মত গুনাহ্ গার সাহ্ মোবারকের জীবনীর বিষয় লিখিতে বসিলাম।"[৮]

মোবারকগাজীর সঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া ঐতিহাসিক গবেষণা সাপেক্ষ। কারণ তিনি এখন লোককথার নায়ক। পালাগায়কগণ সাধারণত গাজীবাবার মদনপালা অংশটিই গেয়ে থাকেন। কোন কোন গায়ক তাঁর জন্মের থেকে কিছু ঘটনা গল্প করে বলেন। পালাগান হিসাবে লোকশিল্পীর নিকট মোবারকগাজীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র কাহিনী শোনা যায় না। অন্ততপক্ষে ঐরূপ পূর্ণাঙ্গ পালাগান ক্ষেত্রানুসন্ধানে মেলেনি। কাহিনী সংক্ষেপ অংশে গাজীবাবার পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্যর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গৌরমোহন সেনের লেখা কাহিনীর 'মদনপালার' পূর্ব পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উৎকলিত হয়েছে। 'গাজীবাবার পালা' নামে প্রচলিত পালাগানটি পালাগায়ক প্রবোধচন্দ্র ছাটুই মহাশয়ের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া এই পালাটি গীতিনাট্যের আকারে লিখেছেন আটঘরার গোষ্ঠ মণ্ডল। সে লেখাটিও সংগৃহীত হয়েছে। গীতিনাট্যের ঘটনা মূল ঘটনার পৃথক কিছু নয়, কেবল দু-একটি চরিত্র বাড়িয়ে ও কাল্পনিক কিছু ঘটনা যোগ করে পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে মাত্র। গোষ্ঠ মণ্ডলের গাজীবাবার গান নাটকটি মঞ্চোপযোগী রচনা।

গাজীবাবার নামে একাধিক পালাগান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় 'মদনপালা' নামে একটি পুঁথি আছে। পুঁথিটি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত বলে জানা যায়। পুঁথিটির রচনাকাল ও রচয়িতার নাম ঠিকানার কোন হদিস নেই। কারণ পুঁথিটির জরাজীর্ণ অবস্থা ও তার উপর প্রথম ও শেষ দিকের কিছু পাতা নেই। পুঁথির ঘটনা ও বিষয় এবং বিভিন্ন তথ্যসূত্র পর্যালোচনা করে অনুমান করা যায় অষ্টাদশ শতকের কোন একসময়ে এটি রচিত হয়েছিল।

মদনপালা পুঁথিটি পাঁচালি আকারে লেখা, কিন্তু পালাগানের আকারে যে গাজীবাবার পালাটি পাওয়া যায়, তার স্রষ্টা কলেমুদ্দিন গায়েন। কলেমুদ্দিন গায়েনের বাড়ি বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড গ্রামে। তাঁর মুখ থেকে গাজী-বাবার গান শুনে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন এবং তা সংকলন করে মদনপালা নামে প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায়। কলেমুদ্দিন গায়েনের প্রধান শিষ্য হলেন নিতাইচন্দ্র ছাটুই, ইয়ারআলী ফকির প্রমুখ। এঁরা গায়েনসাহেবের নিকট থেকে পালাটি সংগ্রহ করে গান করতেন। এঁদের অসংখ্য শিষ্য আছে। তাঁরা গাজীসাহেবের গান করেন। ফলে কলেমুদ্দিন- সাহেবের যে গানটি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সংকলন করেছেন প্রায় সেই গানটিই ঐ সমস্ত গায়কগণ গান করেন। কলেমুদ্দিন সাহেবের উত্তরপুরুষ পৌত্র জহুর আলি গায়েন-এর নিকট থেকে জানতে পারি যে তিনি লেখাপড়া জানতেন না। তাঁর হাতেলেখা কোন কিছুই নেই। তিনি মুখে মুখে পালাগান রচনা করতে পারতেন এবং গাজীসাহেবের পালাটি তাঁরই সৃষ্টি। সেই

পালাটি তিনি নিতাইচন্দ্র ছাটুই মহাশয়কে শিখিয়েছিলেন। আমার সংগ্রহে নিতাইবাবুর হাতেলেখা খাতাটিই আছে। এর কাহিনীর সাথে মদনপালার কাহিনীর অনেক মিল আছে। সেইহেতু মনে হয় মূল ঘটনা কলেমুদ্দিনসাহেব অন্য কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেটি পালা-রূপ দিয়েছেন তিনি নিজেই। বর্তমানে যে পালাটি গ্রামেগঞ্জে গাওয়া হয় তা তাঁরই সৃষ্ট পালা। কারণ সুদিন মণ্ডল, গোষ্ঠ মণ্ডল, অনিল হাজরা প্রমুখ যত পালাগায়ক চব্বিশ পরগণায় গাজীবাবার গান করেন তাঁদের গানের বিষয় প্রায় একই। হাস্যরসাদিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় মাত্র।

মোবারকগাজীর পালাকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। একটি অংশে মোবারকগাজীর জন্ম, বিবাহ, কর্ম এবং ঘুটিয়ারী শরীফে আস্তানা নির্মাণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। অপর অংশটিতে মদন রায়চৌধুরীর মামলা ও মোবারকগাজী কর্তৃক তাঁকে কৃপা করার কথা বর্ণিত হয়েছে। শেষোক্ত অংশটি পালাগান হিসাবে গীত হয়, পালাটি অতিশয় দীর্ঘ। পালাগায়কগণ চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে পালাটি গান করেন। এই অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা ভেবে ও কাহিনীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কেবল উক্ত দুই অংশের কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হল।

মোবারকগাজীর পালা

দিল্লীর (বাংলার?) প্রতাপবান বাদশা হলেন চন্দন সাহা। একসময় তাঁর রাজত্বে বর্গী হানা হয়। তাদের দমনের জন্য তিনি উজীরসাহেবকে পাঠান। উজীরসাহেব সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাত্রাকালে এক ফকিরপীর মইনুদ্দিন তাঁদের ফিরে যেতে বলেন ও দিল্লীর বাদশা চন্দন সাহার রাজত্বকাল শেষ হয়ে এসেছে — রাজ্যত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। এই কথা শুনে উজীরসাহেব ফিরে এসে চন্দন সাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাতে রাজা তাকে ভর্ৎসনা করেন ও যুদ্ধে যেতে আদেশ করেন। যুদ্ধে চন্দন সাহার সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বাকী সৈন্য পালিয়ে যায়। এই সংবাদ পেয়ে চন্দন সাহা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সেই সময় স্বপ্নে এক ফকির তাঁকে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলেন। এতে বরং তাঁর পরবর্তীকালে মঙ্গল হবে বলে জানান। এই কথা শুনে চন্দন সাহা ও তাঁর পত্নী দেশত্যাগ করে ঢাকায় এক মমিন সাহেবের বাড়ীতে উপনীত হলেন। তারপর মমিন সাহেবের সেবা যত্নে দীর্ঘদিন কাটার পর মমিন সাহেব তাঁকে নিয়ে দেশের বাদশার নিকট গেলেন। বাদশা চন্দন সাহার সমস্ত ঘটনা শুনে দুঃখিত হলেন ও বেলে আদমপুরের জঙ্গল (বেলিয়া) তাঁকে দান করেন। বাবন মোল্লার সাহায্যে তিনি বেলে আদমপুরে নতুন বালাখানা বসিয়ে জমিদারের আসনে বসালেন ও বাবন নিজে উজিরের পদে কাজ করতে লাগলেন।

বেলে আদমপুরে চন্দন সাহার আনন্দে কালাতিপাত হতে থাকে। একদিন ঐ ফকির-সাহেব তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করায় তিনি সন্তানহীনতার দুঃখ জানান। ফকির সাহেব তখন একটি সুগন্ধ ফুল দিলেন এবং বলেন—

এই ফুলের ঘ্রাণে বিবির লড়কা হইবে,
আল্লার দরগায় তুমি মোনাজাত ভেজিবে।

বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিবে মুক্তারণ,
আমার সাক্ষাৎ তুমি পাবে গো তখন।

এইরূপ দোওয়া দিয়ে ফকির চলে গেলেন। সময়মত মোবাবকগাজীর জন্ম হল। পুত্রকে নিয়ে মহানন্দে চন্দন সাহার কালাতিপাত ঘটে। একদিন সেই ফকির স্বপ্নে জানালেন এই জঙ্গলেব কোণে এক কদম্বগাছের নিচে যোগের আসন করতে, তাতে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হবে। ফকিরের কথা শুনে চন্দন সাহা সেখানে যোগের আসন করে নিত্য আল্লার জিকির করেন। ক্রমে মোবারকগাজী বয়ঃপ্রাপ্ত হন। মক্তবে পড়াশুনা শেষ করে দ্বাদশ বর্ষে তিনি বাবন মোল্লার নিকট থেকে জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাজ বুঝে নেন। মাঝেমধ্যে জঙ্গলে পিতার নিকট কদমতলায় গিয়ে আল্লার প্রেমের কথা শোনেন। কিছুদিন পর চন্দন সাহার মৃত্যু হল।

এতেক শুনিয়া বিবি কাঁদে জারে জার।
রানাজারি করে বিবি আফসোষ হাজাব।।
ত্বরায় বাবন মোল্লা আসিয়া, আনিল কাফন।
কদম্বতলায় গিয়া তিনি করিল দফন।।

এইদিন থেকে প্রত্যহ মোবারকগাজী পিতার রওজায় গিয়ে সালাম করে আসেন। একদিন পীর মহউদ্দিনসাহেব আল্লার প্রেম বোঝার জন্য মোবাবকগাজীকে ফকির হতে বলেন। এই কথা শুনে মোবারকগাজী সংসারের প্রতি আর টান অনুভব করেন না। তখন বাবন মোল্লা তাঁকে শাদি দিলেন। তাতে তাঁর দুটি পুত্রসন্তান লাভ হয়। তাঁদের একজনের নাম দুঃখী গাজী অপরজনের নাম মেহেরগাজী। কিছুদিন পর তিনি পিতার রওজার পাশে বেশি সময় কাটাতেন—সংসার দেখভাল করতেন না। ফলে দুঃখী ও মেহেরগাজী খাদেম হলেন।
এই সময় মন্দিরায় বেলের শিকদার হন

খোলার কাছারীতে মন্দিরায় বলিল
পিয়াদা পাইক সব হাজির হইল।
প্রথমে বেলের কাগজ নিরখিয়া আঁখি
তিন সন খাজনা চন্দন সার বাকি।

মন্দিরায়ের আদেশে পেয়াদাপাইক মোবারকগাজীকে ধরে মন্দিরায়ের নিকট আনল। মোবারকগাজী তাঁকে সালাম না করায় তিনি অপমানিত হলেন। এর উপর তিন সনের খাজনা আনতে বলায়—

মোবারক বলে শুন কহি যে তোমায়
খাজনার কথা আর বোলোনা আমায়।
ফের যদি কহ তুমি আমার হুজুরে
খোদার গরূজ হবে তোমার উপরে।

এই কথা শুনে মন্দিরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কারাগারে বন্ধন করে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে আদেশ দেন। তখন মোবারকগাজী পীর মইনুদ্দিনকে স্মরণ করেন। পীরের কৃপায় কঠিন পাষাণ শোলার মত হাল্কা হয় এবং পরে কারাগার থেকে মুক্ত করে দুটি হাসা-চিতা বাঘ দিয়ে জানালেন এই দুটিকে নিয়ে তুমি বেলের কদমতলে যাও, এরা তোমায় রক্ষা করবে। পীরের কৃপায় মোবারকগাজী কারাগার থেকে বেরিয়ে গিয়ে কদমতলে যোগের আসনে বসলেন। এদিকে কারাগারে আগুন লেগে সব পুড়ে যাওয়ায় মন্দিরায় ভাবলেন মোবারকগাজী নিশ্চিত মারা গেছেন। তাঁর কবরের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন, কিন্তু তারপর যখন তিনি জানলেন এবং দেখলেন মোবারকগাজী মারা যাননি, যোগাসনে বেলের কদমতলে অবস্থান করছেন ও তাঁর দুইদিকে হাসা চিতা দুটি বাঘ আছে তখন মন্দিরায় মোবারকগাজীর পায়ে এসে পড়েন এবং 'অপরাধ ক্ষমা কর গাজী দয়ামত' বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ও গাজীর আদেশে দুঃখীর নামে পাট্টা লিখে দেন।

এই ঘটনার পর একদিন মোবারকগাজী গায়েবি আওয়াজ শুনে অপবা পৃথিবীর সন্ধানে সঙ্গের হাসা চিতা দুটি নিয়ে, সংসারের দায়-দায়িত্ব স্ত্রী-পুত্রের ও বাবন মোল্লার উপর দিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মহাদেবের নিকট অপরা পৃথিবীর সন্ধান জানতে চাইলেন। মহাদেব মাতা দুর্গার নিকট প্রেরণ করেন। মাতা দুর্গা তাঁকে মেদনমল্লে রসাসাকিনেতে অবস্থানরত পাগলপীরের নিকট প্রেরণ করেন। মোবারকগাজী পাগল পীরের নিকট এলে তিনি পাইকহাটীতে যেতে বলেন। পথে আসতে তিনি পঞ্জরা গাঁয়ের এক বিখ্যাত আলেম জনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁকে করুণা করেন। এরপর পাইকহাটীতে এসে তিনি হেলোখাঁ নামক এক জমিদারকে কৃপা করেন। তারপর মুটুক পাটুনীর ঘাটে এসে তিনি জলের উপর দিয়ে হেঁটে অলৌকিকত্ব দেখান এবং মাথার পাগড়ি মুটুক পাটুনীকে দিয়ে কৃপা করেন। গাজী পাটুনীকে বলেন—

শুন পাটুনী তোমায় কই মোর কাছে কড়ি নাই
এই পাগটি রাখিয়া যে যাই।
দুঃখী মোর পার হবে পারের কড়ি দিয়া যাবে
এই কথা তোমারে জানাই।।
দুঃখীর নিকটে তুমি কড়ি নাহি লিবে কমি
এই পাগ তার হাতে দিবে।

এই বলে মটুক পাটুনীর নিকটয় তিনি নারানপুর গেলেন। সেখানে তারাহেদে নামক এক দীঘির পাড়ে শেওড়াগাছের তলায় যোগাসন করে বসেন। ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। জমিদার রামচন্দ্র চাটুজ্যে, তাঁর মাতা মুসলমান-বিদ্বেষী ও ছুঁৎমার্গী। মায়ের কথায় রামচন্দ্র মোবারকগাজীকে অপমান ও লজ্জাকর কথা বলে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। এর পর রামচন্দ্রের স্ত্রী দীঘিতে জল আনতে গিয়ে আর ফেরেন নি। গ্রামে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। তখন মা নারায়ণী স্বপ্নে বৃদ্ধাকে জানালেন, রামচন্দ্র ফকিরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন

বলে তাঁর এই অবস্থা। গ্রামের পাশে এক বনের মধ্যে সেই ফকির আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে রামচন্দ্র ক্ষমাভিক্ষা করলে বধূমাতাকে ফিবে পাওয়া যাবে। মায়ের কাছে রামচন্দ্র এই আদেশ শুনে তৎক্ষণাৎ অন্বেষণ করে মোবারকগাজীর নিকট গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কবলেন। গাজীসাহেব তাঁকে জোড়া খাসী দিয়ে হাজত দিতে বলেন। তারপর রামচন্দ্র বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর স্ত্রী দীঘিতে স্নান করে এক ফকিরের দেওয়া একটি সোনার মাগুর মাছ ও পিয়ালায় দেলিয়া (ক্ষীর) নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এই দৃশ্য দেখে পাড়া-প্রতিবেশী চমৎকৃত হল কিন্তু বধূ জানেন না তিনি কোথায় গেছেন এবং তাঁর বিহনে গ্রামসুদ্ধ লোক কেমন অস্বস্তিতে আছে। বধূকে ফিরে পেয়ে খাসী না পাওয়ায় রামচন্দ্র প্রথমে দুটো মোরগ ও পবে খাসী দিয়ে বড়পীর সাহেবের নামে হাজত দিলেন। গাজীব নির্দেশে কাছিম নস্করকে হাজতের ব্যবস্থা করার আদেশ দিয়ে তাঁকে দোওয়া কবেন।

এরপর মোবারকগাজী অপরা (অপোড়া) পৃথিবীর সন্ধানের জন্য নারায়ণীর মন্দিরে গেলেন। নারায়ণী তাঁকে কুরালী (সাপুর) গ্রামে এসে মরা শেওড়াগাছ তলে বসার আদেশ দিলেন।

নারায়ণী বলে তুমি, কুরালী গিয়া রহ।
মরা শেওড়া গাছ তলে, আসন করহ।।

মাতা নারায়ণীর আদেশ পেয়ে মোবারকগাজী কুরালী এসে উপস্থিত হলেন ও মরা শেওড়া-গাছেব তলে বসায় সেওড়া গাছও সতেজ সবল হয়ে উঠল এবং শেওড়াগাছে কদমফুল ফুটল। এই দৃশ্য দেখে গ্রামবাসীগণ গাজীসাহেবের মাহাত্ম্যে মশগুল হয়ে গেল।

গাজীর মাহাত্ম্যতে কুরালি বন হুলস্থূল
বাঘবাঘিনী উকুন বাছে, পাট করে তার মাথার চুল।
বসলে তলায় শুকনো তরুর ধোরতো পাতা ফল মুকুল
ফুটলো বাবার পরশ পেয়ে শেওড়া গাছে কদম ফুল।
বাবার খনা পুষ্কর্ণিতে স্নান করিলে যক্ষ্মা শূল
কুষ্ঠ ব্যাধি আদি সারে আরোগ্য পায় ধুম বাতুল।

গাজীবাবা নানাভাবে গ্রামবাসীকে উপকার করেন। গ্রামে মিষ্টি জলের পুকুর কাটিয়ে অলৌকিকভাবে এক ছোপাহাঁড়ি ভাতে বহু লোককে খাওয়ালেন। রামা ও শ্যামা গাঙ্গুলী গাজীবাবাকে কটু কথা বলায় বাঘে তাদের কান ছিঁড়ে দেয়। বাবার কৃপায় আবার জোড়া লাগে।

রামাশ্যামাকে কৃপা করে মোবারকগাজী বসে আছেন, এমন সময় কর্ণে গায়েবী আওয়াজ শুনলেন। তিনি আদিষ্ট হলেন এই বনে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য এবং এই আগুন যেখানে গিয়ে থামবে সেটাই হবে অপরা পৃথিবী। গাজীবাবা এই আওয়াজ শুনে বনে আগুন ধরিয়ে দিলেন ও সেই আগুন ঘুটিয়ারী শরীফে এসে নিভে গেল। এখানেই বিদ্যাধরী নদীর কূলে বাদামগাছের তলে তিনি যোগাসন করলেন। তাঁর দুই বাঘ সেখানে ঘর বানিয়ে দিল। ঘর দেখে গাজী অতিশয় খুশি হলেন। তখন—

বড়পীর গাজীকে যে ডাক দিয়া কয়
এইখানে আমার নজর গাহ যেন তৈয়ার হয়।
তোমার জাহির আল্লা এইখানে রাখিবে
এইরূপেতে কতদিন গোজারিয়া যাবে।

এই বলে বড়পীরসাহেব অন্তর্ধান হলেন। মোবারকগাজী ঐখানে বড়পীরের নজরগাহ তৈরি করে খাদিম স্বরূপ থেকে এবাদত করতেন ও যাঁরা মোবারকের নাম শুনে এখানে আসতেন তাঁদের দ্বারা বড়পীরের হাজত দেওয়াতেন।

কিছুদিন এইভাবে কাটার পর এক দেউনীর আত্মা শিলারূপে নদীর কূল ভাঙত। গাজীসাহেব নিষেধ করা সত্ত্বেও জিদ ধরে সেই কাজ করত। তখন তাকে ধরে গাজীসাহেব বন্দী করে রাখেন ও তার পিঠে বাটনা বা মশলা বাটার ব্যবস্থা করেন। তবে দেউনীর অনুরোধে গাজীসাহেব এখানে গোহত্যা করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

বিদ্যাধরী নদী দিয়ে বহু ধানের নৌকা চলাফেরা করত। বাবাজী একদিন সেই সমস্ত মাঝিদের কাউকে জিজ্ঞাসা করে জানেন যে, তারা বেলে আদমপুর থেকে এসেছে এবং ধান নিয়ে সেখানে যাচ্ছে। গাজীবাবা আরও জানেন যে, তারা দুঃখীগাজীর দেশের লোক। গাজী সাহেব তাদের দিয়ে খবর পাঠালেন দুঃখীকে এখানে আসার জন্য। পিতার সংবাদ পেয়ে দুঃখী প্রথমে ধোঘাটার ঘাটে মটুক পাটুনীর নৌকায় পার হতে চাইলে মটুক পাটুনী গাজীবাবার সংবাদ দিয়ে পারানি নিয়ে গাজীবাবার মটুক বা পাগড়ি ফিরিয়ে দিলেন।

পাগড়ি নিয়ে দুঃখী মোবারকগাজীর নিকট এসে সংসারের সমস্ত ঘটনা বলেন ও পিতাপুত্রের মিলন হয়। এখানে আরও ধান চাষ করে দুঃখীকে দিয়ে বেলে আদমপুরে পাঠালেন।

গাজীসাহেবের পালা (সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

মোবারকগাজী খুটিয়ারী শরীফে মক্কা তৈরি করে বসে আছেন। এমনসময় ঢাকার শহরের নবাব (মুর্শিদাবাদের মুর্শিদকুলি খাঁ) সেরেস্তাদারকে ডেকে বলেন, দক্ষিণ মুলুকে মদন রায়চৌধুরীর তিন সনের খাজনা তিন লাখ তিন হাজার টাকা বাকী পড়েছে। সেখানে বারোজন সেপাই ও একজন জমাদার নিয়ে গিয়ে জমিদার মদন রায়চৌধুরীকে এখানে ধরে আন। অন্তর্যামী পীর মোবারকগাজী এই বিষয় অন্তরে জেনে দুঃখীকে ডেকে বলেন, মেদনমল্লে আমাদের আর জাহির হবে না। তার কারণ মদন রায়চৌধুরীকে আজ বেঁধে নিয়ে যাবে। দুঃখী বাবাজীকে বলেন এর কোন প্রতিকার করা যায় কিনা। তাতে গাজীসাহেব বলেন, যদি মদন রায়চৌধুরী আমার কাছে আসে তবে তাকে পদচ্ছায়া দেব। দুঃখী তখন বলে, তোমার যদি সে ক্ষমতা থাকত তাহলে মন্দিরায় তোমাকে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে রাখত না। দুঃখীর এই কথায় গাজীসাহেব একটু দুঃখ পেলেন বটে কিন্তু মদন রায়কে কৃপা করার সংকল্প তিনি করলেন।

এদিকে নবাবের বারোজন সেপাই ও এক জমাদার মদন রায়চৌধুরীকে ধরে আনতে রওনা হয়ে গেল। তারা কালীঘাটে এসে কালী মায়ের পূজা দিল ও মানসিক করল, মদন

রায়কে যদি ধরে আনতে পারি তাহলে যাবার সময় বিল্বদল দিয়ে তোমাকে পূজা দিয়ে যাব। এই বলে এখান থেকে তারা রওনা হয়ে রাজপুর হাটে এসে উপনীত হল। এখানে মদন রায়ের কয়েকজন কপট প্রজার সাথে তাদের আলাপ হল। তারা ব্যাপারটি বুঝতে পেবে সেপাইদের অন্য পথ দেখিয়ে দিয়ে মদন রায়ের কাছে আগাম খবর পৌঁছে দিল। সেপাইগণ এসেছে শুনে রাজা ভয়ে অস্থির। মন্ত্রী ফরিদ নস্করের সাথে পরামর্শ কবে প্রথমে দেওয়ান মহেশ ঘোষকে সেপাইদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, রাজা এখানে নেই, এই কথা বলার জন্যে। মহেশ ঘোষ গিয়ে এই কথা বলতে বেদম বেত্রাঘাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সেপাইগণ আবার দ্বারে গিয়ে মদন রায় মদন রায় বলে ডাকছে। তখন মদন রায় মন্ত্রীর সাথে পরামর্শে ব্যস্ত। এবার মন্ত্রী নিজে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। মন্ত্রী চাতুরী করে সেপাইদের ভাগিয়ে দেবাব মানসে গাজীবাবাকে স্মবণ করে গেলেন ও নানা বাক্‌চাতুর্যে তাদের সপ্তাহকাল অতিথি হিসাবে থাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে মৃতপ্রায় দেওয়ান মহেশকে নিয়ে অন্তঃপুরে ফিরলেন। মন্ত্রী গাজীবাবার স্মরণ করে একটু মাটি নিয়ে দেওয়ানের গায়ে মাখিয়ে দিতে তার সর্বাঙ্গের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। মন্ত্রীর এই অলৌকিক ক্রিয়া দেখে মদনরায় অবাক হয়ে গেলেন এবং মন্ত্রীর কাছে এর রহস্য জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন—

মহারাজ এ আমার তন্ত্র নয় মন্ত্র নয়, শুন গুণধাম।
আমার মন্ত্র তন্ত্র সব সেই পীর মোবারকগাজীর নাম

মন্ত্রীর পরামর্শ মত রাজা পাঁচ সিকি মূল্যের সিন্নি নিয়ে এই বিপদ হতে মুক্তির আশায় পীর মোবারকগাজীর উদ্দেশ্যে পালকি করে চললেন—

রাজপুর নিজ বাটী তখন পার হয়ে যায়, সোনারপুর গিয়ে তখন উপনীত হয়।
সোনারপুর গ্রাম রাজা পার হয়ে যায়, আড়াপাঁচে গিয়ে তখন উপনীত হয়।
আড়াপাঁচ গ্রাম রাজা পার হয়ে যায়, নভাসানে গিয়ে তখন উপনীত হয়।
নভাসান গ্রাম রাজা পার হয়ে যায়, নারানপুর গ্রামে রাজা উপনীত হয়।
নারানপুর ঘাট রাজা পার হয়ে গেল, গোড়দহ কাছারী বাড়ীতে উপনীত হল।

গোড়দহে এসে মন্ত্রী পূর্বদিকে নিশান দেখিয়ে মদন রায়কে জানালেন, এটিই গাজীবাবার মোকাম। চারিদিকে জঙ্গল, বাঘ ভাল্লুকের ভয় কিন্তু যাত্রীদের কোন ক্ষতি কখনো হয় না। তাও এখান থেকে মন্ত্রীর নির্দেশে রাজা পালকি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে মাথায় শিরনি নিয়ে চলেছেন। রাজাকে দেখে গাজীসাহেব ছলনা করলেন শিশুরূপ ধরে। সবরকম পরীক্ষায় মদন রায় উত্তীর্ণ হলেন। অবশেষে মদন রায়ের ভক্তিতে গাজীবাবা সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করলেন ও ঢাকার শহরে মোকদ্দমায় যাবার জন্য একটি শুভদিন বাতলে দিলেন। মদন রায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, মোকদ্দমায় যদি ভাল ফল পান তাহলে সাত খাসি মেরে এখানে হাজত দিয়ে যাবেন। যাবার কালে গাজীবাবা মদন রায়কে আরও একটা পরীক্ষা করলেন—যারা কোদাল নিয়ে মাটি কেটে বাবার পুকুর বানাচ্ছিল তাদের সাথে মাটি কাটতে বল্লেন।

এক কোপ দুই কোপ তিন কোপের কালে,

গাজীর দোয়ায় মদন রায়ের কাপড় গেল খুলে।
কোদাল রেখে মদন রায় তখন কাপড় পর্ত্তেছিল,
হেসে উঠে গাজী তখন কহিতে লাগিল।
শুন শুন মদন রায় বলি তোমার ঠাঁই,
তিন পুরুষের বই জমিদারী বাবা তোমার রবে নাই।

মদন রায়চৌধুরী পীর মোবারকগাজীর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরছেন, বাড়ির কাছে আসতে মদন রায়কে দেখে সেপাইগণ তাঁকে বাঁধবার জন্য নড়েচড়ে বসতে মদন রায় ভয়ে গাজীর স্মরণ করলেন। তখন বাবাজী সোনার ভ্রমর হয়ে রায়কে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন। বাবাজীর কৃপায় সেপাইগণ তাঁকে সালাম করল এবং বাবার নির্দেশিত নির্দিষ্ট মঙ্গলবার মোকর্দ্দমার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। মদন রায় মন্ত্রীকে সাথে নিয়ে মোকদ্দমা করতে ঢাকা শহরে গেলেন। সেখানে নবাবের কাছারী দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। তখন গলায় কাপড় দিয়ে বাবাজীর স্মরণ করতে বাবাজী সোনার ভ্রমর হয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও নবাবকে স্বপ্নে ডাকলেন—

শুন শুন নবাব আউলে একবার হওরে চেতন
তোমার শিয়ের পীর মোবারকগাজী ডাকে ঘুমে এত মন।

নবাবকে ডেকে বাবাজী আরও বললেন, মদন রায় কাল প্রথম কাছারীতে আসবে, তাকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে বেশ্বরীখত লিখে দিয়ে রাজ সিংহাসনে বসাবে, নইলে তোমার সর্বনাশ হবে। এইরূপ স্বপ্ন পেয়ে নবাব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন এই ফকির নিশ্চয়ই কোন জাহিরের পীর। স্বপ্ন দিয়ে বাবা কাছারীতে গিয়ে বাকী খাজনার খাতা খুলে দেখলেন মদন রায়ের নামে তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা বাকী পড়েছে। তখন তিনি খাতায় সেই টাকা জমা করে আরও একলক্ষ এক হাজার টাকা জমা লিখে সেখান থেকে অন্তর্ধান করে ঘুটিয়ারীতে এসে উপস্থিত হলেন। মদন রায় নবাবের কাছারীতে এসে উপস্থিত হলে নবাব মদন রায়কে হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই চামর ব্যজন করতে লাগলেন। এতে মদন রায় ভাবলেন নবাব বোধ হয় তাঁর সাথে তামাসা করছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সত্যাসত্য বুঝতে পারলেন। বাদশা —

মদন রায়কে শাল দিল শিরোপা দিল আর দিল জোড়া
মদন রায়কে বকশিশ করল চড়নেরই ঘোড়া।

বকশিশ পেয়ে মদন রায় বিদায় হলেন। বিদায়কালে কারাগারে আরও অনেক জমিদার খাজনা অনাদায়ে আটক ছিল, তারা মদনরায়ের শরণাপন্ন হল। মদন রায়ের সহযোগিতায় জমিদারগণ ছাড়া পেয়ে গেল। বারোজন জমিদার ছাড়া পেয়ে মদন রায়কে বারোখানা তালুক বকশিশ করেছিল।

এদিকে মদন রায়ের জন্য কেঁদে কেঁদে তাঁর মা অন্ধ হয়ে যান। পীর মোবারকগাজীর কৃপায় মায়ের চোখ ভাল হয়ে যায়। ঢাকা শহরে পুত্রের মকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পীরমোবারকগাজীর প্রতি মদন রায়ের মাতা শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়েন। সাত খাসি মেরে

বাবার নামে হাজত দেবার ব্যবস্থা করেন। সাত খাসির সাত হাঁড়ি মাংস পীর আড়াই হালা ব্যানায় মুহূর্তে রান্না করেন। এই দৃশ্য দেখে গাজীর অনুচর দুঃখী পীরের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখল ও পীরের অলৌকিকত্ব স্বীকার করল। দুঃখী বলে—

শুন শুন বাবাজী আমার মন হয়েছে স্থির।
আমি নিশ্চয় জানিলাম তুমি জাহিরের পীর।।

মদন রায়ের জননী মোবারকগাজীর নামে মাগুন করে গান হাজত দিয়ে পীরের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন।

রানী বলে বাবাজী আমি ধর্ম প্রমাণ কব
বাস্তু দেবতা করে আমি তোমায় রাখিব। (সমাপ্ত)

গাজীসাহেবের, ঐতিহাসিকতা যাই হোক না কেন, গাজীসাহেবের পালার সাহিত্য-মূল্য অনস্বীকার্য। এই পালার মধ্যে যে সমস্ত চরিত্র আছে তার অধিকাংশই ঐতিহাসিক চরিত্র। যে-সমস্ত গ্রাম নগর বা জনপদের উল্লেখ আছে তা বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত। বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদীর নাম এই পালাগানে আছে, সেগুলিও এই অঞ্চলের। বর্তমানে এই নদীর স্রোত মজে গেছে বটে, কিন্তু পালাগানে সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। তৎকালীন জমিদারী ব্যবস্থার কিছু পরিচয় এই কাহিনীতে আছে। আর আছে এখানকার জলাজঙ্গল পরিবেষ্টিত কিছু মানুষের পরিচয় ও হিন্দু প্রধান এই অঞ্চলে মুসলমান পীর-ফকিরদের আধিপত্য কি ভাবে গড়ে উঠল তার ইঙ্গিত। সুতরাং গাজীসাহেবের গান উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নিজস্ব সম্পদ। এখানকার মানুষের ভাষা, জীবন সমস্যা সবই এই গানে প্রতিফলিত হয়েছে। ঘুটিয়ারী শরীফের গাজীবাবাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কারাদি গড়ে উঠেছে তা এই অঞ্চলের অতীতকে ধরে রাখার পক্ষে মূল্যবান উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এখানকার মেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন কুটীর শিল্প। তালপাতার শার্শি, জোয়াল, লোহার তৈরি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। অতএব গাজীসাহেবের গান, মেলা, লোকবিশ্বাস প্রভৃতি চব্বিশ পরগণার ইতিহাসের অনেক উপাদান বহন করে।

পরিশেষে বলা যায় মোবারকগাজী বহু আলোচিত লৌকিক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উৎস সম্পর্কিত প্রকৃত তাৎপর্য উদঘাটন অদ্যাপি সম্ভব হয়েছে এমন দাবী করা যায় না। কারণ প্রথমত ঐতিহাসিক ব্যক্তি মদন রায়চৌধুরীর সাথে লোককথার নায়ক মোবারক গাজীর যে সম্পর্কের কথা লোকায়ত পালাগানে উল্লেখ আছে তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। খাজনা বাকীর দায়ে সামন্তরাজাদের ধরে নিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখা ও কোন দেব বা দেবী কর্তৃক তাঁকে উদ্ধারের গল্প একাধিক প্রচলিত আছে। যেমন আলিবর্দি কর্তৃক রাজাকৃষ্ণচন্দ্র খাজনার দায়ে বন্দী হয়েছিলেন, পরে কালীমায়ের কৃপায় তিনি সসম্মানে মুক্তি পান। মোবারক গাজী নিজে মন্দিরায় কর্তৃক খাজনার দায়ে বন্দী হন, পরে বড়পীর সাহেবের কৃপায় মুক্তি পান। পরবর্তী কালে মদন রায়চৌধুরী খাজনার দায়ে রাজরোষে পড়লে মোবারকগাজী তাঁকে উদ্ধার করেন। সুতরাং এই সমস্ত লোককথার মধ্যে কতখানি ইতিহাসের উপাদান আছে তা

ঐতিহাসিক গবেষণা সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত মোবারকগাজীর পিতৃপরিচয় বিভ্রান্তি কর। তাঁর পিতা কোথাও চন্দন সাহা বলে কথিত হয়, কোথাও সেকেন্দারসা বলে উল্লিখিত হয়। তৃতীয়ত ঘুটিয়ারী শরীফের মোবারকগাজীর দরগাটি প্রকৃতপক্ষে বড়পীর সাহেবের কথিত দরগা যা বড়পীরের আদেশে মোবারকগাজী নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে পালাগানে উল্লিখিত হয়। বড়পীরসাহেব প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক লৌকিক দেবতা (বড়পীর সাহেব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মোবারকগাজীর দরগায় অনেক হিন্দুর দেবদেবীর অস্তিত্ব বিভিন্ন রূপে আজও বিদ্যমান। যাদের সাথে মোবারকগাজী কাহিনীগত যোগসূত্রের কথা জানা যায়। চতুর্থত মোবারকগাজীর দরগায় গাজী সম্পর্কিত যে সংস্কারাদি পালিত হয় তাতে ইসলামি কায়দায় হিন্দুসংস্কারাদিই পালিত হয়। যেমন জলে শিরনিভাসান, হাঁড়িতে করে সন্তান ভাসান, ধূপ বাতি জ্বেলে পূজার নৈবেদ্য প্রদান ইত্যাদি। পঞ্চমত মোবারকগাজী সম্পর্কিত নানা কথা উপকথায় যে যোগসাধনার কথা আছে তা নিতান্ত হিন্দু কালচারেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ষষ্ঠত মোবারক- গাজীর থানে হিন্দুদেরই আগ্রহ বেশি। গাজীর তেলপড়া, জলপড়া প্রভৃতিতে সবসম্প্রদায়ের মানুষের আগ্রহ থাকলেও সংখ্যাধিক্যে হিন্দুই। এইরূপ বহু তথ্য উদ্ধৃত করা যায় যার দ্বারা মোবারকগাজীকে কাল্পনিক পীর ও মোবারকগাজীর দরগাটিকে হিন্দুসংস্কারজাত দেবস্থান হিসাবে বিশ্বাসের উদ্রেক করে। তথাপি ঘুটিয়ারী শরীফের মোবারকগাজীর দরগাটি চব্বিশ পরগণা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসাবে মান্য হয়। মোবারকগাজীর কৃপায় মানুষের বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়।

পাদটীকা

১। বাজার সরকার, ঘুটিয়ারি শরিফের মায়াবি টেবিল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে অগস্ট, ১৯৯৪, পৃঃ ৩।

২। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী, সমাজশিক্ষা পত্রিকা, ২৫শ বর্ষ, জানুয়ারী, ১৯৮২, (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)।

৩। ঐ

৪। সাদা ফকির ও সাজালালী ফকির, (দেওয়ানগাজীর মেলা, সাক্ষাতকার)।

৫। বাজার সরকার, ঘুটিয়ারি শরিফের মায়াবি টেবিল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে অগস্ট, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩।

৬। গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬, পৃঃ ২২৪।

৭। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য়), ১৩৯৪, পৃঃ ২৪৫।

৮। গৌরমোহন সেন, হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি সাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান, বাং ১৩৯৪।

* আবদুর রহিম সাহেব, গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি।

* অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, মদনপালা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৮৬।

পীর ও গাজীপালা ঃ বড়খাঁগাজী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের ধারায় বড়খাঁগাজীর পালা অন্যতম। পালাগান আলোচনায় বড়খাঁগাজীর পালাটি পীর ও গাজীপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে লৌকিক দেবতা হিসাবে বড়খাঁগাজীর নাম খুব শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। চব্বিশ পরগণা তথা অখণ্ড সুন্দরবন অঞ্চলে বড়খাঁগাজীর একাধিক দরগা পরিলক্ষিত হয়। গ্রামে গঞ্জে এই গাজীর নামে পালাগান গীত হয়। লোকশিল্পীগণ আজও বড়খাঁগাজীর পালা আসরে গেয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁরাই গাজী বাবার মহিমা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন লোকায়ত পালাগানের মাধ্যমে।

বড়খাঁগাজী অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই নাম মূল বড়খাঁগাজী নামের ধ্বনিগত কিছু পরিবর্তন মাত্র। যেমন— বড়খাঁ, বড়খান, বরখান, বরকান, বরকন প্রভৃতি। পালাগান ও লোকশ্রুতিতে বড়খাঁগাজীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে দেখানোর ক্ষীণ প্রচেষ্টা থাকলেও লোকদেবতা হিসাবে তিনি অধিক পূজিত হন। বড়খাঁগাজীর নামে ঝাড়ফুঁক, তুক্-তাক, মাদুলী-চন্নেমিত্তিকে (চরণমৃত্তিকা), জলপড়া- তেলপড়া ইত্যাদিতে লোকসমাজের যত বিশ্বাস, ঐতিহাসিক ব্যক্তি সামন্ত রাজা সেকেন্দার শার পুত্র ও মুসলিম ধর্ম প্রচারক (?) হিসাবে তাঁর তেমন খ্যাতি নেই। চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে বড়খাঁগাজী এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন, আর্তজনের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী পীর বা পয়গম্বর হিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন লোকগাথায় ও পালাগানে গাজীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ—

'বোনবিবি জহুরানামা' নামক পুস্তিকায় বড়খাঁগাজী, দক্ষিণরায় ও বনবিবির দ্বন্দ্বের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পরিচিত। দক্ষিণরায় শাজঙ্গুলীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দৌড়ে বরখান গাজীর নিকট এসেছিলেন। বনবিবির ভাই শাজঙ্গুলী যখন দক্ষিণরায়ের বাঘ ও কুমির সৈন্য পরাস্ত করে ক্রমশ রায়মণির দিকে তেড়ে আসেন, তখন

দেখে রায় পেয়ে ভয় সেথা হইতে ছুটে *
হাজির হইল এসে গাজীর নিকটে।।

শাজঙ্গুলী সোটা হস্তে মার মার রবে যখন গাজীর নিকট যান গাজী তখন তাঁকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করে কাছে বসিয়ে বলেন—

গাজী কহে শাজঙ্গুলী বৈসহ এখন *
ঠাণ্ডা হয়ে কহ বাত শুনি বিবরণ।।
ইহা বলে বসাইয়া জঙ্গুলীর কয় *
এই যে বামন ইনি বন্ধু মোর হয়।।

গাজীসাহেব এবং দক্ষিণরায়ের পরিচয় পেয়েও শাজঙ্গুলী উভয়কে বনবিবির নিকট নিয়ে গেলেন।

গাজী আর রায়মণি জঙ্গলীর সাথে।।
আসিয়া হাজির হইল বৈরীর সাক্ষাতে *
দুই হস্ত জোড় করি করিল ছালাম।।
বিবি কহে কহ মিঞা কিবা তেরা নাম *
গাজী বলে বরখান নাম যে আমার।।
আমার বাপের নাম শাহ সেকেন্দার *[১]

কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীতে রায়মঙ্গল নামক কাব্যাংশের ১৬৯-৭০ শ্লোকে কবি উল্লেখ করেছেন—

শুন্যাছ বড়খাঁ গাজী পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠারো ভাঁটির।।
দুইজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে।।[২]

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত গাজীর গীতে বড়খাঁগাজীর বিশেষ পরিচয় মেলে। যেমন—

পোড়া রাজা গয়েশাদি তার বেটা সমসদি
তার পুত্র সাইসেকেন্দার।।
তার বেটা বরখান গাজী খোদাবন্দ মুলুকে রাজী
কলি যুগে যার অবসর।
বাদসাই ছাড়িল বঙ্গে কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির।।[৩]

আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত 'গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি'তে বড়খাঁগাজীর বিস্তারিত পরিচয় আছে। এখানে গাজীর জন্ম, বিবাহ ও কর্মের কথা উল্লেখ আছে। বিরাট নগরের রাজা সাহা সেকেন্দার, তাঁর পত্নী আজুপা। আজুপার পিতা ছিলেন পাতালের রাজা। সাহা সেকেন্দারের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি সেকেন্দারকে কন্যা দান করেছিলেন।

আজুপার গর্ভে দুই সন্তানের জন্ম হয়। একজন জুলহাস, অপবজন গাজী। আজুপার আর এক পালিত সন্তান ছিল তার নাম ছিল কালু। কালু ও গাজীব মধ্যে ছিল গভীব অন্তরঙ্গতা।

কালুকে জানেন গুরু গাজী মনে মনে।।
গাজীকে মানের গুরু কালু মনে প্রাণে *[৪]

পববর্তীকালে গাজীব সাথে মুকুট বাজার কন্যা চাম্পাবতীর শাদি হয়েছিল। এই পুঁথিতে গাজী সাহেবকে কোথাও বড়খাঁগজী বলে উল্লেখ নেই। বরখানগাজী ও গাজী কালু চাম্পাবতীর গাজী এক বা অভিন্ন বলে অনুমান কবা গেলেও মোবারকগাজী ও বড়খাঁগাজী সম্পর্কিত প্রচলিত লোককথা, মন্ত্রতন্ত্র লোকবিশ্বাস, পূজাচার ও প্রচলিত পালাগান ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোবারকগাজী ও বড়খাঁগাজীকে দুই পৃথক লৌকিক দেবতারূপে চিহ্নিত করা যায়।

চব্বিশ পরগণার অনেক স্থানে বড়খাঁগাজীর দবগা আছে। সর্বত্র বড়খাঁগাজীর মূর্তি নেই। যেখানে মূর্তি নেই সেখানে ইটের বেদীকে বড়খাঁগাজীর থান বলে কল্পনা করা হয়। খাড়িগ্রামে (দঃ ২৪ পরগণা) গাজীর আস্তানা বাটী আছে। এখানে গাজীর মনুষ্য প্রমাণ মূর্তি আছে। মূর্তির মাথায় পাগড়ি, মুখে চাপদাড়ি, পায়ে জুতা, যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী, ডান হাত উর্দ্ধে তোলা অবস্থায় দেখা যায়। উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট একটি জীর্ণ ঘরে গাজীর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিত সেখানে পূজাদি হয় না। ভক্তরা এলে পর পূজার আয়োজন করা হয়। সুন্দরবনে যাঁরা মধু ও কাঠ সংগ্রহে যান তাঁরা গাজী সাহেবের দরগায় পূজা হাজতাদি দিয়ে জঙ্গলে যান। প্রতিবৎসর নন্দাস্নান উপলক্ষে চক্রতীর্থে যাঁরা আসেন তাঁরা বড়খাঁগাজীর দরগায় পূজা হাজত দেন। মানত করেন, ঢিল বাঁধেন ইত্যাদি নানা আচরণ পালন করেন।

বরকানগাজীর একটি প্রতিষ্ঠিত স্থান বারুইপুর থানার মদারাট পশ্চিমপাড়ায় অবস্থিত। এখানে গাজীর কোন মূর্তি নেই। এই থান প্রায় পাঁচশত বৎসরের পুরান বলে অনেকে দাবী করেন। এখানকার বর্তমান সেবক হলেন হরেন্দ্রনাথ নাগ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ এই থান দেখভাল করেন। প্রতিবৎসর ১লা মাঘ খুব জাঁকজমক সহকারে এখানে মেলা বসে। বহু লোকের সমাগম হয়। মেলা উপলক্ষে বরকানগাজীর গান, মানিকপীরের গান, বিবিমার গান ইত্যাদি হয়ে থাকে। বরকানগাজীর এই থানে বহু লোক মানত কবেন। রোগ-পীড়া থেকে মুক্তি লাভ, মামলা-মকদ্দমায় জয়, চাকুরি লাভ, মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি গাজীবাবার কৃপায় হয়ে থাকে। বিশেষত মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা, পাগলা, শরের ব্যথা, ফিকের ব্যথা ইত্যাদি যেকোন ব্যথা এমনকি ক্যান্সার রোগও পর্যন্ত গাজীবাবর কৃপায় আরোগ্য হয় বলে সেবাইত জানান। এছাড়া বাবাজীর দোহাই দিয়ে অনেক তুকতাক ও মন্ত্রতন্ত্র আছে। নিম্নে কয়েকটি মন্ত্রের নমুনা দেওয়া হল।

(ক)

ভার কাটি বাণ কাটি শির কাটি সিন্দ কাটি
দৃষ্টি কাটি, মিষ্টি কাটি, বা ও বাতাস কাটি

ডান ও ডাকিনী বাণ, ডাকিনী বাণ, ডাকিনী বাণ
শ্রীরামের কৃপায় করি খান খান।
কার আজ্ঞায় ? বাবা বরকানগাজীর আজ্ঞায়
মা বনবিবির আজ্ঞায়, মানিকসাহেবের আজ্ঞায়
দেওয়ানগাজীর আজ্ঞায়, মোবারকগাজীর আজ্ঞায়,
অমুকের অঙ্গের বেদনা শিগ্‌গির ছাড়।

(খ)

হাড়ে রক্ত মাসের মধ্যে, শিরে রক্ত সেই শিরে যা,
কার আজ্ঞে কামাক্ষার আজ্ঞে, হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, বাবা বরকান গাজীর আজ্ঞে, মানিক-পীরের আজ্ঞে, মা বনবিবির আজ্ঞে, দেওয়ানগাজীর আজ্ঞে, বাবা মোবারকগাজীর আজ্ঞায় শিগ্‌গির ছাড়।

(গ)

অগ্নিকুণ্ড বাণ, ব্রহ্মা কুণ্ড জাতি, হামুকের ব্যথা কেটে করি খানখান।
কার বাণে কাটি, শ্রী রামের বাণে কাটি।
কার আজ্ঞায় বাবা দেওয়ান গাজীর আজ্ঞায়, বাবা মোবারকগাজীর আজ্ঞায়, বাবা বরকান গাজীর আজ্ঞায়, অমুকের অঙ্গের ব্যথা শিগগির যা।।[৫]

ময়দা গ্রামের দক্ষিণে চণ্ডীপুর গ্রামে মুসলমান পাড়ায় আদিগঙ্গার মজা খাদের পূর্ব দিকে রাস্তার পাশে বড়খাঁগাজী ও চাঁপাবিবির দুটি ইষ্টকনির্মিত কবরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই কবরের ইট পাঠানযুগের গৃহাদিতে ব্যবহৃত ইটের অনুরূপ বলে কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেছেন। শ্রীদত্ত সংগৃহীত পালাগানে এই অঞ্চলের ইতিহাস প্রছন্ন আছে।[৬]

সুতরাং বিভিন্ন মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যেও মোবারকগাজী, দেওয়ানগাজী, বড়খাঁগাজী প্রভৃতিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের জমিদারী কাগজপত্রে (চিটা) মোবারকগাজী ও বড়খাঁগাজীর নামে পৃথক ভাবে একাধিক ক্ষেত্রে নিষ্কর জমি প্রদত্ত হয়েছে তার উল্লেখ আছে। অতএব মোবারকগাজী ও বড়খাঁগাজী এক ও অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা প্রমাদ বিশেষ।

চব্বিশ পরগণায় বড়খাঁগাজীকে নিয়ে অনেক পালাগানের সন্ধান পাওয়া গেছে। যে গানগুলি পাওয়া গেছে তা অধিকাংশই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। পালাগায়কগণ এগুলিই অতিরিক্ত কথা, সংলাপ, সংগীত ইত্যাদি যোগ করে আসরে পরিবেশন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল পুঁথি পাঠ করা হয় বলে জানা গেছে। 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের লেখক ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস "কালু গাজী চম্পাবতী" নামক একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখান। এটির লেখক সতীশচন্দ্র চৌধুরী। নাট্যাকারে লিখিত এই পুঁথিটিতে বহু গান

আছে। যে গানগুলি নাট্যকারের নিজের সংযোজন। নাটকের মূল কাহিনীটি আবদুর রহিম সাহেবের 'গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি' অবলম্বনে লেখা। এটির রচনাকাল সম্পর্কে পুঁথির প্রথম পাতায় উল্লেখ আছে — "এই পুস্তক সন ১৩২০ সালের ৬ই পৌষ রবিবার আরম্ভ এবং ..... ৮ই পৌষ মঙ্গলবার সমাপ্ত হইল।" এটি যাত্রার রীতিতে আসরে পরিবেশিত হয় বলে জানা যায়।

কবি কৃষ্ণরাম দাস 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বড়খাঁগাজী ও দক্ষিণরায়ের জঙ্গ দেখিয়েছেন। এই কাব্যে কবির এক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বড় করে দেখাবার চেষ্টা তিনি করেছেন। আঠারভাঁটির অধিকার নিয়ে দক্ষিণরায় ও গাজীসাহেবের তুমুল লড়াই হয়েছে। তাঁদের সেই লড়াইয়ের মীমাংসা করেছেন অর্ধেক কৃষ্ণ ও অর্ধেক পীর বেশধারী এক মহাত্মা। তাঁর —

অর্ধেক মাথায় কালা এক ভাগ চূড়াটালা
বনমালা ছিলিমিলি হাতে।
যবন অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘপ্রায়
কোরাণপুরাণ দুই হাতে।

এই মহাত্মার সুপরামর্শে স্থির হয় —

বড়খাঁর মহাকায় গোরে কেরামত তায়
হইবে লোকের কাম ফতে।
যেখানে পীরের নাম বারাম মোকাম থান
যত ফয়সালা নামেতে।।
মায়ামুণ্ড এই রূপ দক্ষিণদেশের ভূপ
পূজা করিবেক যতো জন।
এখন দক্ষিণরায় যত ভাঁটির অধিকার
হিজলিতে কালু রায় থানা।।
সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোয়াইবে শির,
কেহ তারে না করিবে মানা।।

সুতরাং এই মিটমাটের পরে কারো মনে পরাজয়ের কোন গ্লানি আর থাকল না।

এই পালাটি পূর্বে পালাগানের রীতিতে গাওয়া হত বলে জানা যায়, কিন্তু পালাগানের আকারে এই অঞ্চলের কোন গায়কের নিকট হতে পালাটি পাওয়া যায় নি। বড়খাঁগাজীর গান নামে একটি পালা কালিদাস দত্ত মহাশয় 'ভারতীয় লোকযান' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এটি তিনি এই অঞ্চলের গায়েনদের নিকট হতে সংগ্রহ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটিতে গাজী কালু চাম্পাবতীর কাহিনীর ছায়া থাকলেও ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এখানে চাম্পাবতীর নামের পরিবর্তে সুভদ্রা নাম ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত ঘটনার স্থানের নাম ব্রাহ্মণনগরের পরিবর্তে খনিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। এই পালাগানের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

বড়খাঁগাজীর পালা

বড়খাঁগাজী তার ভাই কালুকে নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চণ্ডীপুর মোকামে পৌঁছালেন। সেখানে শেওড়াতলায় বসে কালী দেওয়ানের দেওয়া আরবী কোরাণ খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকেন। সেইদিন হিন্দুর বারুণী-স্নান ছিল।

সারি সারি লোকজন যাত্রা করি যায়।
মুকুট রাজার বেটি দেখিবারে পায়।।
সুভদ্রা বামনের মেয়ে শিবপূজে সেই ঠাঁই।
বার বছর পরপুরুষের মুখ দেখে নাই।।

সুভদ্রা তার এক দাসীকে ডেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বিষ্ণুপুরে গঙ্গাতে বারুণী-স্নান করতে মনস্থির করলেন। দাসী তখন চারিদিকে কাপড়ের কাণ্ডারী ঘিরে গোপাল গঙ্গায় নিয়ে গেলেন। রাজকন্যার রূপে স্বর্গমর্ত্য যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই দেখে কোরাণ পাঠরত বরখাঁগাজী অবাক হয়ে যান। তিনি কালেখাঁ দেওয়ানকে ডেকে কার রমণী স্নান করছে তা জেনে আসার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন —

কোথা হতে এল কন্যা বল দেখি ভাই।
এমন ধারা রূপ আমি কভু দেখি নাই।।
** ** **
আর এক কথা ভাই বলি তোমা কাছে।
জেনে এস ঐ কন্যার শাদি কি হয়েছে।।

বড়খাঁগাজীর কথায় কালুমিঞা প্রথমে যেতে রাজী হননি। পরে আল্লার দোহাই দেওয়াতে তিনি গোপাল গঙ্গার স্নানঘাটে গেলেন। সেখানে গিয়ে দমমাদারের নামে হাঁক দিতে রাজকন্যা ও দাসী সবাই চমকে উঠল। রাজকন্যা পরপুরুষের মুখ দেখবে না বলে পদ্মপত্রে মুখ ঢাকা দিল। তথাপি কালু মিঞা নিকটে এসে কন্যার পরিচয় জানতে চাইলে—

দাসী বলে শুন বলি ফকির মিঞা।
খনিয়া নগরে ঘর মটুক রাজার ঝি।।

কালু সুভদ্রার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বড়খাঁগাজীকে গিয়ে জানাল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে —

গাজী বলে শুন ভাই বলি তোমার ঠাঁই।
ওই কন্যার না সাদি করলে প্রাণে বাঁচব নাই।।

তিনি কালুকে ঘটক হয়ে মুকুট রাজার নিকট যেতে বললেন, কিন্তু কালু যেতে রাজী নয়। অবশেষে গাজীমিঞার একান্ত পীড়াপীড়িতে যেতে স্থির করলেন।

এত কহি কালু দেওয়ান খনিয়াতে যায়।
একগাছা পৈতা কিনি লাগায়ে গলায়।।

ব্রাহ্মণ সেজে কালুমিঞা খনিয়াতে গেল। মুকুট রাজার অনুচর রমাবেধো ব্রাহ্মণকে দেখে ভিক্ষা দিতে গেলেন, কিন্তু কালু তার এই আচরণে বিরক্ত হয়ে মুকুট রাজাকে তাঁর সাথে

দেখা করতে বললেন। ব্রাহ্মণের আচরণে রমাবেধো ভয় পেয়ে অন্দবে মুকুট বাজার সাথে গিয়ে দেখা করলেন। তখন রাজা শিব পূজায় ব্যস্ত। পূজা সেরে উঠে দাঁড়াতে রমাবেধো তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল। তখন রাজা এক কলকে তামাক টানতে টানতে বাইরে ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন। ছদ্মবেশী কালুমিঞা তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কন্যার বিবাহের নিমিত্ত এক সুপাত্রের বর্ণনা দিলেন।

কালু কহে শুন বলি রাজা মহারাজ।
এক উত্তম বর আছে তবে কিছু দূবে রয়।।
তোমার হইতে তিনি বড় হন তেজা।
মহাগুণবান আর ভাঁটিদেশের রাজা।।

বাজা সবিস্তারে বরের পরিচয় জানতে চান। কালু ইতস্তত করে বলেন, বর সেকেন্দার শার পুত্র, নাম বড়খাঁগাজী। কিন্তু "গাজী" বলে কোন ব্রাহ্মণ আছে কিনা রাজা জানেন না। তখন তিনি ব্রাহ্মণপাড়া থেকে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডাকিয়ে আনলেন।

কেহ বাড়ুজ্যে কেহ হয় মতীলাল।
চাটুয্যে, মুখুয্যে সব চলে পালে পাল।।
একে একে সব গিয়া হইল হাজির।
পুঁথি পাঁজি কত নিয়ে দেখিতে নজির।।

কিন্তু পণ্ডিতগণ গাজী নামে কোন ব্রাহ্মণকে পুঁথিতে পেলেন না। এই কথা জেনে মুকুট রাজা ঘটক মহাশয়কে ঘাড় ধরে বার করে দিতে বলেন। তখন কালু মিঞা বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পালালেন এবং—

চণ্ডীপুরে গিয়া মিঞা কহে গাজী ভাই।
তোমার বিভার ঘটক হয়ে প্রাণে মারা যাই।।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গাজীসাহেব আর একবার খনিয়াতে যেতে বললেন। তিনি এবার নিজে সোনার ভ্রমর হয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের পুঁথির হরফ তুলে 'গাজী ব্রাহ্মণ' এই কথা লিখে চণ্ডীপুব মোকামে ফিরে এলেন। পরদিন কালু মিঞা খনিয়াতে এসে আবার মুকুট রাজার সাথে সাক্ষাৎ করেন ও পুনরায় ব্রাহ্মণদের পুঁথি দেখাবার কথা বললেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ও রাজা দেখলেন পুঁথিতে গাজী ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ আছে। তখন রাজা ঘটককে কন্যার বিবাহের 'পান' তুলে যেতে বললেন।

কালু দেওয়ান মনে তখন ভাবি আল্লা নবী।
পান উঠাইয়া লয় রাজাকে প্রণাম করি।।

কালুমিঞা পান নিয়ে চণ্ডীপুরে গাজীর নিকট এলেন। তিনি প্রথমে গাজীর নিকট ছলনা করাতে গাজী মনের দুঃখে গলায় ছুরি দিয়ে মৃত্যু কামনা করেন। তখন কালু পানপত্র দেখিয়ে বলেন বিয়েতে অনেক খরচা হবে।

তিনশত বামন চাই, একুশ জোড়া শাড়ি।
চিনি সন্দেশ মেঠাই চাই, তিন শত হাঁড়ি।।

ক্ষীর দই কত চাই, নাহি লেখা জোকা।
জলদি করে দাও ভাই হাজার খানেক টাকা।।

তখন গাজীমিঞা শেওড়াগাছের জাম্বল (এক প্রকার বৃক্ষ) হতে তিনটি কড়ি আনলেন যার দুটি ভাঙা, একটি ভাল। তার একটি কালুকে দিয়ে শেখের বাজারে ভাঙাতে বললেন। কালু দ্বিধাভরে তা নিয়ে শেখের বাজারে গেলেন ও তা ভাঙিয়ে দুইশত ছয় টাকা পেলেন। সেই টাকায় সিদ্ধি আদি বিবাহের সমস্ত জিনিসপত্র কিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে চণ্ডীপুরে ফিরে এলেন। কালু সব শেষে দুটি বড় মোরগ কিনে পিছনে ছিলেন। মোরগ হাতে কালুকে দেখে গাজী অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন মাংস নিয়ে ব্রাহ্মণ বাড়িতে কি ভাবে যাবে? গাজীকে আশ্বাস দিয়ে কালু নিশ্চিন্ত হতে বললেন। তিনশত ব্রাহ্মণের পরিবর্তে তিনশত ফকির ডেকে গলায় পৈতে দিয়ে ও হাঁড়িতে মোরগের গোস নিয়ে কালু খনিয়াতে এসে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণবেশী ফকিরদের দেখে রমাবেধোর সন্দেহ হয় এবং পরে নিশ্চিত হন যে, ব্রাহ্মণ কখনও নয়, ওরা সকলে যবন। তখন রমাবেধোর পরামর্শে রাজা সেপাই ডেকে ফকির তাড়াতে লাগলেন, তাড়া খেয়ে ফকিরগণ কোনরকমে প্রাণে বেঁচে চণ্ডীপুরে ফিরে গেলেন ও গাজীকে সমস্ত ঘটনা বললেন। গাজী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এর উচিত শিক্ষা দেবার জন্য যত বাগ সৈন্যকে ডেকে মুকুট রাজার বিরুদ্ধে ভেজিয়ে দিলেন। তখন ধানধাগড়া, জটাবাগ, দরিয়াবাগ, টংভাঙা, খোঁড়াবাগ, পাঁসুটেবাগ প্রভৃতি বাগেরা তাদের নিজেদের বিক্রম দেখিয়ে গাজীকে প্রণাম করে খনিয়া নগরে এসে উপস্থিত হল। খনিয়াতে বাগেদের সাথে রাজার সেপাইদের তুমুল যুদ্ধের পর বাগেরা রাজাকে ধরে নিয়ে গাজীর নিকট উপস্থিত হল। মুকুট রাজা কালুর নিকট প্রাণে বাঁচার জন্য কান্নাকাটি করলে কালু সেকথা গাজীকে জানান।

গাজী শুনি বলে রাজা কহি তোমার ঠাঁই।
জাতি তোমার দিতে হবে নইলে রক্ষা নাই।।
মুকুট তখন ভয়ে জাতি কন্যা দিতে চায়।
খুশী হয়ে গাজী মিঞা ভাবেন খোদায়।।

** ** **

বামনেরা মনের দুখে বলে নিরঞ্জন।
সুভদ্রারে বিভা করিল পাষণ্ড যবন।।

গাজীর সাথে সুভদ্রার বিয়ে হওয়াতে অন্য ব্রাহ্মণেরা মুকুট রাজার বাড়িতে আসে না। তখন গাজী বাগ সৈন্যদের ভেজিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করতে লাগল। ভয়ে ব্রাহ্মণেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। খনিয়াতে হাহাকার পড়ে গেল।

মুকুটের বেটিরে বিভা করে গাজী মিঞা।
নানা বাদ্য ঢোল বাজে কাড়া আর শিঙা।।
বিভা করি গাজী মিঞা চণ্ডীপুরে যায়।

কালুদেয়ান দেখি দেলে খুশী হয়।।

গাজীমীএ্রাব হাজত সিন্নী সম্পূর্ণ হইল।
হিন্দুগণে বল হরি মমিনে আল্লা বল।।

(কাহিনী সমাপ্ত)

বড়খাঁগাজীর এই পালায় অধুনা বারুইপুর ও জয়নগর থানার পরিচিত কিছু স্থাননাম পাওয়া যায়। যথা চণ্ডীপুর, শেখের বাজার (কাছারী বাজার ?) গঙ্গার ঘাট, খনিয়া ইত্যাদি। বর্তমান দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুর রাজবাড়ি সংলগ্ন পুকুর বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন। এটি মুকুট রাজার স্মৃতি বিজড়িত কিনা সে বিষয়ে গভীর গবেষণার অবকাশ আছে। তথাপি বড়খাঁগাজী ঐতিহাসিক না কাল্পনিক এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। আরব দুনিয়া থেকে বহু আউলিয়া ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে আস্তানা গেড়ে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে কথিত হয়। তাঁদের কেউ কেউ চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে এসেছিলেন এবং ইসলাম ধর্মপ্রচার করেছিলেন এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু বড়খাঁগাজী সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য মেলে না। অথচ কালিদাস দত্তের বর্ণনানুযায়ী মনে হয় তিনি জয়নগরের খনিয়াতেই এসেছিলেন এবং এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। কারণ এখানে বড়খাঁ ও চাঁপাবিবির নামে পৃথক দুটি কবর আছে। এ ধরনের আরও অনেক জায়গায় বড়খাঁগাজীর দরগা আছে বলে জানা যায়। সুতরাং বড়খাঁগাজী যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি জয়নগরের নিকট দেহরক্ষা করেছিলেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। পালাগান ও গাজীসাহেবের মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক বিভিন্ন পুঁথির কাহিনী বাদ দিলে বড়খাঁগাজীর ঐতিহাসিকত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু কাল্পনিক পীর হিসাবে বড়খাঁগাজীকে মনে করার অনেক কারণ আছে। প্রথমত বলা যায় এই গাজীর নাম মুসলিম ইতিহাসে মেলে না। দ্বিতীয়ত বড়খাঁগাজী হিন্দুর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূজিত। তৃতীয়ত বড়খাঁগাজীর নিকট মানুষ যেভাবে গান, হাজত, পূজাদি দেয় তাতে তাঁর ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করে না বরং তাঁর লৌকিক দেবত্বের মহিমা প্রকাশ পায়। সুতরাং বড়খাঁগাজীকে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজ-পূজিত লৌকিক ও কাল্পনিক পীর হিসাবে অনুমান করা যায়।

বড়খাঁগাজীর অধিকাংশ ভক্ত নিম্নসম্প্রদায়ের হিন্দু। ইতিহাস থেকে জানা যায় এক সময় বর্তমান চব্বিশ পরগণার নিম্নবর্ণের হিন্দু দলে দলে মুসলমান হয়েছিলেন। সুতরাং মুসলমান হলেও সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতিগত পুরানো ঐতিহ্য ভুলতে পারেন না। 'Folklore Contextul Theory' অনুযায়ী তা সম্ভবও নয়। সেকারণে অনুমান করা যায় ঐ সমস্ত ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন সেখানে তাঁদের পূর্বের লোকদেবতার থানে লৌকিক কোন দেবতার উপর ঐতিহ্যময় মুসলিম নারী বা পুরুষের অবয়ব কল্পনা করে বা কাল্পনিক কোন নাম দিয়ে পূজার পরিবর্তে হাজত দিতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজ মুসলমানদের এই পূজার তত্ত্ব জানতেন বলে সম্ভবত তাঁরাও কাল্পনিক পীর

ফকিরদের উপর পূর্ব সংস্কারবশত সমান শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে পূজা হাজতাদি দিতেন। পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে পূজাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে এই সমস্ত দরগায় তাঁদের আনাগোনা কমে গেলেও হিন্দুগণ পূর্বের ট্রাডিশন সমানে বজায় রেখে চলেছেন। বড়খাঁগাজী সম্ভবত এমনই এক লৌকিক দেবতা, যিনি মুসলিম অপেক্ষা হিন্দুর নিকট অধিক আদরণীয়। চরিত্রবৈশিষ্টে বড়খাঁগাজী বাংলার লোকদেবতা মহাদেবের ন্যায় শিথিল চরিত্রও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদেবতারূপে পালাগানে বর্ণিত হয়েছেন। তাছাড়া লোককাহিনীতে দেখা যায়, বনবিবি নারায়ণীর দ্বন্দ্ব ও সন্ধি, দক্ষিণরায় বড়খাঁগাজীর দ্বন্দ্ব ও সন্ধি, মুকুটরায় ও গাজীর দ্বন্দ্ব ও সন্ধি প্রভৃতি ঐসব সনাতনপন্থী হিন্দুর সাথে ধর্মান্তরিত মুসলমানের দ্বন্দ্ব ও মিলনকেই স্মরণ করায়। সুতরাং বড়খাঁগাজী হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের যুগে মিশ্রসংস্কৃতি জাত এক লৌকিক দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন এমন অনুমান করা যায়।

পাদটীকা

১। আবদুর রহিম, বোনবিবি জহুরানামা।

২। শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী।

৩। যতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, ১ মখণ্ড।

৪। আবদুর রহিম প্রণীত, গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি।

৫। হরেন্দ্রনাথ নাগ, মদারাট, বারুইপুর থানা (সাক্ষাতকার)।

৬। কালিদাস দত্ত, বড়খাঁগাজীর গান, ভারতীয় লোকযান (তৃতীয়), ১৯৬৩, নং ১ এবং ২, সম্পাদক- প্রফুল্লচন্দ্র পাল।

৭। ঐ, পৃ :- ১৮।

পীর ও গাজীপালা ঃ দেওয়ানগাজী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানে কেচ্ছাকাহিনী ধারার বিশিষ্ট পীর হলেন দেওয়ান গাজী। পালাগান আলোচনায় দেওয়ানগাজীর পালা পীর ও গাজীপালার অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ানগাজীর ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু আছে কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই অঞ্চলের লোক-বিশ্বাসে তিনি অতি পূজনীয় ও কল্যাণকারী পীর হিসাবে চিহ্নিত। দেওয়ানগাজী প্রকৃত প্রস্তাবে একটি সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ। ফারসী 'দীবান' শব্দ থেকে দেওয়ান শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ হল রাজসভা বা মন্ত্রীসভা। জমিদারী বা রাজ্য সংক্রান্ত প্রধান কর্মচারীকেও দেওয়ান বলা হয়। গাজী শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি আরবী শব্দ যার অর্থ হল মুসলমান ধর্মযোদ্ধা। স্বধর্ম রক্ষার্থে যে-সমস্ত মুসলমান ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন—তাঁদেরও গাজী বলা হয়। অতএব দেওয়ানগাজী কোন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী, যিনি এতদ অঞ্চলে মুসলিম ধর্ম প্রচার কালে হিন্দুদের সাথে সংগ্রামে শহীদ হয়েছিলেন এমনও হতে পারে। পরবর্তীকালে তিনি লৌকিক দেবতা হিসাবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকসমাজে পূজা পেয়েছেন। চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লোককথায় দেওয়ানগাজীর উক্ত পরিচয়ের ইঙ্গিত মেলে।

আঞ্চলিকভাবে দেওয়ানগাজীকে দেবনাগাজী ও দেওনাগাজী বলে। 'দেবনাগাজী' শব্দটির মধ্যে হিন্দুত্বের স্পর্শ রয়েছে। যেমন দেব + না = দেবনা, তার সাথে গাজী শব্দ যুক্ত হয়ে দেবনাগাজী হয়েছে। অনুরূপভাবে বিপরীত লিঙ্গবাচক শব্দ হল 'দেওনী'। ঘুটিয়ারী শরীফে মোবারকগাজীর মাজারে 'দেওনী' নামক দেবীশিলা আছে। যার উপর মশলা গুঁড়া করে মোবারকগাজীর হাজতের রান্না করা হয়। এক্ষেত্রে 'দেওনী' শব্দটি দেবিনী শব্দ জাত। দেব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে এই শব্দটি লৌকিকভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেবনাগাজী শব্দটির মধ্যে দেবতা নয়, গাজী, এমন প্রচারের ইঙ্গিত থাকা বিচিত্র নয়। এরূপ ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে— দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত আটঘরা ও সীতাকুণ্ড গ্রামের সীমান্তে দেওয়ান গাজীর একটি মাজার আছে। এটি এক প্রাচীন ধ্বংস স্তূপের উপর

অবস্থিত। আনুমানিক আড়াইশো বছর পূর্বে মাজারটি স্থাপিত হয়েছিল বলে কথিত হয়, অথচ মাজারের চারিদিকে পাল ও সেন যুগের ইট ছড়ান আছে। বহু প্রত্নসামগ্রী এখান থেকে উদ্ধার হয়েছে, যা নাকি পাল, সেন, কুষাণ ও শুঙ্গ যুগের বলে প্রমাণিত। সম্প্রতি (জুন ১৯৯৬) এই মাজার সংলগ্ন পুকুর থেকে একটি বিষ্ণুমূর্তিও পাওয়া গেছে। লোকসংস্কৃতির গবেষক কালিচরণ কর্মকার সম্প্রতি আটঘরা গ্রামটি প্রাচীন অষ্টগৌড়া বলে প্রমাণ করেছেন।

দেওয়ানগাজীর মাজারের সেবাইত মতিউর রহমান ও আতিউর রহমানের সাথে সাক্ষাতকারে জানা গেছে এই উঁচু ঢিপির উপর প্রথমে এক ফকির এসে কুঁড়েঘর করে থাকতেন। লোকে তাঁকে ফকিরসাহেব, দেওয়ানসাহেব, দেবনাগাজী, দেওনাগাজী বা দেওয়ানগাজী বলত। তাঁর কাছে নিত্য বহু যাত্রী এসে তেলপড়া, জলপড়া ইত্যাদি নিয়ে রোগমুক্ত হতেন। তারপর সেই ফকির দেহরক্ষা করলে তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল এবং ইটের সাধারণ মাজার করা হয়েছিল। সেই থেকে এখানে যাত্রীরা আসাযাওয়া করেন, তেলপড়া, জলপড়া ইত্যাদি নেন, মানত করেন, রোগমুক্ত হন ও পুজাহাজত দেন। বর্তমানে এটিই দেবনাগাজী বা দেওয়ানগাজীর মাজার নামে পরিচিত। পূর্বে এই স্থানটি কবরডাঙ্গা রূপে ব্যবহৃত হত এবং এখনও হয়। বর্তমানে যে-মাজারটি দেখা যায় এটি ইদানিং (১৯৯৩) সংস্কার করা হয়েছে। তার পূর্বে এখানে শিবের মন্দিরের আদলে নির্মিত একটি মাজার (?) ছিল।[২] সেটির ভগ্নদশা বর্তমান গবেষক প্রত্যক্ষ করেছেন। উক্ত শিবমন্দির আকৃতির মাজারটি কে বা কারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। বারুইপুরের জমিদার বর্তমান চৌধুরীবাবুদের পূর্বপুরুষ শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী (?) পীরের নামে ৬-৭ বিঘা জমি নিষ্কর পীরোত্তর দিয়েছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্টে তার উল্লেখ আছে। আটঘরার মধ্যে ফাঁসিডাঙ্গা, দমদমা (উচ্চ ঢিপি) ও দেবনাগাজীর মাজারের স্থানটি সবচাইতে উঁচু। দেওনাগাজীর মাজারের আশেপাশে কবর খোঁড়ার কালে পাল ও সেন আমলের ইট থরে থরে সাজান অবস্থায় আছে তা দেখা যায়। সুতরাং দেওয়ানগাজী হিন্দুসংস্কৃতিজাত কোন দেবতা কিনা তা দেওয়ানগাজীর মাজারে ব্যবহৃত বস্তুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞাননিষ্ঠ গবেষণা আবশ্যক বলে বর্তমান গবেষক মনে করেন। লোকসংস্কৃতির গবেষক কালিচরণ কর্মকার অনুমান করেন যে, উক্ত মাজারটির সংলগ্ন স্থান একটি পুরাতন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। অতএব উল্লিখিত ধ্বংসস্তুপের উপর শিবমন্দিরের আদলে নির্মিত দেওয়ানগাজীর মাজারটি প্রাচীন কোন দেবমন্দির হওয়া বিচিত্র নয়, যা পরবর্তী কালে দেবনাগাজীর মাজাররূপে পূজিত হচ্ছে। দেওয়ানগাজীর মাজারের উত্তরদিকে প্রায় ঢিলছোড়া দূরত্বে সীতেমার থান অবস্থিত। অনেকে এই থানকে সতীমার থান বলেন। সীতেমাকে নিয়ে অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। যেমন সীতেমায়ের শঙ্খ-পরিধান, অনুষ্ঠানবাড়িতে বাসনপত্র দেওয়া ইত্যাদি। দেওয়ানগাজীকে নিয়ে প্রচলিত লোককথার মধ্যেই গাজীবাবা ও সীতেমার পরিচয়ের সূত্রটি নিহিত আছে বলে অনুমান করা যায়। কাহিনীটি নিম্নরূপ —

কোন এক অজ্ঞাত কারণে সীতেমার সাথে দেওয়ানগাজীর লড়াই বাঁধে। সীতেমার সৈন্যদের সাথে দেওয়ানগাজীর সৈন্যদের সে এক তুমুল লড়াই হয়। উভয় পক্ষের সৈন্য-

সামন্ত যথেষ্ট মারা পড়ে, কিন্তু দেওয়ানগাজীর সৈন্যদের হাতে সীতেমার যে-সমস্ত সৈন্য মারা পড়ে তারা পুনরায় জীবন ফিরে পায়। দেবীর মন্দিরের পিছনে জিওনকুণ্ড ও মরণকুণ্ড নামে দুটি কুণ্ড আছে (বর্তমানে এ দুটি মজে গেছে)। জিওনকুণ্ডর জল নিয়ে মৃত সৈন্যদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই এই অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এই খবর জানতে পেরে দেওয়ানগাজীর এক অনুগত সৈন্য গোধন বধ করে সেই ছুরি জিওনকুণ্ডতে স্পর্শ করামাত্র কুণ্ড অপবিত্র হয়ে অলৌকিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারপর যুদ্ধে সীতেমা হার সুনিশ্চিত বুঝতে পেরে দেওয়ানগাজীর সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সীতেমার মন্দিরের নিকট দেওয়ানগাজীর মসজিদ নির্মাণ হয় এবং এখানেই গাজীর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। সেই থেকে এটি দেওয়ানগাজীর মাজার নামে প্রচলিত। মসজিদের মধ্যে দেওয়ানগাজীর লাল শালু দিয়ে ঢাকা একটি কবর আছে। এটি অর্বাচীন কালের বলে কথিত হয়। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে আসেন, মানত করেন, গান হাজতাদি হয়।

দেওয়ানগাজী ও সীতেমার নামে প্রচলিত লোককথা হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতি ও আধিপত্যের লড়াইকে স্মরণ করায়। আসল ঘটনা যাই হোক না কেন, দেওয়ানগাজীর এই থানটি হিন্দু মুসলমানের মিলনক্ষেত্র। প্রতিবৎসর মাঘের শেষ ও ফাল্গুনের প্রথম শুক্লপক্ষের. পূর্ণিমা তিথিতে দেওয়ানগাজীর গান হাজতাদি হয়। বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা অবধি যাত্রীরা এখানে আসেন ও হাজত দেন বা প্রার্থনা করেন। যাত্রীদের অধিকাংশই হিন্দু রমণী। মুসলমান নরনারী নিতান্তই কম। সব বয়সের মহিলা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে মধ্যবয়স্কা ও বৃদ্ধা মহিলাদের সংখ্যা বেশি। দেওয়ানগাজীর মাজার-ঘরের জানালায় অসংখ্য ঢিল বাঁধা, এই ঢিল অধিকাংশই হিন্দুরমণীদের মনস্কামনাজ্ঞাপক স্মারকচিহ্ন। অনেক বেকার যুবক চাকুরি পাবার মানত করে দেওয়ানগাজীর থানে ঢিল বাঁধেন। মেলায় প্রায় হাজারখানেক পুরুষ ও মহিলা জমায়েত হন। দেওয়ানগাজীর মেলা দেখলে মনে হবে এটি হিন্দুর কোন লৌকিক দেবতার মেলা। কেবল মুসলমানী আদপ কায়দায় হাজতাদি হয়ে থাকে। বর্তমানে এই মাজারের খাদেম হলেন আতিউর রহমান। ভক্তগণ ধামা ভর্তি করে বা কাগজের ঠোঙায় বাতাসা, চিনির সন্দেশ, মঠ, পাটালী, নৈবেদ্য, কিছু ফুল, বাতি ও ধূপ নিয়ে এসে খাদেমের হাতে দেন। নৈবেদ্যর মধ্যে একটি কাগজে নাম লেখাও থাকে। তিনি সেই নৈবেদ্য মাজারের সামনে রেখে খানিকক্ষণ পরে তার থেকে অল্পকিছু প্রসাদ তুলে নিয়ে যাত্রীর নাম ধরে ফেরত দেন। ভক্ত নিজে বাবার মাজারের কোথাও ধূপবাতি জ্বালিয়ে দেন। মেলার দিন ছাড়া প্রতি শুক্রবার বাবার মাজারে বহু যাত্রী মোনাজাত করেন, হাজত দেন, ঢিল বাঁধেন, মানত চুকান। এক্ষেত্রে যাত্রীদের মধ্যে মুসলমান-পুরুষ ও নারী বেশি। কিছু বয়স্কা মুসলিম মহিলার সাক্ষাতকার নিয়ে জানা গেছে তাঁদের কোন রোগ হলে বাবার তেলপড়া বা জলপড়া মাখলে ও খেলে সেরে যায়, ডাক্তার দেখাতে হয় না। দেওয়ানগাজী সম্পর্কে তাঁদের ধারণা মুসলিম তত্ত্ব ঘেঁষা। তাঁরা বলতে চান, আমরা মানুষ, দেওয়ানগাজীও মানুষ, তবে দেওয়ানগাজী সিদ্ধপুরুষ, মালিক তাঁর কথা শোনেন। দেওয়ানগাজী দয়া করে আমাদের কথা মালিকের কাছে যদি জানান তাহলেই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে। এ

সম্পর্কে হিন্দু মহিলাদের সাক্ষাতকারে জানা যায় দেওয়ানগাজীই তাঁদের সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করে থাকেন।

দেওয়ানগাজীর মাজারে পূজা হাজত দেবার একটা বিশেষ লোকপ্রচলিত রীতি আছে। এখানকার এই অনুষ্ঠানে হাজত দেবার কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে থেকে হিন্দু পরিবারের শিশু ও মহিলাগণ পাড়ায় পাড়ায় মাঙন করেন। মায়েরা 'খড়ের কালি' গলায় বেঁধে দলবেঁধে বেতের পালি, বেতের খড়া বা ধামা, মালসা, সরা প্রভৃতি পাত্র নিয়ে মাঙন করতে বার হন। একে 'গলায় কুটো বেঁধে মাঙন' বলে। এক-এক বাড়িতে কমপক্ষে দু-তিনজন করে মহিলা বা শিশু মাঙন করতে যান। দলবেঁধে ব্যাপকভাবে এই মাঙনকে 'দেশপালা মাঙন' বলে। মহিলাগণ বিশেষত মায়েরা যখন মাঙন করতে বার হন তার পূর্বে তাঁরা এক স্থানে মিলিত হয়ে কোন নির্দিষ্ট পুকুরে (অথবা পৃথক পুকুরেও) স্নান করে খুব শুদ্ধভাবে জমায়েত হন। সেখান থেকে গলায় কুটো বেঁধে এক এক দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন পাড়া বা গ্রামের দিকে চলে যান। সারাদিন ঘুরে মাঙন করে সন্ধের আগে তাঁরা আবার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে এক জায়গায় মিলিত হন। এইবার যে চাল পয়সা সংগৃহীত হয় তা এক জায়গায় ঢেলে বা মিশিয়ে দোকানে বা হাটে বিক্রি করে যে পয়সা হয় তা সবাই মিলে ভাগ করে নেন। এবার এই পয়সার একটা অংশ স্থানীয় কোন লৌকিক দেব বা দেবীর (শীতলা, মনসা, বিবিমা পূজার জন্য রাখেন, একটি অংশ দেওয়ানগাজীর উত্তর দিকে অবস্থিত সীতেমার পূজার জন্য রাখেন। আর সিংহভাগটাই দেওয়ানগাজীর কাছে হাজতের জন্য রাখেন। মহিলাগণ সারাদিন উপবাসে থেকে মাঙন করা পয়সা ও তার সাথে কিছু নিজের পয়সা যোগ দিয়ে প্রথমে সীতেমার মন্দিরে পূজা দেন। তারপর দেওয়ানগাজীর মাজারে আসেন। দেওয়ানগাজীর মাজারে হাজত দেবার পর সেই প্রসাদ নিয়ে মাঙুনের দল এক সাথে মেলাপ্রাঙ্গণে গোল হয়ে বসে স্থানীয় ভাবে মুড়ি, আলুরচপ ইত্যাদি কিনে উপবাস ভঙ্গ করেন। বাবার প্রসাদে উপবাস ভঙ্গের পর তাঁরা যে যাঁর বাড়ীতে ফিরে যান।

দেওয়ানগাজীর মেলায় অনেক মহিলা ভক্ত 'দেশপালা মাঙন' করে ঢাক-ঢোল, বাঁশি বাজিয়ে পুরুষদের সাথে আসেন। সীতাকুণ্ডুর অদূরবর্তী ডেডাঙ্গী গ্রাম থেকে আগত (কাওরা সম্প্রদায়) একটি দলের সাথে কথা বলে জানা গেল তাঁরা তাঁদের বাপঠাকুরদার আমল থেকে মাঙন করে এইভাবে বাদ্যিবাজনা করে দলবেঁধে বাবার হাজত দিতে আসেন। সারাদিন তাঁদের কেউ উপবাসে থাকেন, কেঁউ বা পান্তাভাত খান। মানত করে যাঁদের মনস্কামনা পূরণ হয় তাঁরা এইদিন মানত চুকিয়ে যান।

দেওয়ানগাজীর পূজা বা হাজতকে 'দেশপালাপূজা' বলা হয়। কিছু মহিলার সাক্ষাতকার নিয়ে জানা গেছে তাঁরা দেওয়ানগাজীর হাজত দেন সামগ্রিক ভাবে গৃহের মঙ্গলের জন্য। সংসারের গরুবাছুর, হাঁস ছাগল প্রভৃতি গবাদি পশুর ভাল থাকা ও সংসারের সন্তানাদির রোগপীড়ামুক্ত থাকার জন্য তাঁরা প্রতিবৎসর বাবা দেওয়ানগাজীর মাজারে এসে হাজত দেন। কোন কোন মহিলা জানালেন সংসারে আঘা-বিঘে অর্থাৎ দুর্দৈব যাতে না হয় তার জন্য তাঁরা তাঁদের শ্বাশুড়ি পরম্পরায় এই পূজাহাজতাদি দিয়ে আসছেন। কোন কোন

মহিলার কাছে নতুন কথা শোনা গেল। তাঁরা সংসারের উক্ত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিঘ্ন থেকে মুক্তিলাভ, ভাল ফসলের জন্য ও বাৎসরিক পূজা হাজত দিতে প্রতি বৎসর এখানে আসেন। তাঁদের বিশ্বাস, সীতেমার থান ও দেওয়ানগাজীর মাজারের মাঝখানে যে বিশাল পুকুর আছে এই পুকুরের জল নিয়ে শনি মঙ্গলবার বা অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথিতে ফসলের ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে ফসল বেশি হয়। এমনকি আম-কাঁঠাল ইত্যাদি গাছে যদি ফলন না হয় বা ফুল হয় অথচ ফল ধরে না, এমন হলে এই পুকুরের জল তাতে ছিটিয়ে দিলে ফল বাঁধে এমত লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যদি গবাদিপশুর বাচ্চা না হয় তাহলে এই পুকুরে উক্ত বার বা তিথিতে জল নিয়ে পশুর গা ধুইয়ে দিলে সে সন্তানবতী হয় বা ভালো দুধ দেয়। এই পুকুরটির নাম সীতেমার পুকুর হলেও এটিতে বাবা দেওয়ানগাজীর মাহাত্ম্য আছে বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

সীতাকুণ্ডুর দেওয়ানগাজী খুবই জাগ্রত লৌকিক দেবতা। স্থানীয় লোকশিল্পীগণ এই গাজীবাবাকে নিয়ে পালাগান করেন। আটঘরার গোষ্ঠ মণ্ডল, বেগমপুর গ্রামের সুদিন মণ্ডল, সীতাকুণ্ডুর প্রবোধ ছাটুই, শাঁখারিপুকুরের জ্যোতিষ কয়াল, কুসুম্বার আবদুল জব্বার গায়েন প্রমুখ পালাগায়কগণ দেওয়ানগাজীকে নিয়ে পালাগান রচনা করে বহু আসরে গান করেছেন বলে জানান, কিন্তু দেওয়ানগাজীর নির্দিষ্ট কোন পালাগান নেই। তাঁরা যেসমস্ত পীরগাজীর গান করেন সেইসমস্ত পীরগাজীর গানের একটি 'ছক' নিয়ে কেবল দেওয়ান-গাজীর নাম দিয়ে বা দোহাই দিয়ে 'ভাঙটা' বা 'টন্‌সা' পদ্ধতিতে গান করেন। ফলে কারোর গানের সাথে কারোর গানের মিল থাকে না। দেওয়ানগাজীর আহ্বানমূলক গানের একটি নমুনাঅংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

"কোথা রইলে দেওয়ানগাজী বাপ এস আমার এই আসরে,
অধম সন্তানে ডাকে এস বাবা দয়া করে।
আসবে বলে আশা করে আছি বসে আসন করে,
তোমার করুণা বিনা এই আসরে জয় নাই আমার যে।
কে বুঝিতে পারে বাবা দেওয়ানগাজী বল মহিমা তোমার,
তব গুণ ব্যাখ্যা নিতে হেন সাধ্য আছে কার।
তুমি যে দয়াল অত্যন্ত কেবা বোঝে তোমার অন্ত,
মায়াতে আছে চূড়ান্ত তোমার অন্ত পাওয়া ভার।।

উদ্ধৃতাংশটি সত্যনারায়ণ পালার আসর বন্দনার ভাঙটা রূপ, যা দেওয়ানগাজীর নাম দিয়ে গাওয়া হয়। পালার কাহিনীতে দেওয়ানগাজী ও সীতেমার বিরোধ ও সখ্যতার তত্ত্ব পরিবেশিত হয়। বন্দনাদি গানে বা কাহিনী অংশে প্রচলিত সত্যপীরের পালা বা বিবিমার পালা ইত্যাদির অনুসরণ করা হয়। দেওয়ানগাজীর কোন মৌলিক পূর্ণাঙ্গপালার প্রচলন দেখা যায় না।

পাদটীকা

১। কালিচরণ কর্মকার, (সাক্ষাতকার)।
২। মতিউর রহমান ও আতিউর রহমান (সাক্ষাতকার)।

পীর ও গাজীপালা ঃ রক্তানগাজী

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানে বিশিষ্ট গাজী হলেন রক্তানগাজী। পালাগান আলোচনায় রক্তানগাজী পীর ও গাজীপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণায় পীর পীরাণী-গাজীদের নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। অসংখ্য পীর, গাজী, পীরাণীর কথা এ অঞ্চলে শোনা যায়। তাঁদের ঐতিহাসিক সত্যতা বা কাল্পনিকতা নিয়েই যত বিভ্রান্তি। তার কারণ মোবারকগাজী, গোরাচাঁদপীর, ভাঙ্গড়সুলতান, রক্তানগাজী প্রমুখ পীরের একাধিক মাজার লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে মূলের সন্ধান পাওয়া যেমনই কষ্টকর ও অনুমান নির্ভর তেমনি যুক্তি তর্ক সাপেক্ষ। অথচ ভক্তদের নিকট স্থানীয় দরগাই আদি বলে বিবেচিত হয়। প্রতি থানের পীর বা পীরাণীর রোগ শোক প্রতিকারের অদ্বিতীয় ক্ষমতা বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস। আর্ত মানুষের বিশ্বাসে এঁরাই বৈদ্যরাজের আসনে উপবিষ্ট। চব্বিশ পরগণায় এমনই এক রোগশোক প্রতিকারক পীর হলেন রক্তানগাজী।

রক্তানগাজী বিভিন্ন নামে পরিচিত। রক্তামগাজী, রক্তখাঁগাজী, রক্তানগাজী প্রভৃতি। তাঁর পিতার নাম সেকেন্দার শা, মতান্তরে এঁরা সাতভাই, আটভাই, আবার কেউ বলেন দশভাই। ভাইদের নামেরও ব্যতিক্রম আছে। ক্ষেত্রগবেষণাকালে বিভিন্ন ফকির ও সেবাইতদের নিকট হতে দশভাইয়ের যে নামের তালিকা সংগৃহীত হয়েছে তা হল— মোবারকগাজী, মুকগুধগাজী, কালুগাজী, কামালগাজী, বর্তনগাজী, দেওয়ানগাজী, শালারগাজী, রক্তানগাজী, আদানগাজী ও নেদান বা নেজানগাজী। কেউ বলেন রক্তানগাজী একজন সুফী সাধক। আবার কেউ মনে করেন ইনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক পীর। প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকসমাজ বহু পূর্ব থেকে আমাশয় ও রক্ত-আমাশয়ের রোগের এক দেবতা কল্পনা করেছেন। ইনি মুসলিম বিজয়কালে রক্তখাঁগাজী, রক্তানগাজী বা রক্তাম্‌গাজী বলে পরিচিত হয়েছেন। (রক্ত ও আম রক্ত-আমাশায় রোগের প্রধান লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়) রক্ত ও আম কথা থেকেই রক্তাম্ শব্দের উৎপত্তি। এর সাথে গাজী যুক্ত হয়ে রক্তামগাজী

বা রক্তানগাজী হয়েছেন। ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাসের 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে রক্তানগাজীর নাম পাওয়া যায় না। চব্বিশ পরগণা বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই পীরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রক্তানগাজী প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক ও লৌকিক দেবতা। কারণ রোগের নামের সাথে এই দেবতার নামের সম্পর্ক অতিশয় স্পষ্ট। জেলা চব্বিশ পরগণায় পূজিত অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবী বিশেষত যাঁদের নাম কোন না কোন রোগের নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাঁরা কাল্পনিক লৌকিক দেবতারূপে বিবেচিত হন।

জেলা চব্বিশ পরগণায় রক্তানগাজীর একাধিক থান আছে। এর মধ্যে জয়নগরের রক্তখাঁগাজী, পুঁড়ির আবাদের রক্তানগাজী, এড়াচির রক্তানগাজী বিশেষ প্রসিদ্ধ। জয়নগরে রক্তখাঁগাজীর যে-মাজারটি আছে এটিকে স্থানীয় মানুষ আদিথান বলতে চান। দঃ চব্বিশ পরগণার পুঁড়ির আবাদে যে দরগাটি আছে এখানে পীরের কোন মাজার বা ঘর নেই। একটি পাকুড়গাছের গোড়ায় ইটের উপর কয়েকটি ইট সাজিয়ে বেদীমত করা আছে। এটিকেই রক্তানগাজীর থান বলে কল্পনা করা হয়। ভক্তরা এখানে ধূপ বাতি দেন। কাঠা পাঁচেক জায়গার উপর থানটি অবস্থিত এখান থেকে রক্ত আমাশয়ের ঔষধ দেওয়া হয়। বাৎসরিক অনুষ্ঠান পূর্বে খুব জাঁকজমক সহকারে হত। এখন অর্থাভাবে তা সম্ভব হয় না। যেদিন ভক্তরা এখানে বাদ্যিবাজনা করে মানত চুকোতে আসেন সেদিনই থানটি সুসজ্জিত হয়। ভক্তদের কেউ এখানে মুরগি ছেড়ে দিয়ে মানত চুকোন, কেউ মুরগি জবাই করে রান্না করে হাজত দেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজপুরের নিকট এড়াচি গ্রামে রক্তানগাজীর একটি প্রাচীন দরগা আছে, এটি খুব জাগ্রত থান বলে লোকবিশ্বাস। চার দেওয়াল যুক্ত প্রায় ছয় ফুট উঁচু একটি ইটের ঘর আছে। এই দরগা কত দিনের তা কেউ বলতে পারেন না। বর্তমানে এই দরগার সেবাইত মোঃ কপিল মিস্তিরী। পিতা মোঃ ভূতনাথ মিস্তিরী। তাঁরা এই দরগার ৬-৭ পুরুষের সেবাইত। কবে থেকে এখানে রক্তানগাজীর আস্তানাবাটি গড়ে উঠেছে তা কেউ জানেন না। সেবাইত কপিল মিস্তিরী জানালেন এটি কমপক্ষে পাঁচশ বৎসরের পুরানো দরগা হবে। দরগার যে গৃহটি আছে তার ইট দেড়ইঞ্চি পুরু ও ছয়-সাত ইঞ্চি লম্বা। বর্তমানে এই পুরানো গৃহের বেশ কিছু সংস্কার করা হয়েছে। চার গম্বুজ যুক্ত এই ঘরের মধ্যে তিন থাক যুক্ত ইটের স্তূপ রক্তানগাজী বলে কল্পনা করা হয়। এর উপর লাল শালু দেওয়া আছে এবং তার উপর গাঁদাফুলের মালা আছে। এড়াচির রক্তানগাজীর থানে প্রতিবৎসর ১লা মাঘ বাৎসরিক মেলা হয়। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই মেলা চলে। ৬০-৭০ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। বেশির ভাগ যাত্রী এই সময় তাদের মনস্কামনা পুরণের মানত চুকিয়ে যান। এছাড়া প্রতি শুক্রবার পুজা হাজত হয়। অনেকে পীরের ছলন বাজনা বাজিয়ে আনেন। অবশ্য কোন ছলন এখানে রাখা হয় না। ছলনগুলির কোনটি দাঁড়ান, কোনটি বা ঘোড়ায় চড়া। মেলার দিন যাত্রীদের নিকট হতে বহু অর্থ সংগৃহীত হয়। অবশ্য কারোর নিকট কিছুই চাওয়া হয় না। ১৯৯৬ সালে প্রায় সতের হাজার টাকা দক্ষিণাস্বরূপ পাওয়া

গেছে। এছাড়া প্রত্যেকের পূজার ডালা থেকে দু-চারটে করে বাতাসা তুলে নিয়ে এই বৎসরই ১৬-১৭ মণ (প্রায় সাত কুইন্টল) বাতাসা সংগৃহীত হয়েছে বলে সেবাইত জানান। মেলা প্রায় শেষে সেবাইত সমস্ত ভক্তের উদ্দেশ্যে আল্লার নিকট প্রার্থনা করেন। কখনো যাত্রীদের নাম ধরেও আল্লার নিকট প্রার্থনা করেন।

রক্তানগাজীর ঐতিহাসিকতা থাক আর নাই থাক, এই গাজীর মাহাত্ম্য নিয়ে লোকসমাজে কোন সন্দেহ নেই। রোগশোক, সাংসারিক অশান্তি পরিহারক হিসাবে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারিত। রক্তানগাজী বিশেষত রক্ত-আমাশয় রোগ নিবারক লৌকিক দেবতা বলে পরিচিত কিন্তু মানুষ সবরকম রোগ-শোকের কবল থেকে রেহাই পেতে দরগায় আসেন। প্রধানত রক্ত-সংক্রান্ত রোগ-নিবারক লৌকিক দেবতা হলেন রক্তানগাজী, এই বিশ্বাসে আমাশয়, অর্শ, রক্তহীনতা, মেয়েলী অসুখ, মলরেচন, মুখে রক্ত ওঠা প্রভৃতি রোগে রক্তানগাজীর থানের সেবাইত-প্রদত্ত ঔষধ এক অব্যর্থ প্রতিরোধক বলে লোকসমাজের বিশ্বাস। এছাড়া মেয়ের বিবাহ, ছেলের চাকরি, সাংসারের অশান্তি দূরীকরণের জন্য মানুষ গাজীর দরগায় ঢিল বেঁধে মানত করেন ও মনস্কামনা পূর্ণ হলে গান হাজত দিয়ে যান। পীরের দরগার সেবাইত বিভিন্ন রোগ প্রতিকারের জন্য জলপড়া, তেলপড়া, ধূপপড়া, মাদুলি প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। রক্তানগাজীর হাজতের প্রধান উপকরণ হল শিরনী। এছাড়া আতপ দুধ রান্না, পিঠে, জিলিপি, মুরগির মাংস রান্না, ও অন্যান্য পাক করা খাদ্য বাবার হাজতরূপে দেওয়া হয়। অনেকে পীরের দরগায় মুরগি ছেড়ে দিয়ে মানত চোকান। কেউ এখানে জব করে রান্না করে অন্ন সহ থালায় বা সরায় নিয়ে পীরের হাজত দেন। মুসলমানেরা সাধারণত বাড়ি থেকে রান্না করে আনেন আর হিন্দুরা পীরের দরগায় রান্না করে হাজত দেন।

রক্তানগাজী সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন পালাগান এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নি। ক্ষেত্রগবেষণায় জানা গেছে কুসুম্বার আবদুল জব্বার গায়েনের পিতা ভূতই গায়েন রক্তানগাজীর পালা গাইতেন। এই তথ্য ভূতই গায়েনের পুত্র পালাগায়ক আবদুল জব্বার গায়েন স্বয়ং জানান। কিন্তু সে পালা আবদুল জব্বার গায়েন শেখেন নি। পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে সে গান লোপ পেয়ে গেছে। তিনি অন্য কাউকে শিখিয়েও যান নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গায়েনদের মুখে মুখে পালাগান প্রচারিত থাকায় এই পালার লিখিত কোন নিদর্শন নেই। যেসমস্ত পালাগায়ক বর্তমানে রক্তানগাজীর পালাগান করেন, তাঁরা কেউই রক্তানগাজীর নির্দিষ্ট কোন পালাগান করেন না। অন্য পালা 'ভাঙটা' করে 'টনসা' পদ্ধতিতে রক্তানগাজীর দোহাই দিয়ে গান করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু পালাগায়ক এই টনসা ও ভাঙটা পদ্ধতিতে বিভিন্ন পীরফকিরের গান করেন বলে জানা যায়।[১] ভাঙটা পদ্ধতির গানের বন্দনার একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল—

বন্দনা

বন্দিলাম রক্তানগাজী তুমি হও হজের হাজী
দীনজনে রাখ চরণতলে।

জাহির করিবার তরে আসিয়া দুনিয়াপরে
আপনি ক্রমেতে প্রকাশিলে।
বিরাট তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে লীলা
তুমি গাজী বড় দুনেদার।
তুমি কৃপা কর যারে ধন্য সেই ত্রিসংসারে
অনায়াসে হয় পারাপার।
তোমাতে ভকতি যার কোন দুঃখ নাহি তার
ধন্য তুমি এ দুনিয়াতে
রক্ত-আমাশয় আদি যত রোগশোক ব্যাধি
তব কৃপায় থাকে কুশলেতে।

ভাঙটা পালার উদ্ধৃত অংশটি মানিকপীরের পালাগানে বন্দনা অংশে আছে। কেবল মানিক-পীরের পরিবর্তে রক্তানগাজী ও প্রাসঙ্গিক কিছু শব্দ পরিবর্তন করে রক্তানগাজীর বন্দনা গাওয়া হয় এবং এর সাথে আসর অনুযায়ী কোন একটি পালার কাহিনী জুড়ে দিয়ে গায়কগণ রক্তানগাজীর পালাগান করেন।

প্রকৃতপক্ষে রক্তানগাজীর মূল যে পালা চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়, এই গানের একমাত্র শিল্পী ভূতই গায়েনের মৃত্যুর পর গাজীর পূর্ণপালার নিদর্শন লুপ্ত হয়ে যায়। ভাঙটা পালা হিসাবে বর্তমানে রক্তানগাজীর গান বা পালা পরিবেশিত হয়। —

পাদটীকা

'ভাঙটা পালা' বলতে বোঝায় বহুল প্রচলিত কোন লৌকিক দেবদেবীর পালা বা কাহিনী হতে কেবল সেই দেবদেবীর নাম বাদ দিয়ে মনোমত কোন বিশেষ দেবদেবীর নাম করে বা দোহাই দিয়ে গাওয়া পালা। অন্যপালাগান ভাঙিয়ে নতুন রূপ দিয়ে গাওয়া হয় বলে এইরূপ পদ্ধতিকে 'ভাঙটা' পদ্ধতি বলে। 'টনসা' পদ্ধতি হল আসরে উপস্থিত বুদ্ধিমত ভাঙটা পালা মূলগায়ক ও দোহারগণ উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। অন্যের কথার জের ধরে বা টেনে এই গান করা হয় বলে একে 'টনসা' পদ্ধতি বা 'টনসাপালা' বলে।

পীর ও গাজীপালা ঃ হজরত জাবের

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের আলোচনায় হজরত জাবেরের পালাটি পীর ও গাজীপালার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণায় পীর ও গাজী অবলম্বনে যেসব লৌকিক পালাগানের প্রচলন আছে তার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র ধরনের একটি শাখা ক্ষেত্রগবেষণায় পাওয়া যায়, যা মূলত সঙ্গীত-নির্ভর এবং ইসলামিক কাহিনী ভিত্তিক। এই শ্রেণীর পালাগান মূলত উত্তর চব্বিশ পরগণার ঐতিহ্যজাত বলে অনুমিত হয়। কারণ এই পালাগুলি যেমন উত্তর চব্বিশ পরগণা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে তেমন অন্যদিকে এগুলির গায়ন ও পরিবেশন রীতিও উত্তর চব্বিশ পরগণার বৈশিষ্ট্য যুক্ত। পালাগানের আসরে নাল, হারমোনিয়াম, কাঁচ ইত্যাদি থাকে। গায়ক একাই অথবা দোহারের সাহায্যও নিয়ে থাকেন। পালাটি উত্তর চব্বিশ পরগণায় অতিশয় জনপ্রিয়। অনেক ধর্মনিষ্ঠ সঙ্গীত-রসিক ব্যক্তি এই পালাটি ক্যাসেট করে নিয়েও শোনেন।

এ পর্যন্ত যতজন পীর-গাজীর পরিচয় পাওয়া গেছে, তাঁরা রোগ-শোক, বন্ধ্যাত্ব-মোচন, মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ইত্যাদি অলৌকিক মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন, কিন্তু 'হজরত জাবের' এই পালায় দেখা যায় নবীজির কৃপায় মৃত বাঁচে। তাঁর অপার করুণায় ভক্ত নিজেকে ধন্য মনে গনেন। এই পালার কাহিনীটি নিম্নরূপ—

হজরত জাবেরের বাড়িতে নবীজি আসবেন ও খানা খাবেন। সেইজন্য হজরত জাবের একটি বকরী মেরে নবীজির সেবা করবেন বলে মনে স্থির করলেন। তিনি তাঁর বড়বেটাকে নিয়ে বকরী মারতে গেলেন। বকরীর গলায় ছোরা চালিয়ে দিয়ে জাবের চলে আসেন। এমন সময় তাঁর ছোটবেটা সেখানে গিয়ে রক্তাক্ত বকরীকে দেখে দুঃখিত হন এবং বিলাপ করেন। তখন বড়বেটা বিরক্ত হয়ে ছোটবেটার গলায় ছুরি চালিয়ে দেন। ছোট বেটা তৎক্ষণাৎ মারা যান। তারপর বকরীর মাংস নিয়ে জাবেরের স্ত্রী যখন রান্না করছেন তখন বড়বেটা ছাদ থেকে পড়ে মারা যান। মা তখন মরা দুই বেটাকে ঘরের কোণে কম্বল চাপা দিয়ে রেখে

নবীজির জন্য পাক সমাপন করতে মনঃ সংযোগ করেন। যথাসময়ে নবীজি তাঁর লোকজন নিয়ে জাবেরের বাড়িতে এলেন। হজরত জাবেরও বাড়ি ফিরে এলেন। জাবের দুর্ঘটনাব খবর কিছু জানতেন না। তিনি তাঁর বিবিকে খানার ব্যবস্থা করতে বলেন। বিবি তাই কবলেন। মুখে শোকের লেশমাত্র নেই। এমন সময় জিব্রাইল এসে নবীজির কানে কানে বললেন জাবেরের বেটা ছাড়া খানা খেও না। তখন নবীজি জাবেরকে সেই কথা জানাতে ভেতর থেকে জাবেরের স্ত্রী কেঁদে উঠলেন ও আসল বৃত্তান্ত সব জানাজানি হয়ে গেল। এরপর নবীজির কৃপায় জাবেরের দুই মরা ছেলে বেঁচে উঠল। শুধু তাই নয়, নবীজি তাঁর লোকজনদের বকরীর কেবল মাস খেতে বললেন, হাড় চিবাতে নিষেধ করলেন, নবীজি পরে বকরীর হাড়গুলো একত্রিত করে বকরীকেও বাঁচিয়ে দিলেন। এরপর নবীজির নামে প্রার্থনা কবে ও গুণগান করে পালাগানটি শেষ হল।

এই পালাগানের আগাগোড়াই সুরের মায়াজালে মোড়া। বিভিন্ন তাল, লয় ও সুরে পালাগানটি গীত হয়েছে। গানটি কাহিনী-নির্ভর হলেও নাট্যধর্মী বা মঞ্চোপযোগী নয়। এছাড়া অন্যান্য পালাগানের সাথে যেমন হাজতাদির ব্যবস্থা থাকে এখানে তা অনুপস্থিত। কাওয়াল ঢঙের এই গানে কথা ও সুরই প্রধান। হজরত জাবেরের মূল পালাগানটি নিম্নরূপ—

হজরত জাবেরের পালা

জাবেরের বাড়িতে আজকে নবীজি খাবে খানা।
তাই বুঝি হজরত জাবের আনন্দে আর বাঁচে না।।
বকরী এক ছিল তাহার হজরত জাবেরের বাড়িতে।
বড়বেটাকে লয়ে যায় বকরী জবাই করিতে।।
বকরী জবাই করল জাবের বেটাকে সাথে লয়ে।
তখন তাহার ছোটবেটা ছিল না তো সেই ঘরে।।
বাজারেতে চলল জাবের খুশি খুশি মনেতে।
কি খবর হইল সেথা হজরত জাবেরের বাড়িতে।।
জবাই করা বকরী তখন জমিনে পড়ে ছিল।
জাবেরের ছোটবেটা সেই দৃশ্য দেখিল।।
বলে দেখনা ভাইজান বকরী কেমনে জবাই করিলে।
কেমন করে আব্বাজান বখরীর গলাতে ছোরা চালালে।।
বড় ভাই তখন তাহার ছোরা বাহির করিয়া।
জমিনেতে ফেলিয়া দিল গলায় ছোরা চালাইয়া।।
বকরীর ন্যায় ছোটবেটা জবাই হইয়া গেল।
বেটার রক্তের (?) স্রোতে আজ সারা জমিন ভাসিল।।

ছটফট করিতেছে বেটা লুটিতেছে ধূলাতে।
দাঁড়ায়ে রয়েছে বেটা ছোরাটি লয়ে হাতে।।
ছুটিয়া আসিল মায়ের নজরে যেই পড়িল।
হায় হায় করিয়া ছাতি ফাটাইতে যে লাগিল।।
মাকে দেখিয়া বেটা চড়িল কোঠার পরে।
হজরত জাবের তখন ছিল না ঘরে।।
একদিকেতে বকরী জবাই একদিকে বেটা কোরবানি।
জাবেরের বাড়িতে আজকে নবীজির মেহেরবানি।।
মাকে দেখিয়া বেটা ভয়েতে সে ছুটিল।
সেও বেটা ছাদ হইতে পড়িয়া মারা গেল।।
জাবেরের জিন্দেগীর সম্বল মাত্র দুটি চেরাগ তার।
বিনা ঝড়ে নিভিয়া যায় হইল সে অন্ধকার।।
নির্বাক হইয়া বিবি বোবার মত খাড়া রয়।
না পারে হাসিতে বিবি না পারে কাঁদিতে হায়।।
সারা জাহান জুড়িয়া যেন গোলসান হইল।
আল্লার দরগায় বিবি কাঁদিতে যে লাগিল।।

গীত ।। ওগো মোর আল্লা রহমান (?) রহিম এ কি গো তোমার অসীম করুণা।
আজ সাহস দাওনা হৃদয়েতে, মোর হাতে নবীজি খাবে খানা।
জানিতে যদি পারে গো তিনি খানা কি নবীজি খাবে গো তিনি?
দোজখে পড়ি গো হারাম হব যে আমি নবী যদি না খায় খানা।
আমি চাই না বেটা চাই নবীজির, নবী যেন মোর সব জানে না।।
বুকেতে বাঁধিল পাথর কঠোর করিল জান।
কারণ যে আল্লার হাবির তার ঘরে মেহেরবান।।
বাড়ির ভিতরে বিবি মরা দুই বেটা কে।
রাখিল জননী তাহার কম্বলের দ্বারা ঢেকে।।
স্বামী তার আসল ফিরে দেখেন জাবের গিন্নী।
দোনো বেটা মারা গিয়াছে কিছু জানালেন না তিনি।
জননী বেটার শোক ভুলিয়া গেল বিপুল।
নবীজি খাবেন খানা পাক করিতে মশগুল।।
স্বামীর সাথে বিবি তখন হাসিমুখে কথা কয়।
বিবি যে স্বামীর ওষ্ঠে কিছু নাহি দেয়।।

হজরত জাবের বাড়ি যে ফিরিল।
আকাশ বাতাস তারা যেন কাঁদিয়া যে উঠিল।।
মাতন করিল ও মরুর বালু ও ধূলিকণা।
আছাড় খাইয়া বলে ওরে জাবের শোন না।।
বাগিচার ফোটা ফুল দুটি ছিঁড়িয়া যে পড়িয়াছে।
তোর আর মোর চেরাগ নিভিয়া যে গিয়াছে।।
আব্বা বলিয়া তোর আর কেহ নাহি ডাকিবে।
কাদামাটি মেখে আর তোর কোলে নাহি চড়িবে।।
নির্মল নবীজি এলেন আর এলেন কত লোক।
নবীকে দেখিয়া বিবি ভুলিয়া যায় বেটার শোক।।
বিবিকে হজরত জাবের হুকুম দিলেন তখনি।
মোস্তফার লাগি খানা বাহির কর এখনি।।
হুকুম পাইয়া বিবি বাহির করিল খানা।
মোস্তফার সামনে খানা হাজির হল দেখনা।।
জিব্রাইলের পরে আল্লা অহি নাজেব হইল।
জীবরিল আমিন আসিয়া নবীর কানে কানে কহিল।।

গীত।। শোন শোন নূর নবী মোর কথা শোন না।
জাবেরের দুই বেটা ছাড়া খানা খেও না।।
খুশি হবে আল্লা ও সাহেব মনিয়া।
জাবেরের দুই বেটা ছাড়া খানা খেও না।।
আল্লা রহিম রহিল আমার পরে।
বলি ও নবীজি তোমার গোফুরে।।
আল্লার হাতের শোন নবীজি ভুলে যেও না।
জাবেরের দুই বেটা ছাড়া খানা খেও না।।
জিগরী আমিন জের গায়েব হইল।
নবীজি জাবেরকে তখন বলিল।।
শোন ও জাবের তুই লাল আন না।
তব লাল ছাড়া আর খানা খাব না।।
শোন ও জাবের আমার কথা শোন না।
তোমার দুই বেটাকে ছাড়া আমি খানা খাব না।।
জাবেরের আগে জবাব দেয় গিন্নী মহল হতে।
খেলতে গেছে তারা খানা খান মোস্তফা আপনি।।

তাদেরকে ছাড়া খাইব না নবী যখন বলিল।
জাবেরের বিবি তখন কাঁদিয়া যে উঠিল।।
একথা বলিলেন নবী করি কি এখন উপায়।
মারা গিয়াছে লাল কোঙ (?) ঢাকা আছে ঘরের কোণায়।।
এই কথা বলিয়া বিবি ছাতি ফাটাইতে লাগিল।
বিনা মেঘে বজ্র যেন জাহানেতে পড়িল।।
নবীজি তখন আবার যায় অন্দরমহলে।
দেখিল কম্বলে ঢাকা জাবেরের মরা ছেলে।।

মাতন ।। আল্লার দরগায় হাত তুলিয়া কত কান্না কাঁদিল।
বিসমিল্লা বলিয়া জিন্দা তাদের করিল।।
দুই বেটা জিন্দা হইল নবীজির দোওয়া হতে।
জিন্দা করিয়া খানা খাওয়াইলেন নিজের সাথে।।
বাকী যারা খায় নবীজি করল মানা।
গোস্ত খাও হাড্ডিতে কামড় তোমরা দিও না।।
রান্না করা হাড্ডি যত এক সাথে জমা করিল।
বকরীকে দীনের নবী জিন্দা দেখ করিল।।
জান্নাত হতে ফেরেস্তারা মার হাবামার হাবা গায় (?)।
অধীন আবদুল যে কলম ধরিয়া কয়।।

গীত ।। ভুল না মুসলমান ভুলনা।
ত্রিভুবনেরও প্রিয় নবীর নাই তুলনা।।
মরা বেটা জিন্দা করে খাওয়ায় যে খানা .... ।
আরবের ঘরে ঘরে প্রচার হয় নবীজি মরা ছেলে জিন্দা যে করিল।
আবুবককার সিদ্দিক আলি ওসমান ছুটিয়া নবীর কাছে আসিল।।
মনে হইল তারা তিনজনা ত্রিভুবনের প্রিয় নবীর নাই তুলনা।
মরা বেটা জিন্দা করে খাওয়ালো খানা ... ।।
মুরীদ হইল নবীজির কাছেতে জাবের জাবেরের বিবি দুজনে।
বুকের মানিককে বুকে পাইয়া খুশি হয় মনে আর প্রাণে।।
নবীজির তরে তারা হয় দিবানা-ত্রিভুবনের প্রিয় নবীর নাই তুলনা—
পীরের জপমালা গলায় পরিয়া আকুল করি যায় চলিয়া.
বলিও সেইখানে আর মাঠে ময়দানে তকবীর খানি লব শুনিয়া।।
পীরের চরণমালা করি সাধনা ত্রিভুবনের প্রিয় নবীর .... ভুলনা।—

হজরত জাবেরের পালাগায়ক একাধিক। আবদুল ফকির (কাওয়াল, পাটকেলপোতা, চন্দনেশ্বর) এই পালাটি গান করেন নিজস্ব সুরে। তিনি বাড়ি বাড়ি গইলেগান গেয়ে বেড়ান। সেই সাথে স্থান বিশেষে অনুরোধ করলে জাবেরের পালাটিও গান করেন। এছাড়া কোন পীরফকিরের দরগায় কাওয়ালগানের আসর বসলে সেখানে এ পালাটি অবশ্য গান করেন বলে সাক্ষাতকারে জানান। হজরত জাবেরের আর একজন বিখ্যাত পালাগায়ক হলেন উত্তর ২৪ পরগণার বকজুড়ী গ্রামের রফিকুল ইসলাম। গ্রামটি হাড়োয়া থানার অন্তর্গত, খাড়ুবালা পোস্ট অফিসের অধীন। রফিকুল ইসলামের বড়দাদা শহীদুল ইসলামও জনপ্রিয় পালাগায়ক ও কাওয়ালদের মধ্যে অন্যতম। এঁরা দুইভাই হজরত জাবেবের পালাগান করেন এবং ইসলাম ধর্মামাদী সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতাদের অনুরোধে এই গানের অনেক ক্যাসেট করে দিয়েছেন। রফিকুল ইসলাম নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করেন। তাঁর সাথে নাল, কাঁচ, করতাল ইত্যাদি বাজিয়ে সহযোগিতা করেন তাঁর সন্তানেরা। বলা বাহুল্য সাক্ষাতকারের সময় তাঁর সন্তানদের বয়স পনেরোর নিচে। অথচ তাদের পারদর্শিতা মনোমুগ্ধকর। ক্ষেত্রগবেষণা কালে হিন্দু লোকশিল্পীর নিকট হজরত জাবেরের পালাগানের সন্ধান মেলেনি।
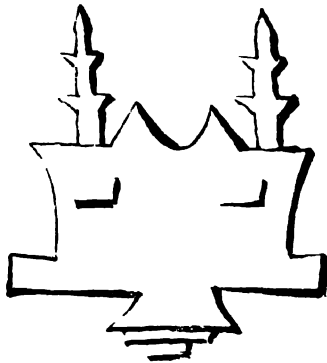
অষ্টম অধ্যায়

পালাগায়ক ও পালাকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অখণ্ড চব্বিশ পরগণায় বহু পালাগায়ক আছেন, যাঁরা লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগান গেয়ে জীবিকা অর্জন করেন। পালাগানের ফাঁকে কৃষিকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্যও করেন। এই সমস্ত পালাগায়কের অধিকাংশই চব্বিশ পরগণার নিম্ন-বর্ণের হিন্দু অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, এঁদের বেশির ভাগই কাওরা, বাগদী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁরা সমাজের বর্ণহিন্দুদের চক্ষে এমনিতেই 'পিরুল', তার উপর পীর, বিবি, গাজী প্রমুখ দেবদেবীদের গান গেয়ে পাকাপাকিভাবে পিরুল হয়েছেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজের কাছে এঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র। বর্তমানে এঁরা সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেলেও অর্থনৈতিক দুরবস্থার তেমন উন্নতি ঘটাতে পারেননি। চব্বিশ পরগণায় অসংখ্য পালাগায়কের দল আছে। প্রতি দলে কমপক্ষে ৭-৮ জন লোক থাকেন। লোকশিল্পীদের যে বর্ণনা নিম্নে উল্লিখিত হয়েছে তা ঐ বিপুল সংখ্যক শিল্পীদের সামান্য এক অংশমাত্র। তবুও প্রধান প্রধান যে-সমস্ত দল এই অঞ্চলে পালাগান করেন সেই দলের পরিচালক ও মূলগায়কের সাথে সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে যে তথ্যসমূহ পাওয়া গেছে তাইই সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এই অংশে কয়েকজন প্রতিভাবান পালাকারের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। এঁদের অনেকেই পালাগান লিখে নিজে আসরে গান করছেন বা অন্য গায়কদের দিয়ে গান করাচ্ছেন। নিম্নে এই সমস্ত পালাগায়ক ও পালাকারদের গানের পদ্ধতি, আসর রচনা ও জীবনের কিছু ঘটনা উপস্থাপন করা হল।

পালাগায়ক : বনমালী মণ্ডল

গ্রাম - কাঁকুড়িয়া, পোঃ- খলিসাথী, জেলা - উঃ ২৪ পরগণা

উত্তর চব্বিশ পরগণার বহু পরিচিত পালাগায়ক হলেন বনমালী মণ্ডল। বনমালী মণ্ডলের

একটি মনসা গানের দল আছে। দলে ৫-৬জন গায়ক-যন্ত্রী থাকেন। তাঁদের গানের ধরন সম্পূর্ণ পৃথক, যা চব্বিশ পরগণার অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় দেখাই যায় না। এটি উত্তর চব্বিশ পরগণার পালাগানেরই বৈশিষ্ট্য বলা যায়। বিশেষত মনসা পালাগানের দলের মধ্যে যে-বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয় তা হল—এই দলে পাঁচজন গায়ক ও পাঁচজন যন্ত্রী থাকেন। পাঁচ জন গায়কের মধ্যে একজন মহড়াগায়ক অপর চারজন ঘোষা। 'ঘোষা' শব্দের অর্থ দোহার। মূলগায়ক মনসার ভাসান বইটি ধরে একটি করে লাইন সুর করে গান করেন আর বাকী দোহারগণ সেই সুরে সুর ধরে গান করেন। এইভাবে বইটি শেষ হতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মত সময় লাগে। এর মধ্যে নাওয়াখাওয়া ও বিশ্রামের সামান্য সময় বাদ দিয়ে টানা গান চলে। যন্ত্রীদের কাছে থাকে হারমোনিয়াম, খোল, করতাল, ডাইনে তবলা, আনন্দ লহরী (গুপগুপী) ইত্যাদি। এই অঞ্চলে এই পদ্ধতিতে গানের চলন অধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে লোকনাট্যের ধারায়ও মনসার পালাগান গীত হয়।

ভাদ্র মাসে রান্নাপূজার দিন মনসা গানের আসর ব্যাপকভাবে বসে। এছাড়া মানসিক গান হিসাবে ঘোষাগানের দলের বেশি ডাক পড়ে। যেদিন যে-পরিবারে মনসার পালাগান শুরু হয় সেই নায়েক-পরিবারে নিরামিষ খাওয়ার বিধি আছে। এছাড়া এই গানের আসরে আর একটি বিশেষ নিয়ম পালন করা হয়। সেটি হল ঘটবসানো। মূলগায়ক ঘটবসান। ঘটমুখে আম্রপল্লব, তার উপর একটা গামছা, আলাদাভাবে চালের ডালা ও পূজার ফলমূল থাকে। গানশেষে মূলগায়ক এই ঘট তুলে নায়েকের হাতে দেন এবং নায়েক তা নিয়ে গোলার ধারে বাস্তুঠাকুরের নিকট রাখেন। অনেকে মনসার নামে দুধ, কলাপাকা, বাতাসা মানত করেন ও পূজা দেন।

বনমালী মণ্ডল সাক্ষাতকারে জানান তাঁর দলের লোকজনের প্রত্যেকেই এই পালাগান করা ছাড়াও কৃষিকর্ম বা ব্যবসাবাণিজ্যের সাথে যুক্ত আছেন।

পালাগায়ক : শহীদুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম

গ্রাম - বকজুড়ি, পোঃ- খাড়ুবালা, ভায়া- বসিরহাট, থানা-হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগণা

উত্তর চব্বিশ পরগণার খ্যাতিমান লোকশিল্পী হলেন শহীদুল ইসলাম ও তাঁর ভাই রফিকুল ইসলাম। মুসলমানী কেচ্ছাকাহিনী তাঁরা কাওয়ালীর ঢঙে গেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠানেও এঁরা গান করেছেন। বহু বিদগ্ধজনের প্রশংসা-পত্র তাঁদের কাছে আছে। লোকশিল্পী শহীদুল ও রফিকুল ইসলাম যে-সমস্ত গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তা নিম্নরূপ—

১। বড়পীরসাহেবের পালা
২। পীরগোরাচাঁদ
৩। মোবারকগাজী
৪। দাতা মেহবুব শা
৫। শামসুদ্দীনবাবা
৬। মাদারপীর
৭। ফতেমাবিবি
৮। ওলাবিবি

৯। খাজাসাহেব
১০। পীর একদিলশা
১১। ভাঙ্গড়-সুলতান
১২। দানশাবাবা
১৩। মানিকপীর
১৪। হজরত মহম্মদ (নবী)
১৫। হাসানহুসেন
১৬। বনবিবি
১৭। শীতলা (চন্দ্রকেতুর পালা)
১৮। সত্যপীর

শহীদুল ও রফিকুল ইসলামের পরিবারে পালাগান ও কাওয়ালগানের চর্চা বংশানুক্রমিক। তাঁর পিতা গোলাম ওয়াজেদ পালাগান করতেন। তিনি এই গানের মাস্টার ছিলেন। খড়ম্বা গ্রামের বসন্তবাবুর নিকট হতে গোলাম ওয়াজেদ গান শিখেছিলেন। শহীদুল ইসলামের নিকট হাতেলেখা 'পুঁথি' আছে বলে জানান। তাঁদের ছেলেরাও বাজনায় খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছে। রফিকুলবাবুর বছর বারো বয়সের একটি ছেলে তাঁর গানে নাল বাজায়, তাঁর বছর দশেকের একটি ছেলে দুটি কাঁচ নিয়ে ভাঙ্গাখোলা বাজানোর মত ধরে অপূর্ব দক্ষতায় বাজায়। বর্তমানে রফিকুলবাবুর গানের দল তাঁর বাচ্চাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে, বাইরের লোক তেমন ডাকতে হয় না বলে জানান।

শহীদুলবাবু ও রফিকুলবাবুর আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়। শহীদুলবাবুর ছয় ছেলে ও তিন মেয়ে। গানবাজনা ও চাষবাসের উপর সংসার নির্বাহ হয়। গানবাজনা করে বছরে হাজার দশেক টাকা আয় করেন। তিনি হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতির উপর গান-রচনা করে বিভিন্ন আসরে গান করেন। তাঁর চাঁছা-ছোলা সুন্দর কণ্ঠের গান মুহূর্তে শ্রোতাকে মোহিত করে। এই অঞ্চলের এই দুই নামী লোকশিল্পী খুব খেদের সাথে জানান, "আমাদের মত অনেক লোকশিল্পী আর্থিক কষ্টের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। সরকার আমাদের কথা ভাবে না।"

পালাগায়ক : বাসুদেব মণ্ডল (২৮)

গ্রাম ও পোঃ- নলকোঁড়া (হাটগাছা), ভায়া-বালির হাট, থানা-সন্দেশখালি, জেলা - উত্তর চব্বিশ পরগণা

বাসুদেব মণ্ডল দুলালকৃষ্ণ মণ্ডলের সুযোগ্য শিষ্য। ১৪-১৫ বৎসর বয়স থেকে গানবাজনার লাইনে আছেন। অবসর সময়ে চাষবাসের কাজ করেন। তিনি শীতলামঙ্গল গান গেয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। শীতলামঙ্গল এই পালার সাথে পূজাচারকে জড়িয়ে অর্থাৎ কিছু সংস্কার পালন করে তিনি এটি লোকনাট্যের ধারায় আসরে পরিবেশন করেন।
বাসুদেব মণ্ডল যে সমস্ত পালাগান করেন তা নিম্নরূপ —

১। শীতলাপালা
২। লক্ষ্মীর বনবাস
৩। দুর্গার শঙ্খ-পরিধান
৪। বিনন্দ রাখাল

শীতলামঙ্গলের ৭টি পালা, যথা—শীতলার জন্ম, স্বর্গ, নিমাইজগাতি, বিরাট, হেম- ঘট, গোকুলপূজা ও চন্দ্রলতা পালা। দুটি বই থেকে তাঁরা এই পালাটি তৈরি করেছেন বলে জানান।

যেমন — (১) নিত্যানন্দ চক্রবর্তী প্রণীত 'শীতলামঙ্গল'
(২) তারাপদ চাঁদ অধিকারী প্রণীত 'শীতলামঙ্গল'

লক্ষ্মীর পালাগান ৭টি, এর সম্পূর্ণটাই বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র বইয়ের অন্তর্গত। এছাড়া তিনি কালিমঙ্গল (গুরু দুলাল মণ্ডলের লেখা), সারদামঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, রামায়ণ—অযোধ্যা কাণ্ড থেকে ২ পালা, সতীমায়ের বৈঠক প্রভৃতি পালা গান করেন। সতীমায়ের বৈঠক নদীয়ার ঘোষপাড়া মাঠে গাওয়া হয়। ঘোষপাড়ার দোল-উৎসব উপলক্ষে এই গান চলে।

বাসুদেব মণ্ডল এখন কিছু শিষ্য করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর দুইজন শিষ্য দুটি দল করে আসরে গাইছেন। তিনি চুক্তি করে গান শেখান, অর্থাৎ আসরে গান গাওয়ার উপযুক্ত করে দিলে চুক্তিমত টাকা নেন। তাঁর এইরকম দুজন শিষ্য হলেন মণীন্দ্রনাথ মাল ও নবীন নস্কর।

নলকোঁড়া গ্রামে ও আশপাশের অঞ্চলে শীতলামঙ্গল গানের বহু শিল্পী আছেন বলে বাসুদেববাবু জানান। তাঁরা হলেন—অরুণ মণ্ডল, বিদ্যা পাত্র, সন্ন্যাসী পাত্র, শঙ্কর দাস, শম্ভু দাস, দুলাল মণ্ডল প্রমুখ।

পালাগায়ক : দুলালকৃষ্ণ মণ্ডল (৪৫)

গ্রাম - ১০ নং দঃ কানমারী, পোঃ- কানমারী, ভায়া - ন্যাজাট,

থানা- সন্দেশখালি, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগণা

দুলালকৃষ্ণ মণ্ডল উত্তর চব্বিশ পরগণার পালাগানের সম্রাট। তিনি নিজের নাম লেখেন পালাসম্রাট দুলালকৃষ্ণ মণ্ডল। তাঁর পিতার নাম নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রায় তিরিশ বছর বয়স থেকে তিনি পালাগান করছেন। তাঁর প্রথম গুরু উদ্ধবচন্দ্র দাস (১৩নং দক্ষিণ কানমারী), দ্বিতীয় গুরু জগন্নাথ দাস (১০ নং দক্ষিণ কানমারী), তৃতীয় গুরু নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)। বর্তমানে তাঁর ২২৫জন শিষ্য। এঁদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন বাসুদেব মণ্ডল, বিদ্যাধর পাত্র, শম্ভু বিশ্বাস, শঙ্কর মণ্ডল, মণীন্দ্রনাথ মাল প্রমুখ।

দুলালকৃষ্ণ মণ্ডলের গানবাজনাই পেশা। হাতে তানপুরা নিয়ে গান করেন। একহারা চেহারা, বাউল চুল। তিনি গুরুগিরি করেন অর্থাৎ দীক্ষা দেন। এইভাবে বহু শিষ্য তাঁর আছে। সব মিলিয়ে কোনরকমে সংসার চলে। প্রথমবার যখন তাঁর বাড়ি যাই (১৯৯২) তখন ঘর বলতে নিতান্তই একটা কুঁড়ে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার মত অবস্থা। দ্বিতীয়বার গিয়ে (১৯৯৪) দেখি, একটি নতুন ঘর করেছেন। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। তিনদিকে দাবা। অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে। তাঁর তিন ছেলে, চার মেয়ে। ১৯৭৭ সালের ভাদ্র মাসের বন্যায় তাঁর ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁর বাবার মৃত্যুও ঘটে। ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যাবার পর বাগবাজারে নেপালপদর মাঠে দশ বৎসরকাল কাটিয়েছেন। সেইসময় তাঁর ভিটা বিক্রি হয়ে যায়। পরে তিনি ফিরে এসে তা উদ্ধার করেন। বর্তমানে তিনি তাঁর পুরান বাস্তুতেই ঘর বেঁধে আছেন।

দুলালমণ্ডল যে-সমস্ত পালা ও গান করেন তা নিম্নরূপ —

(১) শীতলামঙ্গল - ৪৪ খানা পালা (?), (২) বিদ্যাসুন্দর - ভারতচন্দ্র (গীতিনাট্যের আকারে), (৩) সারদামঙ্গল - বিহারীলাল চক্রবর্তী (যাত্রার ঢঙে), (৪) লক্ষ্মীর বনবাস - কিংকর কবি (যাত্রার ঢঙে), (৫) গাজি কালু ও চাম্পাবতী (গীতিনাট্য), (৬) চণ্ডীমঙ্গল, (৭) মনসামঙ্গল, (৮) রামায়ণ - অশ্বমেধ যজ্ঞ (লক্ষ্মণের শক্তিশেল), (৯) বনবিবির পালা (দুখের পালা), (১০) মানিকপীর (কিনু ঘোষের পালা), (১১) বৈঠকীগান (দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান)।

দুলালকৃষ্ণ মণ্ডল মেদিনীপুর থেকে তালপাতার শীতলামঙ্গলের পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেটি কিছু নষ্ট হয়েছে, কিছু আছে বলে জানান। দুলালকৃষ্ণ মণ্ডল সরকারি সাহায্য পেলে লোকসংস্কৃতিচর্চা বিষয়ে আরও উন্নতি করতে পারেন বলে জানান। তাঁর এখন একমাত্র লক্ষ্য নবদ্বীপের টোল থেকে কীর্তন শিক্ষা করা।

পালাগায়ক : জাফরআলি মণ্ডল

গ্রাম - বুজরুকদীঘা, পোঃ- শ্রীকৃষ্ণপুর, থানা- হাবড়া, উঃ ২৪ পরগণা

উত্তর চব্বিশ পরগণার একজন খ্যাতিমান লোকশিল্পী হলেন জাফর আলি মণ্ডল (৩১)। পিতা আবদার আলি মণ্ডল। লৌকিক দেবদেবী-কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগান গেয়ে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। বেশির ভাগ পালাগান তিনি গীতিনাট্যের ধারায় গান করেন। শৈশবে মাতা-পিতা হারানোর ফলে লেখাপড়া আদৌ শিখতে পারেন নি। খুবই অল্প বয়স থেকে লোকায়ত পালাগানের শিল্পীদের দলে যোগ দিয়ে তিনি নিজেই এখন প্রতিষ্ঠিত লোকশিল্পী। আড়বাঁশী, ঢোলক, দোতারা, হারমোনিয়াম, ক্যাসিও বাজনায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। আসরে বসে মুখে মুখে গান বেঁধে সুর করে গেয়ে দিতে পারেন। তাঁর চমৎকার গানের গলা। মানিকপীর, এরেনবাদশা, জামালবাদশা, কিনুগরীব, কানু ঘোষ, সাতবিবি, শীতলা, প্রভৃতি পালাগান করেন। এছাড়া যাত্রাগান, দেহতত্ত্বের গান, ভাটিয়ালী, লালন ফকিরের গান প্রভৃতি গেয়ে থাকেন। তিনি নিজে অনেক গানের শিষ্য করেছেন। তাঁর বড় কৃতিত্ব—প্রতিবন্ধীদের (অন্ধ) পালাগান শিখিয়ে একটি পৃথক দল গঠন করেছেন। এই দলের মূলগায়ক হলেন মঃ কয়েশ আলি মণ্ডল। বছরে ৭-৮ মাস প্রায় প্রত্যেক রাতে তাঁদের গানের আসর বসে। আট জনের দলে আসর পিছু কমপক্ষে প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা পান। তাঁর তিন সন্তান ও এক বিবি নিয়ে কোনরকমে দিন চলে যায়।

পালাগায়ক : অনিলকুমার হাজরা (৪২)

গ্রাম ও পোঃ - বেগমপুর, থানা- বারুইপুর, জেলা- দঃ পরগণা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একজন স্বনামধন্য পালাগায়ক হলেন শ্রী অনিলকুমার হাজরা। পিতা নগেন্দ্রনাথ হাজরা। সংসারের অভাব অনটনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাটি কোনরকমে শেষ

করেন। ১৪-১৫ বৎসর বয়স থেকে গ্রামের যাত্রাদলে যোগ দেন। সেই সাথে গোষ্ঠগানও করতেন। গোষ্ঠ গানে অনিলবাবু রাধা সেজে গাইতেন। এতে তাঁর খুব সুনাম হয়। এরপর ১৮-১৯ বৎসর বয়স থেকে পাঁচালদলে যোগ দেন ও নিজে মূলগায়ক হিসাবে দল গঠন করে গান শুরু করেন।

অনিল হাজরার পাঁচালগানের প্রথম গুরু হলেন অনন্ত হালদার (কচিরাম)। তাঁর নিকট থেকে তিনি বিবিমার স্বরূপচাঁদের পালাটি সংগ্রহ করেছিলেন। অনন্তবাবু তাঁর শ্বশুর রামনগরের কালিপদ মণ্ডলের নিকট হতে পালাটি সংগ্রহ করে অনিল হাজরাকে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে অনিলবাবুর দলে হারমোনিয়াম বাজান।

অনিল হাজরার দ্বিতীয় গুরু আটঘরার সনাতন ঘোষ। তিনি একজন পালাগায়ক। তাঁর গুরু সীতাকুণ্ডুর পাঁচকড়ি নস্কর। পাঁচকড়ি নস্করের নিকট থেকে তিনি মানিকপীরের তিনখানা পালা, গাজীসাহেবের পালা ও বনবিবির পালা সংগ্রহ করে অনিল হাজরাকে দিয়েছিলেন। এছাড়া কেফায়েতপুরের মোহন মণ্ডল, আটঘরার ফটিক মণ্ডলের নিকট থেকে মনসা ও শীতলার পালা সংগ্রহ করে অনিলবাবুকে দিয়েছিলেন। মোহন মণ্ডল ফটিক মণ্ডলের দলে ঘটকালির পার্ট করতেন (ঘটকালি, দোহার, দেওড়া বা ঘোষা)।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পালাগায়কের দল খুব বেড়ে যাওয়ায় অনিল হাজরার গানের আসরের সংখ্যা ও উপার্জন অনেক কমে গেছে। পূর্বে বৎসরে ৭০-৮০টি আসর গাইতে হত। এখন ৪০-৪৫টি আসর গাইতে হয়। বছরে সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ৩-৪ হাজার টাকা আয় হয়। তাঁর দলের আর পাঁচজন লোকের একই পরিমাণ উপার্জন হয়। যা উপায় হয় সবাই সমানভাবে ভাগ করে নেন। হারমোনিয়াম, করতাল, খোল, ঝাঁঝ, কাড়ানাকাড়া, ডিগি তবলা, আরওবাঁশী, ফ্লুট ও কর্ণিট প্রভৃতি যন্ত্র নিয়ে তাঁরা গান করেন। অনিলবাবুর বর্তমানে সহযোগিগণ হলেন সুবর্ণ মণ্ডল, সুধাময় হাজরা, গোরাচাঁদ পাঠক, কালিপদ মণ্ডল ও অরুণকুমার মণ্ডল। প্রতেকেই খুব কুশলী শিল্পী। তাঁরা এক-একজন একাধিক যন্ত্রে নিপুণ। সুবর্ণ মণ্ডল ও সুধাময় হাজরা কমিক্ পরিবেশনে দক্ষ। তাঁদের জন্য তাঁর দলের চাহিদা খুব বেশি।

অনিল হাজরা মনসার পালা তিনভাগে ভাগ করে তিনদিন গান করেন। মানিকপীরের তিনখানা পালা একদিন গান করেন, এছাড়া শীতলা, বিবিমা, প্রভৃতি পালা একদিন করে গান করেন। শ্রোতাদের চাহিদামত তিনি বড়পালা-গুলো ছোট করে একদিনে দু তিন খানা পালাগান করেন আবার একদিনে একটা পালা বড় করে গান করেন। অনেক পালাগায়ক কোন একটি পালা ভাঙটা করে নাম ভাঁড়িয়ে অন্য নাম দিয়ে যেকোন ঠাকুরদেবতার নাম করে গেয়ে থাকেন, কিন্তু অনিলবাবু তা করেন না। তিনি এটা অন্যায় বলে মনে করেন।

অনিল হাজরা গান করার সময় বিশেষত মহিলার পোশাক পরে গান করেন। মনসার পালায় মনসা সাজেন। বিশেষ চিহ্ন হিসাবে হাতে সাপ থাকে। বিবিমা, শীতলা, বনবিবি, মানিকপীর পালায় মহিলা সাজেন, হাতে চামর থাকে। কোন কোন আসরে ধুতিপাঞ্জাবি

পরেও গান করেন। মাইক লাগিয়ে এখন বেশির ভাগ আসরে গান করেন কিন্তু খালিগলায়ও অনেক জায়গায় গান করতে হয়।

গানবাজনা করে অনিল হাজরার সংসার চলে না। নিজের ও পরের জমি চাষাবাদ করে সংসার নির্বাহ করতে হয়। প্রয়োজনে জন-মজুরীও খাটতে হয়। অনিল বাবু বলেন, বাৎসরিক হাজারখানেক টাকা সরকারি অনুদান পেলে অন্তত যন্ত্রপাতিগুলো সারান বা নতুন কিছু কেনাকাটা করা যায়। এতে কিছু সাশ্রয় হয়। নচেৎ যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলে বড় অসুবিধায় পড়তে হয়।

পালাগায়ক : শ্রী সুদিন মণ্ডল (৫৫)

গ্রাম ও পোঃ - বেগমপুর, ভায়া - পিয়ালী টাউন, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিশিষ্ট পালাগায়ক হলেন শ্রী সুদিন মণ্ডল, পিতা গোপাল মণ্ডল। পালাগান, যাত্রা, কীর্তন, গোষ্ঠগান প্রভৃতিতে তাঁর সমান দক্ষতা। খোল- বাজনা, ডিগি তবলা, সাইড্রাম, হারমোনিয়াম ও কর্নিট বাজানোয় তাঁর দক্ষতা আছে। মূলত তিনি পাঁচালগায়ক। অনেকে তাঁকে সুদিন মণ্ডল না বলে সুদিন গায়েন বলেন। কুড়ি-একুশ বৎসর বয়স থেকে তিনি পাঁচালি গান গাইছেন। পাঁচালগান গাওয়ার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তি- জীবনের একটি মজার গল্পও শুনিয়েছেন।

সুদিনবাবু যখন পাঁচালগান শুরু করেন তখন বাড়িতে রিহারস্যাল দিতে পারতেন না। সবাই তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন, ঐ কালপেঁচা পিরুলীগান করবে আর সবাই শুনবে। এরূপ বলার কারণ হল তিনি অত্যন্ত কালো ও তেমনি লম্বা মানুষ। মহিলা সাজলে তাঁকে তখন আর সুদর্শনা বলা যায় না। দাদা, বৌদি, ভাই, বোন সবাই তাঁর পিছনে লাগত। তাই একদিন খুব দুঃখ পেয়ে বাড়ি থেকে অনেক দূরে গিয়ে এক বাবলাগাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। বিকেলের একটু ঠাণ্ডা বাতাসে তাঁর ঘুম এসে যায় ও ঘুমিয়ে পড়েন। এমন সময় এক মহিলা, সম্পর্কে তাঁর মাসী, একটা বাঁশের কচি তেড় (বাঁশের প্রথম অবস্থা) এনে তাঁকে যেন খেতে বলছেন। তিনি কিছুতেই খেতে চান না। মাসীমা জোর করে তাঁর গালে গুঁজে দিলেন ও পিঠে এক চাপড় মারলেন। তাতে চেতনা পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন এবং সত্যিসত্যিই দেখলেন তাঁর মুখের মধ্যে কি যেন একটা বস্তু রয়েছে। সেটি চিবিয়ে খেতে খুব মধুর মত মিষ্টি লাগল। তারপর বাড়িতে এসে রাতে তিনি আবার স্বপ্নে দেখলেন, মা মনসা তাঁকে যেন বলছেন—"আমি তোকে যে জিনিসটি খাইয়েছি ঐটির জন্য তুই যে-গান করবি বলে মনে করবি তা সহজে আয়ত্ত হবে এবং গাইতে পারবি। তবে একজন গুরু ধরবি।" এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই থেকে তিনি মা মনসার কৃপা পেয়ে নাজিরপুরের শ্রী করুণা মণ্ডলের নিকট এলেন, করুণা মণ্ডল তাঁকে মনসাপালার একটা ছক শুধু বলে দেন। তারপর তিনি তা আয়ত্ত করে আসরে গাইতে শুরু করেন এবং সেই থেকে একের পর এক পালাগান করতে থাকেন।

সুদিনবাবুর পালাগানের হাতেখড়ি বেগমপুরের অনন্ত হালদারের (কচিরাম) নিকট। তিনি তাঁকে বিবিমার স্বরূপচাঁদের পালাটি প্রথম দেন। তারপর করুণা মণ্ডলের নিকট থেকে মনসার পালা সংগ্রহ করেন। লক্ষ্মীর পালাগান সংগ্রহ করেন খেজুরতলার হারান পণ্ডিতের নিকট হতে। শীতলার গান সীতাকুণ্ডুর দ্বিজপদ মণ্ডলের লেখা (১ ঘণ্টা গাওয়ার মত) গান সংগ্রহ করেন। শীতলার বড় পালাটি বই পড়ে ও নিজে কিছু যোগ করে তৈরি করেছেন। মানিকপীরের তিনখানা পালা কালিপদ মণ্ডলের (রামনগর) নিকট হতে সংগ্রহ করেছেন।

সুদিনবাবুর সংগ্রহে বহু পালাগান আছে। তাঁর পালাগানের তালিকাটি নিম্নরূপ—

১। দরবারবিবি ২। ওলাবিবি ৩। বনবিবি ৪। একুশবিবি ৫। বড়পীর সাহেব ৬। মানিকপীর (কিনুঘোষ) ৭। মানিকপীর (মুরদকাঙাল) ৮। মানিকপীর (রঞ্জনাবিবি) ৯। শীতলা (চন্দ্রকেতু) ১০। শীতলা (বিরাট রাজা) ১১। লক্ষ্মী (বিনন্দ রাখাল) ১২। লক্ষ্মী (বীরবাহু) ১৩। লক্ষ্মী (গোকুলচাঁদ) ১৪। পঞ্চানন্দ ১৫। বেনাকীমদন ১৬। দুর্গার শঙ্খপরিধান ১৭। মহাদেবের চাষপালা ১৮। গাজী সাহেবের পালা ১৯। মনসার পালা ২০। নারায়ণীর পালা ২১। দক্ষিণরায় পালা।

উক্ত পালাসমূহ ছাড়া সুদিনবাবু রক্তানগাজী, দেওয়ানগাজী, সীতামা, ষষ্ঠী প্রভৃতি পালা গেয়ে থাকেন। এগুলি অন্য পালার নাম পরিবর্তন করে (ভাঙটা করে) গান করেন। অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি এই পালাগায়ক অদ্ভুত দক্ষতায় আসর বজায় করতে পারেন।

সুদিন মণ্ডল দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর পালাগান করছেন। তাঁর সমস্ত পালাগান পাঁচাল ধারায় তৈরি, কিন্তু বর্তমান এই ধারার গান মানুষ খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিচ্ছে না বলে তাঁর ধারণা। লোকনাট্যের আকারে পালাগান পরিবেশন করলে ভালোভাবে চলে বলে তিনি মনে করেন। তিনি সেকারণে তাঁর সমস্ত পালাগান লোকনাট্যের রূপ দিয়ে গাইতে চান।

সুদিন মণ্ডলের বহু ছাত্রছাত্রী পালাগানের স্বতন্ত্র দল করে গান করছেন। তাঁর মেয়ে আরতি পালাগানের ভাল শিল্পী। বছরে ৭০-৭৫ আসর গান হয়। তাতে পুরো মরসুমে ৫-৬ হাজার টাকা উপায় হয়। এতে তাঁর সংসার ঠিকমত নির্বাহ হয় না। ফলে চাষবাসের কাজ করতে হয় এবং অন্যের জমিতে মজুরীও খাটতে হয়। কয়েক বছর তিনি সরকারি সামান্য অনুদান পাচ্ছেন। চারবছরে পাঁচ কিস্তিতে ২২৫০ (বাইশ পঞ্চাশ) টাকা পেয়েছেন। অনেক শিল্পীর পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি দপ্তর থেকে পাঁচ হাজার টাকা এল.আই.সি. পলিসি হয়েছে, কিন্তু তাঁর হয়নি বলে জানান। ছাপোষা এই লোকশিল্পী অত্যন্ত কায়ক্লেশে সংসার চলান।

পালাগায়ক : সন্তোষ মণ্ডল (৫৫)

গ্রাম- রামনগর, ঘোষপাড়া, পোঃ- রামনগর, দঃ ২৪ পরগণা

চব্বিশ পরগণার খ্যাতনামা পালাগায়কদের মধ্যে শ্রী সন্তোষ মণ্ডল অন্যতম। অপুত্রক

সন্তোষবাবু ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর গানবাজনার লাইনে আছেন। গানবাজনার ফাঁকে প্যাণ্ডেলের কাজ করেন। তিনি দলের প্রয়োজনে হারমোনিয়াম বাজান, আবার খোলও বাজান। পাঁচালদলে ঘুরে ঘুরে তিনি বহু পালাগান রপ্ত করেছেন। ইদানীং অনেক গানের শিষ্য করেছেন। তিনি একাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে পাঁচালগান শিখেছেন। তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিও কিছু আছে। দরবারবিবির পালার প্রথম অংশটি তিনি কোনো স্থান থেকে কাহিনী শুনে লিখেছেন। এই অংশটি সাধারণত পালাগায়কগণ গান করেন না, কিন্তু সন্তোষবাবুর দলে এই অংশটি গান করা হয়।

সন্তোষ মণ্ডলের নিকট হতে এই অঞ্চলে পালাগায়কদের গুরু পরম্পরার মোটামুটি একটি তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যটি নিম্নরূপ—
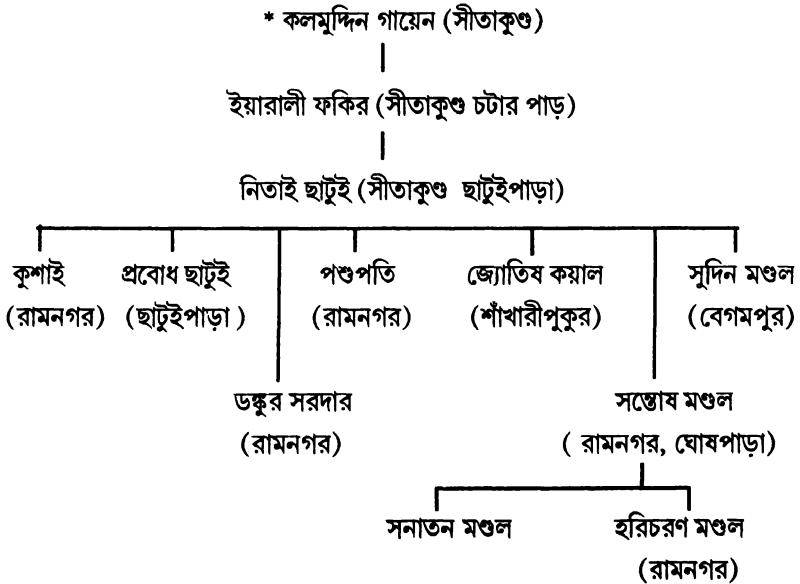
সন্তোষ মণ্ডল আরো অনেকের কাছ থেকে পালাগান শিখেছিলেন, তাঁরা হলেন ডঙ্কুর সরদার, কুশো কানা (কুশাই), পশুপতি প্রমুখ পালাগায়ক। তাঁর দল যে-সমস্ত পালাগান করে তা হল— (১) বিবিমা (দরবারবিবি), (২) বিবিমা (সুলতানছবি), (৩) মানিকপীর (কিনু ঘোষ, রঞ্জনাবিবি ও মুরদ কাঙাল), (৪) বনবিবি, (৫) গাজীবাবা, (৬) মনসা, (৭) শীতলা (বিরাটরাজা), (৮) বড়পীর সাহেব (সুরজ জামাল) ইত্যাদি।

---

* কলমুদ্দিন গায়েন কুসুম্বার ভূতই গায়েনের বংশধরদের নিকট হতে গান শিখেছিলেন বলে জানা যায়। ভূতই গায়েনের বংশধরেরা কলমুদ্দিন-এর আত্মীয়।

পালাগায়ক : দীপককুমার মণ্ডল

গ্রাম-ধোপাগাছি, পোঃ- কুন্দরালি, থানা - বারুইপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা

চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর পালাগানের অন্যতম প্রতিভাধর শিল্পী হলেন দীপককুমার মণ্ডল, পিতা নিতাইচন্দ্র মণ্ডল। শৈশব থেকেই তিনি গানের নেশায় মশগুল। যাত্রাগান, পাঁচালিগান, যাত্রার রূপসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি তাঁর দিদিমা প্রিয়বালা সাঁফুই-এর নিকট থেকে গান শুনে পাঁচালগানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। দিদিমা মনসার গান, রামায়ণগান, মহাভারতের কথা মুখে মুখে বলতে ও গাইতে পারতেন, তাঁর কাছে গান শুনে দীপক মণ্ডল পালাগানের আদব কায়দা ও গান অনেকখানি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি পাঁচালিগানের নতুন এক পদ্ধতি চালু করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে কোনরকম দোহার লাগে না। যেমন মূলগায়ক বা মহাড়াগায়ক মহড়াগানের এককলি গেয়ে গেলেন, দোহারের পরিবর্তে বাঁশিবাদক বাঁশী (ফ্লুট) ও কনসার্ট, (গুলোনো আকৃতির বাঁশী) বাজিয়ে দোহারের কাজটা করে যান। এটা পাঁচালিগানের পুরোপুরি এক নতুন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি তাঁর নিজের আবিষ্কার। এইভাবে তিনি বহু আসরে গেয়েছেন।

'আরফাগান'—এ গানে দীপক মণ্ডলের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। আরফাগান হল 'লেটো- গান'। কাজী নজরুল ইলসাম এই গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। এই লেটোগান আদিরসাত্মক হলেও একেবারে অশ্লীল পর্যায়ভুক্ত নয়। রঙ্গরসিকতা ও মশকরা এই গানের প্রধান অঙ্গ। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাতে লেটোগানের প্রচলন খুব বেশি। আরফাগানের কোন বইপত্র নেই। মুখে মুখে গুরু পরম্পরায় এগুলি চলে আসছে। দীপক মণ্ডল আরও একটি গান করেন, তাহল বংশী কবিরাজের চন্দ্রাবতীর জীবনী নিয়ে রচিত গান।

দীপক মণ্ডলের নিজের লেখা একটি পালাগান আছে । সেটি হল বিশালাক্ষীর পালা। উপযুক্ত দোহারের অভাবে পালাটি তিনি ব্যাপকভাবে আসরে গাইতে পারেন নি। এছাড়া তিনি যে-সমস্ত পালাগান করেন তা হল মনসার পাঁচালি, বনবিবি, শীতলা, প্রভৃতি। শীতলার লোকনাট্যের রূপ দেওয়া লেখাটি বর্তমান গবেষকের সংগ্রহে আছে। এছাড়া নিমাইসন্ন্যাস, সৎমাচরিত্র, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি পালাগান দীর্ঘদিন গ্রামেগঞ্জে দল নিয়ে গেয়ে বেড়িয়েছেন। কৃষ্ণযাত্রা তাঁর নিজের লেখা বলে জানান। তাঁর নিজের লেখা ও সংগৃহীত পালাগানের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, ঘর পুড়ে সব নষ্ট হয়ে গেছে।

পালাগায়ক : পাঁচু হালদার (৬৫)

গ্রাম ও পোঃ- সীতাকুণ্ডু থানা-বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা

পাঁচু হালদার বারুইপুর থানার প্রাচীন পালাগায়কদের অন্যতম। তাঁর পিতা রামগতি হালদার, তিনিও পালাগান গেয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। রামগতি হালদারের বড় ছেলে

মন্মথ হালদার, তিনিও ভাল গায়ক ছিলেন। এঁরা মনসা, বিবিমা, শীতলা প্রভৃতি পালা গাইতেন। তাঁদের গানের গুরু যোবেদ গায়েন। যিনি কলমুদ্দিন নামে বিশেষ পরিচিত। সীতাকুণ্ডুর পাঁচকড়ি নস্করের দলে তিনি কয়েক আসর গান করেছিলেন। পাঁচকড়ি নস্কর বিবিমা, রঞ্জনাবিবি, গাজীসাহেব, মানিকপীর পালা গাইতেন। এ সমস্ত পালা কলমুদ্দিনের নিকট হতে পেয়েছিলেন। পাঁচু হালদারের মতে কলমুদ্দিনসাহেব এই সমস্ত পালা স্বপ্নে পেয়েছিলেন।

(সাক্ষাতকার: ২৫.৮.১৯৯২)

পালাগায়ক : আবদুল জব্বার গায়েন (৬১)

গ্রাম-কুসুম্বা, পো ঃ- নরেন্দ্রপুর, দঃ ২৪ পরগণা

চব্বিশ পরগণার বিশিষ্ট লোকশিল্পী হলেন আবদুল জব্বার গায়েন। লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগান গেয়ে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তাঁদের পরিবারে দীর্ঘ ছয়পুরুষ যাবৎ লোকায়ত পালাগানের চর্চা বহমান। পালাগান গাওয়ার সুবাদে তাঁদের 'পেয়াদা' পদবী পরিবর্তিত হয়ে 'গায়েন' পদবী যুক্ত হয়েছে। তাঁদের বংশ পরম্পরায় যাঁরা পালাগানের চর্চা করেছেন ও করছেন তাঁরা যথাক্রমে স্বরূপ গায়েন, বদন গায়েন, নূপুর গায়েন, বেণী গায়েন, ভুতুই গায়েন, আবদুল জব্বার গায়েন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সীতাকুণ্ড গ্রামের কলমুদ্দিন গায়েন যাঁর এই অঞ্চলে আদি পালাগায়ক বলে খ্যাতি আছে, তিনি ছিলেন বদন গায়েনের শিষ্য। বিশিষ্ট তথ্যসূত্রে জানা যায় বদন গায়েনের পরিবারের সাথে কলমুদ্দিন গায়েনের পরিবারের নিকট সম্পর্ক ছিল।

আবদুল জব্বার গায়েন একজন স্বীকৃত পালাগায়ক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালায় তিনি পালাগান পরিবেশন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশিষ্ট মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র তিনি পেয়েছেন। তিনি যে সমস্ত পালাগান গেয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন তা হল—

১। মোবারক গাজীর পালা, ২। ওলাবিবির পালা, ৩। মানিকপীরের পালা ও ৪। সত্যপীরের পালা।

এ ছাড়া তিনি কাওয়ালী ঢঙে বিভিন্ন পীরপীরাণীর গান করেন। তিনি বছরে কমবেশি একশত পঁচাত্তরটি আসর গান করেন এবং তাতে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে ২৫-৩০ হাজার টাকা আয় হয় বলে জানান। বিবিমায়ের পালা ও সত্যপীরের পালা তাঁর কোন এক পূর্বপুরুষের সৃষ্টি বলে তিনি দাবী করেন। তিনি আরও দাবী করেন সীতাকুণ্ড গ্রামের কলমুদ্দিন গায়েন যে-সমস্ত গান করতেন তার বেশির ভাগই তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া গান।

(সাক্ষাতকার : ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬)।

পালাগায়ক : শ্যামল সরদার

গ্রাম-পুনপুয়া, থানা-বারুইপুর, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহুজন পরিচিত পালাগায়ক হলেন শ্রী শ্যামল সরদার। খুব ছোটবেলা থেকে তিনি গানবাজনার লাইনে এসেছেন। ১৩৮০ সাল থেকে তিনি পালাগান গাইছেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর দলে গান করেন।

শ্যামল সরদার খুব প্রতিভাধর শিল্পী, লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক বহু পালাগান তিনি রপ্ত করেছেন। তিনি গান শেখার আগ্রহ নিয়ে অনেক ওস্তাদের কাছে গেছেন। কেউ শিখিয়েছেন, কেউ অবজ্ঞা করেছেন। এখন তিনি রীতিমত ওস্তাদ। নিজে কয়েকজন শিষ্য করেছেন। তিনি যে-সমস্ত পালাগান করেন তা নিম্নরূপ—
১) মনসামঙ্গল, ২) শীতলামঙ্গল, ৩) বড়পীর সাহেব, ৪) মানিকপীর (রঞ্জনাবিবি বা লালচাঁদচুরি), ৫) আঁটকুড়া নবাব (একুশবিবি), ৬) বনবিবি (দুখের পালা), ৭) সন্তোষীমার পালা, ৮) শ্রীমন্তের মশান, ৯) গ্রহরাজ শনি, ১০) লক্ষ্মী এল ঘরে, ১১) লক্ষ্মীর পাঁচালি, ১২) দরবারবিবি (স্বরূপচাঁদ), ১৩) গাজী সাহেব (মোবারকগাজী), ১৪) রাজা হরিশচন্দ্র, ১৫) কৃষ্ণানদীর বাঁধ ইত্যাদি।

শ্যামল সরদার যাঁদের নিকট হতে গান শিখেছেন তাঁদের একটা নামের তালিকাও দিলেন। তাঁর প্রথম গুরু জ্যোতিষচন্দ্র রুইদাস (নীলকণ্ঠপুর), দ্বিতীয় গুরু নারানচন্দ্র নস্কর (ঘনশ্যামপুর), তৃতীয় গুরু সত্যবাবু (মৌখালি, ঝিনকি), চতুর্থ গুরু কালিচরণবাবু (রামনগর), পঞ্চম গুরু পশুপতিবাবু (ব্রাহ্মণ), ষষ্ঠ গুরু শশধর মহিষ (মৎস্যখালি)।

তিনি বছরে ৭০-৮০ আসর গান করেন। গান করে তাঁর সংসার চলে না। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়। ধানচালের কারবার করেন। তাঁর দলে ১৩-১৪জন লোক থাকেন। তাঁরা গানের ফাঁকে বিভিন্ন কাজকর্ম করেন। (সাক্ষাতকার : ২১.১.১৯৯৫)

পালাগায়ক : বাঁশীনাথ হালদার (৬০)

গ্রাম- কাঁটাবেনিয়া, পোঃ - করঞ্জলি, থানা - কুলপী, দঃ ২৪ পরগণা

বাঁশীনাথ হালদার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার খুব পরিচিত পালাগায়ক। তিনি যেসমস্ত পালাগান করেন তার মধ্যে শীতলা, মনসা, শ্মশান-মশান-ভাসান, শ্রীমন্তের মশান, বনবিবি, বল্লভার বনবাস ও মানিকপীর প্রধান। বল্লভার বনবাস পালাটি তিনি সত্যনারায়ণের শিরনিতে গেয়ে থাকেন। সত্যপীরের পাঁচালির ঢঙে তিনি পালাটি তৈরি করে নিয়েছেন। মানিক-পীরের পালাটি 'ভাঙটা করে' গান করেন।

বাঁশীনাথ হালদার খুব অল্প বয়স থেকেই গানবাজনা করছেন। লেখাপড়া শেখার সুযোগ তাঁর হয়নি। সংসারের আর্থিক অনটনে ও কাছাকাছি স্কুলপাঠশালা না থাকায় পড়াশুনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাঁচালগান তাঁর একমাত্র পেশা নয়। চাষাবাদের কাজকর্মও তিনি করেন। তিনি গান শিখেছিলেন প্রথম যতীন বেরার নিকট। যতীন বেরার

বাড়ি ১৩নং লাট। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে যেতে হয়। যতীন বেরার গুরু সুধীর মাইতি। তিনি মেদিনীপুরের বাসিন্দা। যতীন বেরার নিকট থেকে বাঁশীনাথ হালদার শীতলা ও মনসার পালা নিয়েছিলেন। এই গান গেয়ে তাঁর সুখ্যাতি হয়। তাঁর মায়ের নিষেধের কারণে কোন পালাগান কাউকে হস্তান্তর করেন না। (সাক্ষাতকার : ৯.৮.১৯৯৩)

পালাগায়ক : নকুল মণ্ডল (৭০)

গ্রাম- মধুবনপুর, থানা-বারুইপুর, দঃ২৪ পরগণা

নকুল মণ্ডল বারুইপুর থানার লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর পালাগানের এক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। খুবই অল্প বয়স থেকে তিনি সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম জীবনে তিনি হরিনামের দলে খোল বাজাতেন। তারপর পাঁচালদলে বাজাতেন। এখন তিনি নিজেই প্রধান গায়ক হিসাবে পাঁচালগান গেয়ে বেড়ান। তাঁর দলের প্রধান ও দীর্ঘদিনের দোহার হলেন রতিকান্ত মণ্ডল। তাঁদের গলার কাজ ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ভাবলে অবাক হতে হয়।

নকুল মণ্ডল যে-সমস্ত পালাগান করেন তা হল— শীতলারপালা, লক্ষ্মীর পালা, পঞ্চানন্দের পালা, বিবিমার পালা, মানিকপীরের পালা ও মাদারসাহেবের পালা।

নকুল মণ্ডলের পিতা করুণাময় মণ্ডল পাঁচালগান করতেন। ফলে শৈশব থেকে তিনি পাঁচালগানের আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন। তিনি অনেক পালা তাঁর বাবার কাছ থেকেই শিখেছেন। চীনে গ্রামের হরিপদ ঠাকুরের নিকট হতে তিনি লক্ষ্মীরগান ও শীতলার গান নিয়েছিলেন। করুণাবাবুর গাওয়া লক্ষ্মীর গান এই অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর সেই পালাগান নকুলবাবু নিয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি এই গানটাকেই সম্বল করে বেঁচে আছেন বলে জানান। অপুত্রক নকুলবাবু কন্যার বাড়িতেই থাকেন। পৈতৃক সম্পত্তি সব জ্ঞাতিদের দিয়ে দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বছরে ৩০-৪০ টা গানের আসরে ডাক পান।

(সাক্ষাতকার : ৬.১১.১৯৯২)

পালাগায়ক : গোষ্ঠ মণ্ডল (৩২), ফটিক মণ্ডল (৭০)

গ্রাম- আটঘরা, পোঃ- মদারাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বারুইপুর থানার খুব পরিচিত পালাগায়ক হলেন গোষ্ঠ মণ্ডল, পিতা ফটিক মণ্ডল। গোষ্ঠ মণ্ডল পনেরো-ষোল বৎসর বয়স থেকে লৌকিক দেবদেবী-নির্ভর পালাগান করছেন। তাঁর গানশিক্ষা প্রথম তাঁর বাবা ফটিক মণ্ডলের নিকট হতে। ফটিক মণ্ডল বহুদিন সুনামের সাথে পাঁচালগান করছেন। এখন আর মহড়া গাইতে পারেন না। পুত্র গোষ্ঠ মণ্ডলের দলে করতাল বাজিয়ে গান করেন। বর্তমানে তাঁর দাঁত একটিও নেই কিন্তু তাঁর গানের গলাটি এখনো অনেক যুবক গায়কের গলাকেও হার মানায়। ফটিক মণ্ডলের আর এক ছেলে অষ্ট মণ্ডল (২০), দলে হারমোনিয়াম বাজান। গোষ্ঠবাবুর দলের পাঁচ-ছয়জন লোকের তিনজন নিজেদের মধ্যে। ফটিক মণ্ডল গান শিখেছিলেন ভুরকুল টগরবেড়িয়ার মতি মণ্ডলের নিকট। অনেক

ছোটবেলা থেকে তিনি পাঁচালগান করছেন। তিনিই উৎসাহ দিয়ে ছেলেদের এই দলে এনেছেন ও বড় করবার চেষ্টা করছেন।

গোষ্ঠ মণ্ডল পরবর্তীকালে গান শিখেছেন রামনগরের কালিচরণ মণ্ডলের নিকট হতে। তিনি বলেন এ অঞ্চলের যত পাঁচালগায়ক আছেন তাঁরা কালিচরণবাবুর কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখেছেন। গুরুর কাছ থেকে মুখে মুখে তিনি গান শিখেছেন। তিনি যা শিখেছেন সব পাঁচাল আকারেই। শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর বেশি নেই কিন্তু উদ্ভাবনী ক্ষমতা অসীম। তিনি নিজে কিছু পাঁচালগান লিখেছেন। বিশালাক্ষ্মীর পালা লোকনাট্যের আকারে তিনি লিখেছেন। দেবী ষষ্ঠীর পালা ও বারাঠাকুরের পালা লিখছেন বলে জানান। তিনি অনেক ধরনের পালাগান গেয়ে থাকেন। তাঁর গাওয়া গানের তালিকাটি নিম্নরূপ—

১) মনসার পালা
২) মানিকপীরের পালা (৩টি)
৩) বনবিবির পালা
৪) বিবিমা (স্বরূপচাঁদ)
৫) বিবিমা
৬) পঞ্চানন্দের পালা
৭) গাজীসাহেবের পালা
৮) শীতলার পালা (বিরাটরাজার পালা)
৯) বড়পীর সাহেবের পালা (সুরজ জামাল)
১০) আসানবিবি
১১) রক্তান গাজী
১২) বিশালাক্ষীর পালা।

গোষ্ঠ মণ্ডলের গাওয়া উল্লিখিত পালাসমূহ পাঁচালধারায় সৃষ্ট ও পাঁচালরীতিতে গান করেন, কিন্তু এখন দর্শকের বা শ্রোতার চাহিদার কথা ভেবে সমস্ত পাঁচালধারাকে বদল করে লোকনাট্যের ধারায় রূপান্তরিত করতে চাইছেন। ইতোমধ্যে অনেক পালা যেমন মোবারকগাজীর পালা, বিবিমার পালা (স্বরূপচাঁদ) ও মনসার পালা লোকনাট্যের রূপ দিয়েছেন।

অকৃতদার গোষ্ঠ মণ্ডলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। গান বাজনার মধ্য দিয়ে যা আয় হয় তাতে সংসার চলে না। ফলে চাষবাসের কাজকর্ম করতে হয়। বছরে ৩৫-৩৬ আসর গান হয়। তাতে সমস্ত খরচ-খচা বাদ দিয়ে দুই-আড়াই হাজার টাকা বৎসরান্তে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগ তাঁকে পাঁচহাজার টাকার একটি জীবনবীমার পলিসি করে দিয়েছেন বলে জানান, কিন্তু কোন সার্টিফিকেট হাতে পান নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গণনাট্যের মেলায় তিনি গান করেছেন। এ ব্যাপারে প্রাক্তন এম. এল. এ. হেমেন মজুমদার যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন বলে জানান। সরকারিভাবে মাসিক কিছু সহযোগিতা পেলে গানবাজনা সম্পর্কে নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারেন বলে মনে করেন। বর্তমানে কঠিন রোগগ্রস্ত হওয়ার দরুন তেমন কাজ করতে পারেন না। তিনি আক্ষেপ করে বলেন—
"লোকশিল্পী হয়ে জীবনে দুঃখকষ্ট ছাড়া কিছু পেলাম না।"

(সাক্ষাতকার : ২৫.১২.৯২)

পালাগায়ক : প্রবোধকুমার ছাটুই (৬৮)

গ্রাম- সীতাকুণ্ডু, থানা- বারুইপুর, জেলা - দঃ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু পরিচিত পালাগায়ক হলেন প্রবোধকুমার ছাটুই। পিতা নিতাই ছাটুই তিনি কোনরকমে প্রাথমিক শিক্ষাটাই শেষ করেছিলেন। এগারো বৎসর বয়স থেকে পিতার দলে খোলবাজিয়ে হিসাবে লোকশিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। খোলবাজনা তিনি প্রায় নিজের চেষ্টাতেই শিখেছিলেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়স থেকে তিনি মহড়াগায়ক হিসাবে গান গাইতে শুরু করেন। তাঁর পিতা আগে মহড়া গাইতেন। একদিন অসুস্থতার ভান করে প্রবোধবাবুকে দিয়ে গান করান। তাঁর প্রথম আসর রামসাতালে এবং প্রথম পালা বিবিমার (স্বরূপচাঁদ) পালা। এই থেকেই তাঁর গায়কজীবনের জয়যাত্রা।

প্রাবোধ ছাটুইয়ের নিকট হতে এই অঞ্চলের পালাগায়ক ও পালাগানের অনেক ইতিহাস জানা যায়। তাঁর নিকট থেকে এই অঞ্চলের পালা গায়কদের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ —
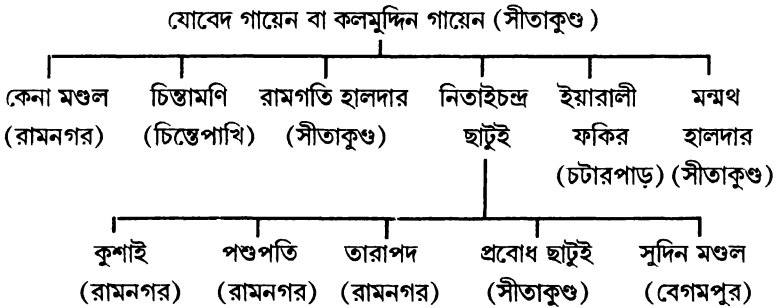
পূর্বে পালাগানের আসরে বাদ্যযন্ত্র বলতে ছিল খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম। এখন অনেক আধুনিক যন্ত্র ঢুকে গেছে বলে প্রবোধবাবু ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তা ছাড়া গানের মধ্যে লোকরহস্য, রঙলাই গান, নাচ ইত্যাদি ঢুকে পড়ায় তিনি মনে করেন এতে দেবতার ঠিক সাড়া পাওয়া যায় না। তিনিও এই আধুনিক তালে তাল মেশাতে অনেক আসরে নাচতে বাধ্য হয়েছেন। সাধারণত প্রবোধবাবু হাঁটুর উপর কাপড় পরে পাঞ্জাবি গায়ে, কখনো গায়ে গেঞ্জি ও কাঁধে উড়ুনী ফেলে ও হাতে চামর নিয়ে গান করেন। নাচানাচি তিনি পছন্দ করেন না। প্রবোধবাবু এই অঞ্চলে প্রচলিত প্রায় সব পালাগানই করেন। যথা—বনবিবি, শীতলা, গাজীসাহেব, মানিকপীর ইত্যাদি। তিনি বলেন পাঁচালগান গাওয়ার ব্যাপারে তাঁর খুব অহংকার ছিল। এ গান অনেকে শিখতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি কারোকে শেখান নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর বংশের কেউ শিখলে তাকেই সব দেবেন, কিন্তু তাঁর বংশের কেউ এ গান করতে ইচ্ছুক নয়। তারা গাজন, গোষ্ঠগান ইত্যাদি করে, কিন্তু পাঁচাল গান করে না।

(সাক্ষাতকার : ২৯.৩.১১৯২)

পালাগায়ক : বসন্তকুমার গায়েন (৭০)

গ্রাম- মোকিমপুর, পোঃ- দঃ বিষ্ণুপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা

বসন্তকুমার গায়েন, পিতা শশিভূষণ গায়েন। তিনি একজন রেলের চাকুরে। প্রায় বারো বৎসর আগে কাজে অবসর নিয়েছেন। পালাগায়ক হিসাবে এই অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি। প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি গান করছেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বসন্তবাবু পাঁচালগান গাওয়াকে একমাত্র বিনোদন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর গলার শক্তি ও সুর এখনো অটুট। তিনি বলেন, "গানে আমি এখনো ক্লান্তি অনুভব করি না। টানা দু-তিন ঘণ্টা গাইতে পারি।" বসন্তবাবু যেসব পালাগান করেন তা হল শীতলা, নয়বিবি, লক্ষ্মী, মানিকপীর ইত্যাদি। বসন্তবাবু সম্পর্কে যে কথাটি বিশেষভাবে বলার তা হল এঁদের পূর্বপুরুষগণও পাঁচালগান করতেন, সেই গানের সুবাদে তাঁরা গায়েন। এই অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত গায়কদের মধ্যে তিনি একজন। (সাক্ষাতকার : ১০.৯.১৯৯৩)

পালাগায়ক : লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন (৬৫)

গ্রাম- বল্লভপুর, পোঃ- উত্তর বল্লভপুর, থানা- মন্দিরবাজার, দঃ ২৪ পরগণা

লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক প্রতিষ্ঠিত পালাগায়ক। তাঁর পিতার নাম কামিনীমোহন গায়েন। তাঁদের পূর্বপুরুষের বর্মন পদবী ছিল। কয়েকপুরুষ পাঁচালগান করার সুবাদে তাঁদের পদবী গায়েন হয়েছে। লক্ষ্মণবাবু তাঁর গানের তালিম প্রথম তাঁর বাবা কামিনীমোহন গায়েনের নিকট থেকে নেন। তারপর আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে পালাগান সংগ্রহ করে তিনি এখন প্রতিষ্ঠিত পালাগায়ক। তাঁর গাওয়া বেনাকীর পালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি মনসা, শীতলা, লক্ষ্মী, বেনাকী, সাতবিবি ও মানিকপীরের পালাগান করেন।

(সাক্ষাতকার : ১৫.১০.১৯৯৩)

পালাগায়ক : মোঃ আবদুল ফকির (কাওয়াল)

চব্বিশ পরগণার এক বিশিষ্ট লোকশিল্পী মোঃ আবদুল ফকির। বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত চন্দনেশ্বরের নিকট পাটকেলপোতা গ্রামে তাঁর বাড়ি। বাংলা ফকিরিগান, কাওয়ালীগান করে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। পীর, গাজী, বিবি প্রভৃতির উরস উপলক্ষে যে-সমস্ত মেলা হয়, তিনি সাধারণত সেখানে গিয়ে দলবল নিয়ে কাওয়ালরীতিতে গান করেন। এছাড়া পাড়ায় পাড়ায় মানিকপীরের গইলেগান, লক্ষ্মীচরিত্র ইত্যাদি গেয়ে জীবিকানির্বাহ করেন। পনেরো-ষোল বৎসর বয়স থেকে তিনি এই গান করেন। আর্থিক অভাবে গুরু ধরে গান শেখার সুযোগ হয় নি। বিভিন্ন বই-পুস্তক দেখে গান শিখেছেন। আবদুল ফকির অনেক পীরগাজীর গান করেন। যেমন মানিকপীর, বড়পীর

সাহেব, আল্লা নবীর সনে, খাজাবাবা, গাজীবাবা, ভাঙ্গড়সুলতান, মাদারপীর প্রভৃতি। কেবল মানিকপীরের গান তিনি জারিগানের ঢঙে করেন। এছাড়া প্রায় সব গানই কাওয়ালরীতিতেই করেন। তিনি বলতে চান ফকিরিগান প্রকৃতপক্ষে বাউলসুরের গান।

গায়েন আবদুল ফকিরের নিকট হতে যে-সমস্ত পালা ও গান সংগৃহীত হয়েছে তা হল —

(ক) বড়পীর সাহেবের অকেয়া

(খ) মানিকপীরের (গইলে) গান

(গ) পীরগোরাচাঁদের সালামীগান

(ঘ) নবীজির গান

(ঙ) মাদারপীরের গান

(চ) হজরত জাবেবের গান

এছাড়া তিনি আরও বহু গান জানেন। তাঁর গানের ধারা সব একরকম নয়। কোন কোন গান তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাওয়ালরীতিতেই করেন আবার কোন গান কিছু কথা কিছু সুরে করেন। অবশ্য আবদুল ফকিরের গান চব্বিশ পরগণার চিরাচরিত পালাগানের প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত।

পালাগায়ক : রবিন মণ্ডল (৩০)

গ্রাম - ঢোলা, পোঃ - দোলতলা, থানা - বারুইপুর

জেলা - দঃ ২৪ পরগণা

চব্বিশ পরগণার এক খ্যাতিমান পালাগায়ক রবিন মণ্ডল। তিনি নয়-দশ জনের দল নিয়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং চব্বিশ পরগণার বাইরেও অনেক স্থানে পালাগান করেন। সব্জিব্যবসা, ধানচালের ব্যবসা ও কৃষিকাজ করে তিনি সংসারনির্বাহ করেন। ব্যবসার ফাঁকে পাঁচালি গান করেন। তাঁর গানের গুরু শ্রী কার্তিকচন্দ্র নস্কর, তাঁর বাড়ি খোলাখালি-সাতমুখীর নিকট। তাঁর আরও দুইজন প্রতিষ্ঠিত গুরুভাই হলেন জয়াতলার গোরা সিং ও বৃন্দাখালির দুখিরাম সরদার। এঁরা মনসা, বিবিমা, শীতলা প্রভৃতি পালাগান করেন।

রবিন মণ্ডল মনসার গান গেয়ে খুব সুনাম অর্জন করেছেন। গীতিনাট্যের বা লোক-নাট্যের ঢঙে তিনি এই পালাটি গান করেন। তাঁর দোহারগণ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। অবশ্য বসে বসে সংলাপ বলেন। আর কিছু চরিত্র রীতিমত সাজপাট করেই আসরে নামেন। রবিনবাবু মূলচরিত্র মনসার অভিনয় করেন। দলটি তাঁরই পরিচালনাধীন। পরপর ৩-৪দিন এই পালাটি গান করেন। আসরের যন্ত্রপাতির মধ্যে থাকে ডিগি-তবলা, কাড়া-নাকাড়া, ঢোলক, ঝাঁঝ, বঙ্গ, হারমোনিয়াম, করতাল, ফ্লুট্ ইত্যাদি। রবিনবাবুর মনসার পালাগানটির কাহিনী ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান থেকে নেওয়া। তবে গানের মধ্যে আধুনিক 'রেকর্ড গানের সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নাচ কিন্তু পুরানো দিনের যাত্রাগানের কোমর দুলিয়ে

নাচের মত। তাঁর দলে কোন মহিলা নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে "মানসিকে" গানের জন্য তাঁর ডাক আসে। চারশত টাকার কম তিনি কোন আসরে গান করেন না।

(সাক্ষাতকার : ১০.৮.১৯৯৩)

পালাগায়ক : বলরাম জানা

গ্রাম- দীঘিরপাড়, পোঃ- বকুলতলা, থানা- রায়দীঘি, দঃ ২৪ পরগণা

বলরাম জানা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার স্বনামধন্য পাঁচালি-গায়ক। পিতা শ্রী অমূল্যচরণ জানা। বলরাম জানা খুব অল্প বয়স থেকেই গান বাজনা করছেন। যাত্রা, নাটক, গাজন, পাঁচালিগান, নৃত্য, গীত প্রভৃতিতে তিনি খুব পারদর্শী। নিজেই গান রচনা করে তাতে সুর আরোপ করে সঙ্গে সঙ্গেই আসরে গান করতে পারেন, অথচ অক্ষরজ্ঞান তাঁর নেই। পাঁচালিগান সবই তাঁর শুনে শিক্ষা। ফলে গুরু কে? এই প্রশ্ন করায় তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য মেদিনীপুর থেকে আসা পাঁচালদলের সাথে ঘুরে কিছু শিখেছেন, স্থানীয় শিল্পীদের গান শুনেও শিখেছেন। এখন তিনি নিজেই পাঁচালিগানের দল করে বিভিন্ন জেলায় গান করে বেড়ান। ছয়-সাতখানা পালা তিনি গান করেন। যেমন— (১) লক্ষ্মীনারায়ণ, (২) মঙ্গলচণ্ডী, (৩) মনসামঙ্গল, (৪) বিদ্যাসুন্দর, (৫) শীতলামঙ্গল, (৬) বিবিমা (নয়বিবি) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি পাড়ার যাত্রানাটকের নির্দেশনার কাজ করেন।

বলরাম জানা বিদ্যাসুন্দরের পালা গান করেন ভারতচন্দ্রের লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে। এটি সাধারণত কোন লৌকিক দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে এই অঞ্চলে গীত হয় না। যেকোন প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানে এ পালা গাওয়া হয়ে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নিম্ন সুন্দরবন অঞ্চলেই এই গানের চাহিদা খুবই আছে। তিনি খুবই উন্নত পাঁচালগায়ক। তাল, লয়, গলার কাজ, সুর খুবই সুন্দর ও নিখুঁত।

(সাক্ষাতকার : ৫.২. ১৯৯৫)

পালাগায়ক : শশধর মহিষ (সিং) (৬০)

গ্রাম- মৎস্যখালি, থানা- বিষ্ণুপুর, দঃ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একজন সুখ্যাত পালাগায়ক হলেন শশধর মহিষ। কয়েক পুরুষ তাঁরা গানবাজনার লাইনে আছেন। তাঁর পিতামহ নিরাপদ মহিষ ও পিতা সুধীরচন্দ্র মহিষ পাঁচালগান করতেন। সুধীরচন্দ্র মহিষ নিজে পালারচনাও করতেন। তাঁর রচিত পালা তিনি অনেকখানি নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। নতুন কিছু গান, কথা ও সুরে পালাগুলি সুন্দর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে তাঁর সন্তানাদিও এই গানবাজনায় পিতার অনুসরণে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। পাঁচালগান শশধরবাবু প্রায় ৪৭-৪৮ বছর গাইছেন। তিনি যাত্রাদলেরও সুর দেন। বর্তমানে পুত্রদের চাপে পড়ে পদবী পরিবর্তন করে সিং হয়েছেন। তিনি বাগদী-সম্প্রদায়ের মানুষ। পুত্রদের কেউ কেউ কলেজে পড়াশুনা করছেন।

শশধর মহিষ সাতটিরও বেশি পালাগান করেন। পালাগুলির সবকটি লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক। যেমন— ১) শীতলা, ২) মনসা, ৩) বিবিমা (ওলাবিবি), ৪) বনবিবি, ৫) মানিক-পীর, ৬) পঞ্চানন্দ, ৭) লক্ষ্মীর পালা। শীতলার পালাগান গেয়ে তিনি খুব সুনাম অর্জন করেছেন। চব্বিশ পরগণার বহু পালাগায়ক শশধর মহিষের শীতলার পালার প্রশংসা করেন। অন্যান্য পালাগায়কের সাথে তাঁর গানের কাহিনীগত কিছু মিল থাকলেও সুর, লয় ও পরিবেশন তাঁর নিজস্ব ঘরানায় সৃষ্ট। শীতলাপালার বিরাটরাজার কাহিনীটি তিনি গান করেন।

(সাক্ষাতকার : ১৭.১০.১৯৯৪)

পালাগান লেখক ঃ দ্বিজপদ মণ্ডল

গ্রাম ও পোঃ- সীতাকুণ্ড (মণ্ডল পাড়া), দঃ ২৪ পরগণা

(দ্বিজপদ মণ্ডলের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র জীবনকৃষ্ণ মণ্ডলের নিকট হতে দ্বিজপদ মণ্ডলের সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাই লিপিবদ্ধ করা হল)।

দ্বিজপদ মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭২ সালের কোন একসময়। তাঁর পিতা মথুরমোহন মণ্ডল চব্বিশ পরগণার সীতাকুণ্ড গ্রামের এক সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষ। মথুর মণ্ডলের দুই বিবাহ। প্রথমপক্ষের চার পুত্র এক কন্যা সন্তানের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বড়ভাই কর্ণধর পিতার বিষয়কর্মাদি দেখতেন ও সংসার পরিচালনা করতেন। মেজভাই ভূধর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। সেজভাই নটবর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নন। কনিষ্ঠ দ্বিজপদ মণ্ডল সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসম্পন্ন, নাট্যকার, অভিনেতা, কবিরাজ, ব্যবসায়ী ও দেশপ্রেমিক। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রতি একটা সতর্কীকরণ নোটিশ জারী করা হয়েছিল।

দ্বিজপদ মণ্ডলের দুই বিবাহ। কোন স্ত্রীর সন্তানাদি হয়নি। প্রথম স্ত্রীর নাম জানা যায় নি। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম মোক্ষদা, ১৯৭৭ সালে দ্বিজপদ মণ্ডলের মৃত্যুর বৎসরেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। একশ পাঁচ বৎসর আয়ুষ্কালের দীর্ঘসময় কেটেছে তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখা পালাগান এতদঅঞ্চলের খুব পরিচিত। পালাগানের শীতলামঙ্গলের বিরাটরাজার পালা (ছোট), মানিকপীরের কিনু ঘোষের পালা, সতীর পালা, তাঁরই লেখা। দরবার বিবির পালাকে তিনি প্রথম শীতলার পালাতে রূপান্তরিত করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়া তিনি প্রবন্ধ, গল্প, নক্‌সা, নাটক, যাত্রাগানের পালা, কীর্তনগান ইত্যাদি লিখেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ লেখা পুরাণঘেঁষা। পালাগান ছাড়া তাঁর আর যে-সমস্ত রচনা আছে তা হল (১) বৃষকেতুর পালা, (২) গুরুভক্তি, (৩) জগাই মাধাই, (৪) কৃষ্ণকালী, (৫) কলঙ্ক কলস, (৬) গোচারণ, (৭) গৌরীর আচরণ, (৮) কারামুক্তি, (৯) অঘাসুরবধ, (১০) পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা, (১১)অকলঙ্ক কৃষ্ণ, (১২)দেবী দুর্গার ধরাতলে আগমন প্রভৃতি। সংস্কৃতসাহিত্যেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। আপাতত দ্বিজপদ মণ্ডলের সমস্ত লেখা তাঁর ভাইপো জীবন মণ্ডলের সংরক্ষণে আছে।

দ্বিজপদ মণ্ডল খুব সাদাসিধে ও খেয়ালী মানুষ ছিলেন। জীবনযাপন করতেন অতি

সাধারণভাবে। হাঁটুর উপর কাপড়, ফতুয়া গায়ে দিয়েই জীবন কাটাতেন। বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না। কবিরাজী করার সুবাদে তিনি খুব স্বাস্থ্যসচেতন ছিলেন। কৃষিকর্ম ও ধান চালের ব্যবসা করতেন। যাত্রা-গানের সুর দেওয়া, অভিনয়করা, যাত্রাদল ও যাত্রা পরিচালনা তিনি করতেন। তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, ফলে ঝাড়ফুঁক-এর কাজও তিনি করতেন। তাঁর কাকা ঘৃতমোহন মণ্ডলের প্রভাবে তিনি অনেকখানি প্রভাবিত ছিলেন বলে জানা যায়।

দ্বিজপদ মণ্ডল কীর্তনের দল করেছিলেন। নিজে কীর্তন করতেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি তিনি যাত্রাদল করেছিলেন, কিন্তু তাঁর যাত্রাদলে দাড়িওয়ালা কোন মুসলমান তিনি বরদাস্ত করতেন না। যে-সমস্ত শিল্পী তাঁর যাত্রাদলে ছিলেন তাঁরা সবাই দাড়ি কামিয়েই থাকতেন। তাঁর মধ্যে ছিল গোঁড়া হিন্দুত্ব। ফুলবাগান করা, বই সংগ্রহ করা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ছিল তাঁর শখ। তাঁর দানশীলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। অনেক অসহায় ব্যক্তিকে জমি দিয়ে গৃহাদি নির্মাণ করে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। শশাড়ীর-কন্দমালা গ্রামে মানিকপীরের সেবার জন্য অনেকখানি জমি তিনি দান করেছিলেন। এখন অবশ্য থান সংলগ্ন সামান্য ভূমি ছাড়া আর কিছুই নেই।

স্বনামধন্য দ্বিজপদ মণ্ডল সীতাকুণ্ড তথা বারুইপুর থানার এক খ্যাতিমান মানুষ। বিষয়ী মানুষ হিসাবে বহু লোক তাঁর দ্বারা বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ নিয়ে উপকৃত হতেন। সর্বোপরি তাঁর চেষ্টায় বারুইপুর থানায় লোকসংস্কৃতিচর্চার একটা জোয়ার এসেছিল বলে জানা যায়।

পালাগান লেখক ঃ সুবর্ণ মণ্ডল (৪৭)

গ্রাম ও পোঃ- বেগমপুর, ভায়া- পিয়ালী টাউন, দঃ ২৪ পরগণা

সুবর্ণ মণ্ডল একজন লোকশিল্পী ও পালাগান লেখক। তাঁর পিতার নাম ˚গোপাল চন্দ্র মণ্ডল। গোপাল মণ্ডলের ছয় পুত্র দুই কন্যা। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত এই পরিবারের প্রত্যেকেই লোকসংস্কৃতিচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ। বড়ভাই ভবেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভাল অভিনেতা, গোষ্ঠগান রচয়িতা ও পালাগান আসরের হারমোনিয়াম-মাস্টার। মেজভাই ভরতচন্দ্র মণ্ডল পালাগানের আসরে দোহার হিসাবে গান করেন এবং ভাল কমিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি দপ্তর থেকে তাঁর স্বীকৃতি আছে। তৃতীয়জন শরৎ মণ্ডল, পিকলী গানের দলে দীর্ঘদিন দোহার হিসাবে গান করে। চতুর্থ জন সুদিন মণ্ডল বারুইপুর থানা তথা চব্বিশ পরগণার বহু পরিচিত ও খ্যাতিমান পালাগায়ক। ষষ্ঠজন হলেন সত্য মণ্ডল। তিনি পালাগানের আসরে প্রথমে আড়বাঁশী বাজাতেন, এখন ফুলোট বাজান। পঞ্চমজন শ্রী সুবর্ণ মণ্ডল অনিল হাজরার দলে কমিক্ হিসাবে গান করেন। তিনি খুব অল্প বয়স থেকে লোকসংস্কৃতিচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। প্রথম জীবনে অর্থাৎ ১৪-১৫ বৎসর বয়স থেকে গোষ্ঠ গানের দলে যোগ দিয়ে দীর্ঘদিন এই দলে কৃষ্ণের ভূমিকায় নাচগান করেছেন এবং রাধার ভূমিকায় ছিলেন শ্রী সুধাময় হাজরা। উভয়েই বর্তমানে পালাগায়ক অনিলকুমার হাজরার

দলের কমিক্ ও দোহার। সুবর্ণ-সুধাময়ের গোষ্ঠ গানের জুটির প্রশংসা চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে আছে। বহু প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার স্মারকচিহ্ন এখনও উভয়ের ঘরে যথেষ্ট আছে।

সুবর্ণ মণ্ডল লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন। এছাড়া তাঁর আরও এক পরিচয় তিনি একজন পালাগান লেখক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার করঞ্জলির নিকট কাঁটাবেনিয়ার দেবীবিশালাক্ষীকে নিয়ে তিনি একটি পালাগান রচনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার উৎকৃষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে এই পালাগান। অথচ তিনি পড়াশুনা করার তেমন সুযোগ পাননি। প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই গ্রহণ করেছেন মাত্র। পালাগানের দলে তিনি দোহার হিসাবে গান করলেও সমস্ত পালাগান তাঁর মুখস্থ। মহড়া গাইতেও পারেন। হারমোনিয়াম বাজনাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা আছে। খোলবাজনা কাজ চালানোর মত জানেন । পালাগানের আসরে তিনি প্রধানত করতাল নিয়ে বসেন।

সুবর্ণ মণ্ডল পালাগানের কয়েক জন ছাত্রও তৈরি করেছেন। এ পর্যন্ত চারজন শিষ্য তাঁর হয়েছে। তাঁরা নতুন দল করে গান করছেন। দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ছাপোষা মানুষ সুবর্ণ মণ্ডলের সংসার এই পালাগানের উপর নির্ভর করে চলে না। সংসার চালানোর জন্য অপরের বাড়ি জনমজুরি খাটতে হয়। রাজমিস্তিরীর কাজও তাঁর জানা আছে। গানের ফাঁকে তিনি এসব কাজকর্ম করেন। সরকারি সাহায্য কিছু পান না।

পালাগায়ক ঃ প্রবোধকুমার মণ্ডল (৪১)

গ্রাম- নারায়ণপুর, পোঃ- সোনাপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা

পালাগায়ক প্রবোধকুমার মণ্ডল, পিতা ঁবনমালী মণ্ডল উত্তর ২৪ পরগণার একজন প্রতিষ্ঠিত লোকশিল্পী। তিনি দীর্ঘ বাইশ বৎসরকাল গান বাজনার লাইনে আছেন। তিনি পালাগান শিক্ষা করেছেন রামপদ নস্কর (ব্রাহ্মণচক্), গৌরবাবু (দেউলিয়া), অশ্বিনীবাবু (গাঁথিগ্রাম), মদনবাবু (জয়া গ্রাম) ও দুলাল মণ্ডল (হাটগাছা গ্রাম) প্রমুখের নিকট। প্রবোধকুমার মণ্ডল যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী-কেন্দ্রিক পালাগান করেন তা হল— শীতলামঙ্গল, মনসামঙ্গল, মানিকপীর প্রভৃতি। তিনি শীতলামঙ্গল গান করেন দ্বিজ নিত্যানন্দ বিরচিত শীতলামঙ্গল-এর কাহিনী অবলম্বন করে। তাঁর দলে আরও ১০-১১জন সহযোগী থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন।

চব্বিশ পরগণার লোকায়ত পালাগানের প্রথা

চব্বিশ পরগণায় লৌকিক দেবদেবী-কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগান ও পূজাচার সংক্রান্ত নানা সংস্কারাদি যুগের দাবীর সাথে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিশেষত পূজাচার সংক্রান্ত প্রাচীন যে-সমস্ত সংস্কারাদি বর্তমানে প্রতিপালিত হয় তার অস্তিত্ব রক্ষায় এ অঞ্চলের পালাগানের লোকশিল্পীদিগের অবদান অনেক বেশি। পালাগানের আসরে গানের মাধ্যমে তাঁরা পূজাচার বিষয়ক সংস্কারের কথা প্রচার করেন। তথাপি তাঁদের প্রচারিত সমস্ত সংস্কার এ অঞ্চলের লোকসমাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন না। বিভিন্ন পালাগায়কের সাক্ষাতকারে জানা গেছে কিভাবে সংস্কার ও পালাগানের ধারা বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের রূপ নিয়েছে। বিবর্তন সর্বত্র একই রকম নয়। কোথাও কম, কোথাও বেশি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত মাগুন করার নিয়মপদ্ধতির কথা ধরা যাক, যে বাড়িতে বিবিমা বা শীতলাপালা গাওয়া হয়, গান বা পূজার আগে পর্যন্ত সেই বাড়ির এক বা একাধিক মহিলা গলায় কুটো বেঁধে সাতগ্রাম বা পাঁচগ্রাম মাগুন করেন। বারোয়ারী থানে পূজার দিন নির্দিষ্ট হলে গ্রামের মহিলাগণ মিলে মাগুন করতে যান। তাঁরা যতক্ষণ না মাগুন করে বাড়ি ফেরেন ততক্ষণ গৃহে উনুন জ্বালা হয় না। বাড়ীর যিনি মাগুন করতে যান তিনি ফিরে এসে বাইরে থেকে ডাক দেন। তারপর মাগুনকারী (গিন্নী) ও বাড়ির বধু বা কোন এক মহিলার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে কথোপকথন হয়। যেমন— গিন্নীঃ দুয়ারে কেন আলো?/বধু—গিন্নি গেছেন বনভোজনে, আমরা সবাই আছি ভালো।/গিন্নি—দুয়ারে কেন কাঁটা?/বধু—গিন্নী গেছেন বনভোজনে সবাই লোহার ভাঁটা।/ গিন্নী—দুয়ারে কেন পেতল?/বধূ—গিন্নী গেছেন বনভোজনে, সবাই আছি শিতল।/এইরূপ কথোপথনের পর বাড়ির লোক এবার তাকে চিনির জল, ডাবের জল বা ফলের রস দেয়। তাই খেয়ে মাগুনকারী বাড়ি প্রবেশ করেন। মাগুনের চাল পয়সা দিয়ে শীতলা বা বিবিমার গানহাজত হয়। বর্তমানে সর্বত্র এই নিয়ম পালিত হয় না। দ্বিতীয়ত শীতলা বা বিবিমায়ের পূজা যে-বাড়িতে বা থানে অনুষ্ঠিত হয় সেইস্থান'হতে মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি দেন। শঙ্খধ্বনি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত গৃহস্থগণ

পূজার দিন পান্তা ভাত খান। বর্তমানে শঙ্খধ্বনি দেওয়া ও পান্তাভাত খাওয়ার রীতি ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত হয়েছে। তৃতীয়ত শীতলাপূজার দিন যেখানে পালাগানের আসর বসে সেখানে পালাগায়ক বিশেষ এক ধরনের প্রসাদ তৈরি করেন। যেমন একটি পাথরবাটিতে আমসত্ত্ব, দুধ, ডাবের জল, সন্দেশ, পাকা কলা নির্দিষ্ট ভাগে একসাথে মিশ্রণ করেন। এবার সেই উপাদেয় বস্তুটির উপর একটি নতুন গামছা ফেলে, মায়ের পায়ের কাছে রেখে, গায়ক একটি বীজমন্ত্র বলেন ও মা যেন তাতে কৃপাদৃষ্টি দেন এরূপ কামনা করেন। তারপর সেই প্রসাদবারি চামচে করে শ্রোতাদের মধ্যে বা চাঁদা দানকারী গৃহস্থের বাড়ি বিতরণ করা হয়। বর্তমানে এ রীতিরও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে এই রীতি পালাগায়কগণ কঠোরভাবে পালন করতেন, বর্তমানে তা করেন না।

পালাগানের আসরের বিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। পালাগানের আসরে লোকবাদ্যের পরিবর্তে আধুনিক অনেক বাদ্যযন্ত্র প্রবেশ করেছে। পূর্বে পাঁচালগানের আসরে হারমোনিয়াম বা খোলের ব্যবহার হতো না। বিশেষত মানিকপীর, বিবিমা প্রভৃতি মুসলিমপালাসমূহ গাওয়ার সময় গায়ক কেবল একটি চামর হাতে নিয়ে কিছু দোহার সহযোগে গান করতেন, পরে হারমোনিয়াম খোল, বাঁশী, কাড়ানাকাড়া, ঝাঁঝ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যুক্ত হয়েছে। এখন হতে (১৯৯৩) বছর তিনেক আগে হতে কাড়ানাকাড়া, বছর আটেক আগে হতে বাঁশী, তারও কিছু আগে থেকে হারমোনিয়াম, খোল, করতাল ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমানে পালাগান তার পুরানো ঐতিহ্য হারিয়ে নিতান্ত আধুনিক হয়ে পড়েছে বলে পালাগায়কগণ জানান।

বর্তমানে পালাগানের মধ্যে লোকনাট্যের ধারা রীতিমত ঢুকে পড়েছে। পাঁচালগানে পূর্বে নাচের প্রচলন ছিল না। এখন পালাগায়কগণ রীতিমতো পুরানো ধাঁচের কোমর দুলিয়ে নাচ করে দর্শকের মন তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। পালাগায়কের বক্তব্য, এরূপ নাচ বা আসরে রঙ-তামাসা কেবল বেশি পয়সা উপায়ের জন্যই করা হয়।

বর্তমান পালাগানের আসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিবর্তন হল, দর্শক বা শ্রোতাদের মধ্য থেকে কোন কোন চরিত্র টেনে নেওয়া। যেমন মনসার পালায় দুটি বাচ্চা আসর থেকে নিয়ে তাদের বেহুলা ও লখিন্দর সাজিয়ে তাদের ঘিরে নাচগান করা হয়। রঞ্জনাবিবির পালাতে লালচাঁদ ও মেরিজান চরিত্র নেওয়া হয়। বড়পীর সাহেবের পালা হলে সুরজ জামাল ও চম্পাবতী, বনবিবির পালায় দুঃখী-চম্পাবতী, বরণ করার জন্য আসর থেকে এয়োদের ডেকে নেওয়া হয়। মনসার পালায় সাঁতালী পর্বতের দ্বারীর অভিনয় করার জন্য একজন গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার পুরুষকে ডেকে তুলে নিয়ে তাকে কিছু কথা বুঝিয়ে দিয়ে নাচ, গান সংলাপ ইত্যাদি চালান হয়। অনেক সময় একটি বাচ্চাকে হনুমান সাজিয়ে হনুমানের পার্ট করানো হয়। গায়ক হাতে একটি কলা ধরে নানারকম রঙতামাসা করেন এবং হনুমান সেই কলা ধরার জন্য বাজনার তালে তালে লাফালাফি করে, নাচানাচি করে। সবমিলিয়ে আসর বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে ও পালাগায়কের দু-চার পয়সা বেশি আয় হয়।

পালাগানে লোকনাট্যের উক্ত ধারাটি পূর্বে ছিল না। বর্তমানে উপায় বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু পালাগায়ক আসরে ঐরূপ নিয়মনীতি পালন করেন। কেবল চামর নিয়ে যে পালাগান

গীত হতো সেক্ষেত্রে বর্তমানে নানা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, পালাগায়কগণ আসর উপযোগী বিভিন্ন সাজসজ্জা করে বর্তমানে গান করেন। ১৯৯০ সালের (কমবেশি) পূর্বে আসরে মাইক ব্যবহারের বিষয় কল্পনা করা যায়নি, বর্তমানে মাইক ছাড়া পালাগান প্রায় হয়ই না।

ক্ষেত্রগবেষণাসূত্রে চব্বিশ পরগণার পালাগান পরিবেশনার বিশেষ রীতি লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে বন্দনা, গীত, পয়ার, কথা, পাঁচাল, মাঙন, নরম-ধোয়া, কোল ধোয়া, ধোয়া, ত্রিপদী, অষ্টমঙ্গল পাঁচাল, অষ্টমঙ্গলা ধোয়া প্রভৃতি বিভাগ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আসরে দোহার বা সহযোগী বাজনদার ও প্রয়োজনানুসারে চরিত্রাভিনেতা, মহড়াগায়ক বা মূলগায়ক ও উপস্থিত ব্যাখ্যাকার, আসরতোলা বা আসর থেকে শিশু-নারী-পুরুষ দর্শকশ্রোতাকে প্রয়োজনমত তোলা ও পালা পরিবেশনের সহযোগীরূপে ব্যবহার করা প্রভৃতি পালাগান পরিবেশনার লোকপ্রচলিত প্রথা। এই প্রথার মাধ্যমে পালাদলের সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান গবেষক ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন যা হয়তো লোকাভিনয়ের বিশিষ্ট রীতি হিসাবে পরিগণিত হয়।
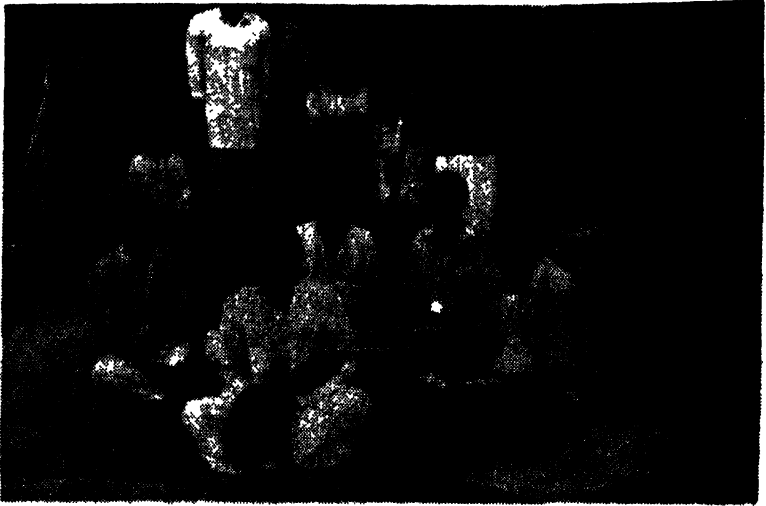
মানিকপীর পালাগানের আসর, আশাবাড়ি বন্দনা করা হচ্ছে। পালাগায়ক অনিল কুমার হাজরা ও সম্প্রদায়, খাতা হাতে-লেখক।

কৃতজ্ঞতা

"চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা" এই বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য বহু বিদ্যানুরাগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে ধন্য করেছেন, এই জন্য তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে প্রথমে আমার পরলোকগত পিতৃদেবের কথা মনে পড়ে। তিনিই আমাকে গবেষণাকর্ম শুরু করতে পরোক্ষভাবে আদেশ করতেন, তাঁরই ইচ্ছায় আমি এই কাজে ব্রতী হই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুভাষ দাস, তিনি আমার বন্ধু, দাদা ও অভিভাবক তুল্য; তাঁরই উৎসাহে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী নরেশচন্দ্র জানা মহাশয়ের সুপারিশক্রমে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের প্রবাদপুরুষ ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীনে গবেষণা কর্ম করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করি। আমার অগ্রজ ফাল্গুনীকুমার নস্কর এই পুস্তক প্রকাশের আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছেন ও আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ছাড়া কোনভাবেই তাঁদের ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়।

গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়ে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং যাঁরা আমাকে বিষয়ানুগ তথ্য দিয়ে, বিষয় দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে যে-সমস্ত শিল্পী আমাকে তাঁদের সাধনার ফসল স্বরূপ পালাগান ও পালাগান বিষয়ক তথ্য দিযে আমার গবষণার বিষয়কে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন—বাঁশীনাথ হালদার (কাঁটাবেনিয়া), সন্তোষ মণ্ডল (রামনগর), কেনারাম মণ্ডল (রাণা), সুদিন মণ্ডল, সুবর্ণ মণ্ডল, অনিল হাজরা, সুধাময় হাজরা (বেগমপুর), গোষ্ঠ মণ্ডল (আটঘরা), প্রবোধ ছাটুই, জীবন মণ্ডল (সীতাকুণ্ড), কড়ি নস্কর (ওড়ঞ্চ), কালিপদ মণ্ডল (মধ্যসীতাকুণ্ড), বাসুদেব মণ্ডল, দুলাল কৃষ্ণ মণ্ডল (নলকোঁড়া), বসন্তকুমার হালদার (মোকিমপুর), লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন (রাধাবল্লভপুর), শশধর মহিষ (মৎস্যখালি), পাঁচু হালদার (সীতাকুণ্ড), শহীদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম (বকজুড়ি), নকুল মণ্ডল, রতিকান্ত মণ্ডল (মধুবনপুর), দীপক মণ্ডল (ধোপাগাছি), অজিত নস্কর, শ্যামল সরদার (পুনপোয়া), বলরাম জানা ও সম্প্রদায় (দীঘিরপাড়), বনমালী মণ্ডল (কাঁকুড়িয়া), রবিন মণ্ডল ও সম্প্রদায় (ঢোলা), গোপাল সরদার (দঃ শ্রীকৃষ্ণ নগর), মুক্তরাম সরদার (কাঁটাপুকুর)। লোকসংস্কৃতির লোকায়ত পালাগানের ধারা যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

অনেক পুরোহিত, মন্দিরের সেবাইত তাঁদের পূজার মন্ত্রতন্ত্র অকপটে বলে ও দেবদেবীর পূজাচার সংক্রান্ত নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁরা হলেন জ্যোতিষ মুখার্জী, গণেশ ব্যানার্জী, স্বপন ব্যানার্জী (বেগমপুর), শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কাঁটাবেনিয়া), সুকুমার ঘোষাল, রাজকুমার ঘোষাল (ঘটকপুকুর), ভূপতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (শিবাকোল), এঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যে-সমস্ত বিদগ্ধজন ক্ষেত্রগবেষণাকর্মে তথ্যাদি সংগ্রহে ও বিচার বিশ্লেষণে নানাভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করে ধন্য করেছেন তাঁদের মধ্যে নরোত্তম হালদার (কাকদ্বীপ), গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, প্রতীপ ভট্টাচার্য (জয়নগর), বিমলেন্দু হালদার, (সোনারপুর), ধূর্জটি নস্কর (বারাশত), শঙ্কর প্রামাণিক, দীপককুমার রায় (ডায়মন্ডহারবার), দিলীপকুমার মইতে (বেড়াচাঁপা), হেমেন মজুমদার, ডাঃ সুশীলকুমার ভট্টাচার্য (বারুইপুর), ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী (নরেন্দ্রপুর), অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী (রামনগর), জীবনকুমার মণ্ডল (সীতাকুণ্ড), বাচ্চু মিঞা (হাড়োয়া), গিরীন্দ্রনাথ দাস (বারাসাত), কালিচরণ কর্মকার, কৃষ্ণকালী মণ্ডল (ধোপাগাছি)।

যে-সকল বিদ্যোৎসাহী ও হিতাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন সময়ে বিষয়কেন্দ্রিক তথ্যাদি ও উৎসাহ দিয়ে এবং তাঁদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাকে সঙ্গ দিয়ে ধন্য করেছেন তাঁরা হলেন অমলেন্দু ত্রিপাঠী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বিনয় মুখার্জী (জোড়ামন্দির), জীবন মণ্ডল (বেগমপুর), অরবিন্দ নস্কর (চাঁদপুর), অনন্তকুমার মান্না (পাথরপ্রতিমা), সাধনচন্দ্র নস্কর, সুবলচন্দ্র হালদার (শিরাকোল), হরেন্দ্রনাথ নাগ (মদারাট), আলি আহমেদ (হাড়োয়া), অনিলকুমার পাত্র (সুরেন্দ্রনগর, পূর্ব), ষষ্ঠীচরণ মণ্ডল (কন্দমালা), নোনো চক্রবর্তী, ভদু পাল (শিখরবালী) ফকিরের মেয়ে (কন্দমালা), বাসুদেব কয়াল, বিশ্বনাথ কয়াল (বেগমপুর), অনিলকুমার ঘোষ (মদারাট), আবুল বাসার (সীতাকুণ্ড), এম. রসিদ, আবদুর রাজ্জাক (যোগীবটতলা), কাসেমালি নস্কব, শৈললাল সরদার (ধোপাগাছি), বীরেন মণ্ডল, সুরেন মণ্ডল, বিব্রত মণ্ডল (শীতলিয়া), বলরাম গায়েন, গোবিন্দ গায়েন (বাপুলীর চক), সুধাসিন্ধু বর, জয়দেব বর (ভরতগড়), সুবীর সরদার (হিরণ্ময়পুর), নরেন্দ্রনাথ রায়, ধীরেন মণ্ডল (ঝড়খালি), তপেন্দু ভট্টাচার্য (বেগমপুর), সুবলচন্দ্র হালদার (চৈতন্যপুর), প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল, সুলেখা মণ্ডল (নারানপুর) মতিউর রহমান, আতিউর রহমান (সীতাকুণ্ড), দীনবন্ধু তরফদার, পাঁচুগোপাল তরফদার (বারুইপুর), সুভাষ মণ্ডল, কমল মণ্ডল (নারায়ণ তলা), অনুপমা মণ্ডল, পুষ্পেন্দু নস্কর (সোনারপুর), অশ্বিনী মণ্ডল (শিরাকোল), মৃদুলা সোম (নোয়াপাড়া), নরনারায়ণ পুততুণ্ড ও স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায় ঘোষপুর, চিটে সিং (মাধবপুর), বিভাস মাইতি, ভুবন কাওয়ারী, সন্তোষ বসাক, নেপালপদ দাস, তপন রায়, সুদিন সেন, শ্যামল পুরকাইত, অশেষ মজুমদার প্রমুখ আদর্শ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকগণ। এঁদের কেবল ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না, এঁদের জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আমার গবেষণাপত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে টাইপ, জেরক্স ও বাঁধাই করে দিয়ে কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন কল্পনা নাগ, তরুণবাবু, রঞ্জিত মাইতি, রাম ব্যানার্জী, রাজা রায় ও ধর ব্রাদার্সের কর্মীবৃন্দ। গবেষণাপত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে স্ক্রিন প্রিন্টো, মুখার্জী এন্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে ছাত্রপ্রতিম শ্রী তপনকুমার মুখার্জী, অলোক দাম দায়িত্ব নিয়ে অতি যত্ন সহকারে কাজটি সম্পাদন করেছে। তার জন্য শ্রী তপন ও তার কোম্পানিকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে যাদের অকুণ্ঠ ও নিরলস প্রয়াস কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি তারা হল, ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধু বিপদবারণ সরকার (বেলিয়াঘাটা), পূর্ণেন্দু ঘোষ (খাড়ুপাতালিয়া), প্রদীপ মুখোপাধ্যায় (সাউথ গড়িয়া), অভিজিৎ সরদার (বারুইপুর)। এছাড়া আরও অনেক ব্যক্তি এই গবেষণাকাজে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, যাঁদের নাম বিস্মরণ হেতু উল্লেখ করা গেল না তাঁদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

অবশেষে আমার পিতৃব্য শ্রী তুলসীচরণ নস্কর, বৌদি লতিকা নস্কর, সহধর্মিণী প্রতিমা এবং সন্তান ও সন্তানতুল্যদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, নির্মল ভালবাসা ও স্নেহ। এঁদের বা এদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

দেবব্রত নস্কর

শব্দসূচি